বঙ্গদর্শন

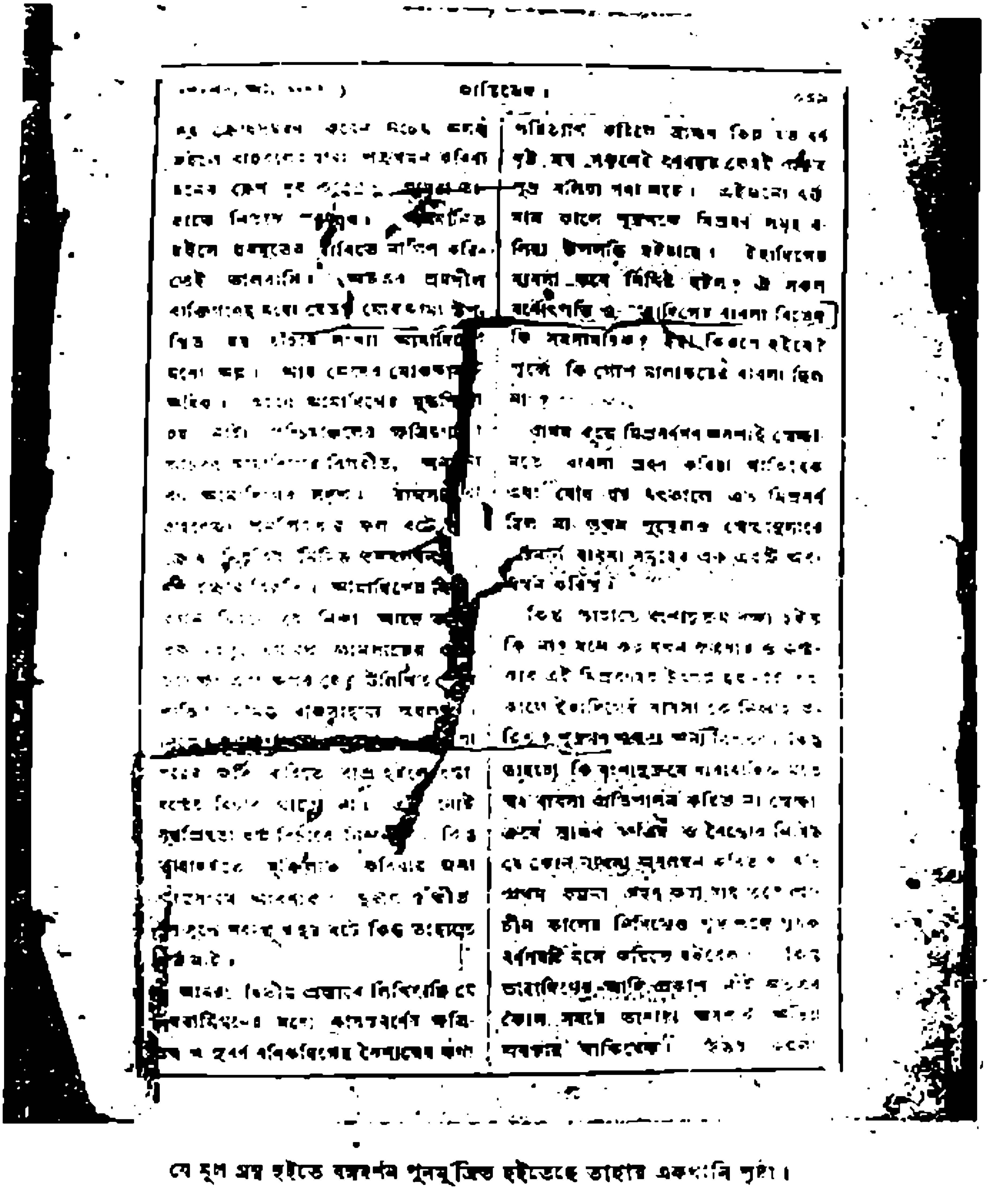

যে মূল গ্রন্থ হইতে বঙ্গদর্শন পুনর্মুদ্রিত হইতেছে তাহার একখানি পৃষ্ঠা।

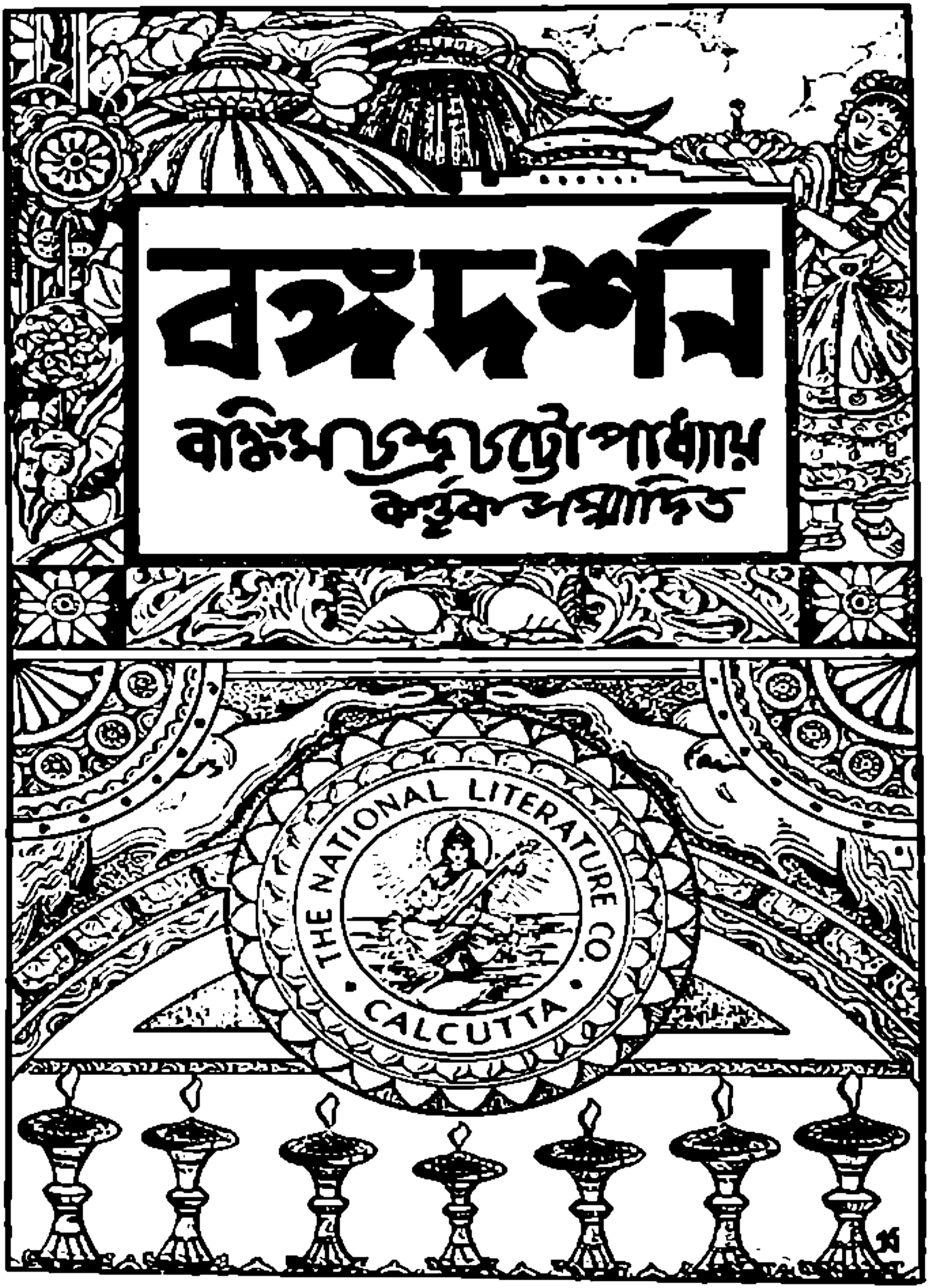

বঙ্গদর্শন

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
কর্তৃক সম্পাদিত

THE NATIONAL LITERATURE CO.
CALCUTTA

প্রথম মুদ্রিত ১২৮১ বঙ্গাব্দ
পুনর্মুদ্রিত সংস্করণ ১৩৪৬ বঙ্গাব্দ

116,601

সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত

দি ন্যাশনাল লিটারেচার কোম্পানীর (৫, ডালহৌসি স্কোয়ার) পক্ষ হইতে
শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত
অন্নদা প্রেস (৩, কিশোরীলাল মুখার্জী লেন, কলিকাতা) হইতে
শ্রীপ্রভাতচন্দ্র দত্ত কর্তৃক মুদ্রিত।

নিবেদন

সম্বর্দ্ধিত উৎসাহে বঙ্গদর্শনের তৃতীয় খণ্ডটি বঙ্গীয় পাঠকসমাজের কাছে উপস্থাপিত করা হইল। ইতিমধ্যে পুনঃপ্রকাশিত বঙ্গদর্শন যে জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করিয়াছে তাহা আশাতীত না হইলেও, আমাদের পক্ষে বিশেষ আনন্দদায়ক হইয়াছে, সন্দেহ নাই।

বহু গুণী, জ্ঞানী, মনীষী, পুনর্মুদ্রিত বঙ্গদর্শনের সজ্জা ও মুদ্রণের প্রশংসা করিয়া এবং তৎসঙ্গে আমাদের এই প্রচেষ্টার সাফল্যকামনা করিয়া, শুভেচ্ছা-লেখন পাঠাইয়াছেন। তাঁহাদের শুভেচ্ছা ও আশীর্ব্বাণী আমাদের অফুরন্ত উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা প্রদান করিয়াছে, বহু প্রতিকূল অবস্থাকে অতিক্রম করিবার সাহস ও শক্তি দিয়াছে। তাই আজ তাঁহাদের প্রতি আমাদের অন্তরের গভীর ও অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতেছি। আশা করি, বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শনের নব-সংস্করণের প্রকাশকরূপে আমরা সকল বাঙ্গালীর নিকট হইতেই সমরূপ উৎসাহ ও শুভকামনা লাভ করিব। ইতি ১৫ই আষাঢ় ১৩৪৬।

দি ন্যাশন্যাল লিটারেচার কোম্পানী

৫৩, ষ্টিফেন হাউস
৫, ডালহৌসি স্কোয়ার, কলিকাতা।

বিষয়	পৃষ্ঠা
অধঃপতন সঙ্গীত	৫১৯
আমার সঙ্গীত	৪৮১
আর্য্যজাতির সূক্ষ্ম শিল্প	২৫৪
এই কি আমার সেই জীবনতোষিণী	৩০৭
ঐতিহাসিক ভ্রম	২৪৪
কমল বিলাসী	১৩৬
কমলাকান্তের দপ্তর	৬১,১২৭,৩০৯,৩১৮,৪১৯,৫২১
কল্পতরু	৫৪৫
কলেজ রি-ইউনিয়ন	৫৯৮
কোম্‌ৎ দর্শন	৫২৩
কৃষ্ণচরিত্র	১০৫
খাদ্য	১১৬-৪৬৭
চন্দ্রনাথ	১০৭
চন্দ্রশেখর	৩১,৮৮,১৫০,১৮৯,২৩৩
চার্ব্বাক দর্শন	১৭১,৩২০
চিহ্নিত স্বজন	৭৭
জাতিভেদ	৩২৮,৩৭৯,৪৫৪
জৈন ধর্ম্ম	১৯৯,২২৬
জ্ঞান সম্বন্ধে দার্শনিক মত	৪৩৬
তিন রকম	১[illegible]৭
দেবতত্ত্ব	২৯৭
নানা কথা	৪৮১,৬৩৪
পরিমাণ রহস্য	১৪৪
পাগলিনী	২০৪
পূর্ব্বরাগ	৫,৪৭৪

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রাচীনা এবং নবীনা	৪১
০প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা	৫০,৯৫,১৫৮,২০৬,২৬৪.৩১৬,৩৬১,৪২২,৪৭৩,৫২৮
বাঙ্গালার ইতিহাস	৪৯৩
বাঙ্গালির বাহুবল	১৬০
বাল্মীকি ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত	১১৫,২৬৮,৩৮৮
বাণভট্ট	২৮৪
বিববর	৬১২
বৃত্রসংহার	৫১৮,৫৪৪
ভারত মহিমা	৫০৮
ভারতবর্ষীয় আর্য্যজাতির আদিম অবস্থা	৮,৫৩,১৩১,১৮২,২১৪,৩৩৯,৩৭২,৪৮৩,৫৮৪
ভালবাসার অত্যাচার	৪১২
০ ভাষা সমালোচন	১
ভাই ভাই	৬১৯
মহিষমর্দ্দিনী	৬২৬
রজনী	২৯০,৩৪৬.৪ ৭.৪৬০,৫০১,৫৭৫,৫৯৫
শ্রীহর্ষ	১৮,৯০
০সংগীত সমালোচনা	৬২৮
সমাজ বিজ্ঞান	৫৪৫
সর্ উইলিয়ম গ্রে ও সর্ জর্জ কাম্বেল	৮০
সেকাল আর একাল	৪৩২

বঙ্গদর্শন

মাসিকপত্র ও সমালোচন

তৃতীয় খণ্ড] বৈশাখ ১২৮১ [প্রথম সংখ্যা

দুই

বঙ্গদর্শনের প্রথম খণ্ডে, "ভাষার উৎপত্তি" ইত্যভিধেয় প্রবন্ধে, ভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধে যে কয়েকটি মত প্রচারিত আছে, তাহা সমালোচিত হইয়াছে। অনুকৃতিবাদই এক্ষণকার পণ্ডিতগণের গ্রাহ্য বলিয়া প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। সেই অনুকৃতি বাদ কি, তাহা এখন আর একবার বুঝাইয়া বলিলে বোধ হয় নিতান্ত পুনরুক্তি হইবে না। কোন পদার্থ হইতে যে শব্দ নিঃসৃত হইয়া থাকে, অথবা জন্তুগণ যে রব করিয়া থাকে, কিম্বা কোন পদার্থ ইন্দ্রিয় গোচর হইলে, আপনা আপনি মনুষ্য মুখ হইতে যে শব্দ নির্গত হয়, সেই শব্দ বা রবের অনুকরণেই ভাষার উৎপত্তি। অনুকরণ শক্তি মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ। সেই জন্যই বালকে বংশীকে, 'ভোঁপো,' কুকুরকে, 'ভেউভেউ' এবং আততায়ীকে 'উঃ উঃ' বলিয়া থাকে; কিন্তু আদিতে সকল শব্দই কি অনুকরণ হইতে উৎপত্তিলাভ করিয়াছে? এবিষয়ে নানা সন্দেহ হইতে পারে। সকল ভাষাতেই কতকগুলি শব্দ যে, অনুকরণসৃষ্ট তাহার আর কোন সন্দেহ নাই অন্যগুলির সম্বন্ধে কেবল অনুমান করিতে হইবে মাত্র। কিন্তু কোন একটী বিশেষ শব্দ লইয়া জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে না, যে, এটী

কোন্ শব্দের অনুকরণে সৃষ্ট হইল ? কেন না ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, যে যুগধর্ম্মে অধিকাংশ শব্দই বিলক্ষণ রূপান্তরিত হইয়াছে। এমন কি, যে শব্দ হইতে বর্ত্তমান শব্দটি উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা হয়ত আমরা আজিও সেইরূপ উচ্চারণ করিয়া থাকি, অথচ সেটি যে, বর্ত্তমান শব্দটির পূর্ব্বপুরুষ তাহা জানিবার এখন কোন উপায় নাই বলিলেই হয়।

বিশেষতঃ সংস্কৃত অতি প্রাচীন ভাষা ; ইহাতে ব্যাকরণের জটিলতা বিস্তর ; আপিশলি* হইতে তারানাথ পর্য্যন্ত সকলেই ইহার উপর যথাসাধ্য দৌরাত্ম্য করিয়াছেন ; সুতরাং সংস্কৃত অত্যন্ত রূপান্তরিত হইয়াছে ; বর্ত্তমান শব্দ সকলের কুলচি স্থির করিয়া মূল গোত্র নির্ণয় করা অত্যন্ত কঠিন ; কঠিন কেন ? এক প্রকার অসম্ভব বলিলেও বলা যাইতে পারে।

সংস্কৃত 'নিষ্ঠীবন' শব্দের মধ্যে যে ইহার পূর্ব্বপুরুষের নাম লুক্কায়িত আছে তাহা আপাততঃ কোন মতেই বোধগম্য হয় না। কিন্তু একটু বিতর্ক করিয়া দেখিলে, তাহা শীঘ্রই অনুভূত হইবে। নি + ষ্ঠীপ্ × অন (ট) = নিষ্ঠীবন। এই ষ্ঠীপ্ শব্দই বলুন আর ধাতুই বলুন, যে শুদ্ধ অনুকরণাত্মক তাহা অনেকেই স্বীকার করিবেন। নিষ্ঠীবন ত্যাগকালে মুখ হইতে যে শব্দ বহির্গত হইয়া থাকে তাহারই অনুকরণে এই সংস্কৃত ষ্ঠীপ্, গ্রাম্য বাঙ্গালা ছিপ বা ছেপ এবং পিক বা পিচ্, ইংরাজি স্পিট্ (Spit) ইত্যাদি। চলিত বাঙ্গালা 'থুথু' শব্দ যে অনুকরণ মূলক তাহাও সহজে উপলব্ধি হয়। নিষ্ঠীবন শব্দের মূল সেরূপ সহজে বুঝা যায় না। কেন না ইহা বিশেষ রূপান্তরিত হইয়াছে।

কোন্ শব্দের অনুকরণে কোন্ শব্দ হইল, তাহা এখন প্রায়ই বলা যায় না ; এবং এইরূপ প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া, সদুত্তর না পাইলেই, সকল শব্দই যে অনুকরণ-মূলক, এ কথা অস্বীকার করা যুক্তি সঙ্গত নহে।

কিন্তু এরূপ কতগুলি শব্দ আছে, যেগুলি অনেক ভাষাতেই প্রায় সমান। ইংরেজি, সংস্কৃত এবং লাটিন অথবা গ্রীক ভাষায়, যে কতকগুলি শব্দ একরূপ আছে তাহা আমরা এই প্রস্তাবের প্রথম খণ্ডে, দ্বিতীয় খণ্ড বঙ্গদর্শনে আশ্বিন মাসে, দেখাইয়াছি।

এরূপ যে শব্দগুলি, অনেক ভাষায় সমান, সেগুলি সম্বন্ধে সহজেই জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে, যে তাহার কোন্‌টি কোন্ শব্দের অনুকরণে উৎপন্ন হইয়াছে। সেগুলি অনেককাল যে বিশেষ রূপান্তরিত হয় নাই, তাহা প্রত্যক্ষ লক্ষিত হইতেছে। যদি অনেক দিন রূপান্তরিত না হইল, তাহা হইলে, আদিম অনুকৃত শব্দের মূর্ত্তি হয়ত তাহারা এখনও ধারণ করিয়া আছে।

---

* বঙ্গদর্শনের প্রথম খণ্ডের ৩১৭ পৃষ্ঠা দেখ।

"ন, অন্, অ," প্রভৃতি নিষেধ জ্ঞাপক শব্দের সাদৃশ্য অনেক ভাষাতেই আছে। ন, না নি (ne L.), নেহি, নো (E. no) প্রভৃতি শব্দ কোন্ শব্দের অনুকরণে সৃষ্ট হইল ? এই প্রশ্নে ভাষাতত্বজ্ঞ কোন আপত্তি করিতে পারেন না। শব্দগুলি অনেক ভাষাতেই প্রায় একাক্ষরী ; যে কিছু রূপান্তর হইয়াছে তাহা স্বর বৈলক্ষণ্যে মাত্র ; কিন্তু দন্ত্য ন্ যে নিষেধ বুঝাইতেছে তাহাতে কিছুই সন্দেহ নাই। কোন্ শব্দ বা রবের অনুকরণে এই দন্ত্য 'নর' নিষেধ জ্ঞাপকত্ব সৃষ্টি ?

এই প্রশ্নের উত্তরে, কোন কোন ভাষাবিৎ* বলেন, যে সকল শব্দই যে অনুকরণ-মূলক এমন না হইতেও পারে। এমন হইতে পারে যে কেহ কাহারও অনুকরণ না করিয়া, ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে অবস্থিত হইয়াও কেবল দন্ত্য ন দ্বারা নিষেধ জ্ঞাপন করিয়াছেন।

বালকে এবিষয়ের উদাহরণ পাওয়া যায়। এরূপ সকল দেশে সকল কালেই ঘটে, যে, বালকের ইচ্ছা না থাকিলেও, তদীয় পিতা মাতা তাহাকে দুগ্ধ পান করাইয়া থাকেন। অপোগণ্ড শিশু স্তন্যদুগ্ধপান করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছে, তাহার আর পানস্পৃহা কিছুমাত্র নাই। কিন্তু স্নেহময়ী জননীর পোষণেচ্ছা এখনও নিবৃত্তি পায় নাই। তিনি নিরুপায় শিশুকে মৃদুবলে ক্রোড়ে পাতিত করিয়া, হয়ত হেমময় কোষপাত্রে ঘন দুগ্ধ পরিপূর্ণ করিয়া, নতুবা শুক্তির কোষার্দ্ধে ছাগদুগ্ধ পূর্ণ করিয়া তাহার মুখবিবরে প্রদান করিতে উদ্যোগ করিতেছেন ; অনুপায় শিশু তখন কি করিবে ? মস্তক সঞ্চালন করিবে। মাতা বামকরে মস্তক ধারণ করিলেন ; বালক তখন মুখ বন্ধ করিয়া, দন্তে দন্ত বদ্ধ করিয়া—কি বলিবে ? নি-নি-নি-নুঁ-উঁ-উঁ প্রায়, ইত্যাকার শব্দ করিয়া থাকে। এইরূপে প্রথমে 'ন' উচ্চারণ করিয়া বালক নিষেধ জ্ঞাপন করিতে শিক্ষা করে।

এই শিক্ষা হইতে ক্রমে অভ্যাস। যাহা বালক শিখিয়াছিল, যুবার তাহা অভ্যস্ত বোধ হয়, অসভ্য আদিম নরে যাহা শিখিয়াছিল, এখনকার সভ্য নরের তাহা অভ্যস্ত। এরূপ তর্ক হইতে পারে যে এরূপ স্থলে শিক্ষা হইতে যে অভ্যাসের সৃষ্টি হয় তাহাও অনুকরণমূলক। প্রথম একবার ন বাণী বলিয়া পরে দ্বিতীয়বার সেই বালক সেরূপ অবস্থায় পতিত না হইয়া যখন ন বাণী বলে, তখন সে আত্মানুকরণ করে মাত্র। এরূপ কথা অপ্রামাণিক অনুমান মাত্র ; এবং কখনই সত্য হইতে পারে না। ইহা যুক্তি বিরুদ্ধ। অনুকরণ ইচ্ছা প্রযুক্ত অপোগণ্ড বালকের ইচ্ছাশক্তি নাই। তাহার এরূপ কার্য্য কেবল শারীরিক-অনুস্মৃতি মূলক মাত্র।

শারীরিক অনুস্মৃতি কাহাকে বলে ? কেহ চক্ষুতে আঘাত করিতে আসিলে চক্ষুর পাতা পড়িয়া যায় কেন ? শারীরিক অনুস্মৃতি বলে। কোন শিরা, ধমনী

---

*যেমন Farrar.

বা কোন শোণিত প্রবাহ বারম্বার এক পথে সঞ্চালিত হইলে, বা শরীরের কোন অঙ্গ বারম্বার একরূপ সঞ্চালিত হইলে, পরে কোন সদৃশ কারণের উৎপত্তি হইলেই সেই শোণিত প্রবাহ সেই পথে আবার ধাবিত হইবে, সেই অঙ্গ আবার সেইরূপ সঞ্চালিত হইবে।

ইহাকেই শারীরিক অনুস্মৃতি বলিতেছি। শারীরিক অনুস্মৃতি স্বভাবসিদ্ধ বলিয়াই, হাস্য* বা ক্রন্দন সম্বরণ করা নিতান্ত কষ্টকর।

নিষেধ জ্ঞাপক 'ন' শব্দের অভ্যাস বালক বা অসভ্য আদিমাবস্থার লোকের পক্ষে শারীরিক অনুস্মৃতিমূলক।

বিশুদ্ধ অনুকৃতিবাদী ইহা স্বীকার করিয়াও বলিতে পারেন, যে, সেই ন আদিম বালকের পক্ষে অনুস্মৃতিমূলক হইতে পারে, কিন্তু এখনকার কালে সেই ন যে কেবল অনুকৃতি মূলক তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

কিন্তু ভাষার উৎপত্তি কথন সময়ে, বর্ত্তমান ভাষা সকল কিরূপে পাইলাম, সে বিষয়ের বিবেচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। কেন না, তাহা হইলে, অপৌরুষেয়ত্ববাদ, সম্মতিবাদ, এবং অনুকৃতিবাদ এ তিনটিই যুক্তিসঙ্গত হইয়া উঠে।

(১) ভাষা অপৌরুষেয়া বা ঈশ্বর প্রদত্তা; কেন না সকলই ঈশ্বর দত্ত। এমন হইতে পারে বটে যে, ঈশ্বর বালককে বা আদিম লোককে, কুক্কুর দেখিয়া এবং তাহার রব আকর্ণন করিয়া, তাহাকে 'ভেউ ভেউ' নাম প্রদান করিতে কাণে কাণে পরামর্শ দেন নাই, কিন্তু বালককে তিনি অবশ্যই এরূপ শক্তি প্রদান করিয়াছিলেন, যে, সে তদ্দ্বারা কুক্কুর দেখিলেই তাহার 'ভেউ ভেউ' নামকরণ করিবে। সুতরাং ভাষা ঈশ্বর প্রদত্তা বা অপৌরুষেয়া।

(২) ভাষা সম্মতিমূলিকাও বটে; কেন না কোন এক বিশেষ শব্দে কোন একটা বিশেষ পদার্থ বুঝাইবে একথায় এখন যদি সকলে সম্মত না হন, তাহা হইলে এখনই ঘরে ঘরে বাবেল মন্দির হইয়া উঠিবে।

এই সকল কথায় অনুকরণবাদীকে উত্তর দিতে হইবে, যে, ঈশ্বর সকল শক্তির বিধাতা এ কথার প্রতিবাদ করা ভাষা সমালোচকের উদ্দেশ্য নহে। এবং সম্মতি হইতে যে ভাষার স্থিতি তাহাও সকলকে স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু ভাষার স্থিতি সম্মতিসাপেক্ষ বলিয়া ভাষার উৎপত্তিকালে সম্মতির প্রয়োজন এ কথা যুক্তিযুক্ত নহে।

তাহাতেই বিশুদ্ধ অনুকরণবাদীকে আমরা বলিতেছি, যে এখন কালে, নিষেধ জ্ঞাপক 'ন' শব্দ প্রয়োগ কালে, একে অন্যের অনুকরণ করিয়া থাকে বলিয়া, নিষেধ

---

*Vide H. Spencer's Philosophy of Laughter.

জ্ঞাপক ‘ন’ অনুকৃতি মূলক বলা যাইতে পারে না। ইহা একরূপ স্বভাবজ্ঞ এবং পরে অনুস্মৃতি মূলক।

সুতরাং অনুকৃতিবাদ দুই খণ্ডে বিভক্ত। ইহার বিভেদ ‘ভাষার উৎপত্তি’ প্রবন্ধে সূচিত হইয়াছিল। পরিস্ফুট করা হয় নাই। সেই জন্যই এই প্রস্তাবের অবতারণা।

ভাষা কতকদূর অনুকৃতা। যেমন পশ্বাদির এবং তাহাদিগের রবের নামকরণ সময়ে। এবং কতদূর স্বভাবজ্ঞা। যেমন পিতা মাতার নামকরণে, নিষেধ জ্ঞাপনে এবং হঠাৎ মনোভাব পরিবর্ত্তনশীল কোন বস্তুর নামকরণ কালে।

ভাষার উৎপত্তি বিবেচনা করিতে গেলে, ইহা মূলতঃ অনুকৃতা এবং স্বভাবজ্ঞা। সেই মূলের মূল বিবেচনা করিতে গেলে, ঈশ্বর অবশ্যই হইবেন : কেননা ঈশ্বরের লক্ষণই এই যে, তিনি সকল মূলের মূল।

ভাষার স্থিতি বিবেচনা করিলে, ইহা কিয়ৎপরিমাণে অনুস্মৃতি মূলক এবং কিয়ৎ পরিমাণে সম্মতি মূলক। দেহী মাত্রেরই পৌনঃপুনিক কার্য্যে অনুস্মৃতি আছে। ভাষাতেও আছে। সমাজ মাত্রেরই সামাজিক কার্য্যে সকলের সম্মতি আছে— ভাষাতেও আছে। আর ঈশ্বর সকল স্থিতিরই মূল, সুতরাং ভাষা স্থিতিরও মূল।

ভাষার সৃষ্টিস্থিতি এইরূপ; ভাষার লয় হয় কি? হয় না। যে কারণে নৈয়ায়িক বৃক্ষ লতাকে নিত্য বলেন, সেই কারণেই আমরা ভাষা নিত্যা বলিতেছি। একটি বৃক্ষের লয় হয়, একটি শব্দের লয় হয়; বৃক্ষজাতির লয় হয় না, সেইরূপ ভাষার লয় হয় না। তবে মহাপ্রলয়ে যখন সকল পদার্থই ব্রহ্মে লীন হইবে, তখন অবশ্য ভাষারও লয় হইবে। কিন্তু সে স্বতন্ত্র কথা।

ভাষার সৃষ্টিস্থিতি আছে লয় নাই। কিন্তু বৈবর্ত্তন আছে। ভাষার অতি বিস্ময়কর বৈবর্ত্তন হইয়া থাকে। জগতে সকল কার্য্যেরই নিয়ম আছে। সকল বৈবর্ত্তনের নিয়ম আছে; ভাষায় যে বৈবর্ত্তন হইয়া থাকে, তাহা অতি বিস্ময়কর বটে, কিন্তু তাহারও অতি সুন্দর নিয়ম আছে।

এই বৈবর্ত্তনের দুইটি মূল নিয়ম এই প্রস্তাবে বলা যাইতেছে।

(১) দেশ ভেদে, অবস্থা ভেদে উচ্চারণের তারতম্য হইয়া থাকে।

বেদে পঞ্জাব প্রদেশকে ‘সপ্তসিন্ধু’ বলিয়া কথিত হইয়াছে। প্রাচীন ইরাণীয়েরা দন্ত্য স স্থানে হ উচ্চারণ করিত। এবং এই ‘সপ্তসিন্ধুকে’ তাহারা ‘হপ্তহিন্দু’ বলিয়াছে। সিন্ধু নদীকে হিন্দু বলিত। এইরূপে ‘হিন্দু’ এবং ‘হিন্দিয়া’ শব্দের উৎপত্তি। এখনও যেমন লণ্ডনের ইতর লোকেরা হকার আদি কথায় হকারের লোপ করিয়া থাকে, মধ্যকালের ইউরোপীয়েরা সেইরূপ হিন্দিয়া শব্দের হ লোপ করিয়া ‘ইণ্ডিয়া’ নাম রাখিল। এইরূপে সিন্ধু হইতে ‘ইণ্ডিয়া’ নামের সৃষ্টি

এইরূপ নানা উদাহরণ প্রদত্ত হইয়া থাকে। কিন্তু এই নিয়ম স্থাপন জন্য নানা উদাহরণ প্রদান করিবার আবশ্যক নাই। সকলেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, যে, ইংরাজে বিশেষ চেষ্টায় ত উচ্চারণ করিতে প্রায়ই পারেন না; এবং সেইরূপ স্কটলণ্ডবাসী সাহেবেরা বিশেষ চেষ্টা করিয়া ট উচ্চারণ করিতে পারেন না। আমরা গত আশ্বিন মাসে ভিন্ন ভিন্ন ভাষা হইতে যে সকল শব্দ সাদৃশ্য প্রদর্শনার্থ উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছি, এক ভাষা হইতে অন্য ভাষায় তাহার এক একটা কিরূপ হইবে, তদ্বিষয়ে কতকগুলি সুন্দর নিয়ম আছে। “প্রসিদ্ধ জর্ম্মাণ পণ্ডিত গ্রিম্ সে নিয়মগুলি ধারাবদ্ধ করিয়াছেন বলিয়া, সে গুলিকে গ্রিমের নিয়ম বলিয়া থাকে।” সেগুলি অতি সুন্দর বটে; কিন্তু ব্যাকরণ সূত্রের মত নিতান্ত বিধিবাক্য বলিয়া বোধ হয়, তাহাতেই আমরা এস্থলে সেগুলি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম না।

(২) *দেশ ভেদে যেরূপ শব্দের বৈবর্ত্তন হয়, এক দেশেই তাড়াতাড়িতে সেইরূপ শব্দ রূপান্তরিত হইয়া থাকে।*

পৃথিবীর সর্ব্বত্রই দেখিবেন, যে নগরের ভাষা একরূপ, আর পল্লীগ্রামের ভাষা অন্যরূপ। পল্লীগ্রামের ভাষা শিথিল, বিরলগ্রন্থ এবং দীর্ঘাবয়ববিশিষ্ট এবং নগরের ভাষা দৃঢ়বদ্ধ, ঘন সংশ্লিষ্ট, স্বল্পায়ববিশিষ্ট। নগরের লোকজনতা অধিক এবং লোকে ব্যবসা বাণিজ্যের ব্যস্ততা নিবন্ধন দীর্ঘসূত্রিতায় ঘৃণা করে বলিয়া এরূপ হইয়া থাকে।

এইরূপে করিলা হামি—করিলা হাম—করিলাম—কর্লাম—কল্‌ম—কন্নু, হইয়া যায়। এইরূপে মধ্যম দাদা মহাশয়, ক্রমে মেজ্‌দা হইয়া উঠেন; এবং ঠাকুরমাতা ঠাকুরাণী; ক্রমে ঠাউমা হন।

ভাষা বৈবর্ত্তনের সকল নিয়ম দেখান আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে; আমরা কেবল দুইটি প্রধান নিয়ম প্রদান করিলাম মাত্র। এই দুইটি নিয়মের মধ্যেই অনেকগুলি সূক্ষ্মতত্ত্ব সন্নিবেশিত আছে। সূত্র হইল দেশ ভেদে উচ্চারণ ভেদ হইয়া থাকে—যথা সংস্কৃত দন্ত্য স, জেন্দ গ্রন্থে ‘হ’ হইয়াছে। দন্ত্য স, ‘হ’ হইল কেন, মূর্দ্ধণ্য ষ-র মত উচ্চারিত না হইল কেন? এটি বড় কূট প্রশ্ন। কিন্তু বৈজ্ঞানিক এই প্রশ্নের যতক্ষণ উচ্চারণ করিতে না পারেন, ততক্ষণ তাঁহার সূত্রকে বিজ্ঞান সূত্র বলিব না। মক্ষমূলর এইরূপ প্রশ্নের উত্তর দিবার চেষ্টা করিতেছেন, আমাদের এরূপ ভরসাও আছে যে তিনি কালে কৃতকার্য্য হইবেন।

চেষ্টা করিলে সকলেই কৃতকার্য্য হইতে পারেন; যখন দেখিতেছি, যে স্কটলণ্ডবাসীরা, ট উচ্চারণ করিতে পারিতেছে না, ইংলণ্ডবাসীরা ত উচ্চারণ করিতে পারিতেছে না, তখন আমি স্বচ্ছন্দে এরূপ অনুমান করিতে পারি, যে এই দুই জাতির জিহ্বায় অবশ্য কোনরূপ আড় থাকিবে। এই আড় হয় তাহাদিগের

দেশের জলবায়ু হইতে, নয় তাহাদিগের খাদ্য হইতে, না হয় এতদুভয় হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এখন দেখ কোন্ বর্ণ কোন্ স্থান হইতে উৎপন্ন হয়। যে স্থানে জিহ্বার আঘাত করিলে ত বর্ণ উচ্চারিত হইয়া থাকে, শিখাইয়া দিলেও ইংরাজ শিশু, সেখানে জিহ্বার আঘাত করিতে পারে না। তাহার অভ্যাস নাই বলিয়া বলিতে পার না; কেননা স্কট্ শিশুরও ত অভ্যাস নাই, ত সে পারিল কেমন করিয়া? তবে পূর্ব্বে যাহা বলা যাইতেছিল তাহাই ঠিক; শীতবাতাতপখাদ্য নিবন্ধনই এরূপ হয়। শীতে জিহ্বা এড়াইয়া পড়ে, মদ খাইলে এড়াইয়া পড়ে, কিসে, কি খাইলে জিহ্বা তকারের উৎপত্তি স্থানে আঘাত করিতে পারে না? বিজ্ঞান এখন ঐ প্রশ্নের উত্তর প্রদানে অপারগ। আমাদিগের এরূপ ভরসা আছে, উপযুক্ত লোকে এ বিষয়ের সমালোচনা করিলে অচিরাৎ সদুত্তর প্রাপ্ত হইব।

আমাদের দেশে এতকাল লোকের ব্যাকরণ সূত্রে এরূপ আস্থা ছিল, যে মহা মহা ভাষাবিদের এরূপ প্রশ্ন কখন মনে উদিত হইয়াছিল কি না সন্দেহ। জায়া শব্দ, পতি শব্দ দ্বন্দ্বসমাসে একত্র হইলে, দম্পতি হইবে, কেন? এ প্রশ্নের উত্তর সংস্কৃত বৈয়াকরণিক দিতে অসমর্থ। কিন্তু ব্যাকরণ সূত্র ব্যতীত এরূপ ঘটনার কি কোন কারণ নাই? অবশ্যই আছে। বররুচি বলিলেন, সংস্কৃত 'ত্য' র স্থানে, প্রাকৃত 'চ্চ' হইবে। কেন? ইহাতে এই বুঝিতে হইবে যে প্রাকৃত-ভাষীরা 'ত্য' উচ্চারণ করিতে পারিত না, চেষ্টা করিয়া 'চ্চ' বলিয়া ফেলিত। তবে বোধ হয় তাহারা বিদেশীয় হইবে, নহিলে এরূপ উচ্চারণের বৈষম্য হয় কেন?

এইরূপে ভাষা সমালোচনে প্রবৃত্ত হইলে, অনেক অন্ধতমসাবৃত পুরাবৃত্ত পরিষ্কৃত হইবে এবং প্রাচীন আচার ব্যবহার আমরা অনেক বুঝিতে পারিব।

ভারতবর্ষীয় আর্য্যজাতির আদিম অবস্থা

উপক্রমণিকা

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

শাসন প্রণালী

আর্য্যগণ ভারতবর্ষের উৎকৃষ্ট স্থানগুলি অধিকার করিয়া প্রথম অবস্থায় কিছুকাল রাজ্য বিস্তার চেষ্টায় বিমুখ রহিলেন। অধিকৃত রাজ্যস্থ প্রজাবর্গের সুশাসন সম্পাদনই সে বিরতির কারণ। ইঁহারা নিশ্চয় জানিতে পারিয়াছিলেন যে, রাজ্য মধ্যে সুনিয়ম না থাকিলে রাজার প্রভুতা থাকে না। প্রভুসমর্থিত তেজ যাবৎ রাজ্য মধ্যে বিস্তৃত না হয় তাবৎ প্রজার অন্তঃকরণে পাপে ভয়, ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্তি জন্মে না। যথাশাস্ত্র যুক্তি যুক্ত রাজার দণ্ডনীতি প্রজাবর্গের মনোমধ্যে দেদীপ্যমান না থাকিলে তাহাদিগের হৃদয়ে পাপরূপ পিশাচের একাধিপত্য হয়। পাপের বৃদ্ধিতেই সংসারে নানাবিধ অনিষ্ট ঘটে। প্রজার পাপে রাজা নষ্ট, রাজার পাপে রাজ্য নষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং সংসার ক্রমশঃ দুঃখের স্থান হইতে পারে—অতএব এই বেলা সুনিয়ম করা যাউক। সুনিয়ম থাকিলে ভারত সংসার পুণ্যভূমি বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিবে। (১)

---

(১) দণ্ডোহি সুমহত্তেজো দুর্দ্ধরশ্চাকৃতাত্মভিঃ।
ধর্ম্মাদ্বিচলিতং হন্তি নৃপমেব সবান্ধবং। ২৮
ততো দুর্গঞ্চ রাষ্ট্রঞ্চ লোকঞ্চ সচরাচরং।
অন্তরীক্ষ গতাংশ্চৈব মুনীন্ দেবাংশ্চ পীড়য়েৎ। ২৯
সোঽসহায়েন মূঢ়েন লুব্ধেনাকৃতবুদ্ধিনা।
ন শক্যো ন্যায়তো নেতুং সক্তেন বিষয়েষু চ। ৩০ মনু—৭
অত্রাপি ভারতং শ্রেষ্ঠং জম্বুদ্বীপে মহামুনে।
যতো হি কর্ম্মভূরেষা ইতোঽন্যা ভোগ ভূময়ঃ। ১১
অত্রজন্ম সহস্রাণাম্ সহস্রৈরপিসত্তমম্।
কদাচিল্লভতে জন্তুর্মনুষ্যং পুণ্য সঞ্চয়ম্। ১২

ভারতবর্ষকে পৃথিবীর পুণ্যাশ্রম করাই আর্য্যগণের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বলিয়াই যাবদীয় সাংসারিক বিষয়ের সঙ্গে ধর্ম্মশাস্ত্রের সংশ্রব রাখিয়াছিলেন। ধর্ম্মশাস্ত্রের সহায়তা ব্যতীত একপাও চলিবার কাহারও সামর্থ্য থাকিত না।

পূর্ব্বকালে ধর্ম্মশাস্ত্রের সঙ্গে যাহার পরম্পরা সম্বন্ধে সংশ্রব ছিল উত্তর কালে সেই স্থলগুলি কল্পিত ধর্ম্মশাস্ত্রের দুর্ভেদ্য সুদৃঢ় গ্রন্থ গ্রন্থি দ্বারা অত্যন্ত সঙ্কট হইয়া উঠিল। তদবধি আর্য্যসন্তানগণের মানসিক প্রতিভা ও স্বাধীন প্রবৃত্তি ঐ সকল সঙ্কট স্থলে ক্রমশঃ প্রতিহত হইতে থাকিল। বারংবার প্রতিঘাত দ্বারা আর্য্য সন্তানিগণের হৃদয় পর্য্যন্ত জর্জ্জরিত হইয়া গেল। অধস্তন সন্ততিবর্গ যদি পূর্ব্বাচরিত প্রণালী অনুসারে চলিতেন, নূতন নিয়মের একান্ত অনুরক্ত না হইতেন, পরিবর্ত্তসহ স্থলে স্থলে সুনিয়ম ক্রমে বিধির পরিবর্ত্তন করিয়া চলিতেন ও একেবারে মূলোচ্ছেদের চেষ্টা না পাইতেন, তাহা হইলে ভারতসংসার চিরকাল সর্ব্বজাতির নিকট পুণ্যাশ্রম বলিয়া যে পরিচিত থাকিত, তদ্বিষয়ে কোন সংশয় নাই।

পূর্ব্বকালে আর্য্যজাতির শাসনভার রাজার হস্তে সমর্পিত ছিল। এক্ষণে দেখা যাউক আর্য্যগণ কাহাকে রাজা শব্দে নির্দ্দেশ করিতেন। স্থূল দৃষ্টিতে ইহাই বোধ হইবে যে অধিকৃত রাজ্যে যাঁহার স্বামিত্ব আছে, যিনি মন্ত্রিগণ পরিবৃত হইয়া প্রজাপালন করেন, যাঁহার সহিত অন্য ভূপতিবর্গ সন্ধি নিবন্ধন হেতু সখ্যতা সূত্রে আবদ্ধ হন, যাঁহার ধনাগার নানাবিধ মণি মাণিক্যাদিতে পরিপূর্ণ, যাঁহার অধিকার মধ্যে অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূস্বামী আছেন, যিনি আপন অধিকার মধ্যে প্রজার ধনপ্রাণ ও মান রক্ষা জন্য সৈন্য সামন্তাদি পরিপূর্ণ দুর্গ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, যিনি কাম ক্রোধাদি রিপু পরতন্ত্র না হন এবং সর্ব্বদা প্রজারঞ্জন নিমিত্ত রত থাকেন, দুষ্টের দণ্ড বিধান ও শিষ্টের পালন করেন, তিনিই রাজা—তেমন লোক ব্যতীত কাহাকেও রাজা উপাধি দেওয়া যায় না। দণ্ডই সাক্ষাত রাজা।

নৃপতির প্রকৃতি এই প্রকার। এক্ষণে তদীয় ব্যবহার, অমাত্যবর্গের কার্য্য, সুহৃৎ লক্ষণ, কোষাগারে অর্থ সঞ্চয়াদি, স্বরাজ্য পর রাজ্যের বার্ত্তা গ্রহণ এবং দুর্গ রক্ষণাদির বিষয় স্থল ও প্রক্রান্ত বিষয়ের বর্ণনাক্রমে যথাযথ স্থানে ক্রমে লিখিত হইবে। (২)

গায়ন্তি দেবাঃকিল গীতকানি
ধন্যাস্তুযে ভারত ভূমি ভাগে।
স্বর্গাপবর্গাস্পদহেতুভূতে
ভবন্তি ভূয়াঃ পুরুষাঃ সুরত্বাৎ। ১৩ বিষ্ণুপুরাণ—২ অং ৩ অং

(২) সাম্যমাত্যা সুহৃৎ কোষ রাষ্ট্রদুর্গ বলানি চ।
দণ্ডঃশাস্তি প্রজাঃ সর্ব্বা দণ্ড এবাভিরক্ষতি।

আর্য্যগণ মনে করিলেন মুনিদিগেরও মতি বিভ্রম ঘটিয়া থাকে। বিষয়াসক্ত ব্যক্তির বুদ্ধি ভ্রংশ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। রাজ্য পালন ভার কেবল রাজার হস্তে সমর্পণ করিলে নানা অনিষ্ট ঘটিতে পারে। অতএব তাঁহাকে এককালে নিরঙ্কুশ না করিয়া অন্যদীয় সাহায্য সাপেক্ষে রাজ্য শাসনের ভার অর্পণ করা মন্দ নয়। প্রজাবর্গ মধ্য হইতে এমন মনুষ্য নির্ব্বাচন করা আবশ্যক, যাহার প্রতি দৃষ্টিমাত্র সর্ব্বলোকের ও রাজার ভক্তি জন্মে; তাঁহাকেই রাজার সহায়স্বরূপ করিয়া দেওয়া উচিত। যেহেতুক ভক্তির পাত্র ব্যতীত কেহই সন্দেহ নিরাস জন্য পরামর্শ জিজ্ঞাসা করে না।

এক্ষণে দেখা যাউক কাহার প্রতি সকলের ভক্তি জন্মে। প্রথম দৃষ্টিতেই ইহা একপ্রকার উপলব্ধি হইবে যে, যিনি জাতিশ্রেষ্ঠ, সদ্বংশপ্রসূত, বয়োবৃদ্ধ, ধার্ম্মিক, নিস্পৃহ, নির্লোভী, জিতেন্দ্রিয়, যিনি মন্ত্রণা গোপন রাখিতে সক্ষম, সর্ব্বশাস্ত্রপারদর্শী, যিনি সমগ্রবেদত্রয় অভ্যাস করিয়াছেন, যিনি গুণের উৎসাহ দাতা, যিনি ক্ষমাশীল, সুচতুর, লোকব্যবহার ও বার্ত্তা শাস্ত্রের তত্ত্বজ্ঞ, যিনি দোষের উচ্ছেদ কর্ত্তা এবং সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান বিষয়ে একান্ত উৎসাহী তাঁহারই প্রতি সমস্ত লোকের ও রাজার আন্তরিক ভক্তি জন্মে। ভক্তিভাজন ব্যক্তিই নৃপতির মন্ত্রীর যোগ্য। এবংবিধ ব্যক্তির প্রতি মন্ত্রির ভার সমর্পণ করিলে রাজ্যের মঙ্গল হইতে পারে। এমন ব্যক্তি সচরাচর কোন্ জাতির মধ্যে অধিক দেখা যায়? বিচার দ্বারা দেখা গেল ব্রাহ্মণ ব্যতীত একাধারে এত গুণ কোন জাতির নাই। সুতরাং বিপ্রজাতিকে প্রধান মন্ত্রীর পদে সংস্থাপিত করা উচিত। ক্ষত্রিয়ের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত গুণাবলীর অধিকাংশ আছে বটে, কিন্তু নিস্পৃহতা ও ক্ষমাগুণ না থাকাতে সে জাতীয় অমাত্যকে দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে গণ্য করা যাইত। বৈশ্য জাতির মধ্যে ক্ষত্রিয় অপেক্ষাও ক্রমশঃ গুণের ভাগ হ্রাস হইয়া আসিয়াছে। বিশেষতঃ তাহারা অর্থনিস্পৃহ নহে, প্রত্যুত কুসীদ ব্যবহার দ্বারা পাপসঞ্চয় করে; অতএব বৈশ্য মন্ত্রীকে তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যে গণ্য করা বিধেয়। শাস্ত্রে অনধিকার প্রযুক্ত শূদ্রগণের মন নিতান্ত ক্ষুদ্র হয়, তদ্ধেতু পাপাচরণে প্রবৃত্তি জন্মিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। এই হেতু বশতঃ ক্ষমতাসত্ত্বে ও কার্য্যদক্ষতার পরিচয় পাইলেও তাহাদিগের প্রতি মন্ত্রণা অথবা

দণ্ডঃ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি দণ্ডং ধর্ম্মং বিদুর্বুধাঃ ॥ ১৮
স রাজা পুরুষো দণ্ডঃ স নেতা শাসিতা চ সঃ।
চতুর্ণামাশ্রমাণাঞ্চ ধর্ম্মস্য প্রতিভূঃ স্মৃতঃ ॥ ১৭
সমীক্ষ্য স ধৃতঃ সম্যক্ সর্ব্বা রঞ্জয়তি প্রজাঃ।
অসমীক্ষ্য প্রণীতস্তু বিনাশয়তি সর্ব্বতঃ ॥ ১৯
মনু—অ ৭

বিচারের ভার কদাচ অর্পিত হইত না। (৩) শূদ্র জাতির প্রতি এতাদৃশ ঘৃণা প্রদর্শনই আর্য্য জাতির পতনের একতর কারণ বলিয়া অনুমান করা যায়।

বিচারাসন ও মন্ত্রণার ভার সর্ব্বাগ্রে সর্ব্বকালে ব্রাহ্মণ জাতির প্রতি বর্ত্তিল। বিপ্রজাতির অভাবে ক্ষত্রিয়ের প্রতি, তদভাবে বৈশ্যজাতি অবধি নিয়ম বিধি হইল। কালক্রমে সগুণত্ব বিষয় লোপ পাইয়া জাতিবিষয় হইয়া গেল। তখন শাস্ত্রের প্রমাণ অনুসারে নির্গুণ ব্রাহ্মণও জাতি মর্য্যাদায় পূজ্য থাকিলেন। তদবধি অদ্য-পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত আছেন। জাতি মর্য্যাদা বা বংশ-গৌরবে মন্ত্রিত্ব প্রাপ্তির নিয়ম কেবল যে ভারতবর্ষেই ছিল এমত নহে। কিয়ৎ পরিমাণে এ রীতি সর্ব্বদেশে ছিল এবং সর্ব্বদেশে আছে। ইংলণ্ডের হৌস অব লর্ড্স্ ইহার এক জাজ্জল্যমান প্রমাণস্বরূপ অদ্যাপি বর্ত্তমান। তবে নিয়মটি সগুণত্বের পরিবর্ত্তে জাতিমাত্র অবলম্বন করাতেই, দোষের কারণ হইল। ইংলণ্ডে সর্ব্বদা গুণবান্ ব্যক্তিগণ কমন্স শ্রেণি হইতে নীত হইয়া লর্ডস্ শ্রেণিভুক্ত হন, অর্থাৎ সে দেশে গুণশালী শূদ্রকে ব্রাহ্মণত্ব প্রদত্ত হইয়া থাকে। এরূপ নিয়মের অভাবে আসিয়ায় ভারতবর্ষ, ইউরোপে স্পার্টা রাজ্য অধঃপতিত হইল।

ব্রাহ্মণ মন্ত্রী সর্ব্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ। রাজা তাঁহার সহিত সর্ব্বদা পরামর্শ করিবেন, তদীয় মন্ত্রণা অবহেলা করিয়া কদাচ স্বেচ্ছানুসারে রাজ্যশাসন করিবেন না। ইহাই

---

(৩) শুচিনা সত্যসন্ধেন যথাশাস্ত্রানুসারিণা।
প্রণেতুং শক্যতে দণ্ডঃ সুসহায়েন ধীমতা ॥ ৩১—অ ৭ মনু
সৈনাপত্যঞ্চ রাজ্যঞ্চ দণ্ডনেতৃত্বমেবচ।
সর্ব্বলোকাধিপত্যঞ্চ বেদশাস্ত্র বিদর্হতি ॥ ১০০—অ ১২ মনু
শ্রুতাধ্যায়নসম্পন্নাঃ কুলীনাঃ সত্যবাদিনঃ।
রাজ্ঞা সভাসদঃ কার্য্যাঃ শত্রৌ মিত্রেচ যে সমাঃ ॥
ব্যবহারতত্ত্বধৃত কাত্যায়ন বচন।
অমাত্যং মুখ্যং ধর্ম্মজ্ঞং প্রাজ্ঞং দান্তং কুলোদ্গতং।
স্থাপয়েদাসনে তস্মিন্ খিন্নঃ কার্য্যেক্ষণে নৃণাং ॥ ১৪১—অ ৮ মনু
ধৃতিঃ ক্ষমা দমোহস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয় নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্ম লক্ষণম্ ॥ ৯২—অ ৬ মনু
ক্ষত্রিয়াণাং বলং তেজো ব্রাহ্মণানাম্ ক্ষমা বলং। ২৭
মহাভারত আদিপর্ব্ব বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র সংবাদ।
ভূতানাং প্রাণিনঃ শ্রেষ্ঠাঃ প্রাণিনাং বুদ্ধিজীবিনঃ।
বুদ্ধিমৎসু নরাঃ শ্রেষ্ঠাঃ নরেষু ব্রাহ্মণাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৯৬
ব্রাহ্মণেষু তু বিদ্বাংসো বিদ্বৎসু কৃত বুদ্ধয়ঃ।
কৃতবুদ্ধিষু কর্ত্তারঃ কর্ত্তৃষু ব্রহ্মবেদিনঃ ৯৭—অ ১ মনু

শাস্ত্রের আদেশ। (৪) মন্ত্রীর প্রতি এইরূপ ব্যবহার আধুনিক ইংলণ্ডের রাজ্য শাসনের নিয়ম। মন্ত্রীর মতের বিরুদ্ধাচারিণী হইয়া ইংলণ্ডেশ্বরী স্বয়ং কোন কার্য্য করিতে পারেন না। অনেক যুদ্ধ, প্রাণিসংহার, রাজবিপ্লব, সমাজবিপ্লবের পর ইংলণ্ডীয়েরা এই তত্বটি স্থির করিয়াছেন। আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ, কেবল স্বীয় মানসিক শক্তির গুণে তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এ বিধি সংস্থাপিত করিয়াছিলেন।

রাজ্যে সুনিয়ম সংস্থাপন ও প্রজাপালন জন্য সাত অথবা আটটি মন্ত্রী রাখিবেন। যে ব্যক্তি যে কার্য্যে নিপুণ ও তত্বজ্ঞ তদ্বিষয়ে অগ্রে তদীয় পরামর্শ গ্রহণ করিবেন। কর্ত্তব্য বিষয়ে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অথবা সমুদায় অমাত্যকে একত্র সমবেত করিয়া পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিয়া আত্মবুদ্ধি অনুসারে, যুক্তি অনুসারে ও শাস্ত্রানুসারে তদীয় মতের বলাবল বিবেচনা পূর্ব্বক স্বীয় মত সংস্থাপন করিবেন। (৫) ইহাই ইংলণ্ডের কাবিনেটের দ্বারা রাজ্য শাসন প্রণালী। আধুনিক ইউরোপীয় রাজনীতির কোন কথা প্রাচীন ভারতবর্ষীয়েরা অবগত ছিলেন না?

কেহই যুক্তি বিহীন শাস্ত্রের নিয়মানুসারে শাসন কার্য্যে সমর্থ ছিলেন না। যুক্তিহীন বিষয়ে যে পাপ জন্মে উহা আর্য্যজাতির অন্তরে প্রথমেই স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু কি কারণে যে উত্তরকালে যুক্তির ধ্বংস হইয়া আসিতে লাগিল তাহা নির্ণয় করা সামান্য ব্যাপার নহে। যে দিন হইতে আর্য্যজাতি যুক্তিমার্গ পরিভ্রষ্ট হইলেন সেইদিন অবধি ইহাদিগের পতনের সূত্রপাত ধরা যায়।

মন্ত্রিগণের কার্য্য বিভাগ।

দ্বিজাতি শ্রেষ্ঠ মন্ত্রিত্রয় বিচারাসনের ভার গ্রহণ করিয়া রাজার সভায় উপস্থিত থাকিতেন। রাজা যখন বিনীতবেশে বিচার কার্য্য সম্পাদন করিতে বসিতেন

---

(৪) সর্ব্বেষান্তু বিশিষ্টেন ব্রাহ্মণেন বিপশ্চিতা।
মন্ত্রয়েৎ পরমং মন্ত্রং রাজা ষাড়্গুণ্য সংযুতং। ৫৮ অ ৭ মনু

(৫) মৌলান্ শাস্ত্রবিদঃ শূরান্ লব্ধলক্ষান্ কুলোদ্গতান্।
সচিবান্ সপ্তচাষ্টৌবা প্রকুর্ব্বীত পরীক্ষিতান্। ৫৪—অ ৭ ঐ
তেষাং স্বং স্বমভিপ্রায়মুপলভ্য পৃথক্ পৃথক্।
সমস্তানাঞ্চ কার্য্যেষু বিদধ্যাদ্ধিতমাত্মনঃ। ৫৭—অ ৭
কেবলং ধর্ম্মমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যো বিনির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীন বিচারেতু ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে। বৃহস্পতি সংহিতা।
যুক্তিঃ ন্যায়ঃ স চ লোক ব্যবহার ইতি ব্যবহার মাতৃকা।
ধর্ম্মশাস্ত্র বিরোধেতু যুক্তিযুক্তো বিধিঃস্মৃতঃ।
ব্যবহারোহি বলবান্ ধর্ম্মস্তেনাবহীয়তে। নারদ সংহিতা।
অবহীয়তে অবগম্যতে।

তৎকালে তাঁহারা সহায়তা করিতেন। তদনুসারে উক্ত দিবসে ঐ সকল অমাত্যকে সভ্যশব্দে নির্দ্দেশ করা রীতি ছিল। পাঠক, ইংলণ্ডীয় "প্রিবি কৌন্সলের" সঙ্গে ইহার সাদৃশ্য দেখিতে পাইবেন। রাজা যে দিন যে স্থলে স্বয়ং বিচার কার্য্য নিষ্পাদনে সমর্থ না হইতেন সেদিন তথায় প্রতিনিধি দিতেন। বিচারাসনে রাজার প্রতিনিধিকে প্রাড্‌বিবাক্ শব্দে নির্দ্দেশ করা যায়। উপরি কথিত মন্ত্রিত্রয়ের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি আসনের ভার প্রাপ্ত হইতেন। তৎপরে দ্বিতীয় ও তৃতীয় মন্ত্রী। প্রাড্‌বিবাক্ আবার অন্য তিনজন মন্ত্রীর সঙ্গে একত্র সমাসীন হইয়া বিচার কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। বিচারকালে অন্যান্য সভ্যও উপস্থিত থাকিতেন। তৎকালে কুলশীল-সম্পন্ন ও বয়োবৃদ্ধলোক বৃত্তবন্ত এবং বার্ত্তা শাস্ত্রদর্শী বণিক্ সভায় উপস্থিত থাকিতেন। (৬)

বিচার কালে সভায় সমাসীন সভ্যবর্গের নিকট সন্দেহ ভঞ্জন জন্য কূট-প্রশ্নের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করা হইত। সভ্যেরা অকুতোভয়ে যথাশাস্ত্র ও ন্যায্য কথা কহিতেন। রাজা ও বিচারক তদনুসারে কার্য্য করুন্ বা না করুন সভ্যেরা তদ্বিষয়ে দৃক্‌পাত করিতেন না। তাঁহারা ধর্ম্ম, যুক্তি ও সত্য পথের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াই পরামর্শ দিতেন। বিচারক ব্যতীত বিচারাসনের অন্য সহায়-দিগকেও সভ্য শব্দে নির্দ্দেশ করা যাইত। ইহারাই এক্ষণকার জুরী Jury. (৭)

সুবিজ্ঞ ব্রাহ্মণের অভাবে ক্ষত্রিয়, তদভাবে বৈশ্য বিচারাসনে বসিতেন। কেহই একাকী বিচার করিতে অনুমত ছিলেন না। ইহারা প্রায়ই বিচারাসনে বসিতেন না। সভার অগ্রে দণ্ডায়মান থাকিয়া অন্যান্য অমাত্য ও সভ্য পরিবেষ্টিত হইয়া ধর্ম্মাধিকরণের কার্য্য করিতেন। সভ্যবর্গের মধ্যে যাঁহারা অর্থী প্রত্যর্থীর

---

(৬) ব্যবহারান্ দিদৃক্ষুস্ত ব্রাহ্মণৈঃ সহ পার্থিবঃ।
মন্ত্রজ্ঞৈ মন্ত্রিভিশ্চৈব বিনীতঃ প্রবিশেৎ সভাং। ১—অ ৮
যদা স্বয়ং নকুর্য্যাত্তু নৃপতিঃ কার্য্য দর্শনং।
তদা নিযুঞ্জ্যাদ্বিদ্বাংসং ব্রাহ্মণং কার্য্যদর্শনে। ৯—ঐ
সোহস্য কার্য্যাণি সম্পশ্যেৎ সভ্যৈরেব ত্রিভির্বৃতঃ।
সভামেব প্রবিশ্যাগ্র্যামাসীনঃস্থিত এব বা। ১০—ঐ
কুলশীল বয়োবৃত্ত বিত্তবদ্ভিরধিষ্ঠিতং।
বণিগ্‌ভিঃস্যাৎকতিপয়ৈঃ কুলবৃদ্ধৈরধিষ্ঠিতং।
ব্যবহারতত্ত্বধৃত কাত্যায়ন বচন।

(৭) সভ্যেনাবশ্যবক্তব্যং ধর্ম্মার্থ সহিতং বচঃ।
শৃণোতি যদি নো রাজা স্যাত্তসভ্যস্তদানৃণঃ।
ব্যবহারতত্ত্বধৃত কাত্যায়ন বচন।

বাক্যের বলাবলানুসারে বিচারাসনে বিচার ও নৃপতিকে বিচার মার্গে আনয়ন করিতেন তাঁহাদিগকেই ব্যবহারাজীব (উকীল) শব্দে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। (৮)

দূতও মন্ত্রিপদ বাচ্য। তদীয় নিয়োগ গুণানুসারে হইত। সদ্বংশ সম্ভূত, সর্ব্বশাস্ত্রের মর্ম্মগ্রাহী, আকার, ইঙ্গিত ও চেষ্টা দ্বারা অন্যের হৃদ্গত ভাব ও কার্য্যের ফল অনুসারে সক্ষম, অন্তঃ শুদ্ধিঃ ও বহিশুদ্ধি সম্পন্ন, ধর্ম্মজ্ঞ, বিনীত, কার্য্যকুশল, নানাভাষা ও কলায় অভিজ্ঞ ব্যক্তি দূত পদে প্রতিষ্ঠিত হইতেন। দূতের অভিপ্রায় অনুসারে পররাজ্যের ভূপতির সঙ্গে সন্ধি বন্ধন, বিজেতব্য রাজাদির প্রতি পরাক্রমের উত্তম ও যুদ্ধ যাত্রা হইত। তাহাতেই আত্মরাজ্যরক্ষা ও শত্রুগণের উপদ্রব নাশ হইয়া আসিত।

সেনাপতিও মন্ত্রিমধ্যে গণ্য। দণ্ডনীতি ও সৈন্য সামন্ত সমস্ত তাহারই আয়ত্ত। দণ্ডনীতি যাবৎ পৃথিবীমণ্ডলে বিরাজিত থাকিবে তাবৎকাল প্রজাগণ স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া বিনয়াদি সদ্গুণ শিক্ষায় মনোনিবেশ করিবে। দণ্ডনীতি অসৎপুরুষে রাখা বিগর্হিত। তদনুসারে দণ্ডনীতির ভার সেনাপতির হস্তে ন্যস্ত হয়। (৯)

ভারতবর্ষীয় মুসলমানেরা ইহার অনুকরণ করিয়া দণ্ডনীতি ফৌজদারের হাতে রাখিয়াছিলেন। ব্রিটেনীয় ভারতবর্ষের যে সকল প্রদেশকে "বিধিচ্যুত"—(Non regulation) বলা যায়, তাহাতে এ নিয়মের একটু ছায়া আছে।

ত্রিবেদবিৎ কুলপুরোহিতও নৃপতির সভায় অমাত্য মধ্যে গণ্য। বিচার দর্শন স্থলে তাঁহারও মত প্রবল বলিয়া পরিগণিত হইত। তিনি রাজার নিজকর্ত্তব্য বেদবিহিত যাবদীয় গৃহ্য কর্ম্ম সম্পাদনে একান্ত বাধ্য ছিলেন। গৃহ্য সূত্রানুসারী ধর্ম্ম কার্য্য নিষ্পাদন নিমিত্ত উক্ত কুলপুরোহিতকে রাজা একবার মাত্র বরণ করিতেন। তাহাই তাঁহার পক্ষে চিরস্থায়ী বরণ স্বরূপ ধরা যাইত। (১০)

---

(৮) যদাকার্য্যবশাদ্রাজানপশ্যেৎ কার্য্যনির্ণয়ং ।
তদা নিযুঞ্জ্যাদ্বিদ্বাংসং ব্রাহ্মণং বেদপারগং ।
যদি বিপ্রো নবিদ্বান্ স্যাৎ ক্ষত্রিয়ং তত্র যোজয়েৎ ।
বৈশ্যং বা ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞং শূদ্রং যত্নেন বর্জ্জয়েৎ ।
কাত্যায়ন সংহিতা ।

(৯) দূতঞ্চৈব প্রকুর্ব্বীত সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদং ।
ইঙ্গিতাকার চেষ্টজ্ঞং শুচিং দক্ষং কুলোদ্গতং । ৬৩—অ ৭ মনু
অমাত্যে দণ্ড আয়ত্তো দণ্ডে বৈনয়িকী ক্রিয়া ।
নৃপতৌ কোষ রাষ্ট্রে চ দূতে সন্ধি বিপর্য্যয়ৌ । ৬৫—অ ৭ মনু

(১০) পুরোহিতঞ্চ কুর্ব্বীত বৃণুয়া দেবচর্ত্বিজং ।
তেহস্য গৃহ্যাণি কর্ম্মাণি কুর্য্যুর্বৈতানিকানি চ শ্লো—৭৮ অ—৭ মনু

এতদ্ব্যতীত অন্যান্য কার্য্য বিষয়ে যে ব্যক্তির পারগতা আছে তাঁহাকে তদ্বিষয়ের ভারাক্রান্ত ব্যক্তিবর্গের তত্বাবধান কার্য্যে নিযুক্ত করিতেন। তত্বাবধারকদিগকেও তত্তৎকার্য্যের অধ্যক্ষ শব্দে নির্দ্দেশ করা যাইত। যিনি চিকিৎসা শাস্ত্রের পারদর্শী ও পশুতত্বজ্ঞ তিনি ভিষক্‌বর্গের উপরি অধ্যক্ষতা করিতেন। তাঁহার পরামর্শ ক্রমে হস্তী, অশ্ব ও গবাদি পশুর রক্ষণাবেক্ষণ ও সেনার চিকিৎসা হইত।

যিনি খনিজ দ্রব্যের গুণাগুণ নির্ণয়ে সমর্থ ও আকরিক বস্তুর মূল্য নির্দ্ধারণ বিষয়ে পটু তদীয় পরামর্শ অনুসারে আকরিক কার্য্যের অনুষ্ঠান হইত। আকরিক কার্য্যে প্রেষ্যবর্গের প্রতি তাঁহারই সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা থাকিত। (১১) অন্তঃপুর রক্ষার ভারও মন্ত্রীর প্রতি অর্পিত হইত।

ইত্যাদি প্রকারে আধুনিক সভ্যতাভিমানী জাতিদিগের ন্যায় প্রত্যেক বিষয়ে পৃথক্ পৃথক্ অধ্যক্ষ বিনিয়োগ পুরঃসর রাজা ধর্ম্ম কার্য্যে মনোনিবেশ করিতেন। প্রজাপালনই রাজার প্রধান ধর্ম্ম, তদনুসারে তিনি নিশার শেষ প্রহরে শয্যা পরিত্যাগ করিতেন। শৌচ ক্রিয়া সমাধান পূর্ব্বক পরিশুদ্ধবেশে পরিশুদ্ধ স্থলে উপবিষ্ট হইয়া পর ব্রহ্মের উপাসনা দ্বারা চিত্ত স্থৈর্য্য সম্পাদন করিতেন। উক্ত কার্য্য করিতে করিতেই সূর্য্যোদয় হইত। দিনমণির আগমনের প্রথমক্ষণেই আহ্নিকাদি সন্ধ্যা বন্দন ও গৃহ্যোক্ত যাবদীয় দৈনিক ধর্ম্ম কার্য্যের পরিসমাপ্তি পূর্ব্বক ত্রিবেদজ্ঞ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণের আশ্রয় ও উপদেশ গ্রহণ জন্য রাজ-প্রাসাদ হইতে নির্গত হইতেন।

তাঁহাদিগের সকাশে ঋক্, যজুঃ ও সাম এই বেদ ত্রয়ের শিক্ষণীয় বিষয়ে উপদেশ গ্রহণ হইত। (১২)

অধ্যক্ষান্ বিবিধান্ কুর্য্যাত্তত্র তত্র বিপশ্চিতঃ।
তেঽস্য সর্ব্বাণ্যবেক্ষেরন্নৃণাং কার্য্যাণি কুর্ব্বতাং। শ্লো ৮১—অ—৭—মনু—

(১১) মণি মুক্তা প্রবালানাং লোহানাং তান্তবস্যচ।
গন্ধানাঞ্চ রসানাঞ্চ বিদ্যাদর্ঘবলাবলং। ৩২৯—অ ৯ মনু
অন্যানপি প্রকুর্ব্বীত শুচীন্ প্রাজ্ঞান্ বস্থিতান্।
সম্যগর্থ সমাহর্ত্তৄনমাত্যান্ সুপরীক্ষিতান্। ৬০
তেষামর্থে নিযুঞ্জীত শূরান্ দক্ষান্ কুলোদ্গতান্।
শুচীনাকরকর্ম্মান্তে ভীরূনন্তর্নিবেশনে। ৬২—মনু—অ ৭—

(১২) ব্রাহ্মণান্ পর্য্যুপাসীত প্রাতরুত্থায় পার্থিবঃ।
ত্রৈবিদ্যবৃদ্ধান্ বিদুষস্তিষ্ঠেত্তেষাঞ্চ শাসনে। ৩৭
ত্রৈবিদ্যেভ্যস্ত্রয়ীং বিদ্যাং দণ্ডনীতিঞ্চ শাশ্বতীং।
আন্বীক্ষিকীঞ্চাত্মবিদ্যাং বার্ত্তারম্ভাংশ্চ লোকতঃ। ৪৩

তৎপরে দণ্ডনীতি ঘটিত কার্য্য কলাপের জটিলবিষয়ের সন্দেহ নিরাস নিমিত্ত বার্ত্তাশাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞ মহাজনদিগের সমীপে উপস্থিত হইতেন। তথায় ক্ষণকাল বিশ্রামানন্তর আন্বিক্ষিকী বিদ্যার অভ্যাসার্থ তদ্বিষয়ের যথার্থ মর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তির সঙ্গগ্রহণ করিতেন। তদীয় সাহায্যে তর্ক বিদ্যা, আত্মতত্ত্ববিজ্ঞান ও ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপণ হইত। তদবসরে লোকবিত্ত পর্য্যালোচনায় ব্যাসক্ত হইয়া লোকাচারদর্শী বিপশ্চিত্তের সহিত সাক্ষাত করিতেন। তদনন্তর কৃষি, বাণিজ্য, পশু পালনাদি সাধারণ বিষয়ের তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া তত্তৎ বিষয়ে কৃষক, বণিক্ ও পশু রক্ষকের মত পরিজ্ঞাত হইয়া বিনীত বেশে সভারোহণ করিতেন।

রাজসভায় ও বিচারগৃহে যেরূপে কার্য্য নির্ণয় হইত উহা পর্য্যালোচনা করিলে জানা যায় যে, রাজা স্বয়ং অথবা তদীয় প্রতিনিধি প্রাড্‌বিবাক্ ধর্ম্মাসনে বিনীতভাবে সভ্যগণের সঙ্গে সঙ্গে একত্র উপবেশন পূর্ব্বক, অগ্রে বাদীর প্রার্থনা শ্রবণ করিতেন। অভিযোগ উত্থাপনের প্রাক্কালে বাদীকে সত্য শ্রাবণ করান হইত। মিথ্যাবাদ উত্থাপনে দণ্ড থাকা হেতু প্রায় কেহই মিথ্যাভিযোগ করিত না। বাদীর বাদ লিখন পূর্ব্বক প্রতিবাদীকে জিজ্ঞাস্য বিষয়ে অগ্রে সত্য শ্রাবণ করিয়া বাদীর সম্মুখে সমস্ত অভিযোগের কারণ গুলি তাহার হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিতেন। ইহাতে যদি তত্ত্বনির্ণয় হইত তবে সাক্ষী গ্রহণ হইত না। অভিযোক্তা অথবা প্রতিপক্ষ ব্যক্তির মধ্যে যদি কোন সন্দেহের কারণ ঘটিত তবে সাক্ষ গ্রহণ হইত। সাক্ষীকেও সত্য শ্রাবণ হইত। সাক্ষীর বিষয় পৃথক্ স্থলে লিখিত হইবে; এখানে প্রক্রান্ত বিষয়ের পর্য্যালোচনা করা উচিত। বাদীর সাক্ষী কোন বিষয় অপলাপ করিলে প্রতিবাদীর পক্ষে সাক্ষী গ্রহণ করা রীতি ছিল। উভয় পক্ষের সাক্ষীতে যদি সন্দেহের কোন কারণ থাকিত তবে সাক্ষিগণকে অগ্রে দণ্ড বিধান পূর্ব্বক অর্থী প্রত্যর্থীর বাক্যের বলাবল বিবেচনা অনুসারে শাস্ত্র ও যুক্তি এবং উভয় পক্ষের সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ পুরঃসর প্রামাণিক রূপে জয় পরাজয় নিরূপিত হইত। যিনি বিচার করিতেন তাঁহাকে প্রাড্‌বিবাক্ কহা যাইত। নিতান্ত পক্ষে, এক বিষয়ে এই কার্য্যবিধির আইন আধুনিক কার্য্যবিধির আইনের অপেক্ষা ভাল। অগ্রে মিথ্যাবাদী সাক্ষির দণ্ড বিধান হইত। (১৩)

উত্থায় পশ্চিমে যামে কৃতশৌচঃ সমাহিতঃ।
হুতাগ্নির্ব্রাহ্মণাংশ্চার্চ্চ্য প্রবিশেৎস শুভাং সভাং। ১৪৫ মনু—৭ অ

(১৩) ব্যবহারতত্ত্বধৃত বচন। বৃহস্পতিঃ।
রাজা কার্য্যাণি সংপশ্যেৎ প্রাড্‌বিবাকোঽথবা দ্বিজঃ।
প্রাড্‌বিবাকলক্ষণ মাহ।
বিবাদে পৃচ্ছতি প্রশ্নং প্রতিপ্রশ্নং তথৈবচ।

যে ব্যক্তি জয়ী হইত সে ব্যক্তি জয়পত্র পাইত। জয়পত্রে বিচার ঘটিত সমস্ত বিষয়ই লিপিবদ্ধ হইত, কোন বিষয় পরিত্যক্ত হইত না।

ইহাতে অভিযোগের কথা, তাহার কারণ, বাদী প্রতিবাদীর নামাদি, উহাদিগের বাদ প্রতিবাদ, সাক্ষীর ও প্রতিসাক্ষীর নামগোত্রাদি, এবং তদীয় বচন প্রতি বচন, রাজা অথবা প্রাড়্‌বিবাকের প্রশ্ন ও বিচার, সভ্যগণের পরিপৃচ্ছা ও পরামর্শ, অর্থী প্রত্যর্থীর মধ্যে কোন পক্ষে জয়, কি হেতু অন্যপক্ষে পরাজয়, কতিপয় মন্ত্রিসমবেত সভায় ও কাহার দ্বারা তত্ত্বনির্ণয় পূর্ব্বক বিচার কার্য্য সমাধা হইল, কোন সময়ে অভিযোগের কারণ ঘটে, কোন সময়ে অভিযোগ উপস্থিত হয় এবং কোন সময়ে বিচার নিষ্পত্তি হইল ইত্যাদি তাবদ্বিষয় ঐ জয়পত্রে লিখিয়া দেওয়া বিচারাসনের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম মধ্যে পরিগণিত ছিল। (১৪) তবে, ইংরেজের, বিচারপ্রণালী সম্বন্ধে এত বড়াই কিসের জন্য, তাহা বুঝিতে পারি না। প্রাচীন ফয়শালা, আধুনিক ফয়শালা অপেক্ষা সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্ট।

প্রিয় পূর্ব্বং প্রাগ্‌বদতি প্রাড়্‌বিবাকস্ততঃস্মৃতঃ ॥
　　　　　　তথা কাত্যায়নঃ ।
ব্যবহারাশ্রিতং প্রশ্নং পৃচ্ছতি প্রাড়িতি স্থিতিঃ ।
বিবেচয়তি যস্তস্মিন প্রাড়্‌বিবাকস্ততঃস্মৃতঃ ।
সপ্রাড়্‌বিবাকঃ সামাত্যঃ স ব্রাহ্মণ পুরোহিতঃ ।
স্বয়ং স রাজা চিহ্নয়ান্তেষাং জয় পরাজয়ৌ ।
কুলশীলবয়োবৃত্ত বিত্তবদ্ভিরধিষ্ঠিতং !
বণিগ্‌ভিঃস্যাৎ কতিপয়ৈঃ কুলবৃদ্ধৈরধিষ্ঠিতং ।

(১৪) নির্ণয় ফলমাহ বৃহস্পতিঃ ।
প্রতিজ্ঞা ভাবয়েদ্বাদী প্রাড়্‌বিবাকাদি পূজনাৎ ।
জয়পত্রস্যাচাদানাৎ জয়ীলোকে নিগদ্যতে ।
জয়পত্রস্য লিখনপ্রকারমাহ সএব ।
যদ্‌বৃত্তং ব্যবহারেষু পূর্ব্বপক্ষোত্তরাদিকং ।
ক্রিয়াবধারণোপেতং জয়পত্রেঽখিলং লিখেৎ ।
পূর্ব্বেণোক্ত ক্রিয়াযুক্তং নির্ণয়ান্তং যদানৃপঃ ।
প্রদদ্যাজ্জয়িনে পত্রং জয়পত্রং তদুচ্যতে ।
　　　　　　তথা কাত্যায়নঃ ।
অর্থি প্রত্যর্থি বাক্যানি প্রতিসাক্ষি বচস্তথা ।
নির্ণয়শ্চ তথাতস্য যথাচার ধৃতং স্বয়ং ।
এতদ্‌যথাক্ষরং লেখ্যং যথা পূর্ব্বম্‌ নিবেশয়েৎ ।
সভাসদশ্চ যে তত্র ধর্ম্মশাস্ত্রবিদস্তথা ।

সংস্কৃত চিত্রশালিকার দুইখানি মহামূল্য চিত্র শ্রীহর্ষ নামাঙ্কিত, রত্নাবলী ও নৈষধ। রত্নাবলী অবলা, সরলা, কোমলাঙ্গী অঙ্গনা; অলঙ্কার বাহুল্য বিনাও দেখিতে সুন্দরী। নৈষধ তেজস্বী, চিন্তাশীল, দৃঢ়কায় বীরপুরুষ; দেবোপম স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য সত্ত্বেও বিবিধ অলৌকিক সজ্জায় সজ্জিত। দেখিলে কোন ক্রমেই দুইটী এক হস্তের চিত্রিত বলিয়া বোধ হয় না। লোকেরও বিশ্বাস এই প্রকার যে দুখানি দুজন চিত্রকরের রচিত। তাঁহারা কে, এবং কোন্ সময়ে কোথায় প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, এই সকল কথা লইয়া তত্ত্বজিজ্ঞাসু সমাজে অনেক বাদানুবাদ হইয়া গিয়াছে।

পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত বাবু রামদাস সেন একবার বঙ্গদর্শনে এতৎ প্রস্তাবের অবতারণা করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে, কাশ্মীরাধিপতি শ্রীহর্ষ রত্নাবলীর রচয়িতা; এবং আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে বঙ্গদেশে যে পঞ্চব্রাহ্মণ আনয়ন করেন, তন্মধ্যে যিনি চট্টোপাধ্যায়দিগের পূর্ব্বপুরুষ তিনিই নৈষধকার। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যতদূর আইসে, তাহাতে বোধ হয় যে এই দুইটী সিদ্ধান্তেই ভ্রম আছে, এবং কোনটির পক্ষেই কোন প্রবল যুক্তি প্রদর্শিত হয় নাই। এজন্য যাহা কিছু আমার বক্তব্য আছে, সত্যানুরোধে বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম। হয় ত আমারও ভুল হইবে; কিন্তু বারম্বার কোন বিষয়ের আলোচনা করিলে, সত্যের পথ যে পরিষ্কার হয়, তাহার সন্দেহ নাই।

এতদ্দেশীয় ঐতিহাসিকতত্ত্ব নির্ণয় করিতে গিয়া যে আমাদিগের পদস্খলন হইবে, বিচিত্র নহে। ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত নিবিড় তিমিরাচ্ছন্ন। অন্ধকারে অনুমান-রূপ লোষ্ট্র নিক্ষেপ পূর্ব্বক পদার্থ পরিচয় করিয়া আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হয়। ইতিহাস ও জীবনচরিত পাওয়া যায় না বলিলেই চলে। বোধ হয় যেন আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা এতদ্বিষয়ক গ্রন্থ লিখিতে ভাল বাসিতেন না। হয়ত প্রকৃতি পুস্তক পাঠে এবং ঐশ্বরিক চিন্তায় তাঁহারা এমন নিমগ্নচিত্ত ছিলেন, যে নশ্বর মানবজীবনের

বৃত্তান্ত বর্ণনা করিতে তাঁহাদিগের প্রায়ই প্রবৃত্তি হইত না। যেখানে বৌদ্ধদেবের প্রভাবে হিন্দুধর্ম্মের বন্ধন শিথিল হইয়া মনুষ্যের গৌরব বর্দ্ধিত হইয়াছিল, সেই পর্ব্বত পরিবৃত কাশ্মীর ও সাগর বেষ্টিত সিংহলের ইতিহাস আছে; তৎসাহায্যে, এবং প্রাচীন মুদ্রা, অনুশাসন পত্র, ক্ষোদিত প্রস্তর, বা সাহিত্য দর্শনাদি গ্রন্থান্তর্গত উল্লেখ দেখিয়া আমাদিগকে তত্ত্ব নিরূপণ করিতে হয়।

কাশ্মীরাধিপতি শ্রীহর্ষ রত্নাবলীর রচয়িতা, এই মত অধ্যাপকশ্রেষ্ঠ উইলসন্ সাহেব উদ্ভাবন করেন। রাজতরঙ্গিণীতে হর্ষনামক নৃপতির বৃত্তান্ত আছে; কিন্তু তিনি যে রত্নাবলীকার, একথার বিন্দুবিসর্গও নাই। কেবল এই মাত্র লিখিত আছে, যে "তিনি অশেষ দেশভাষাজ্ঞ, সর্ব্বভাষায় সৎকবি, সর্ব্ব বিদ্যানিধি বলিয়া দেশান্তরেও খ্যাতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।"

"সোঽশেষ দেশভাষাজ্ঞঃ সর্ব্বভাষাসু সৎকবিঃ।
কৃৎস্ন বিদ্যানিধিঃ প্রাপ খ্যাতিং দেশান্তরেষ্বপি॥"

৬১১ শ্লোক। ৭ম তরঙ্গ। রাজতরঙ্গিণী।

কেবল এই শ্লোকের উপর নির্ভর করিয়া কাশ্মীরাধিপতি হর্ষদেবকে রত্নাবলী রচয়িতা বলা কতদূর সঙ্গত, পাঠকবর্গ বিবেচনা করিবেন। কিন্তু তিনি যে রত্নাবলীকার নহেন, ইহার অপর প্রমাণ দেওয়া যাইতেছে।

ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত যে "সরস্বতী কণ্ঠাভরণ" নামক গ্রন্থ মালবাধিরাজ ভোজদেবের কৃত। উক্ত গ্রন্থে রত্নাবলী উদ্ধৃত হইয়াছে। কিন্তু রাজতরঙ্গিণী দৃষ্টে বোধ হয় যে ভোজরাজ হর্ষদেবের পিতামহ অনন্তদেবের সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। সপ্তম তরঙ্গের ১৯০ শ্লোকে অনন্তদেবের ইতিবৃত্ত বর্ণনাবসরে লিখিত হইয়াছে, যে—

"মালবাধিপতির্ভোজঃ প্রহিতৈঃ স্বর্ণসঞ্চয়ৈঃ।
অকারয়ৎ যেন কুণ্ড যোজনং কপটেশ্বরে॥"

যে গ্রন্থ পিতামহের সমকালীন লোকে উদ্ধৃত করিয়াছে, সে গ্রন্থ পৌত্রের লিখিত হওয়া অতীব অসম্ভব।*

আবার দেখা যাইতেছে যে ধনিকাপর নামা ধনঞ্জয় দশরূপ নিবন্ধে রত্নাবলী হইতে অনেক রত্ন উদ্ধৃত করিয়াছেন। ধনঞ্জয় মুঞ্জরাজের সভাসদ্ ছিলেন।

"বিষ্ণোঃ সুতেনাপি ধনঞ্জয়েন
বিদ্বন্মনোরাগ নিবন্ধ হেতুঃ।
আবিষ্কৃতং মুঞ্জমহীশ গোষ্ঠী
বৈদগ্ধ্যভাজা দশরূপমেতৎ॥"

---

* See the preface to Kavya Prakasa by Pandit Mahes Chandra Nyayaratna.

মুঞ্জ ভোজদেবের পূর্ব্বে মালবাধিপতি ছিলেন। উজ্জয়িনীর জ্যোতির্ব্বেত্তৃগণের গণনানুসারে ভোজদেব খ্রীষ্টীয় ১০৪২ অব্দে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।[*] একখানি অনুশাসন-পত্রের লিখনানুসারে নির্ণীত হয় যে ভোজরাজের পৌত্র এবং উদয়াদিত্যের পুত্র লক্ষ্মীধর ১১০৪ খ্রীষ্টাব্দে রাজত্ব করিতেছিলেন।[†] সুতরাং ভোজের প্রাদুর্ভাব কাল সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। অতএব বোধ হয় এ কথা নির্ব্বিবাদে বলা যায় যে ১০৪২ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে রত্নাবলী রচিত হইয়াছিল।

রামদাস বাবু লিখিয়াছেন, "মহামহোপাধ্যায় উইলসন্ সাহেব কহেন, শ্রীহর্ষদেব ১১১৩ হইতে ১১২৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কাশ্মীর রাজ্যশাসন করেন।" হর্ষদেব যদি ভোজরাজের পৌত্রদিগের সমকালীন লোক হন, তাঁহার রাজত্বকাল ঐরূপ সময়ে হইবারই সম্ভাবনা, এবং তিনি কোন ক্রমেই রত্নাবলী রচয়িতা হইতে পারেন না।

এক্ষণে দেখা যাউক অন্য কোন শ্রীহর্ষের প্রতি রত্নাবলী আরোপ করা যায় কি না। "রত্নাবলী" ও "নাগানন্দ" এই দুইখানি সংস্কৃত নাটক রাজা শ্রীহর্ষদেবের রচিত বলিয়া উভয় গ্রন্থের প্রস্তাবনায় উল্লিখিত হইয়াছে। নান্দ্যন্তে সূত্রধরের উক্তি উভয় গ্রন্থের প্রায় একই প্রকার। নান্দীতে দেখা যায় যে রত্নাবলীতে হরপার্ব্বতীকে এবং নাগানন্দে বৌদ্ধদেবকে নমস্কার করা হইয়াছে। ইহাতে জানা যাইতেছে যে, যে রাজার নামে গ্রন্থদ্বয় পরিচিত, তিনি এক সময়ে হিন্দু ও অপর সময়ে বৌদ্ধ মতাবলম্বী ছিলেন। কান্যকুব্জাধিপতি শ্রীহর্ষদেব বা হর্ষবর্দ্ধন, যিনি একটী অব্দ সংস্থাপন করেন, তাঁহার সম্বন্ধে এরূপ কথা একপ্রকার বলা যাইতে পারে। যখন কাদম্বরীকার বাণভট্ট "হর্ষচরিত" নামে তদীয় জীবন চরিত রচনা করেন, তখন বোধ হয় তিনি হিন্দু ছিলেন; নতুবা হিন্দু গ্রন্থকার তাঁহাকে বাড়াইতে যাইবে কেন ?[‡] যখন চীনদেশীয় পর্য্যটক্ হয়েন্থ সাঙ্ এতদ্দেশ ভ্রমণে আগমন করিয়া তাঁহাকে সমুদয় আর্য্যাবর্ত্তের সম্রাট্ পদে প্রতিষ্ঠিত দেখেন, তখন তিনি

---

[*] See Colebrooke's Miscellaneous Essays. Vol. II. p. 462-3.

[†] Ibid p. 303.

[‡] হর্ষচরিত পাঠে অবগত হওয়া যায় যে হর্ষদেব যে রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেন, সেই বংশের আদিপুরুষ পুষ্পভূতি শৈব ছিলেন। শ্রীহর্ষের পিতা প্রতাপ শীল বা প্রভাকর বর্দ্ধন সৌর মতাবলম্বী ছিলেন। শ্রীহর্ষ ও তদীয় জ্যেষ্ঠভ্রাতা রাজ্যবর্দ্ধন ভণ্ডী নামক এক ব্যক্তির নিকটে শিক্ষিত হয়েন। রাজ্যশ্রী নাম্নী ভগিনীর উদ্দেশে বিন্ধ্য প্রদেশে প্রবেশ করিয়া হর্ষদেব দিবাকর মিত্র নামক এক জন বৌদ্ধমতাবলম্বী সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎকার লাভ করেন। দিবাকর মিত্র প্রথমে হিন্দু ছিলেন।

বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী ।[⁂] আমাদিগের অনুমান যদি সমূলক হয়, তাহা হইলে অনায়াসেই বুঝা যায় যে কেন, "হর্ষচরিতের" পঞ্চমাধ্যায়ের অন্তর্গত একটি শ্লোকের সহিত রত্নাবলীর সূত্রধর মুখবিনির্গত একটী শ্লোকের কথায় কথায় মিল আছে ।[*] মধুসূদন "ভাববোধিনী" নাম্নী ময়ূরাষ্টকের টীকায় লিখিয়াছেন যে বাণভট্ট যে শ্রীহর্ষের সভাপণ্ডিত ছিলেন, সেই শ্রীহর্ষই রত্নাবলীর রচয়িতা । মধুসূদনের গ্রন্থ সংবৎ ১৭১১ অর্থাৎ ১৬৫৪ খ্রীষ্টাব্দে, লিখিত । সুতরাং আমরা যে মতের সমর্থন চেষ্টা পাইতেছি, তাহা অন্ততঃ দুই শত বৎসরের পূর্ব্বে এতদ্দেশের পণ্ডিত সমাজে প্রান্থ ছিল, এরূপ বোধ হয় ।

শ্রীহর্ষ একজন দিগ্‌বিজয়ী রাজা । তিনি নাটকাদি লিখিবেন, ইহা সম্ভবপর নহে । কিন্তু রাজ্য বিস্তার দ্বারা তিনি যদ্রূপ যশোলাভ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ স্বনামে গ্রন্থ প্রচার দ্বারা যশস্বী হইতে চেষ্টা পাইবেন, এবং তজ্জন্য লেখকদিগকে প্রচুর অর্থ দ্বারা সন্তুষ্ট করিবেন, ইহা বিচিত্র নহে । কাব্য প্রকাশকার লিখিয়াছেন,

"শ্রীহর্ষাদের্ধাবকাদীনামিব ধনম্ ।"

শ্রীহর্ষাদির নিকট হইতে ধাবক প্রভৃতির ধন প্রাপ্তি হইয়াছিল ।

প্রকাশাদর্শে মহেশ্বর বলেন, "শ্রীহর্ষো রাজা । ধাবকেন রত্নাবলীং নাটিকাং তন্নাম্না কৃত্বা বহু ধনং লব্ধং ।"

কাব্যপ্রকাশের টীকায় বৈদ্যনাথ লিখিয়াছেন, "শ্রীহর্ষাখ্যস্য রাজ্ঞোনাম্না রত্নাবলীনাটিকাং কৃত্বা ধাবকাখ্য কবির্বহুধনং লভেদিতি প্রসিদ্ধং ।"

অন্যান্য সংস্কৃত লেখকও এইরূপ কথা কহিয়াছেন । ঈদৃশ চিরাগত প্রবাদ মিথ্যা বলিয়া বোধ হয় না ।

কালিদাসের রচিত বলিয়া প্রচলিত "মালবিকাগ্নিমিত্র" নামক নাটকের প্রস্তাবনায় লিখিত আছে, "প্রথিত যশসাং ধাবক সৌমিল্ল কবি পুত্রাদীনাং প্রবন্ধানতিক্রম্য বর্ত্তমান কবেঃ কালিদাসস্য কৃতৌ কিং কৃতো বহুমানঃ ।"

প্রথিতযশা ধাবক সৌমিল্ল কবিপুত্রাদির প্রবন্ধ অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান কবি কালিদাসের কৃত গ্রন্থের কেন বহুমান করিতেছ ।

ইহা হইতে জানা যাইতেছে যে ধাবক একজন প্রসিদ্ধ নাটক লেখক । কিন্তু তাঁহার কৃত কোন নাটক পাওয়া যায় না ; কেবল এইমাত্র প্রবাদ আছে যে তিনি রত্নাবলীরচক । বোধ হয় মালবিকাগ্নিমিত্রকার এই প্রবাদের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই

[⁂] খ্রীঃ ৬৩৮ অব্দ ।

[*] শ্লোকটী এই—দ্বীপাদন্যস্মাদপি মধ্যাদপি জলনিধের্দিশোহপ্যন্তাৎ ।
আনীয় ঝটিতি ঘটয়তি বিধিরভিমতমভিমুখীভূতঃ ।
হয়ত সভাপণ্ডিত বাণভট্ট রত্নাবলীর এই শ্লোকটী রচনা করিয়া দিয়াছিলেন ।

উপরি উক্ত শ্লোক লিখিয়াছিলেন। কিন্তু কেহ কেহ আপত্তি করিতে পারেন যে ধাবক যখন কালিদাসের পূর্ব্ববর্ত্তী কবি, তখন তিনি কি প্রকারে কান্যকুব্জাধিপতি শ্রীহর্ষের সমকালীন হইবেন? কালিদাস হয়ত খ্রীষ্ট জন্মিবার পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন, নতুবা তিনি মাতৃগুপ্ত হইলেও খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর লোক; কিন্তু চীনপর্য্যটক বর্ণিত শ্রীহর্ষ খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর রাজা। ইহার উত্তর নিম্নে দেওয়া যাইতেছে।

“ভোজ প্রবন্ধ” পাঠে জানা যায় যে ভোজরাজের সভায় একজন কবি কালিদাস ছিলেন। আমার বিবেচনায় তিনিই “মালবিকাগ্নিমিত্র” লেখক। রচনা প্রণালী ও কবিত্বের বিচার করিয়া দেখিলে এমন বোধ হয় না যে, যে রসময়ী লেখনী হইতে শকুন্তলা, বিক্রমোর্ব্বশী, মেঘদূত, রঘুবংশ ও কুমারসম্ভব বিনির্গত হইয়াছে, সেই লেখনীই আবার মালবিকাগ্নিমিত্রের প্রসূতি। ভাষা ও কল্পনা সম্বন্ধে যেমন, তেমনই আন্তরিক মহত্ত্ব সম্বন্ধেও মালবিকাগ্নিমিত্রকার রঘুবংশকার অপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট। মালবিকাগ্নিমিত্রকার অহঙ্কারের অবতার, রঘুবংশকার মূর্ত্তিমান্ বিনয়। যে কালিদাস মহাকাব্য শিরোভূষণ রঘুবংশ লিখিতে গিয়া প্রাচীন কবিগণের গুণে মোহিত হইয়া লিখিয়াছেন,

“ক্ব সূর্য্যপ্রভবো বংশঃ ক্ব চাল্প বিষয়া মতিঃ।
তিতীর্ষুর্দুস্তরং মোহাদুড়ুপেনাস্মি সাগরং।
মন্দঃ কবিযশঃ প্রার্থী গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাং।
প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ।
অথবা কৃত বাগ্দ্বারে বংশেঽস্মিন্ পূর্ব্ব সূরিভিঃ।
মণৌ বজ্রসমুৎকীর্ণে সূত্রস্যেবাস্তি মে গতিঃ।”*

সেই কালিদাস কি ধাবক সৌমিল্ল প্রভৃতি প্রাচীন কবিদিগের প্রবন্ধের উল্লেখ করিয়া মালবিকাগ্নিমিত্রের ন্যায় সামান্য গ্রন্থ লিখিতে গিয়া বলিতে পারেন,

“পুরাণ মিত্যেব ন সাধু সর্ব্বং,
ন চাপি কাব্যং নবমিত্যবদ্যম্।
সন্তঃ পরীক্ষ্যান্যতরদ্ভজন্তে,
মূঢঃপরপ্রত্যয়নেয়বুদ্ধিঃ।” †

---

* কোথায় বা সূর্য্য প্রভব বংশ, ও অল্প বিষয়মতি আমিই বা কোথায়। আমি মোহ বশতঃ ভেলায় চড়িয়া দুস্তর সাগর পার হইতে যাইতেছি। উন্নতকায় ব্যক্তি সুলভ ফল বাসনায় বামনের ন্যায় মূঢ়তাবশতঃ কবিযশঃ প্রার্থী হইয়া আমি উপহাসাস্পদ হইব। অথবা বজ্রকৃত ছিদ্রপথে মণিমধ্যে যেমন সূত্র প্রবেশ করে, তদ্রূপ পূর্ব্ব পণ্ডিতগণ কৃত বাক্যদ্বার দিয়া আমি এই বংশে প্রবেশ করিব।

† পুরাতন সকলই ভাল নয়, নূতন কাব্য সকলই নিন্দনীয় নয়: সাধুগণ পরীক্ষা করিয়াই দুইটীর মধ্যে একটীর প্রতি ভক্তি দেখান; মূঢ়েরাই পরের বুদ্ধি দ্বারা নীত হয়।

যদি মালবিকাগ্নিমিত্রকার কালিদাস ভোজরাজের সভাসদ হন, তাহা হইলে তিনি যে রত্নবলীকার ধাবককে প্রাচীন কবি বলিয়া উল্লেখ করিবেন, ইহা বিচিত্র নহে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ভোজরাজ স্বয়ং "সরস্বতী কণ্ঠাভরণে" রত্নাবলী উদ্ধৃত করিয়াছেন, এবং তিনি খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হন। হর্ষদেব খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর লোক। চীনদেশীয় পর্য্যটক হুয়েন্থসাঙ্ ও প্রাচীন মুদ্রা প্রভৃতি হইতে অবগত হওয়া যায় যে খ্রীষ্টীয় ৬০৮ হইতে ৬৪৮ অব্দ পর্য্যন্ত তিনি কান্যকুব্জের অধিপতি ছিলেন। ধাবক শ্রীহর্ষের সময়ে, সুতরাং মালবিকাগ্নিমিত্রকারের চারিশত বৎসর পূর্ব্বে, বিদ্যমান ছিলেন।

রত্নাবলীকার শ্রীহর্ষের বিষয়ে যাহা যাহা আমার বক্তব্য ছিল, একপ্রকার বলা হইল। এক্ষণে নৈষধকার শ্রীহর্ষ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ লেখা যাইতেছে।

নৈষধচরিতে শ্রীহর্ষ আপনার পরিচয় দিয়াছেন। ইহাতে জানা যায়, তাঁহার পিতার নাম শ্রীহীর, মাতার নাম মানল্ল দেবী; তিনি কান্যকুব্জেশ্বরের নিকট হইতে তাম্বূলদ্বয় ও আসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন;* এবং তিনি "গৌড়োর্ব্বীশকুল প্রশস্তি" অর্থাৎ গৌড়ীয় রাজবংশের বৃত্তান্ত লিখিয়াছিলেন।† এতদ্ব্যতিরিক্ত তিনি "অর্ণববর্ণনকাব্য," "খণ্ডনখণ্ডখাদ্য," "নবসাহসাঙ্ক চরিত" প্রভৃতি অন্যান্য গ্রন্থও লিখিয়াছিলেন।‡ সুতরাং এরূপ অনুমান করা অন্যায় নহে যে তিনি কান্যকুব্জ নগরে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া গৌড় দেশে আসিয়াছিলেন ও মহাতীর্থ গঙ্গাসাগর দর্শন করিয়াছিলেন; নতুবা কান্যকুব্জে বসিয়া গৌড়ীয় রাজবংশের বৃত্তান্ত বা সমুদ্র বর্ণনা লিখিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইবে কেন? আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে বঙ্গদেশে যে পঞ্চজন ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন, তন্মধ্যে একজনের নাম শ্রীহর্ষ ছিল। কুলাচার্য্যেরা বলেন,

ভট্টনারায়ণোদক্ষোবেদগর্ভোঽথ ছান্দড়ঃ।
অথ শ্রীহর্ষ নামাচ কান্যকুব্জাৎ সমাগতাঃ।
শাণ্ডিল্য গোত্রজ শ্রেষ্ঠো ভট্টনারায়ণঃ কবিঃ।
দক্ষোঽথ কাশ্যপ শ্রেষ্ঠো বাৎস্য শ্রেষ্ঠোঽথ ছান্দড়ঃ।

---

* "তাম্বূলদ্বয়মাসনঞ্চ লভতে যঃ কান্যকুব্জেশ্বরাৎ। ২২শ সর্গ।

† শ্রীহর্ষং কবিরাজ রাজি মুকুটালঙ্কার হীরঃ সুতং
শ্রীহীরঃ সুষুবেজিতেন্দ্রিয় চয়ং মামল্লদেবী চ যং।
গৌড়োর্ব্বীশকুল প্রশস্তি ভণিতি ভ্রাতর্য্যয়ং তন্মহা
কাব্যে চারুণি নৈষধীয় চরিতে সর্গোঽগমৎ সপ্তমঃ।

‡ সংদৃষ্টার্ণববর্ণনস্য নবমস্তস্য ব্যরংসীন্মহা
কাব্যে চারুণি নৈষধীয় চরিতে সর্গো নিসর্গোজ্জ্বলঃ। ৯ম।

ভরদ্বাজ কুলশ্রেষ্ঠঃ শ্রীহর্ষো হর্ষবর্দ্ধনঃ।
বেদগর্ভোঽথ সাবর্ণো যথাবেদ ইতি স্মৃতঃ।

বিদ্যাসাগরোদ্ধৃত কুলাচার্য্য বচন।
বহুবিবাহ বিষয়ক প্রথম পুস্তক। ১৬ পৃষ্ঠা।

সুতরাং শ্রীহর্ষ কাশ্যপ গোত্রজ চট্টোপাধ্যায় কুলের পূর্ব্ব পুরুষ নহেন, ভরদ্বাজ গোত্রীয় মুখোপাধ্যায় দিগের পূর্ব্ব পুরুষ। † যে পঞ্চজন ব্রাহ্মণকে আদিশূর এদেশে আনিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই সুপণ্ডিত; এবং তন্মধ্যে ভট্টনারায়ণ বেণীসংহার নামক বীররসপ্রধান নাটকের রচয়িতা। হর্ষবর্দ্ধন শ্রীহর্ষও যে নৈষধকার হইবেন, আশ্চর্য্য নহে। তিনি একজন প্রধান পণ্ডিত বলিয়া কান্যকুব্জে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন! তিনি তদনন্তর গৌড়ে অবস্থিতি করিয়াছিলেন; এবং বঙ্গদেশে আসিয়া গঙ্গাসাগর সঙ্গম সন্দর্শনে গমন করিয়াছিলেন, ইহা সম্ভব। সুতরাং নৈষধ লেখকের কয়েকটী পরিচায়ক লক্ষণ বঙ্গীয় ভরদ্বাজ কুলপিতা শ্রীহর্ষে আছে।

শ্রীহর্ষ যে বঙ্গদেশের কবি, এরূপ প্রবাদ অনেক কাল হইতে এদেশে প্রচলিত আছে। বাঙ্গালার আদি কবি বিদ্যাপতি সংস্কৃত ভাষায় যে পুরুষপরীক্ষা গ্রন্থ লিখেন,* তাহার বাঙ্গালা অনুবাদে লিখিত আছে, "গৌড়দেশে শ্রীহর্ষ নামা এক

দ্বাবিংশো নবসাহসাঙ্ক চরিতে চম্পূকৃতোঽয়ং মহা
কাব্যে তস্য কৃতৌ নলীয় চরিতে সর্গো নিসর্গোজ্জ্বলঃ। ২২শ।
ষষ্ঠঃ খণ্ডন খণ্ডতোঽপি সহজাৎ ক্ষোদ ক্ষমে তন্মহা
কাব্যেঽয়ং ব্যগলন্নলস্য চরিতে সর্গো নিসর্গোজ্জ্বলঃ। ৬১।

† আমরা জানি এ ভুল রামদাস বাবুর দোষে ঘটে নাই। তিনি কোন বন্ধুবাক্যে নির্ভর করিয়া এ ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন।—বং সম্পাদক।

* বাসবদত্তার প্রস্তাবনায় ডাক্তার হল সাহেব বিদ্যাপতি ঠাকুর কৃত পুরুষপরীক্ষান্তর্গত দানবীর বড়াহের উপাখ্যান হইতে নিম্নলিখিত সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন:—

"বিপ্রৈঃ সন্তুষ্টচিত্তৈঃ প্রমুদিত হৃদয়ৈর্বন্দিভির্লব্ধ কামৈ
র্ভৃত্যৈঃ সিদ্ধাভিলাষৈর্রিপুনৃপতিভির্বন্ধুতামাশ্রয়দ্ভিঃ।
বিদ্বৎ সার্থৈঃ প্রহৃষ্টৈর্দিশিদিশি সুভটৈঃ কাঞ্চনাভ্যর্চ্যমানৈ
নিত্যং সংস্তূয়মান সজয়তি নৃপতির্দানবীরো বড়াহঃ।"

বাঙ্গালা পুরুষ পরীক্ষায় এই শ্লোকের পশ্চাদুদ্ধৃত অনুবাদ দৃষ্ট হয়:—"সন্তুষ্টচিত্ত ব্রাহ্মণ সমূহ এবং প্রফুল্লচিত্ত বন্দিগণ আর অভিলষিত বস্তু প্রাপ্ত দাসবর্গও বশীভূত চতুর্দ্দিগস্থ মহীপাল সকল এবং ধনপ্রাপ্ত পণ্ডিতবর্গ আর উত্তম ভট্টগণ এই সকল মনুষ্য কর্ত্তৃক স্তূয়মান যে দানবীর রাজা বড়াহ তিনি জয়যুক্ত হউন।

বাঙ্গালা পুরুষপরীক্ষা শ্রীহরপ্রসাদ রায় কর্ত্তৃক ফোর্ট উইলিয়ম কালেজের অধ্যক্ষগণের নিয়োগানুসারে প্রণীত হইয়া ১৮১৫ সালে প্রচারিত হয় (Vide p. 189 Vol. XIII. Calcutta Review)

পণ্ডিত, তিনি অতিশয় কবি ছিলেন। এক সময়ে নলচরিত্র নামে কাব্য রচনা করিয়া বিবেচনা করিলেন যে রসযুক্ত ও মনোরম এবং গুণালঙ্কারযুক্ত এইপ্রকার যে কাব্য সে কবিদিগের যশের নিমিত্ত হয়। তদ্ভিন্ন যে কাব্য সে উপহাসের নিমিত্ত হয়। অপর অগ্নিতে স্বর্ণের পরীক্ষা করিবেক এবং সভার মধ্যে কবিতাবেত্তাদিগের নিকটে কাব্যের পরীক্ষা করিবে। যে কাব্য পণ্ডিতেরা গ্রহণ না করেন সে কাব্যেতে কবির কি ফল ? পশ্চাৎ শ্রীহর্ষ সেই কাব্য লইয়া পণ্ডিত সমাজের উদ্দেশে বারানসী গেলেন। সেখানে গিয়া ককোক নামা পণ্ডিতকে স্বাভিপ্রায় নিবেদন করিলেন।” মেধাবী কথা, পুরুষপরীক্ষা।

চৈতন্য চরিতামৃত পাঠে জানা যায় যে জয়দেব, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের কবিতা পড়িতে চৈতন্যদেব ভাল বাসিতেন। সুতরাং বিদ্যাপতি চৈতন্যের পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, এবং তিনি চারিশত বৎসরের পূর্ব্বের লোক। অতএব শ্রীহর্ষ যে বঙ্গদেশের কবি, একথা বহুকাল হইতে প্রচলিত আছে, তাহার সন্দেহ নাই।

এক্ষণে দেখা যাউক যে শ্রীহর্ষকে আদিশূরের সমকালীন লেখক বলিলে কোন প্রকার অসঙ্গতি দোষ ঘটে কি না। বাখরগঞ্জে একখানি তাম্রফলক পাওয়া গিয়াছে তদ্দৃষ্টে জানা যায় যে মাধব সেন ও কেশব সেন লক্ষ্মণ সেনের পুত্র, লক্ষ্মণ সেনের পিতা বল্লাল সেন, বল্লাল সেনের পিতা বিজয় সেন, এবং সেন রাজবংশের আদিপুরুষ বীর সেন। রাজসাহের নিকটস্থ দেওপাড়ায় প্রাপ্ত এক খণ্ড ক্ষোদিত প্রস্তরফলক পাঠে অবগত হওয়া যায় যে বিজয় সেনের পিতা হেমন্ত সেন, হেমন্ত সেনের পিতা সামন্ত সেন, এবং সামন্ত সেনের পিতা বীর সেন। বঙ্গ বিজয়ের অত্যল্পকাল পরে মিনহাজুদ্দিন নামক মুসলমান ইতিহাস-লেখক লিখেন যে বঙ্গের শেষ রাজা লাক্ষ্মণেয় ভূমিষ্ঠ হইয়া পর্য্যন্তই রাজা এবং আশি বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। মুসলমানদিগের কর্তৃক বঙ্গ বিজয় ১২০৩ খৃঃ অব্দে ঘটে। সুতরাং লাক্ষ্মণেয়ের রাজ্যারম্ভ ১১২৩ খ্রীষ্টাব্দে ঘটিয়াছিল। লাক্ষ্মণেয় যদি লক্ষ্মণ সেনের পৌত্র হন, এবং বীর সেনের অপর নাম বংশের আদি বলিয়া যদি আদিবীর বা আদিশূর হয়, তাহা হইলে লাক্ষ্মণেয়ের পূর্ব্বে সেন বংশীয় ৮ জন রাজা হইয়াছিলেন। ইহাদিগের প্রত্যেকের রাজত্ব কাল ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় ভূয়োদর্শনানুরূপ গণনানুসারে গড়ে ১৬ বৎসর করিয়া ধরিলে, আদিশূরের রাজ্যারম্ভ ৯৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ঘটে। সুতরাং নৈষধ চরিত রচয়িতা শ্রীহর্ষ, আদিশূরের সমকালীন লোক হইলে, ১০০০ খ্রীষ্টাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন, বলা যাইতে পারে।*

---

* নৈষধকার শ্রীহর্ষ যে আদিশূরের আনীত পঞ্চ ব্রাহ্মণের মধ্যে একজন, বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র এই মতের উদ্ভাবন করেন। See Babu Rajendra Lala's Paper on Mahendra Pala in the Journal of the Asiatic Society of Bengal.

ভোজরাজকৃত সরস্বতী কণ্ঠাভরণে নৈষধ উদ্ধৃত হইয়াছে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ভোজরাজের সময় ১০৪২ খ্রীষ্টাব্দ। সুতরাং তৎপূর্ব্বে নৈষধ চরিত রচিত হইয়াছে, জানা যাইতেছে। ইহাতে শ্রীহর্ষের প্রাদুর্ভাব কাল সম্বন্ধে আমাদিগের মতেরই সমর্থন হইতেছে।

পূর্ব্বে আমরা লিখিয়াছি যে শ্রীহর্ষের লিখিত একখানি গ্রন্থের নাম “নবসাহসাঙ্ক চরিত,” অর্থাৎ নূতন সাহসাঙ্ক রাজার জীবন চরিত। চীনপর্য্যটক হুয়েন্থসঙ্গের লেখায় এক সাহসাঙ্ক রাজার উল্লেখ দেখা যায়; তিনি সপ্তম শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। বোধ হয় সেই প্রাচীন সাহসাঙ্ক হইতে প্রভেদ দেখাইবার জন্য গ্রন্থকার স্বীয় গ্রন্থের নাম নবসাহসাঙ্ক চরিত করিয়াছিলেন। মহেশ্বর কৃত “বিশ্বপ্রকাশ” পাঠে অবগত হওয়া যায় যে খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর মধ্য বা শেষভাগে সাহসাঙ্ক নামক একজন রাজা গাধিপুরে অর্থাৎ কান্যকুব্জে রাজত্ব করিতেছিলেন। বিশ্বপ্রকাশ ১০৩৩ শকাব্দে অর্থাৎ ১১১১ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়। গ্রন্থের প্রস্তাবনায় গ্রন্থকার আপনার পরিচয় সূত্রে লিখিয়াছেন যে গাধিপুরস্থ সাহসাঙ্ক রাজার সভাবৈদ্য হইতে তিনি ছয় পুরুষ অন্তর।[*] যদি সাহসাঙ্ক দশম শতাব্দীর কান্যকুব্জের রাজা হন, তদীয় চরিত বঙ্গীয় শ্রীহর্ষ লিখিবেন, ইহা বিচিত্র নহে।

দুঃখের বিষয় এই যে শ্রীহর্ষ “গৌড়োর্ব্বীশকুল প্রশস্তি,” “নব সাহসাঙ্ক চরিত” প্রভৃতি যে সকল ঐতিহাসিক গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, তাহাদিগের মধ্যে কোনটীই পাওয়া যায় নাই। বোধ হয়, সর্ব্ব সাধারণে এইরূপ গ্রন্থের বিশেষ আদর করিত না। যে রাজবংশের গুণ বর্ণনা এই সকল গ্রন্থে থাকিত, সেই রাজারাই আগ্রহ করিয়া গ্রন্থগুলি রাখিতেন। পরে যখন মুসলমানেরা আসিয়া রাজ্যগুলি ধ্বংস করিয়াছে, তখন উক্ত পুস্তকগুলি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। অনুমান হয় যে যাহা কিছু ইতিহাস-গ্রন্থ আমাদিগের ছিল, এইরূপেই বিলুপ্ত হইয়াছে। যদি অনেক লোকের ঐতিহাসিক রচনার প্রতি অনুরাগ থাকিত, বা যদি কেহ মিথ্যাকল্পনাশূন্য সর্ব্বলোকহৃদয়রঞ্জন ইতিহাস লিখিতে পারিত, তাহা হইলে ঈদৃশ দুর্দ্দশা ঘটিত না। কিন্তু দেশীয় লোকের অননুরাগ বা উপেক্ষায় এবং বিদেশীয় বিজেতৃগণের বিদ্বেষে আমাদিগের পুরাবৃত্ত প্রায় অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে।

---

[*] “A prince named Sahasanka must have occupied the throne [of Kanouj] about the middle of the 10th century as Maheswara the author of Viswaprakasa in the year 1111, makes himself sixth in descent from the physician of that monarch.” P. 463, Vol. XV. Asiatic Researches.

চাঁদ কবি নৈষধকার শ্রীহর্ষের উল্লেখ করিয়াছেন। চারিজন প্রাচীন কবির নাম করিয়া পরে লিখিয়াছেন,

নর রূপং পঞ্চম শ্রীহর্ষসারং
নলৈরায়কণ্ঠ দিনৈ শুভ্রহারং।

পঞ্চম, নরের প্রধান, সার কবি শ্রীহর্ষ, যিনি নলরাজার কণ্ঠে শুভ্রহার দিয়াছেন।

চাঁদকবি পৃথ্বিরাজের সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। ১১৯২ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ ঘোরীর সঙ্গে যুদ্ধে পৃথ্বিরাজের মৃত্যু হয়। সুতরাং চাঁদ খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের লোক। তিনি যে শ্রীহর্ষের উল্লেখ করিবেন, আশ্চর্য্য নহে।

রামদাস বাবু লিখিয়াছেন, "সুবিখ্যাত জৈন লেখক রাজশেখর ১৩৪৮ খ্রীষ্টাব্দে 'প্রবন্ধকোষ' রচনা করেন। এই গ্রন্থে তিনি লিখিয়াছেন, শ্রীহীর পুত্র শ্রীহর্ষদেব বারানসীতে জন্ম গ্রহণ করিয়া তথাকার নৃপতি গোবিন্দ চন্দ্রের তনয় মহারাজ জয়ন্তচন্দ্রের আজ্ঞায় নৈষধ চরিত কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। রাজশেখর জয়ন্তচন্দ্র সম্বন্ধে অনেক বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। জয়ন্তচন্দ্র, পঙ্গুল নামে বিখ্যাত এবং অনিহীল বারা পত্তনের অধীশ্বর কুমার পালের সমকালবর্ত্তী। মুসলমান নৃপতিগণ ইহার বংশ এককালে ধ্বংস করিয়াছিলেন। সংস্কৃত বিদ্যাবিশারদ ডাক্তার বুলর সাহেব কহেন, এই জয়ন্তচন্দ্র কাষ্ঠ কূট ক্ষত্রিয় নৃপতি এবং ইনিই জয়চন্দ্র নামে খ্যাত। জয়চন্দ্র ১১৬৮ এবং ১১৯৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কান্যকুব্জ ও বারানসীর অধীশ্বর ছিলেন। রাজশেখরের বিবরণ প্রামাণিক বোধ হইতেছে, কেননা, তাহার সহিত শ্রীহর্ষের নিজ পরিচয়ের ঐক্য আছে।"

আমাদিগের বিবেচনায় রামদাস বাবু এস্থলে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে নৈষধ "সরস্বতী কণ্ঠাভরণে" উদ্ধৃত হইয়াছে, সুতরাং উহা ১০৪২ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে লিখিত। রাজা জয়চন্দ্র ঐ সময়ের শতাধিক বৎসর পরে প্রাদুর্ভূত হন। তিন চারিশত বৎসর পরে যদি কেহ কল্পনা অবলম্বন করিয়া কোন গ্রন্থকারের জীবন চরিত লিখিতে যায়, সে গ্রন্থোক্ত পরিচয়গুলি ঠিক রাখিলেই প্রামাণিক বিবরণ লিখিয়াছে, বলা যাইতে পারে না। এতৎসম্বন্ধে অন্য রূপ প্রমাণ চাই। বিশেষতঃ রামদাস বাবু যখন শ্রীহর্ষকে আদিশূরের আহূত পঞ্চব্রাহ্মণের এক জন বলিয়া গণ্য করিয়াছেন, তখন তাহাকে জয়চন্দ্রের সমকালবর্ত্তী কি প্রকারে বলিতে পারেন? জয়চন্দ্রের সময় ১১৬৮ খ্রীষ্টাব্দ। মুসলমান দিগের কর্ত্তৃক বঙ্গবিজয় ১২০৩ খ্রীষ্টাব্দে। ৩৫ বৎসরের মধ্যে কি সমুদায় সেন বংশের রাজত্ব শেষ হইল? প্রামাণিক মুসলমান ইতিহাসকারদিগের মতে তখন ত বঙ্গে লাক্ষণেয়ই রাজত্ব করিতেছিলেন।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে নৈষধকার শ্রীহর্ষ "খণ্ডন খণ্ডখাদ্য" নামক এক খানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থে তিনি নৈয়ায়িকমত খণ্ডন করিয়াছেন, এবং ইহা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। ইহাতে বৃহস্পতি কৃত লোকায়ত সূত্র, বৌদ্ধদিগের মাধ্যমিক মত, এবং শঙ্করাচার্য্যকৃত বাদরায়ণীয় সূত্রের ভাষ্যের, উল্লেখ আছে; যথা, "সোঽয়ং অপূর্ব্বঃ প্রমাণাদি সত্তানভ্যুপগমাত্মা বাক্স্তম্ভন মন্ত্রো ভবতাভ্যুহিতো নূনং যস্য প্রভাবাৎ ভগবতা সুরগুরুণা লোকায়ত সূত্রাণি ন প্রণীতানি তথাগতেন বা মধ্যমাগমা নোপদিষ্টা ভগবৎপাদেনচ বাদরায়ণীয়েষু সূত্রেষু ভাষ্যং ন ভাষে।"

কোন্ সময়ে লোকায়ত সূত্র লিখিত বা মাধ্যমিকমত প্রচারিত হয়, বলা যায় না। বাণকৃত হর্ষচরিতে লোকায়তিক সম্প্রদায়ের নাম দৃষ্ট হয়। বাণ খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দির লোক। কিন্তু রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে ও মহাভারতের শান্তি পর্ব্বে লোকায়তবাদ লক্ষিত হয়। সুতারাং লোকায়ত মতের উল্লেখ দেখিয়া খণ্ডন লেখকের প্রাদুর্ভাব কাল সম্বন্ধে কোনরূপ অনুমানই করা যায় না। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রারম্ভে চীন দেশীয় পর্য্যটক ফাহিয়ান এতদ্দেশে ছিলেন। তিনি মাধ্যমিক মতের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ঐ মতের উৎপত্তি কোন্ সময়ে হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় করা যায় না। অতএব ইহা হইতেও শ্রীহর্ষের কাল নিরূপণ চেষ্টা বিফল হইতেছে।

সুবিখ্যাত কোলব্রুক সাহেব অনুমান করেন যে শঙ্করাচার্য্য খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর বা শেষে নবম শতাব্দীর প্রারম্ভে প্রাদুর্ভূত হন।* সুতরাং যে খণ্ডনকার তৎকৃত ভাষ্যের উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি পরবর্ত্তী দশম শতাব্দীর শেষভাগের বা একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভের লোক হইবেন, ইহা বিচিত্র নহে। যাহা হউক, তিনি যে নবম শতাব্দীর পূর্ব্বের লোক নহেন, ইহা এক প্রকার প্রতিপন্ন হইতেছে।

খণ্ডন খণ্ডখাদ্যের অন্য এক স্থল লইয়া শ্রীহর্ষের প্রাদুর্ভাবকাল সম্বন্ধে আরও কিছু কথা বলা যাইতে পারে।

> "তস্মাদস্মাভিরপ্যস্মিন্নর্থে ন খলু দুষ্পাঠা।
> যদ্যা বৈবাস্থাকারমক্ষরাণি কিয়ন্ত্যপি ॥"

---

* See Colebrooke's Essays, Vol. I. p. 332. Also Colebrooke's Preface to his translation of the Dayabhaga, উইলসন্ সাহেবেরও এই মত।

See Wilson's Preface to his Sanscrit Dictionary, P. XVII, and his Essays on the Religion of the Hindoos. Vol. I. P. 201.

অর্থাৎ "এ নিন্দিত কয়েকটি অক্ষরের অন্যথা করিয়া এই অর্থে তোমারই গাথা অবলম্বন করা আমার অসাধ্য নহে" এই বলিয়া খণ্ডনকার নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটি লিখিয়াছেন,

> "ব্যাঘাতো যদি শঙ্কাস্তি নচেচ্ছঙ্কা ততস্তরাং ।
> ব্যাঘাতাবধিরাশঙ্কাতর্ক শঙ্কাবধিঃ কুতঃ ।"

উদয়নাচার্য্য কৃত কুসুমাঞ্জলীকারিকায় ইহার প্রতিরূপ একটি শ্লোক দেখা যায়, যথা—

> "শঙ্কাচেৎ অনুমাহস্ত্যেব নচেৎ শঙ্কাততস্তরাং ।
> ব্যাঘাতাবধিরাশঙ্কাতর্কঃ শঙ্কাবধির্মতঃ ।"

এতদ্দেশে পণ্ডিতদিগের মধ্যে অনেক শ্লোক লিপিবদ্ধ না হইয়া বহুকাল মুখে মুখে চলিয়া আইসে। সুতরাং একথা বলা যাইতে পারে না যে কুসুমাঞ্জলীকারিকার এই শ্লোকটি উদয়নের পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল না। যাহা হউক, যদি ইহা সম্পূর্ণরূপেই উদয়নাচার্য্যের রচিত হয়, তাহা হইলে এইমাত্র জানা যাইতেছে যে শ্রীহর্ষ উদয়নের পরবর্ত্তী। কিন্তু উদয়ন কোন্ সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, নির্ণয় করা কঠিন।

মহোদয় কাওয়েল সাহেব স্বকৃত কুসুমাঞ্জলী প্রস্তাবনায় লিখিয়াছেন যে বাচস্পতি মিশ্র শাঙ্কর ভাষ্যের "ভামতি" নাম্নী টীকা লিখেন, উদয়ন বাচস্পতি মিশ্র কৃত "ন্যায়বার্ত্তিক তাৎপর্য্য টীকার" * পরিশুদ্ধি জন্য "ন্যায় বার্ত্তিক তাৎপর্য্য পরিশুদ্ধি" রচনা করেন, এবং মাধবাচার্য্য সর্ব্বদর্শন সংগ্রহে বারম্বার উদয়নের কুসুমাঞ্জলি উদ্ধৃত করিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্য খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীর প্রারম্ভের লোক, মাধবাচার্য্য চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের। সুতরাং কাওয়েল সাহেব বলেন, আমরা অনেক ভ্রমের আশঙ্কা না করিয়া স্থির করিতে পারি যে বাচস্পতি মিশ্র খৃঃ দশম শতাব্দীতে এবং উদয়নাচার্য্য দ্বাদশ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। এবিষয়ে আমাদিগের কিছু বক্তব্য আছে। প্রথমতঃ আমরা এমন কোন প্রমাণ দেখি নাই যে "কুসুমাঞ্জলী" যে উদয়নের লিখিত, "ন্যায় বার্ত্তিক তাৎপর্য্য পরিশুদ্ধি"ও সেই উদয়নের রচিত। দ্বিতীয়তঃ যদি "ন্যায় বার্ত্তিক তাৎপর্য্য পরিশুদ্ধি" কুসুমাঞ্জলীকার কর্ত্তৃক বাচস্পতি মিশ্র কৃত "ন্যায় বার্ত্তিক তাৎপর্য্য টীকার" পরে লিখিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে ইহাও অসম্ভব নহে যে উভয়ে শঙ্করাচার্য্যের পরে নবম ও দশম শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। তৃতীয়তঃ আমরা কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের পুস্তকালয়ে হস্তলিখিত গ্রন্থের মধ্যে বাচস্পতি মিশ্রকৃত "খণ্ডনোদ্ধার"

---

* "ভামতি" ও "ন্যায় বার্ত্তিক তাৎপর্য্য টীকা" উভয়ই যে বাচস্পতি মিশ্রের লিখিত, ইহা তৎকৃত স্বরচিত গ্রন্থের উল্লেখ দৃষ্টে জানা যায়; See Dr. Hall's Catalogue, P. 87.

নামক একখানি পুস্তক দেখিয়াছি। ইহাতে শ্রীহর্ষের খণ্ডন খণ্ডখাদ্যের আপত্তি মীমাংসা চেষ্টা আছে। যদি এই বাচস্পতি মিশ্র "ভামতি"-কার হন, তিনি উদয়নের পরবর্ত্তী হইবারই সম্ভাবনা; কিন্তু তিনি "ভামতি"-কার কি না, তাহার প্রমাণ নাই। চতুর্থতঃ মাধবাচার্য্য স্বকৃত "শঙ্কর দিগ্বিজয়" নামক গ্রন্থে শঙ্করাচার্য্য, উদয়নাচার্য্য ও শ্রীহর্ষকে সমসাময়িক লোক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থে লিখিত আছে যে খণ্ডনকার শ্রীহর্ষ ও তৎপরাজয়াসমর্থ উদয়ন শঙ্কর কর্ত্তৃক পরাভূত হন।* গ্রন্থের অপর স্থলে সুরেশ্বরাচার্য্যকে শঙ্কর বলিতেছেন,

"বাচস্পতিত্বমধিগম্য বসুন্ধরায়াং
ভাষ্য বিধাস্যসিত্বমাং মমভাষ্য টীকাং।" †

অর্থাৎ "বাচস্পতিত্ব প্রাপ্ত হইয়া তুমি বসুন্ধরায় জন্ম গ্রহণ করিবে এবং আমার ভাষ্যের টীকা বিধান করিবে।"

এই সকল বিবেচনা করিয়া দেখিলে বোধ হয় যে মাধবাচার্য্য উদয়ন ও শ্রীহর্ষকে শঙ্করের ন্যায় প্রাচীন লেখক ভাবিতেন এবং বাচস্পতি মিশ্রকে তৎপরবর্ত্তী জ্ঞান করিতেন। পঞ্চমতঃ, যখন সরস্বতী কণ্ঠাভরণে নৈষধ উদ্ধৃত হইয়াছে, তখন জানা যাইতেছে যে ভোজরাজের পূর্ব্বে শ্রীহর্ষ বর্ত্তমান ছিলেন; সুতরাং যদি কুসুমাঞ্জলীকার শ্রীহর্ষের পূর্ব্ববর্ত্তী হন, তাহা হইলে এইরূপ অনুমান করাই যুক্তিযুক্ত হইতেছে যে খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে উদয়নাচার্য্য প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। নতুবা কল্পনা অবলম্বন করিয়া, উদয়নকে দ্বাদশ শতাব্দীর লোক বলিয়া শ্রীহর্ষকে তৎপরবর্ত্তী সাময়িক বলা বিবেচনা সিদ্ধ বোধ হয় না। ষষ্ঠতঃ, যদি এমন কোন অকাট্য প্রমাণই পাওয়া যায় যে উদয়নাচার্য্য বাস্তবিক দ্বাদশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন, তাহা হইলে সরস্বতী কণ্ঠাভরণের বলে বলিতে হইবে যে শ্রীহর্ষ উদয়নের পূর্ব্ববর্ত্তী, আর কুসুমাঞ্জলী কারিকার যে শ্লোকের সহিত খণ্ডন খণ্ডখাদ্যোক্ত শ্লোকের সাদৃশ্য আছে, সে শ্লোক কারিকা লিখনের পূর্ব্বে নৈয়ায়িকদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল।

শ্রীরাজ।

---

* ১৫শ "শঙ্কর দিগ্বিজয়", ১৫৭। শ্লো

† ১৩শ "শঙ্কর দিগ্বিজয়", ৭৩। শ্লো

চন্দ্রশেখর

দ্বাত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদ

প্রতাপ কি করিলেন

প্রতাপ জমীদার এবং প্রতাপ দস্যু। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ের অনেক জমিদারই দস্যু ছিলেন। ডারুইন বলেন, মানবজাতি বানরদিগের প্রপৌত্র; এ কথায় যদি কেহ রাগ না করিয়া থাকেন, তবে পূর্ব্বপুরুষগণের এই অখ্যাতি শুনিয়া বোধ হয় কোন জমীদার আমাদের উপর রাগ করিবেন না। বাস্তবিক দস্যুবংশে জন্ম অগৌরবের কথা বলিয়া বোধ হয় না, কেন না অন্যত্র দেখিতে পাই, অনেক দস্যুবংশজাতই গৌরবে প্রধান। তৈমুরলঙ্গ নামে বিখ্যাত দস্যুর পরপুরুষেরাই বংশ মর্য্যাদায় পৃথিবীমধ্যে শ্রেষ্ঠ হইয়াছিলেন। ইংলণ্ডে যাঁহারা বংশ মর্য্যাদার বিশেষ গর্ব্ব করিতে চাহেন, তাঁহারা নর্ম্মান্ বা স্কন্দেনেবীয় নাবিক দস্যুদিগের বংশোদ্ভব বলিয়া আত্মপরিচয় দেন। প্রাচীন ভারতে কুরুবংশেরই বিশেষ মর্য্যাদা ছিল; তাঁহারা গোচোর; বিরাটের উত্তর গোগৃহে গোরু চুরি করিতে গিয়াছিলেন। দুই এক বাঙ্গালি জমীদারের এরূপ কিঞ্চিৎ বংশ মর্য্যাদা আছে।

তবে অন্যান্য প্রাচীন জমীদারের সঙ্গে প্রতাপের দস্যুতার কিছু প্রভেদ ছিল। আত্মসম্পত্তি রক্ষার জন্য, বা দুর্দ্দান্ত শত্রুর দমন জন্যই প্রতাপ দস্যুদিগের সাহায্য গ্রহণ করিতেন; অনর্থক পরস্বাপহরণ বা পরপীড়ন জন্য করিতেন না, এমন কি দুর্ব্বল বা পীড়িত ব্যক্তিকে রক্ষা করিয়া পরোপকার জন্যই দস্যুতা করিতেন। প্রতাপ আবার সেই পথে গমনোদ্যত হইলেন।

যে রাত্রে শৈবলিনী ছিপ ত্যাগ করিয়া পলাইল, সে রাত্র প্রভাতে প্রতাপ, নিদ্রা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া, রামচরণ আসিয়াছে দেখিয়া আনন্দিত হইলেন; কিন্তু শৈবলিনীকে না দেখিয়া, চিন্তিত হইলেন। কিছুকাল তাহার প্রতীক্ষা করিয়া তাহাকে না দেখিয়া তাহার অনুসন্ধান আরম্ভ করিলেন। গঙ্গাতীরে অনু-

সন্ধান করিলেন, পাইলেন না। অনেক বেলা হইল। প্রতাপ নিরাশ হইয়া সিদ্ধান্ত করিলেন, যে শৈবলিনী ডুবিয়া মরিয়াছে। প্রতাপ জানিতেন, এখন তাহার ডুবিয়া মরা অসম্ভব নহে।

প্রতাপ প্রথমে মনে করিলেন "আমিই শৈবলিনীর মৃত্যুর কারণ।" কিন্তু ইহাও ভাবিলেন, "আমার দোষ কি? আমি ধর্ম্ম ভিন্ন অধর্ম্ম পথে যাই নাই। শৈবলিনী যে জন্য মরিয়াছে তাহা আমার নিবার্য্য কারণ নহে।" অতএব প্রতাপ নিজের উপর রাগ করিবার কারণ পাইলেন না। চন্দ্রশেখরের উপর কিছু রাগ করিলেন—চন্দ্রশেখর কেন শৈবলিনীকে বিবাহ করিয়াছিলেন? রূপসীর উপর একটু রাগ করিলেন, কেন শৈবলিনীর সঙ্গে প্রতাপের বিবাহ না হইয়া, রূপসীর সঙ্গে বিবাহ হইয়াছিল? সুন্দরীর উপর আরও একটু রাগ করিলেন—সুন্দরী তাঁহাকে না পাঠাইলে, প্রতাপের সঙ্গে শৈবলিনীর গঙ্গা সন্তরণ ঘটিত না, শৈবলিনীও মরিত না। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা লরেন্স ফষ্টরের উপর রাগ হইল—সে শৈবলিনীকে গৃহত্যাগিনী না করিলে, এ সকল কিছুই ঘটিত না। ইংরেজ জাতি বাঙ্গালায় না আসিলে, শৈবলিনী লরেন্স ফষ্টরের হাতে পড়িত না। অতএব ইংরেজ জাতির উপরও প্রতাপের অনিবার্য্য ক্রোধ জন্মিল। প্রতাপ সিদ্ধান্ত করিলেন, ফষ্টরকে আবার ধৃত করিয়া, বধ করিয়া, এবার অগ্নিসংকার করিতে হইবে—নহিলে সে আবার বাঁচিবে—গোর দিলে মাটি ফুঁড়িয়া উঠিতে পারে। দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত এই করিলেন, যে ইংরেজ জাতিকে বাঙ্গালা হইতে উচ্ছেদ করা কর্ত্তব্য, কেননা ইহাদিগের মধ্যে অনেক ফষ্টর আছে।

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে, প্রতাপ সেই ছিপে মুঙ্গের ফিরিয়া গেলেন। প্রথম চন্দ্রশেখরের সন্ধান করিলেন, তাঁহার সন্ধানার্থ রমানন্দস্বামীর আশ্রমে গেলেন। শুনিলেন, চন্দ্রশেখর শৈবলিনী পুনঃ প্রাপ্তির পরদিন সেখানে গিয়াছিলেন, আর যান নাই। আরও শুনিলেন যে রমানন্দ স্বামীও সেই দিন আশ্রমত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। কোথায় গিয়াছেন কেহ জানে না।

প্রতাপ, মুঙ্গেরে রমানন্দ বা চন্দ্রশেখর কাহারও উদ্দেশ পাইলেন না। দুর্গ মধ্যে গেলেন। দেখিলেন, ইংরেজের সঙ্গে নবাবের যুদ্ধ হইবে, তাহার উদ্যোগের বড় ধূম পড়িয়া গিয়াছে।

প্রতাপের আহ্লাদ হইল। মনে ভাবিলেন, নবাব কি এই অসুরদিগকে বাঙ্গালা হইতে তাড়াইতে পারিবেন না? ফষ্টর কি ধৃত হইবে না? তারপর মনে ভাবিলেন, যাহার যেমন শক্তি, তাহার কর্ত্তব্য, এ কার্য্যে নবাবের সাহায্য করে। কাষ্ঠ বিড়ালেও সমুদ্র বাঁধিতে পারে। তারপর মনে ভাবিলেন, আমা হইতে কি কোন সাহায্য হইতে পারে না? আমি কি করিতে পারি? তারপর মনে

ভাবিলেন, আমার সৈন্য নাই, কেবল লাঠিয়াল আছে—দস্যু আছে। তাহাদিগের দ্বারা কোন্ কার্য্য হইতে পারে? ভাবিলেন, আর কোন কার্য্য না হউক, লুঠপাঠ হইতে পারে। যে গ্রামে ইংরেজের সাহায্য করিবে, সে গ্রাম লুঠ করিতে পারিব। যেখানে দেখিব ইংরেজের রশদ লইয়া যাইতেছে, সেইখানে রশদ লুঠ করিব। যেখানে দেখিব ইংরেজের দ্রব্য সামগ্রী যাইতেছে, সেইখানে দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিব। ইহা করিলেও নবাবের অনেক উপকার করিতে পারিব। সম্মুখ সংগ্রামে যে জয়, তাহা বিপক্ষ বিনাশের সামান্য উপায় মাত্র। সৈন্যের পৃষ্ঠরোধ এবং খাদ্যাহরণের ব্যাঘাত, প্রধান উপায়। যতদূর পারি, ততদূর তাহা করিব।

তারপর ভাবিলেন, আমি কেন এত করিব? করিব, তাহার অনেক কারণ আছে। প্রথম, ইংরেজ চন্দ্রশেখরের সর্ব্বনাশ করিয়াছে; দ্বিতীয়, শৈবলিনী মরিয়াছে; তৃতীয়, আমাকে কয়েদ রাখিয়াছিল; চতুর্থ এইরূপ অনিষ্ট আর আর লোকেরও করিয়াছে ও করিতে পারে; পঞ্চম, নবাবের এ উপকার করিতে পারিলে দুই একখানা বড় বড় পরগনা পাইতে পারিব।

অতএব আমি ইহা করিব।

প্রতাপ তখন অমাত্যবর্গের খোষামোদ করিয়া নবাবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। নবাবের সঙ্গে তাঁহার কি কি কথা হইল, তাহা অপ্রকাশ রহিল। নবাবের সঙ্গে সাক্ষাতের পর তিনি স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

অনেক দিনের পর, তাঁহার স্বদেশে আগমনে রূপসীর গুরুতর চিন্তা দূর হইল, কিন্তু রূপসী শৈবলিনীর মৃত্যুর সম্বাদ শুনিয়া দুঃখিত হইল। প্রতাপ আসিয়াছেন শুনিয়া সুন্দরী তাঁহাকে দেখিতে আসিল। সুন্দরী শৈবলিনীর মৃত্যুর সম্বাদ শুনিয়া নিতান্ত দুঃখিতা হইল, কিন্তু বলিল যে, "যাহা হইবার তাহা হইয়াছে। কিন্তু শৈবলিনী এখন সুখী হইল। তাহার বাঁচা অপেক্ষা মরাই যে সুখের, তা আর কোন্ মুখে না বলিব।"

প্রতাপ রূপসী ও সুন্দরীর সঙ্গে সাক্ষাতের পর, পুনর্ব্বার গৃহত্যাগ করিয়া গেলেন। অচিরাৎ দেশে দেশে রাষ্ট্র হইল যে মুঙ্গের হইতে কাটোয়া পর্য্যন্ত যাবতীয় দস্যু ও লাঠিয়াল দলবদ্ধ হইতেছে, প্রতাপ রায় তাহাদিগকে দলবদ্ধ করিতেছে।

শুনিয়া গুরগণ খাঁ চিন্তাযুক্ত হইলেন। জগৎ শেঠের সঙ্গে প্রতাপসম্বন্ধে যে কথোপকথন হইয়াছিল, তাহা পূর্ব্বে বর্ণিত করিয়াছি।

জগৎ শেঠ স্বীকৃত হইলেন যে, প্রয়োজনীয় অর্থ তাঁহারা দিবেন। প্রতাপকে অর্থের প্রলোভন দেখানই গুরগণ খাঁর কর্ত্তব্য বোধ হইল। তিনি সাক্ষাতের মানস জানাইয়া প্রতাপের নিকট বিশ্বাসী দূত প্রেরণ করিলেন। প্রতাপ পুনর্ব্বার, অশ্বপৃষ্ঠে মুঙ্গের চলিলেন।

গুরগণ খাঁর সহিত প্রতাপের সাক্ষাতে কি ফল ফলিল, তাহা পশ্চাৎ বলিব। শৈবলিনী ও দলনীকে বিষম সঙ্কটে রাখিয়া আসিয়াছি। তাহাদিগের কি ঘটিল, তাহা এক্ষণে বলিব।

ত্রয়স্ত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদ

শৈবলিনী কি করিল

মহান্ধকারময় পর্ব্বত গুহা—পৃষ্ঠচ্ছেদী উপলশয্যায় শুইয়া—শৈবলিনী। মহাকায় পুরুষ, শৈবলিনীকে তথায় ফেলিয়া দিয়া গিয়াছেন। ঝড় বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে—কিন্তু গুহা মধ্যে অন্ধকার—কেবল অন্ধকার—অন্ধকারে ঘোরতর নিঃশব্দ। নয়ন মুদিলে অন্ধকার—চক্ষু চাহিলে তেমনি অন্ধকার। নিঃশব্দ—কেবল কোথাও পর্ব্বতস্থ রন্ধ্র পথে বিন্দু বিন্দু বারি গুহা তলস্থ শিলার উপরে পড়িয়া, ক্ষণে ক্ষণে টিপ্ টাপ্ শব্দ করিতেছে। আর যেন কোন জীব মনুষ্য কি পশু কে জানে?—সেই গুহা মধ্যে নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতেছে।

এতক্ষণে শৈবলিনী ভয়ের বশীভূতা হইলেন। ভয়? তাহাও নহে। মনুষ্যের স্থিরবুদ্ধিতার সীমা আছে—শৈবলিনী সেই সীমা অতিক্রম করিয়াছিলেন। শৈবলিনীর ভয় নাই—কেননা জীবন তাঁহার পক্ষে অবহনীয়, অসহনীয় ভার হইয়া উঠিয়াছিল—ফেলিতে পারিলেই ভাল। বাকি যাহা—সুখ, ধর্ম্ম, জাতি, কুল, মান, সকলই গিয়াছিল—আর যাইবে কি? কিসের ভয়?

কিন্তু শৈবলিনী আশৈশব, চিরকাল, যে আশা হৃদয় মধ্যে সযত্নে, সঙ্গোপনে, লালিত করিয়াছিল, সেই দিন, বা তাহার পূর্ব্বেই, তাহার উচ্ছেদ করিয়াছিল; যাহার জন্য সর্ব্বত্যাগিনী হইয়াছিল, এক্ষণে তাহাও ত্যাগ করিয়াছে; চিত্ত নিতান্ত বিকল, নিতান্ত বলশূন্য। আবার প্রায় দুই দিন অনশন, তাহাতে পথশ্রান্তি, পর্ব্বতারোহণ শ্রান্তি; বাত্যা বৃষ্টি জনিত পীড়া ভোগ; শরীরও নিতান্ত বিকল, নিতান্ত বলশূন্য। তাহার পর এই ভীষণ দৈব ব্যাপার—দৈব বলিয়াই শৈবলিনীর বোধ হইল—মানব চিত্তবৃত্তি আর কতক্ষণ প্রকৃতিস্থ থাকে? দেহ ভাঙ্গিয়া পড়িল, মন ভাঙ্গিয়া পড়িল—শৈবলিনী অপহৃত চেতনা হইয়া, অর্দ্ধ নিদ্রাভিভূত, অর্দ্ধ জাগ্রতাবস্থায় রহিল। গুহা তলস্থ উপলখণ্ড সকলে পৃষ্ঠদেশ ব্যথিত হইতেছিল।

সম্পূর্ণরূপে চৈতন্য বিলুপ্ত হইলে, শৈবলিনী দেখিল, সম্মুখে এক অনন্ত বিস্তৃতা নদী। কিন্তু নদীতে জল নাই—দুকূল প্লাবিত করিয়া রুধিরের স্রোতঃ বহিতেছে। তাহাতে অস্থি, গলিত নরদেহ, নৃমুণ্ড, কঙ্কালাদি ভাসিতেছে। কুম্ভীরাকৃতি জীব সকল—চর্ম্ম মাংসাদি বর্জ্জিত—কেবল অস্থি ও বৃহৎ, ভীষণ,

উজ্জ্বল চক্ষুর্দ্বয় বিশিষ্ট, ইতস্তত: বিচরণ করিয়া সেই সকল গলিত শব ধরিয়া খাইতেছে। শৈবলিনী দেখিল যে, যে মহাকায় পুরুষ তাহাকে পর্ব্বত হইতে ধৃত করিয়া আনিয়াছে, সেই আবার তাহাকে ধৃত করিয়া সেই নদীতীরে আনিয়া বসাইল। সে প্রদেশে, রৌদ্র নাই, জ্যোৎস্না নাই, তারা নাই, মেঘ নাই, আলোক মাত্র নাই—অথচ অন্ধকার নাই। সকলই দেখা যাইতেছে—কিন্তু অস্পষ্ট। রুধিরের নদী, গলিত শব, স্রোতোবাহিত কঙ্কালমালা, অস্থিময় কুম্ভীরগণ, সকলই ভীষণান্ধকারে দেখা যাইতেছে। নদীতীরে বালুকা নাই—তৎপরিবর্ত্তে লৌহ সূচী সকল অগ্রভাগ ঊর্দ্ধ করিয়া রহিয়াছে। শৈবলিনীকে মহাকায় পুরুষ সেইখানে বসাইয়া নদী পার হইতে বলিল। পারের কোন উপায় নাই। নৌকা নাই, সেতু নাই। মহাকায় পুরুষ বলিল, সাঁতার দিয়া পার হ; তুই সাঁতার জানিস্—গঙ্গায় প্রতাপের সঙ্গে অনেক সাঁতার দিয়াছিস্। শৈবলিনী এই রুধিরের নদীতে কি প্রকারে সাঁতার দিবে? মহাকায় পুরুষ তখন হস্তস্থিত বেত্র প্রহার জন্য উত্থিত করিলেন। শৈবলিনী সভয়ে দেখিল, যে সেই বেত্র জলন্ত লোহিত লৌহ নির্ম্মিত। শৈবলিনীর বিলম্ব দেখিয়া, মহাকায় পুরুষ শৈবলিনীর পৃষ্ঠে বেত্রাঘাত করিতে লাগিলেন। শৈবলিনী প্রহারে দগ্ধ হইতে লাগিল। শৈবলিনী প্রহার সহ্য করিতে না পারিয়া রুধিরের নদীতে ঝাঁপ দিল। অমনি অস্থিময় কুম্ভীর সকল তাহাকে ধরিতে আসিল, কিন্তু ধরিল না। শৈবলিনী সাঁতার দিয়া চলিল; রুধিরস্রোত: বদন মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। মহাকায় পুরুষ তাহার সঙ্গে সঙ্গে রুধিরস্রোতের উপর দিয়া পদব্রজে চলিল—ডুবিল না। মধ্যে মধ্যে পূতিগন্ধবিশিষ্ট গলিত শব ভাসিয়া আসিয়া শৈবলিনীর গাত্রে লাগিতে লাগিল। এইরূপে শৈবলিনী পরপারে উপস্থিত হইল। সেখানে কূলে উঠিয়া, চাহিয়া দেখিয়া, "রক্ষা কর! রক্ষা কর!" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। সম্মুখে যাহা দেখিল, তাহার সীমা নাই, আকার নাই, বর্ণ নাই, নাম নাই। তথায় আলোক অতি ক্ষীণ, কিন্তু এতাদৃশ উত্তপ্ত যে তাহা চক্ষে প্রবেশ মাত্র শৈবলিনীর চক্ষু বিদীর্ণ হইতে লাগিল—বিষসংযোগে যেরূপ জ্বালা সম্ভব, চক্ষে সেইরূপ জ্বালা ধরিল। নাসিকায় এরূপ ভয়ানক পূতিগন্ধ প্রবেশ করিল, যে শৈবলিনী নাসিকা আবৃত করিয়াও উন্মত্তার ন্যায় হইল। কর্ণে, অতি কঠোর, কর্কশ, ভয়াবহ, শব্দ সকল এককালে প্রবেশ করিতে লাগিল—হৃদয় বিদারক আর্ত্তনাদ, পৈশাচিক হাস্য, বিকট হুঙ্কার,—পর্ব্বত বিদারণ, অশনি পতন, শিলা বর্ষণ, জল কল্লোল, অগ্নি গর্জ্জন, মুমূর্ষুর ক্রন্দন, সকলই এককালীন শ্রবণ বিদীর্ণ করিতে লাগিল। সম্মুখ হইতে ক্ষণে ক্ষণে ভীমনাদে এরূপ প্রচণ্ড বায়ু বহিতে লাগিল যে তাহাতে শৈবলিনীকে অগ্নিশিখার ন্যায় দগ্ধ করিতে লাগিল—কখন বা শীত শতসহস্র ছুরিকাঘাতের ন্যায় অঙ্গ ছিন্ন

বিচ্ছিন্ন করিতে লাগিল। শৈবলিনী ডাকিতে লাগিল "প্রাণ যায়! প্রাণ যায়! রক্ষা কর!" তখন অসহ্য পূতিগন্ধ বিশিষ্ট এক বৃহৎ কদর্য্য কীট আসিয়া শৈবলিনীর মুখে প্রবেশ করিতে প্রবৃত্ত হইল। শৈবলিনী তখন চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, "রক্ষা কর! এ নরক! এখান হইতে উদ্ধারের কি উপায় নাই?"

মহাকায় পুরুষ বলিলেন "আছে।" স্বপ্নাবস্থায় আত্মকৃত চীৎকারে শৈবলিনীর মোহনিদ্রা ভঙ্গ হইল। কিন্তু তখনও ভ্রান্তি যায় নাই—পৃষ্ঠে প্রস্তর ফুটিতেছে। শৈবলিনী ভ্রান্তি বশে জাগ্রতেও, ডাকিয়া বলিল, "আমার কি হবে! আমার উদ্ধারের কি উপায় নাই?"

গুহামধ্য হইতে গম্ভীর শব্দ হইল "আছে।"

এ কি এ? শৈবলিনী কি সত্য সত্যই নরকে? শৈবলিনী, বিস্মিত, বিমুগ্ধ, ভীতচিত্তে জিজ্ঞাসা করিল, "কি উপায়?"

গুহামধ্য হইতে উত্তর হইল, "দ্বাদশ বার্ষিক ব্রত অবলম্বন কর।"

এ কি দৈববাণী? শৈবলিনী কাতর হইয়া বলিতে লাগিল, "কি সে ব্রত? কে আমায় শিখাইবে?"

উত্তর—"আমি শিখাইব।"

শৈ। তুমি কে?

উত্তর—"ব্রত গ্রহণ কর।"

শৈ। কি করিব?

উত্তর—"তোমার ও চীনবাস ত্যাগ করিয়া আমি যে বসন দিই, তাই পর। হাত বাড়াও।"

শৈবলিনী হাত বাড়াইল। প্রসারিত হস্তের উপর একখণ্ড বস্ত্র স্থাপিত হইল। শৈবলিনী তাহা পরিধান করিয়া, পূর্ব্ববস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আর কি করিব?"

উত্তর—তোমার শ্বশুরালয় কোথায়?

শৈ। বেদগ্রাম। সেখানে কি যাইতে হইবে?

উত্তর—হাঁ—গিয়া গ্রামপ্রান্তে পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিবে।

শৈ। আর?

উত্তর—ভূতলে শয়ন করিবে।

শৈ। আর?

উত্তর—ফলমূলপত্র ভিন্ন ভোজন করিবে না। একবার ভিন্ন খাইবে না।

শৈ। আর ?

উত্তর—জটাধারণ করিবে।

শৈ। আর ?

উত্তর—একবার মাত্র দিনান্তে গ্রামে ভিক্ষার্থ প্রবেশ করিবে। ভিক্ষাকালে গ্রামে গ্রামে আপনার পাপ কীর্ত্তন করিবে।

শৈ। আমার পাপ যে বলিবার নয়! আর কি প্রায়শ্চিত্ত নাই ?

উত্তর—আছে।

শৈ। কি ?

উত্তর—মরণ।

শৈ। ব্রত গ্রহণ করিলাম—আপনি কে ?

শৈবলিনী কোন উত্তর পাইল না। তখন শৈবলিনী সকাতরে পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি যেই হউন, জানিতে চাহি না। এই পর্ব্বতের দেবতা মনে করিয়া আমি আপনাকে প্রণাম করিতেছি। আপনি আর একটি কথার উত্তর করুন—আমার স্বামী কোথায় ?"

উত্তর—কেন ?

শৈ। আর কি তাঁহার দর্শন পাইব না ?

উত্তর—তোমার প্রায়শ্চিত্ত সমাপ্ত হইলে পাইবে।

শৈ। দ্বাদশ বৎসর পরে ?

উত্তর—দ্বাদশ বৎসর পরে।

শৈ। এ প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণ করিয়া কত দিন বাঁচিব ? যদি দ্বাদশ বৎসর মধ্যে মরিয়া যাই ?

উত্তর—তবে মৃত্যুকালে সাক্ষাৎ পাইবে।

শৈ। কোন উপায়েই কি তৎপূর্ব্বে সাক্ষাৎ পাইব না ? আপনি দেবতা, অবশ্য জানেন।

উত্তর—যদি এখন তাঁহাকে দেখিতে চাও, তবে সপ্তাহকাল দিবারাত্র এই গুহামধ্যে একাকিনী বাস কর। এই সপ্তাহ, দিনরাত্র কেবল স্বামীকে মনোমধ্যে চিন্তা কর—অন্য কোন চিন্তাকে মনোমধ্যে স্থান দিও না। এই সাত দিন, কেবল একবার সন্ধ্যাকালে নির্গত হইয়া ফলমূলাহরণ করিও; তাহাতে পরিতোষজনক ভোজন করিও না—যেন ক্ষুধা নিবারণ না হয়। কোন মনুষ্যের নিকট যাইও না,—বা কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইলেও কথা কহিও না। যদি এই অন্ধকার গুহায় সপ্তাহ অবস্থিতি করিয়া, সরল চিত্তে অবিরত অনন্যমন হইয়া কেবল স্বামীর ধ্যান কর, তবে তাঁহার সাক্ষাৎ পাইবে।

চতুস্ত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদ

দলনী কি করিল

মহাকায় পুরুষ, নিঃশব্দে দলনীর পাশে আসিয়া বসিল। দলনী কাঁদিতেছিল, ভয় পাইয়া রোদন সম্বরণ করিল। নিস্পন্দ হইয়া রহিল। আগন্তুকও নিঃশব্দে রহিল। যতক্ষণ এই ব্যাপার ঘটিতেছিল, ততক্ষণ অন্যত্র দলনীর আর এক সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইতেছিল।

মহম্মদ তকির প্রতি গুপ্ত আদেশ ছিল, যে ইংরেজদিগের নৌকা হইতে দলনী বেগমকে হস্তগত করিয়া মুঙ্গেরে পাঠাইবে। মহম্মদ তকি বিবেচনা করিয়াছিলেন, যে ইংরেজেরা বন্দী বা হত হইলে, বেগম কাজে কাজেই তাঁহার হস্তগতা হইবেন, সুতরাং অনুচরবর্গকে বেগম সম্বন্ধে কোন বিশেষ উপদেশ প্রদান করা আবশ্যক বিবেচনা করেন নাই। পরে যখন, মহম্মদ তকি দেখিলেন, নিহত ইংরেজদিগের নৌকায় বেগম নাই, তখন তিনি বুঝিলেন যে, বিষম বিপদ উপস্থিত। তাঁহার শৈথিল্যে বা অমনোযোগে নবাব রুষ্ট হইয়া, কি উৎপাত উপস্থিত করিবেন, তাহা বলা যায় না। এই আশঙ্কায় ভীত হইয়া, মহম্মদ তকি, সাহসে ভর করিয়া নবাবকে বঞ্চনা করিবার কল্পনা করিলেন। লোক পরম্পরা তখন শুনা যাইতেছিল, যে যুদ্ধ আরম্ভ হইলেই ইংরেজেরা মীরজাফরকে কারামুক্ত করিয়া পুনর্ব্বার মস্‌নদে বসাইবেন। যদি ইংরেজেরা যুদ্ধজয়ী হয়েন, তবে মীরকাসেম এ প্রবঞ্চনা শেষে জানিতে পারিলেও কোন ক্ষতি হইবে না। আপাততঃ বাঁচিতে পারিলেই অনেক লাভ। পরে যদিই মীরকাসেম জয়ী হয়েন, তবে তিনি যাহাতে প্রকৃত ঘটনা কখন না জানিতে পারেন, এমত উপায় করা যাইতে পারে। আপাততঃ কোন কঠিন আজ্ঞা না আসে। এইরূপ দুরভিসন্ধি করিয়া, তকি এই রাত্রে নবাবের সমীপে মিথ্যা কথা পরিপূর্ণ এক আরজি পাঠাইতেছিলেন।

মহম্মদ তকি নবাবকে লিখিলেন যে, বেগমকে আমিয়টের নৌকায় পাওয়া গিয়াছে। তকি, তাঁহাকে আনিয়া যথা সম্মানপূর্ব্বক কেল্লার মধ্যে রাখিয়াছেন। কিন্তু বিশেষ আদেশ ব্যতীত তাঁহাকে হজুরে পাঠাইতে পারিতেছেন না। ইংরেজদিগের সঙ্গী খানসামা, নাবিক, শিপাহী প্রভৃতি যাহারা জীবিত আছে, তাহাদের সকলের প্রমুখাৎ শুনিয়াছেন যে বেগম আমিয়টের উপপত্নী স্বরূপ নৌকায় বাস করিতেন। উভয়ে এক শয্যায় শয়ন করিতেন। বেগম স্বয়ং এ সকল কথা স্বীকার করিতেছেন। তিনি এক্ষণে খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বন করিয়াছেন। তিনি মুঙ্গেরে যাইতে অসম্মত। বলেন, "আমাকে ছাড়িয়া দাও। আমি কলিকাতায় গিয়া আমিয়ট সাহেবের সুহৃদ্গণের নিকট বাস করিব। যদি না ছাড়িয়া দাও, তবে

আমি পলাইয়া যাইব। যদি মুঙ্গেরে পাঠাও তবে আত্মহত্যা করিব।" এমত অবস্থায় তাঁহাকে মুঙ্গেরে পাঠাইবেন, কি এখানে রাখিবেন, কি ছাড়িয়া দিবেন, তদ্বিষয়ে আজ্ঞার প্রত্যাশায় রহিলেন। আজ্ঞা প্রাপ্ত হইলে তদনুসারে কার্য্য করিবেন। তকি এই মর্ম্মে পত্র লিখিলেন।

অশ্বারোহী দূত সেই রাত্রেই এই পত্র লইয়া মুঙ্গেরে যাত্রা করিল।

কেহ কেহ বলে দূরবর্ত্তী অজ্ঞাত অমঙ্গল ঘটনাও আমাদিগের মন জানিতে পারে। এ কথা যে সত্য, এমত নহে, কিন্তু যে মুহূর্ত্তে মুরশিদাবাদ হইতে অশ্বারোহী দূত, দলনী বিষয়ক পত্র লইয়া মুঙ্গেরে যাত্রা করিল, সেই মুহূর্ত্তে দলনীর শরীর রোমাঞ্চিত হইল। সেই মুহূর্ত্তে তাঁহার পার্শ্বস্থ বলিষ্ঠ পুরুষ, প্রথম কথা কহিল। তাঁহার কণ্ঠস্বরে হউক, অমঙ্গল সূচনায় হউক, যাহাতে হউক, সেই মুহূর্ত্তে দলনীর শরীর কণ্টকিত হইল।

পার্শ্ববর্ত্তী পুরুষ বলিল, "তোমায় চিনি। তুমি দলনী বেগম।"

দলনী শিহরিল।

পার্শ্বস্থ পুরুষ পুনরপি কহিল, "জানি,- তুমি এই বিজনস্থানে দুরাত্মা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছ।"

দলনীর চক্ষের প্রবাহ আবার ছুটিল।

আগন্তুক কহিল, "এক্ষণে তুমি কোথায় যাইবে?"

সহসা দলনীর ভয় দূর হইয়াছিল। ভীতি বিনাশের দলনী বিশেষ কারণ পাইয়াছিল। দলনী কাঁদিল। প্রশ্নকর্ত্তা প্রশ্ন পুনরুক্ত করিলেন। দলনী বলিল, "যাইব কোথায়? আমার যাইবার স্থান নাই। এক যাইবার স্থান আছে—কিন্তু সে অনেক দূর। কে আমাকে সেখানে সঙ্গে লইয়া যাইবে?"

আগন্তুক বলিলেন, "তুমি নবাবের নিকটে যাইবার বাসনা পরিত্যাগ কর।"

দলনী উৎকণ্ঠিতা, বিস্মিতা হইয়া বলিলেন, "কেন?"

"অমঙ্গল ঘটিবে।"

দলনী শিহরিল, বলিল, "ঘটুক। সেই বৈ আর আমার স্থান নাই। অন্যত্র মঙ্গলাপেক্ষা স্বামীর কাছে অমঙ্গলও ভাল।"

"তবে উঠ। আমি তোমাকে মুরশিদাবাদে মহম্মদ তকির নিকট রাখিয়া আসি। মহম্মদ তকি তোমাকে মুঙ্গেরে পাঠাইয়া দিবেন। কিন্তু আমার কথা শুন। এক্ষণে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। নবাব স্বীয় পৌরজনকে রুহিদাসের গড়ে পাঠাইবার উদ্যোগ করিতেছেন। তুমি সেখানে যাইও না।"

"আমার কপালে যাই থাকুক, আমি যাইব।"

"তোমার কপালে মুঙ্গের দর্শন নাই।"

দলনী চিন্তিতা হইল। বলিল, "ভবিতব্য কে জানে? চলুন, আপনার সঙ্গে আমি মুরশিদাবাদ যাইব। যতক্ষণ প্রাণ আছে, নবাবকে দেখিবার আশা ছাড়িব না।"

আগন্তুক বলিলেন, "তাহা জানি। আইস।"

দুইজনে অন্ধকার রাত্রে মুরশিদাবাদে চলিল। দলনী পতঙ্গ, বহ্নিমুখে [illegible] হইল।

প্রাচীনা এবং নবীনা

১

আমাদিগের সমাজ সংস্কারকেরা, নূতন কীর্ত্তি স্থাপনে যাদৃশ ব্যগ্র, সমাজের গতি পর্য্যবেক্ষণায় তাদৃশ মনোযোগী নহেন। "এই হইলে ভাল হয়, অতএব এই কর," ইহাই তাঁহাদিগের উক্তি, কিন্তু কি করিতে কি হইতেছে, তাহা কেহ দেখেন না। বাঙ্গালীরা যে ইংরেজি শিখে, ইহাতে সকলেরই উৎসাহ; মেকলে হইতে আর্টকিন্‌সন্ পর্য্যন্ত বহুকাল ইহার যত্ন হইয়া আসিতেছে। কিন্তু ইহার ফল কি তাহার সমালোচনা কেবল আজি কাল হইতেছে। এক শ্রেণীর লোক বলেন, ইহার ফল মাইকেল মধুসূদন দত্ত, দ্বারকা নাথ মিত্র প্রভৃতি; দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক বলেন, দুই একটি ফল সুপক্ক এবং সুমধুর বটে, কিন্তু অধিকাংশ তিক্ত ও বিষময়—উদাহরণ মাতালের দল এবং সাধারণ বাঙ্গালী লেখকের পাল। আবার দিনকত ধূম পড়িল, স্ত্রীলোকদিগের অবস্থার সংস্কার কর, স্ত্রীশিক্ষা দাও, বিধবার বিবাহ দাও, স্ত্রীলোককে গৃহপিঞ্জর হইতে বাহির করিয়া উড়াইয়া দাও, বহু-বিবাহ নিবারণ কর; এবং অন্যান্য প্রকারে পাঁচী রামী মাধীকে বিলাতি মেম করিয়া তুল। ইহা করিতে পারিলে যে ভাল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু পাঁচী যদি কখন বিলাতি মেম হইতে পারে, তবে আমাদিগের শালতরুও একদিন ওকবৃক্ষে পরিণত হইবে, এমন ভরসা করা যাইতে পারে। যে রীতিগুলির চলন আপাততঃ অসম্ভব, সেগুলি চলিত হইল না; স্ত্রীশিক্ষা সম্ভব, এক্ষণে তাহা এক প্রকার প্রচলিত হইয়া উঠিতেছে। পুস্তক হইতে এক্ষণে বাঙ্গালী স্ত্রীগণ যে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়, তাহা অতি সামান্য; পরিবর্ত্তনশীল সমাজে অবস্থিতি জন্য, অর্থাৎ শিক্ষিত এবং ইংরেজের অনুকরণকারী পিতা ভ্রাতা স্বামী প্রভৃতির সংসর্গে থাকায় তাহারা যে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়, তাহা প্রবলতর। এই দ্বিবিধ শিক্ষার ফল কিরূপ দাঁড়াইতেছে? বাঙ্গালী যুবকের চরিত্রে যেরূপ পরিবর্ত্তন দেখা যাইতেছে, বাঙ্গালী যুবতীগণের চরিত্রে সেরূপ লক্ষণ কিছু দেখা যাইতেছে কি না? যদি দেখা যাইতেছে, সেগুলি ভাল

না মন্দ? তাহার উৎসাহ দান বিধেয়, না তাহার দমন আবশ্যক? এ সকল প্রশ্ন সাধারণ লেখকদিগকে আলোচনা করিতে আমরা প্রায় দেখিতে পাই না, অথচ, ইহার অপেক্ষা গুরুতর সামাজিক তত্ত্বও আর নাই। তাই বলিতেছিলাম যে, আমাদিগের সমাজ সংস্কারকেরা নূতন কীর্ত্তি স্থাপনে যাদৃশ ব্যগ্র, সমাজের বর্ত্তমান গতির আলোচনায় তাদৃশ মনোযোগী নহেন।

বিষয়টি অতি গুরুতর। সমাজে স্ত্রীজাতির যে বল, তাহা বর্ণিত করিবার প্রয়োজন নাই। মাতা বাল্যকালের শিক্ষাদাত্রী; স্ত্রী বয়ঃপ্রাপ্তের মন্ত্রী, ইত্যাদি প্রাচীন কথা পুনরুক্ত করিবার প্রয়োজন নাই। সকলেই জানেন স্ত্রীলোকের সম্মতি এবং সাহায্য ব্যতীত সংসারের কোন গুরুতর কার্য্য সম্পন্ন হয় না। গহনা গড়ান ও গোরু কেনা হইতে ফরাসিস রাজ্যবিপ্লব এবং লুথরের ধর্ম্মবিপ্লব পর্য্যন্ত সকলেই স্ত্রীসাহায্য সাপেক্ষ। ফরাসিস্স্ত্রীগণ ফরাসিস্ রাজ্যবিপ্লবে মহারথী ছিলেন। আন বলীন হইতে ইংলণ্ড প্রটেষ্টাণ্ট—

—Gospel light first dawned from Bullen's eyes :—

এ সংসার-জলে বাস করিতে গেলে, রমণী কুম্ভীরের সহিত বাদ করা পোষায় না। তাঁহাদের অমতে কোন কাজ করা যায় না। তাঁহারা যে দিগে চলেন, আমরা সেই দিগে চলি; সংসার রণক্ষেত্রের রথীগণের তাঁহারাই সারথি; এ ক্ষণভঙ্গুর দেহ-ছ্যাকড়ার তাঁহারাই কোচমান; এ ভাঙ্গা ডিঙ্গীতে তাঁহারাই বাঙ্গাল মাঝি। আমরা কার্য্য করি; তাঁহারাই কার্য্য করান। আমরা অস্ত্র, তাঁহারা হাত; আমরা লাঠি, তাঁহারা লাঠিয়াল; আমরা খাদ্য, তাঁহারা বক্ত্র; আমরা বুদ্ধি, তাঁহারা ইচ্ছা। আমরা চক্র, তাঁহারা কুম্ভকার, আমাদিগকে ঘুরাইতেছেন; আমরা মেঘ, তাঁহারা বায়ু, রাত্রিদিন আমাদিগকে ফুঁয়ে উড়াইতেছেন; আমরা কাষ্ঠ, তাঁহারা অগ্নি, রাত্রিদিন আমাদিগকে হাড়েহাড়ে পোড়াইতেছেন। আমাদিগের উপার্জ্জন ও পরিশ্রমের অধিকাংশ তাঁহাদিগেরই জন্য। সংসার ক্ষেত্রে পুরুষ চাষাগণ কর্ম্ম রূপ ঘাস কাটিয়া মাথায় করিয়া ঘরে লইয়া যায়, রমণী রূপিনী গাভী-গণ তাহা বসিয়া বসিয়া খায়।

ব্যঙ্গ ত্যাগ করিয়া ইহা বলা যাইতে পারে যে, আমাদের শুভাশুভের মূল আমাদের কর্ম্ম, কর্ম্মের মূল প্রবৃত্তি; এবং অনেক স্থানেই আমাদিগের প্রবৃত্তি সকলের মূল আমাদিগের গৃহিনীগণ। অতএব স্ত্রীজাতি আমাদিগের শুভাশুভের মূল। স্ত্রীজাতির মহত্ব কীর্ত্তন কালে, এই সকল কথা বলা প্রাচীন প্রথা আছে এজন্য আমরাও একথা বলিলাম; কিন্তু এ কথা গুলি যাঁহারা ব্যবহার করেন তাঁহাদিগের আন্তরিক ভাব এই যে পুরুষই মনুষ্য জাতি; যাহা পুরুষের পক্ষে শুভাশুভ বিধান করিতে সক্ষম, তাহাই গুরুতর বিষয়; স্ত্রীগণ, পুরুষের শুভাশুভ

বিধায়িনী বলিয়াই তাঁহাদিগের উন্নতি বা অবনতির বিষয় গুরুতর বিষয়। বাস্তবিক, আমরা সেরূপ কথা বলি না। আমাদিগের প্রধান্ কথা এই, যে স্ত্রীগণ সংখ্যায় পুরুষগণের তুল্য, বা অধিক; তাঁহারা সমাজের অর্দ্ধাংশ। তাঁহারা পুরুষগণের শুভাশুভ বিধায়িনী হউন, বা না হউন, তাঁহাদিগের উন্নতিতে সমাজের উন্নতি; যেমন পুরুষদিগের উন্নতিতে সমাজের উন্নতি, ঠিক সেই পরিমাণে স্ত্রীজাতির উন্নতিতে সমাজের উন্নতি, কেন না স্ত্রীজাতি সমাজের অর্দ্ধেক ভাগ। স্ত্রী পুরুষের সমান ভাগের সমষ্টিকে সমাজ বলে; উভয়ের সমান উন্নতিতে সমাজের উন্নতি। এক ভাগের উন্নতি সমাজ সংস্করণের মুখ্য উদ্দেশ্য, তাহার উন্নতি সহায় বলিয়াই অন্য ভাগের উন্নতি গৌণ উদ্দেশ্য, এ কথা নীতি বিরুদ্ধ।

কিন্তু সমাজের নিয়ন্তৃবর্গ সর্ব্ব কালে সর্ব্ব দেশে, এই ভ্রমে পতিত। তাঁহারা বিধান করেন যে স্ত্রীলোকেরা এইরূপ এইরূপ আচরণ করিবে।—কেন করিবে? উত্তর, তাহা হইলে, পুরুষের অমুক মঙ্গল ঘটিবে, বা অমুক অমঙ্গল নিবারিত হইবে। সমাজ-বিধাতাদিগের সর্ব্বত্র এইরূপ উক্তি; কোথাও এ উদ্দেশ্য স্পষ্ট কোথাও অস্পষ্ট, কিন্তু সর্ব্বত্রই বিদ্যমান। এই জন্যই সর্ব্বত্র স্ত্রীজাতির সতীত্বের জন্য এত পীড়াপীড়ি; পুরুষের সেই জাতীয় দোষ, কোথাও তত বড় গুরুতর দোষ বলিয়া গণনীয় নহে। বাস্তবিক নীতি শাস্ত্রের স্বাভাবিক মূল ধরিতে গেলে এমত কোন বিষয়ই পাওয়া যায়না, যদ্দারা স্ত্রীকৃত ব্যভিচার পুরুষকৃত পরদার গ্রহণ অপেক্ষা গুরুতর দোষ বিবেচনা করা যায়। পাপ দুই সমান। একপুরুষভাগিনী স্ত্রীতে পুরুষের যে স্বাভাবিক অধিকার, একস্ত্রীভাগী পুরুষে স্ত্রীলোকের ঠিক সেই স্বাভাবিক অধিকার, কিছু মাত্র ন্যূন নহে। তথাপি পুরুষে এ নিয়ম লঙ্ঘন করিলে, তাহা বাবুগিরি মধ্যে গণ্য; স্ত্রীলোক এ দোষ করিলে, সংসারের সকল সুখ তাহার পক্ষে বিলুপ্ত হয়; সে অধমের মধ্যে অধম বলিয়া গণ্য হয়, কুষ্ঠগ্রস্তের অধিক অস্পৃশ্যা হয়। কেন? পুরুষের সুখের পক্ষে স্ত্রীর সতীত্ব আবশ্যক; স্ত্রীজাতির সুখের পক্ষে পুরুষের ইন্দ্রিয় সংযম আবশ্যক। কিন্তু পুরুষই সমাজ, স্ত্রীলোক কেহ নহে। অতএব স্ত্রীর পাতিব্রত্যচ্যুতি গুরুতর পাপ বলিয়া সমাজে বিহিত হইল; পুরুষের পক্ষে নৈতিক বন্ধন শিথিল রহিল।

সকল সমাজেই স্ত্রীজাতি পুরুষাপেক্ষা অনুন্নত; পুরুষের আত্মপক্ষপাতিতাই ইহার কারণ। পুরুষ বলিষ্ঠ, সুতরাং পুরুষই কার্য্যকর্ত্তা; স্ত্রীজাতিকে কাজে কাজেই তাঁহাদিগের বাহুবলের অধীন হইয়া থাকিতে হয়। আত্মপক্ষপাতী পুরুষগণ, যত দূর আত্মসুখের প্রয়োজন, ততদূর পর্য্যন্ত স্ত্রীগণের উন্নতির পক্ষে মনোযোগী; তাহার অতিরেকে তিলার্দ্ধ নহে। এ কথা অন্যান্য সমাজের অপেক্ষা, আমাদিগের দেশে বিশেষ সত্য। প্রাচীন কালের কথা বলিতে চাহি না; তৎকালীন

স্ত্রীজাতি চিরাধীনতার বিধি, কেবল অবস্থা বিশেষ ব্যতীত স্ত্রীগণের ধনাধিকারে নিষেধ; স্ত্রী, ধনাধিকারিণী হইলেও স্ত্রীর দান বিক্রয়ে ক্ষমতার অভাব; সহমরণ বিধি; বহু কাল প্রচলিত বিধবার বিবাহ নিষেধ; বিধবার পক্ষে প্রচলিত কঠিন নিয়ম সকল; স্ত্রীপুরুষে গুরুতর বৈষম্যের প্রমাণ। তৎপরে মধ্যভারতেও স্ত্রীজাতির অবনিত আরও গুরুতর হইয়াছিল। পুরুষ প্রভু, স্ত্রী দাসী; স্ত্রী জল তুলে, রন্ধন করে, বাটনা বাটে, কুটনা কোটে। বরং বেতন-ভাগিনী দাসীর কিঞ্চিৎ স্বাধীনতা আছে, কিন্তু বনিতা দুহিতা স্বসার তাহাও ছিলনা। আজি কালি, পুরুষের শিক্ষার গুণে হউক, স্ত্রীশিক্ষার গুণে হউক, বা ইংরেজের দৃষ্টান্তের গুণে হউক, এ অবস্থার পরিবর্ত্তন হইতেছে। কিন্তু যেরূপ পরিবর্ত্তন হইতেছে, তাহার সর্ব্বাংশই কি উন্নতি সূচক? বঙ্গীয় যুবকদিগের যে অবস্থান্তর ঘটিতেছে তাহার বিশেষ আন্দোলন শুনিতে পাই, কিন্তু বঙ্গীয়া যুবতীগণের যে অবস্থান্তর ঘটিতেছে, তাহা কি উন্নতি?

এ প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্ব্বে পূর্ব্বকালে বঙ্গীয়া যুবতী কি ছিলেন, এক্ষণে কি হইতেছেন, তাহা স্মরণ করা আবশ্যক। প্রাচীনার সহিত নবীনার তুলনা আবশ্যক। পূর্ব্বকালের যুবতীগণের নাম করিতে গেলে, আগে শাঁখা শাড়ী সিন্দূর কৌটা মনে পড়িবে; বাঁকমলের মুটাম হাত উপর মনসা পেড়ে শাড়ীর রাঙ্গা পাড় আসিয়া পড়িয়াছে; হাতে পৈছা, কঙ্কন এবং শংখ, (যাহার জুটিল তাহার বাউটি নামে সোনার শংখ)—মুষ্টি মধ্যে দৃঢ়ধৃত সম্মার্জ্জনী, বা রন্ধনের বেড়ী; কপালে, কলা বউয়ের মত সিন্দূরের রেখা, নাকে চন্দ্রমণ্ডলের মত নথ; দাঁতে অমাবস্যার মত মিশি; এবং মস্তকের ঠিক মধ্যভাগে, পর্ব্বত শৃঙ্গের ন্যায় তুঙ্গ কবরী শিখর। আমরা স্বীকার করি যে, সেকেলে মেয়ে যখন গাছকোমর বাঁধিয়া, ঝাঁটা হাতে করিয়া, খোঁপা খাড়া করিয়া, নথ নাড়িয়া দাঁড়াইত, তখন অনেক পুরুষের হৃৎকম্প হইত। যাঁহারা এবম্বিধা প্রাঙ্গণবিহারিণী রসবতীর সঙ্গে বাদানুবাদ সাহস করিতেন, তাঁহারা একটু সতর্ক হইয়া দূরে দাঁড়াইতেন। ইঁহারা কোন্দলে বিশেষ পরিপক্ক ছিলেন; পরস্পরের পৃষ্ঠত্বগের সঙ্গে তাঁহাদের হস্তের সম্মার্জ্জনীর বিশেষ কোন সম্বন্ধ ছিল। তাঁহাদিগের ভাষাও যে বিশেষ প্রকারে অভিধান-সম্মত ছিল, এমত বলিতে পারিনা, কেননা তাঁহারা “পোড়ার মুখো,” “ডেক্‌রা” ইত্যাদি নিপাতনসাধ্য শব্দ আধুনিক প্রাণনাথ প্রাণকান্তাদির স্থলে ব্যবহার করিতেন; এবং “আবাগী” “শতেক্ খুয়ারী” প্রভৃতি শব্দ আধুনিক “সখি” “ভগিনি” স্থানে প্রয়োগ করিতেন।

এক্ষণে যে সুন্দরীকুল চরণালক্তকে বঙ্গ ভূমিকে উজ্জ্বলা করিতেছেন, তাঁহারা ভিন্ন প্রকৃতি। সে শাঁখা শাড়ী সিন্দূর, মিশি মল মাদুলী, কিছুই নাই; অনাভিধানিক প্রিয় সম্বোধন সকল সুন্দরীগণের রসনা ত্যাগ করিয়া বাঙ্গালা নাটকে

আশ্রয় লইয়াছে ; যেখানে আগে মোটা মন্‌সা পেড়ে শাড়ী নেয়ে মোড়া গলিক্রথ ছিল, এক্ষণে তাহার স্থানে শান্তিপুরে ডুরে রূপের জাহাজের পাল হইয়া সোহাগের বাতাসে ফরফর করিয়া উড়িতেছে। হাতা বেড়ী ঝাঁটা কলসীর পরিবর্ত্তে, সূচ সূতা কার্পেট কেতাব হইয়াছে ; পরিধেয় আটু ছাড়িয়া চরণে নামিয়াছে ; কবরী মূর্দ্ধা ছাড়িয়া স্কন্ধে পড়িয়াছে ; এবং অঙ্গের সুবর্ণ, পিণ্ডত্ব ছাড়িয়া, অলঙ্কারে পরিণত হইয়াছে। ধূলিকর্দ্দমরঙ্গিণীগণ, সাবান সুগন্ধাদির মহিমা বুঝিয়াছেন ; কলকণ্ঠ ধ্বনি, পাপিয়ার মত গগনপ্লাবী না হইয়া মার্জ্জারের মত অস্ফুট হইয়াছে। পতির নাম এক্ষণে আর ডেক্‌রা সর্ব্বনেশে নহে ; তত্তৎস্থানে সম্বোধন-পদ সকল দীনবন্ধু বাবুর গ্রন্থ হইতে বাছিয়া বাছিয়া নীত হইয়া ব্যবহৃত হইতেছে। স্থূল কথা এই, প্রাচীনার অপেক্ষা নবীনার রুচি কিছু ভাল। স্ত্রীজাতির রুচির কিছু সংস্কার হইয়াছে।

কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে, তাদৃশ উন্নতি হইয়াছে কি না বলিতে পারি না। কয়েকটি বিষয়ে নবীনাগণকে আমরা নিন্দনীয়া বিবেচনা করি। তাঁহাদিগের কোন প্রকার নিন্দা করা আমাদিগের ঘোরতর বে-আদবি। তবে চন্দ্রের সঙ্গে তাঁহাদিগের সাদৃশ্য সম্পূর্ণ করিবার জন্য তাঁহাদিগের কিঞ্চিৎ কলঙ্ক রটনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

১। তাঁহাদের প্রথম দোষ আলস্য। প্রাচীনা অত্যন্ত শ্রমশালিনী এবং গৃহ কর্ম্মে সুপটু ছিলেন ; নবীনা, ঘোরতর বাবু ; জলের উপর পদ্মের মত স্থিরভাবে বসিয়া স্বচ্ছদর্পণে আপনার রূপের ছায়া আপনি দেখিয়া দিন কাটান। গৃহকর্ম্মের ভার, প্রায় পরিচারিকার প্রতি সমর্পিত। ইহাতে অনেক অনিষ্ট জন্মিতেছে ;—প্রথম, শারীরিক পরিশ্রমের অল্পতায়, যুবতীগণের শরীর বলশূন্য এবং রোগের আগার হইয়া উঠিতেছে। প্রাচীনাদিগের, অর্থাৎ পূর্ব্বকালের যুবতীদিগের শরীর স্বাস্থ্য জনিত এক অপূর্ব্ব লাবণ্য বিশিষ্ট ছিল, এক্ষণে তাহা কেবল নিম্নশ্রেণীর লোকের মধ্যে দেখা যায়। নবীনাদিগের প্রাত্যহিক রোগভোগে তাহাদিগের স্বামী পিতা পুত্র প্রভৃতি সর্ব্বদা জ্বালাতন এবং অসুখী ; এবং সংসারও কাজে কাজেই বিশৃঙ্খলাযুক্ত এবং দুঃখময় হইয়া উঠে। গৃহিণী রুগ্নশয্যাশায়িনী হইলে গৃহের শ্রী থাকে না ; অর্থের ধ্বংস হইতে থাকে ; শিশুগণের প্রতি অযত্ন হয় ; সুতরাং তাহাদিগের স্বাস্থ্যক্ষতি ও কুশিক্ষা হয় ; এবং গৃহমধ্যে সর্ব্বত্র দুর্নীতির প্রচার হয়। যাহারা ভালবাসে, তাহারাও নিত্য রুগ্নের সেবার দুঃখ সহ্য করিতে পারে না ; সুতরাং দম্পতী প্রীতিরও লাঘব হইতে থাকে। এবং মাতার অকাল মৃত্যুতে শিশুগণের এমত অনিষ্ট ঘটে যে, তাহাদের মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তাহারা উহার ফলভোগ করে। সত্য বটে, ইংরেজ জাতীয় স্ত্রীগণকে আলস্য পরবশ দেখিতে

পাই, কিন্তু তাহারা অশ্বারোহণ, বায়ুসেবন ইত্যাদি অনেকগুলি স্বাস্থ্য-রক্ষক শারীরিক ক্রিয়া নিয়মিতরূপে সম্পাদন করে। আমাদিগের গৃহপিঞ্জরের বিহঙ্গিনীগণের সে সকল কিছুই হয় না।

দ্বিতীয়, স্ত্রীগণের আলস্যে আর একটি গুরুতর কুফল এই যে, সন্তান দুর্ব্বল এবং ক্ষীণজীবী হয়। শিশুদিগের নিত্য রোগ এবং অকালমৃত্যু অনেক সময়েই জননীর শ্রমে অনুরাগশূন্যতার ফল। অনেকে বলেন, আগে এত রোগ ছিল না; এখন নিত্য পীড়া; আগে লোকে দীর্ঘজীবী ছিল; এক্ষণে অল্পবয়সে মরে। অনেকের বিশ্বাস আছে, এসকল কাল মহিমা; কলিতে অনৈসর্গিক ব্যাপার ঘটিতেছে। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি জানেন যে নৈসর্গিক নিয়ম কখন কালমাহাত্ম্যে পরিবর্ত্তিত হয় না; যদি আধুনিক বাঙ্গালীরা বহুরোগী এবং অল্পায়ুঃ হইয়া থাকে, তবে তাহার অবশ্য নৈসর্গিক কারণ আছে সন্দেহ নাই। আধুনিক প্রসূতিগণের শ্রমে বিরতিই সেই সকল নৈসর্গিক কারণের মধ্যে অগ্রগণ্য। যে বঙ্গদেশের ভরসা লোকের শারীরিক বলোন্নতির উপর বর্ত্তিয়াছে, সেই বঙ্গদেশে জননীগণের আলস্যবশ্যতার এরূপ বৃদ্ধি যে অতি শোচনীয় ব্যাপার তাহার সন্দেহ নাই।

আলস্যের তৃতীয় কুফল এই যে নবীনাগণ গৃহকর্ম্মে নিতান্ত অশিক্ষিতা এবং অপটু। কখনও সে সকল কাজ করেন না, এজন্য শিখেনও না। ইহাতে অনেক অনিষ্ট ঘটে। প্রাচীনারা নিতান্ত ধনী না হইলে, জল তুলিতেন, বাসন মাজিতেন, উঠান ঝাঁট দিতেন; রন্ধন তাঁহাদের জীবনের প্রধান কার্য্য ছিল। এ কিছু বাড়াবাড়ি; নবীনাদিগের এত দূর করিতে আমরা অনুরোধ করি না; যাহার যেমন অবস্থা, সে তদনুসারে কার্য্য করিলেই যথেষ্ট; কেবল কার্পেট তুলিয়া কাল কাটাইলে, অতি ঘৃণিতরূপে পরস্পরের জীবন নির্ব্বাহ করা হয় বিবেচনা করি। সুখ বর্দ্ধন জন্য সকলেরই জন্ম; যে স্ত্রী, ভূমণ্ডলে আসিয়া, শয্যায় গড়াইয়া, দর্পণ সম্মুখে কেশরঞ্জন করিয়া কার্পেট তুলিয়া, সীতার বনবাস পড়িয়া এবং সন্তান প্রসব করিয়া কাল কাটাইলেন, আপনার ভিন্ন কাহারও সুখ বৃদ্ধি করিলেন না, তিনি পশুজাতির অপেক্ষা কিঞ্চিং ভাল হইলে হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহার স্ত্রীজন্ম নিরর্থক। এ শ্রেণীর স্ত্রীলোকগণকে আমরা গলায় দড়ি দিয়া মরিতে পরামর্শ দিই; পৃথিবী তাহা হইলে অনেক নিরর্থক ভার বহন যন্ত্রণা হইতে বিমুক্তা হয়েন।

গৃহিণী গৃহকর্ম্ম না জানিলে রুগ্নগৃহিণীর গৃহের ন্যায় সকলই বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে। অর্থে উপকার হয় না; অর্থ অনর্থক ব্যয় হয়; দ্রব্য সামগ্রী লুঠ যায়; অর্দ্ধেক দাস দাসী এবং অপর লোক চুরি করে। বহুব্যয়েও খাদ্যাদির অপ্রতুল ঘটে; ভাল সামগ্রীর খরচ দিয়া মন্দ সামগ্রী ব্যবহার করিতে হয়; ভাল সামগ্রী গৃহস্থের

কপালে ঘটেনা। পৌরজনে পৌরজনে অপ্রণয় এবং কলহ ঘটিয়া উঠে। অতিথি অভ্যাগতের উপযুক্ত সম্মান হয় না। সংসার কণ্টকময় হয়।

২। নবীনাদিগের দ্বিতীয় দোষ, ধর্ম্ম সম্বন্ধে। আমরা এক্ষণকার বঙ্গাঙ্গনাগণকে অধার্ম্মিক বলিতেছি না,—বঙ্গীয় যুবকদিগের তুলনায় তাঁহারা ধর্ম্মভক্ত এবং বিশুদ্ধাত্মা বটেন, কিন্তু প্রাচীনাদিগের সম্প্রদায়ের তুলনায় তাঁহারা ধর্ম্মে লঘু, সন্দেহ নাই। বিশেষ যে সকল ধর্ম্ম গৃহস্থের ধর্ম্ম বলিয়া পরিচিত সেইগুলিতে এক্ষণকার যুবতীগণের লাঘব দেখিয়া কষ্ট হয়।

স্ত্রীলোকের প্রথম ধর্ম্ম পাতিব্রত্য। অদ্যাপি, বঙ্গ মহিলাগণ পৃথিবীতলে পাতিব্রত্য ধর্ম্মে তুলনারহিতা। কিন্তু যাহা ছিল তাহা কি আর আছে? এ প্রশ্নের উত্তর শীঘ্র দেওয়া যায় না। প্রাচীনাগণের পাতিব্রত্য যেরূপ দৃঢ় গ্রন্থির দ্বারা হৃদয়ে নিবদ্ধ ছিল, পাতিব্রত্য যেরূপ তাহাদিগের অস্থি মজ্জা শোণিতে প্রবিষ্ট ছিল, নবীনাদিগেরও কি তাই? অনেকের বটে, কিন্তু অধিকাংশের কি তাই? নবীনাগণ পতিব্রতা বটে, কিন্তু যত লোকনিন্দা ভয়ে, তত ধর্ম্মভয়ে নহে।

তাহার পর, দানাদিতে প্রাচীনাদিগের যেরূপ মনোভিনিবেশ ছিল, নবীনাদিগের সেরূপ দেখা যায় না। প্রাচীনাগণের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, যে দানে পরমার্থের কাজ হয়। যে দান করে, সে স্বর্গে যায়। এক্ষণকার যুবতীগণের স্বর্গে বিশ্বাস তত দৃঢ় নহে; তাহাদিগের পরলোকে স্বর্গ প্রাপ্তি কামনা তত বলবতী নহে। ইংরেজী সভ্যতার ফলে, দেশে নানাবিধ সামগ্রীর প্রাচুর্য্য হওয়াতে সকলেরই অর্থের প্রয়োজন বাড়িয়াছে, স্ত্রীলোকদিগেরও বাড়িয়াছে; এজন্য তাদৃশী অনুরক্তি আর নাই। তত দান করিলে, আর কুলায় না। টাকায় যে সকল সুখ কেনা যায়, তাহার সংখ্যা এবং বৈচিত্র্য বাড়িয়াছে, দানের আধিক্য করিলে, এখন অনেক বাঞ্ছনীয় সুখে বঞ্চিত হইতে হয়। সুতরাং স্ত্রীলোকে (এবং পুরুষ) আর তত দানশালিনী নহে।

হিন্দুদিগের একটি প্রধান ধর্ম্ম অতিথি সৎকার। যে গৃহে আসে, তাহাকে আহারাদির দ্বারা পরিতুষ্ট করণ পক্ষে এতদ্দেশীয় লোকের তুল্য কোন জাতি ছিল না। প্রাচীনাগণ এই গুণে বিশেষ গুণশালিনী ছিলেন। নবীনাদিগের মধ্যে সে ধর্ম্ম একেবারে বিলুপ্ত হইতেছে। গৃহে অতিথি অভ্যাগত আসিলে, প্রাচীনারা কৃতার্থ হইতেন, নবীনাগণ বিরক্ত হয়েন। লোককে আহার করান, প্রাচীনাদিগের প্রধান সুখ ছিল, নবীনাগণ ইহাকে ঘোরতর বিপদ্ মনে করেন।

ধর্ম্মে যে নবীনাগণ প্রাচীনাদিগের অপেক্ষা নিকৃষ্ট, তাহার একটি বিশেষ কারণ অসম্পূর্ণ শিক্ষা। লেখা পড়া বা অন্য প্রকারের শিক্ষা তাঁহারা যাহা কিঞ্চিৎ প্রাপ্ত হয়েন, তাহাতেই বুঝিতে পারেন যে প্রাচীন ধর্ম্মের শাসন অমূলক। অতএব

তাহাতে বিশ্বাস হারাইয়া, ধর্ম্মের যে বন্ধন ছিল, তাহা হইতে বিমুক্ত হয়েন। তাহার স্থানে আর নূতন বন্ধন কিছুই গ্রন্থি বদ্ধ হইতেছে না। আমরা লেখা পড়ার নিন্দা করিতেছি না। ধর্ম্ম ভিন্ন বিদ্যার অপেক্ষা মূল্যবান্ বস্তু যে পৃথিবীতে কিছুই নাই, ইহা আমরা ভুলিয়া যাইতেছি না। তবে বিদ্যার ফল ইহা সর্ব্বত্র ঘটিয়াথাকে, যে তাহাতে চক্ষু ফুটে, মিথ্যাকে মিথ্যা বলিয়া বোধ হয়, সত্যকে সত্য বলিয়া জানা যায়। বিদ্যার ফলে লোকে, প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্র ঘটিত ধর্ম্মের মূলের অলীকত্ব দেখিতে পায় ; প্রাকৃতিক যে সত্য ধর্ম্ম, তাহা সত্য বলিয়া চিনিতে পারে। অতএব বিদ্যায় ধর্ম্মের ক্ষতি নাই, বরং বৃদ্ধি আছে। সচরাচর পণ্ডিতে ধর্ম্মিষ্ঠ, মূর্খে পাপিষ্ঠই হয়। কিন্তু অল্প বিদ্যার দোষ এই যে, ধর্ম্মের মিথ্যা মূল তদ্দ্বারা উচ্ছেদ হয় ; অথচ সত্য ধর্ম্মের প্রাকৃতিক মূল সংস্থাপিত হয় না। সেটুকু কিছু অধিক জ্ঞানের ফল। পরোপকার করিতে হইবে, এটি যথার্থ ধর্ম্মনীতি বটে। মূর্খেও ইহা জানে, এবং মূর্খদিগের মধ্যে ধর্ম্মে যাহাদের মতি আছে, তাহারাও ইহার বশবর্ত্তী হয়। তাহার কারণ এই যে এই নৈতিক আজ্ঞা প্রচলিত ধর্ম্মশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে ; মূর্খের তাহাতে দৈবাজ্ঞা বলিয়া বিশ্বাস আছে। দৈববিধি লঙ্ঘন করিলে ইহলোকে ও পরলোকে ক্ষতি প্রাপ্ত হইতে হইবে বলিয়া, মূর্খ সে নীতির বশবর্ত্তী। পণ্ডিতও সে নীতির বশবর্ত্তী, কিন্তু তিনি ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত বলিয়া তদুক্তির অনুসরণ করেন না। তিনি জানেন যে ধর্ম্মের কতকগুলি প্রাকৃতিক নিয়ম আছে তাহা অবশ্য পালনীয় ; এবং পরোপকার বিধি সেই সকল নিয়মের ফল। অতএব এস্থলে ধর্ম্মের ক্ষতি হইল না। কিন্তু যদি কেহ ঈদৃশ পরিমাণে মাত্র বিদ্যার আলোচনা করে যে তদ্দ্বারা প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রে বিশ্বাস বিনষ্ট হয়, অথচ যতদূর বিদ্যার আলোচনায় প্রাকৃতিক ধর্ম্মে বিশ্বাস জন্মে, তত দূর না যায়, তবে তাহার পক্ষে ধর্ম্মের কোন মূল থাকে না। লোকনিন্দা ভয়ই তাহাদিগের একমাত্র ধর্ম্ম বন্ধন হইয়া উঠে। সে বন্ধন অতি দুর্ব্বল। আধুনিক অল্প শিক্ষিত যুবক যুবতীগণ, কিয়দংশে এই অবস্থাপন্ন ; এজন্য ধর্ম্মাংশে তাঁহারা প্রাচীনাদিগের সমকক্ষ নহেন। যাঁহারা স্ত্রীশিক্ষায় ব্যতিব্যস্ত, তাহাদিগের আমরা জিজ্ঞাসা করি যে, আপনারা বালিকাদিগের হৃদয় হইতে প্রাচীন ধর্ম্ম-বন্ধন বিযুক্ত করিতেছেন, তাহার পরিবর্ত্তে কি সংস্থাপন করিতেছেন ?

এ কথার তাৎপর্য্য এরূপ নহে, যে স্ত্রীশিক্ষা ভাল নহে। আমাদিগের বক্তব্য এই যে স্ত্রীগণকে যে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, তাহার উৎকর্ষ সাধন নিতান্ত প্রয়োজনীয়। আঙ্গুল ফুলিয়া কলাগাছ হয় না বটে ; প্রথম উদ্যমের ফল সামান্য হইবে ; তথাপি এবিষয়ে সমাজের যত্ন আরও তীব্রতর হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট বিশেষ নিন্দার ভাগী। স্ত্রীশিক্ষায় রাজপুরুষগণের নিতান্ত অমনোযোগ ; স্ত্রীশিক্ষায় অতি অল্প ব্যয় হইয়া থাকে। স্ত্রী পুরুষ সংখ্যায় সমান ;

বিদ্যায় উভয়েরই অধিকার সমান ; বালক শিক্ষায় যত টাকা রাজকোষ হইতে ব্যয় হয়, বালিকা শিক্ষায় তত না হইবে কেন ? বালিকারা পড়ে না, বিবাহ হইলেই তাহারা অন্তঃপুর মধ্যে নিরুদ্ধ হয়, ইত্যাদি কথা অবলম্বন করিয়া যাঁহারা স্ত্রী শিক্ষায় অর্থব্যয়ে নিরুৎসাহী, তাঁহারা অল্প বুঝেন। বহুলতর অর্থব্যয় করিলে এ সকল আপত্তি নিরাস করা যায়। স্ত্রীলোকদিগের পক্ষ সমর্থন জন্য একখানি সাময়িকপত্র নাই, ইহা দুঃখের বিষয়। তাহা হইলে এ সকল বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার দেখিতে পাইতাম।

নবীনা-সম্প্রদায় সম্বন্ধে কতকগুলি গুরুতর কথা বলিতে আমাদের বাকি রহিল। বারান্তরে বলিব। বঙ্গসুন্দরীগণ আমাদের উপর রাগ করিবেন না ; এবার কিছু যদি নিন্দা করিয়া থাকি, বারান্তরে প্রশংসা করিব। তাঁহাদের যতই দোষ নির্দ্দেশ করি না কেন, তাঁহারা যে বঙ্গীয় যুবকগণ অপেক্ষা অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ, ইহা আমরা শতমুখে স্বীকার করি। এখন যে বঙ্গদেশে ধর্ম্মের নাম শুনা যায়, আমাদের বিবেচনায় তাহার এক কারণ এই বঙ্গীয় যুবতীগণ।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা

নিদান। অর্থাৎ শ্রীযুক্ত মাধব কর প্রণীত সংস্কৃত রোগ নিশ্চয় নামা গ্রন্থ। শ্রীউদয় চাঁদ দত্ত কর্ত্তৃক অনুবাদিত। কলিকাতা। গণেশ যন্ত্র।

আমরা সর্ব্বদাই মনে করি যে এক্ষণকার ইউরোপীয় বিদ্যায় সুশিক্ষিত বাঙ্গালি চিকিৎসকেরা যদি আমাদিগের প্রাচীন চিকিৎসা শাস্ত্রের অনুশীলন করেন, তবে কিছু উপকার হইতে পারে। প্রথম উপকার, প্রাচীন ভারতবর্ষীয়দিগের বিজ্ঞান পারদর্শিতার কিছু পরিচয় পাওয়া যায়—প্রাচীন ভারতের সভ্যতার ইতিহাসের এক পরিচ্ছেদ প্রচারিত হয়। দ্বিতীয় উপকার, প্রাচীন চিকিৎসা শাস্ত্র হইতে আধুনিক চিকিৎসা শাস্ত্রের কোন লাভ হইবার সম্ভাবনা নাই কি? বলিতে পারি না; আমরা বিশেষজ্ঞ নহি। তবে দেখিতেছি, দেশী চিকিৎসা অদ্যাপি বিলাতী চিকিৎসার প্রতিযোগিনী হইয়া, প্রচলিত আছে—বিলাতী চিকিৎসার প্রচার সত্বেও দেশী চিকিৎসার মান আজিও বজায় আছে—কোন গুণ না থাকিলে কি এরূপ ঘটিত? দেশী ভূতত্ত্ব, দেশী জ্যোতিষ, দেশী গণিত, সকল প্রকারের দেশী বিজ্ঞান, দেশী প্রাচীনভাষা পর্য্যন্ত, বিলাতী বিজ্ঞান, বিলাতী ভাষার কাছে দাঁড়াইতে পারিতেছে না, কেবল দেশী ন্যায়-মীমাংসা শাস্ত্র এবং দেশী চিকিৎসা শাস্ত্র অদ্যাপি প্রবল। কোন গুণ না থাকিলে কি এরূপ ঘটিতে পারে?

সে যাহাই হউক, উদয় চাঁদ বাবুর এই উদ্যম প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। ভরসা করি অন্য চিকিৎসকেও এই পথে গমন করিবেন। আমরা যতদূর দেখিয়াছি,—অনুবাদ উত্তম হইয়াছে। নিদান লিখিত রোগ সকলের ইংরেজি নাম, টীকায়, সন্নিবেশিত হওয়াতে আরও ভাল হইয়াছে। "নিদান" নাম শুনিলেই অনেকে ইহা দেখিতে ইচ্ছুক হইবেন সন্দেহ নাই। ইহার মূল্যও অল্প—১৲টাকা মাত্র; এবং গ্রন্থ বুঝিবার কোন কষ্ট নাই।

প্রমোদিনী। প্রথম খণ্ড। পাকুড় প্রমোদিনী সভা হইতে প্রকাশিত সন ১২৮০।

এখানি সাময়িক পত্র। বৎসরে তিনবার প্রকাশ হইবে। আমরা শুনিয়াছি যে যাঁহারা ইহা প্রচার করিতেছেন, তাঁহারা তরুণ বয়স্ক। সুতরাং, অন্য হইলে যে প্রণালীতে ইহার সমালোচনা করিতাম তাহা করিলাম না। পরামর্শ স্বরূপ দুই একটি কথা বলিব।

১ম। ৭২ পৃষ্ঠা পদ্য কেন ? এ প্রকারের পদ্য ৭২ পৃষ্ঠা পাঠ করা, সুখদায়ক নহে।

২য়। গদ্য প্রবন্ধ তিনটী। দুইটী উপন্যাস এবং তৃতীয়টি হুতোমী নক্সা। এখন এ সকলের কিছু বাড়াবাড়ি হইতেছে। ইহার বৃদ্ধি দেখিয়া আমরা সুখী নহি। ভাল হইলে ক্ষতি নাই—কিন্তু মধ্যশ্রেণী গল্প ও নক্সায় বিশেষ লাভ নাই।

৩য়। গদ্যের মধ্যে “কল্পনা মুকুর” নামক প্রবন্ধের ভাষাটী কথঞ্চিৎ ভাল। “পাগলের প্রলাপ” হুতোমী—সুতরাং তাহার ভাষায় ভাল কিছু নাই। “বিচিত্র অঙ্গীকার” নামক প্রবন্ধের ভাষা সংস্কৃত বহুল এবং অপ্রশংসনীয়। ইহা আদ্যোপান্ত অনর্থক শব্দাড়ম্বরে পরিপূর্ণ। লেখক কি কাদম্বরীর অনুকরণে চেষ্টা পাইয়াছেন ? সে প্রবৃত্তি ভাল নহে। আমরা ইতর লোকের ভাষায় গ্রন্থ লিখিতে বলি না। যে ভাষা সরল, অথচ বিশুদ্ধ, তাহাই বাঞ্ছনীয়।

৪র্থ। লেখকদিগের অলঙ্কার প্রিয়তা আমাদিগের বড় ভাল লাগে নাই। তাঁহাদিগের উৎসর্গ পত্র পাঠ করিয়া দেখিবেন আমরা সত্য বলিতেছি কিনা—

“শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ পাঁড়ে মহাশয়ের স্নেহরসার্দ্র নাম এই প্রমোদিনীর কুন্তলে, হীরক স্বরূপ প্রদান করিয়া তাঁহার শ্রীচরণে উপহার প্রদান করিলাম।”

কি উপহার প্রদান করিলেন ? পুস্তক ? সে কথা ত ব্যক্ত হয় নাই। যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে বুঝাইতেছে, যে পাঁড়ে বাবুর নামই উপহার প্রদত্ত হইল। “তাঁহার শ্রীচরণে” কাহার শ্রীচরণে ? বুঝায় যেন, প্রমোদিনীর শ্রীচরণে, লেখকদিগের অভিপ্রায়, লক্ষ্মীনারায়ণ বাবুর শ্রীচরণে। কিন্তু লক্ষ্মীনারায়ণ বাবুর শ্রীচরণে, লক্ষ্মীনারায়ণ বাবুর নাম কিরূপ উপহার ? নামটি “স্নেহরসার্দ্র”—নাম আর্দ্র হয় কি প্রকারে ? কোন লোক লক্ষ্মীনারায়ণ বাবুর নাম শুনিয়া “স্নেহরসার্দ্র” হইতে পারে, তাহা হইলে শ্রোতার মন “স্নেহরসার্দ্র” ; নামটি “স্নেহরসার্দ্র” নহে। আবার যাহা “আর্দ্র” তাহাকেই সেইখানে হীরকের সহিত তুলনা করা, উৎকৃষ্টালঙ্কার নহে। আমাদের বিবেচনায়, এত গণ্ডগোল না করিয়া অমুকের শ্রীচরণে প্রমোদিনী উপহার প্রদত্ত হইল, এই সরল কথা লিখিলেই ভাল হইত।

৫ম। পাকুড় হইতে এরূপ একখানি সাময়িক পত্র প্রচারারম্ভ হইয়াছে, ইহাতে প্রচারকদিগের উৎসাহ এবং বিদ্যানুশীলন প্রবৃত্তির বিশেষ প্রশংসা করিতে

হয়। আমরা তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ করিতেছি। দ্বিতীয় সংখ্যা প্রথমাপেক্ষা উৎকৃষ্ট হউক, এই বাসনায় আমরা কিঞ্চিৎ কর্কশ পরামর্শ দিলাম।

কাব্য পেটিকা, রসকাদম্বিনী, অর্থনীতি ও অর্থব্যবহার, চন্দ্রনাথ, উদাসিনী প্রভৃতি অনেকগুলিন গ্রন্থ আমাদিগের নিকট রহিয়াছে; স্থানাভাবে সমালোচনা হইতেছে না। গ্রন্থকারদিগের নিকট আমরা নিতান্ত লজ্জিত আছি। নিতান্ত ভরসা আছে, আগামী মাসে ঐ সকল গ্রন্থের সমালোচনা করিব।

তৃতীয় বর্ষ : দ্বিতীয় সংখ্যা

ভারতবর্ষীয় আর্য্যজাতির আদিম অবস্থা

উপক্রমণিকা

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

কোষাগার বিষয়

রাজা কাহাকেও রাজকর হইতে মুক্তি দিবেন না এইটী সামান্য নিয়ম। বিশেষ বিশেষ নিয়ম দ্বারা বিশেষ বিশেষ স্থলে অনেকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে করভার হইতে মুক্ত ছিলেন। কোন কোন স্থলে কোন কোন ব্যক্তি একেবারেই কর ভার হইতে নির্ম্মুক্ত ছিলেন। কোষাধ্যক্ষ মন্ত্রী মধ্যে গণ্য।

ব্রাহ্মণগণ তপস্যাদি যে সমস্ত সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা পুণ্য সঞ্চয় করেন রাজা উহার ষষ্ঠাংশের ফলভাগী। এই কারণে বেদবিৎ ব্রাহ্মণকে রাজকর দিতে হইত না। বরং রাজা নিজে ক্লেশ পাইতেন তথাপি ব্রাহ্মণের অন্নসংস্থানের পক্ষে অযত্নবান্ হইতেন না। অন্ধ, জড়, মূক, কুব্জ, আতুর সপ্ততিবর্ষীয় মনুষ্য স্থবির ব্যক্তি, অনাথা স্ত্রী, অপোগণ্ড বালক, ভিক্ষুক ও সংসারাশ্রমত্যাগী প্রভৃতি জনগণ রাজকর হইতে মুক্ত ছিলেন। (১)

বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ যদি কোন স্থলে মৃত্তিকাভ্যন্তরে নিহিত নিধির সন্ধান পান, উহা রাজদ্বারে বিজ্ঞাপন করিয়াই আত্মসাত্ করিতে পারেন। বিদ্বান্ ব্রাহ্মণের দৃষ্ট নিহিত নিধির বিষয়ে রাজার কিঞ্চিৎ মাত্র অধিকার দেখা যায় না। রাজা যদি স্বয়ং কোন গুপ্ত নিধির সন্ধান পাইতেন তবে তাহার অর্দ্ধাংশ বিদ্বান্ ভূদেব-

---

(১) মনু।

ম্রিয়মাণোঽপ্যাদদীত ন রাজা শ্রোত্রিয়াৎ করং।
নচ ক্ষুধাঽস্য সংসীদেচ্ছ্রোত্রিয়ো বিষয়ে বসন্। ১৩৩—অ ৭
অন্ধোজড়ঃ পীঠসর্পীসপ্তত্যা স্থবিরশ্চ যঃ।
শ্রোত্রিয়েষূপকুর্বংশ্চ ন দাপ্যাঃ কেনচিৎ করং। ৩৯৪—অ ৮

বর্গমধ্যে বিতরণ পূর্ব্বক অবশিষ্ট আত্মসাৎ করিতে সক্ষম ছিলেন। অর্দ্ধেক ব্রাহ্মণসাৎ না করিলে পাপের ভাগী হইতেন।

রাজা অথবা অন্য কোন রাজপুরুষ কর্ত্তৃক যদি কোন গুপ্ত নিধির আবিষ্কার হয় এবং পশ্চাৎ যদি কোন ব্যক্তি আসিয়া এই বস্তু আমার বলিয়া সত্যতা পূর্ব্বক প্রার্থনা করে তবে রাজা ঐ ধনের ষষ্ঠাংশ মাত্র গ্রহণ করিতে যোগ্য, অবশিষ্ট অংশ বাদ সমুত্থায়ী ব্যক্তির। কিন্তু পরে যদি জানা যায়, সে ব্যক্তি মিথ্যা করিয়া লইয়াছে, তবে তাহার দণ্ড বিধান পূর্ব্বক সমস্ত ধনই ব্রাহ্মণসাৎ করিতেন এরূপ স্থলে রাজা ষষ্ঠাংশের অধিক পাইতেন না।

অস্বামিক ধন প্রাপ্ত হইলে ঐ ধনের প্রকৃত উত্তরাধিকারী নির্দ্ধারণ নিমিত্ত তিন বর্ষ পর্য্যন্ত কাল দেওয়া যাইত। ইংরেজি নিয়ম ছয় মাস, কিন্তু প্রাচীন নিয়মটিই উৎকৃষ্ট বলিয়া বোধ হয়। ঐকাল মধ্যে সর্ব্বদা সর্ব্বস্থলে অস্বামিক ধনের উত্তরাধিকারীর অন্বেষণ জন্য ঘোষণা প্রচার করা রীতি ছিল। তিন বর্ষ মধ্যে প্রকৃত স্বামী অথবা প্রকৃত উত্তরাধিকারী উপস্থিত না হইলে তখন ঐ ধন রাজকোষ পরিভুক্ত হইত। ইতিপূর্ব্বে উহা স্থাপিত ধনের ন্যায় বিবেচ্য থাকিত। তিন বৎসর মধ্যে অস্বামিক ধনের প্রার্থীর স্থিরতা হইলে ঐ অস্বামিক ধনের প্রত্যর্পণ কালে তাহার প্রমাণ প্রয়োগ গ্রহণাদি দ্বারা তদীয় ধন বলিয়া প্রতীতি হইলে তাহাকে সমর্পিত হইত। প্রনষ্ট ধনের উদ্ধার কালে প্রনষ্টাধিগত ধনস্বামী রাজাকে স্থল ও বস্তু বিবেচনায় কোথাও বা ষষ্ঠাংশ কোথাও বা দশমাংশ কোথাও বা দ্বাদশাংশ ঐ বস্তুর রক্ষণ প্রত্যর্পণ ও অধিকারী নির্ণয়রূপ রাজধর্ম্মের রাজকরস্বরূপ দিতেন। রাজা কোন স্থলেই ষষ্ঠাংশের অধিক লইতেন না। প্রবঞ্চক উক্ত নিধির অষ্টমাংশ তুল্য দণ্ডভোগ করিত স্থল বিশেষে দ্রব্য বিবেচনায় দণ্ডের ন্যূনতা ছিল।

যে সকল ব্যক্তির ক্ষেত্রের সঙ্গে সংস্রব ছিল না অথচ অরণ্যের দ্রুম, মৃগয়ালব্ধ মাংস, বন হইতে আহৃত মধু, গোষ্ঠোৎপন্ন ঘৃত, সর্ব্বপ্রকার গন্ধদ্রব্য, ওষধি বৃক্ষাদির রস পত্র, শাক, ফল, মূল, পুষ্প ও তৃণ, বেণুনির্ম্মিত পাত্র, চর্ম্ম বিনির্ম্মিত পাত্র, মৃন্ময় পাত্র এবং সর্ব্বপ্রকার পাষাণময় দ্রব্য বিক্রয় দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত তাহারাও রাজাকে কর দিত। ইহাদিগের নিকট হইতে রাজা তত্তৎদ্রব্যোৎপন্ন লাভাংশের ষষ্ঠভাগ গ্রহণ করিতেন। ইহাই প্রাচীন লাইসেন্স টেক্স।

যে ব্যক্তি বাণিজ্য কার্য্যে পটু, সর্ব্বপ্রকার বস্তুর অর্ঘ সংস্থাপনে সমর্থ, শুল্ক গ্রহণ সময়ে অগ্রে তদীয় সহায়তায় পণ্য দ্রব্যের মূল্য নির্দ্ধারণ হইত। সেই দ্রব্য বিক্রয় দ্বারা যে পরিমাণে লাভ সম্ভাবনা জ্ঞান হইত, তাহারই বিংশতি ভাগের এক

ভাগ শুল্কস্বরূপ রাজকর আদায় করা পদ্ধতি ছিল। সর্ব্ব বস্তুতেও কদাচ তদপেক্ষা অধিক গ্রহণ করিতেন না।

যাহারা পশুপাল অথবা মণিমাণিক্যাদি বস্তু বিক্রয় দ্বারা আত্ম পরিবারের ভরণপোষণ পূর্ব্বক সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করে, সে প্রকার জনগণের সমীপে তত্তৎদ্রব্যোৎপন্ন লাভাংশের পঞ্চাশত ভাগের একভাগ রাজার প্রাপ্য। তাহাই রাজকরস্বরূপ। (২)

ক্ষেত্র বিশেষে ফল বিশেষে কৃষকের পরিশ্রম বিবেচনায় ক্ষেত্রস্বামীর ব্যয় অনুসারে লভ্যের পরিমাণ বিবেচনায়, ধান্যাদি শস্যের প্রতি কোথাও লাভের ষষ্ঠাংশ কোথাও বা দ্বাদশ ভাগের এক ভাগ রাজাকে রাজস্ব স্বরূপ প্রদত্ত হইত। রাজা ষষ্ঠাংশের অধিক গ্রহণ করিতে সক্ষম ছিলেন না।

কোন গ্রামেই সমস্ত ভূমি প্রজা বিলি হইত না। যথায় কিঞ্চিন্মাত্র ভূমিও পতিত থাকিবার সম্ভাবনা থাকিত না তথায় অগ্রে গোচারণ নিমিত্ত উর্ব্বর ভূমি বাদ রাখিয়া প্রজা পত্তন হইত। ঐ গোচারণ ভূমির চতুঃসীমায় যাহাদিগের ক্ষেত্র থাকিত তাহারা স্ব স্ব ক্ষেত্রের পার্শ্বে বৃতি সংস্থাপনপূর্ব্বক ক্ষেত্রকার্য্য সম্পাদন করিত। গোচারণ ভূমি চতুঃসীমার প্রত্যেক সীমা শতধনু পরিমিত রাখিবার রীতি।

---

(২) বিদ্বাংস্তু ব্রাহ্মণো দৃষ্ট্বা পূর্ব্বোপনিহিতং নিধিং।
অশেষতোঽপ্যাদদীত সর্ব্বস্যাধিপতির্হি সঃ। ৩৭—অ ৮
যন্তু পশ্যেন্নিধিং রাজা পুরাণং নিহিতং ক্ষিতৌ।
তস্মাদ্দ্বিজেভ্যো দত্ত্বার্দ্ধমর্দ্ধং কোষে প্রবেশয়েৎ। ৩৮
আদদীতাথ ষড্ভাগং প্রনষ্টাধিগতান্নৃপঃ।
দশমং দ্বাদশং বাপি সতাং ধর্ম্মমনুস্মরন্। ৩৩—ঐ
মমায়মিতি যোব্রূয়ান্নিধিং সত্যেন মানবঃ।
তস্যাদদীত ষড্ভাগং রাজা দ্বাদশমেববা। ৩৫—ঐ
প্রনষ্ট স্বামিকং রিক্থং রাজা ত্র্যব্দং নিধাপয়েৎ।
অর্ব্বাক্ত্র্যব্দাদ্ধরেৎ স্বামী পরেণ নৃপতির্হরেৎ। ৩০
আদদীতাথ ষড্ভাগং দ্রুমাংস মধুসর্পিষাং।
গন্ধৌষধিরসানাঞ্চ পুষ্পমূলফলস্য চ। ১৩১—অ ৭
পত্রশাক তৃণানাঞ্চ বৈদলস্যচ চর্ম্মণাম্।
মৃণ্ময়ানাঞ্চ ভাণ্ডানাং সর্ব্বস্যাশ্মময়স্যচ। ১৩২—ঐ
শুল্ক স্থানেষু কুশলাঃ সর্ব্বপণ্য বিচক্ষণাঃ।
কুর্য্যুরর্ঘং যথাপণ্যং ততো বিংশং নৃপোহরেৎ। ৩৯৮—অ ৮
পঞ্চাশদ্ভাগ আদেয়ো রাজ্ঞা পশু হিরণ্যয়োঃ
ধান্যানামষ্টমো ভাগঃ ষষ্ঠো দ্বাদশ এব বা। ১৩০—অ ৭

ক্ষুদ্র গ্রাম হইলেও এতদপেক্ষা অল্প রাখিবার প্রথা ছিল না। গণ্ডগ্রাম বা নগরের পক্ষে তিনগুণ অধিক পরিমিত ভূমিখণ্ড গোচারণ নিমিত্ত পরিত্যক্ত হইত। চারি হস্তে এক ধনু হয়।

ব্যক্তি বিশেষের প্রতি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কর গ্রহণ করা রীতি ছিল না বটে, কিন্তু কোন না কোনরূপে সে ব্যক্তি অবশ্য দেয় রাজস্বের নিষ্ক্রয় স্বরূপ আত্ম পরিশ্রম দ্বারা তৎসাধ্য রাজকীয় কার্য্য সমাধা করিত। তদ্দ্বারা রাজার সাংসারিক কার্য্যের ব্যয়ের অনেক লাঘব হইয়া আসিত। এ পদ্ধতি অদ্যাপি অনেক স্থলে প্রচলিত আছে। সে প্রকার কার্য্যে কাহারা ব্রতী ছিল তাহা দেখিতে গেলে ইহাই জানা যায় যে সূপকার, কাংস্যকার, শঙ্খকার, মালাকার, কুম্ভকার, কর্ম্মকার, সূত্রধর, চিত্রকর, স্বর্ণকার, লেখক, কারুক, তৈলিক, মোদক, নাপিত, তন্তুবায় প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গ যাহারা শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা অর্জ্জন করে তাহাদিগকে রাজা প্রতিমাসে এক এক দিন বিনা বেতনে আপন কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন। উহাদিগের পরিশ্রমের মূল্যকেই রাজস্ব স্বরূপ জ্ঞান করিতে হইবে।

বাস্তুবাটীর উপর বার্ষিক কর গ্রহণ করিতেন। ইহারা স্থল বিশেষে ব্যক্তি বিশেষকে করভার হইতে নিষ্কৃতি দিয়াছেন বটে কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে পরম্পরা সম্বন্ধে কেহই করভার হইতে মুক্ত নন। ব্রাহ্মণগণ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে রাজস্ব দিতেন না বটে কিন্তু ইহারা সকল কার্য্যের অগ্রে রাজপূজা করিতেন। ঐ রাজপূজাই কর স্বরূপ। আরও দেখা যায় ইহারা পিতৃযজ্ঞের অনুষ্ঠান কালে অগ্রে ভূস্বামীর পূজা করিয়া থাকেন। তৎপরে স্বীয় অভীষ্ট পিতৃদেবের অর্চ্চনা করেন। (৩)

যদি কেহ বলেন ভূস্বামীর উদ্দেশে ব্রাহ্মণগণ যে দান করেন তাহা ভূপতিকে দেওয়া হয় না। তাহার মীমাংসা স্থলে শাস্ত্রকারেরা কহিয়াছেন, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণে যাহা দান করা যায়, তাহাতেই রাজা পরিতুষ্ট হন। বিশেষতঃ ইহা এক প্রকার স্থির সিদ্ধান্ত যে সমুদ্রে পাদ্য অর্ঘ দেওয়া অপেক্ষা, যথায় দিলে উপকার হয় তথায়

---

(৩) মনু।
ধনুঃশতং পরিহারো গ্রামস্যস্যাৎ সমন্ততঃ।
শম্যাপাতাস্ত্রয়োবাপি ত্রিগুণো নগরস্যতু॥ ২৩৭—অ ৮
সাংবৎসরিকমাপ্তৈশ্চ রাষ্ট্রাদাহারয়েদ্বলিং।
স্যাচ্চাম্নায়পরো লোকে বর্ত্তেত পিতৃবন্নৃষু॥ ৮০—অ ৭
যৎকিঞ্চিদপি বর্ষস্য দাপয়েৎ করসংজ্ঞিতং।
ব্যবহারেণ জীবন্তং রাজা রাষ্ট্রে পৃথগ্জনং॥ ১৩৭—ঐ
কারুকান্ শিল্পিনশ্চৈব শূদ্রাংশ্চাত্মোপজীবিনঃ।
একৈকং কারয়েৎকর্ম্ম মাসি মাসি মহীপতিঃ॥ ৩৮—ঐ

দেওয়া উচিত। সুতরাং আঢ্যের অল্পপরিমিত বস্তু রাজসমীপে বস্তুমধ্যে গণ্য হইতে পারে না কিন্তু নিঃস্ব ব্রাহ্মণের নিকট উহা উপাদেয় বস্তুমধ্যে পরিগণিত হইতে পারে, তদ্দ্বারা তাঁহার তৃপ্তি সম্পাদন হয়। ভূপতি কেবল এই দেখিবেন প্রজাগণ তাঁহার প্রতি অনুরক্ত কি বিরক্ত। যখন পিতৃযজ্ঞ কালেও ভূস্বামীকে স্মরণ করা রীতি, তখন অবশ্য বলিতে হইবে ইঁহারা পরম্পরা সম্বন্ধে রাজকর দিয়া আত্মনিষ্কৃতি সম্পাদন করেন।

রাজা জলৌকা সদৃশ ব্যবহার অবলম্বন করিয়া অল্পে অল্পে করগ্রহণ করেন, কেহই অধিক করভারাক্রান্ত হইলাম মনে করেন না। রাজা যে কেবল করগ্রহণের অধিকারী ছিলেন এমন নহে। তিনি প্রজার ধন, মান, প্রাণ ইত্যাদি সমুদায় বিষয় আত্মনিধি নির্ব্বিশেষে রক্ষা করিয়া প্রজাবর্গের নিকট পিতার তুল্য মান্য হইতেন। আচার ব্যবহার বিষয়েও তাঁহার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করা রীতি ছিল। রাজা প্রজাকে আত্মপুত্র সদৃশ জ্ঞান করিতেন।

অপ্রাপ্ত ব্যবহারাবস্থা।

রাজা কেবল আত্মরক্ষা করিয়াই নিষ্কৃতি পাইতেন না। তাঁহাকে মৃতপিতৃক শিশুজনের যাবদীয় বিষয়, ধন, মান, জাতি সম্ভ্রম, আচার ব্যবহার, বিদ্যাশিক্ষা প্রভৃতি তাবদ্বিষয়ের ভার গ্রহণ পূর্ব্বক তদীয় আশৈশবকাল পর্য্যন্ত সমুদায় স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া আত্মধন নির্ব্বিশেষে রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইত। মৃতপিতৃক শিশু যাবৎ বয়ঃপ্রাপ্ত ও জ্ঞানবান্ না হয় তাবৎকাল নৃপতি উক্ত শিশুকে পুত্রনির্ব্বিশেষে বিদ্যাভ্যাস করাইবেন। মৃতপিতৃক তরুণ ব্যক্তি যে সময়ে আপন বিষয় বুঝিয়া লইতে সক্ষম হয় তখন রাজা সর্ব্বসমক্ষে তদীয় হস্তে যাবদীয় গচ্ছিত ধন বৃদ্ধিসমেত প্রত্যর্পণ করিতেন। অতএব আধুনিক “Court of ward” ইংরেজদিগের সৃষ্টি নহে। তবে ইংরেজেরা স্বার্থপর হইয়াই অপ্রাপ্ত ব্যবহার ভূস্বামীর তত্ত্বাবধারণ করেন, তাঁহাদিগের রাজস্বের ক্ষতি না হয়। ভারতবর্ষীয় রাজগণের সে উদ্দেশ্য নহে।

দ্বিজাতি সন্তান স্থলে সমাবর্ত্তন বিধি-পর্য্যন্ত রাজার অধীনে থাকিত। অন্য জাতির পক্ষে প্রাপ্ত বয়স পর্য্যন্ত সীমা। বেদ বেদাঙ্গের অভ্যাসে ফল জন্মিলে বিবাহের পূর্ব্বে গুরুর নিকট পাঠ সমাপ্তির বিদায় গ্রহণ স্বরূপ যজ্ঞাঙ্গ স্নান বিধিকে সমাবর্ত্তন কহা যায়। (৪)

অনাথ ভরণ।

অনাথাশ্রীজনের প্রতিও রাজার দৃষ্টি ছিল। আর্য্য ভূপতিগণ যৎকালে

---

(৪) মনু।

বালদায়াদিকং রিক্থং তাবদ্রাজানুপালয়েৎ

যাবৎ স স্যাৎ সমাবৃত্তো যাবচ্চাতীত শৈশবঃ।—২৭ অ ৮

ইন্দ্রিয় সুখকে তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন, যখন প্রজারঞ্জনকে পরম পুরুষার্থ জ্ঞান করিতেন, তখন ইহারা আত্ম অর্দ্ধাঙ্গস্বরূপ সহধর্ম্মিণীকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া প্রজার সুখবৃদ্ধি এবং আপনার কুলমর্য্যাদা রক্ষা ও নিজের সুযশের দিগে ধাবিত ছিলেন। অনাথা-স্ত্রীজাতিরাও রাজার শাসন হেতু দুশ্চরিত্র হইতে পারিত না। উদ্ধত যুবা পুরুষও অনায়াসে আত্মস্ত্রী বিসর্জ্জন দিতে সক্ষম হইত না। ইহার বিস্তার পরে প্রদর্শিত হইবে এক্ষণে প্রক্রান্ত বিষয় আরম্ভ করা গেল।

বন্ধ্যাত্ব নিবন্ধন বিরাগ হেতু যে স্ত্রীর স্বামী দারান্তর পরিগ্রহ করিয়া তদীয় গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহযোগ্য ধন দানানন্তর বন্ধ্যা বনিতাকে পৃথক্ করিয়া দিয়াছে সে স্ত্রী অনাথ শরণের অধিকারভুক্ত। যে স্ত্রীলোক অসন্দিষ্টপতিক ও পুত্রাদিরহিত, যে স্ত্রীজন প্রোষিত ভর্তৃক, যে বিধবার পিতৃকুল, মাতৃকুল, শ্বশুরকুলে অভিভাবক নাই, অথবা যে স্ত্রী রোগাদি হেতু বশতঃ কাতরা, কিম্বা সামর্থ্যবিহীনা কিন্তু ইহার সকলেই সাধ্বী, তাহাদিগের ধন, মান, আচার ব্যবহার ইত্যাদি যাবদীয় বিষয় ভূপতি মৃতপিতৃক বালকধনের ন্যায় রক্ষা করিবেন। ধর্ম্মশাস্ত্রের ইহাই নির্দেশ, ইহার অন্য আচরণ করিলে রাজা মহাপাতকীর মধ্যে গণ্য।

উন্মত্ত, জড়, মূক, অন্ধ, আতুরাদি ব্যক্তিবর্গ রাজার অবশ্য পোষ্যবর্গ মধ্যে পরিগণিত ছিল। সুতরাং তাহাদিগের বিষয়ে আর বিশেষ নিয়ম করিতে হয় নাই। তাহাদিগের মধ্যে যদি কাহারও ধন থাকিত উহা মৃতপিতৃক শিশু-ধনের সদৃশ জ্ঞানে তৎপুত্রাদি উত্তরাধিকারীর বয়ঃপ্রাপ্তিকাল পর্য্যন্ত রাজার অধীনে থাকিত। ইংরেজদিগের রাজ্যে এসকল নাই। কেবল যে তাঁহাদিগের রাজস্বের দায়ী, তাহারই বিষয়ের রক্ষণাবেক্ষণ কোর্ট অব ওয়ার্ডস্ হইতে হয়। যে রাজস্বের দায়ী নহে—সে মরুক বাঁচুক সে জন্য সরকারের কিছু আসিয়া যায় না আর্য্যগণ সেরূপ ভাবিতেন না। তাঁহারা প্রজার মঙ্গল কামনায় নানাবিধ সুনিয়ম সংস্থাপন করায় রাজা শব্দটী আর্য্যগণের কর্ণে অতি সুমধুর হইয়া আছে। আর্য্যগণ উপরি কথিত নিয়ম ক্রমেই রাজার প্রতি ভক্তিমন্ত আছেন। ইঁহারা কদাচ কোনকালে রাজভক্তি বিস্মৃত হন নাই। অদ্যাপি ইঁহাদিগের এমনি সংস্কার যে রাজদর্শনে পুণ্য সঞ্চয় হয়।

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরাদি যুগকে কাল বিশেষ জ্ঞান করেন না। আর্য্যগণ রাজাকেই কখন সত্য যুগ, কখন ত্রেতা, কখন দ্বাপর, কখন কলি যুগ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। (৫)

---

(৫) মনু।

বশাঽপুত্রাসু চৈবং স্যাদ্রক্ষণং নিষ্কুলাসু চ।

পতিব্রতাসু চ স্ত্রীষু বিধবাস্বাতুরাসু চ। ২৮—অ ৮

রাজা যখন অনলসভাবে কায়িক বাচিক ও মানসিক বৃত্তি পরিচালনপূর্ব্বক স্বয়ং সমস্ত বিষয় মীমাংসা পূর্ব্বক ধর্ম্মানুসারে স্বহস্তে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে থাকেন তখন তাঁহাকে সাক্ষাৎ সত্যযুগ কহা যায়। সত্য ত্রেতা দ্বাপরাদি যুগ আর কিছুই নহে। রাজার অবস্থা ও কার্য্য বিশেষ দ্বারা তাঁহাকে মূর্ত্তিমান্ যুগ স্বরূপ জ্ঞান করা গিয়া থাকে।

নৃপতি যখন আত্মকর্ত্তব্য বিষয়ের পরিসমাপ্তি বিধানে অভ্যস্ত কিন্তু শারীরিক ব্যাপার বিরহিত তখন তাঁহাকে ত্রেতাযুগ শব্দে অভিহিত করা যায়।

যখন কর্ত্তব্য কর্ম্মে ভূপতির মনোযোগ ও প্রক্রান্ত বিষয়টিও অন্তঃকরণে জাগরূক আছে সত্য, পরন্তু কায়িক ও বাচিক ব্যাপার বিষয়ে তদীয় উৎসাহের অভাব দেখা যায় তখন ঐ অবস্থায় ভূপতিকে দ্বাপরযুগের স্বরূপ জ্ঞান করা যায়।

রাজা যখন কোন কার্য্য দেখেন না। নিদ্রাদি আলস্যে কালহরণ করেন তদীয় রাজকার্য্য অন্যদীয় সাহায্য ব্যতীত সম্পন্ন হয় না তখন তাঁহাকে তদবস্থায় সাক্ষাৎ কলিযুগ কহা যায়। (৬)

এই প্রথা অনুসারেই আর্য্যগণের মধ্যে যাঁহারা আলস্যাদি পরতন্ত্র হইতেন তাঁহাদিগকে আর্য্যেরা পাপাত্মা অথবা সাক্ষাৎ কলি বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন।

সত্য ত্রেতা দ্বাপর ও কলিযুগ শব্দের তাৎপর্য্য কি? সত্যযুগে লোক সকল সত্বগুণের কার্য্যে আসক্ত থাকিত। ধর্ম্ম কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা সত্বগুণের লক্ষণ অনুমান করা যায়। ত্রেতাযুগে রজোগুণ প্রবেশ করিল। তখন অর্থ চিন্তা জন্য ধর্ম্ম একপাদ অন্তরে গেলেন। রজোগুণের সহায়তায় ত্রেতাযুগে লোকের অন্তঃকরণে একপাদ অধর্ম্ম স্থান প্রাপ্ত হইলেন। দ্বাপরে তমোগুণ আসিলেন তৎসাহায্যে লোকের মনে কাম প্রবৃত্তি জন্মিল, তখন ধর্ম্ম দ্বিপাদ অন্তরে থাকিলেন।

কৃতং ত্রেতা যুগঞ্চৈব দ্বাপরং কলিরেবচ।
রাজ্ঞোবৃত্তানি সর্ব্বাণি রাজাহি যুগমুচ্যতে। ৩০১—অ ৯

(৬) মনু।
কলিঃ প্রসুপ্তো ভবতি সজাগ্রদ্দ্বাপরং যুগং।
কর্ম্মস্বভ্যুদ্যতস্ত্রেতা বিচরংস্তু কৃতং যুগং। ৩০২—অ ৯
চতুষ্পাৎ সকলোধর্ম্মঃ সত্যঞ্চৈব কৃতে যুগে।
নাধর্ম্মেণাগমঃ কশ্চিন্মনুষ্যান্ প্রতিবর্ত্ততে। ৮১—অ ১
ইতরেষ্বাগমাদ্ধর্ম্মঃ পাদশস্ত্ববরোপিতঃ।
চৌরিকানৃতমায়াভির্ধর্ম্মশ্চাপৈতি পাদশঃ। ৮২—অ ১
তমসো লক্ষণং কামো রজসস্ত্বর্থ উচ্যতে।
সত্বস্য লক্ষণং ধর্ম্মঃ শ্রেষ্ঠ্যমেষাং যথোত্তরং। ১০০ অ ১২

কলিযুগে তমোগুণের প্রাধান্য হেতু ধর্ম্মকে ত্রিপাদ অন্তরে অপসৃত হইতে হইল। একারণেই রাজাকে যুগচতুষ্টয় স্বরূপ কহিয়াছেন।

আর্য্যগণ কোন্ জাতির পক্ষে কিরূপ কার্য্যকে পরম ধর্ম্ম করিয়াছেন তাঁহার নির্দ্ধারণে এই দেখা যায় যে ব্রাহ্মণের পক্ষে একমাত্র তপস্যাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। রাজ্যরক্ষাই ক্ষত্রিয়ের পক্ষে পরম ধর্ম্ম। বার্ত্তা গ্রহণই বৈশ্যের প্রধান ধর্ম্ম। শূদ্র জাতি এক মাত্র সেবা দ্বারা পরমার্থ পদ প্রাপ্ত হইতে পারে। জাতি ধর্ম্ম ক্রমশঃ দেখান যাইবে। (৭)

---

(৭) ব্রাহ্মণস্য তপোজ্ঞানং তপঃক্ষত্রস্য রক্ষণং।
বৈশ্যস্য তু. তপোবার্ত্তা তপঃ শূদ্রস্য সেবনং॥ ২২৯—অ ১১

কমলাকান্তের দপ্তর

অষ্টম সংখ্যা

স্ত্রীলোকের রূপ

অনেক ভামিনী রূপের গৌরবে পা মাটিতে দেন না। ভাবেন যেদিক্ দিয়া অঙ্গ দোলাইয়া চলিয়া যান, লাবণ্যের তরঙ্গে সেদিকের সংজ্ঞা ডুবিয়া যায়; নূতন জগতের সৃষ্টি হয়। তাঁহারা মনে করেন, তাঁহাদের রূপের ঝড় যেদিকে বয়, সেদিগে সকলের ধৈর্য্য-চালা উড়িয়া যায়, ধর্ম্ম-কোটা ভাঙ্গিয়া পড়ে যখন পুরুষের মন-চড়ায় তাঁহাদের রূপের বান ডাকে, তখন তাঁহাদের কর্ম্ম-জাহাজ, ধর্ম্ম-পান্সী, বুদ্ধি-ডিঙ্গি, সব ভাসিয়া যায়। কেবল সৌন্দর্য্যাভিমানিনী কামিনী কুলেরই এইরূপ প্রতীতি নহে পুরুষেরাও যখন মহিলাগণের মোহিনীশক্তির বশীভূত হইয়া তাহাদিগের রূপের মহিমা বর্ণনারম্ভ করেন, তখন যে তাঁহারাও কি বলেন ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়; তখন গগনের জ্যোতিষ্ক, পৃথিবীর পর্ব্বত, পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ লতা গুল্মাদি সকলকেই লইয়া উপমার জন্য টানাটানি পাড়ান্—আবার, অনেককেই অপমানিত করিয়া ফিরিয়া পাঠান। রূপসীর মুখমণ্ডলের সহিত তুলনা করিয়া তাঁহারা পূর্ণশশীকে নিমন্ত্রণ করিয়া, আবার মসীবৎ ম্লান বলিয়া ফেরত পাঠান; গরিব চাঁদ, আপনার কলঙ্ক আপনি বুকে করিয়া রাতারাতি আকাশের কাজ সারিয়া পলায়ন করে। সুন্দরীর ললাটের সিন্দূরবিন্দু দেখিয়া তাঁহারা ঊষার সীমন্ত শোভা তরুণ তপনের নিন্দা করেন; রাগে সূর্য্যদেব, পৃথিবী দগ্ধ করিয়া চলিয়া যান। রসময়ীর আস্যের হাস্যরাশি অবলোকন করিয়া প্রফুল্লকমলে সৌর-রশ্মির লাস্য বা বিকসিত কুমুদে কৌমুদীর নৃত্য তাঁহারা আর ভালবাসেন না; সেই অবধি কমল কুমুদে কীট পতঙ্গের অধিকার। কামিনীর কণ্ঠহার নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহারা নিশার তারকামালার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করেন; বোধ করি, ভবিষ্যতে জ্যোতিষের অনুশীলন ত্যাগ করিয়া, স্বর্ণকারের বিদ্যায় মন দিবেন। রঙ্গিণীর শরীর সঞ্চালনে তাঁহারা এত লাবণ্যলীলা বিলোকন করেন যে জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে মন্দ মন্দ আন্দোলিত বৃক্ষপত্রে বা নিয়ত কম্পিত সিন্ধু হিল্লোলে

চন্দ্রিকার খেলায় তাঁহাদিগের আর মন উঠে না। এইজন্যই বা, রাত্রে নিদ্রা যান এবং নদীকে কলসী কলসী করিয়া শুষিতে থাকেন। আবার যখন রমণীর নয়ন বর্ণন করেন, তখন সরোবরের মলয়মারুতে দোদুল্যমান নীলোৎপল দূরে থাকুক, বিশ্বমণ্ডলের কিছুই তাঁহাদিগের ভাল লাগে না।

এই নারীমূর্ত্তির স্তাবককুলের উপমানুভবশক্তির কিছু প্রশংসা করিতে হয়। এক চক্ষু, তাঁহাদিগের কল্পনাপ্রভাবে কখন পক্ষী, যথা খঞ্জন, চকোর; কখন মৎস্য, যথা, সফরী; কখন উদ্ভিদ, যথা, পদ্ম, পদ্মপলাশ, ইন্দীবর; কখন জড় পদার্থ, যথা, আকাশের তারা। এক চন্দ্র, কখনও রমণীর মুখমণ্ডল, কখনও তাহার পায়ের নখর।* উচ্চ কৈলাস শিখর এবং ক্ষুদ্র কোমল কোরক, একেরই উপমাস্থল; কিন্তু ইহাতেও কুলায় না বলিয়া দাড়িম্ব কদম্ব করিকুম্ভ এই বিষম উপমাশৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়াছে। জলচর ক্ষুদ্র পক্ষী হংস এবং স্থলচর প্রকাণ্ড চতুষ্পদ হস্তী, ইহাদিগের গমনে বৈষম্য থাকাই স্বাভাবিক উপলব্ধি; কিন্তু কবিদিগের চক্ষে উভয়েই রমণীকুল-চরণ বিন্যাসের অনুকারী। আবার যে সে হাতীর গমনের সহিত, এই হংসগামিনীদিগের গমন সাদৃশ্য নির্দ্দেশ করা বিধেয় নহে; যে হাতী হাতীর রাজা, সেই হাতীর সঙ্গেই গজেন্দ্রগামিনীগণের গতি তুলনীয়। শুনিয়াছি হাতী, এক দিন অনেক দূর যাইতে পারে; অশ্বাদি কোন পশু তত পারে না। যাহাদিগকে দূর যাইতে হয়, তাঁহারা এই গজেন্দ্রগামিনীদিগের পিঠে চড়িয়া যান না কেন? যেদিগে রেইলওয়ে হয় নাই, সে দিগে বাছিয়া বাছিয়া গজগামিনী মেয়ের ডাক বসাইলে কেমন হয়?

আমিও এককালে কামিনী ভক্ত কবিদলভুক্ত ছিলাম। আমি তখন এই অখিল সংসারে রমণীর ন্যায় সুন্দর বস্তু আর দেখিতে পাইতাম না। চম্পক, কমল, কুন্দ, বন্ধুজীব, শিরীশ, কদম্ব, গোলাপ প্রভৃতি পুষ্পচয় তখন কামিনীকান্তিগ্রথিত কুসুম মালিকার ন্যায় মনোহর বোধ হইত না। বলিতে কি, বসন্তের কুসুমবতী বসুমতী অপেক্ষাও আমি কুসুমময়ী মহিলাকে ভালবাসিতাম; বর্ষার উচ্ছ্বসিতসলিলা চিররঙ্গিণী তরঙ্গিণী অপেক্ষাও রসবতী যুবতীর পক্ষপাতী ছিলাম। কিন্তু এক্ষণে আর আমার সে ভাব নাই। আমার দিব্যজ্ঞান হইয়াছে। আমি মায়াময়ী মানবীমণ্ডলের কুহকজাল ছিন্ন করিয়া বাহির হইয়া পলায়ন করিয়াছি। জালিয়ার পচা জালে রাঘব বোয়াল পড়িলে, যেমন জাল ছিঁড়িয়া পলায়ন করে, আমি তেমনি পলায়ন করিয়াছি; ক্ষুদ্র মাকড়সার জালে যেমন গুবরে পোকা পড়িলে জাল

---

* আমার বিবেচনায় চন্দ্রের সহিত নখরের তুলনা অতি সুন্দর—কেননা উভয় পদবিন্যাস হইতে পারে—যথা নগর নিকর হিমকর করম্বিত কোকিল কূজিত কুঞ্জকুটীরে।—এটি আমার নিজের রচনা।—শ্রীভীষ্মদেব।

ছিঁড়িয়া পলায়ন করে, আমি তেমনি পলায়ন করিয়াছি ; দুরন্ত গোরু, একবার দড়ি ছিঁড়িতে পারিলে যেমন ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করে, আমি তেমনি দৌড় মারিয়া পলায়ন করিয়াছি। সকলই আফিমের প্রসাদে ! হে মাতঃ আফিম দেবি ! তোমার কৌটা অক্ষয় হৌক। তুমি বৎসর বৎসর সোনার জাহাজে চড়িয়া চীন দেশে পূজা খাইতে যাও ! জাপান, সাইবিরিয়া, ইউরোপ, আমেরিকা সকলই তোমার অধিকার ভুক্ত হৌক ; তোমার নামে দেশে দেশে দুর্গোৎসব হউক। কমলাকান্তকে পায়ে রাখিও। আমি তোমার কৃপায় সাধারণের উপকারার্থে নিজের মন খুলিয়া দুই চারিটি কথা বলিব।

কথা শুনিয়া কেবল স্ত্রীলোকে কেন, অনেক পুরুষেও আমাকে পাগল বলিবেন। বলুন। ক্ষতি নাই। নূতন কথা যে বলে, সেই পাগল বলিয়া গণ্য হয়। গালিলিও বলিলেন, পৃথিবী ঘুরিতেছে। ইতালীয় ভদ্রসমাজ, ধার্ম্মিক সমাজ, বিদ্বান্ সমাজ, শুনিয়া হাসিলেন ; শুনিয়া স্থির করিলেন, গালিলিওর মতিভ্রম হইয়াছে। কালের স্রোত বহিয়া গেল। ইতালীয় ভদ্রসমাজ, ধার্ম্মিক সমাজ, বিদ্বান্ সমাজ আর পৃথিবী ঘুরিতেছে শুনিলে হাসেন না ; গালিলিওকে আর মতিভ্রান্ত জ্ঞান করেন না।

সকলে সৌন্দর্য্য বিষয়ে স্ত্রীলোকের প্রাধান্য স্বীকার করেন। বিদ্যা, বুদ্ধি, বলে পুরুষের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার পাইয়াও, রূপের টীকা স্ত্রীলোকের মস্তকে দেন। আমার বিবেচনায় এটি মস্ত ভুল। আমি দিব্যচক্ষে দেখিয়াছি যে পুরুষের রূপ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের রূপ অনেক দূর নিকৃষ্ট। হে মানময়ি মোহিনীগণ ! কুটিল কটাক্ষে কালকূট বর্ষণ করিয়া আমাকে এই দোষে দগ্ধ করিও না ; কালসর্পিণী বিনিন্দিত বেণীদ্বারা আমাকে বন্ধন করিও না ; ভ্রূধনুতে কোপে তীক্ষ্ণশর যোজনা করিয়া আমাকে বিদ্ধ করিও না। বলিতে কি, তোমাদের নিন্দা করিতে ভয় করে। পথ বুঝিয়া যদি তোমরা নথ-ফাঁদ পাতিয়া রাখ, তবে কত হস্তী বদ্ধচরণ হইয়া, তোমাদের নাকে ঝুলিতে পারে—কমলাকান্ত কোন্ ছার ! তোমাদের নথের নোলক খসিয়া পড়িলে, মানুষ খুন হইবার অনেক সম্ভাবনা ; চন্দ্রহারের একখানি চাঁদ যদি স্থানচ্যুত হইয়া কাহারও গায়ে লাগে, তবে তাহার হাত পা ভাঙ্গা বিচিত্র নহে। অতএব তোমরা রাগ করিও না। আর হে রমণীপ্রিয়, কল্পনাপ্রিয়, উপমাপ্রিয় কবিগণ, তোমাদিগের স্ত্রীদেবীর সুখময়ী সুবর্ণময়ী প্রতিমা ভাঙ্গিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি বলিয়া, তোমরা আমাকে মারিতে উদ্যত হইও না। আমি সপ্রমাণ করিয়া দিব যে তোমরা কুসংস্কারাবিষ্ট পৌত্তলিক। তোমরা উপাস্য দেবতার প্রকৃত মূর্ত্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিকৃত প্রতিমূর্ত্তির পূজা করিতেছ

যাহার সুন্দর কেশপাশ আছে, সে আর পরচুলা ব্যবহার করে না। যাহার উজ্জ্বল ভাল দাঁত আছে, তাহার কৃত্রিম দন্তের প্রয়োজন হয় না। যাহার বর্ণে লোকের মন হরণ করে, তাহার আর রং মাখিয়া লাবণ্য বৃদ্ধি করিতে হয় না। যাহার নয়ন আছে, তাহার আর কাচের চক্ষুর আশ্রয় লইতে হয় না। যাহার চরণ আছে, তাহাকে আর কাষ্ঠপদ অবলম্বন করিতে হয় না। এইরূপ যাহার যে বস্তু আছে, সে তাহার জন্য লালায়িত হয় না। যে বুঝিতে পারে যে প্রকৃতি কোন্ পদার্থে তাহাকে বঞ্চিত করিয়াছেন, সেই তদ্বিষয়ে আপনার অভাব মোচনার্থে যত্ন করিয়া থাকে। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আমি স্থির করিয়াছি যে স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে সৌন্দর্য্যের অত্যন্ত অভাব। তাহারা সর্ব্বদা আপন আপন রূপ বাড়াইতে ব্যস্ত; কি উপায়ে আপনাকে সুন্দরী দেখাইবে, ইহা লইয়াই উন্মাদিনী; ভাল ভাল অলঙ্কার কিসে পাইবে, নিয়ত ইহাই তাহাদিগের ভাবনা, ইহাই তাহাদিগের চেষ্টা; এমন কি, বলা যাইতে পারে যে অলঙ্কারই তাহাদিগের জপ, অলঙ্কারই তাহাদিগের তপ, অলঙ্কারই তাহাদিগের ধ্যান, অলঙ্কারই তাহাদিগের জ্ঞান। স্বীয় দেহ সজ্জিত করিতে এত যাহাদিগের যত্ন, তাহাদিগের প্রকৃত সৌন্দর্য্য যে অধিক আছে, এরূপ বোধ হয় না। যাহার নাক সুন্দর নহে, সেই নাকে নথরূপ রজ্জুতে দোলক-জগন্নাথকে দোলায়; যাহার কান সুন্দর নহে, সেই ঢকাই কানরূপ নানা ফলফুল পশুপক্ষীবিশিষ্ট বাগানের যোড়া কানে ঝুলাইয়া দেয়। যাহার হৃদয় ভাল নহে, সেই সেখানে সাতনর ফাঁসির দড়ি টাঙ্গাইয়া পুরুষজাতির, বিশেষতঃ স্তন্যপায়ী বালকদিগের ভীতি বিধান করে। যে অলঙ্কার বিনাও আপনাকে সুন্দরী বলিয়া জানে, সে কখন অলঙ্কারের বোঝা বহিতে এত ব্যগ্র হয় না। পুরুষে ভূষণ বিনা সন্তুষ্ট থাকে; স্ত্রীলোকে ভূষণ বিনা মনুষ্য সমাজে মুখ দেখাইতে লজ্জা পায়। অতএব স্ত্রীলোকদিগের নিজের ব্যবহার দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে পুরুষাপেক্ষা স্ত্রীজাতি সৌন্দর্য্য বিষয়ে নিকৃষ্ট।

স্ত্রীজাতি অপেক্ষা যে পুরুষজাতির সৌন্দর্য্য অধিক, প্রকৃতির সৃষ্টি পদ্ধতি সমালোচনা করিয়া দেখিলে আরও স্পষ্ট প্রতীতি হইবে। যে বিস্তীর্ণ চন্দ্রককলাপ দেখিয়া জলদমুকুট ইন্দ্রধনু হারি মানে, সে চন্দ্রককলাপ ময়ূরের আছে; ময়ূরীর নাই। যে কেশরে সিংহের এত শোভা, তাহা সিংহীর নাই। যে বিশাল দন্তে হস্তীর এত সৌন্দর্য্য, হস্তিনীর তাহা নাই। যে ঝুটিতে বৃষভের কান্তি বৃদ্ধি করে, গাভীর তাহা নাই। কুক্কুটের যেমন সুন্দর তাম্র চূড়া ও পক্ষ সকল আছে, কুক্কুটীর তেমন নাই। এইরূপ দেখিতে পাইবে যে উচ্চশ্রেণীর জীবদিগের মধ্যে স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষ সুশ্রী। মনুষ্য সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইয়া সৃষ্টিকর্ত্তা যে এই নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়াছেন, এমন বোধ হয় না। হে মূল "বিদ্যাসুন্দর"-কার! তোমার মনে কি

এই তত্বটী উদিত হইয়াছিল? এজন্যই কি তুমি নায়কের নাম সুন্দর রাখিয়াছিলে? তুমি কি বুঝিয়াছিলে যে স্ত্রীলোক যত কেন বিদ্যাবতী হউক না, পুরুষের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য ও বুদ্ধির নিকটে তাহাকে পরাভব স্বীকার করিতে হইবে।

সৌন্দর্য্যের বাহার যৌবনকালে। কিন্তু রূপান্ধভামিনীগণ! তোমাদিগের যৌবন কতক্ষণ থাকে? জোয়ারের জলের মত আসিতে আসিতেই যায়। কুড়ি হইলেই তোমরা বুড়ী হইলে। অল্পদিনের মধ্যেই তোমাদিগের অঙ্গ সকল শিথিল হইয়া পড়ে। বয়স আসিয়া শীঘ্রই তোমাদিগের গলার লাবণ্যমালা ছিঁড়িয়া লয়। চল্লিশ পঁয়তাল্লিশে পুরুষের যে শ্রী থাকে, বিশ-পঁচিশের ঊর্দ্ধে তোমাদিগের তাহা থাকে না। তোমাদিগের রূপের স্থিতি সৌদামিনীর ন্যায়, ইন্দ্রধনুর ন্যায়, মুহূর্ত্তেক জন্য না হউক; অত্যল্পকালের জন্য, সন্দেহ নাই। যাহারা রূপোপভোগে উন্মত্ত, আমি আহারে বসিলেই তাহাদের যন্ত্রণা অনুভূত করিতে পারি;—আমার জীবনে ঘোর দুঃখ এই যে, অন্ন ব্যঞ্জন পাতে দিতে দিতেই ঠাণ্ডা হইয়া যায়। তেমনি, স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য্যরূপ বুকড়ি চালের ভাত, প্রণয়-কলাপাতে ঢালিতে ঢালিতে ঠাণ্ডা হইয়া যায়—আর কাহার সাধ্য খায়? শেষে বেশভূষা রূপ তেঁতুল মাখিয়া, একটু আদর-লবণের ছিটা দিয়া, কোনরূপে গলাধঃকরণ করিতে হয়।

হে সৌন্দর্য্য গর্ব্বিত কামিনীকুল! সত্য করিয়া বল দেখি, এই রূপ ক্ষণস্থায়ী বলিয়াই কি তোমাদিগের রূপের এত আদর? ভাল করিয়া দেখিতে, না দেখিতে, ভাল করিয়া উপভোগ করিতে না করিতে, অন্তর্হিত হইয়া যায় বলিয়া তোমাদিগের রূপের জন্য কি পুরুষেরা পিপাসিত চাতকের ন্যায় উন্মত্ত? অপরিজ্ঞাত হারাধন বলিয়াই কি তোমরা উহার প্রকৃত মূল্য নির্ণয়ে অশক্ত? কেবল ক্ষণস্থায়ী পদার্থ বলিয়া নয়, অপর কারণেও স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য্য মনোহর মূর্ত্তিধারণ করে। যে সকল গ্রন্থকারদিগের মত ভূমণ্ডলে গ্রাহ্য হইয়াছে, তাঁহারা সকলেই পুরুষ, এ কারণে আমার বিবেচনায় অনুরাগ নেত্রে কামিনীকুলের রূপ বর্ণনা করিয়াছেন। কথাই আছে, "যার যাতে মজে মন, কিবা হাড়ি কিবা ডোম"। যে রমণীগণ প্রণয়ের পদার্থ, তাহাদিগকে কে সহজ চক্ষুতে দেখিবে? সুন্দর মুকুরের প্রভাবে দৃষ্ট বস্তু কুৎসিত হইলেও সুন্দর দেখাইবে। মনোমোহিনীর রূপ নিরীক্ষণকালে তাহাকে প্রীতিরঞ্জনে মাখাইয়া দেখিব। পুরুষাপেক্ষা তাহার মাধুর্য্য কেন না অধিক বোধ হইবে?

হে প্রণয়দেব, পাশ্চাত্য কবিরা তোমাকে অন্ধ বলিয়াছেন। কথাটা মিথ্যা নয়। তোমার প্রভাবে লোকে প্রিয় বস্তুর দোষ দেখিতে পায় না। তোমার অঞ্জনে যাহার নেত্র রঞ্জিত হইয়াছে, সে বিশ্ববিমোহন পদার্থ পরম্পরায় পরিবৃত থাকে। বিকট মূর্ত্তিকে সে মনোহর দেখে। কর্কশ স্বরকে সে মধুময় জ্ঞান প্রেতিনীর

অঙ্গভঙ্গীকে মৃদুমন্দমলয়মারুতে দোদুল্যমানা ললিতা লবঙ্গলতার লাবণ্যলীলা অপেক্ষাও সুখকরী জ্ঞান করে। এজন্যই চীনদেশে খাঁদা নাকের আদর। এজন্যই বিলাতী বিবিদের রাঙ্গা চুল ও বিড়াল চোকের আদর। এজন্যই কাফ্রিদেশে স্থূল ওষ্ঠাধরের আদর। এজন্যই বাঙ্গালদেশে উল্কিচিত্রিত মিশি-কলঙ্কিত চাঁদবদনের আদর। এজন্যই মানব সমাজে স্ত্রীরূপের আদর। আর যদি স্ত্রীলোকেরা পুরুষের ন্যায় মনের কথা মুখে আনিতেন, তাহা হইলে হে প্রণয়দেব, নিজের গুণে হউক না হউক, অন্ততঃ তোমার গুণেও আমরা শুনিতে পাইতাম যে পুরুষের সৌন্দর্য্যের কাছে স্ত্রীলোকের রূপ কিছুই নয়। যদিও অন্তরের গুপ্তভাব বাক্যদ্বারা ব্যক্ত করিতে মহিলাগণ অত্যন্ত সঙ্কুচিতা, তথাপি কার্য্য দ্বারা তাহাদিগের আন্তরিক গূঢ় তত্ত্বগুলি কিয়ৎ পরিমাণে প্রকাশিত হইয়া পড়ে। কে না দেখিয়াছে যে, সুন্দরীরা পরস্পরের সৌন্দর্য্য স্বীকার করিতে চাহেন না, অথচ পুরুষের ভক্ত হইয়া বসেন? ইহাতে কি বুঝাইতেছে না যে মনে মনে তাঁহারা স্ত্রীলোকের রূপাপেক্ষা পুরুষের রূপের পক্ষপাতিনী?

রূপ, রূপ করিয়া স্ত্রীলোকের সর্ব্বনাশ হইয়াছে। সকলেই ভাবে রূপই কামিনীকুলের মহামূল্য ধন, রূপই কামিনীকুলের সর্ব্বস্ব। সুতরাং মহিলাগণ যাহা কিছু কাম্য বস্তু প্রার্থনা করেন, লোকে কেবল রূপের বিনিময়েই দিতে চায়। ইহাতেই মনুষ্য সমাজের কলঙ্ক বারাঙ্গণাবর্গের সৃষ্টি। ইহাতেই পরিবার মধ্যে স্ত্রীলোকের দাসীত্ব।

অস্থায়ী সৌন্দর্য্যই যোষিদ্‌গণের এক মাত্র সম্বল, সংসারসাগর পার হইবার একমাত্র কাণ্ডারী, এ কথা আর আমি শুনিতে চাহি না। অনেক দিন শুনিয়াছি। শুনিয়া কাণ ঝালাপালা হইয়া গিয়াছে। শুনিতে আর পারি না। আমি শুনিতে চাই যে, নারীজাতির রূপাপেক্ষা শত গুণে, সহস্র গুণে, লক্ষ গুণে, কোটী গুণে মহত্বের গুণ আছে। আমি শুনিতে চাই যে তাঁহারা মূর্ত্তিমতী সহিষ্ণুতা, ভক্তি ও প্রীতি। যাঁহারা দেখিয়াছেন যে কত কষ্ট সহ্য করিয়া জননী সন্তানের লালন পালন করেন, যাঁহারা দেখিয়াছেন যে কত যত্নে মহিলাগণ পীড়িত আত্মীয়বর্গের সেবা শুশ্রূষা করেন, তাঁহারা কামিনীকুলের সহিষ্ণুতার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাইয়াছেন। যাঁহারা কখন কোন সুন্দরীকে পতি পুত্রের জন্য জীবন বিসর্জ্জন, ধর্ম্ম বাসসুখ বিসর্জ্জন করিতে দেখিয়াছেন, তাঁহারা কিয়দ্দূর বুঝিয়াছেন যে কিরূপ প্রীতি ও ভক্তি স্ত্রীহৃদয়ে বসতি করে।

যখন আমি উৎকৃষ্টা যোষিদ্বর্গের বিষয়ে চিন্তা করিতে যাই, তখনই আমার মানস-পটে, সহমরণপ্রবৃত্তা সতীর মূর্ত্তি জাগিয়া উঠে। আমি দেখিতে পাই যে, চিতা জ্বলিতেছে, পতির পদ সাদরে বক্ষে ধারণ করিয়া প্রজ্বলিত হুতাশন মধ্যে

সাধ্বী বসিয়া আছেন। আস্তে আস্তে বহ্নি বিস্তৃত হইতেছে, এক অঙ্গ দগ্ধ করিয়া অপর অঙ্গে প্রবেশ করিতেছে। অগ্নি-দগ্ধা স্বামীর চরণ ধ্যান করিতেছেন, মধ্যে মধ্যে হরিবোল বলিতে বলিতেছেন বা সঙ্কেত করিতেছেন। দৈহিক ক্লেশ পরিচায়ক লক্ষণ নাই। আনন প্রফুল্ল। ক্রমে-পাবকশিখা বাড়িল, জীবন ছাড়িল, কায়া ভস্মীভূত হইল। ধন্য সহিষ্ণুতা। ধন্য প্রীতি। ধন্য ভক্তি।

যখন আমি ভাবি যে কিছুদিন হইল আমাদিগের দেশীয়া অবলা অঙ্গনাগণ কোমলাঙ্গী হইয়াও এইরূপে মরিতে পারিত, তখন আমার মনে নূতন আশার সঞ্চার হয়, তখন আমার বিশ্বাস হয় যে মহত্ত্বের বীজ আমাদিগের অন্তরেও নিহিত আছে। কালেও কি আমরা মহত্ত্ব দেখাইতে পারিব না? হে বঙ্গ-পৌরাঙ্গনাগণ—তোমরা এ বঙ্গদেশের সার রত্ন! তোমাদের মিছা রূপের বড়াইয়ে কাজ কি?

পঞ্চত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদ

বাতাস উঠিল

শৈবলিনী তাহাই করিল—সপ্তদিবস গুহা হইতে বাহির হইল না—কেবল এক একবার দিনান্তে ফল মূলান্বেষণে বাহির হইত। সাতদিন মনুষ্যের সঙ্গে আলাপ করিল না। প্রায় অনশনে, সেই বিকটান্ধকারে অনন্যেন্দ্রিয়বৃত্তি হইয়া, স্বামীর চিন্তা করিতে লাগিল,—কিছু দেখিতে পায় না, কিছু শুনিতে পায় না, কিছু স্পর্শ করিতে পায় না। ইন্দ্রিয় নিরুদ্ধ—মন নিরুদ্ধ—সর্ব্বত্র স্বামী। স্বামী চিত্তবৃত্তি সমূহের একমাত্র অবলম্বন হইল। অন্ধকারে আর কিছু দেখিতে পায় না—সাতদিন সাত রাত কেবল স্বামিমুখ দেখিল। ভীম নীরবে আর কিছু শুনিতে পায় না—কেবল স্বামীর জ্ঞান পরিপূর্ণ, স্নেহবিচলিত, বাক্যালাপ শুনিতে পাইল—ঘ্রাণেন্দ্রিয় কেবলমাত্র তাঁহার পুষ্পপাত্রের পুষ্পরাশির গন্ধ পাইতে লাগিল—ত্বক্ কেবল চন্দ্রশেখরের আদরের স্পর্শ অনুভূত করিতে লাগিল। আশা আর কিছুতে নাই—আর কিছুতে ছিল না, স্বামিসন্দর্শন কামনাতেই রহিল। স্মৃতি কেবল শ্মশ্রুশোভিত, প্রশস্ত ললাটপ্রমুখ বদনমণ্ডলের চতুঃপার্শ্বে, ঘুরিতে লাগিল—কণ্টকে ছিন্নপক্ষ ভ্রমরী যেমন দুর্লভ সুগন্ধিপুষ্পবৃক্ষতলে কষ্টে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, তেমনি ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। যে এ ব্রতের পরামর্শ দিয়া ছিল—সে মনুষ্যচিত্তের সর্ব্বাংশদর্শী সন্দেহ নাই। নির্জ্জন, নীরব, অন্ধকার, মনুষ্যসন্দর্শনরহিত, তাহাতে আবার শরীর ক্লিষ্ট, ক্ষুধাপীড়িত; চিত্ত অন্যচিন্তা শূন্য; এমন সময়ে যে বিষয়ে চিত্ত স্থির করা যায় তাহাই জপ করিতে করিতে চিত্ত তন্ময় হইয়া উঠে। এই অবস্থায়, অবসন্ন শরীরে, অবসন্ন মনে, একাগ্র চিত্তে, স্বামীর ধ্যান করিতে করিতে শৈবলিনীর চিত্ত বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়া উঠিল।

বিকৃতি? না দিব্য চক্ষু? শৈবলিনী দেখিল—অন্তরের ভিতর অন্তর হইতে দিব্যচক্ষু চাহিয়া, শৈবলিনী দেখিল, এ কি রূপ! এই দীর্ঘ শালতরুনিন্দিত,

সুভুজবিশিষ্ট, সুন্দর গঠন, সুকুমারে বলময়, এ দেহ যে রূপের শিখর! এই যে ললাট,—প্রশস্ত, চন্দনচর্চ্চিত, চিন্তারেখা বিশিষ্ট—এ যে সরস্বতীর শয্যা, ইন্দ্রের রণভূমি, মদনের সুখকুঞ্জ, লক্ষ্মীর সিংহাসন! ইহার কাছে প্রতাপ? ছি! ছি! সমুদ্রের কাছে গঙ্গা! ঐ যে নয়ন,—জ্বলিতেছে, হাসিতেছে, ফিরিতেছে, ভাসিতেছে—দীর্ঘ, বিস্ফারিত, তীব্র জ্যোতিঃ, স্থির, স্নেহময়, করুণাময়, ঈষৎরঙ্গপ্রিয়, সর্ব্বত্র তত্ত্বজিজ্ঞাসু—ইহার কাছে কি প্রতাপের চক্ষু? কেন আমি ভুলিলাম—কেন মজিলাম—কেন মরিলাম! এই যে সুন্দর, সুকুমার, বলিষ্ঠ দেহ—নবপত্র শোভিত শালতরু,—মাধবী জড়িত দেবদারু, কুসুম পরিব্যাপ্ত পর্ব্বত, অর্দ্ধেক সৌন্দর্য্য অর্দ্ধেক শক্তি—আধ চন্দ্র আধ ভানু—আধ গৌরী আধ শঙ্কর—আধ রাধা আধ জ্ঞান—আধ আশা আধ ভয়—আধ জ্যোতিঃ আধ ছায়া, আধ বহ্নি আধ ধূম—কিসের প্রতাপ? কেন না দেখিলাম—কেন মজিলাম—কেন মরিলাম! সেই যে ভাষা—পরিষ্কৃত, পরিস্ফুট, হাস্যপ্রদীপ্ত, ব্যঙ্গরঞ্জিত, স্নেহ পরিপ্লুত, মৃদু, মধুর, পরিশুদ্ধ, কিসের প্রতাপ?—কেন মজিলাম—কেন মরিলাম—কেন কুল হারাইলাম? সেই যে হাসি—ঐ পুষ্পপাত্রস্থিত মল্লিকারাশি তুল্য, মেঘ মণ্ডলে বিদ্যুত্তুল্য, দুর্ব্বৎসরে দুর্গোৎসব তুল্য, আমার সুখস্বপ্ন তুল্য—কেন দেখিলাম না, কেন মজিলাম, কেন মরিলাম, কেন বুঝিলাম না? সেই যে ভালবাসা, সমুদ্রতুল্য, অপার, অপরিমেয়, অতলস্পর্শ, আপনার বলে আপনি চঞ্চল—প্রশান্তভাবে স্থির, গম্ভীর, মাধুর্য্যময়—চাঞ্চল্যে কূলপ্লাবী, তরঙ্গ ভঙ্গভীষণ, অগম্য, অজ্ঞেয় ভয়ঙ্কর,—কেন বুঝিলাম না, কেন হৃদয়ে তুলিলাম না—কেন আপনা খাইয়া প্রাণ দিলাম না! কে আমি? তাঁহার কি যোগ্য—বালিকা, অজ্ঞান, অনক্ষর, অসৎ, তাঁহার মহিমা জ্ঞানে অশক্ত, তাঁহার কাছে আমি কে? সমুদ্রে শম্বুক, কুসুমে কীট, চন্দ্রে কলঙ্ক, চরণে রেণুকণা—তাঁর কাছে আমি কে? জীবনে কুস্বপ্ন, হৃদয়ে বিস্মৃতি, সুখে বিঘ্ন, আশায় অবিশ্বাস—তাঁর কাছে আমি কে? সরোবরে কর্দ্দম, মৃণালে কণ্টক, পবনে ধূলি, অনলে পতঙ্গ। আমি মজিলাম—মরিলাম না কেন?

যে বলিয়াছিল, এইরূপ স্বামী ধ্যান কর, সে অনন্ত মানবহৃদয়-সমুদ্রের কাণ্ডারী—সব জানে। জানে যে, এই মন্ত্রে চির প্রবাহিত নদী অন্য খাদে চালান যায়,—জানে যে এ বজ্রে পাহাড় ভাঙ্গে, এ গণ্ডূষে সমুদ্র শুষ্ক হয়, এমন্ত্রে বায়ু স্তম্ভিত হয়। শৈবলিনীর চিত্তে চির-প্রবাহিত নদী ফিরিল, পাহাড় ভাঙ্গিল, সমুদ্র শোষিল, বায়ু স্তম্ভিত হইল। শৈবলিনী প্রতাপকে ভুলিয়া চন্দ্রশেখরকে ভালবাসিল।

মনুষ্যের ইন্দ্রিয়ের পথ রোধ কর—ইন্দ্রিয় বিলুপ্ত কর—মনকে বাঁধ,—বাঁধিয়া একটি পথে ছাড়িয়া দাও—অন্য পথ বন্ধ কর,—মনের শক্তি অপহৃত কর—মন কি

করিবে? সেই এক পথে যাইবে—তাহাতে স্থির হইবে—তাহাতে মজিবে। শৈবলিনী পঞ্চম দিবসে আহরিত ফল মূল খাইল না—ষষ্ঠ দিবসে ফল মূল আহরণে গেল না—সপ্তম দিবস প্রাতে ভাবিল, স্বামী দর্শন পাই না পাই—অদ্য মরিব। সপ্তম রাত্রে মনে করিল, হৃদয় মধ্যে পদ্মফুল ফুটিয়াছে—তাহাতে চন্দ্রশেখর যোগাসনে বসিয়া আছেন; শৈবলিনী ভ্রমর হইয়া পাদপদ্মে গুণ গুণ করিতেছে।

সপ্তম রাত্রে সেই অন্ধকার নীরব শিলাকর্কশ গুহামধ্যে, একাকী স্বামিধ্যান করিতে করিতে শৈবলিনী চেতনা হারাইল। সে নানা বিষয় স্বপ্ন দেখিতে লাগিল। কখন দেখিল সে ভয়ঙ্কর নরকে ডুবিয়াছে, অগণিত, শতহস্ত পরিমিত, সর্পগণ অযুত ফণা বিস্তার করিয়া, শৈবলিনীকে জড়াইয়া ধরিতেছে; অযুত মুণ্ডে মুখ ব্যাদান করিয়া শৈবলিনীকে গিলিতে আসিতেছে, সকলের মিলিত নিশ্বাসে প্রবল বাত্যার ন্যায় শব্দ হইতেছে। চন্দ্রশেখর আসিয়া, এক বৃহৎ সর্পের ফণায় চরণ স্থাপন করিয়া দাঁড়াইলেন; তখন সর্প সকল বন্যার জলের ন্যায় সরিয়া গেল। কখন দেখিল, এক অনন্ত কুণ্ডে পর্ব্বতাকার অগ্নি জ্বলিতেছে; আকাশে তাহার শিখা উঠিতেছে; শৈবলিনী তাহার মধ্যে দগ্ধ হইতেছে; এমত সময়ে চন্দ্রশেখর আসিয়া সেই অগ্নি-পর্ব্বত মধ্যে এক গণ্ডূষ জল নিক্ষেপ করিলেন, অমনি অগ্নিরাশি নিবিয়া গেল; শীতল পবন বহিল, কুণ্ড মধ্যে স্বচ্ছসলিলা তরতরবাহিনী নদী বহিল, তীরে কুসুম সকল বিকশিত হইল, নদীজলে বড় বড় পদ্মফুল ফুটিল—চন্দ্রশেখর তাহার উপর দাঁড়াইয়া ভাসিয়া যাইতে লাগিলেন। কখন দেখিল এক প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র আসিয়া শৈবলিনীকে মুখে করিয়া তুলিয়া পর্ব্বতে লইয়া যাইতেছে; চন্দ্রশেখর আসিয়া পূজার পুষ্পপাত্র হইতে একটি পুষ্প লইয়া ব্যাঘ্রকে ফেলিয়া মারিলেন, ব্যাঘ্র তখনই ছিন্নশিরা হইয়া প্রাণত্যাগ করিল, শৈবলিনী দেখিল তাহার মুখ ফষ্টরের মুখের ন্যায়।

রাত্রিশেষে শৈবলিনী দেখিলেন, শৈবলিনীর মৃত্যু হইয়াছে, অথচ জ্ঞান আছে। দেখিলেন পিশাচে তাঁহার দেহ লইয়া অন্ধকারে শূন্যপথে উড়িতেছে। দেখিলেন, কত কৃষ্ণ মেঘের সমুদ্র, কত বিদ্যুদগ্নিরাশি পার হইয়া তাঁহার কেশ ধরিয়া উড়াইয়া লইয়া যাইতেছে। কত গগনবাসী অপ্সরা, কিন্নরাদি মেঘ তরঙ্গ মধ্য হইতে মুখমণ্ডল উত্থিত করিয়া, শৈবলিনীকে দেখিয়া হাসিতেছে। দেখিলেন, কত গগনচারিণী ভৈরবী, রাক্ষসী, কৃষ্ণ মেঘে আরোহণ করিয়া, কৃষ্ণকলেবর বিদ্যুতের মালায় ভূষিত করিয়া, কৃষ্ণকেশাবৃত ললাটে তারার মালা গ্রথিত করিয়া বেড়াইতেছে,—শৈবলিনীর পূতিগন্ধবিশিষ্ট মৃতদেহ দেখিয়া তাহাদের মুখের জল পড়িতেছে, তাহারা হাঁ করিয়া আহার করিতে আসিতেছে। দেখিলেন কত দেব দেবীর বিমানের, কৃষ্ণতাশূন্য উজ্জ্বলালোকময়ী ছায়া মেঘের উপর পড়িয়াছে;

পাছে পাপিষ্ঠা শৈবলিনীর শবের ছায়া বিমানের পবিত্র ছায়ায় লাগিলে শৈবলিনীর পাপক্ষয় হয়, এই ভয়ে তাঁহারা বিমান সরাইয়া লইতেছেন। দেখিল, নক্ষত্র সুন্দরীগণ নীলাম্বর মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুখগুলি সকলে বাহির করিয়া, কিরণময় অঙ্গুলির দ্বারা পরস্পরকে শৈবলিনীর শব দেখাইতেছে—বলিতেছে—দেখ, ভগিনি দেখ্, মনুষ্য-কীটের মধ্যে আবার অসতী আছে! কোন তারা শিহরিয়া চক্ষু বুজিতেছে ; কোন তারা লজ্জায় মেঘে মুখ ঢাকিতেছে ; কোন তারা অসতী নাম শুনিয়া ভয়ে নিবিয়া যাইতেছে। পিশাচেরা শৈবলিনীকে লইয়া উর্দ্ধে উঠিতেছে, তারপর আরও উর্দ্ধে, আরও মেঘ, আরও তারা পার হইয়া আরও উর্দ্ধে উঠিতেছে। অতি উর্দ্ধে উঠিয়া সেইখান হইতে শৈবলিনীর দেহ নরককুণ্ডে নিক্ষেপ করিবে বলিয়া উঠিতেছে। যেখানে উঠিল, সেখানে অন্ধকার, শীত,—মেঘ নাই, তারা নাই, আলো নাই, বায়ু নাই, শব্দ নাই। শব্দ নাই—কিন্তু অকস্মাৎ অতি দূরে অধঃ হইতে অতি ভীম কল কল ঘরঘর শব্দ শুনা যাইতে লাগিল—যেন অতি দূরে, অধোভাগে, শত সহস্র সমুদ্র এককালে গর্জ্জিতেছে। পিশাচেরা বলিল ঐ নরকের কোলাহল শুনা যাইতেছে, এইখান হইতে শব ফেলিয়া দাও। এই বলিয়া পিশাচেরা শৈবলিনীর মস্তকে পদাঘাত করিয়া শব ফেলিয়া দিল। শৈবলিনী ঘুরিতে ঘুরিতে, ঘুরিতে ঘুরিতে, পড়িতে লাগিল। ক্রমে ঘূর্ণ গতি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, অবশেষে কুম্ভকারের চক্রের ন্যায় ঘুরিতে লাগিল। শবের মুখে, নাসিকায়, রক্তবমন হইতে লাগিল। ক্রমে নরকের গর্জ্জন নিকটে শুনা যাইতে লাগিল, পূতিগন্ধ বাড়িতে লাগিল—অকস্মাৎ সজ্ঞানমৃতা শৈবলিনী দূরে নরক দেখিতে পাইল। তাহার পরেই তাহার চক্ষু অন্ধ, কর্ণ বধির হইল,—তখন সে মনে মনে চন্দ্রশেখরের ধ্যান করিতে লাগিল,—মনে মনে ডাকিতে লাগিল, "কোথায় তুমি—স্বামিন্! কোথায় স্বামী—স্ত্রীজাতির জীবন সহায়, আরাধনার দেবতা, সর্ব্বে সর্ব্বমঙ্গল! কোথায় তুমি, চন্দ্রশেখর! তোমার চরণারবিন্দে, সহস্র, সহস্র, সহস্র, প্রণাম! আমায় রক্ষা কর। তোমার নিকটে অপরাধ করিয়া, আমি এই নরককুণ্ডে পতিত হইতেছি—তুমি রক্ষা না করিলে কোন দেবতায় আমায় রক্ষা করিতে পারেন না—আমায় রক্ষা কর। তুমি আমায় ক্ষমা কর, প্রসন্ন হও, এইখানে আসিয়া, চরণযুগল আমার মস্তকে তুলিয়া দাও—তাহা হইলেই আমি নরক হইতে উদ্ধার পাইব।"

তখন, অন্ধ, বধির, মৃতা শৈবলিনীর বোধ হইতে লাগিল যে, কে তাহাকে কোলে করিয়া বসাইল—তাহার অঙ্গের সৌরভে দিক্ পূরিল। সেই দুরন্ত নরকরব, সহসা অন্তর্হিত হইল, পূতিগন্ধের পরিবর্ত্তে কুসুমগন্ধ ছুটিল। সহসা শৈবলিনীর বধিরতা ঘুচিল—চক্ষু আবার দর্শনক্ষম হইল—সহসা শৈবলিনীর বোধ হইল—এ মৃত্যু নহে, জীবন ; এ স্বপ্ন নহে, প্রকৃত। শৈবলিনী চেতনা প্রাপ্ত হইল।

চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখিল, গুহা মধ্যে অল্প আলোক প্রবেশ করিয়াছে; বাহিরে পক্ষীর প্রভাত কূজন শুনা যাইতেছে—কিন্তু একি এ? কাহার অঙ্কে তাঁহার মাথা রহিয়াছে? কাহার মুখমণ্ডল, তাঁহার মস্তকোপরে, গগনোদিত পূর্ণচন্দ্রবৎ এ প্রভাতান্ধকারকে আলোক বিকীর্ণ করিতেছে? শৈবলিনী চিনিলেন, চন্দ্রশেখর।

ষট্‌ত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদ

নৌকা ডুবিল

চন্দ্রশেখর বলিলেন, "শৈবলিনি!"

শৈবলিনী উঠিয়া বসিল, চন্দ্রশেখরের মুখপানে চাহিল; মাথা ঘুরিল; শৈবলিনী পড়িয়া গেল; মুখ চন্দ্রশেখরের চরণে ঘর্ষিত হইল। চন্দ্রশেখর, তাহাকে ধরিয়া তুলিলেন, তুলিয়া আপন শরীরের উপর ভর রাখিয়া শৈবলিনীকে বসাইলেন।

শৈবলিনী কাঁদিতে লাগিল, উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে, চন্দ্রশেখরের চরণে পুনঃপতিত হইয়া, বলিল, "এখন আমার দশা কি হইবে?"

চন্দ্রশেখর বলিলেন, "তুমি আমাকে দেখিতে চাহিয়াছিলে কেন?"

শৈবলিনী চক্ষু মুছিল, রোদন সম্বরণ করিল—স্থির হইয়া বলিতে লাগিল, "বোধ হয় আমি আর অতি অল্পদিন বাঁচিব"—শৈবলিনী শিহরিল—স্বপ্নদৃষ্ট ব্যাপার মনে পড়িল,—ক্ষণেক কপালে হাত দিয়া, নীরব থাকিয়া আবার বলিতে লাগিল,—"অল্পদিন বাঁচিব—মরিবার আগে তোমাকে একবার দেখিতে সাধ হইয়াছিল। এ কথায় কে বিশ্বাস করিবে? কেন বিশ্বাস করিবে? যে ভ্রষ্টা হইয়া স্বামিত্যাগ করিয়া আসিয়াছে, তাহার আবার স্বামী দেখিতে সাধ কি?"

শৈবলিনী কাতরতার বিকট হাসি হাসিল।

চন্দ্র। তোমার কথায় অবিশ্বাস নাই—আমি জানি যে তোমাকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া আনিয়াছিল।

শৈ। সে মিথ্যা কথা। আমি ইচ্ছা পূর্ব্বক ফষ্টরের সঙ্গে চলিয়া আসিয়াছিলাম। ডাকাইতির পূর্ব্বে ফষ্টর আমার নিকট লোক প্রেরণ করিয়াছিল।

চন্দ্রশেখর অধোবদন হইলেন। ধীরে ধীরে শৈবলিনীকে পুনরপি শুয়াইলেন; ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান করিলেন এবং গমনোন্মুখ হইয়া, মৃদু মধুর স্বরে বলিলেন, "শৈবলিনী, দ্বাদশ বৎসর প্রায়শ্চিত্ত কর। উভয়ে বাঁচিয়া থাকি, তবে প্রায়শ্চিত্তান্তে আবার সাক্ষাৎ হইবে। এক্ষণে এই পর্য্যন্ত।"

শৈবলিনী হাত যোড় করিল;—বলিল, "আর একবার বসো! বোধ হয়, প্রায়শ্চিত্ত আমার অদৃষ্টে নাই। আবার সেই স্বপ্ন মনে পড়িল—"বসো—তোমায় ক্ষণেক দেখি।"

চন্দ্রশেখর বসিলেন।

শৈবলিনী জিজ্ঞাসা করিল, "আত্মহত্যায় কি পাপ আছে?" শৈবলিনী স্থিরদৃষ্টে চন্দ্রশেখরের প্রতি চাহিয়াছিল, তাহার প্রফুল্ল নয়নপদ্ম, জলে ভাসিতেছিল।

চন্দ্র। আছে। কেন মরিতে চাও?

শৈবলিনী শিহরিল। বলিল, "মরিতে পারিব না—সেই নরকে পড়িব।"

চন্দ্র। প্রায়শ্চিত্ত করিলে নরক হইতে উদ্ধার হইবে।

শৈ। এ মন-নরক হইতে উদ্ধারের প্রায়শ্চিত্ত কি?

চন্দ্র। সে কি?

শৈ। এ পর্ব্বতে দেবতারা আসিয়া থাকেন। তাঁহারা আমাকে কি করিয়াছেন বলিতে পারি না—আমি রাত্রদিন নরক স্বপ্ন দেখি—

চন্দ্রশেখর দেখিলেন, শৈবলিনীর দৃষ্টি গুহাপ্রান্তে স্থাপিত হইয়াছে—যেন দূরে কিছু দেখিতেছে। দেখিলেন, তাহার শীর্ণ বদনমণ্ডল বিশুষ্ক হইল—চক্ষুঃ বিস্ফারিত, পলকরহিত হইল; নাসারন্ধ্র সঙ্কুচিত, বিস্ফারিত হইতে লাগিল—শরীর কণ্টকিত হইল—কাঁপিতে লাগিল। চন্দ্রশেখর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি দেখিতেছ?"

শৈবলিনী কথা কহিল না, পূর্ব্ববৎ চাহিয়া রহিল। চন্দ্রশেখর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন ভয় পাইতেছ?"

শৈবলিনী প্রস্তরবৎ।

চন্দ্রশেখর বিস্মিত হইলেন—অনেকক্ষণ নীরব হইয়া শৈবলিনীর মুখপ্রতি চাহিয়া রহিলেন। কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। অকস্মাৎ শৈবলিনী বিকট চীৎকার করিয়া উঠিল—"প্রভু! রক্ষা কর! রক্ষা কর! তুমি আমার স্বামী! তুমি না রাখিলে কে রাখে?"

শৈবলিনী মূর্চ্ছিতা হইয়া ভূতলে পড়িল।

চন্দ্রশেখর নিকটস্থ নির্ঝর হইতে জল আনিয়া শৈবলিনীর মুখে সিঞ্চন করিলেন। উত্তরীয়ের দ্বারা ব্যজন করিলেন। কিছুকাল পরে শৈবলিনী চেতনা প্রাপ্ত হইল। শৈবলিনী উঠিয়া বসিল। নীরবে বসিয়া কাঁদিতে লাগিল।

চন্দ্রশেখর বলিলেন, "কি দেখিতেছিলে?"

শৈ। সেই নরক!

চন্দ্রশেখর দেখিলেন, জীবনেই শৈবলিনীর নরকভোগ আরম্ভ হইয়াছে। শৈবলিনী ক্ষণ পরে বলিল, "আমি মরিতে পারিব না—আমার ঘোরতর নরকের ভয়

হইয়াছে। মরিলেই নরকে যাইব। আমাকে বাঁচিতেই হইবে। কিন্তু একাকিনী, আমি দ্বাদশ বৎসর কি প্রকারে বাঁচিব? আমি চেতনে অচেতনে, কেবল নরক দেখিতেছি।"

চন্দ্রশেখর বলিলেন, "চিন্তা নাই—উপবাসে এবং মানসিক ক্লেশে, এ সকল উপস্থিত হইয়াছে। বৈদ্যেরা ইহাকে বায়ু রোগ বলেন। তুমি দেবগ্রামে গিয়া গ্রামপ্রান্তে কুটীর নির্ম্মাণ কর। সেখানে সুন্দরী আসিয়া তোমার তত্ত্বাবধারণ করিবেন—চিকিৎসা করিতে পারিবেন।"

সহসা শৈবলিনী চক্ষু মুদিল—দেখিল গুহাপ্রান্তে সুন্দরী দাঁড়াইয়া, প্রস্তরে কোদিতা—অঙ্গুলি তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। দেখিল সুন্দরী, অতি দীর্ঘাকৃতা, ক্রমে তালবৃক্ষ পরিমিতা হইল, অতি ভয়ঙ্করী! দেখিল, সেই গুহাপ্রান্তে সহসা নরক সৃষ্ট হইল,—সেই পূতিগন্ধ, সেই ভয়ঙ্কর অগ্নিগর্জ্জন, সেই উত্তাপ; সেই শীত, সেই সর্পারণ্য, সেই কদর্য্য কীটরাশিতে গগন অন্ধকার! দেখিল, সেই নরকে পিশাচেরা কণ্টকের রজ্জু হস্তে, বৃশ্চিকের বেত্রহস্তে নামিল—রজ্জুতে শৈবলিনীকে বাঁধিয়া, বৃশ্চিক-বেত্রে তাহাকে প্রহার করিতে করিতে লইয়া চলিল; তালবৃক্ষ পরিমিতা প্রস্তরময়ী সুন্দরী হস্তোত্তোলন করিয়া তাহাদিগকে বলিতে লাগিল—"মার! মার! আমি বারণ করিয়াছিলাম! আমি নৌকা হইতে ফিরাইতে গিয়াছিলাম, শুনে নাই। মার মার! যত পারিস্ মার্! আমি উহার পাপের সাক্ষী! মার! মার!" শৈবলিনী যুক্ত করে, উন্নত আননে, সজল নয়নে সুন্দরীকে মিনতি করিতেছে; সুন্দরী শুনিতেছে না; কেবল ডাকিতেছে "মার! মার! অসতীকে মার! আমি সতী, ও অসতী! মার! মার!" শৈবলিনী, আবার সেইরূপ, দৃষ্টিস্থির লোচন-বিস্ফারিত করিয়া, বিশুষ্ক মুখে, স্তম্ভিতের ন্যায় রহিল। চন্দ্রশেখর চিন্তিত হইলেন—বুঝিলেন, লক্ষণ ভাল নহে। বলিলেন, "শৈবলিনি! আমার সঙ্গে আইস!"

প্রথমে শৈবলিনী, শুনিতে পাইল না। পরে চন্দ্রশেখর, তাহার অঙ্গে হস্তার্পণ করিয়া দুই তিন বার সঞ্চালিত করিয়া ডাকিতে লাগিলেন, বলিতে লাগিলেন—"আমার সঙ্গে আইস।"

সহসা শৈবলিনী দাঁড়াইয়া উঠিল, অতি ভীতস্বরে বলিল, "চল, চল, চল, শীঘ্র চল, শীঘ্র চল, এখান হইতে শীঘ্র চল!" বলিয়াই, বিলম্ব না করিয়া, গুহাদ্বারাভিমুখে ছুটিল, চন্দ্রশেখরের প্রতীক্ষা না করিয়া, দ্রুতপদে চলিল। দ্রুত চলিতে, গুহার অস্পষ্ট আলোকে পদে শিলাখণ্ড বাজিল; পদস্খলিত হইয়া শৈবলিনী ভূপতিতা হইল। আর শব্দ নাই। চন্দ্রশেখর দেখিলেন শৈবলিনী আবার মূর্চ্ছিতা হইয়াছে।

তখন চন্দ্রশেখর, তাহাকে ক্রোড়ে করিয়া গুহা হইতে বাহির হইয়া, যথায় পর্ব্বতাঙ্গ হইতে অতি ক্ষীণা নির্ঝরিণী নিঃশব্দে জলোদ্গার করিতেছিল—তথায় আনিলেন। মুখে জলসেক করাতে এবং অনাবৃত স্থানের অনবরুদ্ধ বায়ুস্পর্শে শৈবলিনী সংজ্ঞালাভ করিয়া চক্ষু চাহিল—বলিল, "আমি কোথায় আসিয়াছি ?"

চন্দ্রশেখর বলিলেন, "আমি তোমাকে বাহিরে আনিয়াছি।"

শৈবলিনী শিহরিল—আবার ভীত হইল, বলিল, "তুমি কে ?"

চন্দ্রশেখরও ভীত হইলেন। বলিলেন, "কেন এরূপ করিতেছ ? আমি যে তোমার স্বামী—চিনিতে পারিতেছ না কেন ?"

শৈবলিনী হা হা করিয়া হাসিল, বলিল,

'"স্বামী আমার সোণার মাছি
বেড়ায় ফুলে ফুলে,
তেকাটাতে এলে সখা, বুঝি পথ ভুলে ?'

তুমি কি লরেন্স ফষ্টর ?"

চন্দ্রশেখর দেখিলেন যে, যে দেবীর প্রভাতেই এই মনুষ্যদেহ সুন্দর, তিনি শৈবলিনীকে ত্যাগ করিয়া যাইতেছেন—বিকট উন্মাদ আসিয়া তাঁহার সুবর্ণ মন্দির অধিকার করিতেছে। চন্দ্রশেখর রোদন করিলেন। অতি মৃদু স্বরে, কত আদরে আবার ডাকিলেন, "শৈবলিনি।"

শৈবলিনী আবার হাসিল, বলিল, "শৈবলিনী কে ? রসো রসো ! একটি মেয়ে ছিল, তার নাম শৈবলিনী। আর একটি ছেলে ছিল, তার নাম প্রতাপ। একদিন রাত্রে ছেলেটি সাপ হয়ে বনে গেল ; মেয়েটি একটি ব্যাঙ্‌ হয়ে বনে গেল। সাপটি ব্যাঙ্‌টিকে গিলে ফেলিল। আমি স্বচক্ষে দেখেছি। হাঁগা সাহেব ! তুমি কি লরেন্স ফষ্টর ?"

চন্দ্রশেখর গদগদকণ্ঠে সকাতরে ডাকিলেন, "গুরুদেব ! একি করিলে ? একি করিলে ?"

শৈবলিনী গীত গায়িল

"কি করিলে প্রাণ সখি, মনচোরে ধরিবে,
ভাসিল পীরিতি নদী দুই কূল ভরিবে।"

বলিতে লাগিল, "মনোচোর কে ? চন্দ্রশেখর। ধরিল কাকে ? চন্দ্রশেখরকে। ভাসিল কে ? চন্দ্রশেখর। দুই কূল কি ? জানি না। তুমি চন্দ্রশেখরকে চেন ?"

চন্দ্রশেখর বলিলেন, "আমিই চন্দ্রশেখর।"

শৈবলিনী ব্যাঘ্রীর ন্যায় ঝাঁপ দিয়া চন্দ্রশেখরের কণ্ঠলগ্ন হইল—কোন কথা না বলিয়া, কাঁদিতে লাগিল—কত কাঁদিল—তাহার অশ্রুজলে চন্দ্রশেখরের পৃষ্ঠ, কণ্ঠ, বক্ষ, বস্ত্র, বাহু প্লাবিত হইল। চন্দ্রশেখরও কাঁদিলেন। শৈবলিনী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল—"আমি তোমার সঙ্গে যাইব।"

চন্দ্রশেখর বলিলেন, "চল।"

শৈবলিনী বলিলেন, "আমাকে মারিবে না।"

চন্দ্রশেখর বলিলেন " না।"

দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া চন্দ্রশেখর গাত্রোত্থান করিলেন। শৈবলিনীও উঠিল। চন্দ্রশেখর কাঁদিতে কাঁদিতে চলিলেন—উন্মাদিনী পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল—কখন হাসিতে লাগিল, কখন কাঁদিতে লাগিল, কখন গায়িতে লাগিল।

১ •

এস এস সখে ! প্রিয় দরশন—
বাল সহচর—অনন্ত-হৃদয় !
শৈশবে, সলিলে সলিল যেমন,
উভয় হৃদয় হইয়াছে লয় ।
তোমার আমার জীবন যুগল,
এক বৃক্ষে দুই লতার মতন ;
শৈশবে যখন হৃদয় কোমল,
অনন্ত বেষ্টনে করেছে বেষ্টন ।

২

এক বিদ্যালয়ে পড়েছি দুজনে,
একই প্রাঙ্গণে করেছি খেলা,
সম সুখ দুঃখে ভাসিয়াছি মনে,
সরল হৃদয়ে-শৈশব বেলা ।
যেই প্রেমে ধরি গলায় গলায়,
যাইতাম সুখে অধ্যয়ন তরে ;
সেই প্রেমে ধরি গলায় গলায়,
অধ্যয়ন করি আসিতাম ঘরে ।

৩

সেই প্রেম—কত বৎসরের পরে,
উছলিছে আজি, হৃদয়ে আমার,
নিদাঘে বিশুষ্ক পর্ব্বত নির্ঝরে,
যেন হলো আজি বরিষা সঞ্চার ;—
সেই স্রোতে এই কয়েক বৎসর
গিয়াছে ভাসিয়া : আজি মনে লয়,
যুড়াতে কৈশোর বিদগ্ধ অন্তর,
ফিরে এল সেই শৈশব সময় ।

৪

সংসার-সাগর——চিন্তার তরঙ্গ—
দারিদ্র্য দাহন——দাসত্ব দংশন,
যেন অকস্মাৎ হলো স্বপ্ন ভঙ্গ,
বোধ হইতেছে, সকলই স্বপন ।
আইস আবার গলায় গলায়,
কহি শুনি সুখ দুঃখ সমাচার,
বিদেশে, বিভূমে, ঈশ্বর কৃপায়,
আছিলে ত ভাল বল একবার ?

৫

দুঃখিনী ভারতে অকূল সাগরে,
ভাসাইয়া যবে চলিলে সখা,
কি ভাব উদয় হইল অন্তরে,
দেখিয়া মলয়-অচল রেখা ?
মলয়াবারের তীর সুবঙ্কিম,
মিশাইল যবে জলধি জলে ?
মলয়-অচল উজ্জ্বল নীলিম,
মিশাইলে নীল আকাশ তলে ?

৬

পার্থিব জগত, ছায়া বাজি প্রায়,
লুকাইলে দূরে ; অসীম আকাশ
সসীম মণ্ডলে ঘেরিয়া তোমায়,
ঢাকিল যখন নীলাম্বু নিবাস :
অধীনস্থে যেন সরোষে ফেলিয়া
অসীম জলধি, বীরদর্প ভরে,
নাচিল যখন উর্ম্মি আস্ফালিয়া,
কি ভাব উদয় হইল অন্তরে ?

• Covenanted.

৭

কি ভাব উদয় হইল অন্তরে ?
লঙ্ঘিয়া যখন ভীম পারাবার,
লঙ্ঘিয়া—হায় রে ! হৃদয় বিদরে,—
অভাগা বাঙ্গালি অদৃষ্ট দুর্ব্বার,
অদূরে যখন করিলে দর্শন,
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম শ্বেত ব্রিটনীয়া,
(রত্নাকর গর্ভে রত্ন সর্ব্বোত্তম)
হৃদয় কি তব উঠিল নাচিয়া ?

৮

নির্জ্জীব, দুর্ব্বল, বাঙ্গালি হৃদয়,
নাচিল কি সুখে ! নাবিলে যখন
ব্রিটনীয়া তীরে ? কবিগণে কয়,
ইংলণ্ড পরশে হয় বিমোচন,
আজন্ম দাসের দাসত্ব বন্ধন——
পাপরাশি যথা জাহ্নবী পরশে ;
কিন্তু ভারতের গলার বেষ্টন,
চির লৌহময় দুরদৃষ্ট বশে !

৯

ইতিহাসে কহে অভাগী ভারত,
ব্রিটনীয়া শিরে মুকুট-রতন ;
কিন্তু সেই রত্ন কোথায়, কি মত,
ব্রিটনীয়াবাসী ভাবে কি কখন ?
ভাবে কি কখন,—অভাগিনী পড়ি
হিমাদ্রি গহ্বরে, সমুদ্র ভিতরে,
(বহে শত নদী অশ্রুধারা ঝরি !)
মুমূর্ষার মত রহিয়াছে পড়ে ?

১০

ভারত জীবন, যাহাদের করে,
যাবেন কি তাঁরা ভারত অমর ?
পোড়াও আগুনে, ডুবাও সাগরে,
মুমূর্ষু জীবন হবে না অন্তর ।
কিন্তু মুছাইয়া নয়নের জল,
কর ক্ষীণ দেহে জীবন সঞ্চার,
আবার ভারত, ছাড়ি হিমাচল
তুলিবে মস্তক—মরি ! দুরাশার

১১

কি সুখ—ছলনা ! নাহি কাজ তাহে ।
বল বল সখে ! দেখেছ কি তুমি,
পতিতা বিগত বিপ্লব প্রবাহে,
জগৎ-গৌরব ফ্রান্স বীরভূমি ?
ফরাসি গৌরব সমাধি "সিডনে" (১)
দাঁড়াইয়া শোকে বিষাদে বিহ্বল,
ফরাসি অদৃষ্টে—বাঙ্গালি নয়নে
ঝরেছিল না কি এক বিন্দু জল ?

১২

রুসিয়া প্রুসিয়া—নব গৌরবিণী
রণ রঙ্গভূমে সিংহিনী যুগল !
চলিছে রুসিয়া দক্ষিণ বাহিনী,
ব্রিটিশ হর্য্যাক্ষ কটাক্ষে বিহ্বল !
একদিকে ফ্রান্স, কুন্তল-শায়িনী,
অন্যত্রে প্রুসিয়া হঠাৎ-প্রবল,—
দর্শি দুই চিত্র !—ভাব প্রবাহিণী !
অন্ধ মানবের কি শিক্ষার স্থল !

১৩

আর এক পদ !—একেবারে তুমি
ডুবিলে অদৃষ্ট অতল সাগরে,
সম্মুখে তোমার রোম রঙ্গভূমি,
চিহ্নমাত্র আছে নদ টাইবরে !
ভুবন বিজয়ী অভিনেতৃগণ,
সময়ের গর্ভে হইয়াছে লয় ;
জগতবিস্ময় কীর্ত্তি অগণন,
কাল কালে ওই নদে মাত্র কয় !

---

(১) Sedan.

১৪

গ্রীকের গৌরব শ্মশান যুগল—
স্পার্টা, এথেন্স—করিয়া দর্শন,
ফিরিলে না সখে! নয়নের জল,
হস্তিনা, অযোধ্যা, করিয়া স্মরণ?
তীর্থ "থর্ম্মপলি" দেখেছ কি হায়!
শত বীরে যথা, রক্তে আপনার,
স্বাধীনতা রত্ন রাখিল হেলায়?
ভারতে আমরা তুলনায় তার—

১৫

যাক্ সেই দুঃখ কি হবে বলিয়া?
বল সখে তব আছে কি স্মরণ?
যাইতে ইংলণ্ডে, অশ্রুতে ভাসিয়া
বলেছিলে—মনে আছে কি এখন?
বলেছিলে—"মাতঃ ভারত দুঃখিনি!
তব দুঃখে মাত! হৃদয় বিকল:
সহিতে না পারি, দিবস যামিনী
ভারত বৈধব্য—মাতৃ-চিতানল।"

১৬

অকূল, দুর্লঙ্ঘ্য সিন্ধু অতিক্রমি,
বীরত্বের খনি ব্রিটনে পশিয়া;
যগত জীবন ইউরোপে ভ্রমি
আসিয়াছে সখে কি ফল লভিয়া?
শিখেছ সাহিত্য, শিখেছ দর্শন:
শিখেছ গণিতে নক্ষত্র মণ্ডল,
কিন্তু তাহে সখে! হবে কি বারণ
"মাতার রোদন,—মাতৃ-চিতানল?"

১৭

ইংরাজের শস্ত্র, ইংরাজের বেশ,
ইংরাজি আহার—প্রিয় আভিজন,
আনিয়াছ সখে! ইংরাজের বেশ,
কিন্তু ইংরাজের কই বীর্য্য বল?
কই ইংরাজের তীক্ষ্ণ তরবার?
কই ইংরাজের দুর্জ্জয় কামান?
কই ইংরাজের সাহস অপার?
সিংহ চর্ম্মে তুমি মেষ অল্প প্রাণ!

১৮

হয়েছে "চিহ্নিত!"—কিন্তু সেই চিহ্ন
তব পক্ষে হায়! কলঙ্ক কেবল,
সেই চিহ্নে সখে হইবে না ছিন্ন,
দীনা ভারতের অদৃষ্ট শৃঙ্খল।

• • • • •

শ্রীনঃ

এই উৎকৃষ্ট কবিতার শেষাংশ অনুমোদনীয় নহে।—বং সম্পাদক।

সর উইলিয়ম গ্রে ও সর জর্জ কাম্বেল

পূর্ব্ববঙ্গবাসী কোন বর, কলিকাতা নিবাসী একটি কন্যা বিবাহ করিয়া গৃহে লইয়া যান। কন্যাটি পরমাসুন্দরী, বুদ্ধিমতী, বিদ্যাবতী, কর্ম্মিষ্ঠা এবং সুশীলা। তাঁহার পিতা মহা ধনী, নানা রত্নে ভূষিতা করিয়া কন্যাকে শ্বশুর গৃহে পাঠাইলেন। মনে ভাবিলেন, আমার মেয়ের কোন দোষ কেহ বাহির করিতে পারিবে না। সঙ্গের লোক ফিরিয়া আসিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন হে বাঙ্গালেরা মেয়ের কোন দোষ বাহির করিতে পারিয়াছে?" সঙ্গের লোক বলিল, "আজ্ঞা হাঁ—দোষ লইয়া বড় গণ্ডগোল গিয়াছে।" বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"সে কি? কি দোষ?" ভৃত্য বলিল, "বাঙ্গালেরা বড় নিন্দা করিয়াছে, মেয়ের কপালে উল্কি নাই।" আমরা এই বঙ্গদর্শনে, কখন সর্ জর্জ কাম্বেল সাহেব সম্বন্ধে কোন কথা বলি নাই। যাঁহার নিন্দা তিন বৎসরকাল বাঙ্গালাপত্রের জীবন স্বরূপ ছিল, তাঁহার কোন উল্লেখ না থাকাতে, আমাদের ভয় করে যে পাছে কেহ বলে, যে বঙ্গদর্শনের উল্কি নাই। আমরা অদ্য বঙ্গদর্শনকে উল্কি পরাইতে প্রবৃত্ত হইলাম।

তবে এই উল্কি বড় সামান্য নহে। যে পত্র বা পত্রিকা—(কোন্‌গুলি পত্র আর কোন্‌গুলি পত্রিকা তাহা আমরা ঠিক্ জানি না—কি করিলে পত্র পত্রিকা হইয়া যায়, তাহাও অবগত নহি)—যে পত্র বা পত্রিকা একবার কপালে এই উল্কি পরিয়াছেন, তিনি বঙ্গদেশ মোহিয়াছেন, মুগ্ধ হইয়া বঙ্গীয় পাঠকগণ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়াছে—এবং সাম্বৎসরিক অগ্রিম মূল্যে বরণ করিয়া তাঁহাকে ঘরে তুলিয়াছে। যে এই উল্কি পরে, তাহার অনেক সুখ।

এক্ষণে সর্ জর্জ কাম্বেল এতদ্দেশ ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন—ইহাতে সকলেই দুঃখিত। এ পৃথিবীতে পরনিন্দা প্রধান সুখ—বিশেষ যদি নিন্দিত ব্যক্তি উচ্চশ্রেণীস্থ এবং গুণবান্ হয় তবে আরও সুখ। সর্ জর্জ কাম্বেল গুণবান্ হউন বা না হউন উচ্চশ্রেণীস্থ বটে। তাঁহার নিন্দায় যে সুখ, তাহাতে এক্ষণে বঙ্গদেশের

লোক বঞ্চিত হইল। ইহার অপেক্ষায়, আর গুরুতর দুর্ঘটনা কি হইতে পারে। এই যে গুরুতর দুর্ভিক্ষ-বহ্নিতে দেশ দগ্ধ হইতেছিল—তাহাতেও আমরা কোন মতে প্রাণ ধারণ করিতেছিলাম—খবরের কাগজ চলিতেছিল, বাঙ্গালি বাবু গণের মজলিশে অশ্লীল গল্প ছাড়িয়া, সর্ জর্জের নিন্দা করিয়া বোতল শেষ করিতেছিলেন। কিন্তু এক্ষণে? হায়। এক্ষণে কি হইবে।

এইরূপ সর্ব্বজননিন্দার্হ হওয়া সচরাচর দেখা যায় না। অনেকে বলিবেন, সর্ জর্জ কাম্বেলের অসাধারণ দোষ ছিল, এইজন্যই তিনি এইরূপ অসাধারণ নিন্দনীয় হইয়াছিলেন। আমাদিগের বিশ্বাস আছে যে এইরূপ সর্ব্বজন নিন্দনীয় হয়, যাহার নিন্দায় সকলের তুষ্টি জন্মে, সে হয় অসাধারণ দোষে দোষী বা অসাধারণ গুণে গুণবান্—নয়ত দুই। জিজ্ঞাস্য, সর্ জর্জ কাম্বেল, অসাধারণ দোষে দোষী, না অসাধারণ গুণে গুণবান্ বলিয়া তাঁহার এই নিন্দাতিশয্য হইয়াছিল?

তাঁহার পূর্ব্বগামী শাসনকর্ত্তা সর্ উইলিয়ম গ্রে। সর্ উইলিয়ম গ্রের ন্যায় কোন লেঃ গবর্ণর প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হয়েন নাই। সর্ জর্জ কাম্বেল ও সর্ উইলিয়ম গ্রের এই ভাগ্যতারতম্য কোন্ দোষে বা কোন্ গুণে? কোন্ গুণে সর্ উইলিয়ম সকলের প্রিয়, কোন্ দোষে সর্ জর্জ সকলের অপ্রিয়?

যাঁহারা এই কথার মীমাংসা করিতে ইচ্ছুক তাঁহাদিগকে একটা কথা বুঝাইতে হয়। এই ব্রিটিশ ভারতীয় শাসন প্রণালী দূর হইতে দেখিতে বড় জাঁক, শুনিতে ভয়ানক, বুঝিতে বড় গোল—ইহার প্রকৃতি কি প্রকার? এক লেঃ গবর্ণর কর্ত্তৃক যে এই বৃহৎ রাজ্য শাসিত হয় সে কোন্ রীতি অবলম্বন করিয়া?

সে রীতি দুই প্রকার। একটি রীতি, একটি সামান্য উদাহরণের দ্বারা বুঝাইব। মনে কর, বাঁধের কথা উপস্থিত। কমিস্যনরের রিপোর্টে হউক, বোর্ডের রিপোর্টে হউক, ইঞ্জিনিয়রদিগের রিপোর্টে হউক, সম্বাদপত্রে হউক, লেঃ গবর্ণর জানিলেন যে, নদীতীরস্থ প্রাচীন বাঁধ সকল রক্ষিত হইতেছে না—তাহার উপায় করা কর্ত্তব্য। তখন লেঃ গবর্ণরের হুকুম হইল যে রিপোর্ট তলব কর। এই হুকুমে যদি কোন বিশেষ গুণশালিত্ব বা যোগ্যতা থাকে, তবে সে গুণশালিত্ব বা যোগ্যতা লেঃ গবর্ণরের। সেক্রেটরি সাহেব হুকুম পাইয়া, বোর্ডে চিঠি লিখিলেন—তাঁহার চিঠিতে কথাটা একটু বিস্তৃতি পাইল—তিনি বলিলেন ইহার বিশেষ অবস্থা জানিবে—অধীনস্থ কর্ম্মচারীদিগের অভিপ্রায় কি তাহা লিখিবে, ইহার কিরূপ উপায় হইতে পারে তাহা লিখিবে। বোর্ড, ঐ পত্রখানির একাদশ খণ্ড অতি পরিষ্কার অনুলিপি প্রস্তুত করিয়া, একাদশ কমিস্যনরের নিকট পাঠাইলেন। একাদশ কমিস্যনর, অনুলিপি প্রাপ্ত হইয়া তাহার কোণে পেন্সিলে প্রাপ্তির তারিখ লিখিয়া বাক্সে ফেলিলেন, তাঁহার গুরুতর কর্ত্তব্য কার্য্য সমাপ্ত হইল। বাক্স প্রাচীন প্রথানুসারে

যথাসময়ে চাপরাশির স্কন্ধে আরোহণ করিয়া, কেরাণীর নিকট পৌঁছিল। কেরাণী তাহার আর এক এক খণ্ড পরিষ্কার অনুলিপি প্রস্তুত করিয়া সাত দিনের মিয়াদ লিখিয়া দিয়া, কালেক্টরদিগের নিকট পাঠাইলেন। যে পথে মহাজন-- যায় সেই পথ,—দোর্দ্দণ্ড প্রচণ্ড প্রতাপান্বিত শ্রীল শ্রীযুক্ত কালেক্টর বাহাদুর, চুরট খাইতে খাইতে চিঠির কোণে লিখিলেন, "সব্ ডিবিজন ও ডেপুটিগণ বরাবর।" চিঠি এইরূপে বড় ডাকঘর হইতে মেজো ডাকঘরে, মেজো ডাকঘর হইতে ছোট ডাকঘরে এবং তথা হইতে শেষে আটচালা নিবাসী বোতামশূন্য চাপকানধারী কাল-কোল নাদুস নুদুস ডিপুটি বাহাদুরের ছিন্ন পাদুকামণ্ডিত শ্রীপাদপদ্মযুগলে মধুলুব্ধ ভ্রমরের ন্যায় আসিয়া পড়িল। ডিপুটি বাহাদুরেরা প্রায় উপরস্থ মহাত্মাদিগের অনুকরণ করিয়া, ইংরেজি চিঠির বাঙ্গালা পরওয়ানা করিয়া সবইনস্পেক্টরগণের নিকট ফেলফোর রিপোর্ট তলব করিলেন—সবইনস্পেক্টর পরওয়ানা কনষ্টেবলের হাওয়ালা করিল—কনষ্টেবল যে গ্রামে বাঁধ সেইখানে, কাল কোর্ত্তা কাল দাড়ি এবং মোটা রুল লইয়া, দর্শন দিয়া এক অন্নাভাবে শীর্ণ ক্লিষ্ট চৌকিদারকে ধরিল। ধরিয়াই জিজ্ঞাসা করিল যে "তোদের গাঁয়ের বাঁধ থাকে না কেন রে?" চৌকিদার ভীত হইয়া বলিল, "আজ্ঞা, জমীদারে মেরামত করে না, আমি গরিব মানুষ কি করিব?" কনষ্টেবল তখন জমীদারী কাছারিতে পদরেণু অর্পণ করিয়া গোমস্তাকে কিছু তম্বী করিলেন। গোমস্তা জমীদারী খাতায় পাঁচ টাকা খরচ লিখিয়া কনষ্টেবল বাবুকে দেড় টাকা পারিতোষিক দিয়া বিদায় করিলেন। কনষ্টেবল আসিয়া সবইনস্পেক্টর সমক্ষে রিপোর্ট করিলেন "বাঁধ সব বেমেরামত—জমীদার মেরামত করে না—জমীদার মেরামত করিলেই মেরামত হইতে পারে।" ডিপুটি বাহাদুর লিখিলেন, "বাঁধ সব বেমেরামত,—জমীদারেরা মেরামত করে না—তাহারা মেরামত করিলেই হয়।" কালেক্টর বাহাদুর সেই সকল কথা লিখিলেন, অধিকন্তু "এক্ষণে জমীদারদিগকে বাঁধ মেরামত করিতে বাধ্য করা উচিত।" কমিশ্যনর, সেই সকল কথা লিখিয়া বোর্ডে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এক্ষণে, কি প্রকারে জমীদার বাঁধ মেরামত করিতে বাধ্য হইতে পারে?" বোর্ড তত্তদুক্তি পুনরুক্ত করিয়া, একটা যাহা হয় উপায় নির্দ্দিষ্ট করিলেন। সেক্রেটরি সাহেব সেই সকল কথা সাজাইয়া লিখিয়া এক রিজলিউসনের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়া পাঠাইলেন, লেঃ গবর্ণর সাহেব, সম্মত হইয়া তাহাতে দস্তখত করিয়া দিলেন। আজ্ঞা দেশে প্রচারিত হইল; লেঃ গবর্ণর বাহাদুরের যশ দেশে বিদেশে ঘোষিল। যাহারা মিত্রপক্ষ তাহারা গবর্ণর বাহাদুরের প্রশংসা করিতে লাগিল—শত্রুপক্ষ নানা জাতীয় ইংরেজি বাঙ্গালায় তাঁহাকে গালি পাড়িতে লাগিল। নষ্টের গোড়া চৌকিদার নির্ব্বিঘ্নে স্বদেশে কোদালি পাড়িতে লাগিল।

বাস্তবিক যে এইরূপ কোন প্রকৃত ঘটনা ঘটিয়াছে, এমত নহে। একটি কল্পিত ঘটনা অবলম্বন করিয়াই এ সকল কথা লিখিলাম। এইরূপ যে সচরাচরই ঘটিয়া থাকে, এমত নহে। কিন্তু অনেক সময়ে ঘটে। সৌভাগ্যক্রমে যাঁহারা সুযোগ্য শাসনকর্ত্তা, তাঁহারা এ প্রথা অবলম্বন করেন না, অযোগ্যেরা করিয়া থাকেন। এইরূপ কার্য্যপ্রণালীকে "কলে শাসন" বলা যাইতে পারে। ধর্ম্মের কলের ন্যায় শাসনের কলও বাতাসে নড়িয়া থাকে ; কোন দিগ্ হইতে কোন কর্ম্মচারীর রিপোর্টের বাতাস, বা অন্য প্রকার ঝাঁপি উঠিয়া, কলে লাগিলে, কল চলিতে আরম্ভ করে ; তদন্তের হুকুম হইতে কলের দম আরম্ভ হইয়া বোর্ড কমিস্যনর প্রভৃতি অধোধঃ পর্য্যায়ক্রমে ঘুরিয়া আবার লেঃ গবর্ণর পর্য্যন্ত আসিয়া সহি মোহরের মঞ্জুরি মুদ্রিত করিয়া দিয়া বন্ধ হয়। যেমন কলের ধুতি, কলের সূতা প্রভৃতি সামগ্রী আছে, তেমনি কলে তৈয়ারি রাজাজ্ঞাও আছে।

যে লেঃ গবর্ণর এইরূপ কলে শাসন করেন, তিনি সুমানুষ হইলে হইতে পারেন ; তদ্ভিন্ন তাঁহার বুদ্ধিমত্তা, যোগ্যতা বা অন্য কোন গুণের প্রশংসার কারণ দেখা যায় না। তিনি কখন আপন বুদ্ধির চালনা করেন না, কোন বিষয়ের সদ্বিবেচনা করিবার জন্য তাঁহাকে নিজে কষ্ট পাইতে হয় না। তিনি পরিশ্রম স্বীকার করিয়া কখন কোন নূতন বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়েন না ; পরিশ্রম স্বীকার করিয়া কোন বিষয়ের যথার্থ স্বয়ং মীমাংসা করেন না। তিনি শাসন যন্ত্রের একটি অংশ মাত্র—যখন রাজ্যের কল বাতাসে নড়িল, তখন তিনিও নড়িলেন, কলে চালিত হইয়া মঞ্জুরি লিপি সমেত সহিমোহর করিয়া দিয়া কলে থামিলেন। সেইরূপ ঘণ্টাপূর্ণ হইলে, ঘড়ির মূরদ, বাহির হইয়া, ঠংঠং করিয়া ঘণ্টা বাজাইয়া, আবার কলে মিশিয়া যায়।

সর্ উইলিয়ম গ্রে ও সর্ জর্জ কাম্বেলে প্রধান প্রভেদ এই যে সর্ উইলিয়ম গ্রে কলে শাসন করিতেন, সর্ জর্জ কাম্বেল তাহা করিতেন না।

কলে শাসনের অনেক গুণ আছে। তাহার ফল ভাল হউক, মন্দ হউক, লোকের অসন্তোষের সম্ভাবনা অতি অল্প। যাহা পূর্ব্বাপর চলিয়া আসিতেছে, তাহা নিতান্ত অনিষ্টকর হইলেও, লোকে তাহাতে সন্তুষ্ট ; পূর্ব্ব প্রচলিতা রীতি অত্যন্ত অনিষ্টকারী হইলেও লোকে তাহার সংশোধনে অসন্তুষ্ট। পুরাতনের মন্দও ভাল, নূতনের ভালও মন্দ। কলের শাসন, শাসনই নহে ; যিনি কলে শাসন করেন, তিনি কিছু করেন না বলিলেই হয়। অতএব কলের শাসনে পুরাতনের কিঞ্চিন্মাত্র সংস্করণ ভিন্ন নূতন কখন ঘটে না; যাহা আছে, তাহাই প্রায় বজায় থাকে, যাহা নাই, অথচ আবশ্যক, প্রায় তাহা ঘটিয়া উঠে না। এজন্য লোকেরও অসন্তোষ জন্মে না ; বিশেষ এদেশীয় লোক পুরাতনের অত্যন্ত অনুরাগী, নূতনে অত্যন্ত বিরক্ত।

সর্ উইলিয়ম গ্রে, কলে শাসন করিতেন, সুতরাং লোকের বড় প্রিয় ছিলেন। সর্ জর্জ কাম্বেল, কলে শাসন করিতেন না, এজন্য লোকের বড় অপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। রাজ্যশাসন উভয়েরই উদ্দেশ্য; কিন্তু সর্ উইলিয়ম গ্রের উদ্দেশ্য ছিল কেবল শাসনের কল চালান; সর্ জর্জ কাম্বেলের উদ্দেশ্য শাসনের উদ্দেশ্য সফল করা। এমত বলিতেছিনা যে সর্ জর্জ কাম্বেল সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার শাসনে সুফল ফলিয়াছে, সর্ উইলিয়ম গ্রের শাসনে কুফল ফলিয়াছে, একথা বলাও আমাদের অভিপ্রায় নহে। কেবল বলিতে চাই যে, সর্ জর্জ কাম্বেল আপন বুদ্ধিতে চলিতেন; এ বৃহৎ রাজ্যশাসন জন্য চিন্তা করিতেন; উদ্দেশ্যগুলি স্থির করিয়া, তাহার সাধনে প্রাণপণে যত্ন করিতেন; যে কার্য্য কর্ত্তব্য এবং সাধ্য বলিয়া বুঝিতেন, কিছুতেই তাহা হইতে বিরত হইতেন না। সর্ উইলিয়ম গ্রে এ সকল কিছুই করিতেন না। যাহা হয় আপনি হউক; কেহ কল টিপিয়া দেয় ত কল চলুক,—আমি কিছুর মধ্যে থাকিব না। নিজের বুদ্ধি গ্রে সাহেব প্রায় খরচ করিতেন না; জমার অঙ্কে কিছু ছিল কি না বলা যায় না। নিজের যত্ন প্রায় তাঁহার কোন বিষয়ে ছিল না। তাঁহার দ্বারা যে কিছু সৎকার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে—তাহা কলে; তাঁহার দ্বারা যে কিছু অনিষ্ট ঘটিয়াছে, তাহা কলে। তিনি উচ্চ শিক্ষার পোষক ছিলেন বলিয়া বাঙ্গালি-মহলে বড় প্রশংসিত; কিন্তু বাঙ্গালি বাবুদিগের মত, আসল কথাটা কি তাহা বুঝেন নাই; কেবল আট্‌কিন্সন সাহেব কল টিপিয়া দিয়াছিলেন বলিয়া কলের পুত্তলী সর্ উইলিয়ম গ্রে উচ্চ শিক্ষার পোষকতা করিয়াছিলেন, ঘড়ির মুরদ ঘড়ি পিটিয়া দিয়া কলে লুকাইয়াছিলেন।

এমন নহে যে, সর্ জর্জ কাম্বেলের সময় কলে শাসন একেবারে ছিল না। শাসনের কল চিরকাল বজায় আছে; যিনি ইচ্ছা তিনি শাসন-কর্ত্তা হউন, সে কল মধ্যে মধ্যে বাতাসে নড়িবে; সকল শাসনকর্ত্তাকেই শাসনের কল চালাইয়া কতকগুলি কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে। তবে সর্ জর্জ কাম্বেল কলে সিদ্ধ তত্ত্বগুলি অবশ্যগ্রাহ্য মনে করিতেন না; ইচ্ছানুসারে তাহা ত্যাগ করিতেন; ইচ্ছানুসারে তত্তৎস্থানে নূতন সিদ্ধান্ত আদিষ্ট করিতেন। সর্ জর্জ কাম্বেল কল নিজে চালাইতেন, স্বয়ং কলের অংশ ছিলেন না।

সর্ উইলিয়ম গ্রে সকলের মন রাখিয়া কাজ করিতেন; গালিগালাজকে বড় ভয় করিতেন। সম্বাদপত্রের ভয়ে তটস্থ ছিলেন; ব্রিটীশ ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েসনকে মুরুব্বি বলিয়া মানিতেন। সুখ্যাতির আশায় এবং গালির ভয়ে, তিনি সম্বাদপত্রের আজ্ঞাকারী ছিলেন; ব্রি, ই, আসোসিয়েসনের প্রধান মেম্বরদিগের কেনাবেচার মধ্যে ছিলেন। সর্ জর্জ কাম্বেল কাহারও নিকট সুখ্যাতি খুঁজিতেন না; কাহারও অনুরোধ রাখিতেন না। সম্বাদপত্রসকলকে ঘৃণা করিতেন,

ব্রিটীশ ইঃ আসোসিয়েসনকে ব্যঙ্গ করিতেন। অতএব একজন যে লোকের প্রিয়, আর একজন অপ্রিয় হইবেন ইহা সহজেই অনুমেয়।

সর্ উইলিয়ম গ্রে কিয়দংশে প্রিয়বাদী ছিলেন, সর্ জর্জ কাম্বেল বড় অপ্রিয়বাদী ছিলেন। সকলকে কটু বলায় সর্ জর্জ কাম্বেলের বিশেষ আমোদ ছিল। তাঁহার গুরুতর অহঙ্কারই এই অপ্রিয়বাদিত্বের একটী প্রধান কারণ। তিনি জানিতেন যে, পৃথিবীতে বুদ্ধিমান্, পণ্ডিত এবং বিজ্ঞ একা সর্ জর্জ কাম্বেল; আর সকল মনুষ্যই মূর্খ, নির্ব্বোধ, অসার, ভণ্ড এবং স্বার্থপর। তিরস্কারই তাহাদের উপযুক্ত ব্যবহার। এইরূপ তমোভিভূত হইয়া সর্ জর্জ কাম্বেল, কাহারও পরামর্শ গ্রাহ্য করিতেন না। নিজেও দেশের অবস্থা কিছুই জানিতেন না। অথচ সকল বিষয়েই আত্মবুদ্ধিমত মীমাংসা করিয়া হস্তক্ষেপ করিতেন। তাহাতে অনেক অনিষ্ট ঘটাইয়াছেন।

সর্ জর্জ কাম্বেল এদেশীয়গণকে বিশেষ ঘৃণা করিতেন। তিনি বিবেচনা করিতেন, ইহারা অকর্ম্মণ্য—কোন গুরুতর ভারের অযোগ্য। এই ঘৃণা, তাঁহার শাসনকার্য্যের আর একটি ঘোরতর বিঘ্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। যাহার প্রতি ঘৃণা আছে তাহার সুখ দুঃখের ভাগী হওয়া যায় না, প্রজার সুখ দুঃখের ভাগী না হইলে, কখন প্রজার সুখ বৃদ্ধি, দুঃখ নিবারণ করা যায় না।

সর্ উইলিয়ম গ্রে ও সর্ জর্জ কাম্বেল উভয়েই স্বেচ্ছাচারী ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। যিনি যাহা ধরিতেন, তিনি তাহা আর ছাড়িতে চাহিতেন না। দুই জনের "রোখ" বড় ভয়ানক ছিল—দণ্ড প্রণয়নের সাধ দুই জনেরই বড় গুরুতর ছিল। দুই জনেরই একটি নিতান্ত নিন্দনীয় দোষ ছিল যে, বিনাপরাধেও দণ্ডবিধান করিতেন। বিশেষ সর্ জর্জ কাম্বেলের ন্যায়নিষ্ঠতা কিছুই ছিল না।

স্থূল কথা এই যে সর্ জর্জ কাম্বেল অত্যন্ত গর্ব্বিত, আত্মাভিমানী, কৃষ্ণচর্ম্মে ঘৃণাবিশিষ্ট, পরোপদেশে বিরক্ত, স্বেচ্ছাচারী, অপ্রিয়বাদী, অপ্রিয়কারী, অন্যায়পর শাসনকর্ত্তা ছিলেন। সর্ উইলিয়ম গ্রের এত দোষ ছিল না; তিনি কেবল স্থূলবুদ্ধি ছিলেন; কোন রূপে লোকের মন রাখিয়া, কলে শাসন করিয়া, নিন্দার হাত হইতে মুক্তিলাভ তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল।

গুণ পক্ষে, সর্ জর্জ কাম্বেল সাহেবের নিতান্ত অভাব ছিল না। তিনি বুদ্ধিমান, সুপণ্ডিত, পরিশ্রমী এবং অধ্যবসায় সম্পন্ন। দুর্ভিক্ষের ব্যাপারে দেখা গিয়াছে, তিনি ক্ষিপ্রকারী এবং দূরদর্শী। তিনি সাম্যবাদী। প্রজার কোন মঙ্গল সিদ্ধ করিয়া থাকুন, বা না থাকুন, তিনি প্রজার হিতৈষী। সর্ উইলিয়ম গ্রের গুণের মধ্যে কেবল ইহাই আমাদের স্মরণ হইতেছে যে, তিনি অপেক্ষাকৃত নিরপেক্ষ ছিলেন। সর্ জর্জ কাম্বেলের মত বহু গুণে গুণবান্ ও বহু দোষে দোষী শাসনকর্ত্তা

কেহই এদেশে আসেন নাই : সর্ উইলিয়ম গ্রের মত দোষশূন্য ও গুণশূন্য কেহ আসেন নাই। গুণবান্ ও দোষযুক্তের শত্রু অনেক ; নির্দ্দোষ ও নির্গুণের শত্রু থাকেনা! সর্ জর্জ কাম্বেলের নিন্দা এবং সর্ উইলিয়ন গ্রের সুখ্যাতির কারণই এই।

কিন্তু কিছু বিবেচনা করিয়া দেখিলে, সে নিন্দা ও সুখ্যাতির সকল কারণ বজায় থাকে না। দুই একটা উদাহরণের দ্বারা এ কথা প্রতিপন্ন করিতেছি।

রোডশেষের আইন প্রচার করার জন্য সর্ জর্জ কাম্বেল বিশেষ নিন্দিত, কিন্তু এবিষয়ে সর্ জর্জ কাম্বেলের দোষ কি? তিনি কেবল উপরিস্থ কর্ম্মচারীর আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়াছিলেন। রোডশেষের দায়ী ডিউক্ অব আর্গাইল; অধস্তন কর্ম্মচারীর সাধ্য নাই উপরিস্থ কর্ম্মচারীর আজ্ঞা লঙ্ঘন করেন। সর্ জর্জ কাম্বেল রোডশেষ বিধিবদ্ধ করিয়া অলঙ্ঘনীয় আজ্ঞাপালন করিয়াছেন মাত্র।

নূতন কার্য্যবিধি আইনের দুইটি নিয়মের জন্য সর্ জর্জ কাম্বেল নিন্দিত হইয়া থাকেন। প্রথম, জুরির বিচারের অলঙ্ঘনীয়তার উচ্ছেদ, দ্বিতীয়, সরাসরি বিচারের প্রথা।

সারসরি বিচার প্রথার আমরা অনুমোদন করি না। অনুমোদন করি না, তাহার কারণ এই যে, এ দেশীয় বিচারকগণ অনেকেই এই ক্ষমতার অযোগ্য। কিন্তু বিচারক অযোগ্য বলিয়া, আইন অসম্পূর্ণ থাকিবে কেন? একটি কথা বিশেষ বিবেচনা করা আবশ্যক। যেরূপ লিখিত বিচার প্রণালী প্রচলিত, তাহাতে একটি ফৌজদারী মোকদ্দমা করিতে অনেক বিলম্ব হয়। বিচারকেরা যে কয়েকটির বিচার করিতে পারেন, সেই কয়টির বিচার করিয়া অবশিষ্টের দিন ফিরাইয়া দেন। এইরূপ অনেক মোকদ্দমার দিন, পুনঃ পুনঃ ফিরিয়া যায়। অর্থী প্রত্যর্থী অনেকবার কষ্ট পাইয়া,-রফা করিয়া চলিয়া যায়। না হয়, সাক্ষী পলায়; নয়, ধনী পক্ষ, সময় পাইলে অর্থ ব্যয় করিয়া সাক্ষিগণকে বশীভূত করে। এইরূপে বিচারকের অনবকাশে অনেক মোকদ্দমার বিচার একেবারে হয় না। ইহার দুইটী মাত্র উপায় সম্ভবে; প্রথম, বিচারকের সংখ্যা বৃদ্ধি, দ্বিতীয় বিচারকের অবকাশ বৃদ্ধি। প্রথম উপায়, অর্থব্যয়সাপেক্ষ; বিচারকসংখ্যা বৃদ্ধি করিতে গেলে, আবার নূতন টেক্স বসাইতে হয়। টেক্সের নামে লোকের যেরূপ ভয়, টেক্স বসিলে লোকের যেরূপ কষ্ট, টেক্সের জন্য গবর্ণমেণ্টের উপর প্রজার যেরূপ অসন্তোষ তাহাতে আর টেক্স বসান সম্ভব নহে। সুতরাং বিচারকের সংখ্যা বাড়াইবার কোন উপায় নাই। অতএব বিচারকের অবসর বৃদ্ধি ভিন্ন এ অবিচার নিবারণের উপায়ান্তর নাই। বিচারকের অবসর বৃদ্ধির একমাত্র উপায় আছে। যাহাতে মোকদ্দমায় অল্প সময় লাগে, তাহা

করিলেই অবসর বৃদ্ধি হইতে পারে। এই জন্য সরাসরি বিচারের সৃষ্টি। ইহার অন্য কোন উপায় নাই—কেবল কতকগুলি মোকদ্দমায় লেখাপড়ার অল্পতা করা একমাত্র উপায়। যদি বল, আপিল উঠিয়া গেল কেন? উত্তর, প্রমাণ লিপিবদ্ধ না থাকিলে কি দেখিয়া আপিল আদালত বিচার নিষ্পত্তি করিবেন।

জুরির বিষয়েও একটী বিশেষ কথা আছে। যদি হাঁড়ি গড়া, ঘটি গড়ায় নৈপুণ্য শিক্ষার অধীন, তবে বিচারকার্য্যেই শিক্ষার প্রয়োজন নাই, এ কথা নির্ব্বোধ বা কুসংস্কারাবিষ্ট লোকেই বলিবে। বিচার কার্য্য শিক্ষিত জজের দ্বারা হওয়াই কর্ত্তব্য—যে অনেক দিন ধরিয়া কোন একটি কাজ অভ্যাস করিয়াছে, তাহাকেই শিক্ষিত বলিতেছি। যদি কাঁসারীকে ঘটি গড়িতে না দিয়া, তাঁতিকে কাপড় বুনিতে না দিয়া, পাঁচজন মাটি-কাটা মজুরকে দিয়া ঘটি গড়ান, বা বস্ত্র বুনান, ভাল না হয়, তবে যে বিচারকার্য্য শিল্পকর্ম্মাপেক্ষা শতগুণে কঠিন, তাহাতেই কি কেবল শিক্ষিতাপেক্ষা অশিক্ষিতের কার্য্য ভাল? অনেকে বলেন, একজন বিচারকের উপর নির্ভর করিলে ভুলের সম্ভাবনা, অতএব একজন জজের অপেক্ষা পাঁচ জন জুরির বিচার ভাল। ইহা বলিলে বলিতে হয় যে একজন নিউটন অপেক্ষা পাঁচ জন পাঠশালার গুরু গণনায় ভাল, একজন হক্স্‌লী অপেক্ষা পাঁচটী নেটিব ডাক্তার শারীরতত্ত্বে ভাল, একজন কালিদাস অপেক্ষা বাঙ্গালা সম্বাদপত্রের পাঁচজন পত্রপ্রেরক কবিত্বে ভাল। আমাদিগের সংস্কার আছে যে, যাহা বিলাতী, তাহাই ভাল, বিলাতে জুরির প্রথা প্রচলিত আছে, সুতরাং আমাদের দেশেও ঠিক্ সেই জুরির বিচার চালাইতে হইবে। এরূপ কুসংস্কারাবিষ্ট লোকে জানেন না যে ইংলণ্ডে যখন বিচারকেরা পক্ষপাতী ছিলেন, ধনীর বশীভূত হইয়া দীনের অন্যায় দণ্ড করিতেন, তখন দীনের রক্ষার্থ দীনের দ্বারা দীনের বিচার, ধনীর দ্বারা ধনীর বিচার, সমানের দ্বারা সমানের বিচার, এই প্রথা সৃষ্ট হইয়াছিল। এইক্ষণে ইংলণ্ডে সে অবস্থা নাই, কিন্তু ইংলণ্ডের ন্যায় দেশাচারপ্রিয় দেশে দেশাচার শীঘ্র লোপ পায় না বলিয়াই উহা অদ্যাপি চলিতেছে। এবং কতকগুলি অনুকরণভক্ত দেশেও গৃহীত হইয়াছে। এক্ষণে ইংলণ্ডীয় কৃতবিদ্য, চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ জুরির বিচারের প্রথার বিরোধী হইয়া দাঁড়াইতেছেন। ভারতবর্ষ, বিশেষ প্রকারে জুরির বিচার প্রথার অযোগ্য। জুরির সৃষ্টি হইয়া অবধিই ভারতবর্ষে অবিচার হইতেছে—দোষী দোষ করিয়া, সেসন হইতে প্রায় খালাস পাইয়া আসিতেছে। হুগলীতে নবীনের বিচার, ইহার একটি জাজ্বল্যমান প্রমাণ। এই ঘোর অবিচার নিবারণের জন্যই সর্ জর্জ কাম্বেল জুরির আইনের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করাইয়াছেন। সে জন্য তাঁহার নিন্দা না করিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ করিতে হয়। তিনি যে জুরির প্রথার একেবারে উচ্ছেদ করেন নাই, ইহাতেই আমরা দুঃখিত।

কার্য্যবিধি-আইন সম্বন্ধে আর একটি কথা আমাদিগের বলিতে বাকি আছে। ব্রিটীশ-ভারতবর্ষীয় রাজ্যে সর্ব্বাপেক্ষা তিমিরময় কলঙ্ক—দেশী বিদেশীতে বিচারাগারে বৈষম্য। দেশীর জন্য এক আইন আদালত—সাহেবের জন্য ভিন্ন আইন আদালত। এই লজ্জাকর কলঙ্ক মেকলে হইতে লরেন্স পর্য্যন্ত অনেকে অপনীত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন—কেহ শক্ত হয়েন নাই। সর্ জর্জ কাম্বেল হইতেই সেই কার্য্য কিয়দংশে সিদ্ধ হইতেছে। এবিষয়ে তিনি দেশীয় লোকের পরম বন্ধুর কার্য্য করিয়াছেন। অন্য কেহ করিলে, এতদিন তাঁহার সুখ্যাতিতে দেশ পুরিয়া যাইত। সর্ জর্জ কাম্বেল এ কার্য্য করিয়াছেন বলিয়া সে কথার কোন উচ্চবাচ্য নাই।

উচ্চশিক্ষার বিরুদ্ধাচরণ তাঁহার আর একটি নিন্দার কারণ। যিনি কোন প্রকার শিক্ষার বিরুদ্ধাচরণ করেন, তিনি মনুষ্যজাতির শত্রুর মধ্যে গণ্য। তবে ইহা স্মরণ করিতে হইবে যে, সকল মনুষ্যেরই শিক্ষায় সমান অধিকার। শিক্ষায় ধনীর পুত্রের যে অধিকার, কৃষক-পুত্রের সেই অধিকার। রাজকোষ হইতে ধনীদিগের শিক্ষার জন্য অধিক অর্থব্যয় হউক, নির্ধনদিগের শিক্ষায় অল্প ব্যয় হউক, ইহা ন্যায়-বিগর্হিত কথা। বরং নির্ধনদিগের শিক্ষার্থ অধিক ব্যয় এবং ধনীদিগের শিক্ষার্থ অল্প ব্যয়ই ন্যায়সঙ্গত; কেননা ধনিগণ আপন ব্যয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতে পারে, কিন্তু নির্ধনগণ, সংখ্যায় অধিক এবং রাজকোষ ভিন্ন অনন্যগতি। কিন্তু ভারতবর্ষীয় ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্বাপর শিক্ষার্থ যে প্রণালীতে ব্যয় করিয়া আসিয়াছেন, তাহা ন্যায়ানুমোদিত নহে। ধনীর শিক্ষার্থই সে ব্যয় হইয়া আসিতেছে; দরিদ্রের শিক্ষার্থ প্রায় নহে। যখন ইণ্ডিয়ান গবর্ণমেণ্ট হইতে এ প্রথা পরিবর্ত্তন করিয়া, ধনীর শিক্ষার ব্যয়ের লাঘব করিয়া, দরিদ্র শিক্ষার ব্যয় বাড়াইবার প্রস্তাব হইয়াছিল, তখন সর্ উইলিয়ম গ্রে “উচ্চশিক্ষা! উচ্চশিক্ষা!” করিয়া সে প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিয়া, দেশের লোকের প্রিয় হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু দেশের মঙ্গল করেন নাই। যদি উচ্চশিক্ষার ব্যয় হইতে কিছু টাকা লইয়া তাহা দরিদ্র শিক্ষায় ব্যয় করিবার জন্য সর্ জর্জ কাম্বেল উচ্চশিক্ষার ব্যয় কমাইয়া থাকেন তবে আমরা তাঁহার নিন্দা করিতে পারি না।

- আরও কয়েকটি বিষয়ের সমালোচনার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু স্থানাভাবে এ প্রস্তাবের আর সম্প্রসারণ করিতে পারিলাম না। উপসংহারে বক্তব্য.যে যদি কেহ আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করে যে সর্ জর্জ কাম্বেলের কৃত এমন কি কার্য্য আছে যে তজ্জন্য সর্ জর্জের কিছু প্রশংসা করিতে পারি? আমরা তাহা হইলে বলিব যে, দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে তিনি উপকার করিয়াছেন, ব্রিটীশজাত প্রজাকে এতদ্দেশীয় আদালতের বিচারাধীন করিয়াছেন, প্রবিনসিয়াল আয়ব্যয়, তাঁহার হস্তে যেরূপ সুনিয়ম-বিশিষ্ট ছিল। পক্ষান্তরে যদি কাহাকে আমরা জিজ্ঞাসা করি যে সর্ উইলিয়ম

গ্রের কৃত এমন কোন কার্য্য আছে, যে তজ্জন্য আমরা তাঁহার নাম স্মরণ করিয়া প্রশংসা করিতে পারি, তাহা হইলে তিনি কি উত্তর দিবেন? উচ্চশিক্ষার পক্ষ সমর্থন?

অনেকে এই প্রস্তাব পাঠ করিয়া লেখকের প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইবেন। এদেশীয় লোকের মধ্যে অনেকের বিশ্বাস আছে যে, সর্ জর্জ কাম্বেল, মনুষ্যাকারে পিশাচ ছিলেন। আমরা পিশাচ বলিয়া তাঁহাকে বর্ণিত করি নাই। তিনি বহু দোষযুক্ত ছিলেন, কিন্তু তাঁহার দোষের বর্ণনার অভাব নাই। যাহার অনেক দোষ, তাহার কোন গুণ আছে কি না, এবিষয়ের সমালোচনার ফল আছে—যে এক চক্ষে দেখে সে অর্দ্ধেক অন্ধ। এ প্রস্তাবের জন্য, যদি কেহ রাগ করেন, আমাদের আপত্তি নাই। কোন শ্রেণীর পাঠকের সন্তোষের কামনায় কোন প্রকার কথা এ পত্রে লিখিত হয় না; কোন শ্রেণীর পাঠকের অসন্তোষের আশঙ্কায় কোন কথা ব্যক্ত করিয়া বলিতে, এ পত্রের লেখকেরা সঙ্কুচিত নহেন। বর্ত্তমান লেখক সর্ জর্জ কাম্বেল কর্ত্তৃক কোন অংশে উপকৃত বা সর্ উইলিয়ম গ্রে কর্ত্তৃক কোন অংশে অপকৃত নহেন; যাহা লিখিত হইল, সত্যানুরোধেই লিখিত হইল। এদেশে অন্ধ অন্ধকে পথ দেখাইতেছে; ভ্রান্ত ভ্রান্তকে উপদেশ দিতেছে। যদি এই প্রবন্ধের সাহায্যে কেহ এ কথাটি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন, তাহা হইলেই এ প্রস্তাবের সার্থকতা হইল।

শ্রীভজরাম।

ইউরোপে প্রাচীন কালের ইতিবৃত্ত নিচয় সঙ্কলিত হইয়া ক্রমেই প্রকাশ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। গ্রীক ও রোমকদিগের ইতিহাস তত্তৎ জাতির বিচক্ষণ পণ্ডিতবর্গের দ্বারা লিপিবদ্ধ হওয়াতে এক্ষণে উক্ত জাতিদ্বয়ের সুপ্রসিদ্ধ রাজা ও পণ্ডিতগণের জীবনবৃত্তান্ত অবগত হইবার কোন অসুবিধা হইতেছে না, কিন্তু আমরা রামায়ণ ও মহাভারত অবলম্বন করিয়া রামচন্দ্র, কৃষ্ণ, পাণ্ডব, ব্যাসদেব ও বাল্মীকির জীবন-চরিত অবগত হইবার চেষ্টা করিলে মহাবিভ্রাট উপস্থিত হয়। আমাদিগের দেশে প্রকৃত জীবন-চরিত লিখিবার প্রথা ছিল না সুতরাং এক্ষণে প্রাচীন কালের ইতিবৃত্ত সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হইলেই নানা গোলযোগ উপস্থিত হইয়া থাকে। প্রাচীন তাম্রশাসন, অশোকস্তম্ভ ও অন্যান্য জয়স্তম্ভ লিপি তথা মৌর্য্য, গুপ্ত, পালবংশীয় প্রভৃতি নৃপতিগণের প্রাচীন মুদ্রা সন্দর্শনে ভারতবর্ষের অনেক বিবরণ আবিষ্কৃত হইতেছে। আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট জেনারেল কনিংহামের ন্যায় সুযোগ্য ব্যক্তিকে নিযুক্ত করায় পৃথ্বীতলে প্রোথিত প্রাচীন তাম্রশাসন, মুদ্রা, প্রস্তরফলকস্থ লিপি হইতে নানা প্রাচীন বিষয় জ্ঞাত হইতেছি। সম্প্রতি তিনি মথুরা কঙ্কালী স্তূপ মধ্যে তাম্রশাসন ও অনেক বৌদ্ধলিপি প্রাপ্ত হইয়াছেন, এ সকল পুরাবৃত্ত লেখকগণের পরম আদরণীয় হইবেক।

তাম্রশাসন, মুদ্রা প্রভৃতির মুদ্রিত বিষয় পাঠে কোন নৃপতির কাল নিরূপণ নির্ব্বিঘ্নে স্থির হইতে পারে কিন্তু একমাত্র প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ অবলম্বনে কোন প্রাচীন কবি বা মহাজনের জীবন চরিত সম্বন্ধীয় বিবরণ সঙ্কলন করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। তাহাতে নানা মুনির নানা মত; একখানি গ্রন্থ এক রূপ এবং আর এক সময়ের অপর একজন গ্রন্থকার সেই বিবরণ ভিন্ন প্রকার সঙ্কলন করিয়াছেন, তাহা হইতে সত্য নিরাকরণ করিয়া কেহই ভ্রমশূন্য প্রস্তাব লিপিবদ্ধ করিতে পারেন না। মহামহোপাধ্যায় উইলসন সাহেব যে সকল কবি ও নৃপতিগণের কাল নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন, প্রায় সে সকল আধুনিক তত্ত্বদর্শী পণ্ডিত-

গণের ভ্রমপূর্ণ বোধ হইতেছে। লাসেন, পাত্তি, এডালং, সেজ্জি প্রভৃতির ত কথাই নাই, ভট্ট মোক্ষমূলরেরও ঐতিহাসিক ভ্রম মৃত অধ্যাপক গোলড্‌ষ্টুকার কর্তৃক সংশোধিত হইয়াছে; কাজেই আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি যদি কোন মহাত্মা আর্য্যগণের ইতিবৃত্ত বহু যত্নসহকারে লিপিবদ্ধ করেন, তাঁহার প্রস্তাবও ভ্রমশূন্য হয় কিনা সন্দেহ; তবে এক বিষয়ের যতই তর্ক বিতর্ক চলিবে ততই তাহা ক্রমে উত্তমরূপ সামঞ্জস্য হইয়া আসিবে।

আমি প্রথম বর্ষের বঙ্গদর্শন ৭০২ পৃষ্ঠায় শ্রীহর্ষাখ্য একটী বিবরণ প্রকাশ করি। এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিয়া গত সংখ্যার বঙ্গদর্শণে বিচক্ষণবর "শ্রীরাজ" স্বাক্ষরিত মহাশয় একটী প্রস্তাব প্রকাশ করিয়াছেন। আমার মতে দুই জন শ্রীহর্ষ। একজন নৈষধকার ও একজন রত্নাবলীপ্রণেতা। নৈষধকার শ্রীহর্ষকে কোন বিজ্ঞ বন্ধুর কথাতে চট্টোপাধ্যায় বংশের আদিপুরুষ লিখিয়াছিলাম কিন্তু উক্ত ভ্রম আমার প্রথমভাগ ঐতিহাসিক রহস্যে সংশোধিত হইয়াছে।

আমি অনেক দিবস হইল একদা কথোপকথনচ্ছলে বঙ্গদর্শনের সুযোগ্য সম্পাদক মহাশয়কে বলিয়াছিলাম যে, শ্রীহর্ষ ভরদ্বাজ গোত্রোদ্ভব এবং ইহার বংশজাত ধুরন্ধর মুখটী বঙ্গদেশীয় মুখোপাধ্যায় বংশের আদি পুরুষ। যথা—

ভরদ্বাজ গোত্রে শ্রীহর্ষ বংশজাতঃ
ধুরন্ধর মুখটী সচ মুখ্যঃ।

সংস্কৃত বিদ্যাবিশারদ বুলার সাহেব বম্বের আসিয়াটীক সোসাইটীর অধিবেশনে শ্রীহর্ষ সম্বন্ধে একটী উৎকৃষ্ট প্রস্তাব পাঠ করেন, তাহাতে তিনি জৈন লেখক রাজশেখরের প্রবন্ধ-চিন্তামণি হইতে কবির জীবন বৃত্তান্ত সঙ্কলন করিয়াছিলেন। আমি রাজশেখরের গ্রন্থপাঠ করত উক্ত মহোদয়ের প্রস্তাবের পোষকতা করিয়া বঙ্গদর্শনে এবং ইংরাজী ভাষায় বম্বে প্রদেশের ইণ্ডিয়ান এন্‌টিকুয়ারী নামক মাসিক পত্রিকার সংখ্যাদ্বয়ে শ্রীহর্ষের বিবরণ লিপিবদ্ধ করি; শেষোক্ত প্রস্তাবদ্বয় মেং গ্রাউশ সাহেবের মত খণ্ডন করিয়া শ্রীহর্ষকে কবিচন্দ্র ভট্টের সমসাময়িক স্থির করিয়াছি। এই মর্ম্মে সোমপ্রকাশে যে প্রস্তাব লিখিয়াছিলাম তাহাও ঐতিহাসিক রহস্য পরিশিষ্টে প্রকাশ হইয়াছে। রাজশেখর ১৩৪৮ খৃঃ অঃ গ্রন্থ রচনা করেন, তাঁহার বিবরণ কবির পরিচয়ের সহিত ঐক্য আছে এবং পুরুষ পরীক্ষায় বিদ্যাপতি মেধাবী কথায় শ্রীহর্ষের যে পরিচয় দিয়াছেন তাহাও রাজশেখরের বিবরণের সহিত অনৈক্য হয় না। শ্রীহর্ষ স্বয়ং কহিয়াছেন, তিনি কান্যকুব্জেশ্বরের নিকট হইতে সম্মানসূচক তাম্বুলদ্বয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; রাজশেখর এই নৃপতিকে কান্যকুব্জাধিপতি জয়ন্তচন্দ্র স্থির করিয়াছেন; তাহা হইলে শ্রীহর্ষ খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর ব্যক্তি। শ্রীহর্ষ "গৌড়োর্ব্বীশকুলপ্রশস্তি" রচনা করাতে তাঁহার গৌড়ে আগমন স্থির হইতেছে।

এক্ষণে একটী কথা গুরুতর বোধ হইতেছে ; প্রস্তাব লেখক হল সাহেব কৃত বাসব দত্তার ভূমিকা দেখিয়া লিখিয়াছেন যে ভোজদেব কৃত সরস্বতী কণ্ঠাভরণ মধ্যে নৈষধের প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে। একথা প্রকৃত হইলে কিছু গোলযোগের বিষয় বটে, কেননা তাহা হইলে মুঞ্জের ভ্রাতুষ্পুত্র ভোজের পূর্ব্বে শ্রীহর্ষ বর্ত্তমান ছিলেন প্রমাণ হইবেক কিন্তু আমার নিকট রত্নেশ্বরের টীকা সহ সরস্বতীকণ্ঠাভরণ আছে, তাহার মধ্যে নৈষধের প্রমাণ উদ্ধৃত দেখিতে পাইলাম না এবং বুলার সাহেব লিখিয়াছেন তিনিও এই প্রমাণ উক্ত অলঙ্কার গ্রন্থে দেখেন নাই। আফ্রেক্‌ট মহোদয়ও তাঁহার সুবিস্তীর্ণ সংস্কৃত গ্রন্থের তালিকায় ইহার কোন উল্লেখ করেন নাই, কাজেই এ কথাটি প্রমাণিক হইতেছে না, আবার যদি কোন একখানি সরস্বতীকণ্ঠাভরণে নৈষধের শ্লোক থাকে, তবে তাহা অধুনিক কোন পণ্ডিত কর্ত্তৃক সন্নিবেশিত হইয়াছে বলিব—এজন্য তাহা কৃত্রিম। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি চাঁদকবি শ্রীহর্ষের সমকালিক। চাঁদ শ্রীহর্ষের মান্যবৃদ্ধি জন্য তাঁহার নাম পৃথ্বীরাজ চৌহানরাসের প্রস্তাবনায়, কালিদাসের পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে "নরের প্রধান, সার কবি শ্রীহর্ষ" বলিয়াছেন। শ্রীহর্ষ, কুমারপাল, হেমচন্দ্র, চাঁদ সকলেই খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বর্ত্তমান ছিলেন।

নৈষধ কর্ত্তা শ্রীহর্ষ সম্বন্ধে প্রস্তাব লেখক যে সকল প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা সমুদয় ইতিপূর্ব্বে পণ্ডিত কাশীনাথ ত্র্যম্বক তৈলঙ্গ কর্ত্তৃক এবং পি, এন, পূর্ণিয়া কর্ত্তৃক Indian Antiquary প্রকাশিত হইয়াছে, আর তিনি যে কুসুমাঞ্জলীর তথা খণ্ডনখণ্ডখাদ্যের শ্লোক লইয়া উদয়নাচার্য্য এবং বাচস্পতি মিশ্র সম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক করিয়াছেন, তাহা কিছুই নূতন বলিয়া প্রতীয়মান হইল না, সমুদয় পণ্ডিত কাশীনাথ ত্র্যম্বক তৈলঙ্গের লিখিত প্রবন্ধ মধ্যে উল্লেখ আছে *।

কাশ্মীরাধিপতি শ্রীহর্ষ কৃত রত্নাবলী, ধাবকপ্রণীত প্রমাণ করিবার নিমিত্ত "শ্রীরাজ" মহাশয় যে সকল প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা সমুদায় ইতিপূর্ব্বেও আমার কৃত প্রস্তাবে উদ্ধৃত হইয়াছিল, তথাপি সে সকল প্রমাণের উপর একান্ত নির্ভর করা যুক্তিসঙ্গত নহে। বহুশাস্ত্রদর্শী পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও তারানাথ তর্কবাচস্পতি কাশ্মীরাধিপতি শ্রীহর্ষ রত্নাবলী ও নাগানন্দ প্রণেতা স্বীকার করিয়াছেন এক "কাব্য প্রকাশের" প্রমাণ বেদবৎ মান্য করিয়া শ্রীহর্ষের কীর্ত্তি লোপ করা নিতান্ত যুক্তি বিরুদ্ধ। প্রস্তাব লেখক বলেন "মধুসূদন" "ভাববোধিনী" নাম্নী ময়ূরাষ্টকের টীকায় লিখিয়াছেন যে বাণভট্ট "যে শ্রীহর্ষের সভাপণ্ডিত ছিলেন, সেই শ্রীহর্ষই রত্নাবলীর রচয়িতা।" মধুসূদন পঞ্চানন্দ বংশোদ্ভব মাধব ভট্টের পুত্র

---

* Vide Indian Antiquary Page 297. Vol. 1.

এবং বালকৃষ্ণের ছাত্র, তিনি ময়ূর শতকের টীকাকার। সেই টীকার নাম "ভাববোধিনী।" প্রস্তাব লেখক তাঁহাকে ভ্রমক্রমে ময়ূরাষ্টকের টীকাকার বলিয়াছেন। "ভাববোধিনী" ১৬৫৪ খৃঃ অঃ সুরাটে লিখিত হইয়াছিল। আমরা উহা দেখি নাই। সম্প্রতি অধ্যাপক বুলার সাহেব ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। এই টীকার প্রমাণ এবং মম্মটাচার্য্যের "শ্রীহর্ষাদের্ধাবকাদিনামিব ধনম্" বাক্য আমরা বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। এ সকল কথা প্রামাণিক স্থির করিবার চেষ্টা করিলে বলবৎ প্রমাণ প্রয়োগ আবশ্যক।

শ্রীরামদাস সেন।

১

দেখ সখি নাগর রাজে,
ও মুখ সুন্দর হেরি বিধুবর
জলদে লুকায় লাজে,
মরকত ভাতি জিনি তনু কাঁতি
ভূষিত বনফুল সাজে,
চলন সুরঙ্গে তরল তরঙ্গে
নূপুর ঝুনু ঝুনু বাজে,
সজনি নব বৃন্দাবনে মদন বিরাজে।

২

ফুটল শতদল সর-উর মাঝে,
সাজল উপবন নববধূ সাজে,
জুটল অলিদল লুটল পরিমল
ছুটল মলয় বাতাসে,
কেতকী হাসল পিককুল ভাসল
মঞ্জুল মাধবী মাসে,
তাহে সখি পুন পুন ব্রজপতি নিকরুণ
খরলোচন শর করত বিথার
কৈসে জীয়ব সখি প্রাণ হমার।

৩

অধর বিকাশিত মধুরিম হাসে,
ডারি নবনীরদ প্রেমক ফাঁসে,
চঞ্চল লোচনে বঙ্ক বিলোকনে
কহত রভসময় বাত,
মনসিজ তাপে বিরহ বিলাপে
যুবতী মরমে মরি যাত,
পৈঠি হৃদয়মে নাশত ভরমে
হরত হরি মন প্রাণে,
সখিরে কৈসে রাখব অব কুলশীল মানে।

৪

মধুর মুরলীবর তান বরিখে,
মুরছত মুনি মন ধাবত বিখে,
রাই রাই করি বাঁজত বাঁশরী
বিপিনে বোলায়ত মোয়,
হম কুল নারী কহই ন পারি
যৈসন হিয়ে দুখ হোয়,
ডগমগ ডোলে পীরিতি হিলোলে
ফুটত রসে অতি গাঢ়ি,
সখি কৈসে রহব ঘরে মাধবে ছাড়ি।

রুদ্র।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা

রসকাদম্বিনী; অর্থাৎ সংস্কৃত অমরুশতক কাব্যের বাঙ্গালা অনুবাদ। মূল্য ।৵০।

সংস্কৃত অমরুশতক কাব্য আদিরস প্রধান। প্রকৃত আদিরস জগতের একটী দুর্লভ পদার্থ। ইহা পবিত্র, বিশুদ্ধ, অমূল্য। সংস্কৃত নানা গ্রন্থে এই আদিরস চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। ইংরাজিতে নানা স্থানে চমৎকার আদিরস পাওয়া যায়। অন্ধকবি মিল্টন যখন ইদন উদ্যান মধ্যে প্রথম নরদম্পতিকে সৃজন করিয়া মনোহর গন্ধবাহী প্রভাতকালে তাহাদিগের দৃশ্য উন্মোচন করিয়াছেন, তখন তাহাতে কি অপূর্ব্ব আদিরস সঙ্ঘটিত হইয়াছে! সরলা নিষ্পাপা লোকমাতা নিদ্রা যাইতেছেন, আদিপুরুষ প্রত্যেক লোমকূপে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতেছেন, অলকাবলীর উপরি প্রভাত সমীরণ নৃত্য করিতেছে, নিমীলিত নয়নোপরি অলকাবলী ঝলঝল করিতেছে, আদম যতনে তাহা সরাইয়া দিতেছেন; এই চিত্র সমধিক মনোহর, ইহা অতুল্য, অমূল্য। সেই জন্য আদিরসের প্রধানত্ব।

কিন্তু এই অপূর্ব্ব রসের বিকৃতি আছে; পৈশাচিকী বিকৃতি আছে। একটা সামান্য কথায় বলে, যে মন্দ দ্রব্য কোনরূপে সেবন করা যায়, কিন্তু ভাল দ্রব্য মন্দ হইলে তাহা একেবারে অসহ্য হয়। ঘোল খাওয়া যায়, কিন্তু দুধ ছিঁড়িয়া গেলে, তাহা আর কাহার সাধ্য যে গলাধঃকরণ করে? আদিরস সম্বন্ধেও সেইরূপ। সংস্কৃত নানা গ্রন্থে এবং বাঙ্গালা অনেক গ্রন্থে আদিরসের কুৎসিত বিকৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। অমরুশতকেরও অনেকগুলি শ্লোক নিতান্ত অশ্লীল। অনুবাদক বলেন যে, একশত শ্লোকের মধ্যে কেবল পাঁচটি অশ্লীল, তিনি সেই পাঁচটি অনুবাদ করেন নাই। অন্যগুলি সম্বন্ধে তিনি বলেন, যে "অনেকে মনে করেন এই শতক অশ্লীলতা দোষে দূষিত," "উহা তাঁহাদের ভ্রান্তি মাত্র," "এরূপ কাব্যও যদি অশ্লীল হয়, তবে আদিরসের কবিতা মাত্রই তাদৃশ দোষে দূষিত হইতে পারে।" আমরা অনুবাদক মহাশয়ের মতের সম্পূর্ণ অনুমোদন করিতে পারিলাম না, মুক্তকণ্ঠে

বলিতেছি, অমরুশতক অশ্লীলতা দোষে দূষিত, এমন কি, ইহার মঙ্গলাচরণ সূচক প্রথম শ্লোকটিই কিঞ্চিৎ অশ্লীল। সেই অশ্লীল ছত্রটি পরিবর্ত্তন করিয়া আমরা বঙ্গদর্শন পাঠককে (পাঠিকাকে নয়) আশীর্ব্বাদ ছলে, সেই শ্লোকটি উদ্ধৃত করিলাম।

এই অলকগুলি,   ললাটে পড়িছে ঝুলি,
মণিময় কাণবালা দোলে ঝলমলে,
বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্মজল,   ছুটে যেন মুক্তাফল,
তিলক পুঁছিয়া যায়, সেই ঘর্ম্মজলে।
ছল ছল মিটি মিটি,   সেই কামিনীর দিঠি,
অলস আবেশে আর শ্রম প্রেমভরেতে,
মুখখানি হোক তারি,   তোমার মঙ্গলকারী,
কি কায কেশব-শিব ব্রহ্মাদি দেবেতে ?

অমরুশতককাব্যের বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে অনুবাদক মহাশয়ের সহিত এক মত হইল না বলিয়া, আমরা তাঁহার রুচির বিশেষ প্রশংসা করিতে পারিলাম না বটে, কিন্তু তাঁহার ক্ষমতার প্রশংসা না করিলে, আমাদের অধর্ম্ম হইবে। রসকাদম্বিনীকারের অনুবাদ ক্ষমতা অতি সুন্দর। অনুবাদিত গ্রন্থ, অনেক সময়েই নীরস, কটমট, এবং বিস্তার বিশিষ্ট হয়, এরূপ হইয়াও হয়ত মূলের ভাব কিছুই থাকে না; কিন্তু রসকাদম্বিনী সেরূপ নহে। ইহার রচনা, অতি সহজ, সুমিষ্ট, এবং ইহাতে মূলের সকল কথাগুলি না থাকুক অমরুশতকের ভাবটি ইহাতে সুন্দর রক্ষিত হইয়াছে। নিজের কবিত্ব বোধ না থাকিলে কখন এরূপ হইত না, রসকাদম্বিনীকার একটি ক্ষুদ্র কবি। এত কথা বলিয়া যদি দুই চারিটি শ্লোক আমরা উদ্ধৃত করি তাহা হইলে বিশেষ দোষ না হইলেও না হইতে পারে। দুটি মানের কবিতা দেখুন। এ মান শ্রীমতীর দুর্জ্জয় মান নহে। ইহা মান, অভিমান নহে। তুষার নিজে লুপ্ত হইয়া পানীয় জলের শীতলতা বৃদ্ধি করে, বলিয়াই তুষারের আদর। এই মান তুষার—প্রণয়িনীর হৃদয় সরসীতে নিক্ষিপ্ত হইয়া, তৎক্ষণাৎ গলিয়া গিয়া প্রণয়ভাণ্ডার শীতল করে বলিয়াই এ মানের আদর। এই মান, প্রণয়রূপ গানের পক্ষে প্রকৃতই মান। মানের ঘরে ক্ষণেক বিচ্ছেদ বটে, কিন্তু এই মান না থাকিলে প্রণয় গানের লয় সঙ্গতি হয় না।

প্রথম, মানে কেবল হাসি :—

স্ত্রীপুরুষ দুজনায়,   বিমুখে মানের দায়,
শুয়ে র(হি)ল বিছানায়, মৌনব্রত ধরি,
সাধিতে উতলা মন,   তথাপি না ছাড়ে পণ,
আপন গৌরব ধন, রাখে যত্ন করি।

ক্রমে কিছু উচ্ছসিয়ে, আড় চোখে ধীরে ধীরে,
দোঁহে দোঁহা পানে ফিরে লাগিল দেখিতে,
চোখে চোখে হল মিল, ভাঙ্গিল মানের খিল
দোঁহে দোঁহা আলিঙ্গিল হাসিতে হাসিতে।

দ্বিতীয়, মানে, হাসি কান্না :—

দেখিতে নিরখি মোরে, বিধুমুখী কি আচরে,
এই ভেবে চুপে আমি রহিনু যতনে,
প্রেয়সীও তাই হেরি, মানেতে হইল ভারী,
মনে কৈল এ ধূর্ত্ত কি করে মোর সনে।
এইরূপ দুইজনে, বিস্মিত নয়নার্পণে,
পরস্পর দেখিতেছি হেন অবস্থায়,
আমি হাসিলাম ছলে, সে নারীও অশ্রুজলে,
ভাসিয়া ধৈরয শূন্য করিল আমায়।

এইস্থলে এইরূপ মানের একটি গান তুলিব। রসকাদম্বিনী হইতে নহে।

তৃতীয়, মানে, ঘোর বিপদ :—

মনে মনে সাধয়ে।
কে আগে সাধিবে বল, ঘটিল প্রমাদ যে।
নয়নেতে লাজ অতি, হৃদয় ব্যাকুল
উভয়ে তাকিতে নারে মান অনুরোধ যে।

চতুর্থ, এ মানেও ঘোর বিপদ বটে, কিন্তু কেবল একজনের।

ভুরু বাঁকাইয়া রই, তথাপি অমনি নই,
উতলা হইয়া আঁখি তারি পানে ধায় লো
চিত্ত তো কর্কশ করি, তথাপি যে সহচরি!
অঙ্গ শিহরিয়া উঠে, তার কি উপায় লো?
বাক্যরোধ করি বটে তবু বিশৃঙ্খলা ঘটে,
পোড়া মুখে হাসি পায় রাখা নাহি যায় লো
যদি সে জনের সনে, দেখা হয় তবে যেনে,
মানের নির্ব্বাহ করা, ঘটে বড় দায় লো।

তবে ইনি একলা মান করিতে চান? মানিনী বটে!

পঞ্চম, আর এক প্রকার মান, কেবল কান্না।

মান করে কি প্রকারে, জানেনা সখীরা তারে,
পূর্ব্বে তাহা শিক্ষা দেয় নাই,
অন্য ভঙ্গী নানা কথা, যে সব মানের প্রথা
নাহি জানে বালা কিছু তাই।

কান্তের প্রথম দোষে, সে বালা কেবল রোষে
কি করিবে লাগিল কাঁদিতে,
অশ্রুধারা দর দরে কপোল বহিয়া ঝরে
বন্যা যেন আসিল আঁখিতে।

সেই বন্যার জল যে বস্ত্রাঞ্চলে মুছাইয়া দিয়াছে সেই জানে আদিরস কি।

কবিতা কুসুমমালিকা। প্রথম ভাগ। মেডিকাল কালেজের ইংরাজি শ্রেণীর ছাত্র শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সাহা কর্ত্তৃক প্রণীত। মূল্য দুই আনা। মালাগাছটি অতি ছোট বটে, কিন্তু ইহার কুসুমগুলি নূতন না হউক কোমল, নির্ম্মল, ও সুগন্ধি। তাহার পরিচয় প্রদান করিব। প্রদোষকালে কোথায় কি হইতেছে দেখুন—

একস্থানে,—
কোকিল-কূজিত-কণ্ঠে মা মা মা বলিয়া,
জননী সদনে শিশু করিছে গমন,
সে রব শুনিয়া কাছে বাহু পসারিয়া,
লইছেন স্নেহবতী সন্তানরতন।

আবার কোথায় বা,—
পুরাণপুত্তলি পুত্র দিয়া বিসর্জ্জন,
পুত্রশোকাতুরা এবে দুখিনী জননী,
ঘন ঘন বলি হুহু কোথা বাছাধন
পুরিছে রোদন রোলে আকাশ অবনি।

কোনস্থানে,—
গৃহকাজ পরিহরি সধবা কামিনী
গাঁথিয়া কুসুমহার অতি চিকণিয়া,
ভেটিতেছে নিজ নাথে যেন পাগলিনী,
দেখাতে হৃদয়-নাট পরাণ খুলিয়া

কিন্তু অন্যস্থানে,—
পরাণপিঞ্জরবদ্ধ বিহঙ্গ বিহনে
কোথা প্রাণনাথ বলি, বিরলে বসিয়া
ভাসিছে নয়ন নীরে বিরহিণীগণে,
কার না দহে গো প্রাণ সে রব শুনিয়া ?*

নবরসাঙ্কুর, অর্থাৎ আদিহাস্যকরুণ প্রভৃতি নবরসের সংক্ষিপ্ত বর্ণন। শ্রীরসিকচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক প্রণীত। কলিকাতা নূতন সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ছাপাতে ছিল ।০, আনা, হাতে কাটিয়া করা হইয়াছে ৵০ আনা মাত্র। রসিক বাবুকে আমরা চিনি না, কিন্তু তিনি যদি শুদ্ধ আপন নামের গৌরব রক্ষার্থ এই গ্রন্থ প্রচার করিতেন তাহা হইলে, আমাদিগের কোন কথাই বলিবার ছিল না, কিন্তু বিজ্ঞাপনে বলা হইয়াছে “বালকবর্গের রসানুভব জন্য উক্ত নবরস সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া প্রকাশ করিতেছি।” আমরা জিজ্ঞাসা করি নবরসের আলঙ্কারিক ভেদ জ্ঞান কি বালকের বোধ্য ? এমন কি—রসিক বাবু যে হাস্যরসের উদাহরণটি প্রদান করিয়াছেন, তাহা আমাদিগেরই করুণরসাত্মক বলিয়া বোধ হইয়াছে, অথচ আমরা নিতান্ত বালক নহি, সুতরাং এই নবরস যে বালকে রসিক বাবুর মত বুঝিতে পারিবে এমন বোধ হয় না। বিশেষ একটা সামান্য কথায় বলে, “না

---

* সংসার এইরূপই বটে, কোথাও হাসি, কোথাও কান্না। যে হাসি দেখে হাসিতে পারে, কান্না দেখে কাঁদিতে পারে, সেই সাধু।

হলে রসিকা বয়োধিকা রস বুঝে না।" আমাদের মন্দ অদৃষ্ট, তাহাতেই রসিক বাবুকেও এত কথা বলিতে হইল। স্থূল কথা, রসবোধ বালকের হয় না, গ্রন্থখানি বালকের উপযোগী হয় নাই ; এবং বালোপযোগী কাব্যগ্রন্থ বঙ্গদর্শনে সমালোচিত হয় না।

পল্লীগ্রামদর্পণ। নাটক। শ্রীপ্রসন্নচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত। ১২৭৯ সাল, মূল্য এক টাকা, মফস্বলে ডাকমাশুল দুই আনা। এই 'নাটক' গ্রন্থের 'সারপ্রমুখ' মধ্যে লিখিত আছে "দর্পণখানি অদ্য দয়াদাক্ষিণ্যবান্ স্বদেশ হিতৈষী গুণিজনগণ সন্নিধানে সমর্পণ করিলাম।" অতগুলি আভিধানিক বিশেষণে স্বত্বস্থাপন করিতে আমরা আপাতত প্রস্তুত নহি, সুতরাং ঐ সকল নানা বিশেষণ যুক্ত জনগণ সমীপে 'নাটককার' যেসকল প্রার্থনা করিয়াছেন, তাহা পুরণ করিতে আমরা অপারগ। তবে গ্রন্থকার সাহিত্য সমাজকে গ্রন্থের প্রতি 'সস্নেহ সকৃপ কটাক্ষ করিতে' অনুরোধ করিয়াছেন, আমরা সাহিত্য সমাজের সভ্যভাবে এই অনুরোধ রক্ষা করিব। অনুরোধ রক্ষা করিব তাহার অন্য কারণও আছে : এবিষয়ে আমরা বিশেষ অনুরুদ্ধ হইয়াছি। গ্রন্থকার কি জন্য গ্রন্থ প্রেরণ করিয়াছেন তাহা ইংরেজিতে গ্রন্থের শিরোদেশে লিখিয়া দিয়াছেন ; তিনি সমালোচকের নিকট গ্রন্থ প্রেরণ করিয়াছেন, for his favourable opinion if available. গ্রন্থের প্রশংসাবাদকল্পে আমরা এই বলিতে পারি, যে গ্রন্থকার পল্লীগ্রামের দুরবস্থা বর্ণন জন্য গ্রন্থ লিখিতে প্রয়াসী হইয়াছেন, তাঁহার উদ্দেশ্য অতি বৃহৎ। এটি আমাদের মনের কথা বিদ্রূপের কথা নহে।

হেমলতা। ১ম খণ্ড ১ম সংখ্যা পাক্ষিকপত্র। শ্রীমহেন্দ্রনাথ বোষ কর্তৃক সম্পাদিত। অনেক দিন হইল এখানি পাওয়া গিয়াছে। সময়াভাবে বা স্থানাভাবে সমালোচিত হয় নাই। সম্পাদক বলিয়াছেন ইহাতে সুশিক্ষিতা স্ত্রীলোক লিখিবেন। আমাদের অনুরোধ যেগুলি স্ত্রীলোকের, সেগুলি স্ত্রীলোকের বলিয়া চিহ্নিত করা থাকে। এ সংখ্যায় সেরূপ নাই বলিয়া আমরা হেমলতার সম্যক্ সমালোচন করিতে পারিলাম না। আর একটি যাহাতে স্ত্রীলোকে লিখিবে, তাহা অধিকতররূপে স্ত্রীলোকেরই পাঠ্য হইবার সম্ভাবনা। তবে হেমলতা মধ্যে, এত ইংরেজির ছড়াছড়ি কেন ? ইহার মধ্যে যে পরিণয়-কুসুম নাটক প্রকাশিত হইতেছে, তাহা আর না প্রকাশিত হইলেই ভাল হয়। যাহা হউক আমরা হেমলতার স্থিতি ও উন্নতি আন্তরিক ইচ্ছা করি।

উদাসিনী। কলিকাতা বাল্মীকি যন্ত্র। মূল্য একটাকা। এরূপ কল্পনা-প্রসূত কাব্যগ্রন্থ বঙ্গভাষায় অতি বিরল। সরলা প্রেমউদাসিনী, সুরেন্দ্র প্রেম-ভিখারী। পিতৃমাতৃহীনা সরলা রাজরাণী না হইয়া, ঐশ্বর্য্যে লালিত না হইয়া,

যাহাকে ভালবাসিত তাহাকেই বরণ করেন। এইজন্য সরলাকে কত কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছে; তাহাতে সে দৃক্‌পাত করে নাই। প্রণয়ের বজ্রায়স সামর্থ এই কাব্য মধ্যে প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রণয় যতই পীড়িত হইয়াছে ততই বল সংগ্রহ করিয়াছে। শেষে প্রণয়েরই জয় হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বেই স্বয়ং প্রণয়দেব ও রতিদেবী এই নবদম্পতির সহায় হইয়াছেন। তখন ইহারা ছদ্মবেশে ছিলেন। হঠাৎ—

একিরে আবার নূতন ব্যাপার,
নূতন প্রকার রূপের ছটা
শত শত শশী যেন একাকার
পিছনে গভীর জলদ ঘটা।
নবীন ঝলসে বরণের ভাসে
অমিয় অধরে অমৃত ক্ষরে,
বিলাস লালসা নয়নে বিকাশে
অলস গমনা রূপের ভরে
মরি মরি শিরে মালতি মালিকা
দুলে দুলে দোলে বিনোদ গলে,
দুলিছে কেমন কনক কলিকা
সমীর পরশে শ্রবণতলে।
ফুলে ফুলে গাঁথা হাতের বলয়,
পদ্মমালা গলে কেমন রাজে,
যেন যুঁই জাতি কুসুম নিচয়
তারকা ঝলকে কেশের মাঝে।

আর এক জনের

ঝক ঝক জলে বরণ বিমল,
কষিত কাঞ্চন সোহাগে মাখা,
ঢল ঢল করে মুখ-শতদল,
ঢুলু ঢুলু প্রেমে নয়ন বাঁকা।
ফুলের মালিকা শোভিছে মাথে
পিছনে শোভিছে ফুলের তূণ,
ফুলে ফুলশর শোভিতেছে হাতে
ফুলের ধনুক ফুলের গুণ,

তখন এই প্রণয়দেব স্বয়ং পুরোহিত হইলেন; রতিদেবী নবদম্পতিকে বরণ করিতে লাগিলেন, আর—

হাসিয়া হাসিয়া দিগঙ্গনাগণে
হুলুধ্বনি দেয় মিলিয়া সবে,
কুসুম আসার বরষি সঘনে
কাঁপায় গগন উৎসব রবে।

তাহার পর

দেখিতে দেখিতে, স্বপন সমান,
চকিতে সে সব পাইল লয়,
বিস্ময় বিপ্লবে হারা হয়ে জ্ঞান,
সরলা সুরেন্দ্র চাহিয়া রয়।

আমরা নবদম্পতিকে আশীর্ব্বাদ করিয়া এবং গ্রন্থকারকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া বিদায় লইলাম।

মৃদঙ্গমঞ্জরী। শ্রীযুক্ত বাবু শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর কর্ত্তৃক প্রণীত।

উপসংহারে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন যে "সংগীতবৃক্ষের বাদ্যরূপ যে একটি মহতী শাখা আছে মৃদঙ্গমঞ্জরী গ্রন্থখানি তাহার মঞ্জরীরূপে কল্পিত হইল" এবং প্রার্থনা করিয়াছেন যে "গুণজ্ঞজনগণের কোমল করস্পর্শে ইহা প্রস্ফুটিত এবং ফলিত হইবেক।"

আমাদিগের বিবেচনায় মৃদঙ্গমঞ্জরী কেবল মঞ্জরী মাত্র নহে বাদ্য শাস্ত্রের ইহা “উপক্রমণিকা” বলিয়া গণনীয় হইবেক এবং ইহার সাহায্যে শিক্ষার্থিগণের সঙ্গত করিবার সম্বন্ধে ক্ষমতা জন্মিতে পারিবেক, অতএব গ্রন্থকার আমাদিগের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র, আমরা কায়মনোবাক্যে তাঁহার ধন্যবাদ করিতেছি।

“প্রবেশিকা” এবং “মৃদঙ্গের জন্ম বৃত্তান্ত” কিছু বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইলে আমরা আপ্যায়িত হইতাম। মহাদেব কর্ত্তৃক ত্রিপুরাসুর বধ উপলক্ষে মৃদঙ্গের জন্ম হওয়াতে ইহাই বোধ হয়, যে আর্য্যেরা দেশীয় আদিম মনুষ্যদিগকে জয় করিয়া তাহাদের মাদল গ্রহণ করিয়া বুদ্ধিকৌশলে তাহা সুস্বরশালী করিয়াছেন।

হস্তপাঠ এবং শব্দ সাধন অতি সুচারু হইয়াছে, এবং উদ্ধৃত পরমগুলি অতি সাবধানে এবং বিচক্ষণতার সহিত সঙ্কলিত হইয়াছে। লালা কেবলকৃষ্ণের বোলগুলি অতি মনোহর, কিন্তু গ্রন্থকারের অভিপ্রায় মত প্রকৃত মার্দ্দঙ্গিকের লক্ষণযুক্ত “গীতের বহুবিধ রীতিজ্ঞ সদা সন্তুষ্টচিত্ত” অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী এবং শ্রীযুক্ত বাবু শরচ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয়গণের প্রক্রমণিকাগুলিতে বিশেষ প্রীতিলাভ হয়, ইহাতে বাঙ্গালির বুদ্ধিজ্যোতিঃ, চাতুর্য্য, কোমলত্ব এবং মাধুর্য্য সম্পূর্ণ প্রকাশমান।

পরিশিষ্ট পাঠে আমরা বিশেষ আনন্দ লাভ করিলাম। বহু পরিশ্রম সহকারে প্রাচীন সংস্কৃত তান সকল যাহা উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহা যদিও শিক্ষার্থীর পক্ষে বিশেষ উপকারের নহে, কিন্তু আদিমকালের আদর্শ এবং ইতিহাসমূলক বলিয়া আমাদিগের পরম যত্নের ধন, ভরসা করি কোন মহাত্মা ইহাদের জন্ম, অবয়ব, কাল এবং প্রণালীর মীমাংসা করিবেন। সংস্কৃত এবং আধুনিক তালে যে মাত্রা ভেদ দেখা যায় তাহা প্রগাঢ় ভেদ বোধ হয় না। মাত্রার তারতম্যে হঠাৎ ভিন্ন ভিন্ন বোধ জ্ঞান হইলেও, মূলে ঐক্য দেখা যায়।

চিত্ত-কানন। প্রথম ভাগ। শ্রীকানাইলাল মিত্র প্রণীত। কলিকাতা, বেণ্টিঙ্ক প্রেস। ১২৮০।

এ গ্রন্থও পদ্য। ইহার বিশেষ গুণ কিছুই নাই, এবং গুণশূন্যতা ভিন্ন অন্য কোন দোষ নাই। “রাবণের প্রতি মন্দোদরী।” প্রভৃতি দুই একটি কবিতা পড়া যায়।

কাব্যপেটিকা। শ্রীমহেশচন্দ্র তর্ক চূড়ামণি প্রণীত। কলিকাতা মৃজাপুর অপর সরকিউলার রোড, নং ৫৮।৫ গিরিশ বিদ্যারত্ন যন্ত্রে মুদ্রিত। সন ১২৭৭।

এই গ্রন্থ সংস্কৃত পদ্যে খণ্ডকাব্যাকারে লিখিত। গ্রন্থকার এক এক রসাত্মক কতকগুলি কবিতা একত্র যোজনা করণানন্তর এক একটি পরিচ্ছেদের ন্যায় যোজনা করত এইরূপ কয়েকটি পরিচ্ছেদে গ্রন্থ সমাপ্ত করিয়াছেন। কবিতা যেরূপ, সংক্ষেপে তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিতেছি।

মঙ্গলাচরণের পর "শৃঙ্গারকাব্যশীর্ষক" একটি পরিচ্ছেদ।

এ অংশটি পরিহার্য্য। এবিষয়ে এই মাত্র বক্তব্য যে, সংস্কৃতভাষায় যতগুলি অপাঠ্য, অশ্লীল গ্রন্থ আছে, ইহা তাহারই উদ্গীর্ণের উদ্গীরণ।

কাল বর্ণনটি মন্দ হয় নাই; ইহাতে নূতনত্ব কিছু না থাকিলেও কিঞ্চিৎ কবিত্ব আছে। আমরা দেশ কাল পাত্র বিবেচনায় এই অংশটিকে ভাল বলিলাম ও যথাস্থানে ইহা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিলাম।

"শান্তকাব্যানি" শীর্ষক পরিচ্ছেদটি অশ্লীলতাদুষ্ট নহে, তথাপি সম্ভবতঃ শান্ত-রসোদ্দীপক হয় নাই; ইহার কোন কোন কবিতা ভাল, কোন কোন কবিতা সদোষও হইয়াছে।

ভগ্নো জীর্ণো বিশীর্ণঃ পদমপি চলিতুং যো ন শক্নোতি তল্পা
নিঃশৌচঃ পূতিগন্ধৈর্বিসৃজতি সমলং যত্র ভুঙ্‌ক্তেঽপি তত্র।
শুশ্রূষাভির্বিরক্তঃ সপদি পরিজনো যাচতে যস্য মৃত্যুং
সোঽপি প্রায়ো জুগুপ্সুঃ স্ত্রিয়মনুনয়তি প্রেমবদ্ধাঞ্জলোক্ত্যা।

এই শ্লোকটির তাৎপর্য্য বোধ হয় এইরূপ যে, এমত অবস্থাপন্ন ব্যক্তিও জঘন্যা স্ত্রীকে অনুনয় করিয়া থাকে। এই বাক্যদ্বারা স্ত্রীজাতি প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করানই গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য; কিন্তু উক্ত বাক্য গ্রন্থকারের অভিপ্রায় সিদ্ধি পক্ষে অনুকূল কি না বলিতে পারি না।

আত্মাংস্তব ভবার্ণব স্তরণি কিং সজ্জন্ ক্ষিতাম্মগ্নসে
দৈন্যংজ্ঞানলবেঽপি কোষত তথাপ্যাচাভিমানো মহান্।
চাপিটৈর্ব্বলিনোঽপি গোষ ইতিচ শ্লাঘা কথন্তে মৃষা
সর্ব্বো ভ্রান্তিবশং প্রযত্নব ভবাবর্ত্তে মুহুর্ভ্রাম্যন্তঃ।
প্রসবেঽবধি গৌরীশ কদা মে ছেৎস্যাতেতমঃ।
প্রাভবত্বাদিতে সূর্য্যোদিঙ্মূঢ়স্য যথা ভ্রমঃ।

ইহা মন্দ হয় নাই বিশেষতঃ দ্বিতীয় শ্লোকটীতে দৃষ্টান্তটী অতীব সুন্দর। এক্ষণে কাল বর্ণন হইতে কিঞ্চিৎ।

গ্রীষ্ম

শ্বের শিরীষ কুসুমৈস্তত পাটলাক্তঃ স্কন্ধংলগন্থিব কলং যশকারবেন।'
ক্রীড়ন্নিব প্রখরবাতধুতৈ রজোভির্বালোঽয়ং বিহরতি ভুবোঽঙ্ক তলে নিদাঘঃ।
গাত্রং বিশেষ বিশদং সলিলাবগাহাৎ স্নিগ্ধো মুহুর্ব্যজন চালনতোঽগ্রহস্তৌ।
অঙ্গাদ্যুন্নীত মলয়োদ্ভব চর্চ্চিতানি ভাগো ন শাম্যতি তথাপ্যধুনা জনানাম্।
দিনেষু চণ্ডাতপদাহশঙ্কয়া পদং জনো বাহতি সর্ব্বতোবৃতঃ।
গৃহং তথঃ রবিষু চন্দ্রিকেশয়া ক্রম প্রতীপোঽপি সুখাবহস্থলে।

বর্ষা

বজ্রপাত করকাভিবর্ষণোঃ সম্ভবেহপ্যমৃতভুন্দিনং ঘনং ।
স্তৌতি চাতকযুবা ক হীয়তে যাতুকাপিনয় গোঃ পয়স্বিনী ।
পর্য্যায়তোহস্য বিকটৈঃ সমমন্দ্রতাবৈর্ম্ভাপ্রবাঃ কিমিতরেতর মানপন্তি ।
উৎকুদ্দিতৈর্ম্মদকলা অপি মৎস্যরঙ্কাঃ কিং প্রাবৃষং স্থলভমীনতয়া স্তবন্তি ।

এই শ্লোকগুলি উৎকৃষ্ট, ইহাতে স্বভাবের বৈচিত্র্য সুন্দর রক্ষিত হইয়াছে ; কিন্তু এ অংশ মধ্যেও কোন কোন স্থানে ঋতু সংহারের ছায়া লক্ষিত হয় ।

আমরা বাহুল্য ভয়ে অন্যান্য ভাগ উদ্ধৃত করিলাম না। অন্যান্য অংশের পক্ষে আমাদিগের বক্তব্যও অধিক নাই ; তবে চন্দ্রোদয় বর্ণন হইতে আর একটী শ্লোক পাঠকবর্গকে উপহার দিব ।

পূর্ব্বাচল ব্যবহিতোহপি তমোভিভূতানাশাসয়ন্নিব জনং কর নূপময়া ।
উজ্জৃম্ভতে স্মরমপি দ্বয়যন্ত্রিবাহং দেব্যারতেঃ কুতুক কন্দুকবৎ সুধাংশুঃ ।

পাঠক দেখিবেন চূড়ামণি মহাশয় সম্ভাবনা সত্বে কখনই আদিরসকে পরিত্যাগ করেন নাই ; কিঞ্চিৎ সুবিধা পাইয়া কেমন "দেব্যারতেঃ কুতুক কন্দুকবৎ" প্রয়োগ করিয়াছেন । ফলতঃ এই কবি যখন যেখানে সুযোগ দেখিয়াছেন তখনই কি করুণ, কি শান্ত, সকলের ভিতরেই আদিরস প্রবেশ করাইয়াছেন । এই কারণ গ্রন্থখানি বিকৃত ও অশ্লীলতাদুষ্ট হইলেও গ্রন্থকার তাহা কিছুই লক্ষ্য করেন নাই । ফলতঃ গ্রন্থকারের এই দোষটি অত্যন্ত প্রবল ।

উপসংহারে বক্তব্য যে, এ গ্রন্থকারের অনুকরণস্পৃহা অত্যন্ত বলবতী । এই গ্রন্থের সর্ব্বাপেক্ষা মহদ্দোষ এই, ইহার অধিকাংশ কবিতা নিম্নশ্রেণীস্থ সংস্কৃত কবির অনুকৃতিমূলক । সত্য বটে যে, মনুষ্য স্বভাবতঃ অনুকরণপ্রিয় । আমরা যখন যাহা কিছু প্রচলিত দেখি, বিচার না করিয়া বিবেচনা না করিয়া তখনই তদভিমুখে ধাবমান হই । কিন্তু এ কথা অন্যান্য পক্ষে যাহা হউক এ পক্ষে তত শোভমান নহে । আমাদিগের অনুকরণপ্রিয়তা আছে বলিয়াই একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ বা একখানি ক্ষুদ্র কাব্য রচনা করিতে গিয়া শত শত সহস্র সহস্র বর্ষ ক্রমাগত প্রচলিত কবিতা বা প্রস্তাবের ছত্রে ছত্রে অনুকরণ করিলে চলিবে না । রচনা বিষয়ে অনুকরণের আরও মহোদ্দোষ এই যে, লেখকের নিজের যাহা কিছু কবিত্ব থাকে, অন্যের অনুকরণ করিতে গিয়া হয়ত তিনি তাহা হারাইয়া বসেন । এ বিষয়ের বহুবিধ প্রমাণ দর্শান যাইতে পারে, কিন্তু এ প্রস্তাবের তাহা উদ্দেশ্য নহে । পাঠক দেখিবেন অনেক আখ্যায়িকা, গীতিকাব্য ও সাময়িক পত্রিকা লেখকদিগের এই দশা । সংস্কৃত গ্রন্থকারদিগের মধ্যে এই রীতি অত্যন্ত প্রচলিত । প্রাচীন মহাকবিরা যে প্রণালীতে যে কোন বস্তু বর্ণন করিয়াছেন, অধস্তন কবিরা সেই সেই বস্তু-

বর্ণন স্থলে তাঁহাদিগের মধ্যে অবশ্যই কাহারও না কাহারও অনুকরণ করিয়াছেন। এই নিমিত্ত অনেক সংস্কৃত কবির কবিত্বশক্তি সত্বেও কবিতা সুরস হয় নাই; এই নিমিত্ত অধিকাংশ সংস্কৃতগ্রন্থে সাদৃশ্য যোজনা প্রায়ই একরূপ ও এই নিমিত্তই অধস্তন সংস্কৃত কাব্যের উত্তরোত্তর অধোগতি। আমরা এইস্থলে এ বিষয়ের একটি উদাহরণ প্রদর্শন করিব। সকলেই জানেন যে মুখ বর্ণনায় উপমাস্থলে চন্দ্রপদ্ম সংস্কৃত গ্রন্থকারের একায়ত্ত। কিন্তু যে কবি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া মুখের সাদৃশ্য স্থলে চন্দ্রপদ্মকে গ্রহণ করিয়াছেন, ও যে কবি তদ্দ্বারা কেবল অনুচিকীর্ষাবৃত্তি চরিতার্থ করিয়াছেন উভয়ের কবিত্বে কিরূপ প্রভেদ, তাহা নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক দ্বারা কলে অনুভব করিতে পারিবেন।

চন্দ্রংগতা পদ্ম গুণান্নভুঙ্‌ক্তে পদ্মাশ্রিতা চান্দ্রমসীমভিখ্যাং।
উমামুখন্তু প্রতিপদ্য লোলা দ্বিসংশ্রয়াং প্রীতিমবাপ লক্ষ্মী।

অন্যত্র

ধৃতলাঞ্ছনগোময়াঞ্চনং বিধুমালেপন পাণ্ডুরং বিধিঃ।
ভ্রময়ত্যুচিতং বিদর্ভজা নন নীরাজন বর্দ্ধমানকং।
সুষমা বিষয়ে পরীক্ষণে নিখিলং পদ্মমভাজি তন্মুখাৎ।
অধুনাপি নভঙ্গলক্ষণং সলিলোন্মজ্জন মুজ্‌ঝতি স্ফুটং।

পাঠক দেখিবেন প্রথম কবিতাটী ও শেষ দুইটী একই ভাবাত্মক, কিন্তু কবি সুলভ রচনা ও অনুচিকীর্ষা বশতঃ প্রথমটী যে পরিমাণে হৃদয়গ্রাহিণী, অন্য দুইটী সেই পরিমাণে কর্ণজ্বর।

সর্ব্বশেষে বক্তব্য যে এই কাব্যখানির ভাষা অতি বিশদ, আর ছন্দগুলি সর্ব্বত্রই সুন্দররূপে রক্ষিত হইয়াছে, শ্রুতিকটু বা কাঠিন্য দোষ কুত্রাপি নাই।

অর্থনীতি ও অর্থ ব্যবহার। শ্রীযুক্ত নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম এ, বি এল, বিদ্যারত্ন প্রণীত।

একদা কোন দুর্ভিক্ষ-দুঃখনিবারণী সভায় আমরা উপস্থিত ছিলাম। একজন সুবিজ্ঞ সভ্য প্রস্তাব করিলেন যে, চাউল সস্তা করিবার অন্য উপায় নাই, বাজারের দর বাঁধিয়া দেওয়া হউক। যখনই দুর্ভিক্ষের কোন সূচনা উপস্থিত হয়, তখনই দেশীয় লোকে প্রায় বাজারের দর বাঁধিবার জন্য ব্যস্ত হয়েন। পুনশ্চ দেশীয় লোকে সর্ব্বদা মনে করিয়া থাকেন, ভারতবর্ষীয় বাণিজ্যে দেশের অনিষ্ট হইতেছে, বিলাতীয় সওদাগরেরা আসিয়া দেশের টাকাটা লুঠিয়া লইয়া যাইতেছে। এই সকল গুরুতর ভ্রম যে ভ্রম, ইহা তাঁহাদিগকে বুঝান প্রায় অসাধ্য। এ সকল ভ্রমে দেশের অনেক অনিষ্ট ঘটিতেছে—অনেক অবাঞ্ছনীয় বিষয়ে বৃথা যত্ন হইতেছে, অনেক মঙ্গলের উচ্ছেদের জন্য চেষ্টা হইতেছে, অনেক বৃথা ভয়ে লোকে কষ্ট পাইতেছেন। কিসে

সামাজিক উন্নতি কিসে অবনতি তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারেন না ; সমাজের গতি পর্য্যবেক্ষণায় তাঁহারা অশক্ত। এই সকল দেখিয়া আমাদিগের সর্ব্বদা মনে হইত, যে যত দিন না বাঙ্গালা ভাষায় অর্থশাস্ত্রের প্রচার হয়, তত দিন দেশের উন্নতির প্রধান পথ রুদ্ধ। যিনি অর্থশাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায় প্রচার করিবেন, তিনি দেশের পরম উপকার করিবেন। নৃসিংহ বাবু দেশের এই মহৎ উপকার করিয়াছেন।

আমরা এ গ্রন্থ পাঠ করিয়া নৃসিংহ বাবুর অনেক প্রশংসা করিয়াছি। আমাদিগের এরূপ বিশ্বাস ছিল, যে অর্থশাস্ত্র যেরূপ দুরূহ, তাহা সকলের বোধগম্য করিয়া বাঙ্গালা ভাষায় ইহার প্রণয়ন করা অসাধ্য। নৃসিংহ বাবু সে অসাধ্যও সাধন করিয়াছেন। এই গ্রন্থ, সকলেরই বোধগম্য। অতি সরল ভাষায়, অতিশয় কঠিন তত্ত্ব সকল অতি পরিষ্কার করিয়া বুঝান হইয়াছে। অর্থশাস্ত্র বিষয়ক এরূপ পরিষ্কৃত রচনা ইংরাজিতেও বিরল। গ্রন্থখানি পাঠ করিলে বোধ হয় নৃসিংহ বাবু এই শাস্ত্র অতি সুন্দররূপে নিজে বুঝিয়াছেন, এবং বাঙ্গালা রচনায় তিনি বিশেষ ক্ষমতাশালী।

নৃসিংহ বাবু বিস্তর আয়াস সহকারে নানা গ্রন্থ হইতে এই গ্রন্থ সঙ্কলিত করিয়াছেন। কোন একজন লেখকের মতের অনুগামী হয়েন নাই। ইহা ভালই করিয়াছেন।

গ্রন্থখানির মূল্য অতি অল্প, অথচ তাহাতে বিস্তর কথা আছে। উৎকৃষ্ট গ্রন্থ এরূপ সুমূল্য প্রায় দেখা যায় না। গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য লোকের শিক্ষা, নিজের লাভ নহে। আমরা নৃসিংহ বাবুর কাছে ইহার জন্য বিশেষ কৃতজ্ঞ।

আমাদিগের বিবেচনায় বিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে অর্থশাস্ত্রের মূল নীতি সকল শিখান কর্ত্তব্য। এই গ্রন্থখানি তাহার বিশেষ উপযোগী। শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণকে অনুরোধ করি, এ গ্রন্থখানি বিদ্যালয়ে প্রচারিত করুন।

ঐতিহাসিক রহস্য। প্রথম ভাগ। শ্রীরামদাস সেন প্রণীত। কলিকাতা ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোম্পানী।

এই গ্রন্থে কতকগুলি ঐতিহাসিক প্রবন্ধ সঙ্কলিত হইয়াছে। যথা (১) ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত সমালোচন, (২) মহাকবি কালিদাস, (৩) বররুচি, (৪) শ্রীহর্ষ, (৫) হেমচন্দ্র, (৬) হিন্দুদিগের নাট্যাভিনয়, (৭) বেদপ্রচার (৮) গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যবৃন্দের গ্রন্থাবলীর বিবরণ, (৯) শ্রীমদ্ভাগবত (১০) ভারতবর্ষের সঙ্গীত শাস্ত্র। এবং একটি পরিশিষ্ট আছে। শ্রীমদ্ভাগবত বিষয়ক প্রবন্ধটি রহস্য সন্দর্ভ হইতে পুনর্মুদ্রিত, এবং অবশিষ্ট সকলগুলিই বঙ্গদর্শন হইতে পুনর্মুদ্রিত।

অল্পাংশ ভিন্ন এই গ্রন্থ বঙ্গদর্শন হইতে পুনর্ম্ুদ্রিত বলিয়া আমরা ইহার সবিশেষ সমালোচনা হইতে বিরত হইলাম। কেননা, ইহার প্রশংসা করিলে একপ্রকার আত্মপ্রশংসা করিতে হয়। বিশেষ, এই সকল প্রবন্ধ প্রথমে এই পত্রের সম্পাদকের অনুরোধে লিখিত হয়।

তবে ইহা বলা যাইতে পারে, যে রামদাস বাবু এক জন বিখ্যাত লেখক এবং পুরাবৃত্তবেত্তা। এবং এই সকল প্রবন্ধ অন্যান্য পত্রে বিশেষ প্রশংসিত হইয়াছে। এ প্রকার গ্রন্থ এই প্রথম বাঙ্গালা ভাষায় প্রচারিত হইল।

গ্রন্থকার এই গ্রন্থ সুবিখ্যাত ভাষাতত্ববেত্তা "ভট্ট মোক্ষমূলর"কে উপহার প্রদান করিয়াছেন।

তৃতীয় বর্ষ : তৃতীয় সংখ্যা

আমরা একজন সুলেখককে অদ্য পাঠকদিগের নিকট পরিচিত করিতেছি। "চন্দ্রনাথ" পাঠ করিয়া আমাদিগের এইরূপ বোধ হইয়াছে যে, ইহার প্রণেতা সুলেখক বটে, কিন্তু তিনি যেমন সুলেখক, গ্রন্থ তত ভাল হয় নাই। বোধ হয় ক্ষেত্রপাল বাবুর এই প্রথম গ্রন্থ, এই গ্রন্থখানি পাঠ করিয়াই আমরা তাঁহাকে সুলেখক বলিতেছি, অথচ গ্রন্থখানির তত প্রশংসা করি না।

অথচ গ্রন্থখানির এ পরিমাণে উৎকর্ষ আছে যে, ইহার দোষনির্ব্বাচনে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতে পারে। সচরাচর বাঙ্গালা গ্রন্থসকল এরূপ জঘন্য যে, ঘৃণা করিয়া আমরা তাহার দোষনির্ব্বাচনে প্রবৃত্ত হই না। অনেক গ্রন্থকার এই বলিয়া আমাদিগের নিকট মনোদুঃখ প্রকাশ করিয়া থাকেন যে, "আমার গ্রন্থের উপর ব্যঙ্গ করা হইয়াছে, কিন্তু দোষ কিছু নির্ব্বাচন করা হয় নাই।" তাঁহারা বুঝেন না যে, যাহার সর্ব্বাঙ্গে ক্ষত, তাহার কোথায় ঔষধ দিব? যাঁহার এক পৃষ্ঠার দোষবর্ণনে দশ পৃষ্ঠা লিখিতে হয়, ক্ষুদ্র বঙ্গদর্শনে তাঁহার কত দোষ লিখিব? তাঁহাদিগের দোষনির্ব্বাচনের কোন ফলও দেখা যায় না। দোষনির্ব্বাচনে দুইটি মাত্র উদ্দেশ্য—এক, গ্রন্থকার, আপন দোষ সংশোধন করিয়া ভবিষ্যতে উৎকর্ষলাভ করিতে পারেন; আর এক অন্যকে সতর্ক করা। এ সকল গ্রন্থ সম্বন্ধে প্রথম উদ্দেশ্য, অরণ্যে রোদন মাত্র—যাঁহার রচনা দেখিয়া ভবিষ্যতের আশা একেবারে নির্ম্মূল হয়, তাঁহাকে পরামর্শ দিয়া কি করিব? দ্বিতীয় উদ্দেশ্যেও যত্ন নিষ্প্রয়োজন—যাহা কেহ পড়িবে না তৎসম্বন্ধে পরকে সতর্ক করিবার আবশ্যকতা কি?

এই সকল কারণে অধিকাংশ গ্রন্থের সবিস্তার দোষকীর্ত্তনে আমরা বিরত; কখন কখন কোন গ্রন্থের প্রতি এতাদৃশ ঘৃণা জন্মে যে, তাহার কিছুমাত্র দোষের উল্লেখ করা অনাবশ্যক মনে করি। ইহার ফল এই দাঁড়ায় যে, যাঁহার কিছু গুণ

চন্দ্রনাথ। উপন্যাস। শ্রীক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তী প্রণীত। কলিকাতা [illegible] প্রেস।

আছে, তাঁহার দোষ থাকিলেই তিনিই নিন্দার ভাগী হয়েন—এবং কিয়ৎপরিমাণে উৎকৃষ্ট না হইলে তাহার দোষ ব্যাখ্যায় আমরা প্রবৃত্ত হই না।

চন্দ্রনাথের "কিছু" গুণ আছে বলিলে অন্যায় বলা হয়—ইহার অনেক গুণ আছে। অনেক দোষও আছে। দোষ গুণের দুই একটা বলিতেছি।

অনেক উৎকৃষ্ট কাব্যোপন্যাসে দুইটি পৃথক্ উপাখ্যান, একত্রে বিন্যস্ত হইয়াছে। লিয়রে, এইরূপ দুইটি উপাখ্যান; একটির নায়ক স্বয়ং লিয়র, আর একটির নায়ক এড্মণ্ড ও এড্গার। "নিদাঘ নিশীথের স্বপ্নে" ঐরূপ, দুইটি নায়ক এবং দুই নায়িকা, দুইটি স্বতন্ত্র উপাখ্যানের বিষয়ীভূত। ঐবান্হোর, এক উপাখ্যানের নায়ক ঐবান্হো, অপরের নায়ক রাজা রিচার্ড। কেনিলর্থে, একটি উপাখ্যানের নায়ক, লের, নায়িকা রাজ্ঞী; অপরের নায়ক ট্রেসিলিয়ন, নায়িকা এমি। এইরূপ শত শত উৎকৃষ্ট কাব্য, নাটক, উপন্যাসে আছে, কিন্তু এই সকলেই, স্বতন্ত্র উপাখ্যানগুলি আশ্চর্য্য কৌশলের সহিত, এক সূত্রে গ্রন্থিত হইয়াছে, দুই স্রোতঃ এক খাদে প্রবাহিত হইয়াছে। প্রতিভাশূন্য লেখকের হস্তে তাহা হয় না—উদাহরণ—"মিষ্টরিস"।

চন্দ্রনাথে, দুইটি কেন, চারিটি পৃথক্ পৃথক্ উপন্যাস সন্নিবেশিত হইয়াছে যথা—

১। সৌরেন্দ্র হেমলতার কথা।
২। নবীন সুলোচনার কথা।
৩। নিস্তারিণী সদানন্দের কথা।
৪। মহেন্দ্র মনোরমার কথা।

এই চারিটি উপন্যাসের মধ্যে কাহারও সঙ্গে কাহারও কোন সম্বন্ধ দেখা যায় না। চারিটি স্বতন্ত্রই আছে। চারিটি পৃথক্ পৃথক্ লিখিলেই ভাল হইত—বস্তুতঃ তাহাই হইয়াছে। কেবল, এ উপন্যাসের পরিচ্ছেদ, ও উপন্যাসের পরিচ্ছেদগুলির মধ্যে, ও উপন্যাসের পরিচ্ছেদ, এ উপন্যাসের মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়া, ক্ষেত্রপাল বাবু চারিখানির এক টাইটলপেজ, এক নাম দিয়া, জোর করিয়া এই এক গণ্ডা নবেলকে একখানি বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন।

মূলবিষয়নির্ম্মাণে এইরূপ কৌশলের অভাব। স্বতন্ত্র উপাখ্যানগুলির গ্রন্থনে বিশেষ প্রশংসনীয় নির্ম্মাণকৌশল দেখিতে পাইলাম না। সদানন্দ নিস্তারিণীর উপাখ্যানে কিঞ্চিৎ কৌশল আছে—নবীনের উপাখ্যানেও কিঞ্চিৎ—কিন্তু অপর দুইটিতে কিছু মাত্র নাই।

দ্বিতীয়, চরিত্র। সৌরেন্দ্র কিছু হয় নাই; হেমলতাও না। রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য কেহ নহে। নবীন, সামান্য প্রকার; সুলোচনা, কাপির কাপি, তস্য

কাপি। উপেন্দ্র, সাধারণ নাটকের বওয়াটে বাবু মাত্র—আলালের ঘরের দুলালের "প্র-পরা-অপ-পৌত্র।" তাঁহার পারিষদেরা মতিলালের পারিষদের "সু-উৎ-পরি-দৌহিত্র" মাত্র। কেবল রূপচাঁদ সুন্দর হইয়াছে—অতি সুন্দর হইয়াছে। মহেন্দ্র বা মনোরমা বিশেষ কিছু না; বিনোদও না। সদানন্দ, উত্তম হইয়াছে। নিস্তারিণী উত্তম হইয়াছে। মতিয়া, এক নজর বৈ দেখা দেয় নাই; কিন্তু সেই এক নজরে অনেক সৌন্দর্য্য দেখাইয়াছে।

ইহা কেহ প্রত্যাশা করে না যে, কোন কাব্যের সকল নায়ক নায়িকাগুলির চরিত্র উত্তম হইবে। সকলগুলিকে পরিস্ফুট করা যাইতেও পারে না। একখানি গ্রন্থে দুই একটি চরিত্র সুচিত্রিত হইলেই তাহার প্রশংসা করা যায়। সদানন্দ, নিস্তারিণী এবং রূপচাঁদকে দেখিয়া, চরিত্রচিত্রবিষয়ে তাঁহার প্রশংসা করিলাম।

ক্ষেত্রপাল বাবু চরিত্রের সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন—তাঁহার গ্রন্থে নূতন সৃষ্টি কিছুই নাই। তিনি চিত্রকর মাত্র—কয়টি চিত্র উত্তম হইয়াছে।

তৃতীয়, সংস্থান। যে সকল অবস্থা বিশেষে নায়ক নায়িকাগণকে সংস্থাপিত করিলে, রসবিশেষের অবতারণা সহজ হয়, তাহাকে সংস্থান বলিতেছি। ইহাতে নৈপুণ্য ব্যতীত উপন্যাসকার, বা নাটককার, কোন মতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন না। সংস্থানই রসের আকর। ক্ষেত্রপাল বাবুর ইহাতে বিলক্ষণ দক্ষতা আছে। নবীন সুলোচনার উপাখ্যান সুসংস্থানে পরিপূর্ণ।

চতুর্থ, রস। ইহাতেও ক্ষেত্রপাল বাবুর ক্ষমতা মন্দ নহে। অনেক স্থানে, করুণ ও হাস্যরসের অবতারণায় বিলক্ষণ পটুতা দেখাইয়াছেন। পশ্চাৎ উদাহরণ উদ্ধৃত করিতেছি।

ভাষা। ক্ষেত্র বাবুর ভাষা বহুবিধ। সচরাচর হুতোমী ভাষাই ব্যবহার করিয়াছেন। অর্থাৎ যে ভাষা বাঙ্গালিরা লিখিয়া থাকেন—সে ভাষায় গ্রন্থ না লিখিয়া যে ভাষা কথোপকথনে ব্যবহৃত হয় তাহাতেই গ্রন্থ লিখিয়াছেন। কিন্তু আবার অনেক স্থানে হুতোমী ভাষা পরিত্যাগ করিয়া, বাঙ্গালা লিপির ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন। অনেক স্থানে ভাষা সরল ও সুমধুর—স্থানে স্থানে শব্দাড়ম্বর-বিশিষ্ট।

পঞ্চম, রুচি। ক্ষেত্রপাল বাবুর রুচির নিন্দা করিতে আমরা বাধ্য হইতেছি। ৭৩ পৃষ্ঠায়, নিম্ন হইতে গণিয়া নবম পংক্তি পাঠ করুন—অশ্লীলতা দোষের উদাহরণ পাওয়া যাইবে। "স্বামী" অর্থে তাঁহার নায়িকারা ভর্ত্তা শব্দের অপভ্রংশটিই ব্যবহার করিয়া থাকেন। তাহারা স্ব স্ব স্বামীকে সুখের সময়ে, দুঃখের সময়ে, সকল সময়ে, "ভাই" বলিয়া সম্বোধন করিতে ব্যস্ত। কিন্তু এ সকল সামান্য দোষ। একটি গুরুতর, এবং মার্জ্জনাতীত রুচির দোষ এই যে, তিনি গাঢ় রঙে পাপের চিত্র

আঁকিয়া তাহাকে পাঠকের নয়নপথে ধরিয়াছেন—পাপের সে চিত্রের জন্য বহু যত্নে রঙ ফলাইয়া, বহু যত্নে তাহাতে তুলি ঘসিয়াছেন। তাহাতে পাপের মোহিনীশক্তি পরিস্ফুট হইয়াছে। উদাহরণ—মহেন্দ্র মনোরমা সম্বন্ধে ৮৪।৮৫-এবং ১৭৩।১৭৪ পৃষ্ঠার লিখিত বিবরণ। সত্য বটে, ধর্ম্মাধর্ম্মের বিরোধই কাব্যের সামগ্রী—এবং রাবণ হইতে মোহন্ত পর্য্যন্ত পাপিষ্ঠের পাপ বর্ণনা কাব্যের একটি কার্য্য। কিন্তু এখানে যেরূপ বর্ণনা দেখা যায়, তাহাতে পাপের বিঘ্ন হয় না—পুষ্টি হয়। কবির কর্ত্তব্য, পাপের সিদ্ধির উপর আবরণ নিক্ষেপ করিয়া তাহার লক্ষণ, গতি, এবং ফল বর্ণিত করেন।

উপাখ্যানের শেষভাগে গ্রন্থকার যাকে পাইয়াছেন, তাহাকে মারিয়াছেন। সুলোচনা মরিল, নবীন মরিল, মহেন্দ্র মরিল, মনোরমা মরিল, সদানন্দ মরিল, আরও কে কে মরিল। অনেক তরুণ লেখক ইংরেজি নাটকের অনুকরণ করিতে গিয়া এইরূপ কসাইয়ের কাজ করিয়া ফেলেন। ক্ষেত্রপাল বাবুকে এই গোহত্যাগুলির প্রায়শ্চিত্ত করিতে অনুরোধ করি।

সবিস্তারে আমরা চন্দ্রনাথের দোষ বর্ণনা করিয়াছি বলিয়া, আমরা সংক্ষিপ্তভাবে গ্রন্থের গুণের পরিচয় দিবার জন্য, নিম্নলিখিত কয়েকটি স্থান উদ্ধৃত করিলাম।

প্রথম একটি বর্ণনা।

“রজনী অবসান; কিন্তু এখন প্রভাত হয় নাই। চন্দ্রমা গগনমধ্যস্থ জ্যোতিঃহীন, পূর্ব্বদিকে শুক্রগ্রহ একাকী সমুজ্জ্বল। সপ্তর্ষিমণ্ডল বায়ুকোণে বিলীনপ্রায়। অন্ধকার পাংশুবর্ণ। নীলবর্ণ গগনে মেঘাবলী অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়া চন্দ্রমাকে পরিবেষ্টন করিয়া আছে। পক্ষিগণ কুলায় হইতে এক এক বার কিঞ্চিৎ বাহির হইয়া নিস্তব্ধ জগতে সুস্বরলহরী বিস্তার করত পুনরায় কুলায় মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া নীরবে রহিয়াছে—বোধ হয় উহারা নিশি অবসান হইয়াছে কি না তাহা নিশ্চয় করিতে পারিতেছে না। ভাগীরথীর জল এখন শশিকলার সুন্দর ছবি লইয়া নৃত্য করিতেছে। মন্দ মন্দ বায়ুভরে তরঙ্গরাজি আসিয়া তটে প্রতিহত হইয়া পুনরায় যুগশত সম্মিলিত জলরাশিতে মিলিত হইতেছে। বৃক্ষপত্র হইতে নিশির শিশির বিন্দু বিন্দু হইয়া ভূতলে পতিত হইতেছে,—এমন সময়ে রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য এক হস্তে একখানি কোশা, অপর হস্তে পরিধেয় ধুতি ও নামাবলী লইয়া ধীরে ধীরে গঙ্গাস্নানে আসিতেছেন; পথ ঘাট জনহীন, একাকী মৃদুস্বরে—

হে কেশীমনমথন, মধু কৈটভ মুরারে।
(জয়) জয় মীন-রূপ-ধর, জয় বরাহবর,
কূর্ম্মপধর, বামন বিহারে।

হরিনাম সংকীর্ত্তন করিতে করিতে গঙ্গাতীরে আসিয়া উপনীত হইলেন—হইয়া দেখিলেন তিন জন ধীবর জাল ফেলিয়া মৎস্য ধরিতেছে ; তাহাদিগের সম্মুখে একটি ক্ষুদ্র নৌকাতে একজন মনুষ্য দাঁড় হস্তে বসিয়া আছে, পরপারে—আবদ্ধ নৌকাশ্রেণী হইতে দীপমালা ভাগীরথীর জলে প্রতিবিম্বিত হইয়া কম্পিত হইতেছে।

তারপর সদানন্দ নিস্তারিণীর সম্বাদ।

"কর্ত্তা রেগেছেন দেখে খুদি চাকরাণী কাটের পুতুলের মতন আড়ষ্ট হয়ে এক পাশে দাঁড়িয়ে রইল ; এমন সময়ে ঝম্ ঝম্ মলের শব্দ কর্ত্তার কাণে গেল। কর্ত্তা গিন্নী আস্‌ছেন বুঝ্‌তে পেরে রাগভরে মুখখানি গোঁজ্ করে রইলেন। গিন্নী ঝম্ ঝম্ কর্‌তে কর্‌তে ঘরের ভিতরে এলেন। গিন্নী দেখ্‌তে মন্দ নয়, রং উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, গড়ন পিটনগুলি বেশ মাট মাট, তাতে আবার যৌবনকাল, যৌবন জুয়ারের জল কানে কান, টল্ টল, বানের টান, কুটগাছ্‌টি দিলে দুভাগ হয়ে যায়—কানে কতকগুলি মাকড়ি, খোঁপা ফিরিঙ্গি গোচ্ করে বাঁধা জরি দিয়ে মোড়া, হাতে চার্ গাচা করে সোণার দম্‌দম্, দুপায়ে চারগাচি মল্, পরণে একখানি অতি সরু সিম্‌লের ধুতী—পরা মাত্র, আঁচলে একটী রিং, তাতে কতকগুলি চাবি ঝোলান। এই আঁচলটি ঢং করে বেড় দিয়ে কাঁদের উপর ফেলেচেন : চল্‌বার কি ঠসক্! আস্তে আস্তে হেল্‌তে দুল্‌তে যাচ্চেন, এম্‌নি ভাবে যাচ্চেন যেন প্রতি পদে পদে বল্‌চেন্ আমার এ যৌবনের ভার আমি আর বইতে পারিনে, যদি কেউ মন বুঝে নেয় তো দিতে রাজি আছি। গিন্নী এইরূপ ভাবে ঘরের ভিতর এলেন, কর্ত্তা হাঁড়িপানা মুখ করে বসে আছেন দেখ্‌লেন, দেখে ভ্রূক্ষেপও কর্‌লেন্ না। আন্‌লা থেকে একখানি আটপউরে কাপড় নিয়ে, পরা কাপড়খানি ছাড়তে লাগ্‌লেন। সদানন্দ আরো জ্বলে উঠলেন, শেষে আর থাক্‌তে না পেরে বল্‌লেন, "কোথায় গিয়েছিলে ?"

গিন্নী। যেখানে যাই না কেন, আবার তো ফিরে এসেছি।

কর্ত্তা। আসবেনা তো যাবে কোন্ চুলোয় ?

গিন্নী। চুলোয় সত্তি, তুমি যে রেগে গর্ গর্ কর্‌চো তোমার কি হয়েছে ?

কর্ত্তা। বুকে বসে দাড়ী ওপ্‌ড়াচ্চো আবার কি হয়েছে ?

গিন্নী। পাকা দাড়ী ওপ্‌ড়ালে কি লেগে থাকে—কাঁচা হলেই লাগে।

কর্ত্তা। আমি কি বুড় ?

গিন্নী। আমি সে ভাবে বলিনে—না—তুমি বুড় নও আমি বুড়—তুমি ষোল বছরের ছোক্‌রা, মরণ আর্ কি যত বয়স হচ্চে তত ছোট হচ্চেন্।

কর্ত্তা। (ভয়ঙ্কর রেগে) মর্ বলে গালাগাল্ দিলে যে বড় ? আমি মোলে তুমি নিশ্চিন্ত হও——

গিন্নী। (ঈষৎ হাসিতে হাসিতে) বালাই—তোমাকে কি গাল দিতে পারি ? আকাশে থুথু ফেল্‌লে আপনারি গায়ে লাগে—তোমাকে যে ভালবাসে সে মরুক্।

কর্ত্তা। আবার ঠাট্টা—গালের উপর আবার ঠাট্টা—

গিন্নী। বেস্ আমি কি ঠাট্টা কর্‌লুম, আমি বল্‌লুম্ তোমাকে যে ভালবাসে সে মরুক্—আমি তোমাকে ভালবাসি, আর তুমি আমাকে দূর্ ছাই কর, এই জন্যে আমি মরি।

কর্ত্তা। (কিছু নরম্ হয়ে) তুমি যে আমাকে ভালবাস তা আমি দেখ্‌তেই পাচ্চি ; আমি বাড়ী থেকে একটু বেরিয়ে গিয়েছিলুম্ আর তুমি উমাচরণ ভদ্দরের বাড়ী কর্ত্তাভজার্ দলে গিয়ে মিশেছিলে।

গিন্নী। তাতে কি দুষ্য হয়েছে—এই অন্ধকার বাড়ীতে চুপ্ করে না থেকে একটু গান্ টান্ শুন্‌তে যাই, তাতে তোমার এত রাগ কেন ?

কর্ত্তা। রাগ্ কেন ? ও সব বদ্‌মাইসের দল, ওখানে ভদ্রলোকের মেয়ে ছেলে যায় না।

গিন্নী। না—ওখানে সব ছোটলোকের মেয়েরা আসে, ওরা ধর্ম্মের কথা কয়, ওরা বদ্‌মাইস্ : আর তুমি ভুলেও ধর্ম্মের কথা মুখে আন না—কেবল টাকা টাকা কর, তুমিই সাধু।

কর্ত্তা। আমি অধার্ম্মিক্‌ই হই, আর অসাধুই হই, আমাকে ভালবাসা ও আমার সেবা করা তোমার ধর্ম্ম।

গিন্নী। আমি কি তা কর্‌চি নি, আমি এও কর্‌চি ওও কর্‌চি।

কর্ত্তা। তা হবে না, শুক্রবার হলে তুমি আর ওখানে যেতে পাবে না।

গিন্নী। (মহা বিপদ দেখে) বলি তুমি আমার সঙ্গে অ্যাত লেগেচ কেন ? তোমার অনেক টাকা দেখে আমার বাপ মা তোমায় বেচে গিয়েছে, তাই তুমি যা ইচ্ছে তাই বল্‌চো ; আমি যদি বড় মানুষের মেয়ে হতুম্, আমার বাপের যদি বিষয় থাক্‌তো তাহলে আর তুমি আমাকে দু পা দিয়ে থাঁৎলাতে পার্‌তে না—এক মুঠ খেতে দেও বলে কি অ্যাত—(বলে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লো।)

কর্ত্তা। (মহা ফাঁপরে) আমি তোমাকে কখন অযত্ন করেছি, না তোমাকে কখন বকি, তবে তুমি কর্ত্তাভজার দলে গিয়েছিলে বলে রাগ্ করেছিলুম্, রাগের ভরে দুটো নিষ্ঠুর কথা বলেছি, তা ঝক্‌মারি করেছি, আর কেঁদনা, তোমার কান্না দেখ্‌লে আমার বুক ফেটে যায় ; তুমি কিসে সুখে থাক্‌বে বলে ভেবে ভেবে আমার শরীর আধখানি হয়ে গেছে, আমার আর সে রকম্ বল নাই, সে রং নাই, এই দেখ কাল হয়ে গিয়েছি, আমি সর্ব্বদাই তোমার বিষয় ভাবি।

গিন্নী। ভাব্‌বেনা কেন? সবাই আমার দোষ ভাবে, তোমার জন্যে আমার একটু স্বস্তি নেই, কোথায় যাবার যো নেই, কারো সঙ্গে কথা কবার যো নেই, একটু ছাতের উপর দাঁড়াবার যো নেই, ছিনে জোঁকের মত সর্ব্বদাই সঙ্গে লেগে আছো—ছি! পুরুষ মানুষের কি অ্যাত মেয়ে-ন্যাক্‌ড়া হওয়া ভাল? তোমার আচরণ দেখে আমার এম্‌নি ঘেন্না হয়, যে গলায় একগাছা দড়ী দিয়ে মরি। (এই বলিয়া গিন্নী পুনরায় ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগ্‌লেন।)

কর্ত্তা। (সকাতরে) আমি ঝক্‌মারি করেছি, আমার ঘাট্ হয়েছে, তুমি আর কেঁদনা আমি আর কিছু বলবো না।

গিন্নী। তুমি আমার গায়ে হাত দিয়ে বল আমায় কখন কিছু বল্‌বেনা, আমাকে শুক্রবার সন্ধ্যার সময় ছেড়ে দেবে—বল? না বল্লে আমি আর খাব দাব না, আমি—(এই বলে ঢিপ্‌ করে শুয়ে পড়লেন্)

কর্ত্তা। (অগত্যা) এই গায়ে হাত দিয়ে বল্‌চি আমি তোমাকে আর কিছু বল্‌বো না।

গিন্নী। শুক্রবার সন্ধ্যাবেলা ছেড়ে দেবে, বল?

কর্ত্তা। দেবো।

গিন্নী। আমার মাথা খাও, দেবে?

কর্ত্তা। আঃ! আচ্ছা দেবো।”

তারপর বিনাপরাধে চোর বলিয়া অবরুদ্ধ হওয়ার পরে, নবীনের গৃহে প্রত্যাগমন।

তারপর নবীনের পুলিস হইতে প্রত্যাগমন।

“পর দিন, সোমবার, বেলা পাঁচটা বেজেচে, নবীনবাবু সদ্বিচারক মহাত্মা রবার্ট সাহেবের নিরপেক্ষ বিচারে নির্দ্দোষী প্রকাশ হয়ে পুলিস থেকে বেরিয়ে একবার মনে করিলেন আপিসে যাই। সাহেব একে তো প্রতিকূল অম্‌নিতেই দোষ না পেয়ে তাড়াবার পন্থা করে, আজ আবার এই কামাই হয়েছে, কোন খবর পাঠাতে পারি নি—নিশ্চয় জরিমানা করেচে। কিন্তু সুলোচনাকে কাল রাত্রে যে রকম দেখে এসেচি, তাতে তিলার্দ্ধ বিলম্ব করতে পারি নি, মন কেমন হু হু করচে, আগেত বাড়ী যাই, প্রাণটা জুড়াগ। মনে মনে এই চিন্তার পর যত শীঘ্র চল্‌তে পারেন চলে বাড়ীর দরোজায় এসে দাঁড়ালেন। দরোজা দেওয়া—ঘা দিতে লাগ্‌লেন। বাড়ীর ভিতর থেকে দাসী দরোজায় ঘা মারা শব্দ শুন্‌তে পেয়ে তাড়াতাড়ি দরোজা খুলে দিতে এল। ছেলে দুটিও সেই সঙ্গে—“সদি, বাবা এয়েচে, বাবা এয়েচে” জিজ্ঞাসা করতে করতে দৌড়িয়ে দাসীর সঙ্গে এল। দরোজা খুলিতেও বিলম্ব সহিল না। ছেলে দুটি কপাটের ফাঁক দিয়ে “বাবা, বাবা, এয়েচ?”

বলে ডাক্‌তে লাগ্‌লো। নবীনবাবু বাহির থেকে—"হ্যাঁ বাবা এসেচি" বলে সাড়া দিলেন। দাসী দরোজা খুলে দিলে। ছেলে দুটি ওম্‌নি দৌড়িয়ে নবীনবাবুর হাঁটুদুটো জাপ্‌টিয়ে ধর্‌লে। বড় ছেলেটি বাপের মুখের দিকে চেয়ে কাঁদ কাঁদ চক্ষে তিরস্কার করিবার ভাবে "বাবা কোথায় গিয়েছিলে? মার অসুখ—মা উঠ্‌তে পারে না আমরা আজ ভাত খাই নি।" ছোট ছেলেটি "বাবা কোথায় গিছ্‌লি?" বলে উঠে গলা জড়িয়ে ধরে ফুলে ফুলে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লো। নবীনবাবুর চক্ষু দুটি তাই দেখে জলে আবরিয়ে এল। তিনি বড় ছেলেটির দাড়ি ধরে "আজ ভাত খেতে পাওনি বাবা?" বলেই আপনি ফুলে ফুলে কাঁদতে কাঁদতে একটি ছেলের হাত ধরে, আর একটিকে বুকে করে নিয়ে, তাড়াতাড়ি বাড়ীর ভিতর গেলেন—গিয়ে দেখেন সাধ্বী সুলোচনা ধরাবলুণ্ঠিতা, তাঁহার স্বাভাবিক হাস্যবদনখানি অতি ম্লান, মস্তকের কেশরাশি আলুলায়িত, চতুষ্পার্শ্বে বিস্তৃত, ওষ্ঠ ও অধরের আর সে রক্তিম আভা নাই, শুষ্ক, পাণ্ডুবর্ণ, মন্দ মন্দ কম্পিত। যে প্রফুল্ল নয়নদুটীর জ্যোতিঃ নবীনবাবুর হৃদয়ে অমৃত বর্ষণ করিত, সেই নয়ন দুটিতে আহা! আজ কালিমা পড়িয়াছে—স্বর ক্ষীণ ও অপরিস্ফুট—অস্থিরা, ধরোপরি এপাশ ওপাশ করিতেছেন। নবীনবাবু প্রাণাধিকা সুলোচনাকে ঈদৃশ অবস্থাপন্ন দেখিয়া "হা প্রিয়তমে—রে চণ্ডাল গোলোক তুই কি করিলি" বলিয়া তিনি সুলোচনার নিকট বসিয়া পড়িলেন। সুলোচনা স্বামীকে প্রত্যাগত দেখিয়া প্রথমতঃ আহ্লাদিত, তৎপরে তাঁহার সকরুণ আর্ত্তনাদ শুনিয়া চমকিত হইয়া, উঠিয়া বসিবার জন্য চেষ্টা করিলেন—উঠিতে পারিলেন না। নবীনবাবু সযত্নে সুলোচনার মস্তকটি আপনার ক্রোড়ে রাখিলেন। সুলোচনা দক্ষিণ হস্ত দ্বারা স্বামীর কটিদেশ বেষ্টন করিয়া কাতর স্বরে বলিলেন "আমার প্রাণ ক্যামন কর্‌চে—তোমার কি হলো তুমি এখন ক্যান বল্‌চো না আবার কি তোমায় নিয়ে—?"

ইত্যাদি। ভরসা করি, পাঠক এতক্ষণে বুঝিয়াছেন যে আমরা কেন বলিয়াছি যে লেখক সুলেখক বটে, কিন্তু গ্রন্থ তত ভাল হয় নাই।

চতুর্থ প্রস্তাব—রাজধর্ম্ম

রাজধর্ম্ম সম্বন্ধে রামায়ণ হইতে যে উপকরণ সমষ্টি সংগৃহীত হইবে, তাহাই যে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে বাল্মীকির সময়ে, ভারতে কার্য্যে পরিণত হইয়াছিল, ইহা বিবেচনাসিদ্ধ নহে। কাজে এবং কথায় সচরাচর যতটুকু অন্তর দেখা যায়, এখানেও বোধ হয় সেইরূপ হইতে পারে। মনুষ্যের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কর্ত্তব্য কার্য্য এবং মনুষ্যের অবস্থা, এতদুভয়ের বৃত্তান্ত বিষয়ে কিছু প্রভেদ লক্ষ্য হয়। প্রথমোক্ত বিষয়ে অত্যুক্তি হওয়ার অধিক সম্ভাবনা, শেষোক্ত বিষয়ে তত নহে।

এই প্রবন্ধের প্রথম প্রস্তাবদ্বয়ে যেরূপ দেশ প্রদেশাদির আকৃতি এবং অবস্থিতি প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা দ্বারা প্রতীত হইবে যে রামায়ণের সময়ে বা তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বে, আর্য্যভূভাগে একছত্র রাজা কেহ ছিলেন না। মহাভারতে যেমন দেখা যায় যে, কোন কোন প্রতাপশালী রাজা মধ্যে মধ্যে একাধিকারের চেষ্টা করিয়াছেন এবং কখন বা সফলও হইয়াছেন, আবার কখন বা নৈরাশ্যে পতিত হইয়াছেন; রামায়ণের উত্তরকাণ্ড ব্যতীত আর কোথাও সেরূপ লক্ষিত হয় না। উত্তরকাণ্ড বাল্মীকির লেখনীনিঃসৃত কি না এবিষয়ে অনেক পণ্ডিতের সন্দেহ আছে, (১) যাহা হউক এই প্রবন্ধলিখনে উক্ত কাণ্ড পরিত্যক্ত বলিয়া এই প্রস্তাবের পাঠকেরা জানিবেন।

---

(১) এতদ্বিষয় সবিস্তারে Griffith's Ramayan, Vol. I. Introduction p. XXIII to XXV দেখ। তথায় "There is every reason to believe that the seventh Book is a later addition." পুনশ্চ উত্তরকাণ্ডে বর্ণিত "Traditions and legends only distantly connected with the Ramayan properly so called." &c.—Gorresio. পুনশ্চ নূতন সংযোজন সম্বন্ধে "Whole chapters thus betray their origin by their barrenness of thought and laborious mimicry of the epic spirit, which in the case of the old parts spontaneously burst out of the heart's fulness like the free song of a child &c."—Westminister Review Vol. L.

আর্য্য-ভূমি এই সময়ে বহুতর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত। প্রত্যেক বিভাগে এক এক জন অধীশ্বর। ইনি আপন অধিকার মধ্যে যথাসম্ভব রাজকার্য্য অনন্যরাজশাসনবদ্ধ হইয়া সমাধা করিতেন। কিন্তু তাহা বলিয়া কেহ কাহার সঙ্গে সম্পর্কশূন্য ছিলেন না। ইহাদিগের একতাসূত্রে বন্ধন করিবার অনেক বিষয় থাকাতে কদাচ কেহ কাহার বিরোধী হইতেন না। আচার ব্যবহার ক্রিয়াকলাপ আর্য্যসন্তানগণের মধ্যে সর্ব্বত্রই একরূপ, এক ধর্ম্মাক্রান্ত, একই নিয়মাধীন এবং সেই নিয়মকর্ত্তা ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বত্রই সমানভাবে পূজনীয়; তাঁহারাই একালে একতাবন্ধনের দৃঢ়রজ্জু স্বরূপ। দ্বিতীয়তঃ বহুদূরব্যাপী বৈবাহিক সম্বন্ধও বিবাদের পথে সাধারণ বাধা ছিল না। ফলতঃ বহিঃপ্রকৃতি কোথাও কিছু পৃথক লক্ষিত হইলেও, অন্তঃপ্রকৃতি নির্ব্বিশেষে একরূপ ছিল। রামায়ণে যথায় যাগ যজ্ঞাদি মহোৎসবের ব্যাপার, তথায়ই ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশস্থ রাজগণকে একত্রে আমোদ আহ্লাদে নিমগ্ন থাকিতে দেখা যায়। দশরথের পুত্রকামনায় যে যজ্ঞ হয় তাহাতে আর্য্যাবর্ত্তের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সমস্ত রাজবর্গ একত্র সমবেত হইয়াছিলেন, তদ্রূপ অন্যান্য মহোৎসবেও। মহাভারতে রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় এবং অশ্বমেধ যজ্ঞে ও অন্যান্য উৎসবকালেও ঐরূপ সৌহার্দ্দের পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু আবার রাজাদিগের আপনাপনির মধ্যে বিবাদেরও অভাব নাই। রামায়ণে সেরূপ দৃষ্টান্ত অতি বিরল, কেবল ইহার দ্বারাই তৎকালে রাজাদিগের পরস্পরের সহসদ্ভাবে অবস্থান প্রমাণীকৃত হইতে পারে।

আর্য্যবংশের এই সময়ের রাজ্য সংস্থানের ব্যবস্থা অবলোকন করিলে, ইউরোপ খণ্ডের খ্রীষ্টীয় শতাব্দীর মধ্যম কালীয় ফিউডাল রাজ্য বিভাগের কথা মনে উদয় হয়। বস্তুতঃ পরস্পরের মধ্যে অল্প বৈলক্ষণ্য; তদ্ব্যতীত, ভারতীয় রাজ্যসংস্থান ফিউডাল নিয়মেই সংস্থাপিত ও পরিবর্দ্ধিত। এতদুভয়ের উৎপত্তি বিষয়ে বিশেষ বিভিন্নতা দৃষ্ট হইবে না। রোমক সাম্রাজ্যের অধঃপাতে বর্ব্বর জাতিরা যেমন যুদ্ধাধিকারান্তে, বিগ্রহলব্ধ বস্তুর বিভাগে বিশেষ বিশেষ ভূখণ্ড লাভ করিয়া, তাহাতে একেশ্বরত্ব বিস্তার করিয়াছিল, আবার সেই সকল ভূখণ্ড যেমন অধীনস্থ ভিন্ন ভিন্ন মণ্ডলকে নিয়ম বিশেষের বশবর্ত্তী করিয়া অংশ নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া হইত, সেইরূপ প্রাচীন কালে আর্য্যগণও আদিম অধিবাসীদিগকে পরাজয় করিয়া রাজ্যসংস্থাপন করেন, এবং অংশনির্দ্দেশের নিমিত্তই অধীনস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করদ রাজার নাম শুনিতে পাওয়া যায়। দশরথের এত ক্ষুদ্র রাজ্য, তথাপি তাঁহার সভায় বহুসংখ্যক অধীন রাজগণের (২।১) অবস্থান দেখিতে পাওয়া যায়। পুরোহিতের উন্নতি ও অধম বর্ণের দুর্দ্দশা উভয়েতেই সমান। ঋগ্বেদ (১-১৭৩-১০, ৮-৬২-১১ ইত্যাদি) হইতে আরম্ভ করিয়া মানব ধর্ম্মশাস্ত্র পর্য্যন্ত (রাজধর্ম্ম অধ্যায়ে)

গ্রামপতি, পুরপতি প্রভৃতির শাসন-কর্তৃত্ব পদের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের কার্য্য কি, তাহা ঋগ্বেদ দ্বারা স্পষ্ট কিছু জ্ঞাত হওয়া যায় না; কিন্তু মানব ধর্ম্মশাস্ত্রে প্রতিপন্ন হয় যে ইহারা সেই সেই গ্রাম ও পুরের শাসনকর্ত্তা এবং যাবতীয় রাজকার্য্যের সম্পাদক। যখন কোন নূতন নিয়মাবলী প্রবর্ত্তিত হয়, তাহা যে সম্পূর্ণ নূতন এমন নহে, এবং যাহা পুরাতন তাহা একেবারে পরিত্যক্ত হয় নাপ বরং তাহাই ভিত্তিস্বরূপ রাখিয়া উন্নতিসাধন করা হয় এবং কোন কোনটা যেমন নূতন হয় আবার তেমনি কোন কোনটা পুরাতন অবিকল রাখিয়া দেওয়া হয়। নূতন যাহা হয়, তাহার মধ্যে এমনও অনেক হয় যে তাহা প্রণয়ন সময়ে কার্য্যে পরিণত না হইয়া পরে হইয়া থাকে। এতদ্দ্বারা ঋগ্বেদের সাময়িক আচার ব্যবহারের সহ মনুর, এবং রামায়ণ মনুর পূর্ব্বে বা পরে হউক, তাহার সহিত রামায়ণের সম্বন্ধ বহুলাংশে নিরূপিত হইতে পারে। একের বর্ণিত বিষয় অন্যের ভাব পরিস্ফুট করিতে অনেক সক্ষম। যাহা হউক, এই গ্রাম ও পুরপতি প্রভৃতিগণ ফিউডাল সাময়িক স্থান বিশেষের বর্গোমাষ্টারের ন্যায়। বাহ্যিক আকার সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত। আভ্যন্তরিক ব্যাপারে যথেচ্ছাচারের আধিক্য উভয়স্থানেই সমান; বিশেষ এই যে একস্থানের যথেচ্ছাচার প্রায় সকল সময়েই সুবুদ্ধিপ্রসূত, অপর স্থানে নিরক্ষরচিত্ত হইতে উদ্ভব। ফলপ্রসবিতার মধ্যে দেখা যায় যে, ফিউডাল প্রভুরা পরস্পরের মধ্যে যেমন বিবাদ বিসম্বাদে প্রায় প্রত্যহ নররক্তে স্নান করিতেন, আর্য্যেরা তৎপরিবর্ত্তে প্রেমসংমিলনে মনের সুখে কালযাপন করিতেন। ফিউডাল প্রজারা ভিন্ন ভিন্ন শাসনে থাকিয়াও, আচার, ব্যবহার, ভাষা, রীতি, নীতি দেশস্থ সমস্ত অধিবাসীর অভ্যন্তরে একরূপ থাকায় এবং বহিঃশত্রুর ও আভ্যন্তরিকশত্রুর উত্তেজনায় একতার মূল্যাবধারণ করিয়া, কালে তাহার ফলস্বরূপ সর্ব্ব সংমিলনে জগতের সুখবিকাশক সভ্যজাতির মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। আর আর্য্যেরা এক প্রকৃতি সত্বেও, তদভাবে দৈহিক সুখপরবশে ও একতার মর্ম্ম অনবগতে, জাতিবিদ্বেষিতা লাভ করিয়া স্বতন্ত্রতা দোষে এমনি নিস্তেজঃ হইয়া পড়িয়াছেন যে, এখন আপন অন্ন পরিপাকের ক্ষমতা পর্য্যন্ত নাই।

আভ্যন্তরিক রাজনীতি কিরূপ ছিল, তাহা বহুলভাবে নিম্নে উদ্ধৃত অংশ হইতে প্রতীত হইবে। ভরত রামের অনুসরণে নির্গত হইয়া চিত্রকূট পর্ব্বতে তাঁহার দেখা পাইলে, রাম রাজ্যের কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছেন। (২)

---

(২) এই রাজনীতিগুলি গ্রিফিথ সাহেব কৃত রামায়ণের ইংরেজি অনুবাদে নাই। তৎকৃত রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের ৯৯, ১০০, ১০১ সর্গ এবং হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক সংগৃহীত রামায়ণের ঐ কাণ্ডের ১০০ সর্গ মিলাইয়া দেখ। গ্রিফিথ সাহেব শ্লিগলকর্ত্তৃক সংগৃহীত রামায়ণ হইতে অনুবাদ করিয়াছেন, এই রামায়ণ উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের পাঠ দৃষ্ট। আমার

২।১০০ (৩) তুমি ত দেবতা, পিতৃ, পিতৃতুল্য গুরু, বৃদ্ধ, বৈদ্য, ব্রাহ্মণ ও ভৃত্যগণকে সবিশেষ সম্মান কর ? যিনি অমন্ত্র ও সমন্ত্র শরপ্রয়োগ করিতে সমর্থ, সেই অর্থশাস্ত্রবিদ্ উপাধ্যায় সুধন্বার ত অবমাননা কর না ? মহাবল, বিজ্ঞ, জিতেন্দ্রিয়, সৎকুলপ্রসূত ইঙ্গিতজ্ঞ ও আত্মসম লোকদিগকে ত মন্ত্রিত্বে নিযুক্ত করিয়াছ ? দেখ শাস্ত্রবিশারদ অমাত্যগণের প্রযত্নে মন্ত্র সুরক্ষিত হইলে নিশ্চয়ই জয়লাভ হয়। (৪) বৎস ! তুমি ত নিদ্রার বশীভূত নহ ? যথাকালে ত জাগরিত হইয়া থাক ? রাত্রিশেষে অর্থাগমের উপায় ত অবধারণ কর ? তুমি একাকী বা বহুলোকের সহিত ত মন্ত্রণা কর না ? যে বিষয় নির্ণীত হয় তাহা ত গোপনে থাকে ? (৫) যাহা অল্পায়াসসাধ্য এবং বহুফলপ্রদ এইরূপ কোন কার্য্য

আদর্শমূল পণ্ডিত হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক সংগৃহীত রামায়ণের প্রথম তিন কাণ্ড, অপর তিন কাণ্ড হস্তলিপি। আমার আদর্শ পুস্তকে যাহা যাহা আছে আমি মূল প্রস্তাবে তাহাই গ্রহণ করিতেছি ইহা জ্ঞাতব্য।

(৩) এই অংশের অনুবাদ হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের রামায়ণের অনুবাদ হইতে গৃহীত হইল। উক্ত ভট্টাচার্য্য এই অংশের ব্যাখ্যার্থে রামানুজ হইতে যে কিছু টীকার অনুবাদ দিয়াছেন, তাহা টীকার স্থানে "—হে" চিহ্ন চিহ্নিত করিয়া অবিকল রাখা হইল, তদ্ব্যতীত যত টীকা সে সকল আমার দ্বারা সংগৃহীত।

(৪) "কচ্চিদাত্মসমা বৃদ্ধাঃ শুদ্ধাঃ সম্বোধনক্ষমাঃ ।২৫।
কুলীনাশ্চানুরক্তাশ্চ কৃতাস্তে বীর মন্ত্রিণঃ।
বিজয়ো মন্ত্রমূলো হি রাজ্ঞো ভবতি ভারত ।২৬।
কচ্চিৎ সংবৃতমন্ত্রৈস্তে অমাত্যৈঃ শাস্ত্রকোবিদৈঃ।
রাষ্ট্রং সুরক্ষিতং তাত !———— ।২৭।
মহাভারত সভাপর্ব্ব ।৫।

কচ্চিদাত্মসমাঃ শূরাঃ শ্রুতবন্তো জিতেন্দ্রিয়াঃ।
কুলীনাশ্চেঙ্গিতজ্ঞাশ্চ কৃতাস্তে তাত ! মন্ত্রিণঃ । ১৫।
মন্ত্রো বিজয়মূলো হি রাজ্ঞাং ভবতি রাঘব।
সুসংবৃতো মন্ত্রধুরৈরমাত্যৈঃ শাস্ত্রকোবিদৈঃ ।১৬।
অযোধ্যাকাণ্ড ।১০০।

ইহার মাধ্য চোর কে ?

(৫) কচ্চিন্নিদ্রাবশং নৈষি কচ্চিৎকালেঽপি বুধ্যসে।
কচ্চিচ্চাপররাত্রেষু চিন্তয়স্যর্থমর্থবিৎ ।২৮।
কচ্চিন্মন্ত্রয়সে নৈকঃ কচ্চিন্ন বহুভিঃ সহ।
কচ্চিত্তে মন্ত্রিতো মন্ত্রো ন রাষ্ট্রং পরিধাবতি ।২৯।
মহাভারত ২।৫

অবধারণ করিয়া, শীঘ্রই ত তাহার অনুষ্ঠান করিয়া থাক ? (৬) তোমার যে কার্য্য সমাহিত হইয়াছে এবং যাহা সম্পন্নপ্রায়, সামন্ত রাজগণ সেইগুলি ত জ্ঞাত হইয়া থাকেন ? যে সমস্ত বিষয় অবশিষ্ট আছে, উঁহারা ত তাহা জানিতে পারেন না ? তুমি ও তোমার মন্ত্রী, তোমরা যাহা গোপন করিয়া রাখ, তর্ক ও যুক্তি দ্বারা তাহা ত কেহ উদ্ভাবন করিতে পারে না ? (৭) সহস্র মূর্খকে উপেক্ষা করিয়া একটি মাত্র পণ্ডিতকে ত প্রার্থনা করিয়া থাক ? দেখ, অর্থসঙ্কট উপস্থিত হইলে, বিজ্ঞ-লোকেই সর্ব্বতোভাবে শুভসাধন করিয়া থাকেন। যদি নৃপতি সহস্র বা অযুত মূর্খে পরিবৃত হন, তাহা হইলে উঁহাদের দ্বারা তাঁহার কোন বিষয়েই বিশেষ সাহায্যলাভ হয় না। বলিতে কি, মেধাবী মহাবল সুদক্ষ বিচক্ষণ একজন অমাত্যই, রাজা বা রাজকুমারের যথোচিত শ্রীবৃদ্ধি করিতে পারেন। বৎস ! উন্নতশ্রেণীতে উন্নত, মধ্যমশ্রেণীতে মধ্যম, এবং অধমশ্রেণীতে অধম ভৃত্য ত নিযুক্ত করিয়াছ ? যে সকল অমাত্য কুলক্রমাগত ও সচ্চরিত্র এবং যাঁহারা উৎকোচগ্রহণ করেন না, তুমি তাঁহাদিগকে ত প্রধান প্রধান কার্য্যের ভার প্রদান কর ? প্রজারা অতি কঠোর দণ্ডে নিপীড়িত হইয়া ত তোমার অবমাননা করে না ?

কচ্চিন্নিদ্রাবশং নৈষি কচ্চিৎকালেঽববুধ্যসে ।
কচ্চিচ্চাপররাত্রেষু চিন্তয়স্যর্থ নৈপুনম্ । ১৭ ।
কচ্চিন্মন্ত্রয়সে নৈকঃ কচ্চিন্ন বহুভিঃ সহ ।
কচ্চিত্তে মন্ত্রিতো মন্ত্রো রাষ্ট্রং ন পরিধাবতি । ১৮

অযোধ্যাকাণ্ড । ১০০ ।

চোর কে ?

(৬) কচ্চিদর্থান্‌বিনিশ্চিত্য লঘুমূলান্ মহোদয়ান্ ।
ক্ষিপ্রমারভসে কর্ত্তুং ন বিঘ্নয়সি তাদৃশান্ ।৩০ ।

মহাভারত ।২৫ ।

কচ্চিদর্থং বিনিশ্চিত্য লঘুমূলং মহোদয়ম্ ।
ক্ষিপ্রমারভসে কর্ত্তুং ন দীর্ঘয়সি রাঘব ।১৯ ।

অযোধ্যাকাণ্ড ।১০০ ।

চোর কে ?

বিরক্ত হইয়া আর সাদৃশ্য উঠাইয়া দেখাইলাম না। ফলতঃ সভাপর্ব্বোক্ত ও রামায়ণোক্ত রাজনীতি কিছু কিছু বাদ দিয়া একটি অপরের নকল বলিয়া লওয়া যায়।

(৭) "কচ্চিন্ন কৃতকৈর্দূতৈর্যে চাপ্য পরিশঙ্কিতাঃ ।
ত্বত্তো বা তব চামাত্যৈর্ভিদ্যতে মন্ত্রিতং তথা ।২৩ ।

সভাপর্ব্ব ।৫ ।

অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্টচেতাঃ রাজা ও হীন সমাজের প্রতি এ উপদেশ বর্ত্তে ।

যেমন মহিলারা বলপ্রয়োগপর কামুককে ঘৃণা করে, তদ্রূপ যাজকেরা তোমায় পতিত জানিয়া ত অগৌরব করিতেছেন না? সামাদি প্রয়োগকুশল রাজনীতিজ্ঞ, (৮) অবিশ্বাসী ভৃত্য ও ঐশ্বর্য্যপ্রার্থী বীর, ইহাদিগকে যে না বিনাশ করে, সে স্বয়ংই বিনষ্ট হয়, তুমি ত এই সিদ্ধান্তের অনুসরণ করিয়া থাক? যিনি মহাবীর ধীর ধীমান্ সৎকুলোদ্ভব সুদক্ষ ও অনুরক্ত তুমি এইরূপ লোককে ত সেনাপতি করিয়াছ? যাঁহারা মহাবলপরাক্রান্ত, শ্রেণীপ্রধান ও যুদ্ধবিশারদ এবং যাঁহারা লোকসমক্ষে আপনার পৌরুষের পরীক্ষা দিয়াছেন, তুমি তাঁহাদিগকে ত সমাদর কর? তুমি ত যথাকালে সৈন্যগণকে অন্ন ও বেতন (৯) প্রদান করিয়া থাক? তদ্বিষয়ে ত বিলম্ব কর না? অন্ন ও বেতনের কালাতিক্রম ঘটিলে ভৃত্যেরা স্বামীর প্রতি রুষ্ট ও অসন্তুষ্ট হইয়া থাকে, এবং এই কারণেই তাঁহার নানা অনর্থ উপস্থিত হয়। বৎস! প্রধান প্রধান জ্ঞাতিরা তোমার প্রতি ত বিশেষ অনুরক্ত আছেন? এবং তাঁহারা তোমার নিমিত্ত প্রাণপরিত্যাগেও ত প্রস্তুত? যাহারা জনপদবাসী বিদ্বান্ অনুকূল প্রত্যুৎপন্নমতি ও যথোক্তবাদী, এইরূপ লোকদিগকে ত দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছ? তুমি অন্যের অষ্টাদশ* ও স্বপক্ষে পঞ্চদশ,† প্রত্যেক তীর্থে তিন তিন গুপ্তচর প্রেরণ করিয়া ত সমুদয় জানিতেছ? যে শত্রু দূরীকৃত হইয়া পুনর্ব্বার আগমন করিয়াছে, দুর্ব্বল হইলেও তাহাকে ত উপেক্ষা কর না? নাস্তিক ব্রাহ্মণদিগের সহিত তোমার ত বিশেষ সংস্রব নাই? * * * * কৃষক ও পশুপালকেরা ত তোমার প্রিয়পাত্র হইয়াছে? এবং স্ব স্ব কার্য্যে রত থাকিয়া সুখস্বচ্ছন্দে ত কালযাপন

---

(৮) "উপায়কুশলং বৈদ্যং"—মূল রামায়ণে, তদ্ব্যাখ্যায় উপায়কুশলং সাধ্যাপ্ত্যুপায়চতুরং বৈদ্যং বিদ্যাবিদং রাজনীতিশাস্ত্রজ্ঞং"।—রামানুজ। ইহা অতি মূর্খের রাজনীতি এবং অদূরদর্শিতার পরিচয়, এবং সমাজের সতত অশান্ত ও শঙ্কিত ভাবজ্ঞাপক। এইরূপ (যেমন সংবাদপত্রে দৃষ্ট) পারস্যের সাহ একদা সাদর্লণ্ডের ডিউকের বৈভব দেখিয়া, তাঁহাকে নির্ব্বিঘ্নে রাজ্যে বাস করিতে দেওয়া হইয়াছে, এজন্য বৃটনীয় যুবরাজের নিকট আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

(৯) ইহা অতি বিচক্ষণ নীতি। ইউরোপখণ্ডে অল্পকাল হইল ইহার প্রচলন আরম্ভ হইয়াছে। মুসলমানদের মধ্যে মোগল বংশ এই নীতি প্রথম প্রবর্ত্তিত করেন।

* ১। মন্ত্রী, ২। পুরোহিত, ৩। যুবরাজ, ৪। সেনাপতি, ৫। দৌবারিক, ৬। অন্তঃপুরাধিকারী, ৭। বন্ধনাগারাধিকারী, ৮। ধনাধ্যক্ষ, ৯। রাজাজ্ঞানিবেদক, ১০। প্রাড্‌বিবাক নামক ব্যবহার জিজ্ঞাসক (জজ পণ্ডিত), ১১। ধর্ম্মাসনাধিকারী, ১২। ব্যবহার নির্ণায়ক সভ্য (জুরি), ১৩। বেতন দানাধ্যক্ষ, ১৪। কর্ম্মান্তে বেতনগ্রাহী, ১৫। নগরাধ্যক্ষ, ১৬। আটবিক, ১৭। দণ্ডাধিকারী, ১৮। দুর্গপাল।—হে।

† পূর্ব্বোক্ত অষ্টাদশ তীর্থের মন্ত্রী পুরোহিত ও যুবরাজ এই তিনটি বাদ দিয়া পঞ্চদশ।—হে।

করিতেছে ? ইষ্ট সাধন ও অনিষ্ট নিবারণপূর্ব্বক তুমি ত উহাদিগকে প্রতিপালন করিয়া থাক ? (১০) অধিকারে যত লোক আছে ধর্ম্মানুসারে সকলকে রক্ষা করাই তোমার কর্ত্তব্য। বৎস ! স্ত্রীলোকেরা ত তোমার যত্নে সাবধানে আছে ? উহাদিগকে ত সমাদর করিয়া থাক ? বিশ্বাস করিয়া উহাদিগের নিকট কোন গুপ্ত কথা ত প্রকাশ কর না ? (১১) তোমার পশুসংগ্রহে আগ্রহ কিরূপ ? রাজ্যের অনেক বন হস্তীর আকর, তৎসমুদয়ের ত তত্ত্বাবধান করিয়া থাক ? (১২) রাজবেশে সভামধ্যে ত প্রবেশ কর ? প্রতিদিন পূর্ব্বাহ্নে গাত্রোত্থান করিয়া, রাজপথে ত পরিভ্রমণ করিয়া থাক ? ভৃত্যেরা কি নির্ভয়ে তোমার নিকট আইসে,—না এককালেই অন্তরালে রহিয়াছে ? দেখ, অতি দর্শন ও অদর্শন এই উভয়ের মধ্যরীতিই অর্থ প্রাপ্তির কারণ। বৎস ! দুর্গসকল ধন-ধান্য, জলযন্ত্র, অস্ত্র-শস্ত্র এবং শিল্পী ও বীরে ত পরিপূর্ণ আছে ? তোমার আয় ত অধিক, ব্যয় ত অল্প ? অপাত্রে ত অর্থ বিতরণ কর না ? দৈবকার্য্য, পিতৃকার্য্য, অভ্যাগত ব্রাহ্মণের পরিচর্য্যা, যোদ্ধা ও মিত্রবর্গে ত তুমি মুক্তহস্ত আছ ? কোন শুদ্ধস্বভাব সাধুলোকের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত হইলে, ধর্ম্মশাস্ত্রবিৎ বিচারকের নিকট দোষ সপ্রমাণ না করিয়া, তুমি ত অর্থলোভে তাঁহাকে দণ্ডপ্রদান কর না ? (১৩) যে তস্কর ধৃত, লোপ্ত্রের সহিত পরিগৃহীত এবং বহুবিধ প্রশ্নে স্পৃষ্ট হইয়াছে, ধনলোভে তাহাকে ত মোচন করা হয় না ? ধনী বা দরিদ্র যাহারই হউক না, বিবাদরূপ সঙ্কটে তোমার অমাত্যেরা ত অপক্ষপাতে ব্যবহার পর্য্যালোচনা করিয়া থাকেন ? দেখ, যাহাদের উপর মিথ্যাভিযোগের সম্যক্ বিচার না হয়, সেই সকল নিরীহ লোকের নেত্র হইতে যে অশ্রুবিন্দু নিপতিত হইয়া থাকে, তাহা ঐ ভোগাভিলাষী রাজার পুত্র ও পশুসকল বিনষ্ট করিয়া ফেলে। বৎস ! তুমি বালক, বৃদ্ধ, বৈদ্য ও প্রধান প্রধান লোক-

---

(১০) অধম জাতির পক্ষে সামাজিক শাসন কঠোর থাকিলেও, রাজদ্বারে তাহাদের কিরূপ অবস্থা, তাহা এই বাক্যে উপলব্ধি হয়। ইউরোপের সভ্যতার পথপ্রদর্শক রোমক জাতির প্রাচীন অবস্থায়ও এরূপ লোকদিগের পক্ষে যেরূপ কঠোর নিয়ম ছিল, তাহার সহিত এখানে তুলনা করিয়া দেখা উচিত। Cod. Justice. T. XI. tit. 47 & 49 দ্রষ্টব্য।

(১১) তৎকালে স্ত্রীজাতির মানসিক উন্নতি কতদূর এবং মনুষ্যবর্গের তৎপ্রতি কতদূর আস্থা, এই বাক্য তাহার পরিচায়ক। ঐ ঋগ্বেদে "ইন্দ্রশ্চিদ্ ঘ তদ্ অব্রবীৎ স্ত্রিয়াঃ অশাস্যম্ মনঃ। উতো অহ ক্রতুং রঘুম্।"—৮—৩৩—১৭।

(১২) বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের খেদা ডিপার্টমেণ্টের ন্যায়।

(১৩) এই সুনিয়ম বৃটনদ্বীপ একজন রাজার মস্তক ছেদন, অপরকে দূরীকরণ ব্যতীত সুদৃঢ় করিতে পারেন নাই। ইউরোপ ভূভাগ অতি অল্পকাল হইল, ইহার মধুর মর্ম্ম অবগত হইয়াছে। দুর্ভাগ্য আসিয়ার অনেক স্থানে এখনও নহে।

দিগকে ত বাক্য ব্যবহারে ও অর্থে বশীভূত করিয়াছ ? গুরু, বৃদ্ধ, তপস্বী, দেবতা, অতিথি, চৈত্য ও সিদ্ধব্রাহ্মণকে ত নমস্কার কর ? অর্থ দ্বারা ধর্ম্ম, ধর্ম্ম দ্বারা অর্থ এবং কাম দ্বারা ঐ উভয়কে ত নিপীড়িত কর না ? তুমি ত যথাকালে ধর্ম্ম অর্থ কাম সমভাবে সেবা করিয়া থাক ? (১৪) বিদ্বান্ ব্রাহ্মণেরা পৌর ও জনপদবাসীদিগের সহিত তোমার ত শুভাকাঙ্ক্ষা করেন ? নাস্তিকতা, মিথ্যাবাদ, অনবধানতা, ক্রোধ, দীর্ঘসূত্রতা, অসাধুসঙ্গ, আলস্য, ইন্দ্রিয়সেবা, একব্যক্তির সহিত রাজ্য চিন্তা ও অনর্থদর্শীদিগের সহিত পরামর্শ, নির্ণীত বিষয়ের অননুষ্ঠান, মন্ত্রণা প্রকাশ, প্রাতে কার্য্যের অনারম্ভ এবং সমুদয় শত্রুর উদ্দেশে এককালে যুদ্ধ যাত্রা, তুমি ত এই চতুর্দ্দশ রাজদোষ পরিহার করিয়াছ ? দশবর্গ* (১৫) পঞ্চবর্গ † (১৬) চতুর্ব্বর্গ‡ সপ্তবর্গ ¶ অষ্টবর্গ § (১৭) ও ত্রিবর্গের (১৮) ফলাফল ত করিয়াছ ? ত্রয়ী (১৯) বার্ত্তা (২০) ও দণ্ডনীতি এই তিন বিদ্যা ত তোমার অভ্যস্ত আছে ? ইন্দ্রিয়-

---

(১৪) "পূর্ব্বাহ্ণে চাচরেদ্ধর্ম্মং মধ্যাহ্নেঽর্থমুপার্জ্জয়েৎ।
সায়াহ্নে চাচরেৎ কামমিত্যেষা বৈদিকী শ্রুতিঃ॥—দক্ষোক্ত কালব্যবস্থা।

* মৃগয়া, দ্যূতক্রীড়া, দিবানিদ্রা, পরিবাদ, স্ত্রীপারবশ্য, মদ্য, নৃত্য, গীত, বাদ্য ও বৃথা পর্য্যটন।—হে।

(১৫) উক্ত বিষয়ে
"মৃগয়াক্ষো দিবাস্বাপঃ পরিবাদঃ স্ত্রিয়োমদঃ।
তৌর্য্যত্রিকং বৃথাট্যাচ কামজো দশকো গণ॥" মনু। ৭ অ।

† জলদুর্গ, গিরিদুর্গ, বেণুদুর্গ, ইরিণ দুর্গ (সর্ব্ব শস্য পূর্ণ প্রদেশ) ধান্বন দুর্গ (গ্রীষ্মকালে অগম্য)।

(১৬) উক্ত বিষয়ে
"পঞ্চবর্গস্তু চৌদকং পার্ব্বতং বার্ক্ষমৈরিণং ধান্বনং তথা। ইতি দুর্গং পঞ্চবিধং পঞ্চবর্গ উদাহৃতঃ। ইরিণং সর্ব্বশস্য শূন্য প্রদেশঃ তৎসম্বন্ধি দুর্গমৈরিণং তদ্যাপি পরৈর্গন্তুমশক্যত্বাৎ। ধান্বনম উষ্ণকালে দুর্গং ভবতি।—রামানুজ।

‡ সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড।—হে।

¶ স্বামী, অমাত্য, রাষ্ট্র, দুর্গ, কোষ, বল ও সুহৃদ্।—হে।

§ কৃষি, বাণিজ্য, দুর্গ, সেতু, কুঞ্জরবন্ধন, খনি, আকর, করাদান ও শূন্য নিবেশন।
হে।—

(১৭) অথবা
"পৈশুন্যং সাহসং দ্রোহমীর্ষ্যাসূয়ার্থদূষণম্।
বাগ্দণ্ডয়োশ্চ পারুষ্যং ক্রোধজোঽপি গণোষ্টক॥—রামানুজ।

(১৮) ধর্ম্ম, অর্থ, কাম।

(১৯) বেদত্রয়ী।

(২০) বার্ত্তা কৃষ্যাদি।

জয়, ষাড়্গুণ্য * (২১) দৈব ও মানুষ ব্যসন, (২২) রাজকৃত্য,† বিংশতিবর্গ,‡ প্রকৃতিবর্গ,¶ মণ্ডল,§ (২৩) যাত্রা, (২৪) দণ্ডবিধান, দ্বিযোনী* সন্ধি ও বিগ্রহ

---

* সন্ধি-বিগ্রহ প্রভৃতি ছয় গুণ।—হে।

(২১) "সন্ধির্বিগ্রহো যানমাসনং দ্বৈধমাশ্রয়।"—রামানুজ

অথবা

"ষড়্ গুণাঃ বক্তা প্রগল্ভো মেধাবী স্মৃতিমান্নয়বিৎ কবিঃ।"—নীলকণ্ঠ।

(২২) "হুতাশনো জলং ব্যাধি দুর্ভিক্ষোমরকস্তথেত্যেতদ্দৈবম্। মানুষন্ত আয়ুক্তকেভ্যশ্চৌরেভ্যঃ পরেভ্যো রাজবল্লভাৎ। পৃথিবীপতি লোভাচ্চ ব্যসনং মানুষবিধমিতি।" —রামানুজ

† অলব্ধবেতন লুব্ধকে, অপমানিত মানীকে, অকারণকোপাবিষ্ট ক্রুদ্ধকে প্রদর্শিতভয় ভীতকে, শত্রু হইতে ভেদ করাই রাজকৃত্য।—হে।

‡ বালক, বৃদ্ধ, দীর্ঘরোগী, জ্ঞাতি বহিষ্কৃত, ভীরু, ভয়জনক, লুব্ধ, লুব্ধজন, বিরক্ত প্রকৃতি, বিষয়ে অত্যাসক্ত, বহুমন্ত্রী, দেবব্রাহ্মণনিন্দক, দৈবোপহত, দৈবচিন্তক, দুর্ভিক্ষব্যসনি, বলব্যসনি, অদেশস্থ, বহুশত্রু, মৃতপ্রায় ও অসত্য ধর্ম্মরত, ইহাদিগের সহিত সন্ধি করিবে না।—হে।

¶ অমাত্য, রাষ্ট্র, দুর্গ, ও দণ্ড।—হে।

§ দ্বাদশরাজমণ্ডল।—হে।

(২৩) উক্ত উভয়বিধ বিষয়ে

"অমাত্য রাষ্ট্র দুর্গাণি কোশোদণ্ডশ্চ পঞ্চমঃ।
এতা প্রকৃতয়স্তজ্জ্ঞৈ বিজিগীষোরুদাহৃতাঃ।
সম্পন্ন প্রকৃতিভির্মহোৎসাহঃ কৃত শ্রমঃ।
জেতু মেষণশীলশ্চ বিজিগীষুরিতি স্মৃতঃ।
অরিমিত্রমরেমিত্রং মিত্রমিত্রমতঃ পরঃ।
অথারিমিত্রমিত্রঞ্চ বিজিগীষোঃ পুরস্কৃতাঃ।
পার্ষ্ণিগ্রাহস্ততঃ পশ্চাদাক্রন্দস্তদনন্তরং।
আসারা বনয়শ্চৈব বিজিগীষোস্তু পৃষ্ঠতঃ।
অরেশ্চ বিজিগীষোশ্চ মধ্যমো ভূম্যনন্তরঃ।
অনুগ্রাহ সংহতয়োর্ব্যস্তয়োর্নিগ্রহে প্রভুঃ।
মণ্ডলাদ্বহিরেতেষামুদাসীনো বলাধিকঃ।
অনুগ্রহে সংহতানাং ব্যস্তানাঞ্চবধে প্রভুঃ।
ইতি কামন্দকীয়ে উক্ত নীলকণ্ঠোদ্ধৃত।

(২৪) যাত্রা যানং তচ্চ পঞ্চবিধম্।

"বিগ্রহ সন্ধায় তথা সম্ভূয়াথ প্রসঙ্গতঃ।
উপেক্ষ চেতি নিপুণৈর্যানং পঞ্চবিধং স্মৃতম্।"—রামানুজ।

*সন্ধি ও বিগ্রহাদির মধ্যে দ্বৈধিভাব ও আশ্রয় সন্ধিযোনিক এবং যান ও আসন বিগ্রহযোনিক। হে।

এ সমুদায়ের প্রতি তোমার ত দৃষ্টি আছে? বেদোক্ত কর্ম্মের ত অনুষ্ঠান করিতেছ? ক্রিয়া কলাপের ফল ত উপলব্ধ হইতেছে? ভার্য্যা সকল ত বন্ধ্যা নহে? শাস্ত্রজ্ঞান ত নিষ্ফল হয় নাই? আমি যেরূপ কহিলাম, তুমি ত এই প্রকার বুদ্ধির অনুসারে চলিতেছ? ইহা আয়ুষ্কর, যশস্কর এবং ধর্ম্ম অর্থ ও কামের পরিবর্দ্ধক।"

প্রচলিত হউক অথবা প্রচলিত বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাউক, সমাজের মধ্যে রাজনীতির গতি এই পর্য্যন্ত। আবার রাজ্য অরাজক হইলে কিরূপ দুরবস্থা হইত তাহা দেখা যাউক। রাজা দশরথের মৃত্যুতে রাজ্য অরাজক হওয়ায় অমাত্যবর্গ রাজ্যের অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া বশিষ্ঠের নিকট বলিতেছেন।

২। ৬৭২৫ (২৫)—"অরাজক রাজ্যে সভাস্থাপনে এবং সুরম্য উদ্যান ও পুণ্য গৃহনির্ম্মাণে কাহারই প্রবৃত্তি জন্মে না; যজ্ঞশীল জিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞানুষ্ঠানে বিরত হন; ধনবান্ যাজ্ঞিক ঋত্বিকদিগকে অর্থদান করেন না; উৎসব বিলুপ্ত ও নট নর্ত্তক নিশ্চিন্ত এবং দেশের উন্নতিসাধক সমাজের শ্রীবৃদ্ধিও রহিত হইয়া যায়। অরাজক রাজ্যে ব্যবহারার্থীরা অর্থসিদ্ধি বিষয়ে সম্পূর্ণই হতাশ হন; পৌরাণিকেরা শ্রোতার অভাবে পুরাণ কীর্ত্তনে বীতরাগ হইয়া থাকেন; কুমারী সকল সায়াহ্নে মিলিত ও স্বর্ণালঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া, উদ্যানে ক্রীড়া করিতে যায় না; গোপালক কৃষকেরা কবাট উদ্ঘাটনপূর্ব্বক শয়ন করে না; এবং বিলাসীরাও কামিনীগণের সহিত বেগবান্ বাহনে আরোহণপূর্ব্বক বনবিহারে নির্গত হয় না। অরাজক রাজ্যে দূরগামী বণিকেরা বিপুল পণ্যদ্রব্য লইয়া দূরপথে যাইতে ভীত ও সঙ্কুচিত হয়; অস্ত্রশিক্ষায় নিযুক্ত বীরপুরুষদিগের তলশব্দ আর কেহ শুনিতে পায় না; অলব্ধ-লাভ ও লব্ধরক্ষা দুষ্কর হইয়া উঠে; রণস্থলে শত্রুর বিক্রম সৈন্যগণের একান্ত দুঃসহ হয়; বিশালদশন ষষ্ঠ বৎসরের মাতঙ্গ সকল কণ্ঠে ঘণ্টাবন্ধনপূর্ব্বক রাজপথে ভ্রমণ করে না; কেহ উৎকৃষ্ট অশ্বে বা সুসজ্জিত রথে আরোহণ পূর্ব্বক সহসা বহির্গত হইতে সাহসী হয় না; শাস্ত্রজ্ঞ সুধীগণ বন বা উপবনে গিয়া শাস্ত্র বিচার করিতে বিরত হন; এবং ধর্ম্মশীল লোকেরাও দেবপূজার উদ্দেশে দক্ষিণা, স্নান ও মাল্যমোদক প্রস্তুত করিতে সংশয়ারূঢ় হইয়া থাকেন। অরাজক রাজ্যে রাজকুমারেরা চন্দন ও অগুরুরাগে রঞ্জিত হইয়া বসন্ত কালীন বৃক্ষের ন্যায় পরিদৃশ্যমান হন না; যাঁহারা একাকী পর্য্যটন করেন এবং যথায় সায়ংকাল প্রাপ্ত হন সেই স্থানে বিশ্রাম করিয়া থাকেন, সেই সমস্ত জিতেন্দ্রিয় মুনিও ব্রহ্মে চিত্ত সমাধানপূর্ব্বক ভ্রমণ করিতে পারেন না; অধিক আর কি, যেমন জলশূন্য নদী, তৃণশূন্য বন এবং পালকহীন গো, অরাজক রাজ্যও তদ্রূপ; এই অবস্থায় জীবন রক্ষা করা নিতান্তই দুষ্কর হয়, এবং এই অবস্থায় মনুষ্যেরা মৎস্যের ন্যায় প্রতিনিয়ত পরস্পর পরস্পরকে

---

(২৫) পণ্ডিত হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কৃত অনুবাদ।

ভক্ষণ করিয়া থাকে। যে সমস্ত নাস্তিক ধর্ম্মমর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল, তাহারাও এই সময়ে প্রভুত্ব প্রদর্শন করে। চক্ষু যেমন শরীরের হিতসাধন ও অহিত নিবারণে নিযুক্ত আছে প্রজাদিগের পক্ষে রাজাও তদ্রূপ।”

ভরতের প্রতি রামের প্রশ্নচ্ছলে যে রাজনীতি বর্ণিত হইয়াছে, তাহার দ্বারা তৎসাময়িক রাজধর্ম্ম কতদূর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সম্পন্ন ও বহ্বাড়ম্বর বিশিষ্ট, ইহা প্রতিপন্ন হইবে। ঐ নীতি সমূহের কোন্ কোন্ অংশ পরিত্যাগ করিলে, উহা সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশে নৃপতিগণের কণ্ঠভূষণ হইবার যোগ্য। এতদূর উৎকর্ষ সত্ত্বেও আলোচকের ক্ষোভ নিবারণ হয় না, আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হয় না; কেন? প্রজাদিগের অন্তরের গুহ্যতম প্রদেশে ইহার মূল রোপিত হয় নাই। পূর্ব্বোক্ত রাজনিয়ম সমুদয় যতই কেন উৎকৃষ্ট বলিয়া বোধ হউক না, পরক্ষণে বর্ণিত অরাজকতার স্বভাবে এবং ভিন্ন ভিন্ন স্থান পর্য্যালোচনে অনুমিত হইতেছে যে, যিনি যখন রাজা থাকিতেন, উক্ত নিয়মগুলির অনুষ্ঠানবিষয়ে তাঁহারই প্রকৃতির উপর অনেক নির্ভর করিত। একের উপর নির্ভর করে বলিয়াই অরাজকতায় এত দুর্দ্দশার সম্ভব; রাজা এবং প্রজা এ উভয়ের উপর সমানরূপে নির্ভর করিলে উহার অর্দ্ধেকও হইতে পারে না; অথবা প্রজার উপর যদি অধিক নির্ভর থাকে, তবে রাজা মরিলেন কি বাঁচিলেন তাহা লোকে জানিতেও পারে না, অথবা জানিতে চায়ও না। ফলতঃ সেইকালে রাজকার্য্যে সাধারণ প্রজাবর্গের হস্ত কতদূর ছিল, তাহা নিরূপণার্থে বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় না।

রাজা যদি ঐ সকল সুনিয়মের অনুষ্ঠান করিতেন, তবে ইহা জ্ঞাতব্য নহে যে তিনি প্রকৃতিবর্গের নিকট বাধ্যতা বশতঃ ওরূপ করিতেন। প্রকৃতিবর্গও কেমন করিয়া তাহার অনুষ্ঠান জন্য রাজাকে বাধ্য করিতে হয় তাহা জানিতেন না। রাজা যদি সৎ হইতেন তবে তিনি দেবপ্রেরিত অথবা দেবাবতার বলিয়া পূজ্য। অসৎ হইলে-লোকে অদৃষ্টের দোষ দিয়া ক্ষান্ত থাকিত। আরও অসৎ হইলে, নৈরাশ্যসম্ভূত ক্ষণিক উন্মত্ততা এবং ক্রোধবশবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিত,-এই পর্য্যন্ত হইয়াই ক্ষান্ত।- চকিতের ন্যায় পরক্ষণেই পূর্ব্বকথা সমস্ত বিস্মৃত হইয়া, আবার পূর্ব্বমত ধীরভাব ধারণ করিয়া অদৃষ্ট-সাগরে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক-নিরস্ত থাকিত। সুতরাং তাহাদের যে কোন উদ্বেগ, স্থায়ীরূপে কার্য্যকরী হইতে পারে নাই, তখন পূর্ব্বোক্ত নিয়মাবলী যে নিরবচ্ছিন্নভাবে ও সম্যক্ প্রকারে আচরিত হইত না তাহা অনুমান-সিদ্ধ।

একাধিপত্যসম্পন্ন রাজার দৌরাত্ম্য অপরিসীম। এরূপ রাজা আশানুরূপ সৎ হইলেও দৌরাত্ম্য আশানুরূপ নিবারিত হয় না। যেহেতু সে সময়ে যাহা কিছু হইয়া থাকে সকলই একটি মাত্র চিত্তপ্রসূত। মনুষ্য-চিত্ত ভ্রান্তিসঙ্কুল, ভিন্ন ভিন্ন

চিত্ত ভিন্ন ভিন্ন রূপ, গুণ এবং হীনতার আধার। বহু চিত্তের একত্র সমাবেশে, ভিন্ন ভিন্ন গুণের সংযোজনে ভারাধিক্য হওয়ায়, হীনতা ও ভ্রান্তি হ্রস্বতেজা হইয়া থাকে। সুতরাং এক চিত্তের কার্য্যে যতদূর ভ্রান্তি প্রবেশ করে, বহু চিত্ত-সংযোগে তাহা হইতে পায় না। একাধিপত্য রাজ্যে এক চিত্তের কার্য্য, হয় রাজার, নতুবা অমাত্য-প্রধানের—ফল-প্রসবিতায় উভয়ই এক। এরূপ রাজ্যে সৎ রাজা সদভিপ্রায়যুক্ত হইলেও ভ্রান্তিবশতঃ কার্য্যে পরিণত করার দোষে এবং তদ্রূপ অপরাপর কারণে অনেক অসৎকার্য্য করিয়া থাকেন।

যাহা হউক সমাজ পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত না হইলে, প্রজাগণ চক্ষু কর্ণ বিশিষ্ট হইয়া শাসন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে সমর্থ হয় না। এই সময়ে একাধিপত্যযুক্ত রাজার প্রয়োজন। আভ্যন্তরিক অত্যাচার থাকিলেও তিনি প্রজাগণকে বহিঃশত্রু হইতে রক্ষা করিয়া থাকেন। অত্যাচারে উত্তেজিত হইলে উৎসাহের বৃদ্ধি হয়, প্রজাগণ এই সময়ে উৎসাহযুক্ত হইয়া পরস্পর সংমিলনে আত্মোন্নতি করিয়া গন্তব্য স্থানে অগ্রসর হইতে থাকে। কিন্তু ভারতে ইহার বিপরীত ভাব দাঁড়াইয়াছে। এখানে প্রজাদের মধ্যে আত্ম-বিরোধভাব, ইহার এক পক্ষ ব্রাহ্মণগণ, অপরপক্ষ সাধারণ জনবর্গ। সাধারণ জনবর্গের প্রতি দ্বিবিধ অত্যাচার, প্রথমতঃ রাজার, দ্বিতীয়তঃ ব্রাহ্মণের। এতদুভয় কারণে তাহাদিগের চক্ষু উন্মিলিত হইবার অবসর হয় নাই। ব্রাহ্মণেরাও তন্নিমিত্ত আপনাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করিতে তাহাদের যথোচিত সাহায্য না পাইয়া হীনবল হইয়াছিলেন। জ্ঞানবত্তায় যদিও তাঁহারা বাহ্যিকভাবে পূজ্য ছিলেন বটে, কিন্তু ক্ষত্রিয় রাজারা তাঁহাদিগকে যে কলে চালাইতেন প্রায় সেই কলে চলিতেন। আবার এরূপ সমাজের উপর যাঁহার আধিপত্য, তাঁহার পরিণাম কিরূপ দাঁড়ায় তাহা সহজে অনুমান করা যাইতে পারে। উহা কিরূপ অঙ্কুরিত, পুষ্পিত ও ফলবতী হইয়াছে, তাহা বর্ত্তমান সময়ের সহ-সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া পূর্ব্বাপর আলোচনা করিলে দৃষ্ট হইবে। যাহা হউক বাল্মীকির সময়ে এরূপ ভাবের বাল্যাবস্থা।

ইতি চতুর্থ প্রস্তাব।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

কমলাকান্তের দপ্তর

নবম সংখ্যা

বিবাহ

বৈশাখ মাস বিবাহের মাস। আমি ১লা বৈশাখে নসী বাবুর ফুলবাগানে বসিয়া একটি বিবাহ দেখিলাম। ভবিষ্যৎ-বরকন্যাদিগের শিক্ষার্থ লিখিয়া রাখিতেছি।

মল্লিকার বিবাহ। বৈকাল-শৈশব অবসান প্রায়, কলিকা-কন্যা বিবাহযোগ্যা হইয়া আসিল। কন্যার পিতা বড়লোক নহে, ক্ষুদ্র বৃক্ষ, তাহাতে আবার অনেকগুলি কন্যাভারগ্রস্ত। সম্বন্ধের অনেক কথা হইতেছিল, কিন্তু কোনটা স্থির হয় নাই। উদ্যানের রাজা স্থলপদ্ম নির্দ্দোষ পাত্র বটে, কিন্তু ঘর বড় উচু, স্থলপদ্ম অতদূর নামিল না। জবা এ বিবাহে অসম্মত ছিল না, কিন্তু জবা বড় রাগী, কন্যাকর্ত্তা পিছাইলেন। গন্ধরাজ পাত্র ভাল, কিন্তু বড় দেমাগ, প্রায় তাঁহার বার পাওয়া যায় না। এইরূপ অব্যবস্থার সময়ে ভ্রমররাজ ঘটক হইয়া মল্লিকাবৃক্ষসদনে উপস্থিত হইলেন। তিনি আসিয়া বলিলেন, "গুণ! গুণ! গুণ! মেয়ে আছে?"

মল্লিকাবৃক্ষ পাতা নাড়িয়া সায় দিলেন "আছে!" ভ্রমর পত্রাসন গ্রহণ করিয়া বলিলেন, "গুণ্ গুণ্ গুণ্ গুণ্ গুণাগুণ্ মেয়ে দেখিব।"

বৃক্ষ, শাখা নত করিয়া মুদিত-নয়না অবগুণ্ঠনবতী কন্যা দেখাইলেন।

ভ্রমর একবার বৃক্ষকে প্রদক্ষিণ করিয়া আসিয়া বলিলেন, "গুণ! গুণ! গুণ! গুণ দেখিতে চাই। ঘোমটা খোল।"

লজ্জাশীলা কন্যা কিছুতেই ঘোমটা খুলেনা। বৃক্ষ বলিলেন "আমার মেয়েগুলি বড় লাজুক। তুমি একটু অপেক্ষা কর, আমি মুখ দেখাইতেছি।"

ভ্রমর ভোঁ করিয়া স্থলপদ্মের বৈঠকখানায় গিয়া রাজপুত্রের সঙ্গে ইয়ারকি করিতে বসিলেন। এদিগে মল্লিকার সন্ধ্যাঠাকুরাণী দিদি আসিয়া তাহাকে কত বুঝাইতে লাগিল—বলিল "দিদি, একবার ঘোমটা খোল—নইলে, বর আসিবে না—লক্ষ্মী আমার, চাঁদ আমার, সোণা আমার" ইত্যাদি। কলিকা কতবার ঘাড়

নাড়িল, কতবার রাগ করিয়া মুখ ঘুরাইল, কতবার বলিল, "চাঁদদিদি, তুই যা!" কিন্তু শেষে সন্ধ্যার স্নিগ্ধ স্বভাবে মুগ্ধ হইয়া মুখ খুলিল ; তখন ঘটক মহাশয় ভোঁ করিয়া রাজবাড়ী হইতে নামিয়া আসিয়া ঘটকালীতে মন দিলেন। কন্যার পরিমলে মুগ্ধ হইয়া বলিলেন, "গুণগুণগুণ গুণ্ গুণাগুণ্! কন্যা গুণবতী বটে। ঘরে মধু কত?"

কন্যাকর্ত্তা বৃক্ষ বলিলেন, "ফর্দ্দ দিবেন, কড়ায় গণ্ডায় বুঝাইয়া দিব।" ভ্রমর বলিলেন "গুণ্ গুণ্, আপনার অনেক গুণ্—ঘটকালীটা?"

কন্যাকর্ত্তা শাখা নাড়িয়া সায় দিল—"তাও, হবে।"

ভ্রমর—"বলি ঘটকালীর কিছু আগাম দিলে হয় না? নগদ দান বড় গুণ—গুণ গুণ গুণ।"

ক্ষুদ্র বৃক্ষটি তখন বিরক্ত হইয়া, সকল শাখা নাড়িয়া বলিল, "আগে বরের কথা বল—বর কে?"

ভ্রমর—"বর অতি সুপাত্র।—তাঁর অনেক গুণ্-ন্-ন্"

"কে তিনি?"

"গোলাবলাল গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর অনেক গুণ।"

এ সকল কথোপকথন মনুষ্যে শুনিতে পায় না, আমি কেবল আফিম প্রসাদাৎ দিব্য কর্ণ পাইয়াই, এ সকল শুনিতেছিলাম। আমি শুনিতে লাগিলাম, কুলাচার্য্য মহাশয়, পাখা ঝাড়িয়া, ছয় পা ছড়াইয়া গোলাবের মহিমাকীর্ত্তন করিতেছিলেন। বলিতেছিলেন যে, গোলাব বংশ বড় কুলীন ; কেন না ইহারা "ফুলে" মেল। যদি বল, সকল ফুলই ফুলে, তথাপি গোলাবের গৌরব অধিক, কেন না ইহারা সাক্ষাৎ বাগ্বা-মালীর সন্তান ; তাঁহার স্বহস্তরোপিত। যদি বল এ কুলে কাঁটা আছে, কোন্ কুলে বা কোন্ ফুলে নাই?

যাহা হউক ঘটকরাজ কোনরূপে সম্বন্ধ স্থির করিয়া ভোঁ করিয়া উড়িয়া গিয়া, গোলাব বাবুর বাড়ীতে খবর দিলেন। গোলাব, তখন বাতাসের সঙ্গে নাচিয়া নাচিয়া, হাসিয়া হাসিয়া, লাফাইয়া লাফাইয়া খেলা করিতেছিল, বিবাহের নাম শুনিয়া আহ্লাদিত হইয়া কন্যার বয়স জিজ্ঞাসা করিল ; ভ্রমর বলিল, "আজি কাল ফুটিবে।"

গোধূলি লগ্ন উপস্থিত, গোলাব বিবাহে যাত্রার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। উচ্চিংড়া নহবৎ বাজাইতে আরম্ভ করিল ; মৌমাছি সানাইয়ের বায়না লইয়াছিল, কিন্তু রাতকাণা বলিয়া সঙ্গে যাইতে পারিল না। খদ্যোতেরা ঝাড় ধরিল ; আকাশে তারা-বাজি হইতে লাগিল ; কোকিল আগে আগে ফুকরাইতে লাগিল। অনেক বরযাত্র চলিল, স্বয়ং রাজকুমার স্থলপদ্ম দিবাবসানে অসুস্থকর বলিয়া

আসিতে পারিলেন না, কিন্তু জবাগোষ্ঠী—শ্বেতজবা, রক্তজবা, জরদজবা প্রভৃতি সবংশে আসিয়াছিল। করবীদের দল, সেকেলে রাজাদিগের মত বড় উচ্চ ডালে চড়িয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। সেঁউতি নীতবর হইবে বলিয়া, সাজিয়া আসিয়া দুলিতে লাগিল। গরদের জোড় পরিয়া চাঁপা আসিয়া দাঁড়াইল—বেটা ব্রাণ্ডি টানিয়া আসিয়াছিল, উগ্র গন্ধ ছুটিতে লাগিল। গন্ধরাজেরা বড় বাহার দিয়া দলে দলে আসিয়া, গন্ধ বিলাইয়া দেশ মাতাইতে লাগিল। অশোক, নেশায় লাল হইয়া আসিয়া উপস্থিত; সঙ্গে একপাল পিপড়া মোসায়েব হইয়া আসিয়াছে; তাহাদের গুণের সঙ্গে সম্বন্ধ নাই, কিন্তু দাঁতের জ্বালা বড়—কোন্ বিবাহে না এরূপ বরযাত্র জোটে, আর কোন্ বিবাহে না তাহারা হুল ফুটাইয়া বিবাদ বাধায়? কুরবক, কুটজ প্রভৃতি আরও অনেক বরযাত্র আসিয়াছিলেন, ঘটক মহাশয়ের কাছে তাঁহাদের পরিচয় শুনিবেন। সর্ব্বত্রই তিনি যাতায়াত করেন এবং কিছু কিছু মধু পাইয়া থাকেন।

আমারও নিমন্ত্রণ ছিল, আমিও গেলাম। দেখি বরপক্ষের বড় বিপদ্। বাতাস, বাহকের বায়না লইয়াছিলেন; তখন হুঁ—হুস করিয়া অনেক বরদানি করিয়াছিলেন, কিন্তু কাজের সময়ে কোথায় লুকাইলেন, কেহ খুঁজিয়া পায় না। দেখিলাম বর, বরযাত্র সকলে অবাক্ হইয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া আছেন। মল্লিকাদিগের কুল যায় দেখিয়া, আমিই বাহকের কার্য্য স্বীকার করিলাম। বর, বরযাত্র সকলকে তুলিয়া লইয়া মল্লিকাপুরে গেলাম।

সেখানে দেখিলাম, কন্যাকুল, সকল ভগিনী, আহ্লাদে ঘোমটা খুলিয়া, মুখ ফুটাইয়া, পরিমল ছুটাইয়া, সুখের হাসি হাসিতেছে। দেখিলাম, পাতায় পাতায় জড়াজড়ি, গন্ধের ভাণ্ডারে ছড়াছড়ি পড়িয়া গিয়াছে—রূপের ভরে সকলে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। যূথি, মালতী, বকুল, রজনীগন্ধ প্রভৃতি এয়োগণ স্ত্রী-আচার করিয়া বরণ করিল। দেখিলাম পুরোহিত উপস্থিত; নশীবাবুর নবমবর্ষীয়া কন্যা (জীয়ন্ত কুসুমরূপিণী) কুসুমলতা সূচ সূতা লইয়া দাঁড়াইয়া আছে; কন্যাকর্ত্তা কন্যা সম্প্রদান করিলেন; পুরোহিত মহাশয় দুইজনকে এক সূতায় গাঁথিয়া গাঁটছড়া বাঁধিয়া দিলেন।

তখন বরকে বাসর ঘরে লইয়া গেল। কত যে রসময়ী মধুময়ী সুন্দরী সেখানে বরকে ঘেরিয়া বসিল তাহা কি বলিব। প্রাচীনা ঠাকুরাণীদিদি টগর সাদা প্রাণে বাঁধা রসিকতা করিতে করিতে শুকাইয়া উঠিলেন। রঙ্গনের, রাঙ্গা মুখে হাসি ধরে না। যূই, কন্যের সই, কন্যের কাছে গিয়া শুইল; রজনীগন্ধকে বর তাড়কা-রাক্ষসী বলিয়া কত তামাসা করিল; বকুল, একে বালিকা, তাতে যত গুণ, তত রূপ নহে; এক কোণে গিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল; আর ঝুমকা ফুল

বড় মানুষের গৃহিণীর মত মোটা মাগী নীল শাড়ী ছড়াইয়া জমকাইয়া বসিল তখন—

"কমল কাকা—ওঠ বাড়ী যাই—রাত হয়েছে, ওকি ঢুলে পড়্‌বে যে ?"

কুসুমলতা এই কথা বলিয়া আমার গা ঠেলিতেছিল ;—চমক হইলে, দেখিলাম কিছুই নাই। সেই পুষ্প বাসর কোথায় মিশিল ?—মনে করিলাম, সংসার অনিত্যই বটে—এই আছে এই নাই। সে রম্য বাসর কোথায় গেল,—সেই হাস্যমুখী শুভ্র স্মিত সুধাময়ী পুষ্পসুন্দরী সকল কোথা গেল ? যেখানে সব যাইবে সেইখানে—স্মৃতির দর্পণতলে, ভূত সাগরগর্ভে। যেখানে রাজা প্রজা, পর্ব্বত সমুদ্র গ্রহ নক্ষত্রাদি গিয়াছে বা যাইবে সেইখানে—ধ্বংসপুরে। এই বিবাহের ন্যায় সব শূন্যে মিশাইবে, সব বাতাসে গলিয়া যাইবে—কেবল থাকিবে—কি ? ভোগ ? না, ভোগ্য না থাকিলে ভোগ থাকিতে পারে না। তবে কি ? স্মৃতি ?

কুসুম বলিল, "ওঠ না—কি কচ্চো ?"

আমি বলিলাম, "দূর পাগলি, আমি বিয়ে দিচ্ছিলাম।"

কুসুম ঘেঁসে এসে, হেসে হেসে কাছে দাঁড়াইয়া আদর করিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কার বিয়ে, কাকা ?"

আমি বলিলাম, "ফুলের বিয়ে।"

"ও: পোড়া কপাল, ফুলের ? আমি বলি কি ! আমিও যে এই ফুলের বিয়ে দিয়াছি।"

"কই ?"

"এই যে মালা গাঁথিয়াছি।" দেখিলাম, সেই মালায় আমার বর কন্যা রহিয়াছে।

ভারতবর্ষীয় আর্য্যজাতির আদিম অবস্থা

শাসন প্রণালী

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

ভারতভূমির অদৃষ্ট যেকালে সুপ্রসন্ন ছিল তৎকালে ইহার যেদিগে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যাইত সর্ব্বদিগেই সুন্দর দৃশ্যে পরিপূর্ণ বোধ হইত। পুরাকালে ভারতীয় আর্য্যসন্তানগণ সমস্ত ধরাতলে অগ্রগণ্য ছিলেন। সভ্যতার বৃদ্ধির সঙ্গে যেমন পাপের আধিক্য হইতে লাগিল অমনি তাহার নিবৃত্তিচেষ্টায় সকলেই তন্মনস্ক হইলেন।

ভিন্নদেশীয় ও আধুনিক সভ্যজাতির চক্ষে যাহা সামান্য দোষ বলিয়া গণ্য, ভারতবর্ষীয়দিগের নয়নপথে সেগুলি সেপ্রকার সামান্য অপরাধ বলিয়া উপেক্ষার যোগ্য নয়। ইহাদিগের নিকট অকার্য্য চিন্তা, কুকর্ম্ম, কুপরামর্শ, কুসঙ্গ, কুব্যবহার মাত্রই দোষজনক। দোষ মাত্রই পাপোৎপত্তির মূল।

ইহারা পাপে রত না হইতে পারেন এই কারণে শাস্ত্রকারেরা আত্মা ও মনকে সকল কার্য্যের সাক্ষী স্বরূপ কহিয়াছেন। (১) এই জাতির ধর্ম্মোপদেশকগণ মনুষ্যদিগকে শাস্ত্রের নিয়মাধীন করিয়া সংসার রক্ষার নিমিত্ত সমাজঘটিত যে সকল নিয়ম করিয়াছেন তাহার কতকগুলি অদ্য প্রদর্শিত হইতেছে।

ইহাদিগের বিচারপ্রণালীর কতিপয় বিষয় পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে, এক্ষণে ব্যবহার সংহিতার নিয়মানুসারে কোন্ কার্য্য নিষিদ্ধ ও তত্তৎকার্য্য জ্ঞান পূর্ব্বক করিলে অথবা অজ্ঞানকৃত হইলে কিরূপ দোষ ঘটে ও সেই দোষগুলি কি প্রকার পাতকে পরিণত হয় এবং তাহার দণ্ডই বা কতদূর হইয়া থাকে ইত্যাদি বিষয় নির্দ্ধারণ করিতে পারিলে দণ্ডনীতিঘটিত বিষয়ের তাবৎ কার্য্য ও শাসন প্রণালী জানা যায়।

---

(১) মনু বচনার্দ্ধ।

আত্মৈব হ্যাত্মনঃ সাক্ষী গতিরাত্মা তথাত্মনঃ।

কেহ কেহ মনে করিতে পারেন বিচারপ্রণালীর বিষয় এক প্রকার বলা হইয়াছে। কিন্তু মকদ্দমার আপীলের কথা কিছু বলা হয় নাই। তাঁহাদিগের বোধসৌকর্য্যার্থ আপীলের কথা অগ্রে স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করা যাইতেছে।

বিচারকালে যদি অভিযোক্তা অথবা প্রতিযোগী ব্যক্তির পক্ষে প্রমাণ প্রয়োগাদি পরিশুদ্ধরূপে গ্রহণ না হইয়া থাকে তাহা হইলে পুনর্বিচার হইতে পারে। প্রাড্‌বিবাকাদি কর্ত্তৃক নিষ্পাদিত বিচারের প্রকৃত দোষ প্রদর্শন করিতে না পারিলে পুনর্বিচারস্থলে অভিযোগটী পুনর্নিষ্পাদনযোগ্য বলিয়া গ্রাহ্য হইত না। পুনর্বিচারদর্শনকালে রাজাকে বিচারাসনে উপস্থিত থাকিতে হইত। তাঁহার অনুপস্থিতি কালে পুনর্বিচার স্থগিত থাকিত। প্রথম ধর্ম্মাধিকরণের নিষ্পন্ন বিচারে দোষ দৃষ্ট হইলে দ্বিতীয় ধর্ম্মাধিকরণের মতানুসারে নৃপতিকর্ত্তৃক প্রথম বিচারকের দণ্ডবিধান করা রীতি ছিল। (২)

সুবিচার না করিলে রাজদ্বার হইতে তিরস্কৃত, দণ্ডিত, লোকসমাজে ঘৃণিত এবং পরকালে নরকভাগী হইতে হইবে এই ভয়ে অধিকাংশ বিচারকই জ্ঞানগোচরে কদাপি অবিচার করিতেন না। সেই হেতুই ইহাদিগের কৃত নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে অধিকাংশ স্থলে প্রায় আপীল হইত না। সুতরাং পুনবিচারের কথা অল্প পরিমাণে দেখা যায়। আপীলের ভাগ অতি অল্প হইবার আরও একটী বিশেষ গুরুতর কারণ লক্ষিত হয়। সেটী এই—বাদী প্রতিবাদী কি প্রকার অবস্থার লোক, তাহাদিগের কেমন বিষয়ে বাদ প্রতিবাদ ও কি বিষয়ক অভিযোগ কি প্রকার সাক্ষী আছে উহা অগ্রে পরীক্ষিত হইত। তৎপরে বিবেচনানুসারে সেটী বিচারযোগ্য কিনা জ্ঞান হইলে তাহার মীমাংসা জন্য বিচারাসনে অর্পিত হইত।

---

(২) অসদ্বিচারেতু বিচারান্তরমাহ নারদঃ।
অসাক্ষিকন্তু যদ্দৃষ্টং বিমার্গেণচ তীরিতং।
অসম্মত মতৈ দৃষ্টং পুনর্দর্শনমর্হতি॥
অসাক্ষিকমিত্য প্রামাণিকোপলক্ষণং।
তথা যাজ্ঞবল্ক্য।—
দুর্দৃষ্টাংস্তু পুনর্দৃষ্টা ব্যবহারান্নৃপেণতু।
সভ্যাঃ সজয়িনো দণ্ড্যা বিবাদাদ্দ্বিগুণং দমং॥
তীরিতঞ্চানুশিষ্টঞ্চ যত্র ক্বচন যদ্ভবেৎ।
কৃতং তদ্ধর্ম্মতো বিদ্যান্নতদ্ভূয়ো নিবর্ত্তয়েৎ॥ ২২৩
অমাত্যাঃ প্রাড়্বিবাকোবা যৎকুর্য্যুঃ কার্য্যমন্যথা।
তৎস্বয়ং নৃপতিঃ কুর্য্যাৎ তান্ সহস্রঞ্চ দণ্ডয়েৎ॥ ২৩৪

মনু ৯, অ।

বিশেষতঃ বিবাদমাত্রই ধর্ম্মাধিকরণ দ্বারা নিষ্পন্ন হইত তাহা নয়। কুল, মিত্র, শ্রেণী, পরিবাররক্ষক পিতা, মাতা এবং গুরু পুরোহিতাদি দ্বারা অনেক স্থলে বিবাদ ভঞ্জন করা রীতি ছিল বলিয়া অধিকাংশ স্থলে প্রকৃতরূপে সুপদ্ধতি অনুসারে মীমাংসা হইয়া আসিত, তন্নিবন্ধন পুনর্বিচারের স্থল থাকিত না। আরও একটী বিশেষ কথা এই যে, আর্য্যজাতির সমাজবন্ধনগ্রন্থি সমস্ত এমন দৃঢ় হইয়া রহিয়াছে যে, সত্যকালে যাহা নিষিদ্ধ ছিল উহা ত্রেতাদি তিন যুগে নিষিদ্ধ ও তাদৃশ পাপজনক না হইলেও ইহাদিগের আবহমান কালের সংস্কার অনুসারে চিরকালই উহা নিষিদ্ধ বলিয়া জ্ঞান হইয়া আসিতেছে। সুতরাং ইহাদিগের সমাজের একজন দোষ করিলে সমাজের সমস্ত লোককে দোষী ও পাপলিপ্ত জ্ঞান করা যায়।

ইহারা এমনি তেজস্বী ও ধার্ম্মিক ছিলেন যে মন্দ কর্ম্মমাত্র ইহাদিগের ঘৃণার বিষয় ছিল। কুকর্ম্মের অনুষ্ঠান করা দূরে থাকুক পাপচিন্তাকেও মনে স্থান দিতেন না। এমন এককাল গিয়াছে যেকালে পাপীব্যক্তির সঙ্গে কথোপকথনেও ভারতবর্ষীয় আর্য্যজাতির অধঃপতন ও নরকভোগ জ্ঞান হইত। এখন সেকাল কোথা গেল!—দ্বিতীয় যুগে পাপীর সংস্পর্শে মানুষের পাপ লেখে। ক্রমে লোকের সংস্কার পরিবর্ত্তিত হওয়াতে তৃতীয় যুগে পাপীর অন্ন ভক্ষণে পাপ জননের বিধি হইল। চতুর্থ যুগে কুকর্ম্মকরণ দ্বারাই পাপোৎপত্তির বিধি থাকিল বটে—কিন্তু সংস্কারের গুণে, উপদেশের গুণে, সমাজের প্রথানুসারে পাপীর সঙ্গে কথোপকথনাদি চতুর্ব্বিধ বিষয়ই সর্ব্বকালে আর্য্যজাতির নিকট পাপজনক বলিয়া নির্ণীত আছে। ভারতবর্ষীয়েরা পাপকার্য্যে এরূপ ভয় করেন, পাপ-পঙ্ক ইহাদিগের শরীর ও মনকে এরূপ কলুষিত করে যে ইহারা পাপক্রিয়ার ধ্বনি শুনিতেও ইচ্ছা করেন না। ইহাদিগের অন্তরাত্মাই ইহাদিগের পাপ পুণ্যের সাক্ষী। সত্যকালে দেশমধ্যে কোন ব্যক্তি পাপ-পঙ্কে পতিত হইলে ধার্ম্মিকলোকেরা সে দেশ পরিত্যাগ করিতেন। ত্রেতাযুগে পতিত ব্যক্তি যে গ্রামে বাস করিত সে গ্রামে ধার্ম্মিকগণ বাস করিতেন না। দ্বাপরে পাপীব্যক্তি ও তৎসংসৃষ্ট লোকমাত্রকেই পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র বাস করা রীতি ছিল। কলিতে কথোপকথনে তাদৃশ দোষ না হউক কিন্তু পারতপক্ষে সখ্য আদান প্রদান ও অন্নভোজনে দোষজন্মে এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস আছে। এস্থলে শাস্ত্রের বচন সঙ্কুচিত বলিতে হইবে। পাপীকে এই প্রকারে ঘৃণা করাতে আর্য্যসমাজে দোষ প্রবেশ করিতে পারিত না। সুতরাং বৃথা অভিযোগ হইত না। সত্য অভিযোগের সত্য মীমাংসা হইত বলিয়া আপীলের স্থল থাকিত না। (৩)

---

(৩) কৃতে পতিত সম্ভাষাৎ ত্রেতায়াং স্পর্শনেন তু।
দ্বাপরে ভক্ষণে ভক্ত কলৌ পতিত কর্ম্মণা ॥ ২৬

অভিযোগের পূর্ব্বে যে প্রকারে শপথ ও দিব্য করান হইত তাহার নিয়মে এই জানা যায় যে স্বল্পকারণে কোন অভিযোগ উপস্থিত হইলে পুত্রবান্ পুরুষ সবন্ধুব্যক্তি ও পুত্রবতী নারীদিগকে পুত্রের মস্তকস্পর্শ অথবা প্রিয়ব্যক্তির অঙ্গ স্পর্শ করিয়া শপথ করিতে হইত। বৈশ্যজাতিকে শপথ করাইতে হইলে গোরু শস্য ও কাঞ্চন দ্বারা শপথ করানই প্রকৃত শিষ্টাচার। ক্ষত্রিয়জাতিকে শপথ করাইতে হইলে সত্য বল মিথ্যা বলিও না পাপ হইবে এইরূপ কহিতে হয়। ব্রাহ্মণকে শপথ করাইবার সময় কি জান যথার্থ বল এইমাত্র বলিলেই তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট হইত। শূদ্র ও স্ত্রীজাতির পক্ষে সর্ব্বপ্রকার পাতক দ্বারা শপথ করান রীতি প্রচলিত ছিল।

দিব্য বিষয়ে—দেবতা, ব্রাহ্মণ, বাহন, অস্ত্র, গো, বৃষ, বীজ ও সুবর্ণাদি দ্বারা দিব্য করান যায়। লোকসমাজে ও বিচারাসনের সম্মুখে এইরূপে অভিহিত হইয়া ধর্ম্মের অপলাপ পুরঃসর কোন্ ব্যক্তি অসত্য কহিতে সাহসী হন? যিনি মিথ্যা কথনে অথবা ছলে সাহসী হন তাঁহারও আকার ইঙ্গিত, চেষ্টা মুখভঙ্গী ও বিকৃত স্বরাদি দ্বারা তাঁহার মিথ্যাকথন প্রকাশ পায়। মিথাবাদী জন সংসার মাঝে অতি অপদার্থ মধ্যে গণ্য হয়। মিথ্যা অভিযোগের দণ্ড আছে, সে দণ্ড স্থলবিশেষে অতি ভয়ানক; বিশেষতঃ হিন্দুজাতিরা লঘু পাপেও গুরুদণ্ড করিতেন বলিয়া কেহ নিতান্ত মর্ম্মান্তিক পীড়া না পাইলে কাহারও বিরুদ্ধে বৃথা অভিযোগ করিত না।

শপথ ও দিব্য অদ্যাপি পল্লীগ্রাম মাত্রে প্রচলিত আছে। উহা দ্বারা স্ত্রীলোকের কলহ, বালকগণের বিবাদ ও অজ্ঞলোকের বৈষয়িক কার্য্য সম্বন্ধীয় বিবাদের মীমাংসা হইয়া থাকে। ধর্ম্মাধিকরণে অভিযোগ উপস্থিত হয় না। (৩)

ত্যজেদ্দেশং কৃতযুগে ত্রেতায়াং গ্রামমুৎসৃজেৎ।
দ্বাপরে কুলমেকন্তু কর্ত্তারন্তু কলৌ যুগে॥ ২৫
কৃতেতু লিপ্যতে দেশস্ত্রেতায়াং গ্রাম এবচ।
দ্বাপরে কুলমেকন্তু কলৌ কর্ত্তা বিলিপ্যতে॥ ২৫
পরাশর সংহিতা, ১ম অধ্যায়।

(৪) গোবীজ কাঞ্চনৈর্বৈশ্যং শূদ্রং সর্ব্বৈস্তু পাতকৈঃ।
পুত্রদারস্য বাপ্যেবং শিরাংসি স্পর্শয়েৎ পৃথক্॥
দেব ব্রাহ্মণ পাদাংশ্চ পুত্রদারশিরাংসিচ।
এতেতু শপথাঃ প্রোক্তা মনুনা স্বল্পকারণৈঃ॥
সাহসেষপি শাপেচ দিব্যানিতু বিশোধনং।
বৃহস্পতি সংহিতা।

শপথ প্রকারমাহ নারদঃ।
সত্যবাহন শস্ত্রাণি গোবীজ কনকাণিচ।

বিচারকার্য্য সুচারুরূপে যথার্থরূপে ও ন্যায়ানুসারী না হইলে পাপ জন্মে, ঐ পাপ চতুর্দ্ধা বিভক্ত হইয়া প্রথম পাদপরিমিত অংশ রাজার স্কন্ধে নির্ভর করে। দ্বিতীয় পাদপরিমিত ভাগ বিচারকের শরীর ও মনকে স্পর্শ করে। তৃতীয় পাদাংশ সাক্ষীকে আক্রমণ করে। চতুর্থ পাদ প্রমাণাংশ অভিযোক্তাকে পাপী করিয়া থাকে। সুতরাং দেখা যাইতেছে বিচারকার্য্যের দোষে প্রকৃত পাপকারীর স্কন্ধ হইতে পাপের ৩/৪ অংশ বিচারক, নৃপতি ও সাক্ষীর স্কন্ধে পতিত হইতেছে। এই জ্ঞানটী সুদৃঢ় থাকাতেই সর্ব্বত্র সুবিচারই দেখা যাইত অবিচার প্রায়ই দেখা যাইত না।

আর্য্যজাতির মতে ব্যবহারকাণ্ড চারিভাগে বিভক্ত। ইহার প্রথম পাদ পূর্ব্বপক্ষ। উত্তরপক্ষকে দ্বিতীয় পাদ ধরা যায়। ক্রিয়াকে তৃতীয় পাদ কহা গিয়া থাকে। নির্ণয় দ্বারা ব্যবহারকাণ্ডের চতুর্থ পাদ নির্দ্ধারিত হয়। এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে বাদীর কথাগুলি পূর্ব্বপক্ষ, প্রতিযোগী ব্যক্তির প্রতিবচনগুলি উত্তরপক্ষ, লেখ্য ও সাক্ষীর বচন প্রমাণাদি ক্রিয়াপক্ষ, নিষ্পত্তিকে নির্ণয়পক্ষ কহা গিয়া থাকে। (৫)

স্পৃশেচ্ছিয়াংসি পুত্রাণাং দারাণাং সুহৃদাস্তথা।
দিব্যতত্ত্বধৃতবচন।

(৫) পাদোঽধর্ম্মস্য কর্ত্তারং পাদঃসাক্ষিণ মিচ্ছতি।
পাদঃ সভাসদঃ সর্ব্বান্ পাদোরাজানমিচ্ছতি।
এনোগচ্ছতি কর্ত্তারং নিন্দার্হো যত্র নিন্দ্যতে।
ব্যবহারতত্ত্বধৃত মনুনারদ বৌধায়ন হারীত বচন।
পূর্ব্বপক্ষঃস্মৃতঃপাদো দ্বিতীয়শ্চোত্তরঃস্মৃতঃ।
বৃহস্পতি সংহিতা।

কমল বিলাসী

আহা মরি কিবা দেখিনু সুন্দর
মধুর স্বপনলহরী !—
নবীন প্রদেশে নবীন গগন,
মধুর মধুর শীতল পবন,
সরস সরসে নীরদ বরণ
সলিল ভরিছে বিহরি ।

কত সরোজিনী সরোবর পরে,
পরিমলময় সদা নৃত্য করে,
ফুটে ফুটে আছে শত থরে থরে,
অপূর্ব্ব সুন্দর বিহরি ।

সরোবর তীরে ঘ্রাণেতে বিহ্বল,
ভ্রমে কত প্রাণী হেরে সে কমল ;
পরাণ শরীর সুবাসে শীতল,
বাজায়ে বাজায়ে বাঁশরী ।

ভ্রমে কত সুখে, কত সে আনন্দ,
যেন মাতোয়ারা পেয়ে সে সুগন্ধ,
সরোবরে পশি পিয়ে মকরন্দ—
চিন্তা, শোক তাপ পাশরি ।

ভাঙে পদ্মকলি, ভাঙে পদ্মনাল,
ঢালে পদ্মমধু পূর্ণ করি গাল ;
ভখয়ে সুরস নবীন মৃণাল
কতই যতনে আহরি ।

আনন্দে অঘোর মধুমত্ত মন,
ত্যজি বারি পুনঃ, উঠে কতক্ষণ
তীরে বসি ধীরে সেবে সমীরণ
হৃদয়ে সুখের লহরী ।

পুনঃ গিয়া জলে তোলে পদ্মদল—
কোরক বিকচ নলিনী অমল
মকরন্দ লৈয়ে ঢালে অবিরল
পূরিয়া পূরিয়া গাগরী ।

পুনঃ উঠে তীরে মৃদু মন্দ বায়,
ধীরে ধীরে সবে তরুতলে যায় ;
নিকুঞ্জ ছাড়িয়া তখন সেথায়
প্রবেশে কতই সুন্দরী ।

মধুমাখা হাসি বদনে বিকাস,
পদ্মমধু বাসে পরাণে উল্লাস,
পদ্ম সুধা পিয়ে মিটায় পিয়াস—
কুবলয়ে বান্ধে কবরী ।

বিছায়ে কোমল কমল পাতায়,
সুশীতল শয্যা ভূতলে সাজায়,
চারু মনোহর উপাধান তায়,
গ্রথিত নলিনীমঞ্জরী ।

তরু তলে তলে হেন মনোহর
কমলের শয্যা কোমল সুন্দর ;
দুগ্ধফেণনিভ সুচারু অম্বর
যেন রে মেদিনী উপরি !

এরূপে কুসুম-শয়ন পাতিয়া;
বিলাসিনীগণ হাসিয়া হাসিয়া,
হৃদয়বল্লভ পারশে বসিয়া
ছড়ায় বিলাস লহরী ;

কেহ বা গুঁথিয়া গ্রীবার ভূষণ,
হেরিয়া নানা জড়িত রতন,

পরাণে প্রিয়ের করিয়া যতন,
খেলায় নয়ন-সফরী ;

অলকার চুল কেহ বা খুলিয়া,
জড়ায়ে জড়ায়ে বিননী তুলিয়া,
বঁধুরে বাঁধয়ে, সোহাগে গলিয়া,
অধরে হাসির মাধুরী ;

কেহ বা আপন নয়ন-অঞ্জন
তুলিয়া বিলাসে করে বিলেপন
প্রিয় আঁখি পরে—সলাজ বদন,
চঞ্চল বসনে সম্বরি ;

কোন বা ললনা ছলিয়া চাতুরে,
রাঙ্গা পদ তুলি প্রিয়-হৃদি পরে,
অলক্ত লাঞ্ছনে দেহ চিহ্ন করে,
জানাতে প্রেমের চাকরি ।

এরূপে বসিয়া যতেক ললনা,
হাব, ভাব, হাসি প্রকাশে ছলনা ;
কেহ বা শিয়রে, কোন বা অঙ্গনা
চরণ পারশে প্রহরী ।

বসিয়া এভাবে যতেক সুন্দরী,
মধুর ললিত মোহন বাঁশরী,
সুরেতে বাঁধিয়া আলাপ আচরি
পূরিছে পল্লববল্লরী ।

সে সুরতরঙ্গে মিলিয়া তখন
উঠিল সঙ্গীত পূরিয়া কানন—
শ্যামা, কলকণ্ঠ, শারী অগণন
"বউ কথা কও" সুন্দরী

উঠিল ডাকিয়া, পূরি চারি দিক—
বেণু বীণা রব মধুর অধিক
জগৎ সংসার করিল অলীক,
ছড়ায়ে গীতের লহরী ।

বাঁশীতে বাজিছে—"কিবা সে সংসার"
কোকিলা ভাবিছে—"সে সব মিছার"
"ভ্রম, আশা ভব সকলি অসার"
প্রতিধ্বনি উঠে কুহরি ;—

"কি হবে জীবনে, প্রেমের আলোকে
পরাণ যদি না মাতে !

"রসের বাগান সুখের মেদিনী
নারী-ফুল ফুটে তাতে ।

"যে জানে মথিতে এ সুখ জলধি
সেই সে পীযূষ পায় ;

"সখের বাজার সুখের মেদিনী
রসের বেসাতি তায় !"

• • • •

"হায় সে পীযূষ ! কিবা তার সম
ভাব রে ভাবুক মনে !

"হায়—ধন, মান, যশ, প্রাণের নিগড় !
কণ্টক আশার বনে !

"এ যে সুখের ধরণী, ভাবনা উদাস
ইহাতে নাহিক সাজে ;

"হেথা প্রাণের সাধের প্রমোদে মাতিলে
তবে সে আনন্দে বাজে !

"শুধু—রসিক যে জন রসের ধরায়
সেই সে হরষ পায় !

"ডুবে নারীসুধাকূপে লভে প্রেমসুধা
দ্বিজ এই গীত গায় ।"

বিহগ, বিটপী, বাঁশরী, বীণাতে
এই গীত শুধু বহিবে প্রপাতে ;
প্রকৃতি যেন বা মাতিল তাহাতে
বিকাশি বেশের চাতরি ।

চারু কিসলয় হইল বিকাশ ;
তরুরাজি কোলে মৃদু মৃদু হাস
কুসুম চুম্বিল মলয় বাতাস—
লতিকা উঠিল শিহরি ;

তুলিয়া কলাপ মদন বিধুর
নাচিতে লাগিল উন্মত্ত ময়ূর ;
নবীন জলদ নিনাদি মধুর
গগন রাখিল আবরি ।

গাঢ়তর আরো বাজিল বাদন,
গাঢ়তর আরো গীত বরিষণ,
গাঢ়তর বেশ আরো সে ভুবন—
আঁধারিল যেন শর্ব্বরী।

যত তরু ছিল পড়িল লুটিয়া,
বিটপে বিটপে লতা বিনাইয়া,
করিল মণ্ডপ কুসুমে ভূষিয়া,
ধীর নাদে মৃদু মর্ম্মরি!

মণ্ডপে মণ্ডপে যুগল যুগল,
সুতন্দ্রা আলসে শরীর নিচল,
পড়িল পরাণী—অসাড় সকল—
রহিল চেতনা সংহরি।

একাকী তখন ভ্রমিনু সে দেশ;
চারিদিকে খালি হেরি চারু বেশ
কমল-সরসী, কোমল প্রদেশ
রাজিছে ভূতল উপরি;
পাতিয়া নলিনী যত প্রাণিগণ
সরোবর তীরে সুখে নিমগন,
কেবলি নিরখি, যতই ভ্রমণ
করি সে অপূর্ব্ব নগরী!

ষড় ঋতু ক্রমে কত আসে যায়—
প্রাবৃটের কোলে নিদাঘ জুড়ায়,
প্রাবৃট আবার শরতে লুকায়,
শিশিরে করিয়া সুন্দরী;

শিশিরের কোলে হিমঋতু আসে;
নিশি-অশ্রুজলে তরুদল ভাসে;
প্রাণী সে সকল তখনও বিলাসে
অঘোর দিবস শর্ব্বরী!

যতদিন ক্ষুধা জঠরে না জ্বলে,
সেই ভাবে তারা পড়িয়া ভূতলে,
অচেতন চিতে থাকয়ে বিরলে—
জগত সংসার পাশরি।
বসন্ত ফিরিয়া আইলে আবার
জাগিয়া করয়ে মৃণাল আহার,
কমল-পীযূষ পিয়ে পুনর্ব্বার,
পড়য়ে চেতনা সম্বরি।
কত যে আনন্দে প্রকৃতি খেলায়
ঋতুতে ঋতুতে ঘটনা ছলায়!—
নাহি জানে তারা—দিবস নিশায়
স্বভাবের কত চাতুরি!

নাহি দেখে কভু সে শোভার মুখ!
ঘোরতর রবে প্রকৃতির বুক
ঘনঘটাজালে—পতন উন্মুখ
বিজলি বেড়ায় বিচরি।

না বুঝিতে পারি কি শোভা তখন!
গগনের কোলে যবে প্রভঞ্জন
চলে দম্ভ করি ছাড়িয়া গর্জ্জন—
নাচয়ে প্রকৃতি সুন্দরী!

নেচে নেচে ঝরে ঘন ঘন ফোঁটা
পড়ে ধরাতলে ভেদি গিরি কোঠা
সরিৎ সরসী উলটা পালটা
অদৃশ্য কন্দর শিখরী।

তখন হৃদয়ে যে ভাব গভীর
করে আন্দোলন, অধীর শরীর—
না জানে তাহারা, না ভাবে মহীর
কত সে ঐশ্বর্য্য-লহরী!

যে ভাব পরশে প্রাণে পুষ্প ফুটে
থাকে চিরকাল, প্রাণিচিত্ত পুটে,
নিত্য পরিমল নিত্য যাহে উঠে
জগতে সঞ্চারি মাধুরী;—

যে ভাব পরশে মানবের মন
বেড়ায় জগৎ করি বিদারণ,
করে তেজোজ্বালে পৃথিবী দাহন—
জীবন মরণ বিস্মরি;—

না পরশে কভু তাদের পরাণ;
জীবন কাটায় করি মধু গান;
নারীগত মান—নারীগত প্রাণ,
নারী পায়ে ধরা চাকরি!

এইরূপে হেরি সে চারু স্বপন ;
গেল কত কাল ভ্রমিতে কেবল ;
শেষে যেন প্রাণ হইল বিকল
ভাবিয়া সে ঘোর শর্ব্বরী ।

ভাবিয়া হৃদয়ে উদয় ধিক্কার,
নরজাতি বুঝি নাহি হেন আর ?
ধুধু করে শূন্য পুরাকাল যার—
হেরে উঠে প্রাণ শিহরী ।

হায় রে কিরূপে এ ছার জীবন
এ ভাবে, এখানে, যাপে প্রাণিগণ !
ভুলে কি ইহারা ভাবে না কখন
এ বিলাস ভোগ পাশরি ?

কালচিত্রপটে যদি ফিরে চায়,
গুরুদের ধন কি দেখিতে পায় ?
কিবা সে সঙ্কেত আছে রে কোথায়—
ভ্রমিতে সংসার ভিতরি !

পিতৃকুলগত কোন মহাভাগে
দিয়াছে সুযশঃ ? শুনে অনুরাগে
পুনঃ ধীরে প্রাণ, পুনঃ ছুটে আগে
ভবিষ্য-তরঙ্গ উত্তরি ।

নরজাতি যত হের ধরা মাঝে
সকলেরি চিহ্ন কালবক্ষে সাজে ;
নিরখিলে তায় হৃদিতন্ত্রী বাজে,
ক্ষুধা তৃষ্ণা যায় পাশরি !

এ ছার জাতির কি আছে তেমন,
কালের কপালে সঙ্কেত লিখন ?
অপূর্ব্ব বা কিবা নূতন কেতন
উড়িছে ভবিষ্য-উপরি ?

ভাবিতে ভাবিতে কত দূরে যাই,
পুরী প্রান্তভাগ নিরখিতে পাই—
তেমতি সরস কোমল সে ঠাঁই,
সজ্জিত পল্লববল্লরী ।

প্রাণিগণ সেথা করিছে বিলাস,
তেমতি আকৃতি প্রকৃতি আভাস,
সেই নিদ্রা ঘোর, তরুতলে বাস,
সেইরূপে নারী প্রহরী ।

সেখানে রমণী আরো সুচতুরা,
জানে কত আরো ছলনা মধুরা,
সদা মনে ভয় পাছে সে বঁধুরা
ছাড়িয়া পলায় নগরী ।

কাছে কাছে আছে সোণার পিঞ্জর,
স্বর্ণ শিকলি শতেক নহর ;
যদি কেহ উঠে শুনে অন্ত স্বর
বিলাস প্রমোদ পাশরি ;—

অমনি তাহারে বাঁধে সে শৃঙ্খলে,
অমনি পিঞ্জরে পূরে কত ছলে,
কত কাঁদে প্রাণী, ভাসে চক্ষু জলে,
তবু সে না ছাড়ে সুন্দরী ।

ভয়ে কাঁপে প্রাণ ভেবে সে প্রথায় ;
ভাবি কেন, হায়, প্রবেশি সেথায়,
কিরূপে বাঁচিব করি কি উপায়,
কিরূপে ছাড়ি সে নগরী !

হেন কালে দেখি বিস্ফারি নয়ন,
বিস্ময়ে বিমুগ্ধ, সেই প্রাণিগণ,
আমারি স্বদেশী—নহে সে স্বপন !—
খেলিছে বঙ্গের উপরি !

আহা মরি কিবা দেখিনু সুন্দর
অপূর্ব্ব স্বপন লহরী !

সপ্তত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদ

পূর্ব্ব কথা

পূর্ব্ব কথা যাহা বলি নাই এক্ষণে সংক্ষেপে বলিব।

যে দিন আমিয়ট, ফষ্টরের সহিত, মুঙ্গের হইতে যাত্রা করিলেন, সেই দিন সন্ধান করিতে করিতে রমানন্দস্বামী জানিলেন যে, ফষ্টর ও দলনীবেগম প্রভৃতি একত্রে আমিয়টের সঙ্গে গিয়াছেন। গঙ্গাতীরে গিয়া চন্দ্রশেখরের সাক্ষাৎ পাইলেন। তাঁহাকে এ সম্বাদ অবগত করিলেন, বলিলেন, "এখানে তোমার আর থাকিবার প্রয়োজন কি—কিছুই না। তুমি স্বদেশে প্রত্যাগমন কর। শৈবলিনীকে আমি কাশী পাঠাইব। তুমি যে পরহিতব্রত গ্রহণ করিয়াছ অদ্য হইতে তাহার কার্য্য কর। এই যবনকন্যা ধর্ম্মিষ্ঠা, এক্ষণে বিপদে পতিতা হইয়াছে, তুমি ইহার পশ্চাদনুসরণ কর; যখনই পারিবে, ইহার উদ্ধারের উপায় করিও। প্রতাপও তোমার আত্মীয় ও উপকারী, তোমার জন্যই এ দুর্দ্দশাগ্রস্ত; তাহাকে এ সময়ে ত্যাগ করিতে পারি না। তাহাদিগের অনুসরণ কর।" চন্দ্রশেখর নবাবের নিকট সম্বাদ দিতে চাহিলেন, রমানন্দস্বামী নিষেধ করিলেন, বলিলেন, "আমি সেখানে সম্বাদ দেওয়াইব।" চন্দ্রশেখর গুরুর আদেশে, অগত্যা, একখানি ক্ষুদ্র নৌকা লইয়া আমিয়টের অনুসরণ করিতে লাগিলেন। রমানন্দস্বামীও সেই অবধি, শৈবলিনীকে কাশী পাঠাইবার উদ্যোগে, উপযুক্ত শিষ্যের সন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন অকস্মাৎ জানিলেন যে শৈবলিনী পৃথক্ নৌকা লইয়া ইংরেজের অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে। রমানন্দস্বামী বিষম সঙ্কটে পড়িলেন। এ পাপিষ্ঠা কাহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইল, ফষ্টরের না চন্দ্রশেখরের? রমানন্দস্বামী, মনে মনে ভাবিলেন, "বুঝি চন্দ্রশেখরের জন্য আবার আমাকে সাংসারিক ব্যাপারে লিপ্ত হইতে হইল।" এই ভাবিয়া তিনিও সেই পথে চলিলেন।

রমানন্দস্বামী, চিরকাল পদব্রজে দেশ বিদেশ ভ্রমণ করিয়াছেন,—উৎকৃষ্ট পরিব্রাজক। তিনি তটপথে, পদব্রজে, শীঘ্রই শৈবলিনীকে পশ্চাৎ করিয়া

আসিলেন; বিশেষ তিনি আহার নিদ্রার বশীভূত নহেন, অভ্যাসগুণে সে সকলকে বশীভূত করিয়াছিলেন। ক্রমে আসিয়া চন্দ্রশেখরকে ধরিলেন। চন্দ্রশেখর তীরে রমানন্দস্বামীকে দেখিয়া, তথায় আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন।

রমানন্দস্বামী বলিলেন, "একবার, নবদ্বীপে, অধ্যাপকদিগের সঙ্গে আলাপ করিবার জন্য বঙ্গদেশে যাইব, অভিলাষ করিয়াছি। চল, তোমার সঙ্গে যাই।" এই বলিয়া রমানন্দস্বামী চন্দ্রশেখরের নৌকায় উঠিলেন।

ইংরেজের বহর দেখিয়া তাঁহারা ক্ষুদ্র তরণী নিভৃতে রাখিয়া তীরে উঠিলেন। দেখিলেন, শৈবলিনীর নৌকা আসিয়াও, নিভৃতে রহিল; তাঁহারা দুই জনে তীরে প্রচ্ছন্নভাবে থাকিয়া সকল দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন, প্রতাপ শৈবলিনী সাঁতার দিয়া পলাইল। দেখিলেন, তাহারা নৌকায় উঠিয়া পলাইল। তখন তাঁহারাও নৌকায় উঠিয়া তাহাদিগের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলেন। তাহারা নৌকা লাগাইল, দেখিয়া তাঁহারাও কিছুদূরে নৌকা লাগাইলেন। রমানন্দস্বামী, অনন্তবুদ্ধিশালী—চন্দ্রশেখরকে বলিলেন, "সাঁতার দিবার সময় প্রতাপ শৈবলিনীতে কি কথোপকথন হইতেছিল, কিছু শুনিতে পাইয়াছিলে?"

চ। না।

র। তবে, অদ্যরাত্রে নিদ্রা যাইও না। উহাদের প্রতি দৃষ্টি রাখ।

উভয়ে জাগিয়া রহিলেন। দেখিলেন, শেষ রাত্রে শৈবলিনী নৌকা হইতে উঠিয়া গেল। ক্রমে তীরবনমধ্যে প্রবেশ করিয়া অদৃশ্য হইল। প্রভাত হয় তথাপি ফিরিল না। তখন, রমানন্দস্বামী চন্দ্রশেখরকে বলিলেন, "কিছু বুঝিতে পারিতেছি না, ইহার মনে কি আছে। চল, ইহার অনুসরণ করি।"

তখন উভয়ে সতর্কভাবে শৈবলিনীর অনুসরণ করিলেন। সন্ধ্যার পর মেঘাড়ম্বর দেখিয়া রমানন্দস্বামী বলিলেন, "তোমার বাহুতে বল কত?"

চন্দ্রশেখর, হাসিয়া, একখণ্ড বৃহৎ প্রস্তর একহস্তে তুলিয়া দূরে নিঃক্ষেপ করিলেন।

রমানন্দস্বামী বলিলেন, "উত্তম। শৈবলিনীর নিকটে গিয়া অন্তরালে বসিয়া থাক, শৈবলিনী আগতপ্রায় বাত্যায় সাহায্য না পাইলে, স্ত্রীহত্যা হইবে। নিকটে এক গুহা আছে। আমি তাহার পথ চিনি। আমি যখন বলিব, তখন তুমি শৈবলিনীকে ক্রোড়ে লইয়া আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিও।"

চ। এখনই ঘোরতর অন্ধকার হইবে, পথ দেখিব কি প্রকারে?

র। আমি নিকটেই থাকিব। আমার এই দণ্ডাগ্রভাগ তোমার মুষ্টিমধ্যে দিব। অপর ভাগ আমার হস্তে থাকিবে।

শৈবলিনীকে গুহায় রাখিয়া, চন্দ্রশেখর বাহিরে আসিলে, রমানন্দস্বামী মনে মনে ভাবিলেন, "আমি এতকাল সর্ব্বশাস্ত্রাধ্যয়ন করিলাম, সর্ব্বপ্রকার মনুষ্যের সহিত আলাপ করিলাম, কিন্তু সকলই বৃথা! এই বালিকার মনের কথা বুঝিতে পারিলাম না! এ সমুদ্রের কি তল নাই?" এই ভাবিয়া চন্দ্রশেখরকে বলিলেন, "নিকটে এক পার্ব্বত্য মঠ আছে, সেইখানে অদ্য গিয়া বিশ্রাম কর। কল্য প্রাতে পুনরপি যবনীর অনুসরণ করিবে। মনে জানিও, পরহিত ভিন্ন তোমার ব্রত নাই। তাহার উদ্ধার সম্পন্ন করিয়া, তুমি এইখানে আসিও। সেই মঠে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও। শৈবলিনীর জন্য চিন্তা করিও না, আমি এখানে রহিলাম। কিন্তু তুমি আমার অনুমতি ব্যতীত শৈবলিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও না। তুমি যদি আমার মতে কার্য্য কর, তবে শৈবলিনীর পরমোপকার হইতে পারে।"

চন্দ্রশেখর বলিলেন, "আমি মুরশিদাবাদ পর্য্যন্ত যাইব। মুরশিদাবাদে গেলে যবন-কন্যার উদ্ধারের অবশ্য উপায় করিতে পারিব। বর্ষারম্ভে গঙ্গা অত্যন্ত বেগবতী হইয়াছেন—নৌকাপথে যাইব, তটপথে ফিরিব। অন্যের দ্বিগুণ পথ আমি চলিতে পারি। সপ্তাহ মধ্যে আমি ফিরিয়া আসিব।" এই বলিয়া চন্দ্রশেখর বিদায় হইলেন। রমানন্দস্বামী, তাহার পর, অন্ধকারে, অলক্ষ্যে গুহামধ্যে প্রবেশ করিলেন।

তাহার পর যাহা যাহা ঘটিল, পাঠক সকলই জানেন।

চন্দ্রশেখর, দলনীকে মহম্মদ তকির নিকট রাখিয়া, আত্যন্তিক পরিশ্রম করিয়া, অষ্টম রাত্রে সেই পার্ব্বত্য মঠে আসিয়া রমানন্দস্বামীকে প্রণাম করিলেন। রমানন্দস্বামী সপ্তাহ বৃত্তান্ত তাঁহাকে সবিস্তারে, অবগত করিয়া, প্রভাতে গুহামধ্যে প্রবেশ করিতে উপদেশ দিলেন। তাহার পর যাহা ঘটিল, তাহাও বিবৃত করা গিয়াছে।

উন্মাদগ্রস্তা শৈবলিনীকে চন্দ্রশেখর সেই মঠে রমানন্দস্বামীর নিকটে লইয়া গেলেন। কাঁদিয়া বলিলেন, "গুরুদেব! এ কি করিলে?"

রমানন্দস্বামী, শৈবলিনীর অবস্থা সবিশেষ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "ভালই হইয়াছে। চিন্তা করিও না। তুমি এইখানে দুই একদিন বিশ্রাম কর। পরে ইহাকে সঙ্গে করিয়া স্বদেশে লইয়া যাও। যে গৃহে ইনি বাস করিতেন, সেই গৃহে ইহাকে রাখিও। যাঁহারা ইহার সঙ্গী ছিলেন, তাঁহাদিগকে সর্ব্বদা ইহার কাছে থাকিতে অনুরোধ করিও। প্রতাপকেও সেখানে মধ্যে মধ্যে আসিতে বলিও। আমি পশ্চাৎ যাইতেছি।"

গুরুর আদেশ মত, চন্দ্রশেখর শৈবলিনীকে গৃহে আনিলেন।

অষ্টত্রিংশতম পরিচ্ছেদ

হুকুম

ইংরেজের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মীরকাশেমের অধঃপতন আরম্ভ হইল। মীরকাশেম প্রথমেই কাটোয়ায় যুদ্ধ হারিলেন। তাহার পর গুরগণ খাঁর অবিশ্বাসিতা প্রকাশ পাইতে লাগিল। নবাবের যে ভরসা ছিল, সে ভরসা নির্ব্বাণ হইল। নবাবের এই সময়ে বুদ্ধির বিকৃতি জন্মিতে লাগিল। বন্দী ইংরেজদিগকে বধ করিবার মানস করিলেন। অন্যান্য সকলের প্রতি অহিতাচরণ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে মহম্মদ তকির প্রেরিত দলনীর সম্বাদ পৌঁছিল। জ্বলন্ত অগ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়িল। ইংরেজেরা অবিশ্বাসী হইয়াছে—সেনাপতি অবিশ্বাসী বোধ হইতেছে—রাজ্যলক্ষ্মী বিশ্বাসঘাতিনী—আবার দলনীও বিশ্বাসঘাতিনী? আর সহিল না। মীরকাশেম মহম্মদ তকিকে লিখিলেন, "দলনীকে এখানে পাঠাইবার প্রয়োজন নাই। তাহাকে সেইখানে বিষপান করাইয়া বধ করিও।"

মহম্মদ তকি স্বহস্তে বিষের পাত্র লইয়া দলনীর নিকট গেল। মহম্মদ তকিকে তাঁহার নিকটে দেখিয়া দলনী বিস্মিতা হইলেন। ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "এ কি খাঁ সাহেব, আমাকে বেইয্যত করিতেছেন কেন?"

মহম্মদ তকি কপালে করাঘাত করিয়া কহিল, "কপাল! নবাব আপনার প্রতি অপ্রসন্ন।"

দলনী হাসিয়া বলিলেন, "আপনাকে কে বলিল?"

মহম্মদ তকি, বলিল, "না বিশ্বাস করেন, পরওয়ানা দেখুন।"

দ। তবে আপনি পরওয়ানা পড়িতে পারেন নাই।

মহম্মদ তকি দলনীকে নবাবের মহিমোহরের পরওয়ানা পড়িতে দিলেন। দলনী পরওয়ানা পড়িয়া, হাসিয়া দূরে নিক্ষেপ করিলেন। বলিলেন, "এ জাল। আমার সঙ্গে এ রহস্য কেন? মরিবে সেই জন্য?"

মহ। আপনি ভীতা হইবেন না। আমি আপনাকে রক্ষা করিতে পারি?

দ। ও হো! তোমার কিছু মতলব আছে। তুমি জাল পরওয়ানা লইয়া আমাকে ভয় দেখাইতে আসিয়াছ?

মহ। তবে শুনুন। আমি নবাবকে লিখিয়াছিলাম যে আপনি আমিয়টের নৌকায় তাহার উপপত্নী স্বরূপ ছিলেন। সেই জন্য এই হুকুম আসিয়াছে।

শুনিয়া দলনী ভ্রূ কুঞ্চিত করিলেন। স্থিরবারিশালিনী ললাট-গঙ্গায় তরঙ্গ উঠিল—ভ্রূধনুতে মন্মথ, চিন্তাগুণ দিল—মহম্মদ তকি মনে মনে প্রমাদ গণিল। দলনী বলিলেন, "কেন লিখিয়াছিলে?" মহম্মদ তকি আনুপূর্ব্বিক আদ্যোপান্ত সকল কথা বলিল।

তখন দলনী বলিলেন, "দেখি পরওয়ানা আবার দেখি।"

মহম্মদ তকি পরওয়ানা আবার দলনীর হস্তে দিল। দলনী বিশেষ করিয়া দেখিলেন। বলিলেন, "যথার্থ বটে। জাল নহে। কই বিষ?"

"কই বিষ?" শুনিয়া মহম্মদ তকি বিস্মিত হইল। বলিল, "বিষ কেন?"

দ। পরওয়ানায় কি হুকুম আছে?

মহ। আপনারে বিষপান করাইতে।

দ। তবে কই বিষ?

মহ। আপনি কি বিষপান করিবেন না কি?

দ। আমার রাজার হুকুম আমি কেন পালন করিব না?

মহম্মদ তকি মর্ম্মের ভিতর লজ্জায় মরিয়া গেল। বলিল, "যাহা হইয়াছে, হইয়াছে। আপনাকে বিষপান করিতে হইবে না। আমি ইহার উপায় করিব।"

দলনীর চক্ষু হইতে ক্রোধে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইল। সেই ক্ষুদ্র দেহ উন্নত করিয়া দাঁড়াইয়া দলনী বলিলেন, "যে তোমার মত পাপিষ্ঠের কাছে প্রাণদান গ্রহণ করে, সে তোমার অপেক্ষাও অধম—বিষ আন।"

মহম্মদ তকি দলনীকে দেখিতে লাগিল। সুন্দরী—নবীনা, সবে মাত্র যৌবন-বর্ষায়, রূপের নদী পুরিয়া উঠিতেছে—ভরা বসন্তে অঙ্গ-মুকুল সব ফুটিয়া উঠিয়াছে। বসন্ত বর্ষায় একত্রে মিশিয়াছে। যাকে দেখিতেছি—সে দুঃখে ফাটিতেছে—কিন্তু আমার দেখিয়া কত সুখ! জগদীশ্বর! দুঃখ এত সুন্দর করিয়াছ কেন? সর্পের এত রূপ দিয়াছ কেন? এই যে কাতরা বালিকা—বাত্যাতাড়িত প্রস্ফুটিত কুসুম—তরঙ্গোৎপীড়িতা প্রমোদ-নৌকা—ইহাকে লইয়া কি করিব—কোথায় রাখিব? সয়তান আসিয়া তকির কাণে কাণে বলিল—"হৃদয়-মধ্যে।"

তকি বলিল, "শুন সুন্দরি—আমাকে ভজ—বিষ খাইতে হইবে না।"

শুনিয়া দলনী—লিখিতে লজ্জা করে—মহম্মদ তকিকে পদাঘাত করিলেন।

মহম্মদ তকির বিষ দান করা হইল না—মহম্মদ তকি দলনীর প্রতি, অর্দ্ধ দৃষ্টিতে চাহিতে চাহিতে ধীরে, ধীরে, ধীরে ফিরিয়া গেল।

তখন দলনী মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়া, কাঁদিতে লাগিলেন—"ও রাজরাজেশ্বর! শাহানশাহা! বাদশাহের বাদশাহ! এ গরিব দাসীর উপর কি হুকুম দিয়াছ! বিষ খাইব? তুমি হুকুম দিলে, কেন খাইব না! তোমার আদরই আমার অমৃত! তোমার ক্রোধই আমার বিষ—তুমি যখন রাগ করিয়াছ—তখন আমি বিষপান করিয়াছি। ইহার অপেক্ষা বিষে কি অধিক যন্ত্রণা! হে রাজাধিরাজ—জগতের আলো—অনাথার ভরসা—পৃথিবী-পতি—ঈশ্বরের প্রতিনিধি—দয়ার-সাগর

—কোথায় রহিলে ?—আমি তোমার আদেশে হাসিতে হাসিতে বিষপান করিব—কিন্তু তুমি দাঁড়াইয়া দেখিলে না,—এই আমার দুঃখ।"

করিমন নামে একজন পরিচারিকা দলনী বেগমের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত ছিল। তাহাকে ডাকিয়া, দলনী আপনার অবশিষ্ট অলঙ্কার তাহার হস্তে দিলেন। বলিলেন, "লুকাইয়া হকিমের নিকট হইতে আমাকে এমত ঔষধ আনিয়া দাও—যে আমার নিদ্রা আসে—সে নিদ্রা আর না ভাঙ্গে। মূল্য এই অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া দিও। বাকি যাহা থাকে তুমি লইও।"

করিমন, দলনীর অশ্রুপূর্ণ চক্ষু দেখিয়া বুঝিল। প্রথমে সে সম্মত হইল না—দলনী পুনঃ পুনঃ উত্তেজনা করিতে লাগিলেন। শেষে মূর্খ, লুব্ধ স্ত্রীলোক, অধিক অর্থের লোভে, স্বীকৃত হইল।

হকিম ঔষধ দিল। মহম্মদ তকির নিকট হরকরা আসিয়া গোপনে সম্বাদ দিল—"করিমন বাঁদী আজ এই মাত্র হকিম মেরজা হবীবের নিকট হইতে বিষ ক্রয় করিয়া আনিয়াছে।"

মহম্মদ তকি করিমনকে ধরিলেন। করিমন স্বীকার করিল। বলিল "বিষ দলনী বেগমকে দিয়াছি।"

মহম্মদ তকি শুনিয়াই দলনীর নিকট আসিলেন। দেখিলেন দলনী আসনে ঊর্দ্ধমুখে, ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে, যুক্তকরে বসিয়া আছেন—বিস্ফারিত পদ্মপলাশ চক্ষু হইতে জলধারার পর জলধারা গণ্ড বহিয়া বস্ত্রে আসিয়া পড়িতেছে—সম্মুখে শূন্য পাত্র পড়িয়া আছে—দলনী বিষপান করিয়াছেন।

মহম্মদ তকি জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কিসের পাত্র পড়িয়া আছে ?"

দলনী বলিলেন, "ও বিষ। আমি তোমার মত নিমকহারাম নই—প্রভুর আজ্ঞা পালন করিয়া থাকি। তোমার উচিত—আমার এই উচ্ছিষ্ট পান করিয়া আমার সঙ্গে আইস।"

মহম্মদ তকি নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল। দলনী ধীরে, ধীরে, শয়ন করিল। চক্ষু বুজিল। সব অন্ধকার হইল। দলনী চলিয়া গেল।

ঊনচত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ

সম্রাট্ ও বরাট

মীরকাশেমের সেনা কাটোয়ার রণক্ষেত্রে পরাভূত হইয়া হটিয়া আসিয়াছিল। ভগ্ন কপাল গিরিয়ার ক্ষেত্রে আবার ভাঙ্গিল—আবার যবনসেনা, ইংরেজের বাহুবলে, বায়ুর নিকট ধূলিরাশির ন্যায় তাড়িত হইয়া ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল।

ধ্বংসাবশিষ্ট সৈন্যগণ, আসিয়া উদয়নালায় আশ্রয় গ্রহণ করিল। তথায় চতুঃপার্শ্বে খাদ প্রস্তুত করিয়া যবনেরা ইংরেজ সৈন্যের গতিরোধ করিতেছিলেন।

মীরকাশেম স্বয়ং তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি আসিলে, সৈয়দ আমীর হোসেন, একদা জানাইল যে একজন বন্দী তাঁহার দর্শনার্থ বিশেষ কাতর। তাহার কোন বিশেষ নিবেদন আছে, হজুরে নহিলে তাহা প্রকাশ করিবে না।

মীরকাশেম জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কে?"

আমীর হোসেন বলিলেন, "একজন স্ত্রীলোক—কলিকাতা হইতে আসিয়াছে। ওয়ারন হষ্টিং সাহেব পত্র লিখিয়া তাহাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। সে বাস্তবিক বন্দী নহে। যুদ্ধের পূর্ব্বের পত্র বলিয়া অধীন তাহা গ্রহণ করিয়াছে। অপরাধ হইয়া থাকে, গোলাম হাজির আছে।" এই বলিয়া আমীর হোসেন পত্র পড়িয়া নবাবকে শুনাইলেন।

ওয়ারন হষ্টিং লিখিয়াছিলেন, "এ স্ত্রীলোক কে তাহা আমি চিনি না, সে নিতান্ত কাতর হইয়া আমার নিকটে আসিয়া বিনতি করিল যে, কলিকাতায় সে নিঃসহায়, আমি যদি দয়া করিয়া নবাবের নিকট পাঠাইয়া দিই, তবে সে রক্ষা পায়। আপনাদিগের সঙ্গে আমাদিগের যুদ্ধ উপস্থিত হইতেছে, কিন্তু আমাদের জাতি স্ত্রীলোকের সঙ্গে বিবাদ করে না। এজন্য ইহাকে আপনার নিকট পাঠাইলাম। ভাল মন্দ কিছু জানি না।"

নবাব পত্র শুনিয়া স্ত্রীলোককে সম্মুখে আনিতে অনুমতি দিলেন। সৈয়দ আমীর হোসেন বাহিরে গিয়া ঐ স্ত্রীলোককে সঙ্গে করিয়া আনিলেন—নবাব দেখিলেন—কুল্সম।

নবাব রুষ্ট হইয়া তাহাকে বলিলেন, "তুই কি চাহিস্ বাঁদী—মরিবি—?"

কুল্সম নবাবের প্রতি স্থির দৃষ্টি করিয়া কহিল—"নবাব! তোমার বেগম কোথায়! দলনী বিবি কোথায়!" আমীর হোসেন কুল্সমের বাক্যপ্রণালী দেখিয়া ভীত হইল—এবং নবাবকে অভিবাদন করিয়া সরিয়া গেল।

মীরকাশেম বলিলেন, "যেখানে সেই পাপিষ্ঠা, তুমিও সেইখানে শীঘ্র যাইবে।"

কুল্সম বলিল, "আমিও, আপনিও। তাই আপনার কাছে আসিয়াছি। পথে শুনিলাম লোকে রটাইতেছে যে, দলনী বেগম আত্মহত্যা করিয়াছেন। সত্য কি!"

নবাব। "আত্মহত্যা! রাজদণ্ডে সে মরিয়াছে। তুই তাহার দুষ্কর্ম্মের সহায়—তুই কুক্কুরের দ্বারা ভুক্ত হইবি—"

কুল্‌সম আছড়াইয়া পড়িয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল—এবং যাহা মুখে আসিল তাহা বলিয়া নবাবকে গালি দিতে আরম্ভ করিল। শুনিয়া চারিদিগ্ হইতে সৈনিক, ওমরাহ, ভৃত্য, রক্ষক প্রভৃতি আসিয়া পড়িল—একজন কুল্‌সমের চুল ধরিয়া তুলিতে গেল। নবাব নিষেধ করিলেন—তিনি বিস্মিত হইয়াছিলেন। সে সরিয়া গেল। তখন কুল্‌সম, বলিতে লাগিল, "আপনারা সকলে আসিয়াছেন, ভালই হইয়াছে। আমি এক অপূর্ব্ব কাহিনী বলিব, শুনুন। আমার এক্ষণই বধাজ্ঞা হইবে—আমি মরিলে আর কেহ তাহা শুনিতে পাইবে না। এই সময় শুনুন। শুনুন, যে সুবে বাঙ্গালা বেহারের, মীরকাশেম নামে এক মূর্খ নবাব আছে। দলনী নামে, তাহার বেগম ছিল। সে, নবাবের সেনাপতি গুর্‌গন খাঁর ভগিনী।"

শুনিয়া, কেহ আর কুল্‌সমের উপর আক্রমণ করিল না—সকলেই পরস্পরের মুখের দিগে চাহিতে লাগিল—সকলেরই কৌতূহল বাড়িতে লাগিল। নবাবও কিছু বলিলেন না—কুল্‌সম বলিতে লাগিল—

"গুর্‌গন খাঁ ও দৌলাতউন্নেছা ইস্পাহান হইতে পরামর্শ করিয়া জীবিকান্বেষণে বাঙ্গালায় আসে। দলনী যখন, মীরকাশেমের গৃহে বাঁদী স্বরূপ প্রবেশ করে, তখন উভয়ে উভয়ের উপকারার্থ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়।"

কুল্‌সম তাহার পরে, যে রাত্রে তাহারা দুইজনে গুর্‌গন খাঁর ভবনে গমন করে, তদ্বৃত্তান্ত সবিস্তারে বলিল। গুর্‌গন খাঁর সঙ্গে যে সকল কথাবার্ত্তা হয়, তাহা দলনীর মুখে শুনিয়াছিল, তাহাও বলিল। তৎপরে, প্রত্যাবর্ত্তন, অশ্বারোহী গুর্‌গন খাঁর সহিত পুনঃ সাক্ষাৎ, চন্দ্রশেখরের সাহায্য, প্রতাপের গৃহে অবস্থিতি, ইংরেজগণ কৃত আক্রমণ, এবং শৈবলিনী ভ্রমে দলনীরে হরণ, নৌকায় কারাবাস, আমিয়ট্‌ প্রভৃতির মৃত্যু, ফষ্টরের সহিত তাঁহাদিগের পলায়ন, শেষে দলনীকে গঙ্গাতীরে ফষ্টর কৃত পরিত্যাগ, এ সকল বলিয়া শেষে বলিতে লাগিল।—

"আমার স্কন্ধে সেই সময় সয়তান চাপিয়াছিল সন্দেহ নাই, নহিলে আমি সে সময়ে বেগমকে কেন পরিত্যাগ করিব? আমি সেই পাপিষ্ঠ ফিরিঙ্গীর দুঃখ দেখিয়া তাহার প্রতি—মনে করিয়াছিলাম সে আমাকে বিবাহ করিবে। মনে করিয়াছিলাম নিজামতের নৌকা পশ্চাৎ আসিতেছে—বেগমকে তুলিয়া লইবে—নহিলে আমি তাহাকে ছাড়িব কেন? কিন্তু তাহার যোগ্য শাস্তি আমি পাইয়াছি—বেগমকে পশ্চাৎ করিয়াই আমি কাতর হইয়া ফষ্টরকে সাধিয়াছি যে আমাকেও নামাইয়া দাও—সে নামাইয়া দেয় নাই। কলিকাতায় গিয়া যাহাকে দেখিয়াছি—তাহাকেই সাধিয়াছি যে আমাকে পাঠাইয়া দাও—কেহ কিছু বলে নাই। শুনিলাম হষ্টিং সাহেব বড় দয়ালু—তাঁহার কাছে কাঁদিয়া গিয়া তাঁহার পায়ে

ধরিলাম—তাঁহারই কৃপায় আসিয়াছি। এখন, তোমরা আমার বধের উদ্যোগ কর—আমার আর বাঁচিতে ইচ্ছা নাই।" এই বলিয়া কুল্‌সম কাঁদিতে লাগিল।

বহুমূল্য সিংহাসনে, শতশত রশ্মি প্রতিঘাতী রত্নরাজির উপরে বসিয়া, বাঙ্গালার নবাব অধোবদনে। এই বৃহৎ সাম্রাজ্যের রাজদণ্ড, তাঁহার হস্ত হইতে ত স্খলিত হইয়া পড়িতেছে—বহু যত্নেও ত রহিল না। কিন্তু যে অজেয় রাজ্য, বিনা যত্নে থাকিত—সে কোথায় গেল। তিনি কুসুম ত্যাগ করিয়া, কণ্টকে যত্ন করিয়াছেন—কুল্‌সম সত্যই বলিয়াছে।—বাঙ্গালার নবাব মূর্খ!

নবাব ওমরাহদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তোমরা শুন, এ রাজ্য আমার রক্ষণীয় নহে। এই বাঁদী যাহা বলিল, তাহা সত্য—বাঙ্গালার নবাব মূর্খ। তোমরা পার, সুবা রক্ষা কর, আমি চলিলাম। আমি রুহিদাসের গড়ে স্ত্রীলোক-দিগের মধ্যে লুকাইয়া থাকিব, অথবা ফকিরি গ্রহণ করিব"—বলিতে বলিতে নবাবের বলিষ্ঠ শরীর প্রবাহ মধ্যে রোপিত বংশখণ্ডের ন্যায় কাঁপিতেছিল—চক্ষের জল সম্বরণ করিয়া মীরকাশেম বলিতে লাগিলেন, "শুন বন্ধুবর্গ! যদি আমাকে সেরাজউদ্দৌলার ন্যায়, ইংরেজে বা তাহাদের অনুচরে মারিয়া ফেলে, তবে তোমাদের কাছে আমার এই ভিক্ষা সেই দলনীর কবরের কাছে আমারে কবর দিও। আর আমি কথা কহিতে পারি না—এখন যাও। কিন্তু তোমরা আমার এক আজ্ঞা পালন কর—আমি সেই তকি খাঁকে একবার দেখিব—আলি হিব্রাহিম খাঁ?"

হিব্রাহিম খাঁ উত্তর দিলেন, নবাব বলিলেন, "তোমার ন্যায় আমার বন্ধু জগতে নাই—তোমার কাছে আমার এই ভিক্ষা—তকি খাঁকে আমার কাছে লইয়া আইস।"

হিব্রাহিম খাঁ অভিবাদন করিয়া, তাম্বুর বাহিরে গিয়া, অশ্বারোহণ করিলেন।

নবাব তখন বলিলেন, "আর কেহ আমার উপকার করিবে?"

সকলেই যোড় হাত করিয়া হুকুম চাহিল। নবাব বলিলেন, "কেহ সেই ফষ্টরকে আনিতে পার?"

আমীর হোসেন বলিলেন, "সে কোথায় আছে, আমি তাহার সন্ধান করিতে চলিলাম।"

নবাব ভাবিয়া বলিলেন, "আর সেই শৈবলিনীকে? তাহাকে কেহ আনিতে পারিবে?"

মহম্মদ ইর্‌ফান্ যুক্তকরে নিবেদন করিল, "আমি তাহাকে লইয়া আসিতেছি।" এই বলিয়া মহম্মদ ইর্‌ফান্ বিদায় হইল।

শেষ কাসেম আলি বলিলেন, "গুর্‌গন খাঁ কত দূর?"

অমাত্যবর্গ বলিলেন, "তিনি ফৌজ লইয়া উদয় নালায় আসিতেছেন শুনিয়াছি—কিন্তু এখনও পৌছেন নাই। নবাব, মৃদু মৃদু বলিতে লাগিলেন, "ফৌজ! ফৌজ! কাহার ফৌজ?"

একজন কে চুপি চুপি বলিলেন, "তাঁরি।"

অমাত্যবর্গ বিদায় হইলেন। তখন নবাব রত্নসিংহাসন ত্যাগ করিয়া উঠিলেন, হীরকখচিত উষ্ণীষ দূরে নিক্ষেপ করিলেন—মুক্তার হার কণ্ঠ হইতে ছিঁড়িয়া ফেলিলেন—রত্নখচিত বেশ অঙ্গ হইতে দূর করিলেন।—তখন নবাব ভূমিতে অবলুণ্ঠিত হইয়া, দলনী! দলনী! বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।

এ সংসারে নবাবি এইরূপ।

তিন রকম

নং ১

বঙ্গদর্শনে "নবীনা এবং প্রাচীনা" কে লিখিল ? যিনি লিখুন, তিনি মনে করিয়াছেন, অবলা স্ত্রীজাতি কিছু কথা কহিবে না, অতএব যাহা ইচ্ছা তাহা লিখি। জানেন না যে সম্মার্জ্জনী স্ত্রীলোকেরই আয়ুধ।

ভাল, নবীন মহাশয়, আপনারা নবীনা প্রাচীনার গুণ দোষের তুলনা করিয়াছেন, নবীন ও প্রাচীনে কি তুলনা হয় না ? তুলনা করিলে দোষের ভাগ কোন্ দিগে ভারি হইবে ?

প্রাচীনের অপেক্ষা নবীনের গুণের মধ্যে দেখি, তোমরা একটু ইংরেজি শিখিয়াছ। কিন্তু ইংরেজি শিখিয়া কাহার কি উপকার করিয়াছ ? ইংরেজি শিখিয়া কেরাণীগিরি শিখিয়াছ দেখিতে পাই। কিন্তু মনুষ্যত্ব ? শুন, প্রাচীনে নবীনে প্রভেদ কি, বলি। প্রাচীনেরা পরোপকারী ছিলেন ; তোমরা আত্মোপকারী। প্রাচীনেরা সত্যবাদী ছিলেন ; তোমরা কেবল প্রিয়বাদী। প্রাচীনেরা ভক্তি করিতেন, পিতা মাতাকে ; নবীনের ভক্তি করা পত্নী বা উপপত্নীকে। প্রাচীনেরা দেবতা ব্রাহ্মণের পূজা করিতেন ; তোমাদের দেবতা টেস ফিরিঙ্গী, তোমাদের ব্রাহ্মণ সোনারবেনে। সত্য বটে, তাঁহারা পৌত্তলিক ছিলেন, কিন্তু তোমরা বোতলিক। জগদীশ্বরীর স্থানে, তোমরা অনেকেই ধান্যেশ্বরীকে স্থাপনা করিয়াছ ; ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের স্থানে, ব্রাণ্ডি, রম, জিন। বিয়র, সেরি, তোমাদের ষষ্ঠী মনসার মধ্যে। বঙ্গীয় বাবুর ভ্রাতৃস্নেহ, সম্বন্ধীর উপর বর্ত্তিয়াছে, অপত্যস্নেহ ঘোড়া কুক্কুরের উপর বর্ত্তিয়াছে ; পিতৃভক্তি আপিসের সাহেবের উপর বর্ত্তিয়াছে, আর মাতৃভক্তি ? পাচিকার উপরে। আমরা অতিথি অভ্যাগত দেখিলে মহাবিপদ্ মনে করি বটে, তোমরা তাহাদিগকে গলা ধাক্কা দাও। আমরা অলস ; তোমরা শুধু অলস নও—তোমরা বাবু! তবে ইংরেজ বাহাদুর, নাকে দড়ি দিয়া তোমাদের বানিগাছে ঘুরায়, বল নাই বলিয়া ঘোর। আর আমরাও নাকে দড়ি দিয়া ঘুরাই, বুদ্ধি নাই বলিয়া ঘোর। আমরা লেখা পড়া শিখি নাই বলিয়া আমাদের ধর্ম্মের বন্ধন নাই,

আর তোমাদের ? তোমাদের ধর্ম্মের বন্ধন বড় দৃঢ়, কেননা তোমাদের সে বন্ধনের দড়ী, একদিগে শুঁড়ি, আর একদিগে বারস্ত্রী টানিয়া আঁটিয়া দিতেছে ; তোমরা ধর্ম্ম-দড়িতে মদের কলসী গলায় বাঁধিয়া, প্রেম-সাগরে ঝাঁপ দিতেছ—গরিব "নবীনা" খুনের দায়ে ধরা পড়িতেছে। তোমাদের আবার ধর্ম্মের ভয় কি ? তোমরা কি মান ? ঠাকুর দেবতা ? যিশুখ্রীষ্ট ? ধর্ম্ম মান ? পাপ পুণ্য মান ? কিছু না—কেবল আমাদের এই আলতা-পরা মল-বেড়া শ্রীচরণ মান ; সেও নাতির জ্বালায়।

শ্রীচণ্ডিকা সুন্দরী দেবী।

নং ২

সম্পাদক মহাশয় ! আপনাদের শ্রীচরণে এ কিঙ্করীকুল, কোন দোষে দোষী ? আমরা কি জানি ?—আপনারা শিখাইবেন, আমরা শিখিব—আপনারা গুরু, আমরা শিষ্য,—কিন্তু শিক্ষাদান এক, নিন্দা আর। বঙ্গদর্শনে "নবীনার" প্রতি এত কটূক্তি কেন ?

আমাদের সহস্র দোষ আছে স্বীকার করি। একে স্ত্রীজাতি, তাতে বাঙ্গালির মেয়ে ; জাতিতে কাঠমল্লিকা, তাহাতে মরুভূমে জন্মিয়াছি—দোষ না থাকিবে কেন ? তবে কতকগুলি দোষ, আপনাদেরই গুণে জন্মিয়াছে। আপনাদের গুণে, দোষে নহে। আপনারা আমাদের এত ভাল না বাসিলে, আমাদের এত দোষ ঘটিত না। আপনারা আমাদের সুখী করিয়াছেন, এজন্য আমরা অলস। মাথার ফুলটি খসিয়া পড়িলে, আপনারা তুলিয়া পরান। আপনারা জল হইয়া যে নলিনী হৃদয়ে ধারণ করেন, সে কেন স্বচ্ছ সলিলে আপনার রূপের ছায়া দেখিয়া দিন না কাটাইবে ?

আমরা অতিথি অভ্যাগতের প্রতি অমনোযোগী—তাহার কারণ আমরা স্বামী পুত্রের প্রতি অধিক মনোযোগী। আমাদের ক্ষুদ্র হৃদয়ে আপনারা এতস্থান গ্রহণ করিয়াছেন যে, অন্য ধর্ম্মের আর স্থান নাই।

আর—শেষ কথা, আমরা কি ধর্ম্মভীতা নহি ? ছি ! ধর্ম্মভীতা বলিয়াই, আপনাদিগকে আর কিছু বলিতে পারিলাম না। তোমরাই আমাদিগের ধর্ম্ম। তোমাদের ভয়ে ভীতা বলিয়া, অন্য ধর্ম্মের ভয় করি না। সকল ধর্ম্ম কর্ম্ম আমরা স্বামী পুত্রে সমর্পন করিয়াছি—অন্য ধর্ম্ম জানি না। লেখা পড়া শিখাইয়া আমাদিগকে কোন্ ধর্ম্মে বাঁধিবেন ? যত শিখান না কেন—আমরা বাঙ্গালির মেয়ে, সকল বন্ধন ছিঁড়িয়া এই পাতিব্রত্য বন্ধনে আপনা আপনি বাঁধা পড়িব। যদি ইহাতে অধর্ম্ম হয়, সে আপনাদের দোষ, আপনাদেরই গুণ। আর, যদি আমার ন্যায় মুখরা বালিকার কথায় রাগ না করেন, তবে জিজ্ঞাসা করি, আপনারা গুরু, আমরা শিষ্য—আপনারা আমাদের কোন্ ধর্ম্ম শিখাইয়া থাকেন ?

লেখা পড়া শিখিব ? কেন ? তোমাদের মুখচন্দ্র দেখিয়া যে সুখ, লেখা পড়ায় কি তত ? তোমাদের সুখসাধনে যে ধর্ম্মশিক্ষা, লেখা পড়ায় কি তত ? দেখ, তোমাদের দেখিয়া আমরা আত্মবিসর্জ্জন শিখিয়াছি, লেখা পড়ায় কি তাহা শিখাইবে ? আর লেখা পড়া শিখিব কখন ? তোমাদের মুখ ভাবিতে ভাবিতে দিন যায়, ছাই লেখা পড়া শিখিব কখন ?

ছি ! দাসীদিগের নিন্দা !

শ্রীলক্ষ্মীমণি দেবী ।

নং ৩

ভাল, কোন্ রসিকচূড়ামণি "নবীনা এবং প্রবীণা" লিখিলেন ?

লেখক মহাশয় ! তুমি যা বলিয়াছ, সব সত্য—একটি মিথ্যা নহে। আমরা অলস বটে,—কিন্তু আমরা অলস না হইয়া, কাজ করিয়া বেড়াইলে, তোমাদের দশা কি হইত ? এ বিজুরি, তোমাদের হৃদয়াকাশে স্থির না থাকিলে, কাহার প্রতি চাহিয়া, এ দীর্ঘ দুঃখদারিদ্র্যময় জীবন কাটাইতে ? এ সৌদামিনী স্থির না থাকিলে, তোমরা এ সংসারান্ধকারে কোথায় আলো পাইতে ? আমরা কাজ করিব ? করিব, ক্ষতি কি, কিন্তু দেখ যেন, আমাদের তিলেক না দেখিয়া, তোমরা তৈলশূন্য প্রদীপের মত হঠাৎ নিবিয়া বসিও না ; জলশূন্য মাছের মত বার বার পুচ্ছ আছড়াইতে থাকিও না ; আর রাখালশূন্য (?) বাছুরের মত হাম্বারবে তোমাদের গৃহগোহাল পরিপূর্ণ করিও না। আমরা কাজ করিতে যাইব, কিন্তু তোমরা এ ঢল ঢল চঞ্চল রূপতরঙ্গ যে দেখিতে পাইবে না ! এ কলকণ্ঠধ্বনি ক্ষণেক না শুনিলে যে গীতিমুগ্ধ হরিণের ন্যায় সংসারারণ্যে যে শব্দান্বেষণ করিয়া বেড়াইবে !—কপাল খানা ! আবার বলেন কাজ করে না !

আমরা অতিথি অভ্যাগতকে খাইতে দিই না ;—দিব কি, তোমরা যে ঘরে কিছু রাখ না। ইংরেজের আপিসের কি গুণ বলিতে পারি না—যাইবার সময় যাও যেন নন্দদুলাল—ফিরে এস যেন কুম্ভকর্ণ ! নিজের নিজের উদর—এক একটি আধমণি বস্তা—আমরা যাই হিন্দুর মেয়ে, তাই তাহাতে কোন মতে ত্রিশ সের ঠাসিয়া দিই—তার উপর আবার অতিথি অভ্যাগত।

ধর্ম্মের বন্ধনে বাঁধিবেন ? ক্ষতি নাই, কিন্তু যে একাদশী নিরামিষের বাঁধনে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন, তার উপর এ বন্ধনে আর কাজ কি ? আপনারা একাদশীর ভার নিন, আমরা লেখা পড়া শিখিয়া,—ধর্ম্মের বন্ধন আঁটো করিয়া বাঁধিতে রাজি আছি। আমার মনে বড় সাধ, একবার আপনাদিগের সঙ্গে অবস্থার বিনিময় করি। গালিগালাজ দিবার আগে, একবার কত সুখ দুঃখ বুঝিয়া লউন। আমরা মরিলে আপনারা, একাদশী করিবেন, নিরামিষ খাইবেন, ঠেঁটি পরিবেন, আপনারা

স্বর্গারোহণ করিলে, আমরা “দ্বিতীয় সংসার” করিব—জীয়ন্তে আপনারা সন্তান প্রসব করিবেন, রন্ধনশালার তত্ত্বাবধারণ করিবেন,—বাড়ীতে বিবাহ উপস্থিত হইলে, গোঁপের উপর ঘোমটা টানিয়া বরণডালা মাথায় করিয়া, স্ত্রীআচার করিবেন, বাসর ঘরে রসের হাসি হাসিয়া বাসর জাগিবেন, সুখের সীমা থাকিবে না।—আমরা যৌবনে বহি হাতে করিয়া কালেজে যাইব—বয়সকালে, ফিরিঙ্গী খোঁপার উপর, পাগড়ী তেড়া করিয়া বাঁধিয়া আপিসে যাইব—টৌনহলে নথ নাড়িয়া স্পীচ করিব,—চস্‌মার ভিতর হইতে এই চোখের বিলোল কটাক্ষে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করিব—সাধের ধর্ম্মের দড়ি গলায় বাঁধিয়া সংসার-গোহালে খোল বিচালি খাইব।—ক্ষতি কি! তোমরা বিনিময় করিবে? কিন্তু একটা কথা সাবধান করিয়া দিই—তোমরা যখন মানে বসিবে—আমরা যখন মান ভাঙ্গিতে বসিব—মুখখানি কাঁদো কাঁদো করিয়া, কর্ণভূষা একটু ঈষৎ রসের দোলনে দোলাইয়া, এই সভ্রমর সরোজনয়নে একবার চোরা চাহনি চাহিয়া, যখন গহনাপরা হাতখানি, তোমাদের পায়ে দিব—তখন? তখন কি তোমরা, আমাদের মত মানের মান রাখিতে পারিবে?

বড়াই ছাড়িয়া, তাই কর; তোমরা অন্তঃপুরে এসো—আমরা আপিশে যাই। যাহারা সাতশত বৎসর পরের জুতা মাথায় বহিতেছে তাহারা আবার পুরুষ। বলিতে লজ্জা করে না।

শ্রীরসময়ী দাসী।

পরিমাণ রহস্য

দ্বিতীয় সংখ্যা

(সমুদ্রের গভীরতার পরিমাণ)

লোকের বিশ্বাস আছে যে, সমুদ্র কত গভীর, তাহার পরিমাণ নাই। অনেকের বিশ্বাস যে সমুদ্র "অতল।"

অনেক স্থানে সমুদ্রের গভীরতা পরিমিত হইয়াছে। আলেকজান্দ্রিয়া নিবাসী প্রাচীন গণিত ব্যবসায়িগণ, অনুমাণ করিতেন যে, নিকটস্থ পর্ব্বত সকল যত উচ্চ; সমুদ্রও তত গভীর। ভূমধ্যস্থ (Mediteranean) সমুদ্রের অনেকস্থানে ইহার পোষক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। তথায় এ পর্য্যন্ত ১৫০০০ ফিটের অধিক জল পরিমিত হয় নাই—আল্‌প্‌স্ পর্ব্বত শ্রেণীর উচ্চতাও ঐরূপ।

মিশর ও সাইপ্রস দ্বীপের মধ্যে ছয় সহস্র ফিট, আলেকজান্দ্রিয়া ও রোড্‌সের মধ্যে নয়সহস্র নয়শত, এবং মাল্‌টায় পূর্ব্বে ১৫০০০ ফিট জল পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু তদপেক্ষা অন্যান্য সমুদ্রে অধিকতর গভীরতা পাওয়া গিয়াছে। হম্বোলটের কস্মস্ গ্রন্থে লিখিত আছে যে, একস্থানে ২৬০০০ ফিট রশী নামাইয়া দিয়াও তল পাওয়া যায় নাই—ইহা চারি মাইলের অধিক। ডাক্তার স্কোরেস্‌বি লিখেন যে সাত মাইল রশী ছাড়িয়া দিয়াও তল পাওয়া যায় নাই। পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চতম-পর্ব্বতশৃঙ্গ পাঁচ মাইল মাত্র উচ্চ।

কিন্তু গড়ে, সমুদ্র কত গভীর, তাহা না মাপিয়াও গণিতবলে জানা যাইতে পারে। জলোচ্ছ্বাসের কারণ সমুদ্রের জলের উপর সূর্য্য চন্দ্রের আকর্ষণ। অতএব জলোচ্ছ্বাসের পরিমাণের হেতু, (১) সূর্য্য চন্দ্রের গুরুত্ব, (২) তদীয় দূরতা, (৩) তদীয় সম্বর্ত্তন কাল, (৪) সমুদ্রের গভীরতা। প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় তত্ত্ব আমরা জ্ঞাত আছি ; চতুর্থ আনরা জানি না, কিন্তু চারিটির সমবায়ের ফল, অর্থাৎ জলোচ্ছ্বাসের পরিমাণ, আমরা জ্ঞাত আছি। অতএব অজ্ঞাত চতুর্থ সমবায়ী কারণ অনায়াসেই গণনা করা যাইতে পারে। আচার্য্য হটন এই প্রকারে গণনা করিয়া

স্থির করিয়াছেন যে সমুদ্র, গড়ে, ৫.১২ মাইল, অর্থাৎ পাঁচ মাইলের কিছু অধিক মাত্র গভীর। লাপ্লাস ব্রেষ্ট নগরে জলোচ্ছ্বাস পর্য্যবেক্ষণের বলে যে "Ratio of Semidiurnal Co-efficients" স্থির করিয়াছিলেন, তাহা হইতেও এইরূপ উপলব্ধি করা যায়।

(শব্দ)

“বায়ুচর শব্দ প্রতি সেকেণ্ডে ১০৩৮ ফিট গিয়া থাকে বটে, কিন্তু বের্থেম ও ব্রেগেট নামক বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা বৈদ্যুতিক তারে প্রতি সেকেণ্ডে, ১১, ৪৫৬ সেকেণ্ড বেগে শব্দ প্রেরণ করিয়াছিলেন। অতএব তারে, কেবল পত্র প্রেরণ হয় এমত নহে; বৈজ্ঞানিক শিল্প আরও কিছু উন্নতি প্রাপ্ত হইলে মনুষ্য তারে কথোপকথন করিতে পারিবে।

মনুষ্যের কণ্ঠস্বর কত দূর যায়? বলা যায় না। কোন কোন যুবতীর ব্রীড়ারুদ্ধ কণ্ঠস্বর শুনিবার সময়ে, বিরক্তিক্রমে ইচ্ছা করে যে, নাকের চসমা খুলিয়া কাণে পরি; কোন কোন প্রাচীনার চীৎকারে বোধ হয়, গ্রামান্তরে পলাইলেও নিষ্কৃতি নাই। বিজ্ঞানবিদেরা এ বিষয়ে কি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, দেখা যাউক্।

প্রাচীনমতে আকাশ শব্দবহ; আধুনিক মতে বায়ু শব্দবহ। বায়ুর তরঙ্গে শব্দের সৃষ্টি ও বহন হয়। অতএব যেখানে বায়ু তরল ও ক্ষীণ সেখানে শব্দের অস্পষ্টতা সম্ভব। ব্লাঙ্ শৃঙ্গোপরি শব্দ অস্পষ্টশ্রাব্য বলিয়া শস্যোর বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন তথায় পিস্তল ছুঁড়িলে পটকার মত শব্দ হয়; এবং শ্যাম্পেন খুলিলে কাকের শব্দ প্রায় শুনিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু মার্থ্যুস বলেন যে তিনি সেই শৃঙ্গোপরেই ১৩৪০ ফিট হইতে মনুষ্য কণ্ঠ শুনিয়াছিলেন। এ বিষয় “গগন পর্য্যটন” প্রবন্ধে কিঞ্চিৎ লেখা হইয়াছে।

যদি শব্দবহ বায়ুকে চোঙ্গার ভিতর রুদ্ধ করা যায়, তবে মনুষ্যকণ্ঠ যে অনেক দূর হইতে শুনা যাইবে, ইহা বিচিত্র নহে। কেন না শব্দতরঙ্গ সকল ছড়াইয়া পড়িবে না। বিও নামক বিজ্ঞানবিৎ, পারিসের লৌহনির্ম্মিত জলপ্রণালী মুখে কর্ণ রাখিয়া ৩১২০ ফিট হইতে ফ্লুটের গীত শুনিতে পাইয়াছিলেন। ফ্লুট কি, অতি মৃদু কাণে কাণে কথা শুনিতে পাইয়াছিলেন। যদি কেহ আপনার ঘরে খাটে শুইয়া, গৃহান্তরে বন্ধু প্রতিবাসীর সঙ্গে কথোপকথন করিতে চাহেন, তবে দুই গৃহের মধ্যে চোঙ্গা নির্ম্মাণ করিলেই তাহা পারেন।

স্থির জল, চোঙ্গার কাজ করে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উচ্চতায় বায়ু প্রতিহত হইতে পায় না—এজন্য শব্দতরঙ্গ সকল, ভগ্ন হইয়া নানা দিগ্ দিগন্তরে বিকীর্ণ হয় না। এই জন্য প্রশস্ত নদীর এ পার হইতে ডাকিলে ও পারে শুনিতে পায়। বিখ্যাত হিমকেন্দ্রানুসারী পর্য্যটক পারির সমভিব্যাহারী লেপ্টেনাণ্ট ফষ্টর লিখেন যে, তিনি

পোর্ট বৌয়েনের এ পার হইতে পরপারে স্থিত মনুষ্যের সহিত কথোপকথন করিয়াছিলেন। উভয়ের মধ্যে ১০ মাইল ব্যবধান। ইহা আশ্চর্য্য বটে।

কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়কর ব্যাপার ডাক্তার ইয়ং কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছে। তিনি বলেন যে, জিব্রল্টরে দশ মাইল হইতে মনুষ্য কণ্ঠ শুনা গিয়াছে। কথা বিশ্বাসযোগ্য কি ?

(জ্যোতিস্তরঙ্গ)

প্রবন্ধান্তরে কথিত হইয়াছে যে, আলোক ইথর নামপ্রাপ্ত বিশ্বব্যাপী জাগতিক তরল পদার্থের আন্দোলনের ফল মাত্র। সূর্য্যালোক, সপ্তবর্ণের সমবায়; সেই সপ্তবর্ণ ইন্দ্রধনু অথবা স্ফাটিক প্রেরিত আলোকে লক্ষিত হয়। প্রত্যেক বর্ণের তরঙ্গ সকল পৃথক্ পৃথক্ : তাহাদিগের প্রাকৃতিক সমবায়ের ফলে, শ্বেত রৌদ্র। এই সকল জ্যোতিস্তরঙ্গবৈচিত্রই জগতের বর্ণবৈচিত্রের কারণ। কোন কোন পদার্থ, কোন কোন বর্ণের তরঙ্গ সকল রুদ্ধ করিয়া, অবশিষ্টগুলি প্রতিহত করে। আমরা সে সকল দ্রব্যকে প্রতিহত তরঙ্গের বর্ণ বিশিষ্ট দেখি।

তবে তরঙ্গেরই বা বর্ণ-বৈষম্য কেন ? কোন তরঙ্গ রক্ত, কোন তরঙ্গ পীত, কোন তরঙ্গ নীল কেন ? ইহা কেবল তরঙ্গের বেগের তারতম্য। প্রতি ইঞ্চি স্থান মধ্যে একটি নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার তরঙ্গের উৎপত্তি হইলে, তরঙ্গ রক্তবর্ণ, অন্য নির্দ্দিষ্ট সংখ্যায় তরঙ্গ পীতবর্ণ, ইত্যাদি।

যে জ্যোতিস্তরঙ্গ এক ইঞ্চি মধ্যে ৩৭, ৬৪০ বার প্রক্ষিপ্ত হয়; এবং প্রতি সেকেণ্ডে ৪৫৮,০০০,০০০,০০০,০০০ বার প্রক্ষিপ্ত হয়, তাহা রক্তবর্ণ। পীত তরঙ্গ, এক ইঞ্চিতে ৪৪০০০ বার এবং প্রতি সেকেণ্ডে ৫৩৫,০০০,০০০,০০০,০০০ বার প্রক্ষিপ্ত হয়। এবং নীল তরঙ্গ প্রতি ইঞ্চিতে ৫১, ১১০ বার এবং প্রতি সেকেণ্ডে ৬২২, ০০০,০০০,০০০,০০০ বার প্রক্ষিপ্ত হয়। পরিমাণের রহস্য ইহা অপেক্ষা আর কি বলিব ? এমন অনেক নক্ষত্র আছে যে, তাহার আলোক পৃথিবীতে পঞ্চাশ বৎসরেও পৌঁছে না। সেই নক্ষত্র হইতে যে আলোক-রেখা আমাদের নয়নে আসিয়া লাগে, তাহার তরঙ্গ সকল, কতবার প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে ? এবার যখন, রাত্রে আকাশ প্রতি চাহিবে, তখন এই কথাটি একবার মনে করিও।

(সমুদ্র তরঙ্গ)

এই অচিন্ত্য বেগবান্ সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্ম, জ্যোতিস্তরঙ্গের আলোচনার পর, পার্থিব জলের তরঙ্গমালার আলোচনা অবিধেয় নহে। জ্যোতিস্তরঙ্গের বেগের পরে, সমুদ্রের ঢেউকে অচল মনে করিলেও হয়। তথাপি সাগর তরঙ্গের বেগ মন্দ নহে। ফিট্রো সাহেব প্রমাণ করিয়াছেন যে অতি বৃহৎ সাগরোর্ম্মি সকল ঘণ্টায় ২০ মাইল

হইতে ২৭।। মাইল পর্য্যন্ত বেগে ধাবিত হয়। স্কোরেসবি সাহেব গণনা করিয়াছেন যে আটলান্টিক সাগরের তরঙ্গ ঘণ্টায় প্রায় ৩৩ মাইল চলে। এই বেগ ভারতবর্ষীয় বাষ্পীয় রথের বেগের অপেক্ষা ক্ষিপ্রতর।

যাঁহারা বাঙ্গালার নদীবর্গে নৌকারোহণ করিতে ভীত, সাগরোর্ম্মির পরিমাণ সম্বন্ধে তাঁহাদের কিরূপ অনুমান, তাহা বলিতে পারি না। উপকথায় "তালগাছ প্রমাণ ঢেউ" শুনা যায়—কিন্তু কেহ তাহা বিশ্বাস করে না। সমুদ্রে তদপেক্ষা উচ্চতর ঢেউ উঠিয়া থাকে। ফিণ্ডলে সাহেব লিখেন ১৮৪৩ অব্দে কর্ণালের নিকট ৩০০ ফিট অর্থাৎ ২০০ হাত উচ্চ ঢেউ উঠিয়াছিল। ১৮২০ সালে নরওয়ে প্রদেশের নিকট ৪০০ ফিট পরিমিত ঢেউ উঠিয়াছিল।

সমুদ্রের ঢেউ অনেক দূর চলে। উত্তমাশা অন্তরীপে উদ্ভূত মগ্ন-তরঙ্গ তিন সহস্র মাইল দূরস্থ উপদ্বীপে প্রহৃত হইয়া থাকে। আচার্য্য বাচ বলেন যে, জাপান দ্বীপাবলীর অন্তর্গত সৈমোদা নামক স্থানে একদা ভূমিকম্প হয়। তাহাতে ঐস্থান সমীপস্থ "পোতাশ্রয়ে" এক বৃহৎ উর্ম্মি প্রবেশ করিয়া, সরিয়া আসিলে পোতাশ্রয় জল শূন্য হইয়া পড়ে। সেই ঢেউ প্রশান্ত মহাসাগরের পরপারে, সানফ্রান্সিস্কো নগরের উপকূলে প্রহৃত হয়। সৈমোদা হইতে ঐ নগর ৪৮০০ মাইল ব্যবধান। ঐ ৪৮০০ মাইল তরঙ্গরাজ ১২ ঘণ্টা ১৬ মিনিটে পার হইয়াছিলেন অর্থাৎ মিনিটে ৬।। মাইল চলিয়া ছিলেন।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা

রিপুবিহার। শ্রীমহিমাচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত। কলিকাতা কাব্যপ্রকাশ যন্ত্র। এখানি কাব্য গ্রন্থ। ভূমিকা এইরূপে আরম্ভ হইয়াছে ;—

“সাহিত্য-সংসার মধ্যে কাব্য একটি মনোহর পুষ্পোদ্যান স্বরূপ, তাহাতে বিমল পরিমল পরিপূরিত পদ-প্রসূনরাজী সর্ব্বদা বিকসিত হইয়া সুরসিক ভাবুক ভ্রমণকারীর চিত্ত অনুরঞ্জিত করে। আমি একদা ভাবুক ভাবে ঐ মনোহর পুষ্পোদ্যানে পরিভ্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। কষ্টে তাহার প্রকোষ্ঠে প্রবিষ্ট হইয়া দেখি” ইত্যাদি।

আর কি গ্রন্থের পরিচয় দিতে হইবে? যদি হয়, তবে এক স্থান হইতে নিম্নলিখিত কয় পংক্তি উদ্ধার করিলাম—

রিপুদল দুরাচার কদাচারে রত।
বিষম বিলাসি—মতি না হয় বিগত॥
প্রভুতা প্রভূত মান, করেছে প্রয়াণ।
তাহাতে তাড়িত হয়ে মনে অভিমান॥
বিশঙ্ক বিপক্ষগণ, বলিষ্ঠ প্রধান।
সহজত “নয় ভারী, বিজয় বিধান॥”
কেমনে এমন ধনে, হইবে বিরত।
অচির-উদিত-ভানু, চির অস্তগত॥
বাসনা বিরোধ হেতু বিরোধীর সনে।
ভাবিয়া ভয়াল দলে, ভয়োদিত মনে॥ ইত্যাদি

পাঠক কি ইহার কিছু বুঝিয়াছেন? না বুঝিয়া থাকেন, “প্রভুতা প্রভূত” এবং “ভাবিয়া ভয়াল দলে, ভয়োদিত মনে” পড়িয়া সুখী হইয়াছেন সন্দেহ নাই। আমরা ইহা পড়িয়া বলিতে পারি যে “সাহিত্য-সংসার মধ্যে কাব্য একটি মনোহর পুষ্পোদ্যান স্বরূপ, ইহাতে রিপুবিহার প্রভৃতি নানা প্রকার আগাছা জন্মে। আগাছাগুলি কাটিয়া আপা ধরান, গৃহস্থ লোকের কর্ত্তব্য।

বেহুলা নখিন্দর। নাম চম্পূকাব্যম্। গবর্ণমেণ্ট বৃত্তিভোগী হুগলী বিদ্যালয় ভূতপূর্ব্ব পণ্ডিত শ্রীভগবচ্চন্দ্র বিশারদ প্রণীতম্। কলিকাতা রাজধান্যাং বি এন্স যন্ত্রে মুদ্রিতম্।

বেহুলার প্রাচীন উপখ্যান অবলম্বন করিয়া এই গ্রন্থখানি রচিত হইয়াছে। এখানি সংস্কৃত। ইহার উদ্দেশ্য, আধুনিক বিদ্যার্থিবর্গের উপকার। গ্রন্থখানি সেই জন্য অতি সরল সংস্কৃতে লিখিত হইয়াছে।

বিশারদ মহাশয় বিখ্যাত পণ্ডিত। তাঁহার নিকট বঙ্গদর্শনের গ্রন্থ-সমালোচকেরা অনেক ঋণে বদ্ধ। শিষ্যের দ্বারা অধ্যাপকের গ্রন্থ রীতিমত সমালোচিত হইতে পারে না। তবে, ইহা বলায় বোধ হয় দোষ নাই যে, সংস্কৃত কাব্যামোদী পণ্ডিতেরা এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া সুখী হইবেন। এবং শিক্ষার্থিগণ উপকৃত হইবেন। তবে, অনেকের এরূপ বোধ আছে যে, আধুনিক লেখকের গ্রন্থ হইতে প্রাচীন ভাষা শিক্ষা করা কর্ত্তব্য নহে। ইউরোপে লাটিন শিখিতে কাইসর, বর্জিল, হরেস ত্যাগ করিয়া কেহ "স্কুলমেন" দিগের লাটিন অধ্যয়ন করে না। কিন্তু সংস্কৃত সম্বন্ধে ইহা বলা যাইতে পারে যে ভবভূতি, শ্রীহর্ষ, ভট্টনারায়ণ প্রভৃতির গ্রন্থ সকল এক্ষণে বিদ্যার্থিগণের দ্বারা অধীত হইতেছে। তাঁহারা যখন লিখিয়াছিলেন, তখনও সংস্কৃত ভারতবর্ষের চলিত ভাষা ছিল না—এক্ষণকার ন্যায় পণ্ডিতের ভাষা ছিল মাত্র। অতএব, ভাষা জ্ঞানে তাঁহাদিগেরও যেরূপ বুৎপত্তি সম্ভাবনা, আধুনিক লেখকেরও সেইরূপ।

তৃতীয় বর্ষ : চতুর্থ সংখ্যা

বাঙ্গালির এক্ষণে উন্নতির আকাঙ্ক্ষা অত্যন্ত প্রবল হইয়াছে। সর্ব্বদা উন্নতির জন্য ব্যস্ত। অনেকে তদ্বিষয়ে বিশেষ গুরুতর আশা করেন না। কেন না বাঙ্গালির বাহুবল নাই। বাহুবল ভিন্ন উন্নতি নাই, ইহা তাঁহাদিগের বিশ্বাস।

বাঙ্গালির বাহুতে বল নাই, ইহা সত্যকথা। কখন হইবে কি না, এ কথার মীমাংসার পূর্ব্বে দেখা যাউক কখন ছিল কি না।

বাঙ্গালার পুরাবৃত্ত নাই। যাহা বাঙ্গালার পুরাবৃত্ত বলিয়া পাঠশালার বালকগণ কর্তৃক অধীত হইয়া থাকে, তাহা বাস্তবিক বাঙ্গালার পুরাবৃত্ত নহে, বাঙ্গালার মুসলমানদিগের পুরাবৃত্ত। উহা বাঙ্গালির দাসত্বের পুরাবৃত্ত; বাঙ্গালার অধঃপাতের ইতিহাস। সত্য বটে, যেমন বাঙ্গালার পূর্ব্বাবস্থার কোন লিখিত বৃত্ত নাই, সেইরূপ ভারতবর্ষের অন্যান্যাংশেরও নাই। নাই, কিন্তু আধুনিক প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা অনুসন্ধানে অনেক কথা জানিয়াছেন। পশ্চিম ভারতের, মধ্য ভারতের, দক্ষিণ ভারতের পূর্ব্ব গৌরবের অনেক প্রমাণ পাইয়াছেন। পুরাবৃত্ত থাক্ বা না থাক্, ইহা জানা আছে যে, মৌর্য্যবংশীয় ও গুপ্তবংশীয় সম্রাটেরা হিমাচল হইতে নর্ম্মদা পর্য্যন্ত এক ছত্রে শাসিত করিয়াছিলেন; জানা আছে দিগ্বিজয়ী যুনানীগণ শতদ্রু অতিক্রম করিতে সক্ষম হয় নাই; জানা আছে সেই বীরেরা, আসিয়ার মধ্যে ভারতবাসীরই বীরত্বেরই প্রশংসা করিয়াছিলেন; জানা আছে যে তাঁহারা চন্দ্রগুপ্ত দ্বারা ভারতভূমি হইতে উন্মূলিত হইয়াছিলেন; জানা আছে, হর্ষবর্দ্ধনের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বহুশত করপ্রদ রাজা অনুসরণ করিতেন; জানা আছে, দিগ্বিজয়ী আরবেরা তিনশতবৎসরে পশ্চিম ভারতবর্ষ অধিকার করিতে পারে নাই। এইরূপ আরও অনেক কথা জানা গিয়াছে। পশ্চিম ভারতবর্ষীয়দিগের বীর্য্যবত্তার অনেক চিহ্ন অদ্যাপি ভারতভূমে আছে।

বাঙ্গালার পূর্ব্ব বীরত্ব, পূর্ব্ব গৌরবের কি জানা আছে? কেবল ইহাই জানি যে যখন পশ্চিম ভারতে বেদ সৃষ্ট ও অধীত হইতেছিল, উপনিষদ্ সকল প্রণীত

হইতেছিল, অযোধ্যার ন্যায় সর্ব্বসম্পদশালিনী নগরী সকল স্থাপিতা এবং অলঙ্কৃতা হইতেছিল—বাঙ্গালা তখন অনার্য্য ভূমি, আর্য্যগণের বাসের অযোগ্য বলিয়া পরিত্যক্ত। (১) কেবল ইহাই জানি যে যখন উত্তর ভারতে, সমস্ত আর্য্য বীরগণ একত্রিত হইয়া, কুরুক্ষেত্রজিত রাজ্যখণ্ড সকল বিভাগ করিতেছিলেন, যখন পশ্চিমে মন্বাদি অমর, অক্ষয় ধর্ম্মশাস্ত্র সকল প্রণীত হইতেছিল, তখন বঙ্গদেশে পৌণ্ড্র প্রভৃতি অনার্য্য জাতির বাস। প্রাচীন কাল দূরে থাকুক, যখন মধ্যকালে, চৈনিক পরিব্রাজক হোয়েন্থ সাঙ বঙ্গদেশপর্য্যটনে আসেন, তখন তিনি দেখিয়াছিলেন যে, এই প্রদেশ গৌরবশূন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত। বঙ্গদেশের পূর্ব্বগৌরব কোথায়?

তবে, ইহার পরে শুনা যায় যে, পাল বংশীয় ও সেনবংশীয় রাজগণ, বৃহৎ রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, এবং গৌড় নগরী বড় সমৃদ্ধিশালিনী হইয়াছিল। কিন্তু এমত কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না যে তাঁহারা এই বাহুবলশূন্য বাঙ্গালি জাতি এবং তাঁহাদিগের প্রতিবাসী তদ্রূপ দুর্ব্বল অনার্য্যজাতিগণ ভিন্ন অন্য কাহাকে আপন অধিকারভুক্ত করিয়াছিলেন। এই মাত্র প্রমাণ আছে বটে যে মুঙ্গের পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের অধিকারভুক্ত ছিল। অন্যত্র তাঁহাদিগের অধিকার বিস্তার সম্বন্ধে তিনটি মাত্র কথা আছে, তিনটিই অমূলক।

প্রথম। কিম্বদন্তী আছে যে, দিল্লীতে বল্লালসেনের অধিকার ছিল। এ কথা একখানি দেশীগ্রন্থে লিখিত থাকিলেও নিতান্ত অমূলক এবং জেনেরল কনিঙহাম সাহেব তাহার অমূলকতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। বঙ্গেশ্বর বল্লাল সেনের অধিকার দিল্লী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইলে, এরূপ বৃহৎ ব্যাপার ঘটিত যে, তাহা হইলে অবশ্য একখানি সামান্য গ্রন্থে উল্লেখ ভিন্ন অন্য প্রমাণ অবশ্য পাওয়া যাইত। বঙ্গ হইতে দিল্লীর মধ্যে যে বহুবিস্তৃত প্রদেশ, তথায় বঙ্গপ্রভুত্বের কোন কিম্বদন্তী, কোন উল্লেখ, কোন চিহ্ন অবশ্য থাকিত। কিছু নাই।

দ্বিতীয়। ১৭৯৪ সালে গৌড়েশ্বর মহীপাল রাজের একখানি শাসন কাশীতে পাওয়া গিয়াছিল তাহা হইতে কেহ কেহ অনুমান করেন কাশী প্রদেশ মহীপালের রাজ্যভুক্ত ছিল। এক্ষণে সেমত পরিত্যক্ত হইতেছে। (২)

তৃতীয়। লক্ষণ সেনের দুই একখানি তাম্রশাসনে তাঁহাকে প্রায় সর্ব্বদেশ জেতা বলিয়া বর্ণনা করা আছে। পড়িলেই বুঝা যায় যে, সে সকল কথা চাটুকার কবির কল্পনা মাত্র।

---

(১) বঙ্গদর্শনের দ্বিতীয় খণ্ডে "বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার" দেখ।

(২) See Introduction to Sherring's Sacred City of the Hindus, by F. E. Hall. p xxxv, Note 2.

অতএব পূর্ব্বকালে বাঙ্গালিরা যে বাহুবলশালী ছিলেন এমত কোন প্রমাণ নাই। পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষস্থ অন্যান্য জাতি যে বাহুবলশালী ছিলেন, এমত প্রমাণ অনেক আছে, কিন্তু বাঙ্গালিদিগের বাহুবলের কোন প্রমাণ নাই। হোয়েন্থ সাঙ "সমতট" রাজ্যবাসীদিগের যে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা পড়িয়া বোধ হয় পূর্ব্বে বাঙ্গালিরা এইরূপ, খর্ব্বাকৃতি দুর্ব্বল গঠন ছিল।

বাঙ্গালিদিগের বাহুবল কখন ছিল না, কিন্তু কখন হইবে কি ?

বৈজ্ঞানিক ভবিষ্যৎ উক্তির নিয়ম এই যে যেরূপ হইয়াছে, সেই অবস্থায় সেইরূপ হইবে। যে যে কারণে বাঙ্গালি চিরকাল দুর্ব্বল, সেই সেই কারণ যতদিন বর্ত্তমান থাকিবে, ততদিন বাঙ্গালিরা বাহুবলশূন্য থাকিবে। সে সকল কারণ কি ?

আধুনিক বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকদিগের মতে, সকলই বাহ্য প্রকৃতির ফল। বাঙ্গালির দুর্ব্বলতাও বাহ্য প্রকৃতির ফল। ভূমি, জলবায়ু এবং দেশাচারের ফলে বাঙ্গালিরা দুর্ব্বল, ইহাই প্রচলিত মত। সেই সকল মতগুলির, সংক্ষেপতঃ উল্লেখ করিতেছি।

কেহ কেহ বলেন, এদেশের ভূমি অত্যন্ত উর্ব্বরা—অল্প পরিশ্রমেই শস্যোৎপাদন হইতে পারে। সুতরাং বাঙ্গালিকে অধিক পরিশ্রম করিতে হয় না। পরিশ্রম অধিক না করিলে শরীরে বলাধান হয় না। বঙ্গভূমির উর্ব্বরতা বঙ্গবাসীর দুর্ব্বলতার কারণ।

তাঁহারা আরও বলেন যে ভূমি উর্ব্বরা হইলে, আহারের জন্য মৃগয়া পশুহননাদির আবশ্যকতা হয় না। পশুহনন ব্যবসায় বল, সাহস ও পরিশ্রমের কার্য্য। মনুষ্যকে সর্ব্বদা নিরত রাখে, এবং তাহাতে ঐ সকল গুণ অভ্যস্ত এবং স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয়।

দেখা যাইতেছে যে বঙ্গদেশ ভিন্ন আরও উর্ব্বর দেশ আছে। ইউনাইটেড ষ্টেটসের অনেক অংশ বঙ্গদেশাপেক্ষায় উর্ব্বরতায় ন্যূন নহে। সেই আমেরিকাবাসীদিগের বলের পরিচয় দাসত্বের যুদ্ধে বিলক্ষণ পাওয়া গিয়াছে। তাঁহাদিগের ভয়ে আজি কালি, ইউরোপের দুর্দ্দান্ত বলশালী জাতিরাও তটস্থ। তবে বলা যাইতে পারে ইহারা তরুণ জাতি। উর্ব্বরতার কুফল আজিও আমেরিকায় ফলে নাই।

ইটালি ও গ্রীসের ভূমিও অত্যন্ত উর্ব্বরা। আধুনিক গ্রীসীয় ও ইতালীয়গণ বলশালী বলিয়া বিখ্যাত নহেন বটে, কিন্তু এককালে সেই উর্ব্বর প্রদেশবাসিগণ পৃথিবী জয় করিয়াছিল। তখন কি সে সকল দেশের ভূমি উর্ব্বরা ছিল না ?

অনেকে বলেন জলবায়ুর দোষে বাঙ্গালিরা দুর্ব্বল। যে দেশের বায়ু আর্দ্র অথচ তাপযুক্ত, সে দেশের লোক দুর্ব্বল। কেন হয়, তাহা শারীরতত্ত্ববিদেরা ভাল

করিয়া বুঝান নাই। বায়ুর আর্দ্রতা সম্বন্ধে একটি কথা আছে। বায়ু যে পরিমাণে উষ্ণ তাহাতে সেই পরিমাণে অদৃশ্য জলকণা গুপ্ত ভাবে থাকে। বায়ুতত্ত্ববিদেরা ইহাকে "Saturation" বলেন। বায়ুর তাপানুযায়ী জল বায়ুমধ্যে থাকিলে, কখন সে বায়ুকে আর্দ্র বলা যায় না। কেন না, সেটুকু তাপেরই আনুষঙ্গিক। সে পরিমাণের জলসিক্ততার যে দোষ, তাহা তাপের ফল মাত্র। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য যে, বাঙ্গালার বায়ু যে বাঙ্গালির দুর্ব্বলতার কারণ, সে কি কেবল তাপের কারণে, না তাপের যাহা ধারণীয়, তাহার অতিরিক্ত জলসিক্ততার কারণে?

কেবল তাপে কখন এরূপ ঘটিতে পারেনা। যদি ঘটিত, তবে আরবগণ দিগ্বিজয়ী হইল কি প্রকারে? আরবের ন্যায় কোন দেশ তপ্ত? আরবীয়ের ন্যায় বলবান্ কে? ভারতবর্ষের অনেক প্রদেশ এমত আছে যে, বঙ্গদেশের ন্যায় তাপশালী। কিন্তু উড়িষ্যা ও আসাম ভিন্ন কোন্ দেশের লোক বাঙ্গালির ন্যায় দুর্ব্বল? তবে, যদি বলেন, বায়ুর ধারণাশক্তির অতিরিক্ত জলসিক্ততাই পীড়ার কারণ, তাহা হইলে প্রমাণ করিতে হইবে বঙ্গদেশের বায়ু ধারণাশক্তির অতিরিক্ত জল ধারণ করে। বাস্তবিক তাহা নহে। বঙ্গদেশের বায়ু ইংলণ্ডের বায়ু হইতেও শুষ্ক। যিনি এই বিস্ময়কর কথায় অবিশ্বাস করিবেন তিনি নিম্নোক্ত টীকা পাঠ করিবেন। (৩)

অনেকে মোটামুটি বলেন যে জলসিক্ত তাপযুক্ত বায়ু অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর, তন্নিবন্ধন বাঙ্গালিরা নিত্য রুগ্ন, এবং তাহাই বাঙ্গালির দুর্ব্বলতার কারণ।

যদি তাহা সত্য হয়, তাহা হইলে বাঙ্গালা দেশের মধ্যেই বল সম্বন্ধে অনেক তারতম্য দেখা যাইত। বাঙ্গালা অতি বৃহদ্দেশ, উহার মধ্যে অনেক প্রকার জল বায়ু আছে। রঙ্গপুর, দিনাজপুর, যেরূপ অস্বাস্থ্যকর, মেদিনীপুর, বীরভূম ঠিক তাহার বিপরীত। এ কথা সত্য হইলে, রঙ্গপুর দিনাজপুর অঞ্চলের লোক অপেক্ষা, মেদিনীপুর বীরভূম প্রদেশের লোক, এবং পার্ব্বত্য বন্যজাতি সকল সবল হইবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু সকলেই সমান দুর্ব্বল, কোন তারতম্য দেখা যায় না।

---

(৩) The high humidity of the atmosphere in Bengal, and more especially in its eastern districts, has become proverbial; and if the term be used in reference to the quantity of vapour in the air as measured by its tension, the popular belief is justified by observation. But if used in the more usual sense of relative humidity, that is, as referring to the percentage of vapour in the air in proportion to that which would saturate it, the average annual humidity of a large part of Bengal is sensibly lower than that of England. A comparative

অনেকে বলেন, অন্নই অনর্থের মূল। এদেশের ভূমির প্রধান উৎপাদ্য চাল, এবং এ দেশের লোকের খাদ্য ভাত। ভাত অতি অসার খাদ্য, তাহাতেই বাঙ্গালির শরীর গঠে না। এজন্য "ভেতো বাঙ্গালি" বলিয়া বাঙ্গালির কলঙ্ক হইয়াছে।

---

table is subjoined of the mean vapour tension and relative humidity of London and Calcutta in each month of the year, and the mean of the whole year; the data for the former place being taken from an essay on the climate of London by the late Professor Daniell, those for the latter from the results of the hourly observations registered at Surveyer General's Office Calcutta, and computed in the Meteorological Office of Bengal. The former are deduced from 17 Year's, the latter from 14 Year's observations.

Mean Vapour Tension in Thousandths of an inch.

	Jan.	Feb.	Mar.	Apl.	May.	Jun.	Jul.	Aug.	Sept	Oct.	Nov.	Decm.	Average.
London.	·245	·264	·280	·315	340	·490	·534	530	·466	·389	·310	·281	·376. inch.
Calcutta.	·487	·349	·695	·805	·889	·947	·954	·950	950	828	605	·489	·762.

Mean Relative Humidity :—Saturation 100.

	Jan.	Feb.	Mar.	Apl.	May.	Jun.	Jul.	Aug.	Sept	Oct.	Nov.	Decm.	Year.
London.	97	94	89	84	82	82	84	85	91	94	96	97	89
Calcutta.	71	68	67	69	73	81	85	86	85	78	73	72	76

The quantity of vapour in the air of Calcutta, relatively to the dry air, is then, on the average of the year, about twice as great as in that of London; but the relative humidity of the former equals that of the latter only in the three first months of the rains, which are among the driest months of an European climate.—Bengal Administration Report, 1872-73, Statestical Summary page. 5-6.

শারীরতত্ত্ববিদেরা বলেন যে, খাদ্যের রাসায়নিক বিশ্লেষণ সম্পাদন করিলে দেখা যায় যে, তাহাতে ষ্টার্চ্চ, গ্লুটেন, প্রভৃতি কয়েকটি সামগ্রী আছে। গ্লুটেন নাইট্রোজন প্রধান সামগ্রী। তাহাতেই শরীরের পুষ্টি। মাংসপেষী প্রভৃতির পুষ্টির জন্য এই সামগ্রীর বিশেষ প্রয়োজন। ভাতে, ইহা অতি অল্প পরিমাণে থাকে। মাংসে বা গমে ইহা অধিক পরিমাণে থাকে। এই জন্য মাংসভোজী এবং গোধূম-ভোজীদিগের শরীর অধিক বলবান্—"ভেতো" জাতির শরীর দুর্ব্বল। ময়দায় গ্লুটেন, শত ভাগে দশ ভাগ থাকে ; (৪) মাংসে (Fibrin বা Musculine) ১৯ ভাগ, (৫) এবং ভাতে ৭ কি ৮ ভাগ মাত্র থাকে (৬)। সুতরাং বাঙ্গালি দুর্ব্বল হইবে বৈ কি ?

ইহাতে জনষ্টোন বলেন যে বাঙ্গালি "ভাতে পুষিয়া লয়"—অর্থাৎ এত ভাত খায় যে, সকলেরই পেটের খোল বাড়িয়া গিয়া পেট "নেও" হইয়া পড়ে। সুতরাং গ্লুটেনের মাত্রা সমান হইয়া যায়। আরও দাল, কলাই, মাছ, দুগ্ধ প্রভৃতিতে গ্লুটেন যথেষ্ট আছে,—তাহাতেও ভাতের দোষ সারিতে পারে।

তাহা ভিন্ন আরও একটি কথা আছে। ইংরেজ সৈন্য বড় বলবান্। তন্মধ্যে আইরিষ সৈনিক দিগের বিশেষ যশ। তাহারা বড় বলবান্ ও সাহসী। আয়র্লণ্ডের প্রধান খাদ্য, আলু। আলুতে গ্লুটেন চালের ন্যায় অতি অল্প। শত ভাগের মধ্যে আট ভাগ মাত্র (৭) যদি আলু-খেকো আয়রিষ বীর পুরুষ হইল, তবে ভেতো বাঙ্গালি দুর্ব্বল হইল কি দোষে ?

কেহ কেহ বলেন, বাল্যবিবাহই বাঙ্গালির পরম শত্রু—বাল্যবিবাহের কারণেই বাঙ্গালির শরীর দুর্ব্বল। যে সন্তানের মাতাপিতা অপ্রাপ্তবয়ঃ, তাহার শরীর ও বল চিরকাল অসম্পূর্ণ থাকিবে, এবং যাহারা অল্পবয়স হইতে ইন্দ্রিয় সুখে নিরত, তাহারা বলবান্ হইবার সম্ভাবনা কি ?

এতৎ সম্বন্ধে আমাদিগের একটি কৌতুকাবহ কথা মনে হয়। এ দেশের মনুষ্য যে প্রকার দুর্ব্বল ও ক্ষুদ্রাকার, এ দেশের গোবৃষ, অশ্ব, ছাগ প্রভৃতিও সেইরূপ। বঙ্গীয় মনুষ্যের ন্যায় বঙ্গীয় পশুগণও কি বাল্যবিবাহপরায়ণ ? ইহা কি সত্য যে সভ্য দেশের পশুগণও সভ্য এবং কুসংস্কারশূন্য বলিয়া বাল্য বিবাহে বিমুখ—কেবল বাঙ্গালিপশুই অকালে ইন্দ্রিয় সুখেচ্ছু ?

---

(৪) Johnstone's Chemistry of Common Life, Vol. 1, p 100.

(৫) Ibid, p 125,

(৬) Ibid, 101.

(৭) Ibid, p 115.

বাঙ্গালি মনুষ্যেরই কি, এবং বাঙ্গালি পশুরই কি, দুর্ব্বলতা যে জলবায়ু বা মৃত্তিকার গুণ, তাহা সহজেই বুঝা যায়। কিন্তু জলের, বা বায়ুর বা মৃত্তিকার কোন দোষের এই কুফল, তাহা কোন পণ্ডিতে অবধারিত করেন নাই।

কিন্তু এই দুর্ব্বলতার যে সকল কারণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে বা উল্লিখিত হইল, তাহাতে এমত ভরসা করা যায় না যে অল্পকালে, সে দুর্ব্বলতা দূর হইবে। তবে, ইহাও বলা যাইতে পারে যে, এমত কোন নিশ্চয়তা নাই যে কোন কালে, এ সকল কারণ অপনীত হইতে পারে না। বাল্যবিবাহই যদি এ দুর্ব্বলতার কারণ হয়, তবে এমন ভরসা করা যাইতে পারে যে সামাজিক রীতির পরিবর্ত্তনে এ কুপ্রথা সমাজ হইতে দূর হইবে; এবং বাঙ্গালির শরীরে বলসঞ্চার হইবে। যদি চাল এ অনিষ্টের কারণ হয়, তবে, এমন ভরসা করা যাইতে পারে যে গোধূমাদির চাস এ দেশে বৃদ্ধি করাইলে, বাঙ্গালি ময়দা খাইয়া বলিষ্ঠ হইবে। এমন কি কালে জলবায়ুও পরিবর্ত্তন হইতে পারে। ভূগর্ভস্থ পদার্থের বলে, ভূমি ক্রমশঃ উর্দ্ধোত্থান, ক্রমশঃ নিমজ্জন করে—তাহাতে জলবায়ুর পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। এক্ষণে মনুষ্য বাসের অযোগ্য যে সুন্দরবন তাহা এককালে বহুজনাকীর্ণ ছিল, এমত প্রমাণ আছে। ভূতত্ত্ববিদেরা বলেন যে, ইউরোপীয় অনেক প্রদেশ, এক্ষণকার অপেক্ষা উষ্ণতর ছিল, এবং তথায় সিংহ হস্তী প্রভৃতি উষ্ণদেশবাসী জীবের আবাস ছিল। আবার এককালে সেই সকল প্রদেশ হিমশিলায় নিমগ্ন ছিল। সে সকল যুগান্তরের কথা—সহস্র সহস্র যুগে সে সকল পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে। কিন্তু ঐতিহাসিক কালের মধ্যেও জলবায়ুশীত তাপের পরিবর্ত্তনের অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। পূর্ব্বকালে রোমনগরীর নিম্নে টৈবর নদের মধ্যে বরফ জমিয়া যাইত। এবং এক সময়ে ক্রমাগত চল্লিশদিন তাহাতে বরফ জমিয়া ছিল। কৃষ্ণ সাগরে (Euxine Sea) অবিদ নামক কবির জীবনকালে, প্রতি বৎসর শীত ঋতুতে বরফ জমিয়া যাইত। এবং রীণ এবং রণ নামক নদীদ্বয়ের উপরে তৎসময়ে বরফ এরূপ গাঢ় জমিত যে তাহার উপর দিয়া বোঝাই গাড়ি চলিত। এক্ষণে রোমে বা কৃষ্ণ সাগরে, বা উক্ত নদীদ্বয়ে বরফের নাম মাত্র নাই। কেহ কেহ বলেন, কৃষিকার্য্যের আধিক্যে, বন কাটায়, মৃত্তিকা ভগ্ন করায়, এবং ঝিল বিল বন্ধ করায় এ সকল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। যদি কৃষিকার্য্যের আধিক্য শীত প্রদেশ উষ্ণ হয়, তবে উষ্ণ প্রদেশ শীতল হইবার কারণ কি? গ্রীনলণ্ড এককালে এরূপ তাপযুক্ত প্রদেশ ছিল যে, ইহাতে উদ্ভিদের বিশেষ আধিক্যে এবং শোভা ছিল, এবং সেই জন্য উহার নাম গ্রীনলণ্ড হইয়াছিল। এক্ষণে সেই গ্রীনলণ্ড সর্ব্বদা এবং সর্ব্বত্র হিমশিলায় মণ্ডিত। এই দ্বীপের পূর্ব্ব উপকূলে, বহু সংখ্যক ঐশ্বর্য্যশালী উপনিবেশ ছিল,—এক্ষণে সে উপকূলে কেবল বরফের রাশি, এবং সেই সকল উপনিবেশের চিহ্ন মাত্র নাই।

লাব্রাডর, এক্ষণে শৈত্যাধিক্যের জন্য বিখ্যাত—কিন্তু যখন সহস্র খ্রীষ্টাব্দে নর্ম্মানেরা তথায় গমন করেন, তখন ইহারও শীতের অল্পতা দেখিয়া তাঁহারা প্রীত হইয়াছিলেন, এবং ইহাতে দ্রাক্ষা জন্মিত বলিয়া ইহার দ্রাক্ষাভূমি নাম দিয়াছিলেন। (৮)

এ সকল পরিবর্ত্তনের অতি দূর সম্ভাবনা। না ঘটিবারই সম্ভাবনা। বাঙ্গালির শারীরিক বল চিরকাল এইরূপ থাকিবে, ইহা এক প্রকার সিদ্ধ, কেন না দুর্ব্বলতার নিবার্য্য কারণ কিছু দেখা যায় না।

তবে কি বাঙ্গালির ভরসা নাই? এ প্রশ্নে আমাদের দুইটি উত্তর আছে।

প্রথম উত্তর। শারীরিক বলই অদ্যাপি পৃথিবী শাসন করিতেছে বটে। কিন্তু শারীরিক বল পশুর গুণ; মনুষ্য অদ্যাপি অনেকাংশে পশুপ্রকৃতিসম্পন্ন, এজন্য শারীরিক বলের আজিও এতটা প্রাদুর্ভাব। কিন্তু শারীরিক বল উন্নতি নহে। উন্নতির উপায় মাত্র। এ জগতে বাহুবল ভিন্ন কি উন্নতির উপায় নাই?

বাহুবলকে উন্নতির উপায়ও বলিতে পারি না। বাহুবলে, কাহারও উন্নতি হয় না। যে তাতার, ইউরোপ, আসিয়া জয় করিয়াছিল, সে কখন উন্নতাবস্থায় পদার্পণ করিল না। রুষ, বলিষ্ঠ কিন্তু অদ্যাপি উন্নত নহে। তবে বাহুবল উন্নতির পক্ষে এই জন্য আবশ্যক যে, যে সকল কারণে উন্নতির হানি হয়, সে সকল উপদ্রব হইতে আত্মরক্ষা করা চাই। সেই জন্য বাহুবলের প্রয়োজন। কিন্তু যেখানে সে প্রয়োজন নাই, সেখানে বাহুবল ব্যতীতও উন্নতি ঘটে। দুইটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে।

১ম। স্কটলণ্ড, অতি ক্ষুদ্র রাজ্য। কোনকালে বাহুবলে বিশেষ বলবান্ নহে। ইংলণ্ডীয় রাজগণ সর্ব্বদা ইহার উপর অত্যাচার করিতেন; স্কটলণ্ড কখন কষ্টে আত্মরক্ষা করিত, কখন পারিত না। এজন্য স্কটলণ্ড যত দিন, ইংলণ্ড হইতে স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল, ততদিন স্কটলণ্ডের উন্নতি ইংলণ্ড হইতে অনুন্নতর হইয়াছিল। পরে ইংলণ্ডের প্রথম জেমসের সময়ে, ইংলণ্ড ও স্কটলণ্ড এক রাজ্য হইল। স্কটলণ্ড আত্মরক্ষার দায় হইতে নিষ্কৃতি পাইল। তখন স্কটলণ্ডের উন্নতি অতি দ্রুতবেগে হইতে লাগিল। এক্ষণে স্কটলণ্ড ইংলণ্ড হইতে কোন অংশে অপেক্ষাকৃত অনুন্নত নহে। কিন্তু পূর্ব্বাপেক্ষা কোন অংশে বাহুবল বাড়ে নাই। স্কটেরা বাহুবলে বলবন্ত না হইয়াও উন্নত হইয়াছে।

২য়। গারিবল্দির সময় হইতে ইটালী কিঞ্চিৎ বাহুবল প্রদর্শন করিয়াছে। সেও অল্প দিন। আজি কালির কথা ছাড়িয়া দিয়া, পূর্ব্বাবস্থা ধরিতে হয়। পূর্ব্বাবস্থা ধরিতে গেলে আধুনিক ইটালীকে ইউরোপের মধ্যে বিশেষ বাহুবলশূন্য

---

(৮) The Scientific American.

রাজ্য বলা যাইতে পারে। কিন্তু উন্নতিতে ইটালী, কোন ইউরোপীয় রাজ্যের অপেক্ষায় লঘু নহে। কতকগুলি লঘুচেতা লোক আছেন—এদেশে আছেন, ইউরোপেও আছেন, এবং মনুষ্য জাতির দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই লেখক, তাঁহারা বাহুবলকেই উন্নতি বলেন। তাঁহারা ইটালীয়দিগকে অত্যুন্নত জাতি মধ্যে না গণিলেও গণিতে পারেন। কিন্তু যে সকল সুখের সমবায়কে জাতীয় উন্নতি বলা যায়, তাহাতে ইটালী কোন দেশের অপেক্ষা ন্যূন নহে। বরং ইহা বলা যাইতে পারে যে, এই ইটালী ও স্কটলণ্ড, এই দুই বাহুবল-বিহীন রাজ্য মধ্যে যত মহল্লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছে, এত অল্প ভূমির মধ্যে এত বহুসংখ্যক নরশ্রেষ্ঠ আর কোথাও জন্মগ্রহণ করেন নাই।

এখানেও বাহুবল ব্যতীতও উন্নতি। এখানেও আত্মরক্ষার প্রয়োজন হয় নাই। পূর্ব্বে পোপের প্রতাপে, অধুনা ইউরোপীয় শক্তিসাম্য রক্ষার হেতু প্রয়োজন হয় নাই। কেবল বিনিষিয়া, পরহস্তগত ছিল।

এই সকল কথার আলোচনা করিয়া মনে উদয় হয়, অধুনা বাঙ্গালারও আত্মরক্ষার প্রয়োজন নাই, কেন না ইংরেজ বাঙ্গালা রক্ষা করিতেছে। অতএব বাঙ্গালির উন্নতির জন্য বাঙ্গালির বাহুবলের প্রয়োজন নাই। ইংলণ্ডের অধীনে থাকিয়া ইংলণ্ডের বাহুবলরক্ষিত হইয়া, বাঙ্গালা কি ইটালী ও স্কটলণ্ডের ন্যায় উন্নত হইতে পারিবে না?

অসম্ভব কিছুই নহে—বরং সেই লক্ষণই দেখা যাইতেছে। তবে, ইংরেজের রাজ্যশাসনের যে সকল দোষ, তাঁহাদিগের ভারতীয় রাজনীতিতে যে সকল উন্নতি-নাশক নিয়ম আছে, তাহা অপনীত হওয়া চাই। দেশী বিদেশী প্রজায়, সর্ব্বপ্রকার অধিকারের সমতা চাই। ইহা নহিলে, দেশের উন্নতি নাই। ইংরেজের শাসন-প্রণালী কিয়দংশে পরিশুদ্ধ হউক। তাহা হইলেই দুর্ব্বল বাঙ্গালির উন্নতি হইবে। বরং ইংরেজের অধীনে থাকাই, বাঙ্গালির উন্নতির এক মাত্র উপায় বলিয়া বোধ হয়। কেন না যে বাহুবল, আত্মরক্ষার্থ উন্নতির পক্ষে প্রয়োজন, যাহা বাঙ্গালির নিজের নাই, বা হইবার সম্ভাবনা নাই, ইংরেজ তাহা দিতেছে—ইংরেজের বাহুবল আমাদিগের নিজের বাহুবলের কার্য্য করিতেছে।

দ্বিতীয় উত্তরে, আমরা যাহা বলিতেছি বাঙ্গালার সর্ব্বত্র, সর্ব্ব নগরে, সর্ব্ব গ্রামে সকল বাঙ্গালির হৃদয়ে তাহা লিখিত হওয়া উচিত। বাঙ্গালি শারীরিক বলে দুর্ব্বল—তাহাদের বাহুবল হইবারও সম্ভাবনা নাই—তবে কি বাঙ্গালির ভরসা নাই? এ প্রশ্নে আমাদিগের উত্তর এই যে,—শারীরিক বল বাহুবল নহে।

মনুষ্যের শারীরিক বল অতি তুচ্ছ। তথাপি হস্তী অশ্ব প্রভৃতি মনুষ্যের বাহুবলে শাসিত হইতেছে। মনুষ্যে মনুষ্যে তুলনা করিয়া দেখ। যে সকল পার্ব্বত্য

বন্য জাতি হিমালয়ের পশ্চিমভাগে বাস করে, পৃথিবীতে তাহাদের ন্যায় শারীরিক বলে বলবান্ কে ? এক একজন মেওয়াওয়ালার চপেটাঘাতে, অনেক সেলর গোরাকে ঘূর্ণ্যমান হইয়া আঙ্গুর পেস্তার আশা পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে দেখা গিয়াছে। তবে গোরা সমুদ্র পার হইয়া আসিয়া, ভারত অধিকার করিল—কাবুলির সঙ্গে ভারতের কেবল ফল বিক্রয়ের সম্বন্ধ রহিল, কেন ? অনেক ভারতীয় জাতি হইতে, ইংরেজেরা শারীরিক বলে লঘু। শারীরিক বলে, শিকেরা ইংরেজ অপেক্ষা বলিষ্ঠ। তথাপি শিক, ইংরেজের পদাবনত। শারীরিক বল, বাহুবল নহে।

উদ্যম, ঐক্য, সাহস এবং অধ্যবসায় এই চারিটি একত্রিত করিয়া, শারীরিক বল ব্যবহার করার যে ফল তাহাই বাহুবল। যে জাতির উদ্যম, ঐক্য, সাহস এবং অধ্যবসায় আছে, তাহাদের শারীরিক বল যেমন হউক না কেন, তাহাদের বাহুবল আছে। এই চারিটি বাঙ্গালির কোন কালে নাই, এজন্য বাঙ্গালির বাহুবল, কোন কালে নাই।

কিন্তু সামাজিক গতির বলে, এই চারিটি বাঙ্গালির চরিত্রে সমবেত হওয়ার অসম্ভাবনা কিছুই নাই।

বেগবৎ অভিলাষ হৃদয় মধ্যে থাকিলে উদ্যম জন্মে। অভিলাষ মাত্রেই কখন উদ্যম জন্মে না। যখন অভিলাষ এরূপ বেগ লাভ করে যে, তাহার অপূর্ণাবস্থা বিশেষ ক্লেশকর হয়, তখন অভিলষিতের প্রাপ্তির জন্য উদ্যম জন্মে। অভিলাষের অপূর্ত্তি জন্য যে ক্লেশ, তাহার এমন প্রবলতা চাহি যে, নিশ্চেষ্টতা এবং আলস্যের যে সুখ, তাহা তদ্ভাবে সুখ বলিয়া বোধ না হয়। এরূপ বেগযুক্ত কোন অভিলাষ বাঙ্গালির হৃদয়ে স্থান পাইলে, বাঙ্গালির উদ্যম জন্মিবে। ঐতিহাসিক কাল মধ্যে এরূপ কোন বেগযুক্ত অভিলাষ বাঙ্গালির হৃদয়ে কখন স্থান পায় নাই।

যখন বাঙ্গালির হৃদয়ে সেই এক অভিলাষ জাগরিত হইতে থাকিবে, যখন বাঙ্গালি মাত্রেরই হৃদয়ে সেই অভিলাষের বেগ এরূপ গুরুতর হইবে যে, সকল বাঙ্গালিই তজ্জন্য আলস্য সুখ তুচ্ছ বোধ করিবে, তখন উদ্যমের সঙ্গে ঐক্য মিশ্রিত হইবে।

সাহসের জন্য আর একটু চাই। চাই যে সেই জাতীয় সুখের অভিলাষ, আরও প্রবলতর হইবে। এত প্রবল হইবে যে তজ্জন্য প্রাণ বিসর্জ্জনও শ্রেয়োবোধ হইবে। তখন সাহস হইবে।

যদি এই বেগবৎ অভিলাষ, কিছুকাল স্থায়ী হয়, তবে অধ্যবসায় জন্মিবে।

অতএব যদি কখন (১) বাঙ্গালির হৃদয়ে কোন জাতীয় সুখের অভিলাষ প্রবল হয় (২) যদি বাঙ্গালি মাত্রেরই হৃদয়ে সেই অভিলাষ প্রবল হয়, (৩) যদি সেই প্রবলতা এরূপ হয় যে তদর্থে লোকে প্রাণপণ করিতে প্রস্তুত হয়, (৪) যদি সেই অভিলাষের বল স্থায়ী হয়, তবে বাঙ্গালির অবশ্য বাহুবল হইবে।

বাঙ্গালির এরূপ মানসিক অবস্থা যে কখন ঘটিবে না, একথা বলিতে পারা যায় না। যে কোন সময়ে ঘটিতে পারে।

অতএব বাঙ্গালির ভরসা নাই, একথা সত্য নহে; কিন্তু যাঁহারা ইংরেজের নিন্দায় সুখী, তাঁহাদিগের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, এক্ষণে বাঙ্গালির প্রধান ভরসা ইংরেজ।

চার্ব্বাকদর্শন

এতদ্দেশীয় পণ্ডিতদিগের মতে ভারতবর্ষীয় দর্শনশাস্ত্র সমূহ আস্তিক ও নাস্তিক এই দুই ভাগে বিভক্ত। যে যে দর্শনে বেদের প্রমাণ অগ্রাহ্য করা হইয়াছে, সেইগুলি নাস্তিক, যথা বৌদ্ধ ও চার্ব্বাকদর্শন; এবং যে যে দর্শনে বেদ প্রামাণ্য বলিয়া গণ্য হইয়াছে সে সমুদায় আস্তিক পদবাচ্য, যদিও তন্মধ্যে কোন কোনটি নিরীশ্বর, যথা কাপিল ও জৈমিনি দর্শন। যে সাংখ্যে ঈশ্বর অসিদ্ধ এবং যে পূর্ব্বমীমাংসায় মন্ত্রাতিরিক্ত দেবতার অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় নাই, সে সাংখ্য ও মীমাংসা আস্তিক; এবং বেদ বহির্ভূত বৌদ্ধ সর্ব্বসৃষ্টিকর্ত্তা আদি বৌদ্ধ মানিলেও নাস্তিক। ধন্য শব্দ প্রয়োগের কৌশল! এতৎ প্রবন্ধে আমরা নাস্তিক দর্শনান্তর্গত চার্ব্বাক-দর্শনের সমালোচনা করিব।

কয়েকটি প্রধান বিষয়ে এতদ্দেশীয় অপর সমুদায় দর্শনের সহিত চার্ব্বাক-দর্শনের বিবাদ। উত্তর ও পূর্ব্ব মীমাংসা, ন্যায় ও বৈশেষিক, সাংখ্য, যোগ ও বৌদ্ধ সকল দর্শনেই পরলোক স্বীকৃত হইয়াছে। কেবল চার্ব্বাক-মতাবলম্বীরাই পরলোক মানেন না। এজন্য চার্ব্বাকদর্শনের আর একটি নাম লোকায়তদর্শন, কেন না ইহলোকই ইহার সর্ব্বস্ব।

সকল দর্শনেই অনুমান প্রমাণ মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে; কেবল চার্ব্বাক-দর্শনেই প্রত্যক্ষাতিরিক্ত প্রমাণ অগ্রাহ্য। যাহা চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের অগোচর, চার্ব্বাক-শিষ্যেরা তাহার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। এই নিমিত্তই তাঁহারা ঈশ্বর, পরলোক ও দেহাতিরিক্ত আত্মা মানেন না। সুতরাং চার্ব্বাকদর্শনকে নাস্তিক-দর্শন বলা অন্যায় নহে।

এতদ্দেশীয় অন্যান্য দর্শনকারেরা দুঃখ মিশ্রিত সংসারের সুখ চাহেন না। তাঁহারা যে মোক্ষ প্রার্থনা করেন তাহাতে সুখ দুঃখ কিছুই নাই; সংসার বন্ধন বিমোচন, প্রবৃত্তিদ্বেষের নির্ব্বাণ, আন্তরিক স্থৈর্য্য, ইহাই তাঁহাদিগের কামনা। কেবল চার্ব্বাক মতে সাংসারিক সুখই জীবনের উদ্দেশ্য।

মাধবাচার্য্য সর্ব্বদর্শন সংগ্রহে চার্ব্বাককে "বৃহস্পতি মতানুসারী নাস্তিক শিরোমণি" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বৃহস্পতি বা চার্ব্বাক লিখিত কোন গ্রন্থ দেখা যায় না। কেবল এই মাত্র বলিতে পারা যায় যে মাধবাচার্য্য পশ্চাল্লিখিত শ্লোকগুলি বৃহস্পতির উক্ত বলিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন—

ন স্বর্গো নাপবর্গো বা নৈবাত্মা পারলৌকিকঃ।
নৈব বর্ণাশ্রমাদীনাং ক্রিয়াশ্চ ফলদায়িকাঃ॥
অগ্নিহোত্রং ত্রয়োবেদাস্ত্রিদণ্ডং ভস্মগুণ্ঠনম্।
বুদ্ধি পৌরুষহীনানাং জীবিকা ধাতৃনির্ম্মাতা॥
পশুশ্চেন্নিহতঃ স্বর্গং জ্যোতিষ্টোমে গমিষ্যতি।
স্বপিতা যজমানেন তত্র কস্মান্ন হিংস্যতে॥
মৃতানামপি জন্তূনাং শ্রাদ্ধং চেত্তৃপ্তিকারণম্।
গচ্ছতামিহ জন্তূনাং ব্যর্থং পাথেয় কল্পনম্॥
স্বর্গস্থিতা যদা তৃপ্তিং গচ্ছেয়ুস্তত্র দানতঃ।
প্রাসাদস্যোপরিস্থানামত্র কস্মান্ন দীয়তে॥
যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেদৃণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।
ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ॥
যদি গচ্ছেৎ পরং লোকং দেহাদেষ বিনির্গতঃ।
কস্মাদ্ভূয়োন চায়াতি বন্ধুস্নেহসমাকুলঃ॥
ততশ্চ জীবনোপায়ো ব্রাহ্মণৈর্বিহিতস্ত্বিহ।
মৃতানাং প্রেতকার্য্যাণি নত্বন্যদ্বিদ্যতে ক্বচিৎ॥
ত্রয়ো বেদস্য কর্ত্তারো ভণ্ড ধূর্ত্ত নিশাচরাঃ।
জর্ফরী তুর্ফরীত্যাদি পণ্ডিতানাং বচঃ স্মৃতম্॥
অশ্বস্যাত্রহি * * * পত্নীগ্রাহ্যং প্রকীর্ত্তিতম্।
ভণ্ডৈস্তদ্বৎ পরঞ্চৈব গ্রাহ্যজাতং প্রকীর্ত্তিতম্।
মাংসানাং খাদনং তদ্বন্নিশাচরসমীরিতম্॥

"স্বর্গ, অপবর্গ বা পরলোকগামী আত্মা নাই; বর্ণাশ্রমাদির কোন ক্রিয়াও ফলদায়িনী হয় না। অগ্নিহোত্র, তিনবেদ, ত্রিদণ্ড ও ভস্মলেপন বুদ্ধি পৌরুষহীনদিগেরই ধাতৃনির্ম্মিত জীবিকা। যদি জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞে নিহত পশু স্বর্গে গমন করে, তবে যজমান কেন স্ব পিতাকে বলিদান করে না? যে জন্তুগণ মরিয়াছে, শ্রাদ্ধে যদি তাহাদিগেরও তৃপ্তি জন্মে, তবে পর্য্যটকদিগের পাথেয় সঙ্গে রাখিবার প্রয়োজন নাই। যদি স্বর্গস্থিত লোকে ভূতলস্থ দানে তৃপ্তিপ্রাপ্ত হয়, তবে প্রাসাদোপরিস্থিত ব্যক্তিবর্গের তৃপ্তি নিমিত্ত ভূতলে অন্ন কেন না দাও? যতদিন জীবিত থাক, সুখে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ কর; ঋণ করিয়াও ঘৃত খাও; ভস্মীভূত

দেহের পুনরাগমন কোথায় ? যদি দেহ হইতে নির্গত হইয়া কেহ পরলোকে যায়, তবে বন্ধুস্নেহে আকুল হইয়া কেন ফিরিয়া না আইসে ? সুতরাং মৃতদিগের প্রেত-কার্য্য বিহিত করা ব্রাহ্মণদিগের জীবনোপায় মাত্র ; অন্য কিছু নহে । তিন বেদের কর্ত্তা ভণ্ড, ধূর্ত্ত ও নিশাচর । জর্ফরী তুর্ফরী ইত্যাদি পণ্ডিতদিগের বচন সকলেই শুনিয়াছে । লিখিত আছে যে অশ্বমেধে * * * রাজপত্নী ধরিবেন । ভণ্ডগণ ইত্যাকার কত কি ধরিবার কথা লিখিয়াছে । তদ্রূপ মাংসভক্ষণ নিশাচর নির্দ্দিষ্ট ।"

কোন্ সময়ে চার্ব্বাক বা বৃহস্পতির মত প্রচারিত হয়, স্থির করা কঠিন । বিষ্ণু পুরাণে ইহার প্রতি কটাক্ষ লক্ষিত হয়, যথা—

অজ্ঞানপাস্ত পাষণ্ড প্রকারৈর্বহুভির্দ্বিজ ।
দৈতেয়ান্ মোহয়ামাস মায়ামোহ বিমোহকৃৎ ॥
স্বল্পেনৈব হি কালেন মায়ামোহেন তেঽসুরাঃ ।
মোহিতাস্তত্যজুঃ সর্ব্বাং ত্রয়ীমার্গাশ্রিতাং কথাং ॥
কেচিদ্ হি নিন্দাং বেদানাং দেবানাং অপরে দ্বিজ ।
যজ্ঞকর্ম্মকলাপস্য তথান্যেচ দ্বিজন্মনাং ॥
নৈতদ্যুক্তিসহং বাক্যং হিংসা ধর্ম্মায় নেষ্যতে ।
হবীংষ্যনলদগ্ধানি ফলায়েত্যর্ভকোদিতং ॥
যজ্ঞৈরনেকৈর্দেবত্বমবাপ্যেন্দ্রেণ ভুজ্যতে ।
শম্যাদি যদি চেৎ কাষ্ঠং তদ্বরং পত্রভুক্ পশুঃ ॥
নিহতস্য পশোর্যজ্ঞে স্বর্গপ্রাপ্তির্যদীষ্যতে ।
স্বপিতা যজমানেন কিন্নু তস্মান্ন হন্যতে ॥
তৃপ্তয়ে জায়তে পুংসো ভুক্ত মন্যেন চেৎ ততঃ ।
দদ্যাচ্ছ্রাদ্ধং শ্রদ্ধয়ান্নং ন বহেয়ুঃ প্রবাসিনঃ ॥
জন শ্রদ্ধেয় মিত্যেতদবগম্য ততোবচঃ ।
উপেক্ষা শ্রেয়সে বাক্যং রোচতাম্ যন্ময়েরিতং ॥
ন হ্যাপ্তবাদা নভসো নিপতন্তি মহাসুরাঃ ।
যুক্তিমদ্বচনং গ্রাহ্যং ময়া ন্যৈশ্চভবদ্বিধৈঃ ॥
মায়ামোহেন দৈতেয়াঃ প্রকারৈর্বহুভিস্তথা ।
ব্যুত্থাপিতা যথা নৈষাং ত্রয়ীং কশ্চিদরোচয়ৎ ॥
ইত্থমুন্মার্গযাতেষু তেষু দৈত্যেষু তেঽমরাঃ ।
উদ্যোগং পরমং কৃত্বা যুদ্ধায় সমুপস্থিতাঃ ॥
ততো দেবাসুরং যুদ্ধং পুনরেবাভবদ্ দ্বিজ ।
হতাশ্চতেঽসুরা দেবৈঃ সন্মার্গপরিপন্থিনঃ ॥
সধর্ম্মকবচস্তেষাং অভূদ্যঃ প্রথমং দ্বিজ ।
তেন রক্ষাভবৎ পূর্ব্বং নেশুর্নষ্টেচ তত্রতে ॥

“হে দ্বিজ, মায়ামোহ মায়াজাল বিস্তৃত করিয়া অন্যান্য বহু প্রকার পাষণ্ড প্রকারে দৈত্যদিগকে বিমুগ্ধ করিলেন। মায়ামোহ কর্ত্তৃক মোহিত হইয়া সেই অসুর সকল অল্পকালেই ত্রিবেদমার্গাশ্রিত কথা সমুদয় পরিত্যাগ করিল। হে দ্বিজ, কেহ বেদের নিন্দা করিতে লাগিল, কেহ বা দেবের, কেহ বা যজ্ঞ কর্ম্মকলাপের এবং কেহ বা ব্রাহ্মণের। হিংসায় ধর্ম্ম হয় এ বাক্য যুক্তিসহ নহে; অগ্নিতে ঘৃত দগ্ধ করিলে কোন ফল আছে, ইহা বালকের উক্তি। ইন্দ্র যদি অনেক যজ্ঞ দ্বারা দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়া শম্যাদি কাষ্ঠ ভক্ষণ করেন, পত্রভুক্ পশু তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যদি যজ্ঞে নিহত পশুর স্বর্গপ্রাপ্তি হয়, স্বপিতাকে যজমান কেন মারিয়া ফেলে না? যদি অন্যের ভুক্ত অন্নে পুরুষের তৃপ্তি হয়, তবে প্রবাসীদিগের উদ্দেশে শ্রদ্ধা পূর্ব্বক শ্রাদ্ধ কর, তাহাদিগের আর অন্ন বহন করিতে হইবে না। তন্নিমিত্ত এই বাক্য জনশ্রদ্ধেয় ইহা বুঝিয়া শাস্ত্রের মোক্ষ-নির্ণায়ক বাক্য অবহেলাপূর্ব্বক আমি যাহা বলিতেছি তাহাতেই শ্রদ্ধা কর। হে মহাসুরগণ, আপ্ত বাক্য আকাশ হইতে পড়ে না; আমার কাছে ও তোমাদিগের ন্যায় লোকের কাছে যুক্তিযুক্ত বচনই গ্রাহ্য। এইরূপ বিবিধপ্রকারে মায়ামোহ দৈত্যদিগের চিত্ত বিকৃত করিয়া দিলে, তিন বেদের প্রতি তাহাদিগের আর রুচি রহিল না। এই প্রকারে দৈত্যগণ বিপথগামী হইলে অমরগণ পরম উদ্যোগ করিয়া যুদ্ধে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর, হে দ্বিজ, দেবাসুরে পুনরায় যুদ্ধ বাধিল; এবং দেবতাদিগের হস্তেই সন্মার্গপরিত্যাগী অসুরেরা নিহত হইল। হে দ্বিজ, প্রথমে অসুরদিগের যে ধর্ম্ম-কবচ ছিল, তদ্দ্বারা পূর্ব্বে তাহারা রক্ষিত হইত, এক্ষণে সেই ধর্ম্ম-কবচ নষ্ট হওয়ায় তাহারা বিনষ্ট হইল!”

মহাভারতের শান্তি পর্ব্বে চার্ব্বাকের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, যথা—

নিঃশব্দে চ স্থিতে তত্র ততো বিপ্রজনে পুনঃ।
রাজানং ব্রাহ্মণচ্ছদ্মা চার্ব্বাকো রাক্ষসোঽব্রবীৎ ॥
তত্র দুর্য্যোধনসখা ভিক্ষুরূপেণ সংবৃতঃ।
সাক্ষঃ শিখী ত্রিদণ্ডীচ ধৃষ্টো বিগত সাধ্বসঃ ॥
বৃতঃ সর্ব্বৈস্তথা বিপ্রৈরাশীর্ব্বাদ বিবক্ষুভিঃ।
পরঃ সহস্রৈ রাজেন্দ্র তপোনিয়ম সংশ্রিতৈঃ ॥
স দুষ্টঃ পাপমাশংসুঃ পাণ্ডবানাং মহাত্মনাং।
অনামন্ত্র্যৈব তান্ বিপ্রাং স্তমুবাচ মহীপতিং ॥

চার্ব্বাক উবাচ।

ইমে প্রাহুর্দ্বিজাঃ সর্ব্বে সমারোপ্য বচো ময়ি।
ধিগ্ ভবন্তং কুনৃপতিং জ্ঞাতিঘাতিনমস্তু বৈ ॥
কিং তেন স্যাদ্ধি কৌন্তেয় কৃত্বেমং জ্ঞাতি সংক্ষয়ং।
ঘাতয়িত্বা গুরূংশ্চৈব মৃতং শ্রেয়ো ন জীবিতং ॥

ইতি তে বৈ দ্বিজাঃ শ্রুত্বা তস্য দুষ্টস্য রক্ষসঃ ।
বিব্যথুঃ ক্ষুভিতাশ্চৈব তস্য বাক্য প্রধর্ষিতাঃ ॥
ততস্তে ব্রাহ্মণাঃ সর্ব্বে স চ রাজা যুধিষ্ঠিরঃ ।
ব্রীড়িতা পরমোদ্বিগ্নাস্তূষ্ণীমাসন্ বিশাম্পতে ॥

* * *

ব্রাহ্মণা ঊচুঃ ।

"এষ দুর্য্যোধন-সখা চার্ব্বাকো নাম রাক্ষসঃ ।
পরিব্রাজকরূপেণ হিতং তস্য চিকীর্ষতি ॥
নবয়ং ব্রূম ধর্ম্মাত্মন্ ব্যেতু তে ভয়মীদৃশং ।
উপতিষ্ঠতু কল্যাণং ভবন্তং ভ্রাতৃভিঃ সহ ॥"

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ততস্তে ব্রাহ্মণা সর্ব্বে হুঙ্কারৈঃ ক্রোধ মূর্চ্ছিতাঃ ।
নির্ভৎসয়ন্তঃ শুচয়ো নিজঘ্নুঃ পাপ রাক্ষসং ॥
স পপাত বিনির্দ্দগ্ধস্তেজসা ব্রহ্মবাদিনাং ।
মাহেন্দ্রাশনি নির্দ্দগ্ধঃ পাদপোঽঙ্কুরবানিব ॥

"অনন্তর দ্বিজগণ নিঃশব্দ হইলে ছদ্মব্রাহ্মণরূপী চার্ব্বাক রাক্ষস রাজাকে বলিতে লাগিল। সেই অক্ষ-শিখা ত্রিদণ্ড সম্বলিত ভিক্ষুবেশধারী, নির্লজ্জ ও নির্ভীক দুর্য্যোধনসখা সহস্র সহস্র তপোনিরত আশীর্ব্বাদ প্রদানাভিলাষী বিপ্রবর্গে পরিবৃত হইয়া মহাত্মা পাণ্ডবদিগের অনিষ্ট কামনা করিয়া অন্য দ্বিজগণকে না জিজ্ঞাসিয়াই ভূপতিকে বলিল, "এই সমুদায় বিপ্রগণ আমার প্রতি আরোপ করিয়া বলিতেছেন, ধিক্ তুমি, কুনৃপতি, জ্ঞাতিঘাতী ; হে কৌন্তেয়, জ্ঞাতি এবং গুরু ক্ষয় করিয়া তোমার কি লাভ হইল ? তোমার পক্ষেই মৃত্যুই শ্রেয় ; জীবন ধারণ নহে।" তখন সেই দুষ্ট রাক্ষসের বাক্য শুনিয়া দ্বিজগণ অত্যন্ত ব্যথিত ও ক্রুদ্ধ হইলেন এবং ব্রাহ্মণগণ ও রাজা যুধিষ্ঠির লজ্জিত ও চিন্তান্বিত হইয়া তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন। ব্রাহ্মণেরা কহিলেন, "এ দুর্য্যোধন-সখা চার্ব্বাক নামা রাক্ষস। পরিব্রাজকরূপে তাহার মঙ্গল কামনা করিতেছে। হে ধর্ম্মাত্মন্, আমরা এ সকল বাক্য বলি নাই, আপনি ঈদৃশ ভয় পরিত্যাগ করুন। ভ্রাতৃগণের সহিত আপনার কল্যাণ হউক।"

"বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর সেই শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণ সকল ক্রুদ্ধ হইয়া ভর্ৎসনা করতঃ হুঙ্কার পরিত্যাগ পূর্ব্বক পাপ রাক্ষসকে বিনাশ করিলেন। বজ্র-দগ্ধ অঙ্কুরবান্ পাদপের ন্যায় ব্রহ্মবাদীদিগের তেজে দগ্ধ হইয়া সে পতিত হইল।"

রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে যখন মহর্ষি জাবালি রামচন্দ্রকে অরণ্যযাত্রা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে বলিতেছেন, তখন তাঁহার উক্তি মধ্যে চার্ব্বাক মত লক্ষিত হয়, যথা—

অর্থধর্ম্মপরা যে যে তাংস্তাংশ্চোচামি নেতরান্ ।
তেহি দুঃখমিহ প্রাপ্য বিনাশং প্রেত্য নেমিরে ॥
অষ্টকাপিতৃদৈবত্য মিত্যয়ং প্রসৃতো জনঃ ।
অন্নস্যোপদ্রবং পশ্য মৃতোহি কিমশিষ্যতি ॥
যদি ভুক্তমিহান্যেন দেহমন্যস্য গচ্ছতি ।
দদ্যাৎ প্রবসতাং শ্রাদ্ধং ন তৎপথ্যাশনং ভবেৎ ॥
দানসংবননাহ্যেতে গ্রন্থামেধাবিভিঃকৃতাঃ ।
যজস্ব দেহি দীক্ষস্ব তপস্তপ্যস্ব সন্ত্যজ ॥
স নাস্তি পরমিত্যেতৎ কুরুবুদ্ধিং মহামতে ।
প্রত্যক্ষং যত্তদাতিষ্ঠ পরোক্ষং পৃষ্ঠতঃ কুরু ॥

"যাঁহারা শাস্ত্রার্থধর্ম্মপরায়ণ, আমি তাঁহাদিগের জন্য ব্যাকুল হইতেছি। তাঁহারা ইহলোকে দুঃখ পাইয়া, অন্তে বিনাশপ্রাপ্ত হয়। লোকে পিতৃদেবতার উদ্দেশে অষ্টকা শ্রাদ্ধ করে; দেখ, ইহাতে কেবল অন্ন ধ্বংস হয়; মৃতব্যক্তি কি আহার করিতে পারে? যদি একের ভুক্ত অন্ন অন্যের দেহে যায়, তবে প্রবাসীর উদ্দেশে শ্রাদ্ধ কর, তাহার পাথেয়ের প্রয়োজন হইবে না। যজ্ঞ কর, দান কর, দীক্ষিত হও, তপস্যা কর, বিষয় বাসনা ত্যাগ কর এইরূপ দানপ্রবর্ত্তক গ্রন্থ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা রচনা করিয়াছেন। ধর্ম্ম কোন কাজের নয়, হে মহাত্মন্, তুমি এই বুদ্ধি কর। পরোক্ষ পশ্চাতে রাখিয়া, যাহা প্রত্যক্ষ তাহার অনুষ্ঠান কর।"

এপর্য্যন্ত যে সকল শ্লোক উদ্ধৃত হইল সে সকল পর্য্যালোচনা করিলে এই মাত্র প্রতীতি জন্মে যে বিষ্ণুপুরাণ, মহাভারত ও রামায়ণ তাহাদিগের বর্ত্তমান আকার ধারণ করিবার অগ্রে চার্ব্বাকদর্শন প্রচারিত হইয়াছিল। অনেকে বিবেচনা করেন রামায়ণ ও মহাভারতের অনেকাংশ বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে বিরচিত হইয়াছিল। কিন্তু এ মতটী প্রামাণ্য হইলেও আমাদিগের জানিবার উপায় নাই যে, আমাদিগের উদ্ধৃত শ্লোকগুলি সেই প্রথম রচিত ভাগের অন্তর্গত কি না। সুতরাং মহাভারতে চার্ব্বাকের নাম এবং রামায়ণে তদীয় প্রত্যক্ষবাদ লক্ষিত হইলেও, লোকায়তদর্শন প্রচারের সময় নির্ণীত হইতেছে না। তবে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, যখন শান্তি পর্ব্বে দুর্য্যোধনের সমকালীন লোক বলিয়া চার্ব্বাকের বর্ণনা দেখা যায় এবং অযোধ্যাকাণ্ডে জাবালি ঋষির মুখে লোকায়তিক উপদেশ শুনা যায়, তখন চার্ব্বাক-মত প্রাচীন মত বলিয়া বহুকাল হইতে গ্রাহ্য হইয়াছে সন্দেহ নাই এ প্রসঙ্গে আর একটি কথাও স্মরণ করা উচিত। যিনি এই মতের

প্রবর্ত্তক, তাঁহার নাম বৃহস্পতি। খণ্ডন খণ্ডখাদ্যকার শ্রীহর্ষ তাঁহাকে দেবগুরু বলিয়াছেন। ইহাও তাঁহার প্রাচীনত্বের আর একটি প্রমাণ। লোকে যাঁহার বুদ্ধির সহিত তুলনা দিয়া থাকে, তিনিই কি সেই বৃহস্পতি? ধর্ম্মশাস্ত্রকারদিগের মধ্যে একজন বৃহস্পতি আছেন। তিনিও তর্কানুরাগী। তিনি লিখিয়াছেন

> কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যো বিনির্ণয়ঃ।
> যুক্তিহীন বিচারেতু ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে ॥

অর্থাৎ, "কেবল শাস্ত্র আশ্রয় করিয়া তত্ত্বনির্ণয় করা উচিত নয়; যেহেতু যুক্তিহীন বিচারে ধর্ম্মহানি হয়।"

কিন্তু তর্কানুরাগী হইলেও ধর্ম্মশাস্ত্রকার বৃহস্পতি বেদবিরোধী নাস্তিক বৃহস্পতি হইতে পারেন না।

যদি উপরে উপরে দেখা যায়, তাহা হইলে লোকায়তদর্শন প্রচারের সময় সম্বন্ধে কয়েকটি কথা মনে উদিত হয়। এই দর্শনে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় নাই; সুতরাং ইহা কাপিলদর্শনের পরে রচিত হইবার সম্ভাবনা। এই দর্শনে বেদ ও পশুবধের প্রতি বিদ্বেষ দৃষ্ট হয়; সুতরাং এরূপ অনুমেয় যে ইহা বেদবিদ্বেষী অহিংসা-ধর্ম্মাবলম্বী বুদ্ধদেবের পরবর্ত্তী কালের। কিন্তু কে বলিতে পারে যে কপিল বা শাক্যসিংহের পূর্ব্বে নাস্তিক-মত প্রচলিত ছিল না বা প্রকাশিত হয় নাই, অথবা বৈদিক ক্রিয়াকলাপের প্রতি লোকের অশ্রদ্ধা জন্মে নাই?

এতদ্দেশীয় কোন বিষয়েরই প্রকৃত ইতিবৃত্ত পাওয়া যায় না। অনুসন্ধান করিতে গেলেই অন্ধকার দেখিতে হয়। ইউরোপের ইতিহাসে যেরূপ পর্য্যায়ক্রমে এক মতের পর অপর মতের আবির্ভাব লক্ষিত হয়, এ দেশের দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধে সেরূপ কিছুই দেখা যায় না। বোধ হয় যেন সকল দর্শনই একসময়ে দেখা দিয়া ছিল। প্রত্যেক দার্শনিকদলের মূল সূত্র-গ্রন্থে অপর দর্শন সূত্রের উল্লেখ বা মতখণ্ডন প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা, কাপিল সূত্রের প্রথমাধ্যায়ে ২০ হইতে ২৪ সূত্র পর্য্যন্ত বৈদান্তিক অবিদ্যাবাদখণ্ডন এবং ১৫০ ও ১৫১ সূত্রে একাত্মবাদখণ্ডন আছে। উক্ত অধ্যায়ের ২৫ সূত্রে লিখিত আছে,—

> ন বয়ং ষট্পদার্থবাদিনঃ বৈশেষিকাদিবৎ,

অর্থাৎ "আমরা বৈশেষিকাদিদিগের ন্যায় ষট্পদার্থবাদী নহি।" আবার ২৭ ও তৎপরবর্ত্তী কয়েকটি সূত্রে বৌদ্ধদিগের ক্ষণিকত্ববাদখণ্ডন দৃষ্ট হয়। সুতরাং কপিলের সাংখ্য-সূত্রে বেদান্ত, বৈশেষিক ও বৌদ্ধ অন্ততঃ এই তিন মতের প্রাগস্তিত্ব সূচিত হইতেছে। এইরূপ যদি আবার বেদান্ত সূত্রের দিকে দৃষ্টি কর, দেখিবে যে ২৮ ও ৩১ সূত্রে পতঞ্জলিকৃত যোগ-দর্শনের উল্লেখ আছে, ২ ও ৩ সূত্রে সাংখ্য-মত খণ্ডন আছে এবং অন্যান্য স্থলে কণাদের

পরমাণুবাদ লইয়া বিবাদ আছে। এই নিমিত্ত কেবল সূত্রগুলি দেখিয়া স্থির করিবার উপায় নাই যে অগ্র-পশ্চাৎ কোন্ দর্শনের কখন্ উৎপত্তি হইয়াছে। বোধ হয় যখন, সকল দর্শনেরই প্রচার হইয়া পরস্পরের খণ্ডন চেষ্টা চলিতেছিল, সেই সময়ে প্রচলিত মূল দর্শন সূত্রগুলি লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। যদি কপিল, বদরায়ণ, গৌতম প্রভৃতিকে ভিন্ন ভিন্ন দার্শনিক সম্প্রদায়ের মত-প্রবর্ত্তক বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, যে সূত্রগুলি তাঁহাদিগের নামে চলিতেছে, সেগুলি তাঁহাদিগের রচিত নহে; তাঁহাদিগের মতানুসারী শিষ্য প্রশিষ্যগণ কর্ত্তৃক অনেক বাদানুবাদের পরে লিখিত। সাংখ্যকারিকাকার ঈশ্বর কৃষ্ণ কাপিল-সূত্র সম্বন্ধে ইহা স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, "ঋষি দয়া করিয়া এই প্রধান পবিত্র শাস্ত্র আসুরিকে দিয়াছিলেন, আসুরি পঞ্চশিখকে এবং পঞ্চশিখ ইহাকে বহু বিস্তীর্ণ করিয়াছেন।" (১) আবার দেখ যখন জৈমিনি-সূত্রে জৈমিনির দোহাই ও বেদান্ত-সূত্রে বদরায়ণের দোহাই দেখা যায়, তখন এগুলি তাঁহাদিগের লিখিত না হইয়া শিষ্য প্রশিষ্যের লিখিত হইবারই সম্ভাবনা। (২)

যদিও ভিন্ন ভিন্ন দর্শনের উৎপত্তি-পর্য্যায় নির্ণয় পূর্ব্বক দার্শনিক মত-প্রবর্ত্তক ঋষিবর্গের সময় নিরূপণ করা দুঃসাধ্য, তথাপি তাঁহাদিগের প্রাদুর্ভাবকাল সম্বন্ধে সাধারণতঃ দুই একটি কথা বলা যাইতে পারে। সকল দর্শনই সূত্রাকারে লিখিত। সুতরাং সংস্কৃত সাহিত্যের যে কাল সূত্রপ্রধান, সেই কালেই দর্শন সকলের আবির্ভাব। ভট্টমোক্ষমূলর সাহেবের মতে খ্রীষ্টাব্দের ৬০০ হইতে ২০০ বর্ষ পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই কালের ব্যাপ্তি। এই সময়ের শিরোভূষণ বুদ্ধদেব। বোধ হয়, তাঁহার জন্মের কিছুকাল পূর্ব্ব হইতে দার্শনিককালের আরম্ভ। সংসার দুঃখময়, ইহাই এতদ্দেশীয় দর্শনের মূলতত্ত্ব। শাক্যসিংহ জন্মিবার পূর্ব্বেই ইহা এতদ্দেশ-বাসীরা বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন এজন্যই কাতর হইয়া কতলোক সংসার পরিত্যাগ করিতেছিল। যখন বুদ্ধদেব সাংসারিক সুখ বিসর্জ্জন করিয়া মোক্ষ-পথের পথিক হইলেন, তিনি বহুসংখ্যক লোককে তৎসদৃশদশাপন্ন দেখিতে পাইলেন। কি প্রকারে দুঃখ নিবৃত্তি হইবে, তৎকালে চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গ এই প্রশ্ন লইয়াই ব্যস্ত ছিলেন। বৈদিককালের কবিদিগের ন্যায় তাঁহারা সাংসারিক

---

(১) এতৎপবিত্রমগ্র্যং মুনিরাসুরয়েঽনুকম্পয়া প্রদদৌ
আসুরিরপি পঞ্চশিখায় তেনচ বহুধা কৃতং তন্ত্রং ॥ ৭০ ।

(২) Vide a Lecture on "Hindu. Philosophy" delivered by the present writer on the 14th of March 1857 at the Bethune Society and published in the transactions of the society in 1870.

সুখপ্রার্থী ছিলেন না। উচ্চপদ, বিচিত্র বেশ ভূষা, সুরম্য হর্ম্ম্য, উপাদেয় খাদ্য, সুন্দরী নারী, বহুসংখ্যক সন্তান, শতবর্ষ বয়ঃক্রম, এ সকলে তাঁহাদিগের মনস্তুষ্টি হইত না। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে সাংসারিক সুখের আতে আতে দুঃখ। এই জন্যই তাঁহাদিগের সংসারের প্রতি বিরক্তি। এই জন্যই তাঁহাদিগের সংসার-বন্ধন ছেদন চেষ্টা। সংসার তাঁহাদিগের পক্ষে কেন এত ক্লেশকর বোধ হইয়াছিল, সম্পূর্ণরূপে বুঝা যায় না। কিন্তু এরূপ হইবার কোন কারণ নির্দ্দেশ করা যায় না, এমত নহে। বৈদিক সময়ে আর্য্যগণ হিমালয় সন্নিহিত শীতল প্রদেশে বাস করিতেছিলেন। স্বাস্থ্যকর স্থানে থাকিয়া তাঁহাদিগের কার্য্য করিতেও যেমন প্রবৃত্তি হইত, শরীর ও মনেরও তেমনই স্ফূর্ত্তি ছিল। বিশেষতঃ তাঁহারা দস্যুদিগকে জয় করিয়া দিন দিন নূতন নূতন প্রদেশে আপনাদিগের অধিকার বিস্তার করিতেছিলেন এবং তন্নিমিত্ত অনেকেই অনন্যচিত্ত হইয়া উৎসাহ ও অনুরাগের সহিত আপনাদিগের পার্থিব সুখবর্দ্ধনার্থেই প্রবৃত্ত ছিলেন। তৎকালে সমাজের বন্ধনও এমন শিথিল ছিল যে, লোকে ইচ্ছানুসারে চলিতে পারিত; বর্ণাশ্রম বা তন্নির্দ্দিষ্ট ক্রিয়াকলাপের জাল এত দূর বিস্তৃত ছিল না যে, তাহাতে আবদ্ধ হইয়া কাহাকেও স্বাধীনতা ও সুখ বিসর্জ্জন করিতে হইত। কিন্তু সৌত্রিক সময়ে ইহার সম্পূর্ণ বিপর্য্যয় ঘটিয়াছিল। তখন আর্য্যগণ উষ্ণ অনুগঙ্গ প্রদেশের অধিবাসী। পরিশ্রম করিতে গেলে তাঁহাদিগের কষ্ট হয়। সুখ অপেক্ষা শান্তিই তাঁহাদিগের বাঞ্ছনীয় হইয়া উঠিয়াছে। বিশেষতঃ তাঁহাদিগের মধ্যে যে পরিমাণে সভ্যতা বৃদ্ধি হইয়াছে তাহাতে তাঁহাদিগের দুঃখানুভব শক্তির বৃদ্ধি হইয়াছে। এদিকে সামাজিক শাসনও বাড়িয়াছে। জাতিভেদ, আশ্রম বিভাগ ও কর্ম্মকাণ্ড স্থিরীকৃত হইয়া স্বাধীন গতির পথ রুদ্ধ করিয়াছে; স্বেচ্ছানুসারে সুখান্বেষণে যেদিকে সেদিকে যাইবার উপায় নাই। জীবন ভার বোধ হইয়াছে। সংসারের প্রতি আস্থা নাই। দুঃখের কিসে নিবারণ হইবে, ইহাই প্রধান প্রশ্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বুদ্ধদেবের পূর্ব্বে এ প্রশ্নের উত্তর কি কেহ দেন নাই? বোধ হয় দিয়াছিলেন। বৌদ্ধেরা বলেন যে কপিলদেব শাক্যসিংহের পূর্ব্বকালবর্ত্তী বুদ্ধ। সাংখ্যদর্শন-প্রবর্ত্তক ঋষির নামও কপিল; এবং স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিতে গেলেও সাংখ্যদর্শনকেই বৌদ্ধধর্ম্মের মূল বলিয়া বিশ্বাস হয়। কপিল নিরীশ্বর, বুদ্ধদেবও নিরীশ্বর। কপিল সাংসারিক দুঃখে কাতর, বুদ্ধদেবও সাংসারিক দুঃখে কাতর। কপিল বলেন, দুঃখের কারণ জন্ম, জন্মের কারণ কর্ম্ম, কর্ম্মের কারণ প্রবৃত্তি, প্রবৃত্তির কারণ অজ্ঞানতা; বুদ্ধদেবও সেই সকল কথা বলেন। আবার ভাবিয়া দেখ, বৌদ্ধদিগের যে ক্ষণিকত্ববাদ তাহাও সাংখ্য-মত হইতে উৎপন্ন। কপিল-শিষ্যেরা বলেন যে, কার্য্য কারণের রূপান্তর বা পরিণাম মাত্র। বুদ্ধদেব দেখিলেন যে জগৎ প্রতিক্ষণে পরিবর্ত্তিত হইতেছে,

প্রতিক্ষণে নূতন কার্য্যরূপে পরিণত হইতেছে; সুতরাং ভাবিলেন কোন পদার্থই ক্ষণাধিক স্থায়ী নহে। এই ক্ষণিকত্ববাদই সপ্রমাণ করিতেছে যে বৌদ্ধ-মত অনেক দার্শনিক আলোচনার শেষফল। যতদিন লোকে স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে, ততদিন চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, পর্ব্বত, নদী, পশু, পক্ষী, মনুষ্য প্রভৃতিকে বহুকাল স্থায়ী বলিয়া বিশ্বাস করে; অনেক দার্শনিক চর্চ্চা না হইলে কেহ বুঝিতে পারে না যে, মুহূর্ত্তপরিবর্ত্তনশীলতাই এই বিপুল বিশ্বের প্রধান লক্ষণ।

সাংখ্য-মত-প্রবর্ত্তক কপিল ঋষিই যে কেবল বুদ্ধদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন এমন নহে; বোধ হয় লোকায়ত-মত-প্রবর্ত্তক বৃহস্পতিও শাক্যসিংহের পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে লিখিত আছে যে একদা বৃহস্পতি গায়ত্রীদেবীর মস্তকে আঘাত করেন, তাহাতে মস্তক চূর্ণ হইয়া যায় এবং মস্তিষ্ক ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। কিন্তু গায়ত্রীর মৃত্যু নাই; তজ্জন্য প্রতি খণ্ড মস্তিষ্ক-বসা হইতে এক একটি বষট্কার দেবের উৎপত্তি হইল। (৩) আমাদিগের বোধ হয় এই গল্পের মধ্যে একটি মহামূল্য তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে। গায়ত্রীই হিন্দুধর্ম্মের বীজমন্ত্র। বৃহস্পতি সেই গায়ত্রীর মস্তকে আঘাত করেন। সুতরাং ইহাতে বুঝাইতেছে যে বৃহস্পতি হিন্দুধর্ম্মের বিনাশ চেষ্টা করিয়াছিলেন। অতএব তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে যে বৃহস্পতির উল্লেখ দৃষ্ট হইতেছে, তিনি নাস্তিক-মত প্রবর্ত্তক হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইতেছে যে লোকায়তবাদ তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ সংকলিত হইবার পূর্ব্বে প্রচারিত হইয়াছিল। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ পুরাতন কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদের অন্তর্গত। সুতরাং বলিতে হইতেছে যে সৌত্রিক সময়ের পূর্ব্বে ব্রাহ্মণপ্রধানকালে কর্ম্মকাণ্ডের প্রথম বাড়াবাড়ির আমলে লোকায়তমতের উৎপত্তি হয়। ভট্টমোক্ষমূলর সাহেবের মতে ব্রাহ্মণপ্রধানকাল খ্রীষ্ট জন্মিবার ৮০০ হইতে ৬০০ বর্ষ পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

---

(৩) "The Taittiriya Brahmana relates an interesting anecdote regarding the origin of the word Vashat. The God presiding over Vashat is Vashatkara. The anecdote is as follows: Once upon a time Vribaspati struck the Goddess Gayatri on the head, which was smashed into pieces and the brain split. But Gayatri is immortal, and every drop of her brain so split was alive, and became Vashatkara. The commentator adds, Vashat is derived from Vasa, grease, brain matter."

P. XXXVI, Appendix to Durgapuja by Pratapa Chandra Ghosha, B. A.

অতএব এরূপ অনুমান নিতান্ত অন্যায় নহে যে নাস্তিক-মত প্রবর্ত্তক বৃহস্পতি খ্রীষ্টাব্দের অন্ততঃ সাত আট শত বৎসর পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। ছাব্বিশ সাতাইশ শত বৎসর পর্য্যন্ত হিন্দুসমাজে তাঁহার মত-দ্বারা কত পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে, কে বলিতে পারে? আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে রামায়ণ, মহাভারত ও বিষ্ণুপুরাণেও তাঁহার যুক্তি সকল প্রবেশ করিয়াছে। উপনিষদ ও দর্শন সমূহে কর্ম্মকাণ্ডের প্রতি যে অবজ্ঞা দৃষ্ট হয়, তাহাও বৃহস্পতির তর্ক সম্ভূত হওয়া অসম্ভব নহে। ইন্দ্রাদি বৈদিক দেবতার প্রাধান্য বিলোপও যে তাঁহার হস্তে কতদূর ঘটিয়াছিল, কে নির্ণয় করিবে? বোধ হয় যেন তাঁহার নাস্তিকতাই কপিল, বুদ্ধ ও জৈমিনিকে নাস্তিক করিয়াছে; এবং তাঁহার প্রত্যক্ষবাদ বিরুদ্ধে ধর্ম্ম রক্ষার্থ তর্ক করিতে গিয়া অনুমান পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

ভারতবর্ষীয় আর্য্যজাতির আদিম অবস্থা

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

বিচারদর্শনের কাল নির্দ্ধারণ

দিবসের প্রথম যাম অতিক্রান্ত হইলেই বিচারকার্য্য আরম্ভ হইত। চতুর্থ যাম পর্য্যন্ত বিচারদর্শনের সীমা। ইহা দ্বারা এক প্রকার ইহাই স্থির হয় যে, দিবা দুই প্রহর অতিবাহিত হইলে সেদিন আর নূতন অভিযোগের বিষয় শ্রুত হইত না। কিন্তু কার্য্য বিশেষে, স্থল বিশেষে ও বিষয় বিশেষে নূতন অভিযোগ উত্থাপিত হইতে পারিত। কার্য্যের লাঘব গৌরব ও অবস্থা বিবেচনায় সেদিন উহা উপেক্ষিত না হইয়া তৎক্ষণাৎ সর্ব্বাগ্রে উহার বিষয় বিবেচিত হইত। পূর্ব্বোপস্থিত বিষয় বলিয়া তাহার প্রতি পক্ষপাত হইত না। ইহাদিগের বিধান-সংহিতায় সামান্য নিয়ম ও বিশেষ নিয়ম উভয়ই আছে। ইহারা স্থল বিশেষে নিয়ম সঙ্কোচ ও বিস্তার করিতে পারিতেন। (১)

তামাদি (অর্থাৎ কালাতিক্রম দোষ) হিন্দুজাতিরা স্বল্পকালে কোন ব্যক্তির স্বত্ব ধ্বংস করিতেন না। ধন সম্বন্ধের অভিযোগে ন্যূনকল্পে দশবৎসর অতিক্রান্ত না হইলে কালাত্যয় দোষ ঘটিত না। ধনস্বামীর সমক্ষে কোন ব্যক্তি নির্ব্বিবাদে দশবৎসর কাল ধনাদি উপভোগ না করিলে তাহাতে তাহার স্বত্ব জন্মিবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। ভূমি বিষয়ে স্বামীর সমক্ষে নির্ব্বিবাদে বিংশতি বর্ষ পর্য্যন্ত উপভোগ প্রমাণ না করিতে পারিলে ঐ ভূমি বিষয়ে উপভোক্তার স্বামিত্ব জন্মিত না। সুতরাং ভূমি বিষয়ে বিংশতি বর্ষ পরিমিত কাল অতিক্রান্ত হইলে উপভোক্তার স্বত্ব হইবার সম্ভাবনা থাকিত। বিংশতি বর্ষের পূর্ব্বে অভিযোগ ঘটিলে যাহার ভূমি তাহারই হয়। (২)

---

(১) দিবসস্যাষ্টমংভাগং মুক্ত্বা ভাগত্রয়ন্তু যৎ।
স কালো ব্যবহারাণাং শাস্ত্রদৃষ্টঃ পরঃ স্মৃতঃ॥

(২) পশ্যতোঽব্রুবতো হানির্ভূমের্বিংশতিবার্ষিকী।
পরেণ ভুজ্যমানস্য ধনস্য দশবার্ষিকী। যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

পরোক্ষে যদি কোন ব্যক্তি তাহার তিনপুরুষ পর্য্যন্ত কোন ব্যক্তির ধন এবং ভূম্যাদি উপভোগ করিয়া থাকেন, যাহাদিগের বস্তু তাহারা যদি তিনপুরুষমধ্যে কোন বিবাদ উত্থাপন না করে তবে ঐ বস্তু উপভোক্তার স্বত্ব হয়। পরন্তু জ্ঞাতি, বন্ধু, সকুল্য, জামাতা, শ্রোত্রিয় রাজা ও রাজমন্ত্রী যদি বহুকাল উপভোগ করেন তথাপি অন্যের বস্তুতে ইহাদিগের স্বামিত্ব জন্মে না। যাহার বস্তু তাহারই স্বত্ব। এরূপ ব্যক্তির উপভোগে প্রকৃত ধনস্বামীর স্বত্বধ্বংস হয় না। (৩)

অশক্ত, জড়, রোগার্ত, বালক, ভীতব্যক্তি, প্রবাসী জন এবং রাজকার্য্যে নিয়োগ হেতু ভিন্নদেশস্থিত ব্যক্তিবর্গের সমক্ষেই হউক অথবা পরোক্ষেই হউক উপভোগ দ্বারা ঐ সকল ব্যক্তির বস্তুতে উপভোক্তার স্বামিত্ব জন্মে না। কিন্তু এতদ্ব্যতিরিক্ত স্থলে ধনস্বামীর সমক্ষে যদি উপভোগ প্রমাণ হয় তবে উপেক্ষা নিবন্ধন সে বস্তুতে উপভোক্তারই স্বামিত্ব হয়, প্রকৃত ধনস্বামীর স্বত্ব লোপ পাইয়া থাকে।

স্থাবর ও অস্থাবর বিষয়ে কি প্রকারে ভোগাদির দ্বারা স্বত্ব নাশ হয়, উপভোক্তার স্বামিত্ব জন্মে ইহা নির্ণীত হইলে বিচারপদ্ধতির নিয়ম স্থিরীকৃত হইতে পারে। বিধান সংহিতা পরিশুদ্ধ ও সুপ্রণালীযুক্ত হইলে বিচার কার্য্যের সুবিধা হয় এই কারণে প্রথমে বিধান সংহিতার স্থূল স্থূল নিয়ম গুলি বলা উচিত। তদনুসারে অগ্রে লিপির বিষয় বিবেচনা করা আবশ্যক।

দেখ মানুষ মাত্রেরই ভ্রান্তি জন্মিয়া থাকে; বিশেষতঃ অলিখিত বিষয় যাণ্মাষিক কাল পর্য্যন্ত আলোচিত না হইলে উহা বিস্মৃতির গর্ভে লীন হয়। এই

ভুক্তিঃ ত্রিপুরুষী সিধ্যেৎ পরোক্ষা নাত্র সংশয়ঃ।
অনিবৃত্তে সপিণ্ডত্বে সাকুল্যানাং ন সিদ্ধতি॥
বিবাহ্য শ্রোত্রিয়ৈর্ভুক্তং রাজামাত্যৈস্তথৈবচ।
সুদীর্ঘেণাপি কালেন তেষাং সিধ্যেৎ ন তদ্ধনং॥
অশক্তালস রোগার্ত্ত বাল ভীত প্রবাসিনাং।
শাসনারূঢ় মন্যেন ভুক্তা ভুক্তং নহীয়তে॥

বৃহস্পতি সংহিতা।

(৩) সন্যস্তি বান্ধবৈর্বাপি ভুক্তং যৎ স্বজনৈস্তথা।
ভোগাৎ তত্র ন সিদ্ধিঃস্যাৎ ভোগমন্যেষু কল্পয়েৎ॥
ন ভোগং কল্পয়েৎ স্ত্রীষু দেবরাজ ধনেষুচ।
বাল শ্রোত্রিয় স্বত্বেন প্রাপ্তেচ পিতৃতঃ ক্রমাৎ॥

কাত্যায়ন সংহিতা।

দায় সীমা দাস ধনং নিক্ষেপোপনিধিঃ স্ত্রিয়ঃ।
রাজস্বং শ্রোত্রিয়স্বঞ্চ নভোগেন প্রনশ্যতি॥

নারদ সংহিতা।

কারণে ধর্ম্মশাস্ত্রকারেরা বিধাতার সৃষ্ট অক্ষরকেই বাক্যের প্রতিনিধি করিয়াছেন। অক্ষর দর্শন মাত্র সর্ব্ববিষয় স্মরণ-পথে উদিত হয়। অক্ষর দ্বারা সমস্ত বিষয়গুলি চিত্রিত ছবির ন্যায় দেদীপ্যমান দেখা যায়। যতকাল লিখিত পত্রখানি থাকে তাবৎ কালমধ্যে সে বিষয়ের কোন অঙ্গের বিকলতা ঘটিতে পারে না। কোন বিষয়েই বিচ্যুত হইবার সম্ভাবনা থাকে না। সেই কারণে আর্য্যগণ বর্ণাবলীর নাম অক্ষর রাখিয়াছেন। অক্ষর শব্দের ব্যুৎপত্তি ধরিলে ইহাই বোধ হয় যে যাহার ক্ষয় নাই তাহাকেই অক্ষর শব্দ নির্দ্দেশ করা যায়।

পত্রারূঢ় লেখ্যই প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য। পত্রশব্দে ভূর্জ্যপত্র, তালপত্র, তাড়িতপত্র ধরা গিয়া থাকে।

লেখ্য ভেদ

রাজদত্ত ব্রহ্মোত্তরদানপত্র তাম্রফলকে লিখিত হইত। তাহাকে তাম্রশাসন অথবা তাম্রপত্র বলা গিয়া থাকে। ঐ দানপত্রে দাতা ও গৃহীতা উভয়েরই নাম, গোত্রাদি এবং পূর্ব্ব পুরুষের কীর্ত্তিজনিত যশোগীত, দানের কাল, পরিমাণ ও সীমাদির উল্লেখ থাকে। তাম্রফলকের অভাবে তৎপরিবর্ত্তে পটে লিখিত হইত। বোধ হয় ঐ পট আর কিছুই নহে কাষ্ঠময় ফলক বিশেষ। যে হেতু বিচার নিষ্পত্তি কালে জয় পত্রের পাণ্ডুলেখ্য কাষ্ঠময় ফলকে লিখন পূর্ব্বক সভ্যগণ কর্ত্তৃক বিবেচিত হইত। কাষ্ঠ ফলকের ব্যবহার অদ্যাপি ব্যবসাদার লোকের মধ্যে প্রচলিত আছে। প্রস্তর ফলকে দেবপ্রতিষ্ঠাদির বিষয় ক্ষোদিত হইত, এক্ষণেও হইয়া থাকে। (৪)

মৌখিক বাক্য অপলাপ হইতে পারে, লিখিত বাক্য সহজে অপহ্নব করিবার সাধ্য থাকে না—সুতরাং ব্যবহার বিষয়ে লিখিত প্রমাণই মৌখিক বাক্য অপেক্ষা গৌরবান্বিত।

দানলেখ্যের সাধারণ নাম দানপত্র; তাম্রফলকে লিখিত হইলে শাসনপত্র কহা যায়। নৃপতি কোন ব্যক্তি বিশেষের প্রতি অথবা কোন বীরের প্রতি তাহার শৌর্য্যাদিগুণে পরিতুষ্ট হইয়া যাহা দান করেন এবং পারিতোষিক দানের প্রমাণ স্বরূপ যে লিখিত পত্র দেন তাহাকে প্রসাদপত্র কহা যায়। ইহাকেই এক্ষণকার

---

(৪) ষাণ্মাসিকেহপি সময়ে ভ্রান্তিঃ সংজায়তে যতঃ।
ধাত্রাক্ষরাণি সৃষ্টানি পত্রারূঢ়ান্যতঃ পুরা।
বৃহস্পতি সংহিতা।

পাণ্ডুলেখ্যেন ফলকে ভূমৌ বা প্রথমং লিখেৎ।
ন্যূনাধিকন্তু সংশোধ্য পশ্চাৎ পত্রে নিবেশয়েৎ॥
ব্যাস সংহিতা।

Pension ধরা যাইতে পারে। বিচার নিষ্পত্তি করিয়া জয়ী ব্যক্তিকে যে লেখ্য দেওয়া গিয়া থাকে তাহারই নাম জয়পত্র। দায়াদগণ অথবা যাহার সঙ্গে বিভাগের সম্ভাবনা থাকে তাঁহারা পরস্পর যে লেখ্যকে বিভাগ ক্রিয়ার প্রমাণ স্বরূপ বলিয়া অভিহিত করেন তাহাকে বিভাগ-পত্র কহা যায়। ক্রয় বিক্রয় স্থলে উভয় পক্ষের যে লেখ্য প্রস্তুত হয় উহার প্রথম পক্ষকে ক্রয়লেখ্য, দ্বিতীয় পক্ষকে বিক্রয় বা সম্মতিলেখ্য কহা গিয়া থাকে। বন্ধক রাখিয়া উভয় পক্ষ হইতে যে লেখ্য আদান প্রদান হয়, উহার মধ্যে উত্তমর্ণের দত্ত লেখ্যকে সম্মতিপত্র, অধমর্ণের প্রদত্ত পত্রকে আধিলেখ্য নামে কহা যায়। (৫)

প্রজাবর্গ রাজশাসনের বশবর্ত্তী হইয়া রাজার নিকট যেসকল প্রতিজ্ঞা-পত্র দেয় তাহার নাম সম্বিৎপত্র। দাস প্রভুর সেবা শুশ্রূষা করিবে বলিয়া প্রভুর নিকট যে লেখ্য প্রদান করে তাহার নাম দাসলেখ্য। অধমর্ণ ঋণ লইয়া উত্তমর্ণকে যে লেখ্য দেয় তাহার নাম কুসীদলেখ্য অথবা ঋণলেখ্য। রাজা প্রজাকে, প্রভু ভৃত্যকে এবং উত্তমর্ণ অধমর্ণকে যে লেখ্য দেন তাহার নাম সম্মতি-পত্র।

তমাদি ঘটিত কথার সবিশেষ উল্লেখ করিতে হইলে অগ্রে উত্তমর্ণ, অধমর্ণ, ঋণ, সুদ, গচ্ছিত এবং লেখন প্রকারাদি নির্ণয় করা আবশ্যক। ঋণদাতাকে আর্য্য জাতির ভাষায় উত্তমর্ণ কহা যায়। ঋণী ব্যক্তির উপাধি অধমর্ণ। যাবৎ পরিমিত বস্তু ঋণ দেওয়া যায় তাহার নাম মূল। যাহা বৃদ্ধি হয় তাহার নাম সুদ অথবা কুসীদ। কুসীদ শব্দে মন্দ পথ বুঝায়। শাস্ত্রানুসারে ঋণের বৃদ্ধি গ্রহণ

---

(৫) দত্ত্বা ভূম্যাদিকং রাজা তাম্রপত্রেঽথবা পটে।
শাসনং কারয়েৎ ধর্ম্ম্যং স্থানবংশাদি সংযুতং ॥
সেবা শৌর্য্যাদিনা তুষ্টঃ প্রসাদ লিখিতন্তুতৎ।
যৎ ত্বং ব্যবহারেষু পূর্ব্বোপক্ষোত্তরা দিকং ॥
ক্রিয়াবধারণোপেতং জয়পত্রেঽখিলং লিখেৎ।
ভ্রাতরঃ সংবিভক্তা যে অবিরোধাৎ পরস্পরং ॥
বিভাগপত্রং কুর্ব্বন্তি ভাগলেখ্যং তদুচ্যতে।
ভূমিং দত্বাতু যঃ পত্রং কুর্য্যাৎ চন্দ্রার্ক কালিকং ॥
অনাচ্ছেদ্য মনাহার্য্যং দানলেখ্যং তদুচ্যতে।
গ্রামো দেশশ্চ যঃ কুর্য্যাৎ মতং লেখ্যং পরস্পরং।
রাজা বিরোধি ধর্ম্মার্থে সম্বিৎ পত্রং বদন্তিচ।
ধনং বৃদ্ধ্যা গৃহীত্বাতু স্বয়ং কুর্য্যাচ্চকারয়েৎ ॥
উদ্ধারপত্রং তৎ প্রোক্তং ঋণ লেখ্যং মনীষিভিঃ ॥

বৃহস্পতি সংহিতা।

অতিশয় নিন্দনীয়, এ কারণে সুদের নাম কুসীদ হইয়াছে। সুদব্যবসায়ীকে কুসীদজীবী বলে। এই ব্যবসায়টী বৈশ্য জাতির নিজস্ব স্বরূপ, ইহাতে ঐ জাতির পাপ জন্মে না।

পুরাকালে অর্থ ব্যবহারে কদাচ দ্বিগুণের অধিক বৃদ্ধি ছিল না। কিন্তু ধান্য বৃদ্ধি পক্ষে তমাদি কালের পূর্ব্বদিন পর্য্যন্ত সুদের বৃদ্ধির বৃদ্ধি ধরিলেও প্রত্যেক বর্ষে শতকরা পাঁচ অংশের অধিক পাইতেন না। শেষ সীমায় মূল ও বৃদ্ধির সঙ্গে ধরিয়া দ্বিগুণের অধিক দেওয়া যাইত না। যাঁহারা বর্ষে বর্ষে অথবা মাসে মাসে বৃদ্ধি গ্রহণ করিতেন তাঁহারা চক্রবৃদ্ধি অথবা কালবৃদ্ধি পাইতেন না। বৃদ্ধির বৃদ্ধিকে চক্রবৃদ্ধি শব্দে নির্দ্দেশ করা যায়। ঐ বৃদ্ধি ঋণী ব্যক্তি স্বীকার পূর্ব্বক না লিখিয়া দিলে উত্তমর্ণ নিজ ইচ্ছায় চক্রবৃদ্ধি গ্রহণ করিতে অধিকারী ছিলেন না। কায়িক শ্রম দ্বারা যে বৃদ্ধি পরিশোধ হয় তাহার নাম কায়িকা। মাসে মাসে দেয় সুদকে কালিকা বলা যায়। সময় বিশেষে কালে কালে যে ঋণ শোধ হয় তাহার নামও কালিকা। ইহাকেই কীস্তিবন্দী বলা যায়। (৬)

অপরিমিত বৃদ্ধি

ইহা কোন ব্যক্তির আপৎকাল ভিন্ন গ্রাহ্য নহে। এই বৃদ্ধির অঙ্গীকারপত্র বিলক্ষণরূপ প্রমাণাদি দ্বারা দৃঢ়ীকৃত না হইলে কোন ব্যক্তিই দ্বিগুণের অধিক সুদ লইতে পারগ হন না। কিন্তু ঋণী কর্ত্তৃক লিখিত প্রমাণ থাকিলে অধমর্ণের নিকট হইতে অঙ্গীকৃত পরিমাণে বৃদ্ধি গ্রহণ সিদ্ধ হইতে পারে। (৭)

---

(৬) কুসীদ বৃদ্ধির্দ্বৈগুণ্যং নাত্যেতি সকৃদাহৃতা।
ধান্যে সদে লবে বাহ্যে নাতিক্রামতি পঞ্চতাং॥ ১৫১
কৃতানুসারাদধিকা ব্যতিরিক্তা ন সিদ্ধ্যতি। ১৫২
কুসীদ পথমাহুস্তং পঞ্চকং শতমর্হতি॥
নাতি সাম্বৎসরীং বৃদ্ধিং নচাদৃষ্টাং পুনর্হরেৎ।
চক্রবৃদ্ধিঃ কালবৃদ্ধিঃ কারিতা কায়িকাচ যা॥ ১৫৩
মনু ৮ অ।

কায়িকা কায়সংযুক্তা মাস গ্রাহ্যাচ কালিকা।
বৃদ্ধের্বৃদ্ধিশ্চক্র বৃদ্ধিঃ কারিতা ঋণিনা কৃতা॥
ভাগো যদ্দ্বিগুণাদূর্দ্ধং চক্রবৃদ্ধিশ্চ গৃহ্যতে।
পূর্ণেচ সোদয়ং পশ্চাৎ বর্দ্ধুষ্যং তদ্বিগর্হিতং॥
বৃহস্পতি সংহিতা।

(৭) কাত্যায়ন
ঋণিকেন কৃতা বৃদ্ধিরধিকা সংপ্রকল্পিতা।

ব্যবসায় স্থলে মূলধনের পরিমাণ ও শুদের কথা লাভের অংশের উল্লেখ না থাকিলে ধনস্বামী লাভাংশের অশীতিভাগ ও শ্রমকারী লাভাংশের বিংশতি ভাগ গ্রহণ করিতে পারেন। যাহারা ব্যবসায়ে শুদ গ্রহণ করে তাহারা ধর্ম্মানুসারে শতকরা দুইভাগ শুদ স্বরূপ গ্রহণ করিতে পারে। (৮)

প্রণয় হেতু প্রিয় ব্যক্তিকে ঋণ দিলে যাবৎ বৃদ্ধি গ্রহণের উল্লেখ না হইবে তাবৎ কাল বৃদ্ধি থাকিবে না। যখন বৃদ্ধি যাচ্ঞা করিবেন তদবধি বৃদ্ধি পাইতে পারে। যদি উত্তমর্ণ যাচ্ঞা করিয়াও শুদ প্রাপ্ত না হন তবে ধর্ম্মাধিকরণের বিচারে বার্ষিক শতকরা পাঁচ টাকার অধিক বৃদ্ধি পাইতে পারেন না। (৯)

কথা প্রসঙ্গে আর একটী কথার উল্লেখ করা অতীব আবশ্যক জ্ঞান হইল। আর্য্যজাতির নিকট কাহারও চাকুরী তমাদি হইত কি না। বেতনগ্রাহী কর্ম্মচারী অসুস্থতা অথবা বার্দ্ধক্যাদি হেতু বশতঃ কার্য্যে অক্ষম হইলে বেতন পাইতেন কি না। তাহাদিগের কর্ম্মে তাহাদিগের পুত্রাদির উত্তরাধিকারিত্ব জন্মিত কিনা।—তাহার নির্দ্ধারণে এই জানা যায় যে বিশ্বস্ত ও প্রিয় কার্য্যকারী ব্যক্তি যে কেবল পীড়াকালে বেতন পাইত এমন নয়; অক্ষম অবস্থায় পূর্ণমাত্রায় যাবজ্জীবন বৃত্তি ভোগ করিত। সম্ভাবনাস্থলে পুত্র পৌত্রাদিক্রমে চাকুরী ও নিষ্কর ভূমি উপভোগ করিতে পাইত। (১০)

পাঠক মনে করিবেন আর্য্যজাতি ধর্ম্মাধিকরণ সংস্থাপন করিয়াই নিশ্চিন্ত ছিলেন। তাহা নহে। পাঠক তুমি সভ্য হইতে ইচ্ছা কর? যাহারা রাজপথ কুৎসিত করে তাহাদিগকে দণ্ড দিতে মানস করিয়াছ? স্থল বিশেষে কাহাকেও

আপৎকালে কৃতা নিত্যং দাতব্যা কারিতা তথা॥
অন্যথা কারিতা বৃদ্ধির্ন দাতব্যা কথঞ্চন।

(৮) মনু অধ্যায়—যথা—
বশিষ্ঠবিহিতাং বৃদ্ধিং সৃজেদ্বিত্তবিবর্দ্ধিনীং।
অশীতি ভাগং গৃহ্নীয়ান্মাসাদ্বার্দ্ধুষিকঃ শতে॥ ১৪০
দ্বিকং শতং বা গৃহ্নীয়াৎ সতাং ধর্ম্মমনুস্মরন্।
দ্বিকং শতং বা গৃহ্নানো না ভবত্যার্থ কিল্বিষী॥ ১৪১

(৯) বিষ্ণু বচন।
প্রীতিদত্তং নবর্দ্ধেত যাবন্ন প্রতিযাচিতং।
যাচ্যমানং ন দত্তংচেদ্বর্দ্ধতে পঞ্চকং শতং॥

(১০) মনু ৮ম অধ্যায়
আর্ত্তস্তু কুর্য্যাৎ স্বস্থঃ সন্ যথাভাষিতমাদিতঃ।
স দীর্ঘস্যাপি কালস্য তল্লভেতৈব বেতনং॥২১৬

কি দোষ মার্জ্জনা করিতে অনুরোধ কর? তুমি হাতুড়ে বৈদ্যের ও গণ্ডমূর্খের চিকিৎসা নিবারণ করিতে উদ্যোগী হইয়াছ? ক্ষুদ্র ব্যবসাদার (ফড়ে) দিগকে শাস্তি দিতে বাসনা কর? কেন না তাহারা উৎকৃষ্ট দ্রব্যমধ্যে অপকৃষ্ট দ্রব্য মিসান দিয়া মন্দ করে। তদ্দারা লোকের পীড়া জন্মে। তুমি যাহার জন্য এত খেদিত সেগুলি আর্য্যজাতির চক্ষে অগ্রেই দোষ বলিয়া পতিত হইয়াছিল।

গর্ভিণী, রোগী ও বালক ব্যতীত অন্য ব্যক্তি যদি অনাপৎকালে রাজমার্গ অপরিষ্কৃত করিত তাহা হইলে তাহাকে অগ্রে রাজপথ পরিষ্কৃত করিতে হইত তৎপরে স্থল বিশেষে তাহার দুই পণ বরাটক (কৌড়ী) দণ্ড হইত। গর্ভিণী, বালক ও রোগার্ত্ত ব্যক্তি ঐ প্রকার কুব্যবহার আর না করে এজন্য তিরস্কৃত হইত। (১১)

চিকিৎসকের দ্বারা পশু সম্বন্ধে অমঙ্গল ঘটিলে প্রথম সাহস, মানুষের পক্ষে অমঙ্গল ঘটিলে দ্বিতীয় সাহস দণ্ড হইত। অদূষিত দ্রব্য দূষিত করিলে দোষকারীর প্রথম সাহস দণ্ড দেওয়া রীতি ছিল। দণ্ডের প্রমাণ ও স্বাক্ষীস্বরূপ দণ্ডনীতি প্রকরণে লিখিত হইবে। (১২)

---

(১১) সমুৎসৃজেদ্রাজমার্গে যস্ত মেধ্যমনাপদি।
স দ্বৌকার্য্যাপণৌ দদ্যামমেধ্যঞ্চাপি শোধয়েৎ ॥ ২৮২
আপদ্গতোহথবা বৃদ্ধা গর্ভিণী বাল এব বা।
পরিভাষণমর্হন্তি তচ্চ শোধ্যমিতি স্থিতিঃ ॥ মনু ৯ অ। ২৮৩

(১২) চিকিৎসকানাং সর্ব্বেষাং মিথ্যা প্রচরতাং দমঃ।
অমানুষেষু প্রথমো মানুষেষু চ মধ্যমঃ ॥ ২৮৪
অদূষিতানাং দ্রব্যাণাং দূষণে ভেদনে তথা।
মণীনামপবাধে চ দণ্ডঃ প্রথম সাহসঃ। ২৮৫। মনু ৯ অ।

চত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ

জন ষ্ট্যালকার্ট

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে প্রকাশ পাইয়াছে যে কুল্‌সমের সঙ্গে ওয়ারেন হেষ্টিংস সাহেবের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। কুল্‌সম্‌ আত্মবিবরণ সবিস্তারে কহিতে গিয়া, ফষ্টরের কার্য্য সকলের সবিশেষ পরিচয় দিল।

ইতিহাসে ওয়ারেন হেষ্টিংস পরপীড়ক বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। কর্ম্মঠ লোক কর্ত্তব্যানুরোধে অনেক সময়ে পরপীড়ক হইয়া উঠে। যাঁহার উপর রাজ্য-রক্ষার ভার, তিনি স্বয়ং দয়ালু এবং ন্যায়পর হইলেও রাজ্য-রক্ষার্থ পরপীড়ন করিতে বাধ্য হন। যেখানে দুই এক জনের উপর অত্যাচার করিলে, সমুদয় রাজ্যের উপকার হয়, সেখানে তাঁহারা মনে করেন যে সে অত্যাচার কর্ত্তব্য। বস্তুতঃ যাঁহারা ওয়ারেন হেষ্টিংসের ন্যায় সাম্রাজ্য-সংস্থাপনে সক্ষম, তাঁহারা যে দয়ালু এবং ন্যায়নিষ্ঠ নহেন, ইহা কখনও সম্ভব নহে। যাঁহার প্রকৃতিতে দয়া এবং ন্যায়পরতা নাই—তাঁহার দ্বারা রাজ্য-স্থাপনাদি মহৎ কার্য্য হইতে পারে না—কেন না তাঁহার প্রকৃতি উন্নত নহে—ক্ষুদ্র। এ সকল ক্ষুদ্রচেতার কার্য্য নহে।

ওয়ারেন হেষ্টিংস দয়ালু ও ন্যায়নিষ্ঠ ছিলেন। কুল্‌সম্‌কে বিদায় করিয়া তিনি ফষ্টরের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। দেখিলেন, ফষ্টর পীড়িত। প্রথমে তাহার চিকিৎসা করাইলেন। ফষ্টর উৎকৃষ্ট চিকিৎসকের চিকিৎসায় শীঘ্রই আরোগ্যলাভ করিল।

তাহার পরে, তাহার অপরাধের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। ভীত হইয়া, ফষ্টর তাঁহার নিকট অপরাধ স্বীকার করিল। ওয়ারেন হেষ্টিংস কৌন্সিলে প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া ফষ্টরকে পদচ্যুত করিলেন। হেষ্টিংসের ইচ্ছা ছিল যে, ফষ্টরকে বিচারালয়ে উপস্থিত করেন; কিন্তু সাক্ষীদিগের কোন সন্ধান নাই এবং ফষ্টরও নিজকার্য্যের অনেক ফলভোগ করিয়াছে, এই ভাবিয়া তাহাতে বিরত হইলেন।

ফষ্টর তাহা বুঝিল না। ফষ্টর অত্যন্ত ক্ষুদ্রাশয়। সে মনে করিল, তাহার লঘু পাপে গুরুদণ্ড হইয়াছে। সে ক্ষুদ্রাশয় অপরাধী ভৃত্যদিগের স্বভাবানুসারে পূর্ব্ব প্রভুদিগের প্রতি বিশেষ কোপাবিষ্ট হইল। তাহাদিগের বৈরিতাসাধনে কৃতসংকল্প হইল।

ডাইস্ সম্বর নামে এক জন সুইস্ বা জর্ম্মান মীরকাশেমের সেনাদলমধ্যে সৈনিক-কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। এই ব্যক্তি সমরু নামে বিখ্যাত হইয়াছিল। উদয়নালায় যবন শিবিরে সমরু সৈন্য লইয়া উপস্থিত ছিল। ফষ্টর উদয়নালায় তাহার নিকট আসিল। প্রথমে কৌশলে সমরুর নিকট দূত প্রেরণ করিল। সমরু মনে ভাবিল, ইহার দ্বারা ইংরেজদিগের গুপ্ত মন্ত্রণা সকল জানিতে পারিব। সমরু ফষ্টরকে গ্রহণ করিল। ফষ্টর, আপন নাম গোপন করিয়া, জন ষ্ট্যালকার্ট বলিয়া আপনার পরিচয় দিয়া, সমরুর শিবিরে প্রবেশ করিল। যখন আমীর হোসেন ফষ্টরের অনুসন্ধানে নিযুক্ত, তখন, লরেন্স ফষ্টর সমরুর তাম্বুতে।

আমীর হোসেন, কুল্‌সম্‌কে যথাযোগ্য স্থানে রাখিয়া, ফষ্টরের অনুসন্ধানে নির্গত হইলেন। অনুচরবর্গের নিকট শুনিলেন যে, এক আশ্চর্য্য কাণ্ড ঘটিয়াছে, একজন ইংরেজ আসিয়া মুসলমান সৈন্যভুক্ত হইয়াছে। সে সমরুর শিবিরে আছে। আমীর হোসেন সমরুর শিবিরে গেলেন।

যখন আমীর হোসেন সমরুর তাম্বুতে প্রবেশ করিলেন, তখন সমরু ও ফষ্টর একত্রে কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন। আমীর হোসেন আসন গ্রহণ করিলে সমরু জন ষ্ট্যালকার্ট বলিয়া তাঁহার নিকট ফষ্টরের পরিচয় দিলেন। আমীর হোসেন ষ্ট্যালকার্টের সঙ্গে কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন।

আমীর হোসেন, অন্যান্য কথার পর ষ্ট্যালকার্টকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “লরেন্স ফষ্টর নামক একজন ইংরেজকে আপনি চিনেন?”

ফষ্টরের মুখ রক্তবর্ণ হইয়া গেল। সে মৃত্তিকা পানে দৃষ্টি করিয়া, কিঞ্চিৎ বিকৃত কণ্ঠে কহিল, “লরেন্স ফষ্টর? কই—না।”

আমীর হোসেন, পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন, “কখন তাহার নাম শুনিয়াছেন?”

ফষ্টর কিছু বিলম্ব করিয়া উত্তর করিল—“নাম—লরেন্স ফষ্টর—হাঁ—কই? না।”

আমীর হোসেন আর কিছু বলিলেন না, অন্যান্য কথা কহিতে লাগিলেন। কিন্তু দেখিলেন, ষ্ট্যালকার্ট আর ভাল করিয়া কথা কহিতেছে না। দুই একবার উঠিয়া যাইবার উপক্রম করিল। আমীর হোসেন অনুরোধ করিয়া তাহাকে বসাইলেন। আমীর হোসেনের মনে মনে হইতেছিল যে, এ ফষ্টরের কথা জানে, কিন্তু বলিতেছে না।

ফষ্টর কিয়ৎক্ষণ পরে আপনার টুপি লইয়া মাথায় দিয়া বসিল। আমীর হোসেন জানিতেন যে, এটি ইংরেজদিগের নিয়ম বহির্ভূত কাজ। আরও, যখন ফষ্টর টুপি মাথায় দিতে যায়, তখন তাহার শিরঃস্থ কেশশূন্য আঘাত চিহ্নের উপর দৃষ্টি পড়িল। ষ্ট্যালকার্ট কি আঘাত-চিহ্ন ঢাকিবার জন্য টুপি মাথায় দিল?

আমীর হোসেন, বিদায় হইলেন। আপন শিবিরে আসিয়া, কুল্‌সম্‌কে ডাকিলেন; তাহাকে বলিলেন, "আমার সঙ্গে আয়।" কুল্‌সম্ তাঁহার সঙ্গে গেল।

কুল্‌সম্‌কে সঙ্গে লইয়া আমীর হোসেন পুনর্ব্বার সমরুর তাম্বুতে উপস্থিত হইলেন। কুল্‌সম্ বাহিরে রহিল। ফষ্টর তখনও সমরুর তাম্বুতে বসিয়াছিল। আমীর হোসেন সমরুকে বলিলেন, "যদি আপনার অনুমতি হয়, তবে আমার একজন বাঁদী আসিয়া আপনাকে সেলাম করে। বিশেষ কার্য্য আছে।"

আমীর সমরু অনুমতি দিলেন। ফষ্টরের হৃৎকম্প হইল—সে গাত্রোত্থান করিল। আমীর হোসেন হাসিয়া হাত ধরিয়া তাহাকে বসাইলেন। কুল্‌সম্‌কে ডাকিলেন। কুল্‌সম্ আসিল। ফষ্টরকে দেখিয়া, নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইল।

আমীর হোসেন, কুল্‌সম্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে এ?"

কুল্‌সম্ বলিল, "লরেন্স ফষ্টর।"

আমীর হোসেন ফষ্টরের হাত ধরিলেন। ফষ্টর বলিল, "আমি কি করিয়াছি?"

আমীর হোসেন তাহার কথার উত্তর না দিয়া সমরুকে বলিলেন, "সাহেব! ইহার গ্রেপ্তারীর জন্য নবাব নাজিমের অনুমতি আছে। আপনি আমার সঙ্গে শিপাহী দিন, ইহাকে লইয়া চলুক।"

সমরু বিস্মিত হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৃত্তান্ত কি?"

আমীর হোসেন বলিলেন, "পশ্চাৎ বলিব।" সমরু সঙ্গে প্রহরী দিলেন, আমীর হোসেন ফষ্টরকে বাঁধিয়া লইয়া গেলেন।

একচত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ

আবার বেদগ্রামে

বহুকষ্টে চন্দ্রশেখর শৈবলিনীকে স্বদেশে লইয়া আসিলেন।

বহুকাল পরে আবার গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, সে গৃহ, তখন অরণ্যাধিক ভীষণ হইয়া আছে। চালে প্রায় খড় নাই—প্রায় ঝড়ে উড়িয়া গিয়াছে; কোথায় বা চাল পড়িয়া গিয়াছে—গোরুতে খড় খাইয়া গিয়াছে—বাঁশ বাঁকারি পাড়ার লোকে পোড়াইতে লইয়া গিয়াছে। উঠানে নিবিড় জঙ্গল হইয়াছে—উরগজাতীয় নির্ভয়ে তন্মধ্যে ভ্রমণ করিতেছে। ঘরের কবাট সকল চোরে খুলিয়া

লইয়া গিয়াছে। ঘর খোলা—ঘরে দ্রব্য সামগ্রী কিছুই নাই, কতক চোরে লইয়া গিয়াছে—কতক সুন্দরী আপন গৃহে লইয়া গিয়া তুলিয়া রাখিয়াছে। ঘরে বৃষ্টি প্রবেশ করিয়া জল বসিয়াছে—কোথাও পচিয়াছে, কোথাও ছাতা ধরিয়াছে। ইন্দুর, আরসুলা, বাহুড় পালে পালে বেড়াইতেছে। চন্দ্রশেখর, শৈবলিনীর হাত ধরিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

নিরীক্ষণ করিলেন যে, ঐ খানে দাঁড়াইয়া, পুস্তক রাশি ভস্ম করিয়াছিলেন। মনে করিয়াছিলেন যে, গৃহত্যাগী হইব. সর্ব্বত্যাগী, সন্ন্যাসী হইব। আবার সেই গৃহে আসিতে হইল,—সর্ব্বত্যাগী হইতে পারেন নাই, সন্ন্যাসী হইতে পারেন নাই, কেন না অপরাধিনী শৈবলিনীকে ভুলিতে পারেন নাই। তাহার পর মনে করিয়াছিলেন, রাজবিপ্লব ঘটাইবেন, দ্বিতীয় চাণক্য হইবেন—কই তাও ত পারিলেন না—শৈবলিনী আবার জড়াইল। মনে করিয়াছিলেন, পরহিতব্রত সফল করিবেন, তাহাতেও শৈবলিনীকে ভুলিতে পারিলেন না, তবে আর কেন? শৈবলিনীই সকলের সার, শৈবলিনীই সংসার। চন্দ্রশেখর ডাকিলেন, "শৈবলিনি!"

শৈবলিনী কথা কহিল না; কক্ষদ্বারে বসিয়া পূর্ব্ব স্বপ্ন-দৃষ্ট করবীরের প্রতি নিরীক্ষণ করিতেছিল। চন্দ্রশেখর যত কথা কহিলেন, কোন কথার উত্তর দিল না—বিস্ফারিত লোচনে চারিদিগ্ দেখিতেছিল—একটু একটু টিপি টিপি হাসিতেছিল—একবার স্পষ্ট হাসিয়া অঙ্গুলির দ্বারা কি দেখাইল। চন্দ্রশেখর সাশ্রুলোচনে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন।

এদিগে পল্লীমধ্যে রাষ্ট্র হইল—চন্দ্রশেখর শৈবলিনীকে লইয়া আসিয়াছেন। অনেকে দেখিতে আসিতেছিল। সুন্দরী সর্ব্বাগ্রে আসিল।

সুন্দরী শৈবলিনীর ক্ষিপ্তাবস্থার কথা কিছু শুনে নাই। প্রথমে আসিয়া চন্দ্রশেখরকে প্রণাম করিল। শৈবলিনীর প্রতি চাহিয়া বলিল, "তা, ওকে এনেছ বেশ করেছ। প্রায়শ্চিত্ত করিলেই হইল।"

কিন্তু সুন্দরী দেখিয়া বিস্মিত হইল যে, চন্দ্রশেখর রহিয়াছে, তবু শৈবলিনী সরিলও না, ঘোমটাও টানিল না, বরং সুন্দরীর পানে চাহিয়া খিল খিল করিয়া হাসিতে লাগিল। সুন্দরী ভাবিল, "এ বুঝি ইংরিজি ধরণ, শৈবলিনী ইংরেজের সংসর্গে শিখিয়া আসিয়াছে!" এই ভাবিয়া, শৈবলিনীর কাছে গিয়া বসিল—একটু তফাৎ রহিল, কাপড়ে কাপড় না ঠেকে। হাসিয়া শৈবলিনীকে বলিল, "কি লা! চিন্‌তে পারিস্?"

শৈবলিনী বলিল, "পারি—তুই পার্ব্বতী।"

সুন্দরী বলিল—"মরণ আর কি! তিনদিনে ভুলে গেলি?"

শৈবলিনী বলিল, "ভুলব কেন লো—সেই যে তুই আমার ভাত ছুঁয়ে ফেলেছিলি বলিয়া, আমি তোকে মেরে গুঁড়া নাড়া কল্লুম। পার্ব্বতী দিদি একটি গীত গা না ?

আমার মরম কথা তাই লো তাই,
আমার শ্যামের বামে কই সে রাই ?
আমার মেঘের কোলে কই সে চাঁদ ?
মিছে লো পেতেছি পিরিতি ফাঁদ।

কিছু ঠিক পাইনে পার্ব্বতী দিদি—কে যেন নেই—কে যেন ছিল, সে যেন নেই—কে যেন আসবে, সে যেন আসে না—কোথা যেন এয়েছি, সেখানে যেন আসি নাই—কাকে যেন খুঁজি, তাকে যেন চিনি না।"

সুন্দরী বিস্মিতা হইল—চন্দ্রশেখরের মুখ পানে চাহিল—চন্দ্রশেখর সুন্দরীকে কাছে ডাকিলেন। সুন্দরী নিকটে আসিলে তাহার কর্ণে বলিলেন, "পাগল হইয়া গিয়াছে।"

সুন্দরী তখন বুঝিল। কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিল। সুন্দরীর চক্ষু প্রথমে চক্‌চকে হইল, তার পরে পাতার কোলে ভিজা ভিজা হইয়া উঠিল, শেষ জলবিন্দু ঝরিল—সুন্দরী কাঁদিতে লাগিল। স্ত্রীজাতিই সংসারের রত্ন! এই সুন্দরী আর একদিন কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করিয়াছিল, শৈবলিনী যেন নৌকা সহিত জলমগ্ন হইয়া মরে। আজি সুন্দরীর ন্যায় শৈবলিনীর জন্য কেহ কাতর নহে।

সুন্দরী আসিয়া ধীরে ধীরে, চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে, শৈবলিনীর কাছে বসিল—ধীরে ধীরে কথা কহিতে লাগিল—ধীরে ধীরে পূর্ব্ব কথা স্মরণ করাইতে লাগিল—শৈবলিনী কিছু স্মরণ করিতে পারিল না। শৈবলিনীর স্মৃতির বিলোপ ঘটে নাই—তাহা হইলে পার্ব্বতী নাম মনে পড়িবে কেন ? কিন্তু প্রকৃত কথা মনে পড়ে না—বিকৃত হইয়া, বিপরীতে বিপরীত সংলগ্ন হইয়া মনে আসে। সুন্দরীকে মনে ছিল, কিন্তু সুন্দরীকে চিনিতে পারিল না।

সুন্দরী, প্রথমে চন্দ্রশেখরকে আপনাদিগের গৃহে স্নানাহারের জন্য পাঠাইলেন; পরে সেই ভগ্ন গৃহ শৈবলিনীর বাসোপযোগী করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রমে ক্রমে, প্রতিবাসিনীরা একে একে আসিয়া তাঁহার সাহায্যে প্রবৃত্ত হইল; আবশ্যকীয় সামগ্রী সকল আসিয়া পড়িতে লাগিল।

এদিকে প্রতাপ মুঙ্গের হইতে প্রত্যাগমন করিয়া, লাঠিয়াল সকলকে যথাস্থানে সমাবেশ করিয়া, একবার গৃহে আসিয়াছিলেন। গৃহে আসিয়া শুনিলেন, চন্দ্রশেখর গৃহে আসিয়াছেন। ত্বরায় তাঁহারে দেখিতে বেদগ্রামে আসিলেন।

সেইদিন রমানন্দস্বামীও সেই স্থানে পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি অনুসারে, আসিয়া দর্শন দিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, ঔষধ লইয়া যাইব। বলিলেন, ঔষধ আনিয়াছি। ইহা অব্যর্থ, কিন্তু শুভক্ষণে সেবন করাইতে হইবে।

চন্দ্রশেখর, গণনা করিয়া বলিলেন, আজি রাত্রি চারিদণ্ডের পর উত্তম সময়। সেই সময়ে ঔষধ সেবন করান স্থির হইল।

দ্বিচত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ

যোগবল না Psychic Force ?

ঔষধ কি তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু ইহা সেবন করাইবার জন্য, রমানন্দস্বামী বিশেষরূপে আত্মশুদ্ধি করিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি সহজে জিতেন্দ্রিয়, ক্ষুৎপিপাসাদি শারীরিক বৃত্তি সকল অন্যাপেক্ষা তিনি বশীভূত করিয়াছিলেন ; কিন্তু এক্ষণে তাহার উপরে কঠোর অনশন ব্রত আচরণ করিয়া আসিয়াছিলেন। মনকে কয়দিন হইতে ঈশ্বরের ধ্যানে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন—পারমার্থিক চিন্তা ভিন্ন অন্য কোন চিন্তা মনে স্থান পায় নাই।

অবধারিত কালে, রমানন্দস্বামী ঔষধ সেবনার্থ উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। শৈবলিনীর জন্য শয্যারচনা করিতে বলিলেন, সুন্দরীর নিযুক্তা পরিচারিকা শয্যা রচনা করিয়া দিল।

রমানন্দস্বামী তখন সেই শয্যায় শৈবলিনীকে শুইতে অনুমতি করিলেন। সুন্দরী শৈবলিনীকে ধরিয়া বলপূর্ব্বক শয়ন করাইল—শৈবলিনী সহজে কথা শুনে না। সুন্দরী গৃহে গিয়া স্নান করিবে—প্রত্যহ করে।

রমানন্দস্বামী, তখন সকলকে বলিলেন, "তোমরা একবার বাহিরে যাও। আমি ডাকিবামাত্র আসিও।"

সকলে বাহিরে গেল—কেবল চন্দ্রশেখর রহিলেন। রমানন্দস্বামী চন্দ্রশেখরকে বলিলেন, "তুমিও যাও। সকলকে লইয়া এতদ্দূরে অবস্থিতি কর যে, আমার পাঠ্য মন্ত্র কেহ না শুনিতে পায়। আমি ডাকিবামাত্র আসিও।"

চন্দ্রশেখর গৃহের বাহিরে গিয়া তদ্রূপ করিলেন, রমানন্দস্বামীর হস্তে ঔষধি প্রস্তুত।

সকলে বাহিরে গেলে, রমানন্দস্বামী ঔষধ মাটিতে রাখিলেন। শৈবলিনীকে বলিলেন "উঠিয়া বস দেখি।"

শৈবলিনী, মৃদু মৃদু গীত গায়িতে লাগিল—উঠিল না। রমানন্দস্বামী স্থির দৃষ্টিতে তাহার নয়নের প্রতি নয়ন স্থাপিত করিয়া বসিয়া রহিলেন—ক্রমে, শৈবলিনী ভীতা হইয়া উঠিয়া বসিল।

রমানন্দস্বামী তাহাকে বলিলেন, "একটি কথা কহিবে না কেবল আমার চক্ষের প্রতি চাহিয়া থাকিবে।"

উন্মাদিনী আরও ভীতা হইয়া তাহাই করিল। তখন, রমানন্দস্বামী তাহার ললাট, চক্ষু প্রভৃতির নিকট নানাপ্রকার বক্রগতিতে হস্ত সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। এইরূপ কিছুক্ষণ করিতে করিতে শৈবলিনীর চক্ষু বুজিয়া আসিল—অচিরাৎ শৈবলিনী ঢুলিয়া পড়িল—ঘোর নিদ্রাভিভূত হইল।

তখন রামানন্দস্বামী ডাকিলেন, "শৈবলিনি!"

শৈবলিনী নিদ্রিতাবস্থায় বলিল, "আজ্ঞে।"

রমানন্দস্বামী বলিলেন "আমি কে?"

শৈবলিনী পূর্ব্ববৎ নিদ্রিতা—কহিল, "রমানন্দস্বামী।"

র। তুমি কে?

শৈ। শৈবলিনী।

র। শৈবলিনী কে?

শৈ। স্বামীর নাম করিতে নাই।

র। বল।

শৈ। চন্দ্রশেখরের স্ত্রী।

র। এ কোন্ স্থান?

শৈ। বেদগ্রাম—আমার স্বামীর গৃহ।

র। বাহিরে কে কে আছে?

শৈ। আমার স্বামী, প্রতাপ ও সুন্দরী।

র। তুই এস্থান হইতে গিয়াছিলি কেন?

শৈ। ফষ্টর সাহেব লইয়া গিয়াছিল বলিয়া।

র। এ সকল কথা এতদিন তোর মনে পড়ে নাই কেন?

শৈ। মনে ছিল—ঠিক করিয়া বলিতে পারিতেছিলাম না।

র। কেন?

শৈ। আমি পাগল হইয়াছি।

র। সত্য সত্য না কাপট্য আছে?

শৈ। সত্য সত্য, কাপট্য নাই।

র। তবে? এখন

শৈ। এখন এযে স্বপ্ন—এ আপনার গুণে জ্ঞানলাভ করিয়াছি।

র। তবে সত্য কথা বলিবি?

শৈ। বলিব।

র। তুই ফষ্টরের সঙ্গে গেলি কেন?

শৈ। প্রতাপের জন্য।

রমানন্দ চমকিয়া উঠিলেন—সহস্র চক্ষে বিগত ঘটনা সকল পুনর্দ্দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রতাপ কি তোমার জার?"

শৈ। ছি! ছি!

র। তবে কি?

শৈ। এক বোঁটায় আমরা দুইটি ফুল, এক বনমধ্যে ফুটিয়াছিলাম—ছিঁড়িয়া পৃথক্ করিলে কেন?

রমানন্দস্বামী, অতি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। তাঁহার অপরিসীম বুদ্ধিতে কিছু লুক্কায়িত রহিল না। জিজ্ঞাসা করিলেন, "যেদিন প্রতাপ ম্লেচ্ছের নৌকা হইতে পলাইল, সেদিনের গঙ্গায় সাঁতার মনে পড়ে?"

শৈ। পড়ে।

র। কি কি কথা হইয়াছিল?

শৈবলিনী সংক্ষেপে আনুপূর্ব্বিক বলিল। শুনিয়া, রমানন্দস্বামী মনে মনে প্রতাপকে অনেক সাধুবাদ করিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে তুমি ফষ্টরের সঙ্গে বাস করিলে কেন?"

শৈ। বাস মাত্র। যদি পুরন্দরপুরে গেলে, প্রতাপকে পাই, এই ভরসায়।

র। বাস মাত্র—তবে কি তুমি সাধ্বী?

শৈ। প্রতাপকে মনে মনে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলাম—এজন্য আমি সাধ্বী নহি—মহাপাপিষ্ঠা।

র। নচেৎ?

শৈ। নচেৎ সম্পূর্ণ সতী।

র। ফষ্টর সম্বন্ধে?

শৈ। কায়মনোবাক্যে।

রমানন্দস্বামী খর খর দৃষ্টি করিয়া, হস্ত সঞ্চালন করিয়া, কহিলেন, "সত্য বল।"

নিদ্রিতা যুবতী ভ্রূ কুঞ্চিত করিল বলিল—"সত্যই বলিয়াছি।"

রমানন্দস্বামী আবার নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন, বলিলেন, "তবে ব্রাহ্মণ-কন্যা হইয়া জাতি ভ্রষ্ট হইতে গেলে কেন?"

শৈ। আপনি সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী। বলুন, আমি জাতিভ্রষ্ট কি না। আমি তাহার অন্ন খাই নাই—তাহার স্পৃষ্ট জলও খাই নাই। প্রত্যহ স্বহস্তে পাক করিয়া

খাইয়াছি। হিন্দু পরিচারিকায় আয়োজন করিয়া দিয়াছে। এক নৌকায় বাস করিয়াছি বটে—কিন্তু গঙ্গার উপর।

রমানন্দস্বামী অধোবদন হইয়া বসিলেন;—অনেক ভাবিলেন—বলিতে লাগিলেন, "হায়! হায়! কি কুকর্ম্ম করিয়াছি—স্ত্রীহত্যা করিতে বসিয়াছিলাম।" ক্ষণেক পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ সকল কথা কাহাকেও বল নাই কেন?"

শৈ। আমার কথায় কে বিশ্বাস করিবে?

র। এ সকল কথা কে জানে?

শৈ। ফষ্টর, আর পার্ব্বতী।

র। পার্ব্বতী কোথায়?

শৈ। মাসাবধি হইল মুঙ্গেরে মরিয়া গিয়াছে।

র। ফষ্টর কোথায়?

শৈ। নিকটে—উদয়নালায়, নবাবের শিবিরে।

রমানন্দ স্বামী কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার রোগের কি প্রতিকার হইবে—বুঝিতে পার?"

শৈ। আপনার যোগবল আমাকে দিয়াছেন—তৎপ্রসাদে জানিতে পারিতেছি—আপনার শ্রীচরণ কৃপায়, আপনার ঔষধে আরোগ্যলাভ করিব।

র। আরোগ্য লাভ করিলে, কোথা যাইতে ইচ্ছা কর?

শৈ। যদি বিষ পাই, ত খাই—কিন্তু নরকের ভয় করে।

র। মরিতে চাও কেন?

শৈ। এ সংসারে আমার স্থান কোথায়?

র। কেন, তোমার স্বামীর গৃহে?

শৈ। স্বামী আর গ্রহণ করিবেন?

র। যদি করেন?

শৈ। তবে কায়মনে তাঁহার পদসেবা করি।

এই সময়ে দূরে অশ্বের পদশব্দ শুনা গেল। রমানন্দস্বামী জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার যোগবল পাইয়াছ বলিতেছ—বল ও কিসের শব্দ?"

শৈ। ঘোড়ার পায়ের শব্দ।

র। কে আসিতেছে?

শৈ। মহম্মদ ইরফান—নবাবের সৈনিক।

র। কেন আসিতেছে?

শৈ। আমাকে লইয়া যাইতে—নবাব আমাকে দেখিতে চাহিয়াছেন।

র। ফষ্টর সেখানে গেলে পরে তোমাকে দেখিতে চাহিয়াছিলেন, না তৎপূর্ব্বে ?

শৈ। না। দুই জনকে আনিতে একসময় আদেশ করেন।

র। কোন চিন্তা নাই। নিদ্রা যাও।

এই বলিয়া রমানন্দস্বামী চন্দ্রশেখর প্রভৃতিকে ডাকিলেন। তাহারা আসিলে বলিলেন যে, "এ নিদ্রা যাইতেছে। নিদ্রাভঙ্গ হইলে, এই পাত্রস্থ ঔষধ খাওয়াইও। সম্প্রতি, নবাবের সৈনিক আসিতেছে—কল্য শৈবলিনীকে লইয়া যাইবে। তোমরা সঙ্গে যাইও।"

সকলে বিস্মিত ও ভীত হইল। চন্দ্রশেখর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন ইহাকে নবাবের নিকট লইয়া যাইবে ?"

রমানন্দস্বামী বলিলেন, "এখনই শুনিবে। চিন্তা নাই।"

মহম্মদ ইরফান আসিলে, প্রতাপ তাঁহার অভ্যর্থনায় নিযুক্ত হইলেন। এদিগে, যথাকালে রমানন্দস্বামী, শৈবলিনীকে মহৌষধ সেবন করাইলেন।

জৈনধর্ম্ম

বৌদ্ধ ধর্ম্মের অবসানেই জৈনধর্ম্মের সমুন্নতি। শাক্যসিংহের উপদেশ-মালা অসাধারণ চিন্তাশীল ধর্ম্মপরিব্রাজকগণ গ্রহণ করিয়া তত্তৎকালীন ভূমণ্ডলের সুসভ্য জনপদে অভিনব ধর্ম্মের সুস্নিগ্ধ বারি সিঞ্চন করত বৌদ্ধধর্ম্মের উৎস চতুর্দ্দিগে উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। ধর্ম্মের নানা মতভেদ উপস্থিত হইলেই মহাবিপ্লব ঘটিয়া থাকে, বৌদ্ধধর্ম্মের তাহাই ঘটিল এবং ক্রমে ভারতবর্ষে উহা হীন-প্রভা ধারণ করিল। এই অবসরে জৈন ধর্ম্ম শনৈঃ শনৈঃ পাদবিক্ষেপ করিতে করিতে মহাজনের ধর্ম্ম হইয়া উঠিল। সদ্‌বিদ্বান্‌গণ আচার্য্যের উপদেশ মূলভিত্তি স্বরূপ গ্রহণ করিয়া জৈনধর্ম্মের নানা গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং ক্রমেই ধর্ম্মের সমুন্নতি হইতে চলিল। বৌদ্ধধর্ম্মের ন্যায় জৈনধর্ম্ম প্রগাঢ় কল্পনাপ্রসূত নহে, সুতরাং ইহা ভারতবর্ষ ভিন্ন অন্য দেশে আদৃত হয় নাই। বৌদ্ধধর্ম্মের ছায়া লইয়া ইহা নির্ম্মিত এবং বৌদ্ধধর্ম্মের নীতি-মালা ইহাতে গৃহীত হইয়াছে; কিন্তু তথাপি মূলপত্তন সারহীন এবং নিস্তেজঃ। জৈনধর্ম্ম হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম্মের মধ্যবর্ত্তী ধর্ম্ম, ইহাতে পৌত্তলিক উপাসনার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কিছুমাত্র পরিত্যক্ত হয় নাই, এজন্য ইহার অভিনবত্ব কিছুই নাই বলিলেই হয়। সংস্কৃত এবং প্রাকৃত ভাষায় জৈন গ্রন্থ সকল রচিত হইয়াছে। প্রথম সূত্র গ্রন্থ; ইহাতে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় গুহ্যকথা সমুদায় জ্ঞাত হওয়া যায়; তাহার মধ্যে কল্পসূত্র, দশ বৈকালিকসূত্র, ক্ষেত্র সমাসসূত্র, চতুর্ব্বিংশতি সূত্র, নবতত্ব সূত্র, প্রতিক্রমণ সূত্র, সংগ্রহণী সূত্র, স্মরণসূত্র, পক্ষীসূত্র অতি প্রসিদ্ধ। ইহা ভিন্ন একবিংশতি স্থান, উপদেশমালা, বালা-বিবোধ, উপাধান বিধি, প্রশ্নোত্তর—রত্নমালা, আত্মানুশাসন, আরাধনা প্রকার প্রভৃতি জ্ঞান কাণ্ডের বহুবিধ গ্রন্থ আছে। শান্তিজিনস্তব, বৃহৎ শান্তিস্তব, মহাবীর স্তব, ঋষভ স্তব, পার্শ্বনাথ স্তব, কল্যাণ মন্দির স্তোত্র প্রভৃতি স্তবগ্রন্থ। পুরাণ অনেকগুলি এবং সেগুলি হিন্দুদিগের পুরাণের প্রণালীতে রচিত; তাহার মধ্যে এক্ষণে পদ্মপুরাণ, মহাবীর চরিত, নেমি রাজর্ষি চরিত, চিত্রসেন চরিত, মৃগাবতী চরিত, গজসিংহ চরিত, সাধু চরিত প্রভৃতি সুপ্রাপ্য। অধিকাংশ জৈন গ্রন্থ প্রাকৃত ভাষায় রচিত। বৌদ্ধ-

ধর্ম্মের ন্যায় সাধারণের বোধাধিকারার্থ প্রসিদ্ধ জৈন গ্রন্থ নিচয় এই ভাষায় রচিত হইয়াছে এবং পণ্ডিতগণের জন্য কতিপয় প্রসিদ্ধ গ্রন্থের টীকাও সংস্কৃত ভাষায় আছে। সুপ্রসিদ্ধ জৈন কোষকার হেমচন্দ্রও প্রাকৃত ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিয়া সংস্কৃত ভাষায় তাহার টীপ্পনী লিখিয়া দিয়াছেন। জৈনদিগের গ্রন্থ মধ্যে কল্পসূত্র অতীব আদরণীয়। এই গ্রন্থ মহাবীরের পরলোক গমনের ৯৮০ বৎসর পর অর্থাৎ ৪১১ খৃঃ অঃ রচিত হয়, কিন্তু কেহ কেহ অনুমান করেন যে উহা ৬৩২ খৃঃ অঃ রচিত হইয়াছিল। গ্রন্থকার ভদ্রবহু গুজরাট নিবাসী, তিনি ধ্রুবসেনের রাজ্যশাসন সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন, ইহাতে ষ্টীভিন্‌সন সাহেব অনুমান করেন, তিনি চারিশত খ্রীষ্টাব্দের লোক। কল্পসূত্রের চারিখানি টীকা পঞ্চদশ হইতে সপ্তদশ খৃঃ অঃ মধ্যে রচিত। যশোবিজয় কৃত সংস্কৃত টীকা অতি বিশদ। দেবীচন্দ্র কল্পসূত্রের গুজরাটী অনুবাদ করিবার সময় জ্ঞান-বিমল ও সময়-সুন্দর নামক টীকাদ্বয় ব্যবহার করিয়াছিলেন। ভাদ্র মাসের অষ্টদিবস জৈনাচার্য্যগণ প্রসিদ্ধ জৈনগ্রন্থ সকল অধ্যয়ন করেন, তাহার মধ্যে পঞ্চদিবস কেবল কল্পসূত্র পাঠ করিয়া থাকেন। কল্পসূত্রে লিখিত আছে, যেমন বিশ্বমধ্যে অর্হতের ন্যায় পরম দেবতা ও মুক্তির ন্যায় পরম পদ আর নাই (নার্হতঃ পরমো দেবো ন মুক্তেঃ পরমং পদং) তদ্রূপ শ্রীকল্পসূত্রের ন্যায় ভুবনত্রয়ে ধর্ম্মগ্রন্থ আর বর্ত্তমান নাই। কল্পসূত্র সর্ব্ব গ্রন্থের শিরোরত্ন স্বরূপ। এই কল্পদ্রুমের শ্রীবীর-চরিত্র বীজ, শ্রীপার্শ্ব-চরিত্র অঙ্কুর, শ্রীঋষভ-চরিত বৃক্ষমূল এবং শাখা, শ্রীনেমি-চরিত বৃন্ত, স্থবিরাবলী মুকুল, সমাচারিজ্ঞান সুগন্ধ এবং মোক্ষ ইহার ফল; অধিক কি, ইহার অধ্যয়নে জীব জরা মরণ প্রভৃতি সাংসারিক কষ্ট হইতে মুক্ত হইয়া মোক্ষমার্গে গমন করেন। এইরূপ কল্পসূত্র সম্বন্ধে অনেক ফলশ্রুতি আছে, তাহা সঙ্কলন করিতে হইলে প্রস্তাব বাহুল্য হইয়া উঠে। ভদ্রবহু এই গ্রন্থ দশ শ্রুত স্কন্ধ অষ্টমাধ্যায়ন এবং প্রত্যাখ্যান হইতে সঙ্কলন করেন। কল্পসূত্র তিন ভাগে বিভক্ত, যথা—প্রথম পরিচ্ছেদে প্রথম হইতে শেষ জিন চরিত কথা, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে স্থবিরাবলী বর্ণন, এবং তৃতীয় পরিচ্ছেদে সমাচারী সূত্র ব্যাখ্যান। আমরা কল্পসূত্র হইতে এই প্রস্তাবে অনেক প্রমাণ উদ্ধৃত করিলাম।

মহাবীর কর্ত্তৃক জৈন ধর্ম্ম প্রচারিত হয়। ইনি জৈনদিগের চতুর্ব্বিংশতি তীর্থঙ্কর *, এজন্য হেমচন্দ্রের মতে ইহার অপর নাম অন্তিম জিন। মহাবীর চরিত অনুসারে ইনিই প্রথমে শত্রুমর্দ্দনের রাজ্যশাসন কালে বিজয় নগরের একটী গ্রামে নয়সার নামে প্রধান গ্রাম্য লোক ছিলেন। তাঁহার পুণ্যকর্ম্মজন্য মায়াময় মনুষ্য দেহ পরিত্যক্ত হইলেই সৌধর্ম্মনামক স্বর্গলোকে গমন করিয়া বহুকাল পরে প্রথম

---

* "তীর্য্যতে সংসারসমুদ্রোঽনেনেতি তীর্থং তৎকরোতীতি তীর্থঙ্করঃ" হেমচন্দ্র টীকা।

তীর্থঙ্কর ঋষভ দেবের পৌত্র মরীচি নামে ভূমণ্ডলে জন্ম পরিগ্রহণ করত ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। তৎপরে কয়েক বার বিলাসপ্রিয় ব্রাহ্মণ হইয়া জন্মগ্রহণ করত ক্রমে কয়েক লক্ষ বৎসর জৈন স্বর্গে বাস করিয়া অবশেষে রাজগৃহের নৃপতি বিশ্বভূত নামে ধরামণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাহার পরে ক্রমান্বয়ে ত্রিপৃষ্ট, চক্রবর্ত্তী, প্রিয় মিত্র, এবং তৃতীয় বার সন্ন্যাসধর্ম্মরত নন্দন নামে জন্মগ্রহণ করেন। নন্দনের মৃত আত্মা কুন্দ গ্রামের কোদল বংশোদ্ভব ঋষভ দত্ত নামক ব্রাহ্মণের সহধর্ম্মিণী দেব নন্দীর গর্ভে প্রবেশ করিলে, তিনি এক অপূর্ব্ব স্বপ্ন দেখিতে পাইলেন। এই স্বপ্নে তিনি হস্তী, বৃষ, সিংহ, লক্ষ্মী, পুষ্পমালা, চন্দ্র, সূর্য্য, সৈনিক, কুম্ভ, পদ্ম-শোভিত সরোবর, সাগর, ঋগ্যাশ্রম, মুক্তাবলী এবং নির্ধূম পাবক দেখিতে পাইলেন, যথা।—

গয়, বসহ, সীহ, অভিসেয্য, দাম, সসি, দিনয়রং, ঝয়ং, কুম্ভ, পউমসর, সাগর, বিমান ভবন, রয়ণুক্কয়, সিহিচ।

জলন্ধারবংশোদ্ভবা দেবনন্দী এই স্বপ্নদৃষ্টে অতীব চিন্তাকুল চিত্তে স্বামীর নিকট সমুদয় বিজ্ঞাপন করিলেন। ঋষভ দত্ত তপস্বী, জ্ঞানবান্, তিনি যোগবলে স্বপ্নবিবরণ সমুদয় জ্ঞাত হইয়া প্রীতিপ্রফুল্ল চিত্তে ব্রাহ্মণীকে কহিলেন, তোমার গর্ভে এবারে এক মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিবেন; তিনি রূপে শশধরের ন্যায় এবং বিদ্যায় বৃহস্পতি তুল্য। সেই বালক যৌবন প্রাপ্ত হইলে ঋক্-যজুঃ-সাম-অথর্ব্ব এই বেদ চতুষ্টয় এবং ইতিহাস, পুরাণ (ইহাও বেদের অংশ বিশেষ) নির্ঘণ্টু (বৈদিক শব্দ সংগ্রহ), শিক্ষাকল্প প্রভৃতি বেদাঙ্গ নিচয়ের স্মারক ও ধারণক্ষম হইবেন। পূর্ব্বোক্ত ষড়ঙ্গ বিশেষরূপে অবগত হইবেন। ষষ্ঠীতন্ত্র কাপিল শাস্ত্রে (অর্থাৎ ষষ্ঠীপন্থা সাংখ্যদর্শন) পণ্ডিত হইবেন। গণিত শাস্ত্রে কুশল হইবেন। যজ্ঞবিদ্যায়, ব্যাকরণবিদ্যায়, ছন্দঃশাস্ত্রে, জ্যোতিঃশাস্ত্রে, এবং ব্রাহ্মণ বাক্যে (বেদভাগ বিশেষ) সন্ন্যাস শাস্ত্রে অতিশয় নিপুণ হইবেন। † এতচ্ছ্রবণে ব্রাহ্মণীর আর আনন্দের সীমা রহিল না, কিন্তু দেবলীলা মনুষ্যের বোধগম্য নহে। দেবরাজ মহেন্দ্র দেখিলেন পূর্ব্বপরম্পরা অর্হত, চক্রবর্ত্তী, এবং বাসুদেবের জন্ম ইক্ষাকু এবং হরিবংশ মধ্যে হইয়াছে, তাহাতে এপ্রকার দরিদ্র ব্রাহ্মণের গৃহে তীর্থঙ্করের জন্মগ্রহণ অতীব লজ্জাকর; এজন্য মায়াবলে দেবনন্দীর গর্ভ হইতে শেষ তীর্থঙ্করকে ভারত ক্ষেত্রের রাবণ নগরের অধীশ্বর কাশ্যপবংশোদ্ভব সিদ্ধার্থ নৃপতির রাজ্ঞী ত্রিশলার গর্ভে সঞ্চালন করিলেন। পুত্র প্রসবে রাজ্ঞী ত্রিশলার আনন্দের সীমা রহিল না।

---

† রুবন গমসুপাতে। রিউবেয়। জউব্বেয়। সাম বেয়। অথর্ব্বণ বেয়। ইতিহাস পঞ্চমাণং। নির্ঘংণ্টু ছট্টানং। সঙ্গোবং গগানং। চউন্ন বেয়ানং। সারই। বারই। ধারই। সডংগবী। সট্টি তন্ত বিসারই। সিখানে। সিখাকপ্পে। বাগরণে। ছন্দে। নিরুত্তে। জোই সামরণে। অণসুগ। বংভণ্ণ এসু। পরিব্বায়এসু। সুপরি নিট্টিটএ। আবিভবিসই।

স্বর্গে বিদ্যাধরীগণ পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিলেন, বিশ্বমধ্যে স্থাবর জঙ্গম আনন্দে পুলকিত হইল। নৃপতি পুত্রের নাম বর্দ্ধমান রাখিলেন এবং শক্র তাঁহার দেবতা ও মনুষ্যের উপর কর্ত্তৃত্ব জন্য তাঁহার মহাবীর আখ্যা প্রদান করিলেন।

মহাবীর বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে সমরবীর নৃপতির কন্যা যশোদার পাণি পীড়ন করিলেন। এই উদ্বাহের অল্পকাল পরেই তাঁহার প্রিয়দর্শনা নাম্নী একটী কন্যা জন্মিল। এই কন্যার কুমার জামলি পাণিগ্রহণ করেন। ইতিমধ্যে মহাবীরের পিতামাতার মৃত্যু হইল; ইহাতে তিনি সংসার অনিত্য, ক্ষণভঙ্গুর স্থির করিয়া, তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নন্দিবর্দ্ধনকে রাজ্যভার প্রদান করতঃ যতিধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। ক্রমাগত দুই বৎসর ইন্দ্রিয় সংযম দ্বারা তিনি জিনত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

তাঁহার বহু দর্শনে ক্রমে জ্ঞানের উন্নতি হইতে লাগিল এবং ৬ বৎসর কাল যোগাভ্যাসে নিযুক্ত হইলেন। সিদ্ধার্থ নামক যক্ষ গোপনে তাঁহার সহায় হইয়া বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতি করিতে লাগিলেন। রাজগৃহের নলন্দ নামক গ্রামে মহাবীরের গোশল নামক নীচকুলোদ্ভব এক শিষ্য হইল। এব্যক্তির আচার ব্যবহারে পল্লীর অনেক লোকের সহিত বিবাদ ঘটিত। একদা পার্শ্বনাথ জিনের মতাবলম্বী বর্দ্ধন সূরির শিষ্যগণের সহিত বসন পরিধান সম্বন্ধে বিবাদ ঘটিল। গোশল মহাবীরের মতাবলম্বী দিগম্বর, তিনি পার্শ্বনাথের মতাবলম্বী শ্বেতাম্বর জৈনগণকে তাড়না করাতে, তাহারা কহিল, "নির্গ্রন্থাঃ পার্শ্বশিষ্যাঃ বয়ং"। তাহাতে গোশল প্রত্যুত্তর করিল "কথন্নু যূয়ং নির্গ্রন্থা বস্ত্রাদি গ্রন্থধারিণঃ। কেবলং জীবিকা হেতোরিয়ং পাষণ্ডকল্পনা। বস্ত্রাদিসঙ্গরহিতো নিরপেক্ষো বপুষ্যপি। ধর্ম্মাচার্য্যো হি যাদৃঙ্মে নির্গ্রন্থাস্তাদৃশাঃ খলু।"[*]

মহাবীর এইরূপ সশিষ্য ৬ বৎসর মগধে ও অযোধ্যায় পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। বজ্র ভূমি, সুদ্ধি ভূমি এবং লাট বা লাড় দেশীয় গোপগণ তাঁহার প্রতি অত্যন্ত উৎপীড়ন করিয়াছিল, তাহাতে তিনি কিছুমাত্র ক্ষুব্ধচিত্ত হয়েন নাই। এ সময় তাঁহার এক শিষ্য তেজঃ লেশ্য যোগ শিক্ষা করিয়া স্বয়ং জিনত্ব [†] প্রাপ্ত হইয়াছে বিবেচনায় তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিল কিন্তু দেবরাজ ইন্দ্রের কৃপায় কেহই পূর্ণমনোরথ হয় নাই। তিনি কৌশাম্বীতে গমন করিলে নৃপতি শতানীক

---

[*] আমরা ভগবান্ পার্শ্বনাথের শিষ্য, আমরা নির্গ্রন্থ অর্থাৎ কোন বন্ধন আমাদের নাই। তদুত্তরে গোশল কহিল, "তোমাদের কোনও বন্ধন নাই এ কেমন কথা? বিলক্ষণ বস্ত্র গ্রন্থি দেখিতেছি। হায়! হায়! কোন পাষণ্ড ব্যক্তি এই কল্পনা কেবল জীবিকা নির্ব্বাহের জন্যই করিয়াছে সন্দেহ নাই। আমাদের ধর্ম্মাচার্য্য যেমন বাহ্য শরীরে বস্ত্রাদিসঙ্গরহিত, তেমনি অন্তরেও সঙ্গরহিত। আমাদের অন্তর্বহিঃ কোথাও বন্ধন অপেক্ষা করে না।

[†] জয়তি রাগদ্বেষ মোহানিতি জিনঃ। হেমচন্দ্র টীকা॥

তাঁহার বিশেষ আদর করিয়াছিলেন। এই সময় দ্বাদশবর্ষ পর্য্যন্ত উপবাসাদি শারীরিক কষ্ট স্বীকার করিয়া সিদ্ধ হইলেন। তাঁহার বৈশাখ মাসে ঋজুপালিকা নদী তীরস্থ শালবৃক্ষমূলে জপ করিতে করিতে কেবল জ্ঞানলাভ হইল। এই জ্ঞানই জৈন ধর্ম্মের চরম সীমা। এক্ষণে মহাবীর জিনপদবাচ্য হইলেন। ইন্দ্রাদি দেবগণ তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন এবং অসংখ্য শিষ্য তাঁহার উপদেশে মুগ্ধ হইল। তিনি অপাপ পুরীতে গমন করিয়া জীবনের মোক্ষ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিবিধ বক্তৃতা করত মগধের অনেক ব্রাহ্মণকে শিষ্য করিলেন। মহাবীরের জ্ঞানের ইয়ত্তা রহিল না, তিনি মুক্তিপ্রদ পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া সুখ, দুঃখ, -স্বাধীনতা, সাংসারিক জ্ঞান হইতে “সিদ্ধে বুদ্ধে মুত্তে অন্তগডে পরিনিব্বুউ সর্ব্বদুঃখপহিণে “অর্থাৎ সর্ব্ব সন্তাপাভাবাৎ” সর্ব্ব সন্তাপ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া স্বর্গীয় আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন, “যথা অণংতে অণুত্তরে নিব্বধাই নিরাবরণে কসিনে কেবল বরণানন্দ সনা সমুপ্যন্নে।”

মহাবীরের চতুর্দ্দশ শিষ্য সর্ব্বপ্রধান। তাঁহারা যদিও জিন নহেন, তথাপি জিন তুল্য মহাপণ্ডিত যথা “অজিনাণং জিনসংকাসং সর্ব্বাখর সন্নি পাইন” (অজি নাপি জিন সদৃশাঃ সর্ব্বাক্ষর সমূহ জ্ঞাতারঃ)।

মগধের গোতম বংশীয় বসুভূতি, ইন্দ্রভূতি, অগ্নিভূতি এবং বায়ুভূতি নামক তিন পুত্র। হেমচন্দ্র ইহাদিগের সকলকে গোতম আখ্যা প্রদান করিয়াছেন।* ব্যক্ত, সুধর্ম্ম, মন্দিত, মৌর্য্যপুত্র, অকম্পিত, অচল ভ্রাতা, মৈত্রেয়, মহাবীরের একাদশ গণধর নামে খ্যাত। এই সকল আচার্য্য দ্বারা জৈন ধর্ম্মের সমূহ উন্নতি হইয়াছিল। মহাবীর সমানিক এবং শ্রেণিক নামক কৌশাম্বী এবং রাজগৃহের নৃপদ্বয়কে জৈন মতাবলম্বী করিয়াছিলেন। জৈন গ্রন্থে দৃষ্ট হয় মহাবীর ভবিষ্যদ্বাণী স্বরূপ কহিয়াছিলেন, কুমার পাল জন্মগ্রহণ করিয়া ধর্ম্মের উন্নতি করিবেন ; এতৎ সম্বন্ধে শত্রুঞ্জয় মাহাত্ম্যে এই মাত্র লিখিত আছে, যথা “ততঃ কুমার পালস্থ বাহড়ো বস্তু পালবিৎ। সময়াস্থা ভবিষ্যন্তি শাসনেহস্মিন প্রভাবকাঃ।”

(ক্রমশঃ)

শ্রীরা

---

* ইন্দ্রভূতিরগ্নিভূতির্ব্বায়ুভূতিশ্চ গোতমঃ।

১

পাগলিনী রে আমার !
এই কান্না, এই হাসি ; এই আনন্দের রাশি ;
এই দেখি মুখচন্দ্র বিষাদে আঁধার ;
এই নাচ, এই গাও ; এই যাও, ফিরে চাও ;
এই অন্তর্ধান, এই গলায় আবার ;
পাগলিনী রে আমার !

২

চঞ্চল চিত্তের স্রোত ;—
কিবা সুখ, দুঃখ তার, স্থির না থাকিতে পায়,
ভেসে যায় স্রোতে ক্ষুদ্র তৃণের আকার ;
এই প্রেম বরিষায়, সেই স্রোতে পূর্ণ-কায়,
এই মান নিদাঘেতে বিশুষ্ক আবার ;
পাগলিনী রে আমার !

৩

পিঞ্জরের পাখী তুমি,
বেড়াও পিঞ্জর মাঝে, চরণে শৃঙ্খল বাজে,
নাহি জ্ঞান, আনন্দেতে গাও অনিবার
স্বভাব, সঙ্গীতরাশি, আঁধারে শ্যামের বাঁশী ;
যে বুলি বলাই তাহা বল আরবার,
পাগলিনী রে আমার !

৪

এই পাগলিনী মূর্ত্তি,—
একমাত্র, বাঙ্গালির দুঃখ সাগরের তীর,
এই মূর্ত্তি,—একমাত্র গৃহ অলঙ্কার ;
বাঙ্গালির শূন্য ঘরে, এই মূর্ত্তি শোভা ধরে,
অন্য মূর্ত্তি কদাচিত শোভিবে না আর,
পাগলিনী রে আমার !

৫

শোভিবে না আহ্লাদিনী ।
আহ্লাদিনী বঙ্গঘরে ! নির্ঝরিণী প্রভাকরে !
মরুভূমি মধ্যে মৃগতৃষ্ণিকা সঞ্চার !
জ্বলিতেছে চিতা প্রায়, যাহার হৃদয় হায় !
তাহার আলয়ে কিসে আহ্লাদ আবার ?
পাগলিনী রে আমার !

৬

শোভিবে না বিষাদিনী ।
বাহিরের দুঃখানলে, নিরন্তর চিত্ত জ্বলে,
তাহাতে বিষাদ যদি গৃহেতে আবার,
হতভাগা বঙ্গবাসী, হইবেক ভস্মরাশি,
কোথায় জুড়াবে এই যন্ত্রণা তাহার,
পাগলিনী রে আমার !

৭

গম্ভীরা ত্রাম্বিকা মূর্ত্তি !
নাহি সুখ, নাহি দুঃখ, সতত বিষণ্ণ মুখ,
পাপে অনুতাপে চিত্ত দহে অনিবার !
এই পাপরাশি হায় ! যাবে কোন তপস্যায় ?
এত পাপ যার ঘরে কি সুখ তাহার,
পাগলিনী রে আমার ?

৮

নাহি চাহি কোন মূর্ত্তি ;—
আহ্লাদিনী, বিষাদিনী, কিম্বা পাপ-প্রয়াসিনী
নাহি চাহি অন্য ছবি গৃহেতে আমার,
ওই কান্না, ওই হাসি, আমি বড় ভালবাসি,
ওই বালিকার শুদ্ধ-হৃদয় তোমার,
পাগলিনী রে আমার !

৯

জ্বলিয়া অনন্ত দুঃখে,
যবে দগ্ধ কলেবরে, ফিরিয়া আসিব ঘরে,
দেখিব বিষাদে মাখা সকল সংসার,
তখন হাসিয়া সুখে, কোমল প্রসন্ন মুখে,
ধরিয়া গলায় মম, হাসিও আবার,
পাগলিনী রে আমার !

১০

কিম্বা যদি হাসি মুখ,
দেখি প্রিয়ে ! কোনদিন,—বিদ্যুৎকৌমুদীলীন
অধর টিপিয়া, শুনি সুখ সমাচার,
"পাই নাথ ! যেই সুখ, নিরখি তোমার মুখ,"
বলিও—"তাহার কাছে, কি সুখ আবার !"
পাগলিনী রে আমার !

১১

এই বরিষার মত,
তব মুখে সদা দেখি, মেঘে চন্দ্রে মাখামাখি
বাম বিদ্যুতেতে মাখা আদর আমার ;
তব কান্না, তব হাসি, তাই এত ভালবাসি,
তরল চঞ্চল ওই বদন তোমার,
পাগলিনী রে আমার !

১২

যে চাহে দেখিতে প্রিয়ে !
অচঞ্চল সৌদামিনী, অচঞ্চল কাদম্বিনী,
অচঞ্চল আহ্লাদিনী,—হউক তাহার ।
আমি বেশে ভাল বাসি, চঞ্চলা চপলা হাসি ;
আমি ভাল বাসি তোরে,—চাঞ্চল্য সবার !
পাগলিনী রে আমার !

শ্রীনঃ ।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা

আর্য্যদর্শন। সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, পুরাবৃত্ত, বার্ত্তাশাস্ত্র, জীবনবৃত্ত, শব্দশাস্ত্র ও সঙ্গীতাদি বিষয়ক মাসিকপত্র ও সমালোচন। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ, এম্-এ, সম্পাদিত। কলিকাতা। নূতন ভারত যন্ত্র। ১২৮১ সাল।

গত দুইবৎসর মধ্যে আমরা অনেকগুলি ইংরেজি ও বাঙ্গালা উৎকৃষ্ট মাসিক পত্র সমাদরপূর্ব্বক, পাঠকদিগের নিকট পরিচিত করিয়াছি। বিশেষ আহ্লাদের সহিত এখানিও পরিচিত করিতেছি। ফলে এখানির বিশেষ পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক; আপনার গুণে ইহা সকলের নিকট পরিচিত হইয়াছে।

এ পত্রের রচনা-প্রণালী অতি পরিষ্কার; যে সকল বিষয় ইহাতে লিখিত হইতেছে, তাহা সারগর্ভ, ও লেখকেরা কৃতবিদ্য, এবং লিপিকুশল। তবে, সকল প্রবন্ধগুলি যে তুল্যরূপে প্রশংসনীয় নহে, ইহা বলা বাহুল্য, "আত্মারাম পড়।" এবং "শক্রসিংহ" ইত্যভিধেয় প্রবন্ধদ্বয়ের কোন প্রশংসা করা যায় না।

কোন জাতি নূতন শিক্ষা প্রাপ্ত হইতে থাকিলে, সেই জাতির সাহিত্য প্রায় দুই অংশে বিভক্ত হয়, এক অনুবাদ, আর এক অনুকরণ। কদাচিৎ দুই একজন, স্ববুদ্ধিমূলক অভিনব সাহিত্য রচনায় সক্ষম হয়েন। আরব জাতীয়েরা অনুবাদ ভিন্ন প্রায় আর কিছুই করিতে পারেন নাই। রোমক সাহিত্য যুনানী সাহিত্যের অনুকরণ মাত্র। বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যে অনুবাদ ও অনুকরণ উভয়ই লক্ষিত হইতেছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রভৃতি পণ্ডিতেরা অনুবাদ করেন; মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র প্রভৃতি সুকবিরা অনুকরণ করেন। মেঘনাদ বধ, ইলিয়দের অনুকরণ, নবীন তপস্বিনী, "Merry Wives of Windsor" নামক নাটকের অনুকরণ। কিন্তু অনেক সময়ে, অনুকরণ অপেক্ষা অনুবাদ সুসাধ্য, এবং সাধারণের উপকারী হয়। অনুকরণ দুই এক জন বিশেষ প্রতিভাশালী লেখকের হস্তেই ভাল হইয়া থাকে; ভাল হইলেও, উপকারিতায় সকল সময়ে অনুবাদের তুল্য হয় না।

আমরা দেখিলাম যে আর্য্যদর্শন লেখকেরা এবিষয়ে যথার্থ কার্য্যকারিতা বুঝিয়াছেন। ইহা সদ্বিবেচনা এবং বিজ্ঞতার কাজ হইয়াছে। এই প্রথা অবলম্বন করিয়া তাঁহারা দেশের বিশেষ মঙ্গল সাধিতে পারিবেন, এমত সম্ভাবনা।

ইহাও বক্তব্য যে, সকল প্রবন্ধগুলি অনুবাদমূলক নহে। অনেক স্থানে, লেখকেরা আত্মবুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়াছেন, এবং চিন্তাশীলতার পরিচয়ও দিয়াছেন। আমরা ভরসা করি, এই পত্র দীর্ঘজীবী হইয়া সর্ব্বত্র সমাদৃত হইবে।

বান্ধব। মাসিক পত্র ও সমালোচন। শ্রীকালীপ্রসন্ন ঘোষ কর্ত্তৃক সম্পাদিত। ঢাকা ইষ্ট বেঙ্গাল প্রেস।

ইহা আর একখানি উৎকৃষ্ট মাসিক পত্র। পশ্চিম বাঙ্গালায় অনেকগুলি উৎকৃষ্ট মাসিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে, কিন্তু পূর্ব্ব বাঙ্গালায় সেরূপ ছিল না। অথচ পূর্ব্ববঙ্গবাসিগণ যে পশ্চিমবঙ্গবাসিগণ অপেক্ষা বিদ্যাবুদ্ধিতে ন্যূন, ইহা আমরা স্বীকার করি না। অতএব ঢাকা হইতে এই উৎকৃষ্ট মাসিক পত্রের প্রকাশারম্ভ হইয়াছে দেখিয়া আমরা বিশেষ প্রীতি লাভ করিয়াছি। দুঃখের বিষয় এই যে, এই পত্রের কলেবর ক্ষুদ্র, এবং মুদ্রাকার্য্য এ প্রদেশের মাসিকপত্র সকলের ন্যায় উৎকৃষ্ট হয় নাই। ভরসা করি, ইহার আকার বাড়িবে, এবং মুদ্রাকার্য্যের উন্নতি ঘটিবে।

কিন্তু পত্র আকারে ক্ষুদ্র হইলেও গুণে, অন্য কোন পত্রাপেক্ষা লঘু বলিয়া আমাদিগের বোধ হইল না। রচনা অতি সুন্দর, এবং লেখকদিগের চিন্তাশক্তি অসামান্য। ইহা যে, বাঙ্গালায় একখানি সর্ব্বোৎকৃষ্ট পত্রমধ্যে গণ্য হইবে, তদ্বিষয়ে আমাদিগের সংশয় নাই।

কাব্য কৌমুদী। প্রথম খণ্ড। শ্রীশ্রীনাথ চন্দ প্রণীত। কলিকাতা, রামায়ণ যন্ত্র। ১৭৯৬ শকাব্দা।

এখানি পদ্য গ্রন্থ। দুই একটি কবিতা মন্দ নহে। দুই একটি নিতান্ত নীরস ও অসার। ইহার একটি গদ্য উপক্রমণিকা আছে। উপক্রমণিকা অতি পরিষ্কার, এবং বাক্যাড়ম্বর ও অনাবশ্যক বিস্তৃতি শূন্য, কিন্তু ইহাতে অনেক ভ্রমাত্মক কথা আছে।

ললিতা সুন্দরী। প্রথম সর্গ। শ্রীঅধরলাল সেন বিরচিত। নূতন বাঙ্গালা যন্ত্র। কলিকাতা।

এখানি পদ্য। গ্রন্থকারের অনুরোধ যে, আমরা তাঁহার গ্রন্থের প্রতি পংক্তি, প্রতি শ্লোক, প্রতি পৃষ্ঠা পৃথক্ পৃথক্ সমালোচনা করি। লেখক অতি তরুণ বয়স্ক, আমরা জানিয়াছি। অতএব এখন তাঁহার এ আশা পূর্ণ না হইলেও তিনি রাগ করিতে পারেন না। যখন তিনি কোন উৎকৃষ্টতর গ্রন্থ প্রণয়ন করিবেন, তখনও

আমরা প্রতি পংক্তি, প্রতি শ্লোক, প্রতি পৃষ্ঠা পৃথক্ পৃথক্ করিয়া সমালোচিত করিতে পারিব না—ক্ষুদ্র বঙ্গদর্শনে তাহা পাঁচ বৎসরে সম্পন্ন হইতে পারে না—তবে সাধ্যানুসারে সবিস্তারে সমালোচনা করিব। উপস্থিত কাব্যে, নবীনত্বের বিশেষ অভাব, কিন্তু দেখিয়া বোধ হয় বয়োবৃদ্ধি হইলে ইহার রচনা বিশেষ প্রশংসনীয় হইতে পারিবে।

স্বর্ণলতা নাটক। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। কলিকাতা প্রাচীন ভারত যন্ত্র।

মানব প্রকৃতি সম্বন্ধে কতকগুলি গূঢ় তত্ত্ব আছে, তাহা আধ্যাত্মিক দর্শনের অপ্রাপ্য, বিজ্ঞানের অপ্রাপ্য। তাহা কেবল কবিই দেখিতে পান। তাহার প্রকটনই নাটকের উদ্দেশ্য—সেই জন্য নাটকের সৃষ্টি। বঙ্গদেশে নাটকের সে উদ্দেশ্য লোপ পাইয়াছে—মোহন্তের মোকদ্দামা, নাপিতের মোকদ্দামা—কুলীনের বহুবিবাহ—কি মজার শনিবার ইত্যাদি বিষয়ের প্রকটনার্থ বঙ্গীয় নাটক লিখিত হয়। কতকগুলি নাটককারের উদ্দেশ্য "সসিয়েল রিফরমেশ্যন।" এ সসিয়েল রিফরমেশ্যন অর্থে সমাজ সংস্করণ নহে—ইহার অর্থ বিলাতী রেওয়াজ। যদি দেশে এমত কোন প্রথা থাকে যে ইংরেজে তাহার বিপরীতাচরণ করে, তবে নাটকের দ্বারা তাহার নিন্দা করিতে হইবে। দেবেন্দ্র বাবু দেখিলেন যে, দেশী প্রথা সকল প্রায় পূর্ব্বগামী নাটককারগণ উৎসৃষ্ট করিয়াছেন—নীলের চাস হইতে তীর্থ ভক্তি পর্য্যন্ত কিছু বাকি নাই; অতএব তিনি "মনোনীত করিয়া পরিণয় করিবার প্রথা প্রচলিত না থাকায়" যে কত অনিষ্ট, তাহার বর্ণনা জন্য নাটক লিখিয়াছেন। নাটকখানি ৯৫ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ হইয়াছে। অতএব দেবেন্দ্র বাবুর দিন কোনমতে কাটিয়া গেল। কিন্তু ভবিষ্যৎ নাটককারেরা কি লিখিবেন, তাহা ভাবিয়া আমরা ব্যাকুল হইয়াছি। আমরা তাঁহাদিগের উপকারার্থ, ভাবিয়া চিন্তিয়া কয়েকটি বিষয় স্থির করিয়াছি—ভরসা করি, তাঁহারা ইহার মধ্যে কোন বিষয় মনোনীত করিবেন। যথা বাঙ্গালী মাছ ভাত খায়, মুরগী খায় না—এই কুপ্রথায় অনেক অনিষ্ট ঘটিতেছে, এই নৈতিক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া "মুরগী নাটক" নামে একখানি উৎকৃষ্ট নাটক হইতে পারে। আর, এ দেশে অশ্বের দ্বারা চাস না হইয়া বলদের দ্বারা চাস হয়, এই কুপ্রথার নিন্দার্থ "বলদ মহিমা" নামে আর একখানি উৎকৃষ্ট নাটক হইতে পারে। "রোড্ শেষ নাটক," "দুর্ভিক্ষ নাটক" প্রভৃতি নাটক এপর্য্যন্ত হয় নাই—ভরসা করি, শীঘ্র হইবে। হইলে, যেমন হউক, স্বর্ণলতা নাটকের অপেক্ষা অপকৃষ্ট হইতে পারিবে না।

তত্ত্ব কুসুম। অর্থাৎ মনের প্রতি ঈশ্বর বিষয়ক উপদেশ। শ্রীদ্বারকানাথ ঘোষ প্রণীত। ঢাকা সুলভ যন্ত্র।

"ভব কুসুম" যদি এইরূপ, ভবের ফল না জানি কেমন ? দ্বারকানাথ বাবু, অতি সরলপ্রকৃতির লোক সন্দেহ নাই। নচেৎ এ গ্রন্থ প্রচারিত করিতে কখন সাহস করিতেন না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যে গ্রন্থখানি আমরা পাইয়াছি, তাহাতে "দ্বিতীয় সংস্করণ" লেখা আছে। বাঙ্গালির পায় শত নমস্কার। তাঁহারা যদি ইহার প্রথম সংস্করণ কিনিয়া পড়িয়া থাকেন; তবে তাঁহাদের অসাধ্য কার্য্য নাই। এবং তাঁহাদের কোন ভরসাও নাই। ঞ.

মহাগুরু নিপাতের পর অশৌচাবস্থায় কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের বিচার। "প্রস্থ কমলনন্দিনী" পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত। কলিকাতা সত্য যন্ত্র। ১৭৯৬।

গ্রন্থারম্ভে লিখিত হইয়াছে "কোন মহাশয় ব্যক্তি, তাঁহার মাতৃবিয়োগের পর তাঁহার কোন আত্মীয়ের নিকট হইতে অশৌচব্যবস্থার কর্ত্তব্য বিষয়ে একখানি ব্যবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাহার উত্তর প্রত্যুত্তরে একটি সুদীর্ঘ বিচার নিষ্পন্ন হয়। ঐ সকল বাদানুবাদের পাঠে অনেকের উপকার হইতে পারে, এই বিবেচনায় তাহা (গ্রন্থে) প্রকটীকৃত হইয়াছে। এ বিষয়ে শাস্ত্রার্থই উদ্দেশ্য, বিবাদীর কেহই পাণ্ডিত্যের অভিমান রাখেন না; অতএব তাঁহাদের পরিচয় না দেওয়াই বিধেয় হইয়াছে।"

বিবাদীরা পাণ্ডিত্যের অভিমান রাখেন না, কিন্তু গ্রন্থখানি এই শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য পরিপূর্ণ। আর, পণ্ডিতদিগের কৃত স্মৃতি-শাস্ত্রঘটিত বিচারে যেরূপ অভদ্রতা, এবং গালির ব্যবহার পূর্ব্ব হইতে প্রচলিত আছে, ইহাতে তাহার কিছু মাত্র নাই। বিচারকেরা কেবল পণ্ডিত নহেন, বিশেষ ভদ্রলোক।

ঋতুবিলাস। "রিপু বিহার" রচয়িতা শ্রীমহিমাচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত। কলিকাতা নূতন সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত। ১২৭৯ সাল।

এই গ্রন্থের উপরে লেখা আছে,

অসম কুসুম ফুল বল্লরী নূতন।
পরিমলপূর্ণ কিনা দেখ ভৃঙ্গগণ ॥

আমরা ভৃঙ্গ নহি—মনুষ্য জাতীয় বলিয়া আত্ম পরিচয় দিই—এই জন্য বোধ হয় এ "বল্লরীতে" নূতন কিছু দেখিলাম না—বা পরিমল পাইলাম না।—উদাহরণ, গ্রন্থারম্ভেই

বসন্ত ঋতুর উদয়

১

বসন্ত ঋতুপতি, সংহতি সদাগতি,
প্রবেশে সরসে এ ভুবনে।
ফুটনে ফুলকুল, লুঠনে সনাকুল,
মধুপ ধাইছে একমনে ॥

নিকুঞ্জ মঞ্জু বনে, মাতিয়া বঁধু সনে,
কোকিল কলতি একতানে।
বকুল শাখাপরে, সারিকা থরে থরে,
রঞ্জিছে মন গুঞ্জন গানে॥
হেরিয়া কাল মধু, কাঁদিছে কোক-বধূ,
মোহিত দহিত কলেবরে।
ছাড়িয়া প্রাণকান্ত, অন্তর নহে শান্ত,
হায়রে! বিরহ বিষজ্বরে॥
মল্লিকা সুপ্রভাতি, তাহাতে ভৃঙ্গপাতি,
পশিয়া ডাকিছে কলকলে।
অহো! আনন্দ মনে, স্বামীর আগমনে,
বাজাইছে কম্বু দল বলে॥
সলিলে সরোজিনী, সুবল প্রেমাস্বিনী,
হাসিয়া ভাসিছে সুখ-হ্রদে।
মনোজ যোধবর, চালিছে শরশর,
মাতিছে ধনিকা কামমদে॥

ইহাতে নূতন কি? পরিমল কোথায়? তবে এ গ্রন্থ "ত্রিপুবিহারের" অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ভাল।

গ্রন্থকার যে সকল দুরূহ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, টীকায় তাহার অর্থ লিখিয়া দিয়াছেন। দুরূহ শব্দ ব্যবহারের এত প্রয়োজন কি ছিল? অভিধান বিক্রেতাদিগের নিকট আমাদের নিবেদন—অভিধানগুলির একটু দাম বাড়াইবেন।

বীরাঙ্গনা পত্রোত্তর কাব্য। সটীক। শ্রীরামকুমার নন্দী প্রণীত। শ্রীরামপুর। আলফ্রেড যন্ত্র। ১২৭৯ শাল।

এখানি পদ্য। মাইকেল মধুসূদন দত্ত বীরাঙ্গনা কাব্য লিখিয়াছেন, দেখিয়া, এই কবি, তাহার উত্তর দিয়াছেন। দত্তমহাশয় কেবল নায়িকার উক্তি সকল লিখিয়া গিয়াছেন; মেয়েমানুষের কথা কে সহ্য করিতে পারে? রামকুমার বাবু তাহার উত্তর দিয়াছেন। পুরুষ জাতির মুখ রাখিয়াছেন সন্দেহ নাই।

মধ্য হইতে বাবু দক্ষিণাচরণ রায় আসিয়া গ্রন্থভূমিকায় লেখকের এক জীবন-চরিত লিখিয়া দিয়াছেন; এবং সঙ্গে সঙ্গে কাব্যের সমালোচনা করিয়াছেন।

এই জীবন বৃত্তে, আমরা জানিয়া সুখী হইলাম যে, এই উত্তরদায়ক কবি এক্ষণে কাছাড়ে ডিপুটি কমিশ্যনরের আফিশে একৌণ্টেণ্ট, এবং মনি অর্ডর এজেন্ট। ইনি পূর্ব্বে আফিশে নকলনবিশ ছিলেন। বোধ হয়, পূর্ব্বাভ্যাস বশতঃই এই কাব্য প্রণয়ন করিয়াছেন।

দক্ষিণাবাবুর সমালোচনার উদাহরণ স্বরূপ, কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি।

"রাজা দুষ্মন্ত শকুন্তলা সম্বোধনে, কামদেবকে উল্লেখ করিয়া যে কয়েকটি পংক্তি লিখিয়াছেন, উহা বিশুদ্ধ রচনা না বলিয়া ক্ষান্ত থাকা যায় না। শব্দগুলি এমন ধ্বনিকারক যে অন্তঃস্থান পর্য্যন্ত তাহাদের প্রতিধ্বনি সবলে প্রতিঘাত হইতে থাকে এবং অন্তঃকরণ যেন তৎসহ নৃত্য করিয়া উঠে এ কথা কোন্ সহৃদয় ব্যক্তি স্বীকার না করিবেন? যথা—

"অনুভব মনোভব দুরন্ত প্রহারী,
কে সহে তাহার শর নশ্বর জগতে
নর নারী! হীন শক্তি তুহিন শিখরে,
আয় সম্বরণে শম্ভু শম্বরারি শরে,
বিহীন সম্বিত অঙ্গ অপূর্ব সম্ভব,
হৃদ্ভেদী শক্র, ভেদিলে যে কুসুমেষু
কুসুম বিশিখে।"

শব্দগুলি ধ্বনিকারকই বটে। সমালোচনা পড়িয়া, আমাদিগের সাধারণীর চানাচুর মনে পড়িল, "ইস্মে প্রাড়্বিবাক হ্যায়, মলিম্লুচ হ্যায়, সহানুভূতি হ্যায়, উচ্ছৃখল হ্যায়, ধৃষ্টদ্যুম্ন হ্যায়।" সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণ করিবার জন্য, গ্রন্থখানি সটীক করা হইয়াছে—কেন না রঘুবংশাদি সকলই সটীক; এবং হেমবাবু, মেঘনাদবধের টীকা করিয়া মুদ্রিত করিয়াছেন। টীকারও কিছু উদাহরণ উদ্ধৃত করিতেছি—

পন্নগপতি—অনন্ত
দিতিসুত—অসুর
ত্রিদশ—দেবতা
ইন্দ্রজাল—ভোজবাজি, ভেলকি!

কাব্য সম্বন্ধে, কেবল ইহাই বলা প্রয়োজন যে, কাব্যখানি আদ্যোপান্ত বীরাঙ্গনার অনুকরণ—অনুকরণের অনুকরণ—সুতরাং ইহাতে বিশেষ প্রশংসনীয় কিছু দেখা যায় না। স্থানে স্থানে, মাধুর্য্য আছে।

বৈদেহী বৈধব্য কাব্য। শ্রীঅনাথবন্ধু রায় প্রণীত। ঢাকা গিরিশ যন্ত্র।

এ গ্রন্থখানির বিষয় কুশীলবের পালা। রামপুত্রদিগের কথাবার্ত্তাগুলিও যাত্রার ন্যায় হইয়াছে। স্থানে স্থানে, কিঞ্চিৎ কবিত্ব দেখা যায়। অনেকস্থানে ইহা দুর্ব্বোধ্য, অর্থব্যক্তি ভালরূপে হয় নাই।

সুশ্রুত। প্রাচীন আর্য্যগণের চিকিৎসা বিজ্ঞান। বাঙ্গালা অনুবাদ এবং সংস্করণ শ্রীঅম্বিকাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। কলিকাতা। বিক্টোরিয়া যন্ত্র।

আধুনিক লোকের ইংরেজি চিকিৎসাতেই ভক্তি। আমাদিগের বোধ আছে, অন্যান্য বিদ্যায়, ইউরোপীয়দিগের যেরূপ প্রাধান্য, চিকিৎসা শাস্ত্রে সেরূপ নহে।

দেশী চিকিৎসা প্রণালীতে অনেক সময়েই ইংরেজি চিকিৎসা অপেক্ষা সুসিদ্ধি জন্মিয়া থাকে। দেশী চিকিৎসা, বাঙ্গালা চিকিৎসা, উভয়ের গুণ, উভয়ের অভাব আছে। একের যাহা আছে, দ্বিতীয়ের তাহা নাই; দ্বিতীয়ের যাহা আছে, প্রথমের তাহা নাই। উভয়ে সংমিলিত হইলেই পরস্পরের অভাব পূর্ণ হইয়া সর্ব্বরোগ শান্তিদায়ক চিকিৎসাপদ্ধতির উদ্ভাবন হইতে পারে। দুর্ভাগ্যবশতঃ ডাক্তারেরা প্রায় সংস্কৃত জানেন না, বৈদ্যেরা কেহই ইংরেজি জানেন না। এজন্য উভয়ের বিদ্যা অসম্পূর্ণ রহিতেছে। এক্ষণে যদি, দেশী চিকিৎসা শাস্ত্র বাঙ্গালায় প্রচারিত হয়, তবে দেশী ডাক্তারগণ, তাহার মর্ম্মাবগত হইতে পারেন। অতএব অম্বিকা বাবুর এই উদ্যম অত্যন্ত প্রশংসনীয় এবং হিতকর। তাঁহাকে উৎসাহ দান করা, বাঙ্গালি মাত্রেরই কর্ত্তব্য। তিনি যে কার্য্যে প্রবৃত্ত তাহা অত্যন্ত দুরূহ—তিনি বিশেষ সাধুবাদের পাত্র। অনুবাদ অতি প্রাঞ্জল হইতেছে।

রামোদ্বাহ নাটক। অর্থাৎ রামের সহিত সীতার বিবাহ বর্ণন। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। শ্রীরামপুর আলফ্রেড যন্ত্র।

অশুভক্ষণে বাল্মীকি রামায়ণ প্রণীত করিয়াছিলেন। ভরসা ছিল, বাঙ্গালার অঙ্গুলিকণ্ডূয়ণ ব্যধিগ্রস্ত মহাশয়েরা, বিষয়াভাবে কাব্যনাটক রচনায় বিমুখ হইবেন। কিন্তু রামায়ণ থাকিতে তাহা ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। রামের বিবাহ, রামের বনবাস, সীতার বনবাস, রামের যুদ্ধ, কুশীলবের যুদ্ধ প্রভৃতি বিষয়াবলম্বন করিয়া অসংখ্য অপাঠ্য কাব্য নাটকের সৃষ্টি হইতেছে। সমুদ্রে রত্ন আছে বলিয়া, অধ্যবসায়শালী বাঙ্গালি কবিগণ অবিরত লোণা জল সেচিতেছেন। সম্প্রতি আর একখানি রামোদ্বাহ নাটক উপস্থিত। রামোদ্বাহ বলিলে কেহ যদি না বুঝিতে পারেন, এই জন্য, গ্রন্থকার বলিয়া দিয়াছেন, "অর্থাৎ শ্রীরামের সহিত সীতার বিবাহ বর্ণন।" আমরা গ্রন্থকারের নিকট বিশেষ বাধ্য হইলাম। পাঠকের মনোরঞ্জনার্থ এই নাটক হইতে একটি কৌশল্যা বিলাপ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

"কৌশ—[কপালে করাঘাত করিতে করিতে] মা! আবার আমার কপালে একি হলো! মহারাজ এই কথা কইতে কইতে এমন হলেন কেন! (গাত্রে হস্ত স্পর্শ করিয়া) শক্ত মক্ত দেখ্‌চি যে। কি করি। মহারাজ বুঝি পুত্রশোকে প্রাণ পরিহার কল্লেন। (চরণ স্পর্শ করিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে) মহারাজ! আপনি গাত্রোত্থান করুন, আপনকার ভূমিশয্যা কেন?—এরূপ অবস্থাবলোকনে বিষ বিন্দুর ন্যায় আমার নয়নে দরদরিত বারিধারা বরিষণ হচ্চে। হৃদয় বল্লভ! ত্বরায় গাত্রোত্থান করুন্। আপনাকে নীতি শিক্ষা দেওয়া অবলাঙ্গনার বিধেয় নয়। আপনি এত কাতর হবেন না। অগ্রে প্রাণধন রঘুমণির তত্বানুসন্ধানে সংখ্যাতিরিক্ত যুদ্ধোৎসাহী সেনাদিগকে পাঠাইয়া দিন্। পরে যাহা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য তাই কর্‌বেন—

(চরণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বাম গণ্ডে হস্ত দিয়া) আহা! গুণমণি রাম বিনা যেন আমাকে বৎসহারা গাভীর ন্যায় করেচে! আর তৃষিতা চাতকিনী যদ্রূপ কাদম্বিনী সন্দর্শনে প্রফুল্লিতা হয়ে ঊর্দ্ধদৃষ্টে অবিরত চঞ্চুব্যাদান করিতে থাকে, আমিও তদ্রূপ নীলমণির আসার আশায় রাজপথাবলোকন করিতে থাকি। আহা! আমার হৃদয় আকাশে আর কি সে রাম-চন্দ্রের উদয় হবে। ভূমিশয্যে অধোচলে।—তবে বাঁচনে সুখ কি—"

ত্রুটি কি? ইহাতে কপালে করাঘাত আছে, চরণস্পর্শ আছে, ভূমিশয্যা আছে, বিষবিন্দু আছে, হৃদয়বল্লভ আছে, চাতকিনী আছে, কাদম্বিনী আছে, নীলমণি আছে, নাই কি? যদি কিছুর অভাব থাকে, তবে এক "আসার আশায়" তাহা পরিপূর্ণ হইয়াছে। সাধারণীর তেলে ভাজা চানাচুর কোথায় লাগে?

ভারতবর্ষীয় আর্য্যজাতির আদিম অবস্থা

শাসন প্রণালী

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

পাঠক, তোমাকে সে দিন বলিয়াছি বিচারপ্রণালী সাক্ষীর বিষয় ও সমাজ-প্রথা আমূল বিজ্ঞাপন করিব। অদ্য এই তিন বিষয়ের কিছু কিছু শ্রবণ কর। তত্ত্বানুসন্ধান পূর্ব্বক পাঠ কর। দেখিবে ভারতবর্ষীয় ঋষিগণ কোন বিষয়েই অন্যের নিমিত্ত কিছু অবশিষ্ট রাখিয়া যান নাই। তুমি সভ্য জাতির নিকট যাহা শিক্ষা করিতে চেষ্টা করিতেছ, উহা কতকাল পূর্ব্বে আর্য্যজাতিরা অভ্যাস করিয়াছেন। সাক্ষীর লক্ষণ, ব্যবসায়, আচার, ব্যবহার ও জাতি প্রভৃতি অবগত হইলে বুঝিবে, ঋষিগণ ঐ বিষয়ে কতদূর অভিজ্ঞতা প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহাদিগের অনুসরণে কত ব্যক্তি কৃতার্থ হইয়াছেন, হইতেছেন ও হইবেন।

প্রিয়দর্শন, অদ্য আমি তোমাদিগকে বিচারকের কর্ত্তব্য বলিব। তুমি আর্য্যজাতিকে স্বার্থপর বলিয়া বৃথা অপবাদ দিয়া থাক, তোমার সে ভ্রম দূর করিবার ইচ্ছা করে।

দেখ, আর্য্যভূপতিগণ কাহাকেও নীতিবিরুদ্ধ কার্য্যে প্রবৃত্তি দিতেন না। যে ব্যক্তি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইত, তাহাকেও অসৎ কার্য্য হইতে বিনিবৃত্ত করিতেন। ধর্ম্মাধিকরণের অথবা বিচারাদির ব্যয় সঙ্কুলনার্থ কোন প্রকার কৌশলাদি দ্বারা প্রজাপীড়ন পূর্ব্বক অর্থ গৃহীত হইত না। (১)

আর্য্যজাতির নিকট কোন ব্যক্তি বিচারপ্রার্থী হইলে তাহাকে প্রতিজ্ঞা-পত্রের [কাগজের] মূল্য (Court Fees) দিতে হইত না। প্রতিবাদীকেও উত্তরপক্ষ সমর্থন নিমিত্ত উত্তরপত্রের আলেখ্য জন্য পত্রশুল্ক দেওয়ার কোন প্রমাণ দেখা যায়

---

(১) ধর্ম্ম শ্রুতি বিরুদ্ধঞ্চ ভূতানামহিতঞ্চযৎ।
ন তৎপ্রবর্ত্তয়েদ্রাজা প্রবৃত্তঞ্চ নিবর্ত্তয়েৎ॥

মনু কাত্যায়ন।

না। ইঁহাদিগের নিকট হইতে পদাতিকের বেতনাদির সম্বন্ধেও কোন উল্লেখ নাই।

রাজকীয় সমস্ত ভৃত্যই রাজকোষ হইতে বেতন, ভৃতি, অন্নাচ্ছাদন এবং স্থলবিশেষে চিরস্থায়ী বৃত্তিও ভোগ করিত। আর্য্যজাতির নিকট যে ব্যক্তির কার্য্য সুখকর, হিতকর ও প্রিয়তর বোধ হইত, সে ব্যক্তি বৃদ্ধাবস্থা অথবা অন্য কোন হেতু বশতঃ প্রভুর কার্য্য সম্পাদনে অক্ষম হইলে তদীয় পূর্ব্বানুষ্ঠিত কার্য্যকলাপের পুরস্কার প্রাপ্ত হইত।

পুরস্কার বা পেনস্যন (২) এ বিষয়টী রাজার প্রসন্নতা অথবা ইচ্ছার উপর অধিক নির্ভর করিত না। রাজনীতির নিয়মানুসারেই বাধ্য ভৃত্য ও কর্ম্মচারী মাত্রেই রাজদত্ত বৃত্তি উপভোগ করিতে অধিকারী ছিল। সুতরাং কেহই অর্থী প্রত্যর্থীর নিকট কিছু গ্রহণ করিতে সক্ষম ছিল না। যে ব্যক্তি উৎকোচ গ্রহণ করিত, রাজা তাহার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন পূর্ব্বক তাহাকে স্বরাজ্যবহিষ্কৃত করিতেন।

এই কারণে পদাতিকেরাও অর্থী প্রত্যর্থীর নিকট কিঞ্চিন্মাত্র লালসা রাখিত না। (৩)

রাজভৃত্য যদি তাহাদিগের ভরণপোষণ জন্য বিচারকের নিকট অভিযোগ করিত, ধর্ম্মাধিকরণ অমনি মুক্তহস্তে তাহার পক্ষে ডিক্রী দিতেন। আর্য্যেরা জানিতেন, ভৃত্যবর্গ অবাধ্য হইলে রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটিবার সম্ভাবনা। সুতরাং বেতনাদির বিষয়ে বড় গুণনিষ্ঠ ছিলেন। সামান্য ভৃত্যেরা শাস্ত্রের নিয়মানুসারে দাস্য বৃত্তির নিষ্ক্রয় স্বরূপ উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট ভেদে ছয় পণ হইতে এক পণ পর্য্যন্ত দৈনিক বৃত্তি পাইত। উভয় ব্যক্তিই বর্ষমধ্যে দুইবার পরিধেয় পাইবার যোগ্য বলিয়া অভিহিত, তাহাদিগের অন্ন সংস্থান জন্য প্রতি মাসে ধান্য প্রদানেরও ব্যবস্থা আছে। শাস্ত্রের নিয়মানুসারে উৎকৃষ্ট ভৃত্য ছয় মাস অন্তে ছয় যোড় কাপড় ও প্রত্যেক মাসে ছয় দ্রোণ পরিমিত ধান্য গ্রহণের অধিকারী; অপকৃষ্ট ভৃত্য মাসিক এক দ্রোণ পরিমিত ধান্য এবং ষাণ্মাসিকে এক যোড় বস্ত্র পাইত। চারি আঢ়কে এক দ্রোণ হয়। এক আঢ়ীর পরিমাণ চারি পুষ্কল। আট কুঞ্চিতে এক পুষ্কল

---

(২) কচ্চিৎ পুরুষকারেণ পুরুষঃ কর্ম্ম শোভয়ন্।
লভতে মানমধিকং ভূয়ো বা ভক্তবেতনম্ ॥ ৫৩
মহাভারত—সভাপর্ব্ব, অধ্যায় ৫।

(৩) উৎকোচকাশ্চোপধিকা বঞ্চকাঃ কিতবাস্তথা।
মঙ্গলাদেশবৃত্তাশ্চ ভদ্রাশ্চেক্ষণিকৈঃ সহ ॥ ২৫৮ মনু—অ ৯

কহা যায়। কুঞ্চির পরিমাণ অষ্ট মুষ্টি। বঙ্গভাষায় কুঞ্চির পরিবর্ত্তে কুণিকা, খুঁচি হইয়াছে। [৪]

মুষ্টির পরিমাণকে ন্যূনকল্পে এক ছটাক ধরিলেও এক দ্রোণে এক মণ পাঁচ সের ধান্য ধরা যায়—বোধ হয় মুষ্টিমধ্যে এতদপেক্ষা অধিক ধান্য ধরে। প্রিয়দর্শন, তুমি মনে করিতেছ, উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট এই দুই শ্রেণী দাস ছিল, মধ্যবিধ ভৃত্য ছিল না। তুমি কেন ভাব না ন্যূন সংখ্যার পরিমাণ এক পণ, এক যোড় বস্ত্র, এক দ্রোণ ধান্য, ঊর্দ্ধ সংখ্যার পরিমাণ ছয় পণ, ছয় জোড় বস্ত্র ও ছয় দ্রোণ ধান্য পর্য্যন্ত বিচারাসন হইতে ডিক্রী পাইত নতুবা মধ্যবিধ কিঙ্করের প্রতি মধ্যবিধ নিয়ম ছিল।

ভৃত্যগণের পরিচয় স্থলে উচ্চতম কর্ম্মচারিবর্গের উল্লেখ করা নিতান্ত দৌবীবহ; এজন্য উহা এখানে পরিত্যক্ত হইল। স্থলবিশেষে দেখিতে পাইবেন।

বিচার প্রণালীর কথা প্রসঙ্গে ভৃত্যের কথা উঠিয়াছে সুতরাং প্রসঙ্গ পরিত্যাগ করিতে পারি না। পদাতিক, তুমি বিচারাসনের উপকরণ মধ্যে গণ্য কাজেই তোমাকে আসরে নামাইলাম, তুমি রাগ করিও না। এক্ষণে তোমাদিগের দোষে বিচার যত নষ্ট হয়, বোধ হয় পূর্ব্বে তাহার সহস্রাংশের একাংশও সে প্রকার হইত না। পদাতিক, তোমরা রাজার গূঢ় চর ও চক্ষু; তোমরা সুশীল হও, এই ইচ্ছা; অন্ধ হইও না।

অভিযোগ বিষয়।

অভিযোগ উপস্থিত করিবার সময় বাদীকে অগ্রে দোষনির্ম্মুক্ত প্রতিজ্ঞা, সংকারণান্বিত সাধ্য, লোকপ্রসিদ্ধ পক্ষ সমর্থন করিতে হয়। ইহার বিপরীত হইলে অভিযোগ গ্রাহ্য হয় না এবং প্রতিবাদীকেও উত্তর পক্ষ সমর্থন নিমিত্ত আহ্বান না করা বিচারাসনের রীতি ছিল না। ব্যবহার প্রকরণে প্রতিজ্ঞাপত্রই সার বস্তু; উহা সদোষ হইলে বাদী নিশ্চয়ই ক্ষতিগ্রস্ত হন। [৫]

---

(৪) পণোদেয়োঽবকৃষ্টস্য ষড়ুৎকৃষ্টস্য বেতনং।
ষাণ্মাসিকস্তথাচ্ছাদো ধান্যদ্রোণস্তু মাসিকঃ। ১২৬ মনু—অ ৭
অষ্টমুষ্টির্ভবেৎকুঞ্চিঃ কুঞ্চয়োঽষ্টৌচ পুষ্কলং।
পুষ্কলানিতু চত্বারি আঢ়কঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥
চতুরাঢ়কোভবেদ্দ্রোণ ইতি কুল্লূকভট্টধৃত মনুটীকা।

(৫) নারদ বচন যথা
সারস্তু ব্যবহারাণাং প্রতিজ্ঞা সমুদাহৃতা।
তদ্ধানৌ হীয়তে বাদী তরস্তামুত্তরো ভবেৎ

বিচারক প্রথমতই দেখিবেন বাদী যে সকল কারণ নির্দ্দেশ করিতেছে সেগুলি প্রতিজ্ঞা পত্রে নিঃসন্দিগ্ধরূপে লিখিত, পূর্ব্বাপর সংলগ্ন, বিরুদ্ধ কারণ বিনির্মুক্ত, বিরোধিবাক্যের প্রতিরোধক, অন্য প্রমাণে অকাট্য এবং লেখনটী অতি সুন্দররূপে ও স্বল্পাক্ষরে বিরচিত হইয়াছে তবেই গ্রহণযোগ্য জ্ঞান করিবেন। এবম্বিধ পক্ষ গ্রহণান্তর প্রতিবাদীকে উত্তর পক্ষ সমর্থনজন্য বিচারাসন হইতে লেখ্য প্রেরণ দ্বারা আহ্বান করিবার রীতি। (৬)

বাদী যে সকল বাদ উত্থাপন করে সেই সকল বাদবাক্যের নাম প্রতিজ্ঞা, প্রতিজ্ঞা বাক্যের অর্থের নাম পক্ষ, বিচার্য্য বিষয় সার্থক কি না বিবেচনা অনুসারে দেখা কর্ত্তব্য, তদনুসারে বাদ উত্থাপনকালে দেশ কাল পাত্র, বর্ষ, মাস, কোন্ পক্ষের কোন্ তিথি, দিন সংখ্যার নাম, উভয় পক্ষের নাম গোত্রাদি এবং পীড়া প্রদান, পূর্ব্বে প্রতিবাদী অভিযোগ নিবারণ জন্য বাদীর প্রতি ক্ষমা চিহ্ন প্রকাশ করিয়াছিল কি না, ইত্যাদি তাবৎ বিষয় বিশেষতঃ সাধ্য, প্রমাণ, দ্রব্যসংখ্যা ও কি বিষয়ক অভিযোগ তৎসমুদায় প্রকাশ করিবে ; এবং ঐ পত্রে উভয় পক্ষের বাসস্থান, জাতি, বয়ঃক্রম ও কাহার অধিকারে বাস তৎসমস্ত পরিষ্কৃতরূপে ক্রমান্বয়ে লিখিত থাকিবে। (৭)

---

(৬) বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে
উপস্থিতে বিবাদেতু বাদীপক্ষং প্রকাশয়েৎ।
নিরবদ্যং সংপ্রতিজ্ঞং প্রমাণাগমসম্মতং ॥
দেশকালং সমাং মাসং পক্ষাহো জাতি নামচ।
দ্রব্য সংখ্যোদয়ং পীড়াং ক্ষমা লিঙ্গঞ্চ লেখয়েৎ ॥

কাত্যায়ন সংহিতা
নিবেশ্য কালং বর্ষঞ্চ মাসং পক্ষং তিথিং তথা।
বেলাং প্রদেশং বিষয়ং স্থানং জাত্যা কৃতী বয়ঃ ॥
সাধ্য প্রমাণং দ্রব্যঞ্চ সংখ্যাং নাম তথাত্মনঃ।
রাজ্ঞাঞ্চ ক্রমশো নাম নিবাসং সাধ্যনামচ।
ক্রমাৎ পিতৄণাং নামানি লেখয়েৎ রাজসন্নিধৌ ॥

প্রতিজ্ঞা দোষ নির্ম্মুক্তং সাধ্যং সৎকারণান্বিতং।
নিশ্চিতং লোকসিদ্ধঞ্চ পক্ষং পক্ষ বিদো বিদুঃ ॥
কাত্যায়ন ও বৃহস্পতি।

স্বল্পাক্ষরঃ প্রভূতার্থো নিঃসন্দিগ্ধো নিরাকুলঃ।
বিরোধিকারণৈর্ম্মুক্তো বিরোধি প্রতিরোধকঃ ॥
যদাত্বেবং বিধঃ পক্ষঃ কল্পিতঃ পূর্ব্ব বাদিনা।
দদ্যাত্তৎ পক্ষ সম্বন্ধং প্রতিবাদী তদোত্তরং ॥
কাত্যায়ন।

(৭) বচনস্য প্রতিজ্ঞাত্বং তদর্থস্যচ পক্ষতা।
অসঙ্করেণ বক্তব্যং ব্যবহারেষু বাদিভিঃ ॥

প্রতিবাদী যাবৎকাল পর্য্যন্ত উত্তর প্রদান না করে তাবৎকাল মধ্যে বাদী নিজকৃত ভাষাপত্র সংশোধন করিতে অধিকারী। (৮)

উত্তর প্রদান হইলে ভাষাপত্রের ন্যূনাধিক্য পরিহার করিবার কাহারও ক্ষমতা থাকে না, প্রতিজ্ঞাপত্রকেই ভাষাপত্র কহা যায়। ভাষাপত্রের লেখক কায়স্থ ব্যক্তি। তাহার পরীক্ষক উদাসীন বিজ্ঞ ব্যক্তি। যে ব্যক্তির সঙ্গে কোন পক্ষের কোন সংস্রব নাই তাহাকেই উদাসীন কহা যায়।

শাস্ত্রকারেরা কহেন শতরঞ্চাদি দ্যূতক্রীড়ায়, রতে, যজ্ঞকর্ম্মে ও ব্যবহারাদি বিষয়ে কর্ম্মকর্ত্তা নিজে ভাল মন্দ বুঝিতে পারেন না। উদাসীন ব্যক্তিরা তত্তাবৎ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিতে পান। তাঁহাদিগের দর্শনপথে ও বুদ্ধিমার্গে অন্যের দোষ গুণ পতিত হয় অতএব রাজদ্বারে যাইবার অগ্রে বিজ্ঞ ও উদাসীন ব্যক্তিকে ভাষাপত্র দেখাইবে। তদীয় পরামর্শে ভাষাপত্র পরিশুদ্ধ করিবে। (৯)

প্রিয়দর্শন! তুমি আমাকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করিতে পার; স্থল বিশেষে বাচনিক অভিযোগ হইত কিনা। তাহার সম্বন্ধে কি প্রকার নিয়ম ছিল। পাঠক, তুমি বুঝিয়াছ এরূপ স্থলে কি হইত? এখানে প্রাড্‌বিবাক নিজেই অর্থীর স্বভাবোক্ত বাক্যগুলি শুনিয়া লিখন পূর্ব্বক ভাষাপত্রের প্রতিজ্ঞা, পক্ষ ও সাধ্য সংস্থাপন করিতেন। (১০) বাচনিক অভিযোগের বিষয়গুলি অগ্রে পাণ্ডুলেখ্য স্বরূপে কাষ্ঠ ফলকে লিখিত হইত, তৎপরে তাহা অভিযোক্তাকে শ্রবণ করানই প্রসিদ্ধ রীতি। উক্ত শ্রবণ করিয়া অভিযোক্তা যদি তদীয় তৎকালের বিস্মৃত বিষয়গুলি সন্নিবিষ্ট এবং অপ্রাসঙ্গিক বিষয় পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে তবে তদ্বিষয়ের সামঞ্জস্য বিধান পূর্ব্বক ফলকস্থিত পাণ্ডুলেখ্যের বিষয়গুলি যথাক্রমে প্রতিলিপি করিয়া প্রাড্‌বিবাককে স্বহস্তে ভাষাপত্র সম্পন্ন করিতে হইত।

---

(৮) শোধয়েৎ পূর্ব্ব পক্ষন্তু যাবন্নোত্তর দর্শনং।
উত্তরেণাবরুদ্ধস্য নিবৃত্তং শোধনং ভবেৎ॥

(৯) তটীন্ প্রজ্ঞান্ সবর্ণজ্ঞান্ কুরু মুদ্রা কয়াহিতান্।
লেখকানপি কায়স্থান্ লেখ্যকৃত্যে বিচক্ষণান্॥ ১০
পরাশর—আচার প্রকরণ।

দ্যূতে চ ব্যবহারে চ প্রবৃত্তে যজ্ঞ কর্ম্মণি।
যানি পশ্যন্ত্যুদাসীনাঃ কর্ত্তা তান্নিপশ্যতি॥
ব্যাস সংহিতা।

(১০) পূর্ব্বপক্ষং স্বভাবোক্তং প্রাড্‌বিবাকোঽথ লেখয়েৎ।
পাণ্ডুলেখ্যেন ফলকে পশ্চাৎ পত্রে নিবেশয়েৎ॥
কাত্যায়ন।

যে বিচারক অর্থিবাক্যের প্রতিকূল বাক্য লেখেন অথবা প্রত্যর্থীর উত্তর, বাক্য বিরুদ্ধভাবে অর্থীকে জ্ঞাপন করান, স্থল বিশেষে উভয় পক্ষেরই বিপর্য্যয় কথা লেখেন তিনি আর্য্যজাতির শাসন অনুসারে চৌর সদৃশ পাপী ও দণ্ডনীয় ব্যক্তি; রাজা এরূপ ব্যক্তিকে চৌর্য্যাপরাধের শাস্তি প্রদান করিতেন। লেখক তোমাদিগকে একটী কথা বিজ্ঞাপন করি, তোমরা যদি সভ্যতাভিমানে মত্ত না হও তবে মর্ম্মগ্রহ করিতে পারিবে। দেখ আর্য্য জাতির বিচার কার্য্য কতক্ষণ পরে নৃপতিসন্নিধানে উপস্থিত হয়। (১১)

তোমরা প্রথম বিচারস্থলকে নিম্ন আদালত বলিয়া থাক। দ্বিতীয় স্থলকে উচ্চ আদালত বা আপীল আদালত বল। তৃতীয় স্থলকে সর্ব্বোচ্চ কিম্বা তৎপরিবর্ত্তে প্রধান বিচারস্থল নামে নির্দ্দেশ করিয়া থাক। এই প্রকারে ক্রমশঃ দেশ শাসনকর্ত্তা হইতে রাজা বা রাজ্ঞী পর্য্যন্ত ক্রমান্বয়ে উচ্চ উচ্চতর, ও উচ্চতম কহিয়া থাক, লেখকেরও সে প্রকার বলিবার পথ আছে।

মনু ও নারদ ঐকমত্য অবলম্বন পূর্ব্বক কহিয়াছেন প্রথমে বাদী প্রতিবাদীর স্বজনের নিকটে বিচার নিষ্পত্তি হওয়া উচিত, দ্বিতীয় কল্পে বাণিজ্য ব্যবসায়ী মধ্যস্থ বর্গদ্বারা বিচার নিষ্পত্তি মন্দ নয়, তৃতীয় কল্পে সদ্বিদ্যাসম্পন্ন বিপ্রজাতির সভায় বিচার্য্য বিষয় নিক্ষিপ্ত হওয়া উচিত, তাঁহাদিগের পরেই নৃপতি সদস্য পরিবৃত প্রাড্‌বিবাকাদিদ্বারা বিচার দর্শন সমাধা হওয়া উচিত। সর্ব্বশেষে নৃপতি অমাত্য পরিবৃত হইয়া স্বয়ং বিচার দর্শন কার্য্য সম্পন্ন করিবেন। ইহাদের প্রত্যেকের নাম যথাক্রমে কুল, শ্রেণী, গণ, অধিকৃত ও নৃপতি শব্দে নির্দ্দেশ করা যায়।

প্রিয়দর্শন, তুমি অভিজ্ঞ, তোমার বুদ্ধিবিবেচনায় আর্য্যজাতির ধর্ম্মশাস্ত্রকারদিগকে আধুনিক সভ্যজাতির প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ সচিব অপেক্ষা প্রগাঢ়বুদ্ধি বলিয়া বিশেষ অনুভব হয় কি? কি সমকক্ষ বা তোমার মতে হীনকল্প বলিয়া বোধ হয় তাঁহাদিগের তুমি যাহাই জ্ঞান কর কিছু ক্ষতি নাই। তাঁহাদিগের পরামর্শ শুন, তৎকৃত মীমাংসা দেখ অবশ্য তোমার ভক্তি হইবে। নৃপতি অথবা বিচারক অগ্রে বাদী প্রতিবাদীর ভ্রম প্রমাদ কথিত বিষয়গুলি নিরাস করিতেন। তৎপরে যথার্থ

---

(১১) অন্যদুক্তং লিখেদ্যোঽন্যৎ অর্থিপ্রত্যর্থিনাং বচঃ।
চৌরবৎ শাসয়েত্তন্তু ধার্ম্মিকঃ পৃথিবীপতিঃ॥
কাত্যায়ন।
কুলানি শ্রেণয়শ্চৈব গণাত্বধিকৃতা নৃপাঃ।
প্রতিষ্ঠা ব্যবহারাণাং গুর্ব্বেষোত্তরোত্তরং।
মনু নারদৌ॥

তত্ত্বের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইতেন। সদোষ অপ্রসিদ্ধ নিষ্প্রয়োজন ও নিরর্থক বাদের খণ্ডন না করিয়া কদাচ মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইতেন না।

পাঠক, তুমি এক্ষণে জিজ্ঞাসা করিতে পার সদোষ, অপ্রসিদ্ধ, নিষ্প্রয়োজন ও নিরর্থক বিবাদের লক্ষণ বল তবে তোমরা বুঝিবে। (১২)

যে বিষয় দ্বারা বাদীর কোন প্রকার অনিষ্ট অথবা মানহানির সম্ভাবনা নাই তদ্রূপ বাক্যকে সদোষ-বাদ কহা যায়। যেমন অমুক আমার প্রতি হাস্য করিয়াছে।

যাহা কখন ঘটে নাই, ঘটিবার সম্ভাবনাও নাই, তদ্রূপ বাক্যে বাদ উত্থাপন করিলে তাহাকে অপ্রসিদ্ধ বলিয়া গণ্য করা যায়। যেমন কেহ কহিল, আমার একটী গর্দ্দভ ছিল অমুক তাহার শৃঙ্গদ্বয় ভগ্ন করিয়া লইয়াছে। এ বাক্যকে কে না অপ্রসিদ্ধ বলিবে!

কোন কোন স্থলে ব্যক্তি বিশেষের এ প্রকার স্বভাব আছে যে, তাহাদিগের নিজের ক্ষতি ঘটিবার আশঙ্কা না থাকিলেও অন্যের ক্ষতি হইতে পারে বলিয়া বিবাদ করে; তদবস্থায় যে বাদ প্রতিবাদ তাহাকে নিষ্প্রয়োজন কহা গিয়া থাকে। সংসারে এমন ব্যক্তিও অনেক আছেন যাঁহারা নিজকৃত অপরাধকে দোষ বলিয়া গণ্য করিতে জানেন না এবং অভিমানের বশবর্ত্তী হইয়া ব্যক্তি বিশেষকে ভর্ৎসনা, তাড়না ও প্রহারাদি করিয়া থাকেন এবং তাহার প্রতিফল স্বরূপ সামান্য লোক হইতে গ্লানিসূচক অপবাদ অথবা অল্প আঘাত প্রাপ্ত হইয়া ক্রোধের বশে অভিযোগ করেন; তদবস্থায় ঐরূপ অভিযোগকে শাস্ত্রকারেরা নিরর্থক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

বিদ্যাবতী স্ত্রীজাতিকে লেখক লীলাবতী বা লাবণ্যবতী বলিয়া সম্বোধন করিবে, তোমরা তাহাতে রুষ্ট হইও না। তোমরাও লেখকের কথা শুনিয়া বিচার করিতে পার; সুতরাং তোমাদিগকে যদি এখানে আহ্বান না করি তবে আমার সভ্য, অভিজ্ঞ, প্রিয়দর্শন পাঠকগণ আমাকে অসহৃদয় কহিবেন। তাঁহাদিগের মনস্তুষ্টি ও তোমাদিগের মর্য্যাদা বৃদ্ধির জন্য তোমাদিগকেও ডাকিব। তোমরা কোন

---

(১২) অপ্রসিদ্ধং সদোষঞ্চ নিরর্থং নিষ্প্রয়োজনং।
অসাধ্যং বা বিরুদ্ধং বা রাজা পক্ষং বিবর্জয়েৎ॥

বৃহস্পতি॥

নকেনচিৎ কৃতোযস্তু সোঽপ্রসিদ্ধ উদাহৃতঃ।
কার্য্যবাধবিহীনশ্চ বিজ্ঞেয়ো নিষ্প্রয়োজনঃ॥
অল্পাপরাধশ্চাল্পার্থো নিরর্থক উদাহৃতঃ।
কার্যবাধ বিহীনশ্চ বিজ্ঞেয়ো নিষ্প্রয়োজনঃ॥

বৃহস্পতি।

শঙ্কা করিও না। তোমাদিগকে বশিষ্ঠের অরুন্ধতী ও অক্ষমালা, নলের দময়ন্তী, কৃষ্ণের রুক্মিনী, সত্যবানের সাবিত্রী, শিবের পার্ব্বতী ও গৌরী এবং অন্যান্য বিচক্ষণা সাধ্বী স্ত্রীলোকদিগের তুল্য জ্ঞান করি। তাঁহারা পুরুষদিগের সঙ্গে সমকক্ষ ভাবে সকল বিষয় বিচার করিতে পারিতেন, সময়ে সময়ে তাঁহারা পুরুষ অপেক্ষাও বুদ্ধি বৈচিত্র প্রদর্শন করিতেন। তাই তোমাদিগকে স্মরণ করিলাম। রাম সীতাকে বনবাস দিয়াছিলেন বলিয়াই তোমাদিগকে সীতার সমান বলিতে বাসনা করি না। সেইজন্য তোমাদিগকে সীতা শব্দে আখ্যা দিলাম না। লক্ষ্মী অতি চঞ্চলা বলিয়া তাঁহার সঙ্গে উপমা দিতে ইচ্ছাও করি না। সরস্বতী কহিলে উপমার স্থল থাকিবে না এজন্য সেটী বাদ দিলাম।

পাঠক, তোমাকে সেদিন কহিয়াছি সাক্ষীর বিষয় আদ্যোপান্ত বলিব, অদ্য আরম্ভ করিলাম। ভারতবর্ষের ঋষিগণ এ বিষয়ের যতদূর নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন তৎসমুদায় কহিব; তুমি দেখ তাঁহারা কোন্ কথা সভ্য জাতির নিকট শিক্ষাপ্রাপ্তির জন্য অবশিষ্ট রাখিয়া গিয়াছেন।

সাক্ষি-প্রকরণ

কোন ঘটনাস্থলে কোন ব্যক্তি কোন বিষয় স্বচক্ষে দর্শন ও স্বকর্ণে শ্রবণ না করিলে তদ্বিষয়ে সাক্ষী হইতে পারে না, অতএব সাক্ষী হইবার অগ্রে স্বচক্ষে দর্শন ও স্বকর্ণে শ্রবণ অত্যাবশ্যক। যিনি সাক্ষিধর্ম্ম অবলম্বন করেন তাঁহাকে সত্য বলা উচিত। সত্য কথায় ধর্ম্ম ও অর্থ কিছুই ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না। যথাদৃষ্ট ও যথাশ্রুত বিষয় কহিবে কিন্তু ধর্ম্মাধিকরণে আহূত বা পরিপৃষ্ট না হইলে কদাচ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সাক্ষী দিবে না, তাহাতে পাপ লিখে। স্থলবিশেষে ও কার্য্যবিশেষে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সাক্ষী দিবার বিধি দেখা যায়, তথায় স্বেচ্ছা প্রবৃত্ত সাক্ষ্যদানে অধর্ম্ম হয় না। বিধি ও নিষেধ স্থলে সাক্ষী সাক্ষ্য ব্যতিক্রম করিলে দণ্ড ও পাপভাগী হন। (১৩)

---

(১৩) সমক্ষদর্শনাৎসাক্ষী শ্রবণাচ্চৈব সিদ্ধতি।
তত্র সত্যংব্রুবন্ সাক্ষী ধর্ম্মার্থাভ্যাং নহীয়তে ॥ ৭৪
যত্রানিবদ্ধোঽপীক্ষেত শৃণুয়াদ্বাপি কিঞ্চন।
পৃষ্টস্তত্রাপি তদ্ ব্রূয়াৎ যথা দৃষ্টং যথা শ্রুতং ॥ ৭০

মনু ৮ অ

যঃ সাক্ষী নৈব নির্দ্দিষ্টো নাহূতো নৈব দেশিতঃ।
ব্রূয়াৎ মিথ্যেতি তথ্যংবা দণ্ড্যঃসোপি নরাধিপৈঃ।

মিতাক্ষরা ধৃত যাজ্ঞবল্ক্য বচন।

সাক্ষ্যগ্রহণ কালাদি

আর্য্যেরা সাক্ষ্য গ্রহণের যে কাল নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহাতে ইহাই স্পষ্ট অনুমান হয় যে যখন জগতের সমস্ত প্রাণী সুস্থভাবে থাকে সেই সময়কেই ঋষিগণ সাক্ষ্য গ্রহণের প্রকৃত কাল বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। সে সময়ের নাম পূর্ব্বাহ্ন। (১৪)

সাক্ষ্য গ্রহণ ধর্ম্মাধিকরণের মধ্যেই হইত। দেব ও ব্রাহ্মণ সমীপে অর্থী প্রত্যর্থীর সমক্ষে প্রাড্ বিবাক অথবা রাজা স্বয়ং সাক্ষীকে জিজ্ঞাসা করিতেন। সাক্ষী ব্যক্তি পূর্ব্ব বা উত্তর মুখ হইয়া যথাদৃষ্ট ও যথাশ্রুত বিষয় সত্য প্রমাণ কহিত; সাক্ষ্য গ্রহণ সময়ে প্রাড্ বিবাক ও সভ্যগণ সাক্ষীর নিকট সত্যের প্রশংসা ও মিথ্যার দোষ প্রখ্যাপন করিতেন। সাক্ষীকে সান্ত্বনা বাক্যে প্রশ্ন করা হইত। কেহ জ্ঞাতব্য বিষয়ের আভাস দ্বারা সাক্ষীকে সহায়তা করিতেন না। অথবা বারংবার জিজ্ঞাসা করিতেন না।

কাহার সাক্ষী কে উহা তোমাকে বলি নাই। প্রিয়দর্শন, তুমি নিশ্চয় জানিবে, জাতি, বয়স, ধর্ম্ম, ব্যবসায়, শ্রেণী, কুল ও মর্য্যাদা অনুসারে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি কার্য্যবিশেষে সাক্ষিযোগ্য বলিয়া পরিগণিত হয়।

---

(১৪) দেব ব্রাহ্মণ সান্নিধ্যে সাক্ষ্যং পৃচ্ছেদৃতং দ্বিজান্।
প্রাঙ্মুখাদঙ্মুখোবাপি পূর্ব্বাহ্নেবৈশুচিঃ শুচীন্॥ ৮৭
সভান্তঃসাক্ষিণঃ সর্ব্বানর্থি প্রত্যর্থি সন্নিধৌ।
প্রাড্বিবাকোহনুযুঞ্জীত বিধিনানেন সান্ত্বয়ন্॥ ৭৯
সত্যং সাক্ষী ব্রুবন্ সাক্ষ্যে লোকানাপ্নোতি পুষ্কলান্।
ইহ চার্থসত্যং কীর্ত্তিং বাগেষা ব্রহ্ম নির্ম্মিতা॥ ৮১
সাক্ষ্যেহনৃতং বদন্ সাক্ষী পাশৈর্বধ্যেত বারুণৈঃ।
বিবশঃ শত মাজাতি তস্মাৎ সাক্ষী বদেদৃতং॥ ৮২
আত্মৈবহ্যাত্মনঃ সাক্ষী গতিরাত্মা তথাত্মনঃ।
মাবমংস্থাঃ সমাত্মানং নৃণাং সাক্ষিণমুত্তমং॥ ৮৪
মন্যন্তেনৈবপাপোকৃতো নকশ্চিৎ পশ্যতীতিনঃ।
তাংস্তুদেবাঃ প্রপশ্যন্তি স্বস্যৈবান্তর পুরুষঃ॥ ৮৫

মনু—৮ অ

স্বভাবোক্তং বচস্তেষাং গ্রাহ্যং যদ্দোষ বর্জ্জিতং।
উক্তেহপি সাক্ষিণো রাজ্ঞা নপ্রষ্টব্যাঃ পুনঃ পুনঃ॥

নারদ সংহিতা।

পাষণ্ড, নাস্তিক, মিথ্যাবাদী, অপোগণ্ড বালক, ছলকারী, জটাধারী, ছদ্মবেশী লোক, স্ত্রীজাতি, ধূর্ত্ত প্রভৃতি যাবতীয় মন্দসংসর্গী ব্যক্তি ও পথিককে আর্য্যেরা সাক্ষিযোগ্য জ্ঞান করিতেন না।

রাজা, সন্ন্যাসী, বিদ্বান্ ও অতি বৃদ্ধবর্গকে সাক্ষ্যদান হইতে নিষ্কৃতি দিয়াছিলেন ; কেহ সাক্ষ্য মানিলে ইহাদিগকে সাক্ষী হইতে হইত না। এতদ্ব্যতীত জনগণের মধ্যে কাহাকেও কেহ সাক্ষী মানিলে সাক্ষ্যদান বিরহে সাক্ষীর ভর্ৎসনা ও নিগ্রহ হইত। (১৫) ইহা দণ্ডবিধির প্রকরণে দেখান যাইবে।

প্রিয়দর্শন, এখন তুমি কহিতে পার কেমন বিবাদে কোন্ ব্যক্তি কাহার সাক্ষী হইত উহা বল। আমি অগ্রে তাহাই কহিব তৎপরে সাক্ষীর লক্ষণাদি শুনিবে। সাক্ষিপ্রকরণ অত্যন্ত বিস্তৃত, একদিনে বলিলে তোমাদিগের মনস্তুষ্টি হইবে না ; পড়িবে ও ক্লেশ বোধ হইবে, অতএব ক্রমে ক্রমে বিষয়ান্তরের বিরামস্থলে সমুদায় কহিব। অদ্য সমাজ সংস্কার উপনীত করিতে বাঞ্ছা করি।

সমাজের ক্ষমতা

প্রাচীন রাজর্ষিবর্গ দোষ সংশোধনে একান্ত অনুরাগী ছিলেন। ইঁহারা সমাজ বন্ধনের বল বুঝিয়াছিলেন। সমাজের কোন ব্যক্তিকে হঠাৎ পরিত্যাগ করিতে সম্মত ছিলেন না। যদি কোন ব্যক্তি দোষী বলিয়া পরিগণিত হইত, রাজা তাহার সে দোষ সংশোধন নিমিত্ত যথাযোগ্য দণ্ডবিধান করিতেন এবং সমাজের অভিপ্রায় অনুসারে গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিকে যথোপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া সমাজে সংস্থাপন করিতেন। এইরূপে আর্য্যসমাজের বলবিক্রম বৃদ্ধি হইয়াছিল। তৎকালে উন্মার্গপ্রস্থিত, কুলচ্যুত, শ্রেণীভ্রষ্ট ও জাতিভ্রষ্ট ব্যক্তিবর্গও বিনীতভাবে রাজার নিকট আসিয়া নিজ দোষের দণ্ড গ্রহণ করিলে রাজা যথাযোগ্য দণ্ডপ্রদান পূর্ব্বক সমাজের নিকট উহার আত্মশুদ্ধির প্রায়শ্চিত্ত জিজ্ঞাসা করিতেন। সে ব্যক্তি যথাশাস্ত্র প্রায়শ্চিত্ত সম্পাদন করিয়া সমাজের নিকট আত্মসমর্পণ করিলে রাজা পরিতুষ্ট হইয়া তাহাকে তৎকুলে ও সমাজের পথে প্রবেশ করিতে অধিকার দিতে

---

(১৫) দাসো নৈকৃতিকোঽশ্রাদ্ধ বৃদ্ধ স্ত্রী বালচক্রিকা।
মত্তোমত্ত প্রমত্তার্ত্ত কিতবা গ্রাম যাজকাঃ ॥
মহাপথিক সামুদ্র বাণ প্রব্রজিতাতুরাঃ।
বার্দ্ধিক শ্রোত্রিয়া চারহীন ক্লীবকুশীলবৌ।
নাস্তিক ব্রাত্যদারাগ্নি ত্যাগিনোঽযাজ্যযাজকাঃ।
একস্থালী সহচারী শচরেত সনাভয়ঃ ॥

নারদ সংহিতা।

পারিতেন। যে রাজা এইরূপ লোকহিতকর কার্য্য করিতে সমর্থ হইতেন, তিনি লোকসমাজে অক্ষয় কীর্ত্তি ও যশোলাভ করিতেন। এবং শাস্ত্রকারদিগের মতে এমন রাজার স্বর্গগমনপথ সদা উদ্ঘাটিত, তিনি চিরকাল স্বর্গে বাস করিবার যোগ্য। যখন তিনি স্বর্গগামী হন, তখন দেবলোকেরাও তাঁহার প্রশংসা না করিয়া বিরত থাকিতে পারেন না। প্রিয়দর্শন, এখন ক্রমেই সমাজের বল খর্ব্ব হইয়া আসিতেছে, দুর্দ্দশারও একশেষ; এখন একবার সর্ব্বজন-হিতকারী পরাশর মুনির কথিত এক-জন হিন্দু ভূপতির আবির্ভাব হওয়া আবশ্যক। (১৬)

উপাধি ও সম্মান

বিদেশি, তুমি মনে করিয়াছ আমি তোমাকে ভুলাইবার জন্য বাগ্জাল বিস্তার করিয়াছি, তুমি একবার ভ্রমে বা স্বপ্নেও সে প্রকার চিন্তা করিও না। আমি অপ্রমাণ কোন কথা তোমার নিকট বলিব না: তুমি একবার প্রমাণ প্রয়োগগুলি অন্য ব্যক্তির নিকট মিলাইয়া দেখ। ঠিক্ মিলে যায় কি না। হে সভ্য! তোমা-দিগকে নমস্কার, তোমরা যেমন পুরাতন জিনিস ঘসে মেজে নূতন বলিয়া বাহির কর, এ জাতির মধ্যে সে প্রকার পাইবে না। ইহাদিগের পুরাতন দ্রব্যজাত যাহা আছে, সেগুলির যদি কেহ একবার পর্দ্দা ঝাড়িয়া বাহির করে তবে তোমার প্রদর্শিত পরিপাটি নূতন দ্রব্যগুলি প্রাচীন আর্য্যজাতির নিকট পুরাতন ও কীটাকুলিত অথবা জর্জ্জরিত বলিয়া বোধ হইবে।

তোমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূস্বামিগণকে, সামন্তরাজাদিগকে, করদভূপতিবর্গকে ও মিত্র সম্রাট্‌সমূহকে সম্মান করিয়া থাক, স্থলবিশেষে উপাধি দিয়া থাক, বিদ্বান্ মণ্ডলীর পাণ্ডিত্যের প্রশংসার চিহ্নস্বরূপ উপাধি প্রদান কর; কার্য্যকুশল লোক-দিগকে কেবল বাহবা দিয়া তাহাদিগের আকারগত বাহ্যভাব পরিত্যক্ত করিয়া কতক মনস্তুটি করিতে সক্ষম বটে—কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মনে প্রবেশ করিতে পার না। আর্য্যেরা অন্ধকে পদ্মলোচন কহিতেন না। যদি কহিতেন অবশ্য তাহার দর্শন-শক্তি দিতেন। ইঁহারা যাহাকে সম্মান বা উপাধি দিতেন, তাহার আন্তরিক বল ও উৎসাহ বৃদ্ধির উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া দিতেন। কেবল উপাধি পাইয়া তাহাকে অন্নসংস্থান জন্য অন্য লোকের উপাসনা করিতে হইত না। সে ব্যক্তিকে উপযুক্ত

---

(১৬) দস্যুভ্য মার্গাণি কুলানি রাজা শ্রেণীশ্চ জাতিশ্চ গুণাংশ্চ লোকান্।
জানীয় মার্গে বিদধাতি ধর্ম্মান্ নাবেৎপি গীর্ব্বাণ পদৈঃ প্রশস্তঃ ॥
৮৫ শ্লোক।
বৃহৎ পরাশর সংহিতা ৫ অধ্যায় আচার প্রকরণ।

ভরণপোষণের শক্তি প্রদান হইত। তাহার উন্নতির দ্বার রুদ্ধ থাকিত না, সে সাধ্যসত্ত্বে সর্ব্বত্র প্রবেশ করিতে পারিত।

শাস্ত্রকারেরা কহিয়াছেন, যে রাজা দণ্ডনীয় ব্যক্তির দণ্ডবিধান করেন তিনি সমস্ত যজ্ঞের ফল পান ; তদ্রূপ যে শরণাগত প্রতিপালন পূর্ব্বক গুণিগণের, বৃদ্ধজনের, সাধুশীলের, সামন্ত ভূপতি প্রভৃতির ও মণ্ডলদিগের সম্মান করেন, তিনিও সমস্ত যজ্ঞ-ফলের অধিকারী এবং যে রাজা এবম্বিধ ব্যক্তির অসম্মানহেতু মনঃপীড়া জন্মান তিনি অচিরেই ধ্বংস প্রাপ্ত হন। (১৭)

---

(১৭) দণ্ডং দণ্ড্যেষু কুর্ব্বাণো রাজা যজ্ঞফলং লভেৎ।
বৃদ্ধান্ সাধূন্ দ্বিজান্ মৌলান্ যো ন সম্মানয়েন্নৃপঃ।
পীড়াং করোতি চামীষাং রাজা শীঘ্রং ক্ষয়ং ব্রজেৎ॥

পরাশর সংহিতা, ২২শ্লো—১০ অধ্যায়।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

মহাবীর বহু শিষ্য সমভিব্যাহারে অপাপ পুরীতে প্রত্যাগমন করিলেন। সে সময় তাঁহার সঙ্গে চতুর্দ্দশ সহস্র সাধু, ৩৬০০০ সহস্র সাধ্বী, চতুর্দ্দশ পূর্ব্ব শাস্ত্রে (১) পণ্ডিত, ৩০০ শত শ্রমণ, ১৩০০ শত অবধি জ্ঞানী, (২) ৭০০ শত কেবলী, (৩) ৫০০ শত মনোবিৎ, ৪০০ শত বাদী, একলক্ষ উনষষ্টি সহস্র শ্রাবক এবং এই সংখ্যার দ্বিগুণ শ্রাবিকা এবং গোতম ও সুধর্ম্মা নামক দুইজন গণধর সঙ্গে ছিল। মহাবীর এই সকল প্রগাঢ় চিন্তাশীল শিষ্যগণের মধ্যে থাকিয়া ৭২ বৎসর বয়সে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলেন। পার্শ্বনাথের ২৫০ শত বৎসর পরে মহাবীরের মৃত্যু হয়। ইউরোপীয় পুরাবিদ্‌গণের মতানুসারে শেষ তীর্থঙ্করের খৃষ্ট জন্মাইবার ৫৬৯ বৎসর পূর্ব্বে মৃত্যু হইয়াছিল।

মহাবীর চতুর্ব্বিংশতি জিন, তাঁহার পূর্ব্বে ঋষভ, অজিত, সম্ভব, অভিনন্দন, সুমতি, পদ্মপ্রভা, সুপর্শ, চন্দ্রপ্রভা, পুষ্পদন্ত, শীতলা, শ্রেয়ংশ, বাসুপূজ্য, বিমলা, অনন্ত, ধর্ম্ম, শান্তি, কুন্থু, অরা, মালি, সুব্রত, নাম, নেমি ও পার্শ্ব নামক তীর্থঙ্কর বর্ত্তমান ছিলেন। ইহাদিগের মধ্যে পার্শ্বনাথের মত ভারতবর্ষে সর্ব্বস্থানে প্রচলিত। শত্রুঞ্জয়মাহাত্ম্যমধ্যে পার্শ্বনাথ সম্বন্ধে এইরূপ আখ্যায়িকা আছে, যথা—

---

(১) সূত্রিতানি গণধরৈর্ অঙ্গেভ্যঃ পূর্ব্বমেব যৎ। পূর্ব্বাণিত্যভিধীয়ন্তে তেনৈতানি চতুর্দ্দশ। ইতি মহাবীর চরিতম্। জৈনদিগের অঙ্গ শাস্ত্রের পূর্ব্বে গণধরেরা যাহা প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহাকে পূর্ব্বাঙ্গ বা পূর্ব্বতত্ত্ব বলে। পূর্ব্ব নামক শাস্ত্র চতুর্দ্দশ সংখ্যায় বিভক্ত॥

(২) "অসম্যক দর্শনাদিগুণজনিতক্ষয়োপশম নিমিত্তমবিচ্ছিন্ন বিষয়ং জ্ঞানমবধিঃ।" ইতি জৈন সূত্র বিবরণম্। ভ্রমাদি দোষ নিবৃত্তির নিমিত্ত অবিচ্ছিন্ন (ধারাবাহী) বিষয়ক জ্ঞানকে অবধি জ্ঞান বলে ॥

(৩) সর্ব্বথাবরণ বিলয়ে চেতন স্বরূপা আবির্ভাবঃ কেবলং তদস্যাস্তি কেবলী ॥

হেমচন্দ্র টীকা।

"তত্রাসীদশ্বসেনাখ্যো জিনাজ্ঞাকমলো নৃপঃ ।
অভিরাম গুণোদ্দামা বামা বামাশ্যজনি ॥
সর্ব্ব বানা শিরোমণিং নৈদধ্যানাসা বল্লভা ।
সান্দ্রা যামিনী যামে তুর্য্যে বর্দ্ধ্যানমথাকরান্ ॥
শয়ানা শয়নীয়ে প্রাপশ্যৎ স্বপ্নাংশ্চতুর্দ্দশ ॥
চৈত্রে সিতৌ চতুর্থ্যাং ভে বিশাখায়াং জিনেশ্বরঃ ।
তদ্গর্ভে প্রাপতামপাগুদ্যোতশ্চ জগত্ত্রয়ে ॥
পূর্ণেঽথকালে পৌষস্য দশম্যাং মিত্রভে সুতম্ ।
সা সূত শ্যামলং সর্পধ্বজমিজ্যং সুরাসুরৈঃ ॥"

অর্থাৎ পার্শ্বনাথ কাশীধামে অশ্বসেন নামে জৈন রাজার পুত্র। ইঁহার মাতার নাম বামা। বামা দেবী একদিন রাত্রে স্বপ্ন দেখিতেছিলেন যেন চৈত্র শুক্ল চতুর্থীতে বিশাখা নক্ষত্রে আদি জৈনেশ্বর তাঁহার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। অনন্তর তাঁহার গর্ভ সঞ্চার হইলে, তিনি পৌষ মাসের দশমী তিথিতে মিত্র দৈবত নক্ষত্রে তাঁহাকে প্রসব করিলেন। তিনি শ্যামবর্ণ এবং সর্পচিহ্নযুক্ত ও সকলের পূজ্য। পার্শ্বদেব যৎকালে মাতৃগর্ভে বাস করেন, তখন তাঁহার মাতা বামাদেবীর এইরূপ জ্ঞান হইত, তিনি যেন তাঁহার পার্শ্বে একটি সর্প ধারণ করিতেছেন। এ কথা মুখেও বলিতেন, অতঃপর ঐ কারণে তাঁহার পিতা "পার্শ্ব" এই নামে তাঁহাকে ডাকিতে লাগিলেন। তাহাতেই তিনি ক্রমে পার্শ্বনাথ নামে বিখ্যাত হইলেন, যথা—

অস্যাস্মিন্‌গর্ভগে পার্শ্বে সর্পং সর্পন্তমৈক্ষত ।
ইতীব নির্ম্মমে তস্য পার্শ্ব ইত্যভিধাং পিতা ॥

পার্শ্বনাথের বাল্যকাল ও যৌবনকাল উভয় কালই নির্দ্দোষে অতিবাহিত হয়। পরে বার্দ্ধক্যে তিনি কাশীবাস পরিত্যাগ করিয়া সম্মেত পর্ব্বতে প্রাণত্যাগ করেন। তিনি ১০০ শত বৎসর জীবিত ছিলেন, তাঁহার জীবনের অধিকাংশ কালই উপদেশ প্রদান, ধর্ম্ম প্রচার প্রভৃতি সদনুষ্ঠানে অতিবাহিত হয়, যথা—

আপূর্ব্বর্ষশতং প্রপাল্য ভগবান্ সম্মেত শৈলং গতো ।
মাসেনানশনেন কর্ম্ম ক্ষিপ্বং কৃত্বা ত্রয়স্ত্রিংশতা ॥
সার্দ্ধং তৈঃ শ্রমণৈঃ সিতাষ্টম দিনে মাসে শুচৌ নির্বৃতে
রাধায়াং ত্রিদশৈঃ কৃতান্তকরণঃ শ্রীপার্শ্বনাথো জিনঃ ।—

জৈনদিগের আচার্য্যেরা বৌদ্ধ সম্প্রদায় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যে সকল দর্শন গ্রন্থ ও বস্তু নির্ণয়, তর্ক প্রণালী উদ্ভাবন করেন তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই—

প্রথম বৌদ্ধ সম্প্রদায় হইতে পৃথক্ হইবার কারণ এই যে, তাঁহারা আত্মার স্থায়িত্ব, ঈশ্বরের অস্তিত্ব, বাহ্য বস্তুর পৃথক্ বস্তুত্ব স্বীকার করেন না। আদি জৈনাচার্য্যদিগের উহা রুচিকর না হওয়াতেই তাঁহারা ভিন্ন হইলেন। ভিন্ন হইয়া

আপনাদের মন্তব্য স্থির রাখিবার জন্য নানা গ্রন্থ, নানা যুক্তির উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। এই মতের দর্শনগ্রন্থ এই সকল—

সিদ্ধসেন বাক্য। প্রমেয় কমল মার্ত্তণ্ড (গ্রন্থকার প্রতাপচন্দ্র), আপ্ত নিশ্চয়ালঙ্কার (মহেন্দ্র চন্দ্র সূরি গ্রন্থকার) তৌতাতিক (তুতাতভট্ট গ্রন্থকার) বীতরাগস্তুতি। অর্হৎ প্রবচন সংগ্রহ। পরমাগম সার। যোগদেব (ইনি গ্রন্থকার, গ্রন্থের নাম পাওয়া যায় না) তত্ত্বার্থ সূত্র। অর্হত (ইনিও গ্রন্থনির্ম্মাতা, গ্রন্থের নাম উল্লেখ নাই) পদ্মনন্দি। বাচকাচার্য্য (ইনিও গ্রন্থকার) স্বরূপ সম্বোধন। বাচকাচার্য্যের টীকাকার বিদ্যানন্দ। হেমচন্দ্রাচার্য্য। সিদ্ধান্ত। অনন্তবীর্য্য (গ্রন্থকার) স্যাদ্বাদ। স্যাদ্বাদ মঞ্জরী। জিনদত্ত সূরি প্রভৃতি (গ্রন্থকার)।

জৈন দুই প্রকার। শ্বেতাম্বর জৈন ও দিগম্বর জৈন। এই উভয়ের ধর্ম্ম প্রভেদ প্রভৃতি, জিনদত্ত সূরি বলিয়াছেন যথা—

জিনদত্ত সূরিণা জৈনং মতমিত্থমুক্তম্ ।
বলভোগোপভোগানামুভয়োর্দানলাভয়োঃ ॥
অন্তরায়স্তথা নিদ্রা ভীরজ্ঞানং জুগুপ্সিতম্ ।
হিংসারত্যরতী রাগদ্বেষৌ অবিরতি স্মরঃ ॥
শোকো মিথ্যাত্বমেতেঽষ্টাদশ দোষা ন যস্য সঃ ।
জিনো দেবো গুরুঃ সম্যক্ তত্ত্বজ্ঞানোপদেশকঃ ॥
জ্ঞান দর্শনচারিত্রাণ্যপবর্গস্য বর্ত্তনি ।
স্যাদ্বাদস্য প্রমাণে দ্বে প্রত্যক্ষ মনুমাপি চ ॥
নিত্যানিত্যাত্মকং সর্ব্বং নব তত্ত্বানি সপ্ত বা ।
জীবাজীবৌ পুণ্যপাপে চাস্রবঃ সংবরোঽপি চ ॥
বন্ধো নির্জ্জরণং মুক্তি রেষাং ব্যাখ্যাধুনোচ্যতে ।
চেতনালক্ষণো জীবঃ স্যাদজীবস্তদন্যকঃ ।
সৎকর্ম্ম পুদ্গলাঃ পুণ্যং পাপং তস্য বিপর্য্যয়ঃ ।
আস্রবঃ কর্ম্মণাং বন্ধো নির্জ্জরস্তদ্বিয়োজনম্ ॥
অষ্টকর্ম্মক্ষয়ান্মোক্ষোঽথান্তর্ভাবশ্চ কৈশ্চন ।
পুণ্যস্য সংস্রবে পাপস্যাস্রবে ক্রিয়তে পুনঃ ॥
লব্ধানন্তচতুষ্কস্য লোকাগূঢ়স্য চাত্মনঃ ।
ক্ষীণাষ্টকর্ম্মণো মুক্তির্নির্ব্যাবৃত্তির্জিনোদিতা ॥
সরজোহরণা ভৈক্ষ্যভুজো লুঞ্চিতমূর্দ্ধজাঃ ।
শ্বেতাম্বরাঃ ক্ষমাশীলাঃ নিঃসঙ্গা জৈনসাধবঃ ॥
লুঞ্চিতাঃ পিচ্ছিকাহস্তাঃ পাণিপাত্রা দিগম্বরাঃ ।
ঊর্দ্ধাশিনো গৃহে দাতুর্দ্বিতীয়াঃ স্যুর্জিনর্ষয়ঃ ॥

ভুঙ্‌ক্তে ন কেবলং ন স্ত্রীঃ মোক্ষমেতি দিগম্বরঃ ।
প্রাহুরেষাময়ং ভেদো মহান্ শ্বেতাম্বরৈঃ সহ ইতি ॥

মর্ম্ম এই—এই মতের উপাস্য দেবতা জিন। বল, ভোগ, উপভোগ, দান, লাভ সম্বন্ধে বিঘ্ন উপস্থিত হওয়া এবং নিদ্রা, ভীতি, অজ্ঞান, জুগুপ্সা, হিংসা, রতি, অরতি, রাগ, দ্বেষ, কাম, শোক, মিথ্যা প্রভৃতি অষ্টাদশ মনুষ্য সংক্রান্ত দোষ যাঁহার নাই তিনিই তত্ত্বজ্ঞানের উপদেষ্টা, জ্ঞান, দর্শন, সচ্চরিত্র ও মোক্ষে অবস্থিত। প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই প্রমাণদ্বয় ইহাদের সম্মত। তর্করীতির নাম স্যাদ্বাদ। ইহাদিগের মতে জগতের মূল তত্ত্ব একমতে ৯টি, একমতে ৭টি। তন্মধ্যে নিত্যানিত্য সম্মিশ্র। ঐ সকল তত্ত্বের নাম জীব (১) অজীব (২) পুণ্য (৩) পাপ (৪) আশ্রব (৫) সম্বর (৬) বন্ধ (৭) নির্জ্জরণ (৮) মুক্তি (৯)। চেতন বস্তু জীব—অচেতন পদার্থ অজীব— সৎকর্ম্ম সমূহ পুণ্য—তদ্বিপরীত পাপ—কর্ম্মের বন্ধন জনকতা আশ্রব—কর্ম্মত্যাগ নির্জ্জর—অষ্ট কর্ম্মক্ষয় মুক্তি। সপ্ত তত্ত্ববাদীর মতে মোক্ষ পদার্থটী নির্জ্জারণের অন্তর্ভূত—পুণ্য সংশ্রবের, পাপ আশ্রবের অন্তর্গত। এই মতের সাধুরা ক্ষমাশীল, সঙ্গ রহিত, কেশ-সংস্কার করে না ও ভিক্ষান্নভোজী। দিগম্বরেরা পিচ্ছিকা ও পয়ঃপাত্রধারী এবং নিরাবরণ। শ্বেতাম্বরেরা উহা করে না। শ্বেতাম্বরেরা স্ত্রীসম্ভোগে একান্ত বিরত, দিগম্বরেরা রত।

নৈয়ায়িকেরা যেমন কার্য্য লিঙ্গক—ঈশ্বরানুমান করিয়া থাকেন। অর্থাৎ “ক্ষিত্যাদিকং সকর্ত্তৃকং কার্য্যত্বাৎ” ক্ষিত্যাদি পদার্থের কোন না কোন কর্ত্তা আছে, যে হেতু ক্ষিত্যাদি বস্তু জন্য। যে বস্তু জন্য হয়, সেই বস্তুর কর্ত্তা অবশ্য থাকিবে। এইরূপ ঈশ্বরানুমান জৈনেরা করে না। তাহাদের মতে জগৎ জন্যই নহে। তাহারা এইমাত্র বলে যে, কোন সর্ব্বজ্ঞ আত্মা আছেন, তিনিই ঈশ্বর। যথা—

সর্ব্বজ্ঞো জিত রাগাদি দোষস্ত্রৈলোক্য পূজিতঃ ।
যথাস্থিতার্থ বাদীচ দেবোঽর্হন পরমেশ্বরঃ । ইতি অহং চন্দ্র সূরি ।

উহাদের ঈশ্বরানুমান প্রণালী এই যে, কোন এক আত্মা সর্ব্ব পদার্থ সাক্ষাৎকারী আছে, কারণ যখন দেখা যায় যে আত্মার জ্ঞানপ্রতিবন্ধক সামগ্রী সকলের সমান নহে, কোন আত্মার জ্ঞান প্রতিবন্ধক অল্প, কোন আত্মার অধিক। এইরূপ কোন এক আত্মার জ্ঞান প্রতিবন্ধক একবারে নাই হইতেও পারে। যাহার জ্ঞান প্রতিবন্ধক একবারে নাই, সেই আত্মাই সর্ব্বজ্ঞ ও ঈশ্বর। এই প্রতিজ্ঞার উপর অনেক তর্ক-কৌশল আছে, তত্তাবতের অবতারণ করা নিষ্প্রয়োজন।

জৈন মতে জীব দুই প্রকার। সংসারী ও মুক্ত। সংসারী জীব দুইপ্রকার, সমনস্ক ও অমনস্ক। শিক্ষা ক্রিয়াকলাপাদি অভ্যাসরত জীব সমনস্ক আর তদ্রহিত জীব অমনস্ক। এই অমনস্ক জীব দুই প্রকারে বিভক্ত। ত্রস ও স্থাবর। শঙ্খ

গণ্ডলোক প্রভৃতি দ্বি-ইন্দ্রিয়, ত্রি-ইন্দ্রিয় ভেদে ত্রস ৪ প্রকার। পৃথিবী জল বৃক্ষাদি ভেদে বহুবিধ স্থাবর তত্ত্বজ্ঞান জিনোক্ত উক্ত পদার্থের স্বরূপাবগতি। তত্ত্বজ্ঞানের উপায় গুরূপদেশ ও শাস্ত্রচর্চ্চা জিনোক্ত কার্য্যকলাপের অনুষ্ঠান। মুক্তি—জ্ঞানাবরণ ও কর্ম্মবন্ধ ক্ষয় হইলে আত্মার উপরি প্রদেশে সুখস্বরূপে অবস্থান। কাহারও মতে সতত ঊর্দ্ধ গমন। "গত্বাগত্য বিবর্ত্তন্তে চন্দ্র সূর্য্যাদয়ো গ্রহাঃ। অদ্যাপি ন নিবর্ত্তন্তে ত্বালোকাকাশমাগতাঃ।" ইহাদের তর্কের নাম সপ্তভঙ্গি অর্থাৎ সপ্ত প্রকার অবয়ব-যুক্ত।

কল্প সূত্রের সমাচারি অধ্যায়ে যতিগণের কর্ত্তব্যানুষ্ঠানের বিবিধ নিয়ম লিখিত আছে, সাধারণতঃ তাহাদের পূজা-পদ্ধতি মন্ত্র যথা "ওঁম্ শ্রীং—ঋষভেয় স্বস্তি—ওঁম্ মস্তীংহম্,—ওঁম্ হ্রীং শ্রীসুধর্ম্মাচার্য্য, আদি গুরুভ্যো নমঃ ওঁম্ হ্রীং হ্রীম্ সমজিন চৈত্যলেভ্যঃ শ্রীজিনেন্দ্রভ্যো নমঃ" ইত্যাদি এবং গায়ত্রী যথা—

"নমো অরীহন্তানং নমো সিদ্ধানং নমো আয়রীয়াণং নমো উজ্ঝয়াণং নমো লোইসর্ব্বসাহূণং।"

উপরের লিখিত দার্শনিক তর্ক বিতর্ক সাধারণ যতিগণ অবগত নহে, তাহারা ধর্ম্মের স্থূল মর্ম্ম এইমাত্র জানে যে—ধর্ম্মো জগতঃ সারঃ। সর্ব্বসুখানাং প্রধানহেতুত্বাৎ। তস্যোৎপত্তির্মনুষ্যাঃ। সারং তেনৈব মানুষ্যে। অর্থাৎ ধর্ম্মই জগতের সার যেহেতু ধর্ম্মই সুখমাত্রেরই প্রধান কারণ। এবম্ভূত ধর্ম্মের উৎপত্তিকারণ মনুষ্য, সেই কারণে মনুষ্যকে জীব মধ্যে সার বলা যায়। ইহা ভিন্ন "স্বর্গাপবর্গপ্রদঃ" স্বর্গ ও অপবর্গ (মোক্ষ) ধর্ম্মের ফল ও "সাধুনাং আচারঃ" সাধু-সম্মত আচার অর্থাৎ সাধুরা যাহা আচরণ করেন তাহাই ধর্ম্মকে জানিবার পথ এবং ধর্ম্মের লক্ষণ এই যে "পুরুষ প্রধানত্বাৎ ধর্ম্মস্য" অর্থাৎ যদ্দ্বারা মনুষ্যেরা উৎকর্ষলাভ করিতে পারে। যতিগণের কর্ত্তব্য কর্ম্ম (অষ্টম তপস্যা) যথা—

চৈত্যে পরিপাঠো সমস্ত সাধুবন্দনং সাম্বৎসরিক প্রতিক্রমণং মিথঃ সাধর্ম্মিকং শমনং অষ্টমং তপশ্চ।

অর্থাৎ চৈত্য (দেবমন্দির) স্থানে পরিপাঠ (১) সাধুদিগের বন্দনা করা (২) বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ একবার তীর্থ পরিভ্রমণ (৩) পরস্পর মিত্রভাবে অবস্থান্ (৪) ইন্দ্রিয় দমন (৫) এই পাঁচটী অষ্টম তপস্যা বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

বৌদ্ধদিগের ন্যায় জৈনদিগেরও অহিংসা পরম ধর্ম্ম। অশোকের ন্যায় তাহাদিগেরও এইরূপ রাজ-ঘোষণা আছে—"অমারী—ঘোষনাদ" অর্থাৎ কোন প্রাণীকে মৃত্যু-মুখে পতিত করিও না। জৈনধর্ম্মের এই মাত্র সার নীতি যথা—

"ত্যজ হিংসাং কুরু দয়াং ভজ ধর্ম্মং সনাতনম্ ।
স্বদেহেনাপি সত্ত্বানাং বিধেহ্যুপকৃতিং তথা ॥
তদ্বৈরিণাপি নির্বৈরং কুর্য্যাঃ স্বস্য হিতায় চ ॥
উবাচ চ জিনো দেবো কল্পবৃক্ষপরিগ্রহঃ ।
দয়া প্রধানো ধর্ম্মস্তু জ্ঞায়তেতৎ সদাত্মনে ॥

[শত্রুঞ্জয় মাহাত্ম্যম্]

যে সকল নীতি উক্ত হইল তাহা সাধারণ ধর্ম্ম অর্থাৎ সকল ধর্ম্মের সারভাগ, সুতরাং ইহা যে কেবল জৈনদিগের ধর্ম্ম তাহা কি প্রকারে বলা যাইতে পারে, তাহাতেই উদয়নাচার্য্য কহেন—

"যত্ত্বসাধারণো মুখ মণ্ডলী করণাদিঃ কেশোলুঞ্চনাদির্নাসৌ সর্ব্বৈরনুষ্ঠীয়তে।" "অর্থাৎ মুখবন্ধন, পিচ্ছিকা গ্রহণ, কেশোলুঞ্চন প্রভৃতি কয়েকটী জৈনদিগের অসাধারণ ধর্ম্ম ; তাহা অন্য কোন জাতির নাই।

অমর সিংহ এবং হেমচন্দ্র দুইজন প্রসিদ্ধ সংস্কৃত কোষকার জৈন ধর্ম্মাবলম্বী। অমর সিংহ বিক্রমাদিত্যের সভাসদ্ সুতরাং তিনি খৃষ্টীয় ৫০০ পঞ্চশত শতাব্দীর ব্যক্তি। বুদ্ধ গয়ার প্রসিদ্ধ জৈনমন্দির অমর সিংহ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। হেমচন্দ্র শ্বেতাম্বর জৈন। তিনি জৈন গ্রন্থের মতানুসারে মহাবীরের নির্ব্বাণের ১৬৬৯ বৎসর পরে বর্ত্তমান ছিলেন।

মহাবীরের পরে সুধর্ম্ম, যতীশ্বর, বজ্র সেন, চন্দ্র, মনাতুঙ্গ, জয়দেব, শ্রীনন্দ, বিজয় সমুদ্র প্রভৃতি স্থবিরাবলী জৈনধর্ম্মের উন্নতির চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহাদিগের নানা মতভেদ উপস্থিত হওয়াতে অভীষ্ট সিদ্ধ হয় নাই। মহামহোপাধ্যায় উদয়নাচার্য্য ও কুমারিল ভট্ট প্রবল তর্ক-তরঙ্গে জৈনদিগকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। সেই অবধিই জৈনধর্ম্ম হীনপ্রভাবিশিষ্ট হইয়াছে। জৈনদিগের আবু, গির্ণার, শত্রুঞ্জয় এবং পার্শ্বনাথ পর্ব্বত প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। এই সকল তীর্থের সংস্কৃত ও মাগধী ভাষার গ্রন্থে মাহাত্ম্য বর্ণন আছে, তাহা যতিগণ সাদরে পাঠ করিয়া থাকেন। ইহার মধ্যে শত্রুঞ্জয় মাহাত্ম্য প্রসিদ্ধ। এই গ্রন্থে জৈনাচার্য্য ধনেশ্বর সূরি সুরাষ্ট্র দেশের শত্রুঞ্জয় নামক গিরির স্তোত্র মাহাত্ম্য বর্ণনা এবং সিদ্ধ পুরুষদিগের চরিত্র বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা চতুর্দ্দশ সর্গে বিভক্ত। এই গ্রন্থ সুরাষ্ট্রাধিপতি শিলাদিত্যের আগ্রহে ধনেশ্বর সূরি ৪৭৭ শকে প্রস্তুত করেন। তিনি বলভীরাজ শিলাদিত্যের পার্ষদ এবং তাঁহার ধর্ম্মোপদেষ্টা।†

---

†"সপ্ত সপ্ততিসংযানামতিক্রম্য চতুঃ শতীন্ ।
বিক্রমার্কাচ্ছিলাদিত্যো ভবিতা বিষ্ণ বৃদ্ধি কৃৎ ।
"সপ্ত সপ্ত চতুঃ সংখ্যে গতে বৈক্রম বৎসরে ।

জগৎ সেঠের সঙ্গে জৈনধর্ম্মাবলম্বী ওসয়ালগণ বঙ্গদেশে আগমন করেন। এক্ষণে সুবিখ্যাত সেঠ-বংশধরেরা জৈন ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদিগের ওসয়ালগণের সহিত আহার ব্যবহার করিতে আপত্তি নাই। কলিকাতা ও মুরশিদাবাদ ওসয়ালদিগের বাণিজ্য ব্যবসায়ের আকর স্থান। তাঁহারা বঙ্গদেশে কতিপয় জৈনমন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন, ইহার মধ্যে রায় লছমীপৎ সিংহ বাহাদুরের মন্দির বহুব্যয়ে নির্ম্মিত। এই সকল মন্দিরে ভোজক ব্রাহ্মণগণ পূজারিরূপে নিযুক্ত আছে।

শ্রীরামদাস সেন

"শ্রীশত্রুঞ্জয় মাহাত্ম্যং বক্তি ভক্তি প্রণোদিতঃ
বলাভ্যাঃ শ্রীসুরাষ্ট্রেশ শিলাদিত্যস্ত চাগ্রহাৎ।"
ইতি শত্রুঞ্জয় মাহাত্ম্যং।

‡ সরে—শতে। অমরধার শব্দঃ।

ত্রয়শ্চত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ

দরবারে

বৃহৎ তাম্বুর মধ্যে, বার দিয়া বাঙ্গালার শেষ রাজা বসিয়াছেন—শেষ রাজা, কেন না, মীরকাসেমের পরে যাঁহারা বাঙ্গালার নবাব নাম ধারণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা কেহ রাজত্ব করেন নাই।

বার দিয়া, মুক্তাপ্রধান রজত কাঞ্চন শোভিত উচ্চাসনে, নবাব কাসেম আলি খাঁ, মুক্তাহীরকমণ্ডিত হইয়া, শিরোদেশে উষ্ণীষোপরে উজ্জ্বলতম সূর্য্যপ্রভ হীরকখণ্ডরঞ্জিত করিয়া, দরবারে বসিয়াছেন। পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া, ভৃত্যবর্গ, যুক্তহস্তে দণ্ডায়মান—অমাত্যবর্গ অনুমতি পাইয়া জানুর দ্বারা ভূমি স্পর্শ করিয়া, নীরবে বসিয়া আছেন। নবাব জিজ্ঞাসা করিলেন, "বন্দীগণ উপস্থিত?"

মহম্মদ ইরফান বলিলেন, "সকলেই উপস্থিত।" নবাব, প্রথমে লরেন্স ফষ্টরকে, আনিতে বলিলেন।

লরেন্স ফষ্টর আনীত হইয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। নবাব জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?"

লরেন্স ফষ্টর বুঝিয়াছিলেন যে, এবার নিস্তার নাই। এতকালের পর ভাবিলেন, "এতকাল ইংরেজ নামে কালি দিয়াছি—এক্ষণে ইংরেজের মত মরিব।" ফষ্টর বলিলেন, "আমার নাম লরেন্স ফষ্টর।"

নবাব। তুমি কোন্ জাতি?

ফষ্টর। ইংরেজ।

ন। ইংরেজ আমার শত্রু—তুমি শত্রু হইয়া আমার শিবিরে কেন আসিয়াছিলে?

ফ। আসিয়াছিলাম, সে জন্য আপনার যাহা অভিরুচি হয়, করুন্—আমি আপনার হাতে পড়িয়াছি। কেন আসিয়াছিলাম, তাহা জিজ্ঞাসার প্রয়োজন নাই—জিজ্ঞাসা করিলেও কোন উত্তর পাইবেন না।

নবাব ক্রুদ্ধ না হইয়া হাসিলেন, বলিলেন, "জানিলাম তুমি ভয়শূন্য। সত্য কথা বলিতে পারিবে ?"

ফ। ইংরেজ কখন মিথ্যা কথা বলে না।

ন। বটে ? তবে দেখা যাউক। কে বলিয়াছিল যে, চন্দ্রশেখর উপস্থিত আছেন ? থাকেন, তবে তাঁহাকে আন।

মহম্মদ ইরফান চন্দ্রশেখরকে আনিলেন। নবাব চন্দ্রশেখরকে দেখাইয়া কহিলেন, "ইহাকে চেন ?"

ফ। নাম শুনিয়াছি—চিনি না।

ন। ভাল। বাঁদী কুল্‌সম কোথায় ?

কুল্‌সমও আসিল। নবাব ফষ্টরকে বলিলেন, "এই বাঁদীকে চেন ?"

ফ। চিনি।

ন। কে এ ?

ফ। আপনার দাসী।

ন। মহম্মদ তকিকে আন।

তখন মহম্মদ ইরফান তকি খাঁকে বদ্ধাবস্থায় আনীত করিলেন।

তকি খাঁ, এতদিন ইতস্ততঃ করিতেছিলেন, কোন্ পক্ষে যাই। এইজন্য শত্রুপক্ষে আজিও মিলিতে পারেন নাই। কিন্তু তাঁহাকে অবিশ্বাসী জানিয়া নবাবের সেনাপতিগণ চক্ষে চক্ষে রাখিয়াছিলেন। আলি-হিব্রাহিম খাঁ অনায়াসে তাঁহাকে বাঁধিয়া আনিয়াছিলেন।

নবাব তকি খাঁর প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া বলিলেন, "কুল্‌সম! বল, তুমি মুঙ্গের হইতে কি প্রকারে কলিকাতায় গিয়াছিলে ?"

কুল্‌সম, আনুপূর্ব্বিক সকল বলিল। দলনী বেগমের বৃত্তান্ত সকল বলিল। বলিয়া যোড়হস্তে, সজলনয়নে, উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল—"জাঁহাপনা! আমি এই আম-দরবারে, এই পাপিষ্ঠ, স্ত্রীঘাতক মহম্মদ তকির নামে নালিশ করিতেছি, গ্রহণ করুন্! সে আমার প্রভুপত্নীর নামে মিথ্যা অপবাদ দিয়া, আমার প্রভুকে মিথ্যা প্রবঞ্চনা করিয়া, সংসারের স্ত্রীরত্নসার দলনী বেগমকে পিপীলিকাবৎ অকাতরে হত্যা করিয়াছে—জাঁহাপনা! পিপীলিকাবৎ এই নরাধমকে অকাতরে হত্যা করুন্।"

মহম্মদ তকি, রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "মিথ্যা কথা—তোমার সাক্ষী কে ?"

কুল্‌সম বিস্ফারিত লোচনে, গর্জ্জন করিয়া বলিতে লাগিল—"আমার সাক্ষী! উপরে চাহিয়া দেখ—আমার সাক্ষী জগদীশ্বর ; আপনার বুকের উপর

হাত দে—আমার সাক্ষী তুই! যদি আর কাহারও কথায় প্রয়োজন থাকে, এই ফিরিঙ্গীকে জিজ্ঞাসা কর!”

ন। কেমন, ফিরিঙ্গী, এই বাঁদী যাহা যাহা বলিতেছে, তাহা কি সত্য? তুমিও ত আমিয়টের সঙ্গে ছিলে—ইংরেজ সত্য ভিন্ন বলে না।

ফষ্টর যাহা জানিত, স্বরূপ বলিল। তাহাতে সকলেই বুঝিল, দলনী অনিন্দনীয়া। তকি অধোবদন হইয়া রহিল।

তখন, চন্দ্রশেখর কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া বলিলেন, “ধর্ম্মাবতার! যদি এই ফিরিঙ্গী সত্যবাদী হয়, তবে উহাকে আর দুই একটা কথা প্রশ্ন করুন্।”

নবাব বুঝিলেন,—বলিলেন, “তুমিই প্রশ্ন কর—দ্বিভাষীতে বুঝাইয়া দিবে।”

চন্দ্রশেখর জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি বলিয়াছ চন্দ্রশেখরের নাম শুনিয়াছ—আমি সেই চন্দ্রশেখর। তুমি তাহার—”

চন্দ্রশেখরের কথা সমাপ্ত হইতে না হইতে ফষ্টর বলিল,—“আপনি কষ্ট পাইবেন না। আমি স্বাধীন—মরণ ভয় করি না। এখানে কোন প্রশ্নের উত্তর দেওয়া না দেওয়া আমার ইচ্ছা। আমি আপনার কোন প্রশ্নের উত্তর দিব না।”

চন্দ্রশেখরের মুখ ম্লান হইল। নবাব অনুমতি করিলেন, “তবে শৈবলিনীকে আন।”

শৈবলিনী আনীতা হইল। ফষ্টর প্রথমে শৈবলিনীকে চিনিতে পারিল না—শৈবলিনী, রুগ্না, শীর্ণা, মলিনা,—জীর্ণ সঙ্কীর্ণ বাসপরিহিতা—অরঞ্জিতকুন্তলা—ধূলি ধূসরা। গায়ে খড়ি—মাথায় ধূলি,—চুল আলুথালু—মুখে পাগলের হাসি—চক্ষে পাগলের জিজ্ঞাসাব্যঞ্জক দৃষ্টি। ফষ্টর শিহরিল।

নবাব জিজ্ঞাসা করিলেন, “ইহাকে চেন?”

ফ। চিনি।

ন। এ কে?

ফ। শৈবলিনী, চন্দ্রশেখরের পত্নী।

ন। তুমি চিনিলে কি প্রকারে?

ফ। আপনার অভিপ্রায়ে যে দণ্ড থাকে—অনুমতি করুন্। আমি উত্তর দিব না।

ন। আমার অভিপ্রায়, কুক্কুর দংশনে তোমার মৃত্যু হইবে।

ফষ্টরের মুখ বিশুষ্ক হইল—হস্ত পদ কাঁপিতে লাগিল। কিছুক্ষণে, ধৈর্য্য প্রাপ্ত হইল,—বলিল,

“আমার মৃত্যুই যদি আপনার অভিপ্রেত হয়—অন্য প্রকার মৃত্যু আজ্ঞা করুন্।”

ন। না। এ দেশে একটি প্রাচীন দণ্ডের কিম্বদন্তী আছে। অপরাধীকে কটি পর্য্যন্ত মৃত্তিকামধ্যে প্রোথিত করে—তাহার পরে তাহাকে দংশনার্থ শিক্ষিত কুক্কুর নিযুক্ত করে। কুক্কুরে দংশন করিলে, ক্ষত মুখে লবণ বৃষ্টি করে। কুক্কুরেরা মাংসভোজনে পরিতৃপ্ত হইলে চলিয়া যায়, অর্দ্ধ ভক্ষিত অপরাধী অর্দ্ধ মৃত হইয়া প্রোথিত থাকে—কুক্কুরদিগের ক্ষুধা হইলে তাহারা আবার আসিয়া অবশিষ্ট মাংস খায়। তোমার ও তকি খাঁর প্রতি সেই মৃত্যুর বিধান করিলাম।

বন্ধনযুক্ত তকি খাঁ আর্ত্তপশুর ন্যায় বিকট চীৎকার করিয়া উঠিল। ফষ্টর জানু পাতিয়া, ভূমে বসিয়া, যুক্তকরে, ঊর্দ্ধনয়নে ডাকিতে লাগিল—"O Father! That art in Heaven! Take pity on a poor erring soul! Thy will be done!" মনে মনে বলিতে লাগিল, "আমি কখন তোমাকে ডাকি নাই, কখন তোমাকে ভাবি নাই—চিরকাল পাপই করিয়াছি! তুমি যে আছ তাহা কখন মনে পড়ে নাই। কিন্তু আজি আমি নিঃসহায় বলিয়া, তোমাকে ডাকিতেছি— হে নিরুপায়ের উপায়—অগতির গতি! আমায় রক্ষা কর!"

কেহ বিস্মিত হইও না। যে ঈশ্বরকে না মানে, সেও বিপদে পড়িলে তাঁহাকে ডাকে—ভক্তিভাবে ডাকে। ফষ্টরও ডাকিল।

নয়ন বিনত করিতে ফষ্টরের দৃষ্টি তাম্বুর বাহিরে পড়িল। সহসা দেখিল, এক জটাজূটধারী, রক্তবস্ত্রপরিহিত, শ্বেতশ্মশ্রুবিভূষিত, বিভূতিরঞ্জিত পুরুষ, দাঁড়াইয়া তাহার প্রতি দৃষ্টি করিতেছে। ফষ্টর সেই চক্ষু প্রতি স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল—ক্রমে তাহার চিত্ত সেই দৃষ্টির বশীভূত হইল। ক্রমে চক্ষু বিনত করিল—যেন দারুণ নিদ্রায় তাহার শরীর অবশ হইয়া আসিতে লাগিল। বোধ হইতে লাগিল যেন সেই জটাজূটধারী পুরুষের ওষ্ঠাধর বিচলিত হইতেছে—যেন তিনি কি বলিতেছেন। ক্রমে সজলজলদগম্ভীর কণ্ঠধ্বনি যেন তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল। ফষ্টর শুনিল যেন কেহ বলিতেছে "আমি তোকে কুক্কুরের দণ্ড হইতে উদ্ধার করিব। আমার কথার উত্তর দে। তুই কি শৈবলিনীর জার?"

ফষ্টর একবার সেই ধূলিধূষরিতা উন্মাদিনীর প্রতি দৃষ্টি করিল—বলিল—"না।"

সকলেই শুনিল, "না। আমি শৈবলিনীর জার নহি।"

সেই বজ্রগম্ভীর শব্দে পুনর্ব্বার প্রশ্ন হইল। নবাব প্রশ্ন করিলেন, কি কে করিল ফষ্টর তাহা বুঝিতে পারিল না—কেবল শুনিল যে বজ্রগম্ভীরস্বরে প্রশ্ন হইল যে "তবে শৈবলিনী তোমার নৌকায় ছিল কেন?"

ফষ্টর উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল, "আমি শৈবলিনীর রূপে মুগ্ধ হইয়া, তাহাকে গৃহ হইতে হরণ করিয়াছিলাম। আমার নৌকায় রাখিয়াছিলাম। মনে করিয়াছিলাম যে সে আমার প্রতি আসক্ত। কিন্তু দেখিলাম যে তাহা নহে, সে

আমার শত্রু। নৌকায় প্রথম সাক্ষাতেই সে ছুরিকা নির্গত করিয়া আমাকে বলিল, 'তুমি যদি আমার কামরায় আসিবে তবে এই ছুরিতে দুজনেই মরিব। আমি তোমার মাতৃতুল্য।' আমি তাহার নিকট যাইতে পারি নাই। কখন তাহাকে স্পর্শ করি নাই।" সকলে এ কথা শুনিল।

পুনরপি বজ্রগম্ভীর শব্দে প্রশ্ন হইল, "এই শৈবলিনীকে তুমি কি প্রকারে ম্লেচ্ছের অন্ন খাওয়াইলে?"

ফষ্টর কুণ্ঠিত হইয়া বলিল "একদিনও আমার অন্ন বা আমার স্পৃষ্ট অন্ন সে খায় নাই। সে নিজে রাঁধিত।"

প্রশ্ন। কি রাঁধিত?

ফষ্টর। কেবল চাউল—অন্নের সঙ্গে দুগ্ধ ভিন্ন আর কিছু খাইত না।

প্রশ্ন। জল?

ফ। গঙ্গা হইতে আপনি তুলিত।

চন্দ্রশেখর, ফষ্টরের সকল অপরাধ ভুলিয়া গিয়া, ফষ্টরকে আলিঙ্গন দিতে চাহিলেন, এমত সময়ে সহসা—শব্দ হইল, "ধুরুম্ ধুরুম্ ধুম্ বুম্!"

নবাব বলিলেন, "ও কি ও?" ইরফান্ কাতরস্বরে বলিল, "আর কি? ইংরেজের কামান। তাহারা শিবির আক্রমণ করিয়াছে।"

সহসা তাম্বু হইতে লোক ঠেলিয়া বাহির হইতে লাগিল। "দুড়ুম্ দুড়ুম্ বুম্" আবার কামান গর্জ্জিতে লাগিল। আবার! শত শত কামান একত্রে শব্দ করিতে লাগিল—ভীম নাদ লক্ষে লক্ষে নিকটে আসিতে লাগিল—রণবাদ্য বাজিল—চারিদিক্ হইতে তুমুল কোলাহল উত্থিত হইল। অশ্বের পদাঘাত, অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা—সৈনিকের জয়ধ্বনি, সমুদ্রতরঙ্গবৎ গর্জ্জিয়া উঠিল; ধূমরাশিতে গগন প্রচ্ছন্ন হইল—দিগন্ত ব্যাপ্ত হইল। সুষুপ্তিকালে যেন জলোচ্ছ্বাসে উছলিয়া, ক্ষুব্ধ সাগর আসিয়া বেড়িল।

সহসা নবাবের অমাত্যবর্গ, এবং ভৃত্যগণ, ঠেলাঠেলি করিয়া তাম্বুর বাহিরে গেল—কেহ সমরাভিমুখে—কেহ পলায়নে। কুল্সম, চন্দ্রশেখর, শৈবলিনী, ও ফষ্টর ইহারাও বাহির হইল। তাম্বু মধ্যে একা নবাব ও বন্দী তকি বসিয়া রহিলেন।

সেই সময়ে কামানের গোলা আসিয়া তাম্বুর মধ্যে পড়িতে লাগিল। নবাব সেই সময়ে স্বীয় কটিবন্ধ হইতে অসি নিষ্কোষিত করিয়া, তকির বক্ষে স্বহস্তে বিদ্ধ করিলেন। তকি মরিল। নবাব তাম্বুর বাহিরে গেলেন।

চতুশ্চত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ

যুদ্ধ-ক্ষেত্রে

শৈবলিনীকে লইয়া বাহিরে আসিয়া চন্দ্রশেখর দেখিলেন, রমানন্দ স্বামী দাঁড়াইয়া আছেন! স্বামী বলিলেন, "চন্দ্রশেখর! কি শুনিলে?"

চন্দ্রশেখর রোদন করিতে লাগিলেন, বলিলেন, "গুরুদেব। যাহা শুনিলাম তাহা এ জন্মে কখন শুনিব, এমন ভরসা করি নাই। কিন্তু এক্ষণে, শৈবলিনীর প্রাণরক্ষা করি কি প্রকারে? চারিদিকে গোলাবৃষ্টি হইতেছে। চারিদিক্ ধূমে অন্ধকার—কোথায় যাইব? আপনিই বা কেন এখানে আসিলেন?"

রমানন্দস্বামী বলিলেন, "চিন্তা নাই,—দেখিতেছ না, কোন্ দিগে যবন সেনাগণ পলায়ন করিতেছে? যেখানে যুদ্ধারম্ভেই পলায়ন, সেখানে আর রণজয়ের সম্ভাবনা কি? এই ইংরেজ জাতি অতিশয় ভাগ্যবান্—বলবান্—এবং কৌশলময় দেখিতেছি—বোধ হয়, ইহারা একদিন সমস্ত ভারতবর্ষ অধিকৃত করিবে। চল, আমরা পলায়নপরায়ণ যবনদিগের পশ্চাদ্বর্ত্তী হই।"

তিনজনে পলায়নোন্মুখ যবন সেনার পশ্চাদ্গামী হইলেন। অকস্মাৎ দেখিলেন, সম্মুখে একদল সুসজ্জিত অস্ত্রধারী হিন্দুসেনা—রণমত্ত হইয়া দর্পিতপদে ইংরেজরণে সম্মুখীন হইতে যাইতেছে। মধ্যে, তাহাদিগের নায়ক, অশ্বারোহণে। সকলেই দেখিয়া চিনিলেন যে প্রতাপ।

চন্দ্রশেখর বলিলেন, "ওকিও প্রতাপ! এ দুর্জ্জয় রণে তুমি কেন? ফের।"

"আমি আপনাদিগের সন্ধানেই আসিতেছিলাম। চলুন, নির্ব্বিঘ্নস্থানে আপনাদিগকে রাখিয়া আসি।"

এই বলিয়া প্রতাপ, তিনজনকে নিজ ক্ষুদ্র সেনাদলের মধ্যস্থানে স্থাপিত করিয়া ফিরিয়া চলিলেন। তিনি যবনশিবিরের নির্গমন পথসকল সবিশেষ অবগত ছিলেন। অবিলম্বে তাঁহাদিগকে, সমরক্ষেত্র হইতে দূরে লইয়া গেলেন। গমনকালে চন্দ্রশেখরের নিকট, দরবারে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা সবিস্তারে শুনিলেন। শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এক্ষণে শৈবলিনী সম্বন্ধে আপনি কি ব্যবস্থা করিবেন?"

চন্দ্রশেখর বাষ্পগদগদ কণ্ঠে বলিলেন, "এক্ষণে জানিলাম যে ইনি নিষ্পাপ। যদি লোকরঞ্জনার্থ কোন প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, তবে তাহা করিব। করিয়া, ইহাকে গৃহে লইব। কিন্তু সুখ আর আমার কপালে হইবে না।"

প্র। কেন, স্বামীর ঔষধে কোন ফল দর্শে নাই?

চ। এ পর্য্যন্ত নহে।

প্রতাপ বিমর্ষ হইলেন। তাঁহারও চক্ষে জল আসিল। শৈবলিনী অবগুণ্ঠন মধ্য হইতে তাহা দেখিতেছিল—শৈবলিনী একটু সরিয়া গিয়া, হস্তেঙ্গিতের দ্বারা প্রতাপকে ডাকিল—প্রতাপ অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া, তাঁহার নিকটে গেলেন। শৈবলিনী অন্যের অশ্রাব্য স্বরে প্রতাপকে বলিল, "আমার একটা কথা কাণে কাণে শুনিবে—আমি দূষণীয় কিছুই বলিব না।"

প্রতাপ বিস্মিত হইলেন,—বলিলেন "তোমার বাতুলতা কি কৃত্রিম ?"

শৈ। এক্ষণে বটে। আজি প্রাতে শয্যা হইতে উঠিয়া অবধি সকল কথা বুঝিতে পারিতেছি। আমি কি সত্য সত্যই পাগল হইয়াছিলাম ?

প্রতাপের মুখ প্রফুল্ল হইল। শৈবলিনী, তাঁহার মনের কথা বুঝিতে পারিয়া ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "চুপ! এক্ষণে কিছু বলিও না। আমি নিজেই সকল বলিব —কিন্তু তোমার অনুমতি সাপেক্ষ।"

প্র। আমার অনুমতি কেন ?

শৈ। স্বামী যদি আমায় পুনর্ব্বার গ্রহণ করেন—তবে মনের পাপ আবার লুকাইয়া রাখিয়া, তাঁহার প্রণয়ভাগিনী হওয়া উচিত হয় ?

প্র। কি করিতে চাও ?

শৈ। পূর্ব্বকথাসকল তাঁহাকে বলিয়া, ক্ষমা চাহিব।

প্রতাপ চিন্তা করিলেন—বলিলেন, "বলিও। আশীর্ব্বাদ করি, তুমি এবার সুখী হও।" এই বলিয়া প্রতাপ নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন।

শৈ। আমি সুখী হইব না। তুমি থাকিতে আমার সুখ নাই—

প্র। সে কি শৈবলিনী ?

শৈ। যতদিন তুমি এ পৃথিবীতে থাকিবে, আমার সঙ্গে আর সাক্ষাৎ করিও না। স্ত্রীলোকের চিত্ত অতি অসার; কতদিন বশে থাকিবে জানি না। এজন্মে তুমি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও না।

প্রতাপ আর উত্তর করিলেন না। দ্রুতপদে অশ্বারোহণ করিয়া, অশ্বে কষাঘাত পূর্ব্বক সমরক্ষেত্রাভিমুখে ধাবমান হইলেন। তাঁহার সৈন্যগণ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল।

গমনকালে চন্দ্রশেখর ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথা যাও ?"

প্রতাপ বলিলেন, "যুদ্ধে।"

চন্দ্রশেখর ব্যগ্রভাবে, উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, "যাইও না। যাইও না। ইংরেজের যুদ্ধে রক্ষা নাই।"

প্রতাপ বলিলেন, "ফষ্টর এখনও জীবিত আছে। তাহার বধে চলিলাম।"

চন্দ্রশেখর দ্রুতবেগে আসিয়া প্রতাপের অশ্বের বল্গা ধরিলেন। বলিলেন, "ফষ্টরের বধে কাজ কি ভাই? যে দুষ্ট, ভগবান্ তাহার দণ্ডবিধান করিবেন—তুমি আমি কি দণ্ডের কর্ত্তা? যে অধম সেই শত্রুর প্রতিহিংসা করে—যে উত্তম, সে শত্রুকে ক্ষমা করে।"

প্রতাপ বিস্মিত, পুলকিত হইলেন। এরূপ মহতী উক্তি তিনি কখন লোকমুখে শ্রবণ করেন নাই। অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া, চন্দ্রশেখরের পদধূলি গ্রহণ করিলেন। বলিলেন, "আপনিই মনুষ্যমধ্যে ধন্য। আমি ফষ্টরকে কিছু বলিব না।"

এই বলিয়া প্রতাপ পুনরপি অশ্বারোহণ করিয়া, যুদ্ধক্ষেত্রাভিমুখে চলিলেন। চন্দ্রশেখর বলিলেন, "প্রতাপ, তবে আবার যুদ্ধক্ষেত্রে যাও কেন?"

প্রতাপ মুখ ফিরাইয়া অতি কোমল, অতি মধুর হাসি হাসিয়া বলিলেন, "আমার প্রয়োজন আছে।" এই বলিয়া অশ্বে কশাঘাত করিয়া অতি দ্রুতবেগে চলিয়া গেলেন।

সেই হাসি দেখিয়া, রমানন্দস্বামী উদ্বিগ্ন হইলেন। চন্দ্রশেখরকে বলিলেন, "তুমি বধূকে লইয়া গৃহে যাও। আমি গঙ্গাস্নানে যাইব। আজি সাক্ষাৎ না হয় কালি হইবে"

চন্দ্রশেখর বলিলেন, "আমি প্রতাপের জন্য অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইতেছি।" রমানন্দস্বামী বলিলেন, "আমি তাঁহার তত্ত্ব লইয়া যাইতেছি।"

এই বলিয়া রমানন্দস্বামী, চন্দ্রশেখর ও শৈবলিনীকে বিদায় করিয়া দিয়া, যুদ্ধক্ষেত্রাভিমুখে চলিলেন। সেই ধূমময়, আহতের আর্ত্তচীৎকারে ভীষণ, যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্নিবৃষ্টির মধ্যে, প্রতাপকে ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, কোথাও শবের উপর শব, স্তূপাকৃত হইয়াছে—কেহ মৃত, কেহ অর্দ্ধমৃত, কাহারও অঙ্গ ছিন্ন, কাহারও বক্ষ বিদ্ধ, কেহ "জল! জল!" করিয়া, আর্ত্তনাদ করিতেছে—কেহ মাতা ভ্রাতা পিতা বন্ধু প্রভৃতির নাম করিয়া ডাকিতেছে। রমানন্দস্বামী সেই সকল শবের মধ্যে প্রতাপের অনুসন্ধান করিলেন, পাইলেন না। দেখিলেন, কত অশ্বারোহী রুধিরাক্ত কলেবরে, আহত অশ্বের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া, অস্ত্রশস্ত্র ফেলিয়া পলাইতেছে, অশ্বপদে কত হতভাগ্য আহত যোদ্ধৃবর্গ দলিত হইয়া বিনষ্ট হইতেছে, তাহাদিগের মধ্যে প্রতাপের সন্ধান করিলেন, পাইলেন না। দেখিলেন, কত পদাতিক, রিক্তহস্তে, ঊর্দ্ধশ্বাসে, রক্তে প্লাবিত হইয়া পলাইতেছে, তাহাদিগের মধ্যে প্রতাপের অনুসন্ধান করিলেন, পাইলেন না।

শ্রান্ত হইয়া রমানন্দস্বামী এক বৃক্ষমূলে উপবেশন করিলেন। সেইখান দিয়া একজন শিপাহী পলাইতেছিল। রমানন্দস্বামী, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা সকলেই পলাইতেছ—তবে যুদ্ধ করিল কে?"

সিপাহী বলিল, "কেহ নহে। কেবল এক হিন্দু বড় যুদ্ধ করিয়াছে।"

স্বামী জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কোথা?" সিপাহী বলিল, "গড়ের সম্মুখে দেখুন।" এই বলিয়া সিপাহী পলাইল।

রমানন্দস্বামী গড়ের দিগে গেলেন; দেখিলেন, যুদ্ধ নাই। কয়েকজন ইংরেজ ও হিন্দুর মৃতদেহ একত্রে স্তূপাকৃত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। স্বামী, তাহার মধ্যে প্রতাপের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। পতিত হিন্দুদিগের মধ্যে কেহ গভীর কাতরোক্তি করিল। রমানন্দস্বামী তাহাকে টানিয়া বাহির করিলেন। দেখিলেন, সেই প্রতাপ!—আহত মৃতপ্রায়—এখনও জীবিত।

রমানন্দস্বামী জল আনিয়া তাহার মুখে দিলেন। প্রতাপ তাঁহাকে চিনিয়া প্রণামের জন্য, হস্তোত্তোলন করিতে উদ্যোগ করিলেন, কিন্তু পারিলেন না।

স্বামী বলিলেন, "আমি অমনিই আশীর্ব্বাদ করিতেছি, আরোগ্য লাভ কর!"

প্রতাপ কষ্টে বলিলেন, "আরোগ্য! আরোগ্যের—আর বড় বিলম্ব নাই। আপনার পদরেণু আমার মাথায় দিন।

রমানন্দস্বামী জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমরা নিষেধ করিয়াছিলাম—কেন এ দুর্জ্জয় রণে আসিলে? শৈবলিনীর কথায় কি এরূপ করিয়াছ?"

প্রতাপ বলিল, "আপনি কেন এরূপ আজ্ঞা করিতেছেন?"

স্বামী বলিলেন, "যখন তুমি শৈবলিনীর সঙ্গে কথা কহিতেছিলে, তখন তাহার আকারেঙ্গিত দেখিয়া বোধ হইয়াছিল যে, সে আর উন্মাদগ্রস্তা নহে। এবং বোধ হয় তোমাকে একেবারে বিস্মৃত হয় নাই।"

প্রতাপ বলিলেন, "শৈবলিনী বলিয়াছিল, যে এ পৃথিবীতে আমার সঙ্গে আর সাক্ষাৎ না হয়। আমি বুঝিলাম, আমি জীবিত থাকিতে শৈবলিনী বা চন্দ্রশেখরের সুখের সম্ভাবনা নাই। যে আমার পরম প্রীতির পাত্র, যে আমার পরমোপকারী, তাহাদিগের সুখের কণ্টকস্বরূপ এ জীবন আমার রাখা অকর্ত্তব্য বিবেচনা করিলাম। তাই, আপনাদিগের নিষেধ সত্বেও এ সমর-ক্ষেত্রে, প্রাণত্যাগ করিতে আসিয়াছিলাম। আমি থাকিলে, শৈবলিনীর চিত্ত, কখন না কখন বিচলিত হইবার সম্ভাবনা। অতএব আমি চলিলাম।"

রমানন্দস্বামীর চক্ষে জল আসিল; আর কেহ কখন রমানন্দস্বামীর চক্ষে জল দেখে নাই। তিনি বলিলেন, "এ সংসারে তুমিই যথার্থ পরহিতব্রতধারী। আমরা ভণ্ডমাত্র। তুমি পরলোকে অনন্ত অক্ষয় স্বর্গ ভোগ করিবে সন্দেহ নাই।"

ক্ষণেক নীরব থাকিয়া, রমানন্দস্বামী বলিতে লাগিলেন, "শুন বৎস! আমি তোমার অন্তঃকরণ বুঝিয়াছি। ব্রহ্মাণ্ড জয় তোমার এই ইন্দ্রিয় জয়ের তুল্য হইতে পারে না—তুমি শৈবলিনীকে ভালবাসিতে?"

সুপ্ত সিংহ যেন জাগিয়া উঠিল। সেই শবাকার প্রতাপ, বলিষ্ঠ, চঞ্চল, উন্মত্তবৎ হুহুঙ্কার করিয়া উঠিল—বলিল—"কি বুঝিবে, তুমি সন্ন্যাসী! এ জগতে মনুষ্য কে আছে, যে আমার এ ভালবাসা বুঝিবে! কে বুঝিবে, আমি এই ষোড়শ বৎসর, আমি শৈবলিনীকে কত ভালবাসিয়াছি। পাপচিত্তে আমি তাহার প্রতি অনুরক্ত নহি—আমার ভালবাসার নাম জীবন বিসর্জ্জনের আকাঙ্ক্ষা। শিরে শিরে, শোণিতে শোণিতে, অস্থিতে অস্থিতে, আমার এই অনুরাগ অহোরাত্র বিচরণ করিয়াছে। কখন মানুষে তাহা জানিতে পারে নাই—মানুষে তাহা জানিতে পারিত না—এই মৃত্যু কালে আপনি কথা তুলিলেন কেন? এজন্মে এ অনুরাগে মঙ্গল নাই বলিয়া, এ দেহ পরিত্যাগ করিলাম। আমার মন কলুষিত হইয়াছে—কি জানি শৈবলিনীর হৃদয়ে আবার কি হইবে? আমার মৃত্যু ভিন্ন ইহার উপায় নাই—এই জন্য মরিলাম। আপনি এই গুপ্ত তত্ত্ব শুনিলেন—আপনি জ্ঞানী, আপনি শাস্ত্রদর্শী—আপনি বলুন আমার পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত? আমি কি জগদীশ্বরের কাছে দোষী? যদি দোষ হইয়া থাকে, এ প্রায়শ্চিত্তে কি তাহার মোচন হইবে না?"

রমানন্দস্বামী বলিলেন, "তাহা জানি না। মানুষের জ্ঞান এখানে অসমর্থ; শাস্ত্রে এখানে মূক। তুমি যে লোকে যাইতেছ, সেই লোকেশ্বর ভিন্ন এ কথার কেহ উত্তর দিতে পারিবে না। তবে, ইহাই বলিতে পারি, ইন্দ্রিয় জয়ে যদি পুণ্য থাকে, তবে অনন্ত স্বর্গ তোমারই। যদি চিত্তসংযমে পুণ্য থাকে, তবে দেবতারাও তোমার তুল্য পুণ্যবান্ নহেন। যদি পরোপকারে স্বর্গ থাকে, তবে দধীচির অপেক্ষাও তুমি স্বর্গের অধিকারী। প্রার্থনা করি, জন্মান্তরে যেন, তোমার মত ইন্দ্রিয়জয়ী হই।"

রমানন্দস্বামী নীরব হইলেন। ধীরে ধীরে ধীরে, প্রতাপের প্রাণ বিমুক্ত হইল। তৃণশয্যায়, অনিন্দ্যজ্যোতিঃ স্বর্ণতরু পড়িয়া রহিল।

তবে যাও, প্রতাপ! অনন্ত ধামে। যাও, যেখানে ইন্দ্রিয়জয়ে কষ্ট নাই, রূপে মোহ নাই, প্রণয়ে পাপ নাই, সেইখানে যাও! যেখানে, রূপ অনন্ত, প্রণয় অনন্ত, সুখ অনন্ত, সুখে অনন্ত পুণ্য, সেইখানে যাও। যেখানে পরের দুঃখ পরে জানে, পরের ধর্ম্ম পরে রাখে, পরের জয় পরে গায়, পরের জন্য পরকে মরিতে হয় না, সেই মহৈশ্বর্য্যময় লোকে যাও! লক্ষ শৈবলিনী পদপ্রান্তে পাইলেও, ভাল বাসিতে চাহিবে না।

পরিশিষ্ট

লরেন্স ফষ্টর, নবাবের তাম্বুর বাহিরে আসিয়া, কি করিবেন, কোথা যাইবেন, কিছু স্থির করিতে পারিলেন না; যবন এবং ইংরেজ উভয়েই তাঁহার শত্রু।

বিহ্বলের ন্যায় ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কতকগুলি ইংরেজ সেনা একদল যবনকে প্রহার করিয়া তাড়াইতে তাড়াইতে লইয়া যাইতেছিল। ফষ্টর একজন মৃত যবনের বন্দুক কুড়াইয়া লইয়া সেই ইংরেজদিগের সঙ্গে মিশিলেন। কিন্তু পরিচ্ছদে ধরা পড়িলেন। সেই রেজিমেণ্টের পোষাক, তাঁহার পরা ছিল না।

সার্জেণ্ট জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে? পোষাক পর নাই কেন?"

ফষ্টর বলিল, "আমি লরেন্স ফষ্টর। মুসলমানেরা আমাকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিল।"

সার্জেণ্ট বলিল, "দুইজন ইহাকে সেনাপতির নিকট লইয়া যাও। সেনাপতির আজ্ঞা আছে, বন্দী কেহ হস্তগত হইলে তাঁহার নিকটে প্রেরিত হইবে।" যুদ্ধাবসানে লরেন্স ফষ্টর, ইংরেজ সেনাপতির নিকটে আনীত হইলেন। সেনাপতি দেখিয়া শুনিয়া বলিলেন, "জানি। লরেন্স ফষ্টর, পলাতক রাজবিদ্রোহী—যবন সেনা মধ্যে পদ গ্রহণ করিয়াছে, উহাকে ফাঁসি দেওয়া যাইবে।"

বিচারান্তে যুদ্ধের পরে রীতিমত বিচার হইয়া ফষ্টরের ফাঁসি হইল।

চন্দ্রশেখর, শৈবলিনীকে লইয়া গৃহে আসিলেন। সুন্দরী শৈবলিনীর সঙ্গে দুই চারিটা কথা কহিয়াই জানিল যে শৈবলিনী রোগ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছে। আহ্লাদে, সুন্দরী চন্দ্রশেখরকে সবিশেষ কহিল। আহ্লাদে চন্দ্রশেখর শৈবলিনীকে আলিঙ্গন করিতে প্রায় সুন্দরীকে আলিঙ্গন করিয়া ফেলিয়াছিলেন। তিনি সেই দিনই, পুনর্ব্বার সংসার পাতিয়া, শৈবলিনীকে গ্রহণ করিলেন। রমানন্দস্বামী আসিলে একটা লৌকিক প্রায়শ্চিত্ত করিবেন স্থির করিলেন।

রমানন্দস্বামী প্রতাপের মৃত্যুসম্বাদ লইয়া আসিলেন। কেন প্রতাপ মরিয়াছে, তাহা প্রকাশ করিলেন না। চন্দ্রশেখর, অত্যন্ত শোকাকুল হইয়া উদয় নালার মাঠে গিয়া, প্রতাপের দেহ লইয়া যথাবিধি সৎকার করিলেন। কিয়দ্দিবস, প্রতাপের শোকে, এরূপ অধীর হইয়া রহিলেন যে, শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্তের কথা বিস্মৃত হইয়া রহিলেন। রমানন্দস্বামী প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া আশ্রমে যাত্রা করিলেন।

নবাব কাসেম আলি খাঁ উদয় নালা হইতে মুঙ্গেরে পলাইলেন। তথায় জগৎ শেঠদিগকে গঙ্গা জলে নিমগ্ন করিয়া বধ করিলেন। এবং যে সকল ইংরেজ বন্দী ছিল, তাহাদিগকে সমরুর হস্তে বধ করিলেন। এই সকল দুষ্কার্য্য করিয়া, মুঙ্গের ত্যাগ করিয়া সসৈন্যে পাটনা যাত্রা করিলেন।

গুর্‌গণ খাঁ অতি চতুর। তিনি নবাবের আদেশক্রমে উদয় নালা যাইবার জন্য নবাবের পশ্চাৎ যাত্রা করিয়াছিলেন বটে। কিন্তু উদয় নালা পর্য্যন্ত যান

নাই—নবাবের অগ্রেই ফিরিয়াছিলেন। ভাব গতিক বুঝিয়া নবাবের সঙ্গে যাহাতে সাক্ষাৎ না হয়, এইরূপ কৌশল করিতেন। কিন্তু এক্ষণে নবাবের সঙ্গে যাইতে বাধ্য হইলেন। পথিমধ্যে নবাব সৈন্যদিগকে ইঙ্গিত করিলেন, তাহারা বিদ্রোহের ছল করিয়া গুর্‌গণ খাঁকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল।

তাহার পরে নবাবের অদৃষ্টে যাহা যাহা ঘটিল তাহা ইতিহাসে লিখিত আছে। বাঙ্গালার শেষ হিন্দু রাজা, রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া পুরুষোত্তমের যাত্রী হইয়াছিলেন—বাঙ্গালার শেষ যবন রাজা, রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া ফকিরি গ্রহণ করিলেন।

কুল্‌সম, যুদ্ধক্ষেত্রে নবাবের ভৃত্যবর্গের সহিত পলায়ন করিয়াছিল। কাসেম আলি ফকিরি গ্রহণ করিলে, সে মীরজাফেরের অবরোধে নিযুক্ত হইল। দলনীকে কখন ভুলিল না।

সমাপ্ত

আর্য্যজাতির সূক্ষ্ম শিল্প

একদল মনুষ্য বলেন যে, এ সংসারে সুখ নাই, বনে চল, ভোগাভোগ সমাপ্ত করিয়া মুক্তি বা নির্ব্বাণ লাভ কর। আর একদল বলেন, সংসার সুখময়, বঞ্চকের বঞ্চনা অগ্রাহ্য করিয়া, খাও, দাও, ঘুমাও। যাঁহারা, সুখাভিলাষী তাঁহাদিগের মধ্যে নানা মত। কেহ বলেন ধনে সুখ, কেহ বলেন মনে সুখ; কেহ বলেন ধর্ম্মে, কেহ অধর্ম্মে; কাহার সুখ কার্য্যে, কাহারও সুখ জ্ঞানে। কিন্তু প্রায় এমন মনুষ্য দেখা যায় না, যে সৌন্দর্য্যে সুখী নহে। তুমি সুন্দরী স্ত্রীর কামনা কর; সুন্দরী কন্যার মুখ দেখিয়া প্রীত হও; সুন্দর শিশুর প্রতি চাহিয়া বিমুগ্ধ হও, সুন্দরী পুত্রবধূর জন্য দেশ মাথাও কর, সুন্দর ফুলগুলি বাছিয়া শয্যায় রাখ, ঘর্ম্মাক্ত ললাটে যে অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছ, সুন্দর গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া, সুন্দর উপকরণে সাজাইতে, তাহা ব্যয়িত করিয়া ঋণী হও; আপনি সুন্দর সাজিবে বলিয়া সর্ব্বস্ব পণ করিয়া, সুন্দর সজ্জা খুঁজিয়া বেড়াও,—ঘটী বাটী পিতল কাঁশাও যাহাতে সুন্দর হয়, তাহার যত্ন কর। সুন্দর দেখিয়া পাখী পোষ, সুন্দর বৃক্ষে সুন্দর উদ্যান রচনা কর, সুন্দর মুখে সুন্দর হাসি দেখিবার জন্য, সুন্দর কাঞ্চন রত্নে সুন্দরীকে সাজাও। সকলেই অহরহ সৌন্দর্য্য-তৃষায় পীড়িত, কিন্তু কেহ কখন এ কথা মনে করে না বলিয়াই এত বিস্তারে বলিতেছি।

এই সৌন্দর্য্যতৃষা যেরূপ বলবতী, সেইরূপ প্রশংসনীয়া এবং পরিপোষনীয়া। মনুষ্যের যত প্রকার সুখ আছে তন্মধ্যে এই সুখ সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, কেন না, প্রথমতঃ ইহা পবিত্র, নির্ম্মল, পাপ-সংস্পর্শশূন্য; সৌন্দর্য্যের উপভোগ কেবল মানসিক সুখ, ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে ইহার সংস্পর্শ নাই। সত্য বটে, সুন্দর বস্তু, অনেক সময়ে ইন্দ্রিয়তৃপ্তির সহিত সম্বন্ধ বিশিষ্ট; কিন্তু সৌন্দর্য্যজনিত সুখ ইন্দ্রিয়তৃপ্তি হইতে ভিন্ন। রত্নখচিত সুবর্ণ জলপাত্রে জলপানে তোমার যেরূপ তৃষা নিবারণ হইবে, কুগঠন মৃৎপাত্রেও তৃষা নিবারণ সেইরূপ হইবে; স্বর্ণপাত্রে জলপান করায়

সূক্ষ্মশিল্পের উৎপত্তি ও আর্য্যজাতির শিল্পচাতুরি, শ্রীশ্যামাচরণ শ্রীমাণি প্রণীত। কলিকাতা। ১৯৩০।

যেটুকু অতিরিক্ত সুখ, তাহা সৌন্দর্য্যজনিত মানসিক সুখ। আপনার স্বর্ণপাত্রে জল খাইলে অহঙ্কারজনিত সুখ তাহার সঙ্গে মিশে বটে, কিন্তু পরের স্বর্ণপাত্রে জলপান করিয়া তৃষা নিবারণাতিরিক্ত যে সুখ, তাহা সৌন্দর্য্যজনিত মাত্র বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, তীব্রতায় এই সুখ সর্ব্বসুখাপেক্ষা গুরুতর; যাঁহারা নৈসর্গিক শোভাদর্শনপ্রিয়, বা কাব্যামোদী, তাঁহারা ইহার অনেক উদাহরণ মনে করিতে পারিবেন: সৌন্দর্য্যের উপভোগজনিত সুখ, অনেক সময়ে তীব্রতায় অসহ্য হইয়া উঠে। তৃতীয়তঃ, অন্যান্য সুখ পৌণঃপুণ্যে অপ্রীতিকর হইয়া উঠে, সৌন্দর্য্যজনিত সুখ চিরনূতন এবং চিরপ্রীতিকর।

অতএব যাঁহারা মনুষ্যজাতির এই সুখবর্দ্ধন করেন, তাঁহারা মনুষ্যজাতির উপকারকদিগের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ পদ প্রাপ্তির যোগ্য। যে ভিখারী খঞ্জনী বাজাইয়া, নেড়ার গীত গাইয়া মুষ্টিভিক্ষা লইয়া যায়, তাহাকে কেহ মনুষ্যজাতির মহোপকারী বলিয়া স্বীকার করিবে না বটে, কিন্তু যে বাল্মীকি, চিরকালের জন্য কোটি কোটি মনুষ্যের অক্ষয় সুখ এবং চিত্তোৎকর্ষের উপায় বিধান করিয়াছেন, তিনি যশের মন্দিরে নিউটন, হার্বি, ওয়াট্ বা জেনরের অপেক্ষা নিম্ন স্থান পাইবার যোগ্য নহেন। অনেকে লেকি, মেকলে, প্রভৃতি অসারগ্রাহী লেখকদিগের অনুবর্ত্তী হইয়া কবির অপেক্ষা পাদুকাকারকে উপকারী বলিয়া উচ্চাসনে বসান; এই গণ্ডমূর্খ দলের মধ্যে আধুনিক অর্দ্ধশিক্ষিত বাঙ্গালিবাবু অগ্রগণ্য। পক্ষান্তরে ইংলণ্ডের রাজপুরুষ চূড়ামণি গ্লাডষ্টোন্, স্কটলণ্ডজাত মনুষ্যদিগের মধ্যে, হিউম্, আদাম স্মিথ, হণ্টর, কার্লাইল থাকিতে ওয়াল্টর স্কট্‌কে সর্ব্বোপরি স্থান দিয়াছেন।

যেমন মনুষ্যের অন্যান্য অভাব পূরণার্থ এক একটি শিল্প বিদ্যা আছে, সৌন্দর্য্যাকাঙ্ক্ষা পূরণার্থও বিদ্যা আছে। সৌন্দর্য্য সৃজনের বিবিধ উপায় আছে। উপায়ভেদে, সেই বিদ্যা পৃথক্ পৃথক্ রূপ ধারণ করিয়াছে।

আমরা যে সকল সুন্দর বস্তু দেখিয়া থাকি, তন্মধ্যে কতকগুলির কেবল বর্ণ মাত্র আছে—আর কিছু নাই। যথা—ইন্দ্রধনু, আকাশ প্রভৃতি।

আর কতকগুলির বর্ণ ভিন্ন, আকারও আছে, যথা পুষ্প।
কতকগুলির বর্ণ ও আকার ভিন্ন, গতিও আছে, যথা—উরগ।
কতকগুলির বর্ণ, আকার, গতি ভিন্ন, রব আছে; যথা—কোকিল।
মনুষ্যের বর্ণ, আকার, গতি ও রব ব্যতীত অর্থযুক্ত বাক্য আছে।

অতএব সৌন্দর্য্য সৃজনের জন্য, এই কয়টি সামগ্রী, বর্ণ, আকার, গতি, রব ও অর্থযুক্ত বাক্য।

যে সৌন্দর্য্যজননী বিদ্যার বর্ণ মাত্র অবলম্বন, তাহাকে চিত্রবিদ্যা কহে।

যে বিদ্যার অবলম্বন আকার, তাহা দ্বিবিধ। জড়ের আকৃতি সৌন্দর্য্য যে বিদ্যার উদ্দেশ্য, তাহার নাম স্থাপত্য। চেতন বা উদ্ভিদের সৌন্দর্য্য যে বিদ্যার উদ্দেশ্য, তাহার নাম ভাস্কর্য্য।

যে সৌন্দর্য্যজনিকা বিদ্যার সিদ্ধি গতির দ্বারা, তাহার নাম নৃত্য।

রব যাহার অবলম্বন, সে বিদ্যার নাম সঙ্গীত।

বাক্য যাহার অবলম্বন, তাহার নাম কাব্য।

কাব্য, সঙ্গীত, নৃত্য, ভাস্কর্য্য, স্থাপত্য. এবং চিত্র, এই ছয়টি সৌন্দর্য্যজনিকা বিদ্যা। ইউরোপে এই সকল বিদ্যার যে জাতিবাচক নাম প্রচলিত আছে, শ্রীমাণি বাবু তাহার অনুবাদ করিয়া "সূক্ষ্ম শিল্প" নাম দিয়াছেন। নামটি আমাদের প্রীতিকর হয় নাই। যদি কালিদাস প্রেতাবস্থায় শুনিতে পান যে কুমারসম্ভব, শকুন্তলার রচনা, "শিল্প" বিদ্যা মাত্র, তবে তিনি রাগ করিবেন সন্দেহ নাই, এবং যে শিল্প বিদ্যার প্রভাবে ইলোরার প্রকাণ্ড গুহাট্টালিকা খোদিত হইয়াছিল, তাহাকে "সূক্ষ্ম" বলা একটু অসঙ্গত হয়। যাহা হউক, নামে কিছু আসিয়া যায় না।

কাব্যের সঙ্গে, অন্যান্য "সূক্ষ্মশিল্পের" এত প্রকৃতিগত বিভেদ যে, এক্ষণে অনেকেই ইহাকে আর "সূক্ষ্মশিল্প" মধ্যে গণ্য করেন না; নৃত্য গীত, সামাজিক সামগ্রী, একা বিদ্যানের নহে, সুতরাং উহাও একটু তফাৎ হইয়া পড়িয়াছে; এবং "সূক্ষ্মশিল্প" নাম করিলে, আপাততঃ চিত্র, ভাস্কর্য্য, এবং স্থাপত্যই মনে পড়ে। বাবু শ্যামাচরণ শ্রীমাণির গ্রন্থের বিষয়, কেবল এই তিন বিদ্যা।

প্রাচীন ভারতবর্ষে, এই তিন বিদ্যার কিরূপ প্রচার এবং উন্নতি ছিল, তাহার পরিচয় দেওয়াই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। কিন্তু গ্রন্থারম্ভে, সাধারণতঃ সূক্ষ্মশিল্পের উৎপত্তি বিষয়ক একটি প্রবন্ধ আছে। প্রবন্ধটি পাঠযোগ্য।

তৎপরে গ্রন্থকার, অস্মদ্দেশীয় শিল্পকার্য্যের প্রাচীনত্ব সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। এদেশের শিল্পকার্য্য যে প্রাচীন, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই, কিন্তু শ্রীমাণি বাবু ইহার যেরূপ প্রাচীনতা প্রতিজ্ঞাত করিয়াছেন, সেরূপ প্রাচীনতা প্রমাণিত করিতে পারেন নাই। অশোকের পূর্ব্বকালিক স্থাপত্য বিদ্যার কোন চিহ্ন এ দেশে যে বর্ত্তমান নাই, তাহা আপাততঃ স্বীকার করিতে হইবে।

এই গ্রন্থে প্রাচীন আর্য্যগণের স্থাপত্য বিষয়ে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহাই ইহার উৎকৃষ্টাংশ; তাহা পাঠ করিয়া ভারতবর্ষীয় মাত্রেই প্রীতিলাভ করিবেন। প্রাচীন ভারতবর্ষীয়েরা পৃথিবীর কোন জাতির অপেক্ষায় স্থাপত্য দক্ষতায় ন্যূন ছিলেন না। ভারতবর্ষীয়েরা, কাব্য, দর্শন, গণিত প্রভৃতি নানা বিদ্যায় প্রাধান্যলাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু স্থাপত্যে যেরূপ তাঁহাদিগের প্রাধান্য প্রতিবাদের অতীত, বোধ হয়, সেরূপ আর কোন বিদ্যায় নহে। ফর্গুসন সাহেবের যে কয়টি

কথা শ্রীমাণি বাবু উক্ত করিয়াছেন, আমরাও তাহা পুনরুক্ত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। তিনি বলেন যে :—

“ইহা সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন ও ভূমণ্ডলস্থ অন্যান্য জাতীয় স্থাপত্য হইতে এত পৃথক্ যে, মিথ্যা ও ভ্রমাত্মক সংস্কারোৎপত্তির আশঙ্কা না করিয়া ইহার সহিত কোন জাতীয় স্থাপত্যের তুলনা করা যাইতে পারে না। * * * ইহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির বহ্বায়াস-সাধ্য-গঠন-নৈপুণ্য ভূমণ্ডলে অদ্বিতীয়। ইহার অলঙ্কার প্রাচুর্য্যই আশ্চর্য্য ভাব উদ্দীপক এবং ইহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গঠনগুলির ভিন্ন ভিন্ন অংশসকলের সৌন্দর্য্য ও মাধুরী এবং প্রধান গঠনটীর সহিত সে সকলের উপযোগিতা, সর্ব্বস্থলেই দর্শকের চিত্তবিনোদন করে।

“ভারতবর্ষীয়েরা স্তম্ভের বিশেষ বিশেষ অংশ ও ভূষণের দীর্ঘতা, হ্রস্বতা, স্থূলতা ও সূক্ষ্মতা বিষয়ে ইজিপ্ত এবং গ্রীশীয়দিগের পশ্চাদ্বর্ত্তী বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের পিলার ভূষণ এবং যে সকল মনুষ্য-মূর্ত্তি ইমারত বহন করে (Caryatides) তৎসম্বন্ধে তাঁহারা উক্ত উভয় জাতিকে পরাজয় করিয়াছেন।”

শ্রীমাণি বাবু ভারতবর্ষীয় স্থাপত্য তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রথম যে সকল ভূগর্ভ এবং পর্ব্বতাভ্যন্তরে খোদিত হইয়া প্রস্তুত; দ্বিতীয়, যে সকল পর্ব্বতের বাহ্যাভ্যন্তরে উভয়েই খোদিত, এবং তৃতীয়, যে সকল প্রস্তর ও ইষ্টকাদি উপকরণে গঠিত।

প্রথম শ্রেণীর স্থাপত্যের উদাহরণ স্বরূপ ইলোরার গুহার বর্ণনা উদ্ধৃত করিলাম।

“একটি অর্দ্ধচন্দ্রাকার লোহিত গ্রাণিট পর্ব্বতাভ্যন্তর অর্দ্ধক্রোশ ব্যাপিয়া খোদিত হইয়া এই বিখ্যাত গুহাসকল প্রস্তুত হইয়াছে। ঐ অর্দ্ধচন্দ্রাকার স্থানের ব্যাস প্রায় ২।।০ ক্রোশ হইবে। স্থপতি কার্য্যে যত প্রকার গঠন ও অলঙ্কার পারিপাট্য থাকিতে পারে, সে সকলই এই গুহাসকল মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। যথা;—বহু ভূষণে বিভূষিত স্তম্ভ, অলিন্দ, চাঁদনী, সোপানশ্রেণী, সেতু, শিখর, গুম্বজাকার ছাদ, বৃহদাকার প্রতিমূর্ত্তি এবং ভিত্তি সংলগ্ন বহুবিধ খোদিত কারুকার্য্য —ইহার কিছুরই অভাব নাই।”

“অত্রত্য গৃহসকল প্রায় দ্বিতল। কোন কোনটী তিনতলও আছে। কিন্তু প্রথম তল মৃত্তিকাদিতে প্রায় পরিপূর্ণ হওয়ায় তৎপ্রবেশ দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। এতদ্গুহাস্থ ইন্দ্রসভা অতীব বিস্তৃতা ও মনোহারিণী; ইহার অভ্যন্তরস্থ স্তম্ভ সকল ইদানীন্তন কালের ন্যায় নহে—একটী হাঁড়ী বিপরীত ভাবে স্থাপিত করিয়া তাহাকে পদ্ম পাপড়ী দ্বারা বেষ্টন করিলে অত্রস্থ স্তম্ভ বোধিকার গঠন-প্রণালী কথঞ্চিত বোধগম্য হইতে পারে, কিন্তু উল্‌টা হাঁড়ী বলিয়া আমাদিগের অনাদর করা উচিত

নহে। কারণ, হাঁড়ীর গঠন কিছু বিশ্রী নহে, প্রত্যুত: শ্রীসম্পন্ন, তাহাতে ইহার মনোহর ভাস্কর্য্য, এবং সমুদয় স্তম্ভের বিভূষণ-সংযুক্ত-গঠন দেখিলে হৃদয় যে অপূর্ব্ব ভাবে উচ্ছ্বসিত হইবে তাহা বিচিত্র নহে। অপরন্তু, এই বোধিকা সকল উৎকল দেশীয় বিমান সকলের চূড়ার নিম্নে আম্লাশিলার (আমলকী ফলের ন্যায় বর্ত্তুলাকার ও দলবিশিষ্ট বলিয়া আম্লাশিলা নামে খ্যাত) আকারে খোদিত। এই গুহার প্রশস্ত গৃহ সকলের বহিঃপ্রকোষ্ঠে শোভনীয় কীলকশ্রেণী দ্বারা গরাদিয়া সকল কর্ত্তিত হইয়াছে। অপর, ইহার প্রবেশদ্বার অতীব মনোহর গঠনে গঠিত—দ্বাদশটী সূক্ষ্ম স্তম্ভোপরি অপূর্ব্ব কারু-কার্য্য খচিত ইহার দিব্য গুম্বজ অদ্যাপিও সুশোভিত হইয়া রহিয়াছে। তৃতীয় চিত্রপটে ইন্দ্রসভার যে চিত্র প্রদত্ত হইল তদ্দ্বারা পাঠক ইহার সুচারু রচনাচাতুর্য্য কিয়ৎপরিমাণে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।"

"ইন্দ্রসভার অন্তঃপাতী তিনটী গুহা আছে। একটি ৬০ পাদ দীর্ঘ এবং ৪৮ পাদ প্রস্থ; ইহার ভিত্তিতে অনেক বুদ্ধমূর্ত্তি সকল খোদিত আছে; ইহার গর্ভস্থানে ব্যাঘ্রেশ্বরী ভবানী ও বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি বিরাজমান। দ্বিতীয় গুহা-গর্ভের বাম ও দক্ষিণ পার্শ্বের ব্যাঘ্রেশ্বরী ভবানীর মূর্ত্তিদ্বয়ের মধ্যে পরশুরামের মূর্ত্তি খোদিত আছে। তৃতীয় গুহার বহিঃপ্রকোষ্ঠে গজারূঢ়-পুরুষ এবং শার্দ্দূলপৃষ্ঠে উপবিষ্টা এক স্ত্রীর মূর্ত্তি থাকায়, ইহাদিগকে ইন্দ্র ও শচী অনুমানে ব্রাহ্মণেরা এই গুহাত্রয়ের নাম ইন্দ্রসভা রাখিয়াছেন। কিন্তু, ইহাও বক্তব্য যে, এই স্ত্রীমূর্ত্তিই প্রথম ও দ্বিতীয় গুহায় ব্যাঘ্রেশ্বরী ভবানী বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

" 'হুনার লয়না' অর্থাৎ বিবাহশালা নামে অপর এক সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ গুহা আছে। ইহা ১২৫ হস্ত দীর্ঘ, এবং ১০০ হস্ত প্রস্থ। এই গুহার গর্ভস্থানে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহাতে অনেক দেবদেবীরও মূর্ত্তিসকল দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তন্মধ্যে হরপার্ব্বতীর বিবাহ ব্যাপার খোদিত থাকায় এই গুহার নাম বিবাহশালা হইয়াছে।

"ইলোরার আর একটী প্রসিদ্ধ গুহার নাম 'কৈলাস'; ইহা ৩৬৭ হস্ত দীর্ঘ এক বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ মধ্যে নির্ম্মিত। ইহার প্রবেশ দ্বারে এক চমৎকার নহবৎখানা আছে এবং এতন্মধ্যে এত অধিকসংখ্যক দেবতাদিগের লীলাপ্রকাশক মূর্ত্তিসকল দৃষ্ট হয় যে, তাহার তুলনা পৃথিবীর আর কোথাও প্রাপ্ত হওয়া যায় না। প্রাঙ্গণের তিন দিকে স্তম্ভযুক্ত অলিন্দ এবং তাহার ভিত্তিতে বহুল দেবাদির মূর্ত্তিসকল খোদিত আছে। গোপুরের পশ্চাতে কৈলাসের প্রাসাদ, ইহা পাঁচটী মন্দিরে সম্পূর্ণ। মধ্যস্থ মন্দির সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ; ইহা ৪৪ হস্ত দীর্ঘ, এবং ৩৭ হস্ত প্রস্থ। এই মন্দিরসকল খোদিত গজ ও শার্দ্দূলযুক্ত উপাধানোপরি স্থাপিত। এই গুহার

পশ্চাদ্ভাগে একটী চাঁদনীর মধ্যে এত দেবদেবীর মূর্ত্তি আছে যে, ইহাকে হিন্দু দেবতাদিগের প্রদর্শন গৃহ বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

এই গুহার সন্নিকটে অনেক গুহা দেখিতে পাওয়া যায়, এবং তৎসমুদয়ই পর্ব্বত খোদিত হইয়া প্রস্তুত হইয়াছে। স্তম্ভ, ছাদ, প্রাচীর, অলিন্দ, গবাক্ষ এবং অসংখ্য দেবদেবীর মূর্ত্তি—এ সকলই একখণ্ড প্রস্তর, ইহার কোন অংশ গ্রথিত নহে। এই সমস্ত পর্ব্বত খোদিত করিতে কত সময়, কত শ্রম ও কত অর্থ ব্যয়িত হইয়াছে, তাহা মনে করিলে স্তব্ধ হইতে হয়।”

“দ্বিতীয় শ্রেণীর স্থপতি কীর্ত্তি সকলের মধ্যে চিলামব্রুমের মন্দিরের বর্ণনা উদ্ধৃত করিলাম।

“চিলামব্রুমের মন্দিরগুলি ১৩৩২ পাদ দীর্ঘ, ৯৩৬ পাদ প্রস্থ এবং ৩০ পাদ উচ্চ ও ৭ পাদ প্রস্থ প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। এই সুবিস্তৃত প্রাঙ্গণের প্রায় মধ্যস্থলে ও ঈষৎ পূর্ব্বদিকে একটি চমৎকার বৃহদাকার মন্দির আছে। ইহা দীর্ঘে ২২৪ পাদ এবং প্রস্থে ৬৪ পাদ; ইহার সম্মুখে এক চাঁদনী আছে, উহা সহস্র স্তম্ভে সুশোভিত! উক্ত মন্দিরাভ্যন্তরস্থ মূর্ত্তিসকল ভারতবর্ষীয় যাবতীয় দেবদেবীর আদর্শে খোদিত। কিন্তু ইহার মধ্যে এরূপ একটি অত্যাশ্চর্য্য কীর্ত্তি আছে যে, তাহা ভূমণ্ডলের অন্য কোন স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায় না। চতুষ্কোণাকার স্তম্ভ-শ্রেণী-সংলগ্ন এক প্রস্তর-শৃঙ্খল খোদিত আছে, তাহা দীর্ঘে ১৪৬ পাদ এবং তাহার প্রত্যেক কড়া তিন পাদ দীর্ঘ। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ইহা ভিত্তিসংলগ্ন নহে, কেবল মাত্র স্তম্ভ হইতে স্তম্ভান্তরে সংযোজিত, অবশিষ্টাংশ শূন্যে ঝুলিয়া আছে। অপর এই মন্দিরের প্রবেশদ্বারে এরূপ উৎকৃষ্ট খোদিত মূর্ত্তিসকল এবং এরূপ দুইটি মনোহর শোভাসম্পন্ন পিল্পা আছে যে, প্রসিদ্ধ শিল্প-নিপুণ গ্রীকজাতিও উক্ত প্রকার গঠনে ঐরূপ অলঙ্কার যোজনা করিতে সমর্থ হয়েন নাই।”

মহাবালীপুরের মন্দিরের প্রসঙ্গে লিখিত আছে যে, “এই নগরস্থ প্রধান মন্দিরে সাতিশয় সুন্দর গঠনে সুশোভিত মনুষ্য-মূর্ত্তিসকল অদ্যাপিও বিদ্যমান আছে। একজন ইউরোপীয় স্বচক্ষে দেখিয়া লিখিয়াছেন তাহাদের কোন কোন অংশ বিশেষতঃ মুখশ্রী, সুবিখ্যাত ভাস্করবিদ্যা-বিশারদ কানবাকৃত মূর্ত্তিসকলের তুল্য।”

তৃতীয় শ্রেণীর স্থাপত্যের প্রধান উদাহরণ, ভুবনেশ্বর। আবু পর্ব্বতস্থ জৈন মন্দিরের অভ্যন্তরস্থ অলঙ্কার সম্বন্ধে শ্রীমাণি বাবু লিখিয়াছেন যে, তাহার সাদৃশ্য বোধ হয় ভূমণ্ডলের আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না।

“বিখ্যাত ফরগুসন সাহেব বলিয়াছেন যে, এরূপ বহ্বায়াসসম্পন্ন এবং বিশুদ্ধ রুচির অনুমোদিত স্থপতি-কার্য্য বোধ হয় আর কুত্রাপি নাই এবং উক্ত মহাত্মা

ইহার চাঁদনী লক্ষ্য করিয়া কহিয়াছেন যে, সে কৃষ্টফর রেনের লণ্ডন প্রভৃতির সুবিখ্যাত ধর্ম্মমন্দির সকল এই জৈন চাঁদনীর সহিত সৌসাদৃশ্য সম্পন্ন হইলে আরও উৎকৃষ্ট হইত। এই কীর্ত্তি ১০৩২ খ্রীঃঅব্দে নির্ম্মিত হয়। ইহাতে ১৮০০০০০০০ অষ্টাদশ কোটী টাকা এবং চতুর্দ্দশ বর্ষ সময় ব্যয়িত হইয়াছিল।”

ভারতবর্ষীয় স্থাপত্যের দুইটি মাত্র দোষের উল্লেখ আছে, বিজনতা এবং আলোকাভাব।

ভারতবর্ষীয় ভাস্কর্য্যের গৌরব, স্থাপত্য-গৌরবের ন্যায় নহে, তথাপি আমাদিগের প্রাচীন ভাস্কর্য্য, আধুনিক দেশী ভাস্কর্য্যাপেক্ষা সহস্র গুণে প্রশংসনীয়।

শ্রীমাণি বাবু কয়েকটি উদাহরণের বর্ণনা করিয়া লিখিয়াছেন,

“বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট শিল্প-বিদ্যালয়ের সুদক্ষ অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত লক সাহেব মহোদয় ভুবনেশ্বরান্তর্গত এক মন্দির-ভিত্তিতে একটী দুর্গাদেবীর মূর্ত্তি দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছেন; তিনি বলেন যে উহা কোমল ও সুখস্পর্শ রক্তমাংসে গঠিত বলিয়া বোধ হয়, কঠিন প্রস্তর বলিয়া প্রতীয়মান হয় না! বাস্তবিক অস্মদ্দেশীয় ভাস্কর্য্যের ইহা একটি প্রধান ধর্ম্ম—সর্ব্বত্রেই ইহার গৌরবের কথা শ্রবণগোচর হয়। পাঠক! বোধ করি আপনি অবগত আছেন যে এইরূপ সুখস্পর্শ ও কোমল গঠন এবং মনোহর অঙ্গবিন্যাস প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্য্যের লক্ষণ। অতএব আপনি শুনিলে আনন্দিত হইবেন যে, আর্য্যগণ এই সকল উৎকৃষ্ট লক্ষণ দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া অধিকাংশ প্রতিমূর্ত্ত্যাদি বিশেষ নৈপুণ্য সহকারে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন! এই জাতীয় শিল্পের অপর একটী উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম “প্রয়োজন সিদ্ধি” অর্থাৎ, শিল্পী পুত্তলিকাদিগকে যে যে কার্য্যে নিয়োজিত করিবার কল্পনা করিয়াছেন, দৃষ্টিমাত্রে দর্শকের মনে সেই সেই উদ্দেশ্য-সাধন-ভাবের উপলব্ধি হয়। আমি আহ্লাদের সহিত ব্যক্ত করিতেছি যে, অনেক বিখ্যাত ইউরোপীয় পণ্ডিত অস্মদ্দেশীয় পৌরাণিক ভাস্কর্য্যে এই মহদ্গুণের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন।”

পরে মথুরার বিখ্যাত পুত্তলিকাসকলের বিস্তারিত বর্ণনা করিয়াছেন। অনেকে উহা গ্রীকশিল্পিনির্ম্মিত সাইলেনসের প্রতিমূর্ত্তি বিবেচনা করেন। শ্রীমাণি বাবু এ কথার প্রতিবাদ করিয়াছেন।* তিনি বলেন যে উহা হিন্দু শিল্পকরের

---

* গ্রীক জাতিরা মথুরা পর্য্যন্ত আসিয়াছিল, এ কথা অসম্ভব বলিয়া শ্রীমাণি মহাশয় যে আপত্তি করিয়াছেন, তাহা অকিঞ্চিৎকর। হণ্টর সাহেব প্রমাণ করিয়াছেন যে, গ্রীকজাতিয়েরা মধ্য-ভারতবর্ষের নানা স্থানে বাস করিত। মহাভাষ্যের বিখ্যাত উদাহরণ “অরুণৎ যবনো সাকেতম্,” শ্রীমাণি মহাশয় কি বিস্মৃত হইয়াছেন? যখন গ্রীকেরা অযোধ্যা অবরোধ করিয়াছিল, তখন মথুরায় না আসিবে কেন?

খোদিত, কৃষ্ণলীলা বর্ণন। সাইলেনস নহে—বলরাম। যদি এই ভাস্কর্য্য হিন্দু প্রণীত হয়, তবে সে হিন্দু গ্রীকদিগের নিকট শিল্প শিক্ষা করিয়াছিল, সন্দেহ নাই। তাহার বিশেষ চিহ্ন আছে। ভারতবর্ষীয় ভাস্কর্য্য মধ্যে ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

নশ্বর চিত্রপট অযত্নে রাখিলে, প্রস্তরাদির ন্যায় অধিককাল স্থায়ী হয় না; এজন্য শ্রীমাণি বাবু অজন্তা ও বাঘের গুহাস্থিত ফ্রেস্কো পেন্টিং ভিন্ন আর কোন চিত্রের উল্লেখ করিতে পারেন নাই। প্রধানতঃ তাঁহাকে নাটকের সাক্ষিতার উপর নির্ভর করিতে হইয়াছে। সে প্রমাণ আমরা বিশেষ সন্তোষজনক বিবেচনা করি না। কবির স্বভাব এই যে, প্রকৃত অনুৎকৃষ্ট হইলেও তাহাকে উৎকর্ষ প্রদান করেন। উত্তরচরিত ও শকুন্তলায় যে চিত্রবিদ্যার পরিচয় আছে, ততদূর নৈপুণ্য যে ভারতবর্ষীয়েরা লাভ করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে অন্য প্রমাণ আবশ্যক।

যাহা হউক, শ্রীমাণি বাবুর এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ পাঠে আমরা বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছি। এ বিষয়ে বাঙ্গালা ভাষায়, দ্বিতীয় গ্রন্থ নাই; এই প্রথমোত্তম। গ্রন্থে পরিচয় পাওয়া যায় যে শ্রীমাণি বাবু স্বয়ং সুশিক্ষিত এবং শিল্প সমালোচনায় সুপটু। এবং গ্রন্থ-প্রণয়নে বিশেষ পরিশ্রমও করিয়াছেন। এই গ্রন্থের বিশেষ পরিচয়ে পাঠকগণ সন্তুষ্টিলাভ করিবেন বলিয়াই, আমরা এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ হইতে এত কথা উদ্ধৃত করিতে সাহস করিয়াছি।

উপসংহারে, স্বদেশীয় মহাশয়গণকে দুই একটা কথা নিবেদন করিলে ক্ষতি নাই। বাঙ্গালি বাবুদিগের নিকট সূক্ষ্মশিল্প সম্বন্ধে কোন কথা বলা, দুই চারি জন সুশিক্ষিত ব্যক্তি ভিন্ন, অন্যের কাছে, ভস্মে ঘৃত ঢালা হয়। সৌন্দর্য্যানুরাগিণী প্রবৃত্তি, বোধ হয় এত অল্প অন্য কোন সভ্যজাতির নাই। বাস্তবিক সৌন্দর্য্যপ্রিয়তাই, সভ্যতার একটি প্রধান লক্ষণ এবং বাঙ্গালিরা এখনও যে সভ্যপদবাচ্য নহেন, ইহাই তাহার একটি প্রমাণ। তাঁহারা গৃহিণীর মুখখানি সুন্দর দেখিতে ভালবাসেন বটে—এবং কতকটা পুত্রবধূর সম্বন্ধেও তাই, কিন্তু অন্যত্র সে সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা তত বলবতী নহে। সঙ্গতি থাকিলেও ছেঁড়া মাদুর, ছেঁড়া বালিশ, দুর্গন্ধ মসি এবং তৈলচিত্রিত জাজিম, আমরা বড় ভালবাসি। পরিধেয় সম্বন্ধে রজককে বঞ্চনা করাই বাঙ্গালি জাতির জীবনযাত্রার একটি প্রধান বীরত্ব। গৃহমধ্যে, পূতিগন্ধবিশিষ্ট, কদর্য্য কীটসঙ্কুল, দৃষ্টিপীড়ক কতকগুলি স্থান না থাকিলে বাঙ্গালির জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হয় না। বরং বস্থপুত্ত পরিষ্কৃতাবস্থায় থাকে, তথাপি বাঙ্গালি নহে। ঈদৃশ জাতির সৌন্দর্য্যস্পৃহা কোথায়? এবং যে বিদ্যার একমাত্র উদ্দেশ্য সৌন্দর্য্য, তাহার আদর কি প্রকারে সম্ভবে? সুতরাং বাঙ্গালার সূক্ষ্মশিল্পের এত দুর্দ্দশা।

স্বীকার করি, সকল দোষটুকু বাঙ্গালির নিজের নহে। কতকটা বাঙ্গালির সামাজিক রীতির দোষ;—পূর্ব্বপুরুষের ভদ্রাসন পরিত্যাগ করা হইবে না, তাহাতেই অসংখ্য সন্তানসন্ততি লইয়া গর্ত্তমধ্যে পিপীলিকার ন্যায়, পিল্ পিল্ করিতে হইবে—সুতরাং স্থানাভাববশতঃ পরিষ্কৃতি এবং সৌন্দর্য্যসাধন সম্ভবে না। কতকটা, বাঙ্গালির দারিদ্র্য জন্য। সৌন্দর্য্য অর্থসাধ্য—অনেকের সংসার চলে না। তাহার উপর সামাজিক রীত্যনুসারে, আগে পৌরস্ত্রীগণের অলঙ্কার, দোল-দুর্গোৎসবের ব্যয়, পিতৃশ্রাদ্ধ, মাতৃশ্রাদ্ধ, পুত্রকন্যার বিবাহাদিতে, অবস্থার অতিরিক্ত ব্যয় করিতে হইবে—সে সকল ব্যয় সম্পন্ন করিয়া, শূকরশালা তুল্য কদর্য্য স্থানে বাস করিতে হইবে, ইহাই সামাজিক রীতি। ইচ্ছা করিলেও, সমাজশৃঙ্খলেবদ্ধ বাঙ্গালি, সে রীতির বিপরীতাচরণ করিতে পারেন না। কতকটা হিন্দুধর্ম্মের দোষ; যে ধর্ম্মানুসারে, উৎকৃষ্ট মর্ম্মর প্রস্তুত হর্ম্ম্যও গোময় লেপনে পরিষ্কৃত করিতে হইবে, তাহার প্রসাদে সূক্ষ্মশিল্পের দুর্দ্দশারই সম্ভাবনা।

এ সকল স্বীকার করিলেও, দোষক্ষালন হয় না। যে ফিরিঙ্গি কেরাণীগিরি করিয়া শত মুদ্রায় কোনমতে দিনপাত করে, তাহার সঙ্গে বৎসরে বিংশতি সহস্র মুদ্রার অধিকারী গ্রাম্য ভূস্বামীর গৃহপারিপাট্য বিষয়ে তুলনা কর। দেখিবে, এ প্রভেদটি অনেকটাই স্বাভাবিক। দুই চারিজন ধনাঢ্য বাবু, ইংরেজদিগের অনুকরণ করিয়া, ইংরেজের ন্যায় গৃহাদির পারিপাট্য বিধান করিয়া থাকেন এবং ভাস্কর্য্য ও চিত্রাদির দ্বারা গৃহ সজ্জিত করিয়া থাকেন। বাঙ্গালি নকল-নবিশ ভাল, নকলে শৈথিল্য নাই। কিন্তু তাঁহাদিগের ভাস্কর্য্য এবং চিত্র সংগ্রহ দেখিলেই বোধ হয় যে অনুকরণ-স্পৃহাতেই ঐ সকল সংগ্রহ ঘটিয়াছে—নচেৎ সৌন্দর্য্যে তাঁহাদিগের আন্তরিক অনুরাগ নাই। এখানে ভালমন্দের বিচার নাই, মহার্ঘ হইলেই হইল; সন্নিবেশের পারিপাট্য নাই, সংখ্যায় অধিক হইলেই হইল। ভাস্কর্য্য চিত্র দূরে থাকুক, কাব্য সম্বন্ধেও বাঙ্গালির উত্তমাধম বিচারশক্তি দেখা যায় না। এ বিষয়ে সুশিক্ষিত অশিক্ষিত সমান—প্রভেদ অতি অল্প। সৌন্দর্য্য-বিচারশক্তি, সৌন্দর্য্য-রসাস্বাদন সুখ, বুঝি বিধাতা বাঙ্গালির কপালে লিখেন নাই।

ঐতিহাসিক ভ্রম

অনেকের মনে তিনটি সিদ্ধান্ত বদ্ধমূল আছে। প্রথমটী এই যে, বাঙ্গালিরা কখনও বিদেশ বিজয় করে নাই; দ্বিতীয়টী এই যে, যে দিন বখ্‌তিয়ার খিলিজি সপ্তদশ জন অশ্বারোহী সমভিব্যাহারে নবদ্বীপে প্রবেশ করিলেন, সেই দিনেই সেনবংশের রাজত্ব বিলুপ্ত এবং সমুদায় বাঙ্গালাদেশ মুসলমানদিগের পদানত হইল; তৃতীয়টী এই যে, মুসলমান ভূপালদিগের সময়ে যে ক্ষমতাপন্ন জমীদারদিগের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তাঁহারা করসংগ্রাহক রাজকর্ম্মচারী ছিল মাত্র। আমরা প্রমাণ করিব যে এ তিনটী সিদ্ধান্তই ভ্রমাত্মক।

কিন্তু প্রমাণ প্রয়োগ করিবার পূর্ব্বে আমাদিগের বলা আবশ্যক হইতেছে যে বাঙ্গালাদেশ ও বাঙ্গালি বলিতে আমরা কি বুঝি। সর্ব্ববাদিসম্মত কথা কহিবার উদ্দেশে আমরা মগধ, মিথিলা, উড়িষ্যা ও আসাম এ কয়েকটীকে বাঙ্গালা হইতে পৃথক্ স্থান করিব। সুতরাং আমাদিগের অবলম্বিত বাঙ্গালার চতুঃসীমা এইরূপ হইতেছে; উত্তরে, সিকিম ও ভোটরাজ্য এবং গারো ও খস পাহাড়; পশ্চিমে, মহানন্দানদী এবং রাজমহল ও ছোটনাগপুরের পাহাড়; দক্ষিণে, সুবর্ণরেখানদী ও বঙ্গসাগর; পূর্ব্বে, চট্টগ্রাম-লুসাই-মণিপুর-পাহাড়শ্রেণী ও আসাম প্রদেশ। এই চতুঃসীমাবদ্ধ স্থানেই বাঙ্গালা ভাষা প্রচলিত, এবং ইহার অধিবাসীদিগকে আমরা বাঙ্গালি বলি। যদিও বাঙ্গালা ভাষা আসামে প্রবেশ করিয়াছে এবং বাঙ্গালিরা উড়িষ্যা, অযোধ্যা, কাশী প্রভৃতি স্থানে উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়াছেন, তথাপি বঙ্গদেশবহিঃস্থ বাঙ্গালির সংখ্যা এত অল্প যে তাহা ধর্ত্তব্য নহে।

বঙ্গদেশের আর্য্যরাজত্বকালের পুরাবৃত্ত নাই। সুতরাং আমাদিগকে বিদেশীয় লেখক ও প্রাচীন অনুশাসন-পত্রের সাহায্য অবলম্বন করিতে হইতেছে। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে, প্রতীতি হইবে যে এগুলি লিখিত দেশীয় ইতিহাস অপেক্ষাও প্রামাণ্য।

মহাবংশ, রাজরত্নাকরী ও রাজাবলী এ তিনখানি প্রামাণ্য গ্রন্থে সিংহলের পূর্ব্ববিবরণ সঙ্কলিত হইয়াছে। এই তিনখানিতেই এই মর্ম্মের কথা আছে যে,

বঙ্গদেশে সিংহবাহু নামে এক রাজা ছিলেন; তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র বিজয়সিংহ, প্রজাপীড়ন-দোষে নির্ব্বাসিত হইলে, সাতশত সঙ্গী লইয়া অর্ণবপোত আরোহণ করেন এবং অনেক বিপদ উত্তীর্ণ হইয়া লঙ্কাদ্বীপে উপস্থিত হন ও তত্রত্য অধিবাসী-দিগকে যুদ্ধে জয় করিয়া সেখানকার রাজসিংহাসনে অধিরোহণ করেন; অনন্তর বিজয়ের পরলোকপ্রাপ্তি হইলে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র পাণ্ডুবাস বঙ্গদেশ হইতে যাত্রা করিয়া মন্ত্রীর নিকট হইতে রাজ্যভার গ্রহণ করেন। পাণ্ডুবাসই লঙ্কার ঐতিহাসিক রাজবংশের আদিপুরুষ; এবং সিংহবংশের রাজ্য বলিয়া উক্ত দ্বীপের নাম সিংহল হইয়াছে। যে বৎসর বুদ্ধদেবের জীবনলীলা সমাপ্ত হয়, সেই বৎসর বিজয় লঙ্কাদ্বীপে উপনীত হন। অধিকাংশ পণ্ডিতদিগের মত এই যে বুদ্ধদেবের তিরোভাব খ্রীষ্টাব্দের ৫৪৩ বর্ষ পূর্ব্বে ঘটে; কেবল ভট্টমোক্ষমূলর সাহেব এই ঘটনার কাল খ্রীঃ পূঃ ৪৭৭ বৎসর বলিয়া স্থির করেন। যাহা হউক, স্বীকার করিতে হইতেছে যে খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী ষষ্ঠ বা পঞ্চম শতাব্দীতে বাঙ্গালিরা, বর্ত্তমান ইংরাজ জাতির ন্যায়, সমুদ্রপথে সাহসপূর্ব্বক যাত্রা করিয়া বিদেশ বিজয় করিয়াছিল।

বিদেশীয় লেখক পরিত্যাগ করিয়া এক্ষণে আমরা দুইখানি অনুশাসন পত্রের কথা বলিব। একখানি মুঙ্গেরে ও অপরখানি বুদাল নামক স্থানে পাওয়া গিয়াছে। এ দুইখানির ইংরাজী অনুবাদ এসিয়াটিক রিসার্চ্চের প্রথম খণ্ডে আছে। (১) প্রথমখানি গৌড়াধিপতি দেবপাল দেবের প্রদত্ত। উহাতে লিখিত আছে যে তাঁহার বিজয়ী সেনা তখন মুদ্গগিরিতে অর্থাৎ মুঙ্গেরে শিবির সন্নিবেশ করিয়া অবস্থিতি করিতেছিল; সেখানে বর্ত্ম জন্য নদীর উপর যে নৌসেতু নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহাকে পর্ব্বতশ্রেণী বলিয়া ভ্রান্তি জন্মিত; সেখানে উত্তরদেশীয় নরপতিগণ এত অশ্ব পাঠাইতেন যে, তাহাদিগের পদধূলিতে দিক্ অন্ধকার হইত; সেখানে জম্বুদ্বীপের এত ক্ষমতাশালী নৃপালগণ সম্মান প্রদর্শন করিতে আসিতেছিলেন যে, তাঁহাদিগের পরিচারকবর্গের পদভরে পৃথিবী বসিয়া যাইতেছিল। (২) বিজয়ীসেনা ও সামন্ত ভূপতিনিচয়ে পরিবেষ্টিত হইয়া রাজা দেবপাল যে

---

(১) See Asiatic Researches. Vol. I.

(২) "At Moodgo-ghiri where is encamped his victorious army; across whose river is constructed for a road a bridge of boats, which is mistaken for a chain of mountains;…whither the Princes of the North send so many troops of horse that the dust of their hoops spreads darkness on all sides; whither so many mighty chiefs of Jamboo Dwipa resort to pay their respects, that the earth sinks beneath the weight of the feet of their attendants. There Deva Paladeva (who walking in the foot-steps of the mighty Lord of the great Soogots)…issues his commands."

অনুশাসন পত্র বাহির করিতেছেন, তাহাতে তিনি স্পষ্টাক্ষরে লিখিতেছেন যে, গঙ্গোত্তরী হইতে সেতুবন্ধ রামেশ্বর পর্য্যন্ত এবং লক্ষীকূল হইতে পশ্চিম সাগর পর্য্যন্ত, সমুদায় স্থান তিনি জয় করিয়াছিলেন ; এবং যুদ্ধার্থে তাঁহার ঘোটকসকল কাম্বোজদেশে উপস্থিত হইয়া কান্তা সন্দর্শনে আনন্দধ্বনি করিয়াছিল। (৩) লক্ষীকূল পূর্ব্বদেশীয় লক্ষীপুর, এবং কাম্বোজদেশ রঘুবংশ দৃষ্টে সিন্ধুনদের অপর পার্শ্ববর্ত্তী বলিয়া বোধ হয়। রঘু পারসীক ও হূণদিগকে পরাজিত করিয়া কাম্বোজদেশীয় রাজগণকে আক্রমণ করেন ; এবং উক্ত দেশে উৎকৃষ্ট অশ্বের উল্লেখও দেখা যায়। (৪) মুঙ্গেরের অনুশাসন-পত্র পাঠ করিয়া বোধ হয় যে গৌড়াধিপ দেবপাল দেব, সমুদয় ভারতভূমির রাজচক্রবর্ত্তী হইয়াছিলেন। বুদালের প্রস্তর-লেখদ্বারাও এই মতের সমর্থন হয়। এটী পালরাজবংশের একজন মন্ত্রীর আদেশানুসারে প্রস্তুত ; এবং ইহাতে কেদার মিশ্র নামক এক ব্যক্তির বিষয়ে লিখিত আছে যে তাঁহার বুদ্ধিবলে গৌড়েশ্বর বহুকাল নির্ম্মূলীকৃত উৎকলকুলের ও খর্ব্বীকৃতগর্ব্ব হূণদিগের দেশ, মহিমাবিচ্যুৎ দ্রাবিড় ও গুর্জ্জররাজের রাজ্য এবং সার্ব্বভৌম সমুদ্র-মেখল রাজসিংহাসন উপভোগ করেন। (৫)

বাঙ্গালিদিগের বিদেশবিজয় বিষয়ে আর একখানি অনুশাসন পত্রের উল্লেখ করিয়া আমরা ক্ষান্ত হইব। অনেকে জানেন যে উড়িষ্যার গঙ্গাবংশীয় রাজারা অত্যন্ত পরাক্রান্ত ছিলেন ; তাঁহারা এক সময়ে ত্রিবেণী পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন ; তাঁহারাই জগদ্বিখ্যাত জগন্নাথদেবের মন্দির প্রস্তুত করান। এক্ষণে জানা যাইতেছে যে তাঁহারাও বাঙ্গালি ছিলেন। পণ্ডিতগণাগ্রগণ্য উইলসন

---

(৩) "He who conquered the earth from the source of the Ganges as far as the well-known bridge. which was constructed by the enemy of Dasasya, from the river of Luckicool, as far as the habitation of Boroon,···who going to subdue other princes, his young horses meeting their females at Kamboge, they mutually neighed for joy."

(৪) কাম্বোজাঃ সমরে সোঢ়ুং তস্য বীর্য্যমনীশ্বরাঃ।
গজালানপরিক্লিষ্টৈরক্ষোটৈঃ সার্দ্ধমানতাঃ ॥
তেষাং সদশ্বভূয়িষ্ঠা তুঙ্গা দ্রবিণরাশয়ঃ।
উপদা বিবিশুঃ শশ্বন্নোৎসেকাঃ কোশলেশ্বরং ॥"

৪ সর্গ রঘুবংশ।

(৫) "Trusting to his wisdom, the king of Gour for a long time enjoyed the country of the eradicated race of Ootkola, of the Hoons of humbled pride, of the kings of Dravir and Goorjas whose glory was reduced, and the universal sea-girt throne."

সাহেব ম্যাকেঞ্জি সংগ্রহের প্রস্তাবনায় লিখিয়াছেন যে কল্‌ভিন্ সাহেব যে অনুশাসন পত্র প্রাপ্ত হন তদ্দৃষ্টে নির্ণীত হয় যে চোরঙ্গ গঙ্গাবংশের আদিপুরুষ নহেন ; যিনি কলিঙ্গে প্রথম উপস্থিত হন, তাঁহার নাম অনন্তবর্ম্মা বা কোলাহল ; তিনি গঙ্গা-রাঢ়ীর অর্থাৎ গঙ্গাসন্নিহিত তমোলুক ও মেদিনীপুর প্রদেশের অধিপতি ছিলেন। এই ঘটনা খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ঘটে। (৬)

বাঙ্গালিরা বিদেশ বিজয় করিয়াছিল, ইহা একপ্রকার সপ্রমাণ হইল। এক্ষণে আমরা দেখাইব যে, বখ্‌তিয়ার খিলিজির নবদ্বীপ প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই সেনবংশের রাজত্ব শেষ ও বাঙ্গালার স্বাধীনতাসূর্য্য অস্তমিত হয় নাই। মিনহাজই সিরাজ বঙ্গদেশে আসিয়া বখ্‌তিয়ার খিলিজির কোন কোন সঙ্গীর মুখে ১২০৩ খ্রীষ্টাব্দের বঙ্গবিজয় বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াছিলেন ; "তবকৎইনসিরী" নামক গ্রন্থে ইহা তিনি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থ ১২৬০ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত ; উহাতে লাক্ষ্মণেয় সেনের পলায়ন বর্ণনা করিয়া মিনহাজ বলেন যে, "রায় লাক্ষ্মণেয় সঙ্কনট ও বঙ্গাভিমুখে চলিলেন, সেখানে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার পুত্রগণ অদ্যাপি বঙ্গদেশের অধিপতি আছেন।" (৭) বাস্তবিক বখ্‌তিয়ার কেবল লক্ষ্মণাবতী বা গৌড় প্রদেশ অধিকার করেন ; পদ্মার অপর পার্শ্ববর্ত্তী প্রকৃত বঙ্গদেশ জয় করিতে পারেন নাই। (৮) আরবী-পারসী-বিদ্যাবিশারদ ব্লকম্যান সাহেব লিখিয়াছেন যে, "বখ্‌তিয়ার খিলিজি সমুদায় বাঙ্গালা জয় করিয়াছিলেন এরূপ বিশ্বাস করা অন্যায় ; তিনি কেবল মিথিলার পূর্ব্ব-দক্ষিণাংশ, বারেন্দ্র, রাঢ়ের উত্তরাংশ, এবং বগড়ির উত্তর-পশ্চিমভাগ

---

(৬) "An inscription procured, since Mr. Stirling wrote, by Mr. Colvin, shews that Choranga was not the founder of Gungavansa family, but that the first who came into Kalinga was Ananta Varma—also called Kolahala, sovereign of Gunga Rarhi—the low country on the right bank of the Ganges or Tumlook and Midnapore ; this occurred at the end of the eleventh century of our era."

P. CXXVIII Wilson's Preface to Mackenzie Collection.

(৭) Rai Lokhmoniya went towards Sanknat and Bengal, where he died." His sons are to this day rulers in the territory of Bengal."

See Elliot's History of India told by her own Historians.

(৮) "Distinct from the country of Lakhnauti is Banga, and in this part of Bengal the descendants of the Lakmaniyah kings of Nadiya still reigned in A. H. 658. or 1260. A. D. when Minhaji siraj, the author of the Tabaqat, wrote his history."

H. Blochmann's Geography and History of Bengal.

অধিকার করিয়াছিলেন। বিজিত প্রদেশ উহার প্রধান নগরী হইতে লক্ষ্মণাবতী নাম প্রাপ্ত হইয়াছিল।" (৯) "তবকৎইনসিরীতে" এবং মুসলমান রাজত্বকালের প্রথম শতাব্দীর কোন মুদ্রাতে সুবর্ণ-গ্রামের নামোল্লেখ না থাকাতে, ১২৬০ খৃঃ অব্দে বঙ্গ সেনবংশীয় রাজাদিগের হাতে ছিল, মিন্‌হাজের এই উক্তির সমর্থন হইতেছে। "তারিখিবরণি" নামক ইতিহাস গ্রন্থে বুলবনের রাজ্যশাসন সময়ে (১২৮০ খৃঃ অব্দে) সুবর্ণগ্রাম একজন স্বাধীন রাজার বাসস্থল বলিয়া প্রথম উল্লিখিত দৃষ্ট হয়; কিন্তু তগলকসার সময়ে (১৩২৩ খৃঃ অব্দে) সোণার গাঁ ও সাতগাঁয় মুসলমান শাসনকর্ত্তা প্রবেশ করিয়াছে, এবং সুবর্ণগ্রাম, সপ্তগ্রাম ও লক্ষ্মণাবতী এই তিনটি সম্মিলিত প্রদেশের সাধারণ নাম "বাঙ্গালা" হইয়াছে। (১০)

একপ্রকার প্রদর্শিত হইল যে, যদিও ১২০৩ খৃঃ অব্দে মুসলমানেরা বাঙ্গালায় উপস্থিত হয়, তথাপি সেনবংশ ধ্বংস করিতে তাহাদিগের প্রায় একশত বৎসর লাগিয়াছিল। এক্ষণে আমরা দেখাইব যে, এই ঘটনার পরেও মুসলমানদিগের প্রভুত্ব এ দেশের কোন কোন স্থলে কখনও সংস্থাপিত হয় নাই এবং কোন কোন স্থলে বহুকালান্তে বদ্ধমূল হইয়াছিল। সুবিখ্যাত ব্লক্‌ম্যান সাহেব "বাঙ্গালার ভূবৃত্তান্ত ও ইতিহাস" নামক প্রস্তাবে এতদ্দেশীয় মুসলমান রাজ্যের সীমা সম্বন্ধে যে সকল কথা লিখিয়াছেন, সেই সকলই আমাদিগের প্রধান অবলম্বন।

হণ্টর সাহেব বলেন যে বিষ্ণুপুরের রাজারা কখনও মুসলমানদিগের অধীনতা স্বীকার করে নাই। (১১) ব্লক্‌ম্যান সাহেব এখানকার মুসলমান রাজ্যের পশ্চিম

---

(৯) "It would be wrong to believe that Bakhtyar Khiligi conquered the whole of Bengal, he merely took possession of the south-eastern parts of Mithila, Barendra, the northern portions of Radha, and the north-western tracts of Bagdi. This conquered territory received from its capital the name of Lakhnauti."

Blochmann's History and Geography of Bengal.

(১০) "Minhaj's remark that Banga was, in 1260, still in the hands of Lakhman Sen's descendants is confirmed by the fact that Sunnargaon is not mentioned in the Tabaqat nor does it occur on the coins of the first century of Mahomedan rule. It is first mentioned in the Tarikhi Barini, as the residence, during Balban's reign of an independent Rai; but under Tughluq Shah (A. D. 1323) Sunnargaon and Satgaon which likewise appear for the first time are the seats of Mahomedan Governors, the term Bangalah being now applied to the united provinces of Lakhnauti, Satgaon and Sunnargaon."

See also p. 238, Journal of the Asiatic Society of Bengal, part I. 1873.

(১১) See Hunter's Rural Bengal.

সীমা সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে এই মতের প্রতিপোষকতা হয়। তিনি কহেন, "দৃষ্ট হইবে যে এই সীমাদ্বারা কাহালগাঁর দক্ষিণ হইতে বরাকর পর্য্যন্ত সমুদায় সাঁওতাল পরগণা, পাচেট, এবং বিষ্ণুপুরের রাজাদিগের রাজ্য, বর্জ্জিত হইতেছে।" (১২)

দক্ষিণ-পশ্চিমে মেদিনীপুর ও হিজলি ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উড়িষ্যা রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। উক্ত বৎসর হিন্দু-সেনাপতি কালাপাহাড়ের প্রভাবে তাহা উৎকল সহ বঙ্গেশ সুলেমানসাহের হস্তগত হয়। (১৩)

দক্ষিণে আকবরের সময়েও আমরা প্রতাপশালী প্রতাপাদিত্যের নাম শুনিতে পাই। আকবরনামা দৃষ্টে জানা যায়, সুন্দরবনের সন্নিহিত প্রদেশে (১৫৭৪) খৃঃ অব্দে, মুকুন্দ নামে একজন পরাক্রান্ত স্বাধীন হিন্দু জমীদার ছিলেন। ফরিদপুর সম্মুখস্থ "চর মুকুন্দিয়া" নামক দ্বীপে তাঁহার নামের চিহ্ন অদ্যাপি রহিয়াছে। তিনি দিল্লীর সম্রাটের একজন সেনানায়ককে নিহত করেন; এবং তদীয় পুত্র শত্রুজিৎ জাহাঙ্গীর সাহের প্রতিনিধি বঙ্গীয় শাসনকর্ত্তাদিগকে কর দিতে অস্বীকার করিয়া তাহাদিগকে অনেক কষ্ট দেন। শত্রুজিৎ কুচবেহারের রাজার সহিত যোগ করিয়াছিলেন, কিন্তু পরিশেষে সাহজাহানের রাজত্ব সময়ে (১৬৩৬ খৃঃ অব্দে) বন্দীকৃত ও বিনষ্ট হন। (১৪)

---

(১২) "This boundary, it will be seen, excludes the whole of the Santal Parganahs from the south of Khalgaon to the Barakar, Pachet and the territory of the Rajahs of Bishnupur (Bankura.)"

(১৩) "I mentioned Mahall, Mandalghat at the confluence of the Rupnarain and the Hughli as the south-west frontier of Bengal. The districts of Midnapur and Hijli (south-east of Midnapur) were therefore excluded. They belonged to the Kingdom of Orissa till A. H. 775, or A. D. 1567, when Suliman, king of Bengal, and his general Kalapahar defeated Mukund Dev, the last Gujptai" G. H. B.

(১৪) "When Akbar's army, in 1574, under Munim Khan Khanan invaded Bengal and Orissa, Murad Khan one of the officers, was despatched to south-eastern Bengal. He conquered, says Akbarnama, Sirkars Bakla and Fathabad, and settled there; but after some time he came into collision with Mukund, the powerful Hindu Zemindar of Fathabad and Boshnah, who in order to get rid of him, invited him to a feast and murdered him together with his sons... The name of Mukund still lives in the name of the large island "Char Mukundia" in the Ganges opposite Faridpore···His son Satrjit gave Jahangir's Governors of Bengal no end of trouble and refused to send in the customary peshkosh or do homage at the court of Dhaka. He was in

পূর্ব্ববঙ্গে ত্রিপুরা, ভুলুয়া, নওয়াখালি, এবং চট্টগ্রাম বহুকাল বিবাদ ভূমি ছিল; খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে সেগুলি প্রায় ত্রিপুরার ও আরাকানের রাজাদিগের অধিকৃত ছিল। রাজমহল হইতে রাজধানী ঢাকা নগরীতে উঠিয়া আসিবার পরে বাঙ্গালায় মুসলমান রাজ্যের সীমা ফণীনদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল, এবং ঔরেঙ্গেব বাদসাহের সময়ে চট্টগ্রাম হস্তগত হয়। (১৫) শ্রীহট্ট বিজয় ১৩৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ঘটে। (১৬) ত্রিপুরা, হিরম্বা বা কাছাড়, জয়ন্তী, খস, গারো এবং কারিবারি পর্ব্বতপ্রদেশ, এ সকল মুসলমানদিগের রাজ্যভুক্ত হয় নাই। (১৭) আইন আকবরিতে লিখিত আছে যে "ত্রিপুরা স্বাধীন; ইহার রাজার নাম বিজয় মাণিক। রাজাদিগের সকলের নামেই মাণিক আছে; এবং প্রধান বংশীয়দিগের নামে নারায়ণ আছে।" (১৮)

উত্তর বাঙ্গালার রাজগণ এমন পরাক্রান্ত ছিলেন যে তাঁহারা একপ্রকার স্বাধীনতা সম্ভোগ করিতেন। (১৯) যে গণেশ খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাঙ্গালার সিংহাসনে অধিরোহণ করেন, ওয়েষ্টমেকট সাহেবের মতে তিনি দিনাজপুরের রাজা গণেশ। (২০) রঙ্গপুরের উত্তরে কামতা নামে একটি রাজ্য ছিল;

---

secret understanding with the Rajahs of Koch Behar and Coch- Halo, and was at last. in the reign of Shahjahan, captured and executed at Dhaka (about 1636. A. D.)" G. H. B.

(১৫) "Tiparah, Bhaluah, Noakhali and District Chatgaon were contested grounds of which the Rajahs of Tiparah and Arakan were at least before the 17th century oftener masters than the Mahomedans. It was only after the transfer of the capital from Rajmahall to Dhaka, that the south-east frontier of Bengal was extended to the Phani River, which was the imperial frontier till the beginning of Aurangzib's reign, when Chatgaon was permanently conquered, assessed, and annexed to Subah Bangalah." G. H. B.

(১৬) "Silhet···was conquered in A. D. 1384." G. H. B.

(১৭) "The neighbouring countries to the east were Tiparah, Kachhar (the old Hirumba), the territories of the independent Rajahs of the Jaintia, Khaseah, and Garo Hills, and on the left bank of the Brahmaputra, the Karibari Hills, the Zemindars of which were the Rajahs of Sosang." G. H. B.

(১৮) "Tiparah is independent; its king is Bijai Manik. The kings all bear the name of Manik, and the nobles that of Narain."—Ain Akbari.

(১৯) "The Rajahs of Northern Bengal were powerful enough to preserve a semi-independence in spite of the numerous invasions from the times of Bakhtiar Khiliji." G. H. B.

(২০) See Dinajpur Raj in the Calcutta Review.

১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে হোসেন সাহের সময়ে উহা অধিকৃত হয়। (২১) কামতা রাজবংশের তিরোভাবের পরে কোচরাজবংশের প্রাদুর্ভাব হইয়া উঠে; পরিশেষে ১৬৬১ খ্রীষ্টাব্দে ঔরেঙ্গেবের সেনাপতি মিরজুম্লা উক্ত প্রদেশ অধিকার করেন। (২২)

এপর্য্যন্ত যাহা যাহা লিখিত হইল, তাহাতে সপ্রমাণ হইতেছে যে বখ্‌তিয়ার খিলিজির প্রায় একশত বৎসর পরে সেন বংশের রাজ্য ধ্বংস হয়; এবং তদনন্তরও বিষ্ণুপুর, পাচেট্‌, ত্রিপুরা, জয়ন্তী, এ সকল স্থানের রাজগণ মুসলমান্‌দিগের রাজত্বকালে আপনাদিগের স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতিরিক্ত দক্ষিণ, পূর্ব্ব ও উত্তরে অনেক জমিদার বহুকাল স্বাধীন ছিলেন।

এক্ষণে আমরা জমিদারদিগের বিষয়ে কিঞ্চিৎ বলিব। বিষ্ণুপুর, পাচেট, দিনাজপুর, এই সকল স্থানের রাজারা এবং পূর্ব্ব-দক্ষিণ প্রদেশীয় মুকুন্দ ও শত্রুজিৎ জমিদারপদবাচ্য। ইহাতেই বুঝাইতেছে যে জমিদারেরা কেবল করসংগ্রাহক রাজকর্ম্মচারী মাত্র ছিলেন না। কিন্তু এ বিষয়ের আমরা অপর প্রমাণ দিতেছি। আইন আকবরিতে লিখিত আছে যে সুবা বাঙ্গালার জমিদারেরা প্রায়ই কায়স্থ এবং তাহারা ২৩,৩৩০ অশ্বারোহী, ৮,০১,১৫৮ পদাতিক, ১৮০ গজ, ৪,২৬০ কামান এবং ৪,৪০০ নৌকা দিয়া থাকে। (২৩) এরূপ যুদ্ধের উপকরণ যাহাদিগের ছিল, তাহাদিগের পরাক্রম নিতান্ত কম ছিল না। বাস্তবিক অনেক জমিদারের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ না করিয়া কর আদায় করা যাইত না। সুবিখ্যাত পাদরি লং সাহেব ইংরাজ রাজ্যের প্রথম আমলের কাগজপত্রের যে সকল অংশ মুদ্রিত করিয়াছেন, তৎপাঠে জানা যায় যে তখন বর্দ্ধমান, বীরভূম, বিষ্ণুপুর এবং মেদিনীপুরের রাজারা সৈন্য সংগ্রহ করিয়া তৎকালীন শাসনকর্ত্তাদিগের অনেক কষ্টের কারণ হইয়াছিলেন। (২৪)

১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে উড়িষ্যার কমিসনর ষ্টর্লিং সাহেব উক্ত দেশের ভূমির স্বত্ব সম্বন্ধে যে মিনিট লিখিয়া গবর্ণমেণ্টে পাঠাইয়াছিলেন, তাহাতে পূর্ব্বকালের

---

(২১) "Kamata was invaded, about 1498 A. D. by Hasain Shah and legends state that the town was destroyed and Nilamba, the last Kamata Rajah, was taken prisoner." G. H. B.

(২২) "The Kamata family was succeeded by the Koch dynasty··· Aurangzib's army under Mir Jumblah took Koch Bihar on the 19th December 1661." G. H. B.

(২৩) "The Zemindars (who are mostly Koits) furnish also 23,330 cavalry, 801, 158 infantry, 170 elephants, 4,260 cannon and 4,400 boats."
Gladwin's Ain Akbari vol. II.

(২৪) See Selections from Indian Records, edited by the Rev. Mr. Long.

জমিদারেরা কি ছিলেন একপ্রকার স্পষ্ট করিয়া লেখা আছে। ঐ লেখার মর্ম্ম নিম্নে গৃহীত হইল। (২৫)

"উড়িষ্যা বন্দোবস্তের সময়ে আকবরের মন্ত্রিগণ সিংহাসনচ্যুত রাজবংশের প্রধান শাখাগুলির ভরণপোষণের ব্যবস্থা করা ন্যায় এবং রাজনীতির অনুমোদিত কার্য্য জ্ঞান করিলেন। তজ্জন্য বাস্তবিক উত্তরাধিকারী রামচন্দ্রদেবকে, জমিদার আখ্যা দিয়া, খোড়দা এবং তথা হইতে পুরীসন্নিহিত সাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত চারিটি পরগণা, জমিদারীস্বরূপ প্রদত্ত হইল, এবং এ নিমিত্ত খোড়দার রাজাদিগকে অদ্যাপি উড়িষ্যার জমিদার বলে। পূর্ব্বোক্ত আখ্যাসহকৃত রাজবংশের অপর এক ব্যক্তিকে কেল্লা আউলের জমিদারী দেওয়া হইল; এ ব্যক্তি তেলেঙ্গা মুকুন্দদেবের বংশীয় বলিয়া রাজ্যপ্রার্থী ছিল। কেল্লা পুটিয়া সারঙ্গগড় এবং দুই তিন পরগণার জমিদারী তৃতীয় একজনকে প্রদত্ত হয়।

"আকবর সাহের রাজত্বের দেড়শত বৎসর পর পর্য্যন্ত এই রাজবংশীয় ব্যক্তিবর্গ এবং পুরুষানুক্রমিক রাজকর্ম্মচারিগণ ব্যতীত আর কেহই কটকে জমীদার

---

(২৫) "At the settlement formed by the ministers of Akbar it was considered just and politic to make some provisions for the principal branches of the family of the dethroned Hindu Rajahs. To the actual heir, Ramchunder Deo, therefore, was assigned Khoordah and the four pergunnas extending from thence to the sea at Pooree as a Zemindaree, with the title of Zemindar, and the Rajahs of Khoordah have been in consequence down to the present day styled Zemindars of Orissa. The Zemindaree of Aul or Killa Aul on the eastern side of the district, was granted under the same title to another member of the Royal family who claimed the Raj as descended from the last dependent sovereign Teliga Mokoond Deb, and Killah Puttia Sarrungurh to a third, with the Zemindaree of two or three pergunnahs long since resumed.

"These descendants of the Royal family and Shewuks, or hereditary officers of state, were the only officially recognized Zemindars in Cuttack for a period of more than a century and a half after the reign of Akbar. Their situations answer to the sense in which the term Zemindar is used by Ferishteh, who invariably speaks of the "Rayan Zemindaran Dukhum," as powerful and formidable chiefs, commanding troops, and possessing forts like the Barons of the middle ages. They succeeded by inheritance, exercised powers of life and death within their lordships or jurisdictions, maintained forces proportioned to their means, and paid, if any thing only a light tribute, as their tenure was that of military service."

Stirling's Minute appended to Mr. Toynbee's History of Orissa.

বলিয়া রাজদ্বারে স্বীকৃত হইত না। ফেরেস্তা 'দক্ষিণের রায় ও জমীদারদিগকে' পরাক্রান্ত, সেনাবলবিশিষ্ট, এবং বহু দুর্গাধিকারী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, সেই ফেরেস্তা যে অর্থে জমীদার শব্দের প্রয়োগ করেন পূর্ব্বোল্লিখিত জমীদারদিগের পদ তদনুরূপ ছিল। উত্তরাধিকারের নিয়মানুসারে তাঁহারা বিষয় সম্পত্তি পাইতেন; আপন আপন প্রভুত্বাধীন স্থানে জীবন-মৃত্যু বিধানশক্তি ধারণ করিতেন; সাধ্যানুরূপ সৈন্য রাখিতেন; এবং যদি কিছু দিতে হইত, অতি সামান্য করই দিতেন।"

এ পর্য্যন্ত যাহা কিছু লিখিত হইল, তাহাতেই প্রতিপন্ন হইতেছে যে পূর্ব্বকালের জমীদারদিগের মধ্যে কেহ কেহ স্বাধীন ছিলেন, এবং কেহ বা বর্ত্তমান রাজপুতানার করদ রাজাদিগের ন্যায় ছিলেন। তাঁহাদিগের সৈন্য ছিল, গড় ছিল; এবং তাঁহারা স্বত্বাস্বত্বের বিচার করিতেন ও অপরাধের দণ্ড দিতেন। মুসলমানদিগের সময়ে বাঙ্গালাদেশের অধিকাংশ স্থলে হিন্দু জমীদার ছিল; সুতরাং প্রায় সর্ব্বত্রই শাস্ত্রের ব্যবস্থা ও হিন্দুসমাজ-প্রচলিত রীত্যনুসারে শাসনকার্য্য নির্ব্বাহিত হইত। রাজধানী সন্নিহিত স্থান ব্যতীত কোথাও মুসলমানরাজাদিগের সহিত প্রজাদিগের সাক্ষাৎসম্বন্ধ ছিল না।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা

পুরুবিক্রম নাটক। কলিকাতা বাল্মীকি যন্ত্রে শ্রীকালীকিঙ্কর চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত। শকাব্দা ১৭১৬। মূল্য ১৲ টাকা।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ মধ্যে সেকেন্দর সা (Alexander), পুরু (Porus), তক্ষশীল (Taxilus), এফেষ্টিয়ান (Hephostion) ইহারাই প্রধান; মহিলাগণের মধ্যে প্রধানা ঐলবিলা—কল্পপর্ব্বতের রাণী, এবং অম্বালিকা তক্ষশীলের ভগিনী।

মহাবীর সেকেন্দর সিন্ধুনদী পার হইয়া ভারত-বিজয়ে অগ্রসর হইতেছেন, বিতস্তা নদীতীরে শিবির সংস্থাপন করিয়াছেন। রাণী ঐলবিলা স্বদেশের উদ্ধারার্থ কৃতসংকল্পা। তিনি অবিবাহিতা, রূপ-গুণবতী। প্রচার করিয়াছেন যে, "যে কোন ক্ষত্রিয় রাজা স্বদেশের জন্য যবনদিগের সহিত যুদ্ধে সর্ব্বাপেক্ষা বীরত্ব প্রকাশ করিবেন, তিনিই তাঁহার পাণিগ্রহণ করিবেন।" মনে মনে পুরুরাজের শৌর্য্য-বীর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, এবং তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে পুরুরাজ বীরত্বে তদীয় প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবেন। পুরুরাজ এদিকে যথার্থই বীরপুরুষ ও ঐলবিলার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী। তক্ষশীলও ঐলবিলার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী—কিন্তু তক্ষশীল কাপুরুষ এবং স্বীয় ভগিনী অম্বালিকাকে সেকেন্দরে প্রদান পূর্ব্বক নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগ করিতে ইচ্ছুক। এদিকে অম্বালিকাও সেই অসদিচ্ছার প্রতিবন্ধকতাচরণ করিতে ইচ্ছা করেন না। অম্বালিকাকে সেকেন্দর পূর্ব্বে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন; অম্বালিকা এক্ষণে সেকেন্দরে অনুরক্তা। ভ্রাতা ভগিনী উভয়ে এইরূপ বন্দোবস্ত করিল যে, উভয়ে উভয়ের সাহায্য করিবে। কিন্তু ঐলবিলা তক্ষশীলকে ঘৃণা করেন এবং পুরুরাজে একান্ত অনুরাগিণী, সুতরাং ঐলবিলা ও পুরুরাজ মধ্যে প্রথমে মনোভঙ্গ সাধনার্থ ভ্রাতা ও ভগিনীতে ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল। এদিকে সেকেন্দর রাত্রির অন্ধকারে বিতস্তা পার হইয়া আসিলেন। পুরুরাজে ও সেকেন্দরে দ্বন্দ্ব যুদ্ধ হইল। একজন যবন সেনা অন্যায়

আক্রমণ করিয়া পুরুরাজকে আবাতিত করিল। পুরুরাজ বন্দী ও শায়িত। ষড়যন্ত্রের মন্ত্রণা কতক সিদ্ধ হইল। পুরু ঐলবিলার প্রণয়ে সন্দেহ করিতে লাগিলেন ও হঠাৎ তক্ষশীলকে বধ করিলেন। পরে সেকেন্দর পুরুর বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে মোচন করিলেন, অম্বালিকাকে গ্রহণ করিলেন না; অম্বালিকা স্বীয় পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ পুরু ও ঐলবিলার সন্দেহভঞ্জন পূর্ব্বক তাঁহাদের মিলন করিয়া দিলেন।

এই উপন্যাসে বৈচিত্র্য আছে। কিন্তু লেখার তাদৃশ বৈচিত্র্য নাই। সকলেই কাটা কাটা কথা কহে। লেখক যে কৃতবিদ্য ও নাটকের রীতিনীতি বিলক্ষণ জানেন তাহা গ্রন্থ পড়িলেই বোধ হয়। গ্রন্থখানি বীররসপ্রধান, এবং গ্রন্থে বীরোচিত বাক্যবিন্যাস বিস্তর আছে বটে, কিন্তু সকল স্থানেই যেন বীররসের খতিয়ান বলিয়া বোধ হয়। যেন সকল কথাতেই শুজরত ও মারফত লেখা আছে বলিয়া বোধ হয়। আন্তরিক ভাব বলিয়া বোধ হয় না। কে যেন বলিল, কে যেন শুনিল, কে যেন সেই কথাগুলি ছাপিয়াছে আর আমরা পড়িলাম। নহিলে অঙ্গ কণ্টকিত হইল না কেন? গ্রন্থের এই মর্ম্মভেদকতার অভাবে আমাদের দুঃখ হইয়াছে। পুরুবিক্রম সন্দর্শনে যে অন্তরাত্মা জানিল না তাহাতেই আমাদের দুঃখ হইয়াছে। যাহা হউক, এইরূপ কৃতবিদ্য এবং মার্জ্জিতরুচি মহাশয়গণ নাটক প্রণয়নের ভার গ্রহণ করেন, ইহা নিতান্ত বাঞ্ছনীয়। তাহা হইলে, নিতান্ত পক্ষে বাঙ্গালা নাটকের বর্ত্তমান অশ্লীলতা এবং কদর্য্যতা থাকিবে না।

কুলীন কন্যা, অথবা **কমলিনী।** শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্ত্তী প্রণীত। কলিকাতা। নং ১১ কলেজ স্কোয়ার রায় যন্ত্রে শ্রীবাবুরাম সরকার কর্ত্তৃক মুদ্রিত। মূল্য বার আনা মাত্র।

গ্রন্থকার শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্ত্তী, বঙ্গদর্শনের পাঠকবর্গের নিকট পরিচিত। গতবৎসর শ্রাবণমাসে আমরা তৎ-প্রণীত 'নন্দবংশোচ্ছেদ' নাটকের সমালোচনা করিয়াছিলাম; বৎসরান্তে আবার তিনি সাহিত্য-সংসারে দর্শন দান করিয়াছেন।

এই নাটকের উপন্যাস পৌরাণিকী ঘটনামূলক নহে। কুলীন কন্যা কমলিনী আধুনিকী, গল্পটিও সুতরাং আধুনিক। গল্পটি শুদ্ধ আধুনিক নহে, হাবড়ার ঈশ্বর নাপিতের মোকদ্দামামূলক। 'যে ভয়ে পলাও তুমি, সেই দেবী আমি।' এই সকল সামাজিক নাটককে আমরা ভয় করি; আর বঙ্গীয় কবিগণ আমাদিগকে জ্বালাতন করিবার জন্যই যেন, সামাজিক নাটকে দেশ প্লাবিত করিতেছেন। শ্রাবণ মাসে (স্বর্ণলতাকে) বিদায় দিয়াছি আবার শ্রাবণ শেষ না হইতেই 'কমলিনী' উপস্থিতা। আমরা গ্রন্থকারকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, বঙ্গীয় কুমারীরা কি

কমলিনীকে আদর্শ করিয়া নীতি শিক্ষা করিবে ? বাহকে শিবিকা লইয়া আসিয়া কমলিনীকে বলিল গ্রামান্তরে দিননাথের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইবে ; কমলিনী অমনি কাহাকেও কিছু না বলিয়া পিতা মাতার প্রীতি বিস্মৃত হইয়া, কুলমান ভয়ে জলাঞ্জলি দিয়া শিবিকারোহণ করিলেন ! এই উদাহরণ সংক্রামক হইলে বাঙ্গালার উন্নতি হইবে, যাঁহারা এরূপ মনে করেন, তাঁহাদিগকে হিন্দু সমাজের সংস্কারক বলিয়া আমরা কখনই এ সমাজের কলঙ্ক করিব না। এইরূপ আচরণের জন্যই আমরা কমলিনীর দুঃখে দুঃখিত হই নাই। কমলিনী যখন কালীবাড়ীতে বসিয়া আক্ষেপ করিয়া বলিলেন :—

"মা দুর্গে কি আমায় দয়া করবেন ? আমি যে মহাপাতকিনী, আমি যে কুল-কলঙ্কিনী, মা ! আমি যে মা বাপের মনে ব্যথা দিয়ে এসেছি !" তখন আমরা মনে মনে বলিলাম, "তোমার জন্য দুঃখ করিব কি ? তুমি মেয়ে ভাল নও, এখন আপনার পাপের ফল আপনি ভোগ কর।" কিন্তু ভৈরবেশ্বরী পূজকের পত্নী মনোরমা নিকটে ছিলেন, তিনি বোধ হয়, আমাদের মত সামাজিক নাটক পড়িয়া পড়িয়া হৃদয় কঠিন করেন নাই, সুতরাং তিনি সান্ত্বনা বাক্যে বলিলেন :

"আর কেঁদ না মা চুপ কর, তুমি ত আর আপনার ইচ্ছায় আসনি তবে তোমার দোষ কি ? চুপ্ কর।" কিন্তু কমলিনীর মন ইহাতে প্রবোধ মানিল না ; কমলিনী হৃদয়োচ্ছ্বাসে বলিয়া উঠিলেন :

"মা, আমার দোষ নয়, অমন কথা বোল না, আমি যে দিদুর কাছে যাব বলে, ইচ্ছা করেই পাল্‌কিতে উঠেছিলাম, আমার পাপের যে সীমা নাই মা, আঃ মাগো কোথা রৈলে, এজন্মে আর কি তোমার পা দুখানি দেখতে পাব, মা ?" এত দুঃখ দেখিয়া এত আক্ষেপেও আমাদের চক্ষে জল আসিল না।

কুলীনকুমারীই হউন আর বংশজ দুহিতাই হউন, যিনি এখনকার 'পবিত্র প্রণয়ের' অনুরোধে কুলত্যাগ করেন, তিনি বিলাতের সিলিং নবেলিষ্টগণের কাছে সুখ্যাতি পাইতে পারেন ; আমরা তাঁহার প্রশংসা করিব না।

আর নাটকের নায়ক দিননাথ আগামী বর্ষে আইনে পরীক্ষা দিবেন, তাঁহাকেও দুটা কথা বলি।

দিননাথ (স্বগত)। "আমাদের প্রণয় অপবিত্র নয়—লালসাসম্ভূত অচির-জাতও নয়, তবে আমি কমলকে কেন না বিবাহ করিব ?" ইত্যাদি।

দিননাথের এ যুক্তিতে আমরা অনুমত নহি। আবেগসঙ্কুলণ অপরিণত বয়সে কি কেহ বলিতে পারে, কোন্ চিত্ত-চাঞ্চল্যটি লালসাসম্ভূত অচিরজাত,

আর কোন্‌টি স্বার্থসাধন শূন্য ? কেহ বলিতে পারুক আর নাই পারুক আমরা বেশ বলিতে পারি, দিননাথ তাহা বলিতে পারেন না। দিননাথ নিতান্ত অপরিপক্ক দিননাথ বালক বলিলেই হয় ; যে দিননাথ প্রণয়িনী বিচ্ছেদে একেবারে জ্ঞানশূন্য হয়েন, যাঁহার তরল বুদ্ধি লোপ পায়, বাতুলতা আক্রমণ করে সে দিননাথ কি আপনার চিত্তাবেগ পরীক্ষা করিতে পারে ? কখনই না। দিননাথ বঙ্গীয় যুবকের আদর্শ নহে। কমলিনী কুমারীবর্গের অনুকরণীয়া নহেন। নাটকখানিতে বিলাতী সভ্যতা প্রবিষ্ট হইয়াছে, নাটকখানি ভাল নহে।

পঞ্চম প্রস্তাব—রাজন্যবর্গ

দেশাধিপতিগণ দেববংশজ, দেবাবতার বা দেবদত্ত ক্ষমতাযুক্ত এবং তাঁহারাই নিয়ন্তা ও তাঁহাদের বাক্যই নিয়ম, এই বিশ্বাস ও বিষয় সম্বন্ধে খ্রীষ্টীয় শকের মধ্যম কালীয় ইউরোপখণ্ডের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে, দেখা যাইবে যে পূর্ব্বাপর উহা প্রজা সাধারণের কিরূপ হৃদয়ঙ্গম হইয়াছিল এবং রাজারা উহা লোক-হৃদয়ে প্রবেশ করাইবার জন্য কিরূপ চেষ্টা পাইয়াছিলেন। ইউরোপীয় আধুনিক ঐতিহাসিক সময়ের প্রারম্ভে দেখা যায় যে জর্ম্মণির জঙ্গলে কতকগুলি বর্ব্বরজাতি বাস করিতেছে। তাহারা অস্থির, দৃঢ়কায়, সতত দ্বন্দ্বপ্রিয় এবং দস্যুবৃত্তি লালসায় একজনের আনুগত্য স্বীকার করিতেছে। যাহার অনুগত হইতেছে, তিনি প্রথমতঃ আধিপত্য হেতু, দ্বিতীয়তঃ ওডিন (বুধ) বা তীস্কো ইত্যাদি দেববংশজাতত্ব হেতু তাহাদিগের নিকট ভক্তি উপহার গ্রহণ করিতেছেন। অতএব জর্ম্মণির জঙ্গলেই ইউরোপীয় রাজদেবত্বভাবের সূত্রপাত হইয়াছিল, কিন্তু অতি সঙ্কুচিতভাবে। পরে ইহারা যখন দস্যুবৃত্তির অনুসরণক্রমে ধ্বংসপ্রায় রোমকভূমে অবতীর্ণ হইল এবং খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক আধিপত্য বিস্তার করিতে লাগিল, তখন খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মগ্রন্থের মর্ম্মানুসারে রাজারা আপন আপন ক্ষমতায় দেবত্বভাব সংযোজিত করিতে ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। এই ব্যস্ততার সূত্রপাত মিরোবিঞ্জীয় রাজাদিগের আমল হইতে হয়। কিন্তু অপরিচিত ভূভাগে, অপরিচিত ধর্ম্মে পরিণত সহচর বর্ব্বরেরা সে মর্ম্মে প্রবেশ করিতে অক্ষমতাবশতঃ, এবং ওডিন প্রভৃতি পূর্ব্ব পূর্ব্ব দেবশ্রেণীতে ভক্তিচ্যুত হওয়ায়, এখন রাজাকে কেবল দস্যুবৃত্তির অধিনায়কস্বরূপ দেখিতে লাগিল। সুতরাং মিরোবিঞ্জীয়দিগের চেষ্টা ফলবতী হইতে পায় নাই। কার্লোবিঞ্জীয় রাজাদিগের সময়েও এই চেষ্টা আরম্ভ হয়, কিন্তু নূতন আকারে। এবং শেও পেপিন হর্ষ্টাল এবং চার্লস মার্টেল পর্য্যন্ত প্রজাগণের বিশ্বাসে রাজা কেবল বলাধিনায়ক মাত্র ছিলেন।

তৎপরে পেপিন ঐ দেবত্বভাবলাভের জন্য কত চেষ্টা করিয়াছিলেন, এবং সার্লেমান কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, তাহা ইউরোপের মধ্যমকালীয় ইতিহাসে অল্পজ্ঞান যুক্ত ব্যক্তিও জ্ঞাত আছেন বোধ হয়। খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষভাগে এই ক্ষণপ্রতিষ্টিত দেবত্বভাবের উপর ভক্তির অনেক হ্রাস হওয়াতে, রাজতন্ত্র ছন্নছাড়া হইয়া যায় এবং তদ্বিনিময়ে ফিউডাল প্রথা পুষ্ট হইতে আরম্ভ হয়। এই ফিউডাল প্রথাই ইউরোপের উন্নতিপথের পথদর্শক স্বরূপ।

রাজার দেবত্বভাবে বিশ্বাস প্রজাদিগের অত্যাচার সহিষ্ণুতার এবং হেয় প্রকৃতি প্রাপ্ত হওয়ার এক প্রধানতম কারণ; এবং সেই দেবত্বে বিশ্বাসাবিশ্বাসের প্রকার এবং তারতম্য প্রজাবর্গের চিত্তবৃত্তির এবং অবস্থার উন্নতি বা অবনতির আংশিক পরিচায়ক, ও ভাবী উন্নতি বা অবনতির আংশিক ভাবে ভবিষ্যৎজ্ঞাপক। এই নিমিত্ত এতদ্বিষয় কিঞ্চিৎ সবিস্তারে আলোচিত হইতেছে। ভারতে বৈদিক সময় হইতে রাজারা দেবাবতার। মানব ধর্ম্মশাস্ত্রকারের মতে—

“ইন্দ্রানিল যমার্কাণামগ্নেশ্চ বরুণস্য চ।
চন্দ্রবিত্তেশয়োশ্চৈব মাত্রা নির্হৃত্য শাশ্বতী ॥৪।
বালোহপি নাবমন্তব্যো মনুষ্য ইতি ভূমিপঃ।
মহতীদেবতাহ্যেষা নররূপেণ তিষ্ঠতি ॥৮।”

মনু ৭ম অ।

ইন্দ্র, অনিল, যম, অর্ক, অগ্নি, বরুণ, চন্দ্র এবং কুবের ইহাদিগের সারভূত অংশ লইয়া রাজার সৃষ্টি হইয়াছে। রাজা বালক হইলেও সাধারণ মনুষ্য জ্ঞানে তাঁহাকে অসম্মান করিবে না। যেহেতু তিনি মহাদেবতা নররূপে অবস্থান করিতেছেন।—

বাল্মীকির সাময়িক—

“পূজনীয়শ্চ মান্যশ্চ রাজা দণ্ডধরো গুরুঃ।
ইন্দ্রস্যেব চতুর্ভাগঃ” ইত্যাদি।

অস কাণ্ড—প্রথম সর্গ।

;—যেহেতু রাজা ইন্দ্রের চতুর্থাংশের অবতার, এ নিমিত্ত তিনি পূজনীয়, মাননীয়, দণ্ডধর এবং গুরু। ইত্যাদি।—

পুনশ্চ আরণ্যকাণ্ডে চত্বারিংশ সর্গে, রাবণকে সীতাহরণে উদ্যত দেখিয়া, তাহা হইতে নিবারণ করিবার নিমিত্ত মারীচ কতকগুলি প্রবোধবাক্য কহায়, রাবণ ক্রুদ্ধ হইয়া যাহা বলিয়াছিল তাহার সারমর্ম্ম এই।—“আমি তোমাকে আমার বাক্যের দোষগুণ বিচার করিতে বলি নাই, কেবল তোমার সাহায্য চাহিয়াছিলাম, অতএব আমার প্রতি তোমার এতগুলি বাক্য প্রয়োগে ধৃষ্টতা প্রকাশ করা হইয়াছে

এবং অতি অন্যায় হইয়াছে, যেহেতু রাজা সর্ব্বসময়ে ও সর্ব্ব অবস্থাতেই পূজনীয়, কারণ—

"পঞ্চরূপাণি রাজানো ধারয়ন্ত্যমিতৌজসঃ ।
অগ্নেরিন্দ্রস্য সোমস্য যমস্য বরুণস্য চ ॥"
১২।৩।৪০

রাবণের বাক্য দ্বারা এখানে ইহাও প্রতীতি হইতেছে যে, এই দেবত্বরূপ বিশ্বাসের আশ্রয়ে রাজারা কতদূর স্পর্দ্ধাযুক্ত হইতে পারেন। ইতিবৃত্তও সাক্ষ্য দিতেছে যে, যেখানে এই বিশ্বাস দৃঢ় প্রবল, ও প্রজাকর্ত্তৃক বাধা দান শিথিল হইয়া আইসে, সেইখানেই রাজা দারুণ দাম্ভিক হইয়া উঠেন। আর্য্যগণের দীর্ঘাধিপত্যের মধ্যে ভারতের দ্বিতীয় জেমসের ন্যায় একইভাবে উৎপন্ন-স্বভাব-বিশিষ্ট অনেক রাজা হইয়াছিলেন তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু জেমসকে দূরীকারক প্রজার ন্যায় প্রজাও ভারতে ছিল না এমন নহে। আক্ষেপের বিষয় এই যে, ভারতীয়েরা দূরীকরণের ফলের তেমন মর্ম্মজ্ঞ ছিলেন না।—অত্যাচারের নিমিত্ত একজন রাজ্যবিচ্যুত হইলে, তাহার উত্তরাধিকারী কিঞ্চিৎ সদ্গুণ দর্শাইলেই, প্রজাবর্গ তাঁহাতে তাহাদের কল্পনায়ত্ত রাজদেবত্বভাবের পরিচয় পাইল জ্ঞান করিয়া, ভবিষ্যতের পক্ষে অদূরদর্শিতা ভাবে সন্দেহবিহীন হইয়া, পূর্ব্ববৎ শান্ত এবং নিশ্চেষ্ট ভাব অবলম্বন করিত!

বাল্মীকির সাময়িক আর্য্যেরা কথিত মত, নিরন্তর অত্যাচার সহ্য করিতেন না। এবং রাজার দেবত্ব ভাব, আর্য্যাধিপত্যের অন্যান্য সময়ের সহ তুলনে অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ ভাবে তাঁহাদের মনে অবস্থান করিত। রাজার ঐ দেবত্ব কিরূপ বন্ধন বিমুক্ত হইলে এ সময়ে অনর্থ উৎপত্তি হইত তাহা দেখা কর্ত্তব্য। রাবণ দাম্ভিকতা প্রকাশ করিলে, মারীচ তাহার প্রতি কহিতেছে, যেহেতু "রাজমূলোহি ধর্ম্মশ্চ যশশ্চ," সুতরাং যাহাতে তিনি সুপথভ্রষ্ট না হয়েন এজন্য সকলে তাঁহাকে সাবধান করিবে। রাজা স্বেচ্ছাচারী হইয়া অসৎপথে পদার্পণ করিলে, সৎস্বভাব মন্ত্রীরা তাঁহাকে রক্ষা করিবেন, কারণ তাঁহার মতিচ্ছন্ন ঘটিলে সর্ব্বসাধারণ দুর্দ্দশাপন্ন হইতে পারেন। যে রাজা অতি উগ্রস্বভাব, অবিনীত ও প্রতিকূল, তিনি রাজ্যশাসনে অক্ষম। এবং যিনি অসৎ মন্ত্রীর সহ রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করেন তিনি বিনষ্ট হয়েন। (১) পুনশ্চ—

"তীক্ষ্ণমপ্রদাতারং প্রমত্তং গর্ব্বিতং শঠম্।
বাসনে নাভিধাবন্তি সর্ব্বভূতানি পার্থিবম্ ॥ ১৫

---

(১) কিরূপ কার্য্যে রাজার দেবত্ব দূর হয়, এবং রাজা কিরূপ শাস্তির যোগ্য বা বশবর্ত্তী হইতে পারেন, তৎসম্বন্ধে মনুর মত সংহিতার সপ্তম অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

অভিমানিনমগ্রাহ্যমাত্মসম্ভাবিতং নরম্ ।
ক্রোধনং ব্যসনে হন্তি স্বজনোঽপি নরাধিপম্ ॥" ১৬৬৪১

তীক্ষ্ণ অর্থাৎ অমাত্যাদি সকলের প্রতি উগ্রস্বভাব, কৃপণ, প্রমত্ত, গর্ব্বিত ও শঠ রাজা বিপদে পতিত হইলেও কেহ তাহার সহায়তায় উদ্যত হয় না। অভিমানী, অগ্রাহ্য এবং আপনাতেই সকলগুণের সম্ভব এরূপ ভাবযুক্ত এবং যিনি নিতান্ত ক্রুদ্ধ, বিপদে স্বজনেও তাঁহার সংহার করিয়া থাকে।—ইত্যাদি।

যথায় রাজদেবত্বে বিশ্বাস, যথায় রাজতন্ত্র শাসনের উপর প্রকৃতিবর্গের আস্থা, তথায় রাজাদের শিক্ষা কিরূপ হওয়া উচিত, এবিষয়ে কাহার কিরূপ মত তাহা বলিতে পারি না। ব্লাডিমীর মনোমেকস মৃত্যুকালীন পুত্রগণকে উপদেশ দিয়াছিলেন "ব্রত, উপবাস, মঠাশ্রম প্রভৃতি দ্বারা রাজা স্মরণীয় হয়েন না, তাহার উপায় কেবল কার্য্য।" এ উপদেশের সফলতা যে শিক্ষার উপর নির্ভর করে তাহার সন্দেহ নাই।

বৃটনদ্বীপ যখন উন্নতির পথস্পর্শ করিতে অগ্রসর হইয়াছে, যখন তাহার জনৈক অধীশ্বর সমবেত প্রজাগণের মধ্যে একমাত্র তিনি নাম স্বাক্ষরে সক্ষম বলিয়া পাণ্ডিত্যাভিমান করিতেছেন, ভারত তখন পার্থিব গৌরবের শেষ সীমা অবলোকন করিয়া অধঃপতিত হইয়াছে। সেখান হইতে বাল্মীকির সময় অনেক দূর, অনেক পুরাতন; রোম তখন গর্ভশয্যাশায়ী, গ্রীকেরা তখন কি করিতেছিল তাহা স্মরণ হয় না। তখন ভারতের রাজন্যবর্গ কি করিতেন? অপরিসীম ক্ষমতা যাঁহাদের হস্তে ন্যস্ত, যাঁহারা দেবাবতার, তাঁহারা কিরূপ গুণবান্ হইলে লোকের মনঃপূত হইত? অন্ততঃ লোকে সম্ভাবিত বলিয়া কি প্রত্যাশা করিত?

"সর্ব্ববিদ্যাব্রতস্নাতো যথাবৎ সাঙ্গবেদবিৎ ॥" ২।১।২০

এই রাজাদিগের বিদ্যাবত্তা, এই রাজাদিগের গুণবত্তা। সর্ব্ববিদ্যার ভাব সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করা সাধ্যাতীত। এ কালের সর্ব্ববিদ্যার ভাব সম্যক্ প্রকারে হউক বা আংশিকই হউক, তৃতীয় প্রস্তাবে আলোচিত হইয়াছে। তারা, বালীর নিকট রামের গুণবর্ণনস্থলে কহিতেছেন,

"আর্ত্তানাং সংশ্রয়শ্চৈব যশসশ্চৈকভাজনঃ।
জ্ঞান বিজ্ঞান সম্পন্নো নিদেশে নিরতঃ পিতুঃ ॥
ধাতূনামিব শৈলেন্দ্রো গুণানামাকরো মহান্।" ৪।১৫

—বিপন্নের গতি, এক মাত্র যশের ভাজন, জ্ঞান ও বিজ্ঞান সম্পন্ন এবং পিতৃআজ্ঞার বশবর্ত্তী, হিমালয় যেরূপ সমস্ত ধাতুর আকর, তিনিও তদ্রূপ গুণসমূহের আকর স্থান।

পুনশ্চ দশরথের পুত্রবর্গ শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া কিরূপ গুণসম্পন্ন হইয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে এরূপ কথিত হইয়াছে।

"সর্ব্বে বেদবিদঃ শূরাঃ সর্ব্বে লোকহিতে রতাঃ ॥ ২৫
সর্ব্বে জ্ঞানোপসম্পন্নাঃ সর্ব্বে সমুদিতাগুণৈঃ।
তেষামপি মহাতেজা রামঃ সত্যপরাক্রমঃ ॥ ২৬
ইষ্টঃ সর্ব্বস্য লোকস্য শশাঙ্ক ইব নির্ম্মলঃ।
গজস্কন্ধেঽশ্বপৃষ্ঠে চ রথচর্য্যাসু সম্মতঃ ॥ ২৭
ধনুর্ব্বেদে চ নিরতঃ পিতুঃ শুশ্রূষণে রতঃ।" ১।১৮

—সকলেই বেদবিদ্ শূর এবং লোকহিতে রত ও জ্ঞান এবং গুণসম্পন্ন হইয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে রাম সত্য পরাক্রম মহাতেজোবন্ত এবং নির্ম্মল শশাঙ্কের ন্যায় সর্ব্বজন মনোরঞ্জক হইয়াছিলেন। তিনি গজস্কন্ধে ও অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণক্ষম এবং রথচর্য্যায় ও ধনুর্ব্বেদে পারদর্শী ও পিতৃসেবা পরায়ণ হইয়াছিলেন।—

পুনশ্চ—

"শীলবৃদ্ধৈর্জ্ঞানবৃদ্ধৈর্বয়োবৃদ্ধৈশ্চ সজ্জনৈঃ।
কথয়ন্নাস্ত বৈ নিত্যমস্ত্রযোগ্যান্তরেষ্বপি ॥ ১২
শ্রেষ্ঠশাস্ত্রসমূহেষু প্রাপ্তোব্যামিশ্রকেষু চ।
অর্থধর্ম্মৌ চ সংগৃহ্য সুখতন্ত্রো ন চালসঃ ॥ ২৭
বৈহারিকাণাং শিল্পানাং বিজ্ঞাতার্থ বিভাগবিৎ।
আরোহে বিনয়ে চৈব যুক্তো বারণ বাজিনাম্ ॥ ২৮
ধনুর্ব্বেদবিদাং শ্রেষ্ঠো লোকেঽতিরথ সম্মতঃ।
অভিযাতা প্রহর্ত্তাচ সেনানায় বিশারদঃ ॥" ২৯।২।১

—অস্ত্রাভ্যাস কালীন অবসর যাহা পায়েন, তাহাও বৃথা নষ্ট না করিয়া শীলবৃদ্ধ, জ্ঞানবৃদ্ধ, ও বয়োবৃদ্ধ এরূপ সজ্জনগণের সহিত সদালাপ করিয়া থাকেন। শ্রেষ্ঠ শাস্ত্র সমূহ ও প্রাকৃতাদি ভাষা মিশ্রিত নাটকাদিতে পারদর্শী। তিনি অনলস হইয়া অর্থ ও ধর্ম্মের সংগ্রহ করিয়া অর্থাৎ সংগ্রহ কার্য্যের সহ অবিরোধভাবে সুখকামনা করিয়া থাকেন। বিহারকালীন শিল্প সমস্ত অর্থাৎ গীতবাদ্য চিত্র কর্ম্মাদিতে এবং অর্থবিদ্যায় সুপটু। হস্তী এবং অশ্বে আরোহণ ও তাহাদিগকে শিক্ষাদান কার্য্যে পারগ। ধনুর্ব্বিদ্‌দিগের শ্রেষ্ঠ ও লোকে অতিরথ বলিয়া [illegible]। বিপক্ষ সৈন্যাভিমুখে গমন, সংহারকরণ এবং সৈন্য সমাবেশ কার্য্যে পারদর্শী।—

রাজাদিগের প্রথম রাজকার্য্যে প্রবেশ সময় কিরূপ শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া কিরূপ উপদেশে উপদিষ্ট হইয়া প্রবেশ করিতে হয়, তৎসম্বন্ধে রামের যৌবরাজ্যে

অভিষেক প্রস্তাবে দশরথ কর্ত্তৃক রামের প্রতি যে উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

> “ভূয়োবিনয়মাস্থায় ভব নিত্যং জিতেন্দ্রিয়ঃ ।৪২
> কামক্রোধসমুত্থানি ত্যজেথা ব্যসনানিচ ।
> পরোক্ষয়া বর্ত্তমানো বৃত্ত্যা প্রত্যক্ষয়া তথা ॥৪৩
> অমাত্য প্রকৃতীঃ সর্ব্বাঃ প্রজাশ্চৈবানুরঞ্জয় ।
> কোষাগারায়ুধাগারৈঃ কৃত্বা সন্নিচয়ান্ বহূন্ ॥৪৪
> ইষ্টানুরক্তঃপ্রকৃতির্যঃ পালয়তি মেদিনীম্ ।
> তস্য নন্দন্তি মিত্রাণি লব্ধামৃতমিবামরাঃ ।”৪৫

—নিরন্তর সর্ব্বতোভাবে বিনয়ী এবং জিতেন্দ্রিয় হইবে। কামক্রোধসহচর ব্যসন সমুদায় পরিত্যাগ করিবে। পরোক্ষাপরোক্ষ অবলম্বন পূর্ব্বক কোষাগার ও আয়ুধাগার পূর্ণ করিয়া অমাত্যবর্গ এবং প্রজাবর্গের প্রিয় হইবে ও চিত্ত-রঞ্জন করিবে। যিনি এরূপ ইষ্টানুরক্তপ্রকৃতি হইয়া রাজ্যপালন করেন, তাঁহার মিত্রবর্গ অমরগণের অমৃতলাভের ন্যায় আনন্দলাভ করেন।—(২)

বাল্মীকির বর্ণনায় রামের তাৎকালিক চিন্তায়ত্ত রাজগুণোৎকর্ষের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। রাবণ তেমনই রাজদোষবিশিষ্ট। বোধ হয় যে কিছু উৎকৃষ্ট রাজগুণ বাল্মীকি মনে ধারণা করিতে পারিয়াছিলেন তাহা রামে আরোপ করিয়াছেন, আবার তেমনি যে কিছু রাজদোষ, তাহা রাবণে আরোপিত হইয়াছে। এমন্ স্থলে রাবণের গুণভাগ আলোচনা করিয়া কথিত রামগুণের পার্শ্বে স্থাপিত করিলে, প্রকৃতভাব উপলব্ধি করা সহজ হইয়া আইসে। তৃতীয় প্রস্তাবে প্রদর্শিত হইয়াছে যে এই সময়ে সংস্কৃত মৃত হইয়া শিক্ষিত ভাষায় পরিণত হইয়াছে, সুতরাং শিক্ষা ভিন্ন সে ভাষায় প্রবেশাধিকার নাই এবং বেদাঙ্গ অধ্যয়ন ব্যতীত বেদবিদ্যায় অধিকার হয় না। রামায়ণের স্থানান্তরে দেখা যায়—

> “যদিবাচং বদিষ্যামি দ্বিজাতিরিব সংস্কৃতাম্ ।
> সেয়মালক্ষ্য রূপঞ্চ জানকী ভাষিতঞ্চ মে ।
> রাবণং মন্যমানা মাং পুনস্ত্রাসং গমিষ্যতি ।” ৫।২৯

হনুমান্ অশোকবনে জানকীকে দেখিতে পাইয়া কিরূপে তাঁহার সম্ভাষ করিবেন, তাহা মনে মনে চিন্তা করিতেছেন যে—যদি আমি দ্বিজাতিগণের ন্যায় সং[illegible]ক্য কহি, তাহা হইলে আমার (অনার্য্যজাতিত্ব হেতু) এই রূপে, এরূপ

---

(২) এই প্রস্তাবেতে উদ্ধৃত এই অংশ, ইহার পূর্ব্বগত ও পরস্থিত অনেক উদ্ধৃত অংশ অবিকল শ্লোকানুযায়ী অনুবাদ না করিয়া, পরিস্ফুট করণার্থে টীকাকারের ভাব অনেক স্থানে অনুবাদ মধ্যে গৃহীত হইয়াছে। এ নিমিত্ত মূলাংশ দীর্ঘ হইলেও উদ্ধৃত করা গেল।

উচ্চ দ্বিজাতি ভাষার সম্ভব দেখিয়া, জানকী আমাকে মায়ারূপধারী রাবণ মনে করিয়া ত্রাসযুক্ত হইতে পারেন।—পুনশ্চ পরিব্রাজকরূপী রাবণ সীতা হরণার্থে কুটীর দ্বারে উপনীত হইয়া—

"দৃষ্ট্বা কামশরাবিদ্ধো ব্রহ্মঘোষ মুদীরয়ন্।" ১৪।৩।৪৬
"ব্রহ্মঘোষং ব্রাহ্মণত্বপ্রত্যভিজ্ঞানায় বেদঘোষমুদীরয়ন্ কুর্ব্বন্।"—রামানুজ।

অতঃপর রাবণ অনেকক্ষণ ব্রাহ্মণ ভাবে সেই কুটীরে সীতার সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়াছে এবং তাহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়াই সীতার প্রতীত হইয়াছে। রাবণ অনার্য্য, রাবণ রাক্ষস, রাবণ দেবদ্বেষী, রাবণ বেদপ্রতিপাদক ধর্ম্মের বিরোধী, রাবণ যজ্ঞহন্তা, রাবণ পাপাবতার; তথাপি রাবণ যুদ্ধবিদ্যায় রামের সমকক্ষ, সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত, বেদবিদ্যায় অভ্যস্ত, এবং হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রের এরূপ গূঢ় মর্ম্মজ্ঞাত যে পরিব্রাজক রূপ ধরিয়া, যতক্ষণ না সীতাকে আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছিল, ততক্ষণ সীতাকে তাহার ব্রাহ্মণত্বে ভ্রান্তিময়ী করিয়া রাখিতে সক্ষম হইয়াছিল। এ সকলের দ্বারা সুন্দররূপে অনুভূত হয় যে সেই সময়ে রাজাদের মধ্যে কেহ কদাচ মূর্খ থাকিতেন। প্রায় সকলেই নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত হইতেন। (৩) যদি বা কাহার কাহার কার্য্য নীতি-শাস্ত্রানুসারী সর্ব্ব সময়ে না হইত, কিন্তু তাহা বলিয়াই যে সেই সকল শাস্ত্র সম্পূর্ণরূপে তাঁহাদের দর্শনবহির্ভূত ছিল এমন বিশ্বাস হয় না। বোধ হয়, সুযোগ পাইলে, তাঁহারা ইচ্ছা করিয়াই নীতিশাস্ত্রের বিধি অনেক সময়ে অবহেলা করিতেন। মনুষ্য প্রকৃতিই এইরূপ!

অতি আক্ষেপের বিষয় সন্দেহ নাই যে রাজারা সুশিক্ষিত হইয়াও সময়ে সময়ে গুরুতর পাপে লিপ্ত হইতেন। সুশিক্ষিত হইলেও নীতিপথে সামান্য ব্যতিক্রম ক্ষমাযোগ্য, লোকেও সচরাচর ক্ষমা করিয়া থাকে। যদিও সাধারণ একজন লোকের কথিত নীতিপথে সামান্য ব্যতিক্রমের ফল, এবং দেশের শুভাশুভ যাহার উপর নির্ভর করে এরূপ একজনের তথাবিধ ব্যতিক্রমের ফল, স্বতন্ত্র হইবার সম্ভব,—সামান্য এক ব্যক্তির দোষে সমাজ দৃশ্য বা অদৃশ্য ভাবে হউক, অনুভবনীয় বা অননুভবনীয় ভাবে হউক অতি অল্পই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে, কিন্তু একজন রাজ্যেশ্বরের সেই দোষে হয় ত সমাজ বিশৃঙ্খল হইয়া যায়;—তথাপি দূর ব্যবধানে স্থিত দর্শকের চক্ষে উভয়ই সমান ক্ষমাযোগ্য হইতে পারে, তাহার চক্ষে উভয়ই মনুষ্যপ্রকৃতি। কিন্তু যে দোষ অতি গুরুতর বলিয়া খ্যাত, যাহা কেবল স্বার্থে কৃত, যাহা অশিক্ষিত দুর্জ্জনেও কদাচ সম্ভব, এরূপ বা তথাবিধ দোষে শিক্ষিত লিপ্ত হইলে, তাহা অতি ঘৃণিত এবং কদাচ ক্ষমাযোগ্য নহে। শিক্ষিত ব্যক্তি যদি আবার এরূপ হয়েন,

---

৩। মনুসংহিতার সপ্তম অধ্যায়ে রাজাদিগের শিক্ষাবিষয় দ্রষ্টব্য।

যে যিনি মানবীয় সম্ভাবিত বা তদুচ্চতর অভাবকেও জয় করিয়া উপরে অবস্থিতি করেন, তাঁহাকে সেই সেই দোষ সম্ভাবিত হইলে পূর্ব্বকথিতাপেক্ষা বহুগুণে পাপী বলিয়া ধরা যায়। বাল্মীকির সময়ে এরূপ পাপের পাপী রাজপরিবারে বোধ হয় নিতান্ত কম ছিল না, যেহেতু ভ্রাতায় ভ্রাতায়, পিতাপুত্রে, বিরোধ বিদ্রোহ, তদানুষঙ্গিক ইত্যাদি পাপময় ব্যাপারের অনেক উল্লেখ দেখা যায়। অবশ্যই এ পাপ নানা কারণে উৎপত্তি লাভ করিত কিন্তু সেরূপ কারণ সাধারণ মানবমণ্ডলীতে প্রায় দুই একজন মধ্যস্থের করায়ত্ব।

এতদ্ব্যতীত দেখা যায় যে বাল্মীকি স্থানে স্থানে কহিয়াছেন, (৩।২ ইত্যাদি), রাজারা বঞ্চনাচতুর, বিশ্বাসের ভাণ করিয়া সুযোগমতে বিনাশ করে, অত্যন্ত কপটাচারী এবং বিশ্বাসঘাতক ইত্যাদি। ইহা অতি নীচপ্রকৃতির কার্য্য তাহার সন্দেহ নাই। আর্য্য রাজাদিগের এ স্বভাব অতি ঘৃণাস্পদ। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যে সময়ে ধর্ম্মের এবং ধর্ম্মযুদ্ধের এত গৌরব, শিক্ষার এত আদর, বীর্য্যবান্ ও তেজঃসম্পন্ন-ব্যক্তি সমাজের অলঙ্কার বলিয়া গণ্য, সেখানে এরূপ স্বভাব কেন এবং কেমন করিয়া প্রবেশ করিল? ওরূপ স্বভাব ত অধঃপতিত, নিরাশগ্রস্ত, পদে পদে দলিত, এমন সমাজেরই সম্পত্তি এবং অস্ত্র!—তাৎকালিক আর্য্যদিগের এরূপ স্বভাবযুক্ত হওয়ার অন্যান্য কারণ থাকিতে পারে, কিন্তু পরিদৃশ্যমান এই একটি কারণ পাওয়া যায়।—আর্য্যরাজাদিগের পরস্পরের মধ্যে অতি অল্পই কলহ হইত। ইহাদিগের সহিত নিরন্তর দ্বন্দ্বসূত্রে সম্বন্ধ কেবল অনার্য্যদিগের ছিল। তাহারা নিরক্ষর, উচ্চভাবরহিত-চিত্ত, তেজোদ্ভবন্যায় পথের তত্ত্বে অনভিজ্ঞ, সম্মুখ শত্রুতায় অপারগ, অথচ তাহাদের আর্য্যদিগের প্রতি শত্রুতা করিবার ইচ্ছা বিষম বলবতী। কাজে কাজেই ইহারা নিরন্তর কপটাচরণ করিয়া আর্য্যগণকে জ্বালাতন করিত। আর্য্যগণও যে বিষে বিষ, সেই বিষে নির্ব্বিষ করিতে গিয়া, সময়ে উহা তাঁহাদিগের স্বভাব স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

রাজকুমারেরা সিংহাসন আরোহণের পূর্ব্ব হইতে বিবাহ করিতে আরম্ভ করিতেন। (৪) ক্রমে একটি একটি করিয়া অনেকগুলি হইত। (৫) রাজারা ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই তিন জাতির কন্যাই (৬) বিবাহ করিতে পারিতেন।

---

(৪) বিবাহ কার্য্য কিরূপে সম্পন্ন হইত এবং তাহার আনুষঙ্গিক বিষয় সমস্ত, গৃহধর্ম্ম প্রস্তাবে কথিত হইবে।

(৫) রাজা প্রজা উভয়েরই মধ্যে বহুবিবাহ-প্রথা বৈদিক কাল হইতে প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে। ঋগ্বেদের ৭।১৮।২, ১।১০৫।৮ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

(৬) মনু ৩।১৩। ব্রাহ্মণের চারিজাতির কন্যাই বিবাহযোগ্য। ক্ষত্রিয়ের স্বজাতি হইতে নিম্ন তিনজাতি অর্থাৎ ক্ষত্রিয়া, বৈশ্য ও শূদ্রকন্যা বিবাহযোগ্য। বৈশ্যেরা ঐরূপ স্বায়

তাহাদিগকে যথাক্রমে মহিষী, বাবাতা, ও পরিবৃক্তি কহিত। সস্ত্রীক রাজকুমারেরা পৃথক্ রাজগৃহ আশ্রয় না করিয়া, রাজপুরমধ্যে পৃথক্ পৃথক্ অন্তঃপুরে বাস করিতেন। রামায়ণের এক স্থান হইতে অন্তঃপুরের বর্ণনা উদ্ধৃত করা যাইতেছে। তাহার দ্বারা উহার ভাব জ্ঞাপিত হইতে পারে। দশরথ কৈকেয়ীকে রামাভিষেকের সম্বাদ দিবার নিমিত্ত অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া (২।১০।১২-১৬) দেখিলেন, কুব্জ ও বামনাকার স্ত্রীলোক সকল উহার চতুর্দ্দিকে রহিয়াছে। শুক, ময়ূর, ক্রৌঞ্চ ও হংস কলরব করিতেছে। বাদ্য বাদিত হইতেছে। লতাগৃহ ও চিত্রিত গৃহসকল শোভা পাইতেছে। যাহা প্রতিনিয়ত পুষ্প ও ফল প্রদান করিয়া থাকে, এই বৃক্ষ এবং চম্পক ও অশোক সকল শ্রেণীবদ্ধ হইয়া আছে। গজদন্ত, স্বর্ণ ও রৌপ্যের বেদি ও আসন প্রস্তুত রহিয়াছে। দীর্ঘিকা সকল অতি সুন্দর। মহারাজ দশরথ সেই নানাবিধ অন্নপানে ও মহামূল্য অলঙ্কারে পরিপূর্ণ সুরপুরপ্রতিম সুসমৃদ্ধ স্বীয় অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া।” ইত্যাদি।—হে। (৭)

রাজারা বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হইলেই প্রায় পুত্রকে রাজ্যভার প্রদান করিয়া, ধর্ম্মকামনায় বনপ্রবেশ করিতেন। ২।২—রাজপুত্রদের অভিষেকের পূর্ব্বাহ্ণে অধীনস্থ ক্ষুদ্র রাজাদিগের, রাজ্যস্থ প্রধান প্রধান ব্যক্তির ও ব্রাহ্মণগণের সম্মতি গৃহীত হইত। কিন্তু পিতাপুত্রে, ভ্রাতায় ভ্রাতায় রাজ্য লইয়া বিবাদ বিসম্বাদের উল্লেখ থাকায়, অনুমান হয় যে ওরূপ সম্মতি গ্রহণ করা কেবল নামে মাত্র এবং ঐ সম্মতির উপর নূতন অভিষেক অল্পই নির্ভর করিত। যাহা হউক ক্ষীণতা সত্ত্বেও প্রথাটি প্রশংসনীয় এবং প্রার্থনীয়। নানা কারণে উহার ধ্বংস না হইলে, সময়ে অনেক সুফল ফলিতে পারিত। বৃটনের “বিজ্ঞ” ইতি খ্যাত যে সমাজ, দিনামার রাজাদিগের নিরন্তর পদানত থাকিয়া, তাহাদের ভালমন্দ সকল বাক্যই অনুমোদন করিয়াছে, সময়ে তাহাই মহাসভা রূপে পরিণত হইয়া এরূপ প্রভাপান্বিত হয় যে, তাহার প্রতাপে তৃতীয় জর্জ্জ চোখের জলে ভাসিয়া হানোবরে যাইয়া শান্তিলাভ করিতে উৎসুক হয়েন।

হইতে নিম্নে দুই জাতির অর্থাৎ বৈশ্য ও শূদ্র কন্যা বিবাহ করিতে পারিত। শূদ্রের কেবল শূদ্র কন্যা বিবাহযোগ্যা। নীচজাতি আপনা হইতে উচ্চ জাতির কন্যা গ্রহণে অক্ষম। পুনশ্চ ঐতরেয় ব্রাহ্মণভাষ্যে “রাজ্ঞাংহি ত্রিবিধাঃ স্ত্রিয়ঃ। উত্তমমধ্যমাধমজাতীয়াঃ। তাসাং মধ্যে উত্তমজাতেঃ ক্ষত্রিয়ায়াঃ মহিষীতি নাম। মধ্যমজাতের্বৈশ্যায়াঃ বাবাতেতি। অধমজাতেঃ শূদ্রায়াঃ পরিবৃক্তিঃ।”

(৭) এই অংশ পণ্ডিত হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক অনুবাদিত। যথায় যথায় উক্ত পণ্ডিত কৃত অনুবাদ গৃহীত হইবে, তথায় তথায় তাহা জ্ঞাপনার্থে অনুবাদ ভাগের শেষে “হে” চিহ্ন দেওয়া থাকিবে।

অনন্তর অভিষেকযোগ্য রাজকুমার নিরূপিত হইলে, অভিষেকের যেরূপ আয়োজন হইত, তাহা নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে প্রতীত হইবে। ২।৩—"সুবর্ণ প্রভৃতি রত্ন সমুদায়, পূজার দ্রব্য, সর্ব্বৌষধি, শুক্লমাল্য, লাজ, পৃথক্ পৃথক্ পাত্রে মধু ও ঘৃত, দশাযুক্তবস্ত্র, রথ, সমস্ত অস্ত্র, চতুরঙ্গ বল, সুলক্ষণাক্রান্ত হস্তী, চামরদ্বয়, ধ্বজদণ্ড, পাণ্ডুবর্ণ ছত্র, শতসংখ্যক হেমময় অত্যুজ্জ্বল কুম্ভ, সুবর্ণশৃঙ্গসম্পন্ন বৃষভ, অখণ্ড ব্যাঘ্রচর্ম্ম এবং অন্যান্য যাহা কিছু আবশ্যক, তৎসমুদায়ই প্রাতে মহারাজার অগ্নিহোত্র গৃহে সংগ্রহ করিয়া রাখ। মাল্য, চন্দন ও সুগন্ধিধূপে রাজ-প্রাসাদ ও সমস্ত নগরের দ্বারদেশ সুশোভিত কর। বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণের অভিমতও পর্য্যাপ্ত হইতে পারে, এরূপ দধি ও ক্ষীরমিশ্রিত সুদৃশ্য ও সুসংস্কৃত অন্নসম্ভার, ঘৃত, লাজ ও প্রভূত দক্ষিণা প্রভাতে বিপ্রগণকে সমাদর পূর্ব্বক প্রদান করিও। কল্য সূর্য্যোদয় মাত্র স্বস্তিবাচন হইবে। এক্ষণে ব্রাহ্মণগণকে নিমন্ত্রণ ও আসন সকল প্রস্তুত কর। গায়িকা গণিকা সকল সুসজ্জিতা হইয়া প্রাসাদের দ্বিতীয় কক্ষে অবস্থান করুক। দেবতায়তন এবং চৈত্যসমুদয়ে অন্ন ও অন্যান্য ভক্ষদ্রব্য ও দক্ষিণার সহিত গন্ধপুষ্প প্রভৃতি পূজার উপকরণ দ্বারা দেবপূজা কর। বীরপুরুষেরা বেশভূষা করিয়া সুদীর্ঘ অসিচর্ম্ম ও ধনুর্দ্ধারণ পূর্ব্বক উৎসবময় অঙ্গনমধ্যে প্রবেশ করুক।"—হে।

তাহার পর অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হইলে, যেরূপ রাজদৃশ্যের আড়ম্বর হইত, তাহা অভিষেকের নির্দ্ধারিত দিনে রামের রাজভাব কিছুমাত্র না দেখিয়া, বিস্ময় বশতঃ সীতা রামের প্রতি যে প্রশ্নগুলি করিয়াছিলেন, তাহাতে উপলব্ধি হইবে। ২।২৬—"শতশলাকারচিত শ্বেতছত্রে তোমার এই সুকুমার মুখকমল কেন আবৃত নাই! শশাঙ্ক ও হংসের ন্যায় ধবল চামর যুগল লইয়া ভৃত্যেরা কি নিমিত্ত ইহা ব্যজন করিতেছে না! সূত, মাগধ ও বন্দিগণ প্রীতমনে মঙ্গল-গীত-গান করিয়া আজ কৈ তোমার স্তুতিবাদ করিল! বেদপারগ বিপ্রেরা স্নানান্তে কেন তোমার মস্তকে মধু ও দধি প্রদান করেন নাই! গ্রাম ও নগরের প্রজাবর্গ প্রধান প্রধান সমস্ত পারিষদ্ বেশভূষা করিয়া অভিষেকান্তে কি কারণে তোমার অনুসরণ করিলেন না! সর্ব্বোৎকৃষ্ট পুষ্পরথ চারিটি সুসজ্জিত বেগবান্ অশ্বে যোজিত হইয়া কি নিমিত্ত তোমার অগ্রে অগ্রে ধাবমান্ হইল না! মেঘের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ পর্ব্বতাকার সুদৃশ্য সুলক্ষণাক্রান্ত হস্তী কেন তোমার অগ্রে নাই! পরিচারকেরা সুবর্ণনির্ম্মিত ভদ্রাসন স্কন্ধে লইয়া কৈ তোমার অগ্রে আগমন করিল!"—হে

রাজাদিগের প্রাতঃকালে শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিবার পূর্ব্বে, কিরূপ আড়ম্বর হইত তাহা নিম্নোদ্ধৃত অংশদ্বারা প্রদর্শিত হইতেছে। ২।৬৫—"রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল। প্রাতঃকালে সুশিক্ষিত সূত, কুলপরিচয়দক্ষ মাগধ, তন্ত্রীমান্ নির্ণায়ক

গায়ক ও স্তুতিপাঠকগণ রাজভবনে আগমন করিল এবং স্ব স্ব প্রণালী অনুসারে উচ্চৈঃস্বরে রাজা দশরথকে আশীর্ব্বাদ ও স্তুতিবাদ করিয়া প্রাসাদ প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল। পাণিবাদকেরা ভূতপূর্ব্ব ভূপতিগণের অদ্ভুত কার্য্যসকল উল্লেখ করিয়া করতালি প্রদানে প্রবৃত্ত হইল। সেই করতালি-শব্দে বৃক্ষশাখায় ও পিঞ্জরে যেসকল বিহঙ্গ বাস করিতেছিল, তাহারা প্রতিবুদ্ধ হইয়া কোলাহল করিয়া উঠিল। পবিত্রস্থান ও তীর্থের নামকীর্ত্তন আরম্ভ হইল, বীণাধ্বনি হইতে লাগিল। বিশুদ্ধাচার সেবানিপুণ বহুসংখ্যক স্ত্রীলোক ও বর্ষবর প্রভৃতি পরিচারকগণ আগমন করিল। স্নান বিধানজ্ঞেরা যথাকালে স্বর্ণকলসে হরিচন্দনসুরভিত সলিল লইয়া উপস্থিত হইল। বহুসংখ্যক কুমারী ও সাধ্বী স্ত্রীরা মঙ্গলার্থ স্পর্শনীয় ধেনু, পানীয় গঙ্গোদক এবং পরিধেয়বস্ত্র ও আভরণ আনয়ন করিল। প্রাতঃকালে নৃপতির নিমিত্ত যে সমস্ত পদার্থ আহৃত হইল, তৎসমুদায়ই সুলক্ষণ, সুন্দর ও উৎকৃষ্টগুণসম্পন্ন; সকলে সেই সকল দ্রব্য লইয়া সূর্য্যোদয়-কাল পর্য্যন্ত রাজদর্শনার্থ উৎসুক হইয়া রহিল।"—রে।

অনন্তর রাজারা শয্যা হইতে উত্থান পূর্ব্বক, পূর্ব্বাহ্নিক কার্য্যসমুদায় সমাধা করিয়া মন্ত্রী ও অপরাপর অমাত্যবর্গ সহ রাজকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন। ১।৭—মন্ত্রী আটজন, (৮) ইহারা ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতীয়। এই অন্য জাতির মধ্যে শূদ্র স্থান পাইত কি না তাহা রামায়ণে ব্যক্ত নাই। (৯) কিন্তু ইহাদের যেরূপ গুণাবলি কথিত হইয়াছে, তাহা তৎসাময়িক কঠোর শাসনাধীন শূদ্রে সম্ভব নহে। স্থানান্তরে কথিত হইয়াছে হনুমান্ সুগ্রীবের মন্ত্রী, কিন্তু এ উভয়ই বানরজাতি, অনার্য্য, সুতরাং আর্য্যশাস্ত্রে অধিকার নাই, অথবা থাকিলেও বেদে কখনই ছিল না। কিন্তু হনুমান্ সুগ্রীবের আজ্ঞামত রামের নিকট দৌত্যকার্য্য সম্পাদন করিলে, রাম লক্ষ্মণের নিকট হনুমানের প্রশংসা করিয়া কহিতেছেন,

"নানৃগ্বেদবিনীতস্য নাযজুর্ব্বেদধারিণঃ।
নাসামবেদবিদুষঃ শক্যমেবং বিভাষিতুম্॥

---

(৮) "মৌলান্ শাস্ত্রবিদঃ শূরান্ লব্ধ লক্ষান্ কুলোদ্গতান্।
সচিবান্ সপ্তচাষ্টৌ বা প্রকুর্ব্বীত পরীক্ষিতান্॥" ৫৪

মনু ৭ অ।

রামায়ণের সাময়িক বন্দোবস্ত অধিক উন্নত বলিয়া বোধ হয়। মনু এই নিযুক্ত মন্ত্রীদিগকে ব্রাহ্মণের সহিত পরামর্শ করিতে বাধ্য করিয়াছেন মাত্র, কিন্তু রামায়ণে কথিত আটজন মন্ত্রী ব্যতীত নিযুক্ত ব্রাহ্মণ-মন্ত্রী এবং ঋত্বিক্ ছিলেন, ইঁহারা সকলে মিলিয়া কার্য্য করিতেন।

(৯) মনুসংহিতা সপ্তম অধ্যায়—মন্ত্রীদিগের সদ্বংশজাতত্বের উপর এত আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন যে, তাহাতে শূদ্রের কিনা উল্লেখই বহিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

নূনং ব্যাকরণং কৃৎস্নমনেন বহুধা শ্রুতম্।
বহুব্যাহরতানেন কিঞ্চিদপশব্দিতম্॥" ৪।৩

—ঋক্, যজুঃ ও সাম এই বেদত্রয় যাহার বিদিত নহে, সে এরূপ বাক্য বলিতে অশক্ত। ইনি নিশ্চয়ই পদার্থস্বরূপ নির্ণয়োপযোগী ন্যায়, সাহিত্য, ব্যাকরণ অনেকবার শ্রবণ করিয়া থাকিবেন, কারণ এতবাক্য কহিলেন, কিন্তু একটিও অপশব্দ ইঁহার মুখ হইতে নির্গত হইল না—

এখন দেখা যাইতেছে হনুমান্ অনার্য্য বানর হইলেও বেদবিদ্যা এবং ব্যাকরণ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। ইহার দ্বারা কি এরূপ বোধ হয় যে আর্য্যব্যতীত শূদ্র প্রভৃতি নীচ জাতিরাও মন্ত্রিত্ব কার্য্যদক্ষতার উপযোগী বেদ ও নীতিশাস্ত্রে শিক্ষিত হইতে পারিত, এবং তাহাদের সে শিক্ষা ফলে পরিণত হইত? বোধ হয় না। তবে কি চতুর্দ্দিকে জাতীয় শাসনে কঠোরতাসত্বেও বাল্মীকি ভ্রমপ্রমাদে পতিত হইয়াছেন? তাহাও নহে। উক্ত বাক্যদ্বারা মন্ত্রীদিগের বিদ্যাবত্তার কতক পরিমাণে পরিচয় পাওয়া যাইতেছে এই মাত্র, তদ্ব্যতীত আর কিছুই উপলব্ধি হয় না। তবে যে এরূপ বিদ্যাবত্তা অনার্য্য বানর হনুমানের প্রতি বাল্মীকি আরোপ করিয়াছেন, তাহা বোধ হয় হনুমান্ দেব অংশ, পবনপুত্র এবং নারায়ণরূপী রামের ভক্ত বলিয়া।

কথিত আটজন মন্ত্রীর সকলেই বীর পুরুষ, নানা শাস্ত্রবিদ্, দৃঢ়জ্ঞ, ইঙ্গিতজ্ঞ, হিতেরত, অর্থবিদ্, লোকপ্রিয়, যশস্বী এবং সুবক্তা। ইঁহারা যুক্তকরে রাজপার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিয়া যথাসম্ভব উপদেশ প্রদান করিতেন। তদ্ভিন্ন দুই জন মুখ্য ঋত্বিক এবং সাত জন ব্রাহ্মণ-মন্ত্রীও থাকিতেন এবং তাঁহারা রাজকার্য্যে পরামর্শ দান করিতেন। স্বদেশ এবং বিদেশবার্ত্তা জ্ঞাপনার্থে দূত নিয়োজিত থাকিত এবং শার্লেমানের সাময়িক প্রথার ন্যায় রাজকর্ম্মচারীদিগের কার্য্য গোপনে অনুসন্ধানের নিমিত্ত এবং প্রকাশ্যে পর্য্যবেক্ষণের নিমিত্ত গুপ্তচর ও চরসকল নিযুক্ত থাকিত। ৬।৬।১১, ২।৭৫।২৫ ইত্যাদি—

রাজারা প্রজাগণের নিকট ষষ্ঠাংশ (১০) কর গ্রহণ করিতেন। কোন কোন বিশেষ দ্রব্যের উপর ভিন্নহারে কর আদায় হইত অথবা সমস্ত বস্তুর উপরেই ষষ্ঠাংশ হারে কর আদায় হইত, ইহার কোন স্পষ্ট উল্লেখ নাই। সমস্ত অথবা যে বস্তুর উপরেই ষষ্ঠাংশ হারে কর গৃহীত হউক না কেন, উহা সেই সময় বিবেচনা

---

(১০) মনুর সঙ্গে সাদৃশ্য দেখা যাউক। সংহিতা ৭।১৩০—১৩২—অন্যান্য দ্রব্যের ষষ্ঠাংশ কর নির্ণয় করিয়া, কেবল পশু ও সুবর্ণলাভের উপর পঞ্চাশ ভাগের এক ভাগ, এবং কৃষিকর্ম্ম দ্বারা উৎপন্ন দ্রব্যের উপর তারতম্য বিবেচনা অনুসারে ছয় আট বা দ্বাদশ অংশের এক অংশ রাজা লইতেন।

করিলে, দুর্ব্বহ তাহার সন্দেহ নাই। কেহ কেহ কহেন যেখানেই করভার অধিক, সেইখানেই সমাজ সেই পরিমাণে উন্নত। এ কথা অন্য কোথাও খাটিলে খাটিতে পারে; কিন্তু পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা করিলে, বাল্মীকির সময়ে সমাজ এতদূর উন্নত হয় নাই, যে ষষ্ঠাংশ করভার অবলীলাক্রমে বহন করিতে সমর্থ। এরূপ সমাজে অধমশ্রেণী কিরূপ অবস্থায় কালযাপন করিত তাহা অনুমান করা সহজ। ফলতঃ সেই সময়ও এই করভার বিবেচনা করিলে, আর্য্যরাজারা সমাজের যে কিছু উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন তাহা সত্বেও তাঁহাদিগকে অবিবেচক বলা যাইতে পারে। যাহা হউক ভারত তবু আনন্দে কাল কাটাইয়াছে।

করাদান ও বাণিজ্যবিনিময় কিরূপ উপায়ে সাধিত হইত, তাহা যতদূর অবধারণ করিতে পারা যায়, তদালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে। গ্রীসীয় পুরাবৃত্তে দেখা যায় যে, স্পার্টা নামক বিখ্যাত সাধারণতন্ত্রে লৌহখণ্ড এতদর্থে ব্যবহৃত হইত। রোমরাজ্যে রাজা সর্বিয়স-তলিয়সের পূর্ব্বে তাম্রখণ্ড ব্যবহৃত হইত, তাঁহার সময় হইতে মুদ্রার প্রচলন আরম্ভ হয়। বৃটনদ্বীপে, নর্ম্মাণজাতীয় রাজা উইলিয়ম কর্ত্তৃক বৃটন অধিকৃত হওয়ার পূর্ব্বে, যে যাহা উৎপন্ন করিত সে সেই দ্রব্য দ্বারা রাজকর প্রদান করিত। অদ্যাপি অনেক অসভ্যস্থানে ঐ প্রথা প্রচলিত আছে। আমাদিগের ঘরের দ্বারে লুসাইজাতি গজদন্ত, শুষ্ক পশু, গয়াল প্রভৃতি গরুদ্বারা রাজকর প্রদান করিয়া থাকে। (১১) পাশ্চাত্য ভূভাগে ধাতুমুদ্রার প্রাচীনতম উল্লেখ বাইবেল-গ্রন্থে দেখা যায়। তথায় একস্থানে (১২) কথিত আছে যে আব্রাহাম ম্যকফিলার ভূমির মূল্যস্বরূপ এফ্রণকে চারিশত শেকল নামক ধাতুমুদ্রা প্রদান করিয়াছিলেন। উহা ঐ কালীয় বণিকদিগের মধ্যে প্রচলিত মুদ্রা ছিল। যদি বাইবেলের রচনার সময়ের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া, বাইবেলে কথিত

---

(১১) গত লুসাই-যুদ্ধে ধাতুমুদ্রা লইয়া কৌতুকাবহ ঘটনা হয়। দেবগিরি নামক স্থানের ওধারে যে সকল লুসাইজাতি বসতি করে, তাহারা তৎপূর্ব্বে কখনও টাকা দেখে নাই। তাহাদের নিকট হইতে পশু ও কুক্কুটের বিনিময়ে ইংরেজ পক্ষীয় লোকের দ্বারা একবার ধাতুমুদ্রা প্রদত্ত হওয়ায়, তাহারা সেই প্রথম টাকার মুখ দেখে, কিন্তু দেখিবামাত্র তাহার উপর এত মায়া বসে ও তাহা লাভের ইচ্ছা এত বলবতী হয় যে তখন এক একটি মুরগী এক টাকা করিয়া বিক্রয় করিতে আরম্ভ করে। ইহাতে বিরক্ত হইয়া শেষে কেহ কেহ ডবল পয়সায় পারা মাখাইয়া টাকা বলিয়া দিতে আরম্ভ করে। তাহারা তাহাও টাকা জ্ঞানে আনন্দে গ্রহণ করিত। ইহারা টাকা লইয়া তাহার চাকচিক্য হেতু গলায় গাঁথিয়া পরিত, তদ্ভিন্ন তাহার অন্যরূপ ব্যবহার তাহাদের সিদ্ধান্তে আসিত না।

(১২) Genesis XXIII.

মত আব্রাহামের সময়ও ঐ মুদ্রার প্রচলনকাল গ্রাহ্য করা যায়, তাহা হইলে ঐ মুদ্রা খৃষ্টের উনিশ শত বৎসর পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল। তৎপূর্ব্বে মুদ্রা প্রচলনের আর কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। কিন্তু এই মুদ্রার বিষয় ইহাও লিখিত আছে যে, আব্রাহাম যৎকালে এফ্রণকে চারি শত শেকল প্রদান করেন, উহা গণনায় নিস্পত্তি না হইয়া ওজনের দ্বারা প্রদত্ত হয়। এ নিমিত্ত বোধ হয় যে উহার প্রত্যেকের পরিমাণের উপর বড় বিশ্বাস না থাকায়, দানাদান কালীন ওজন-পদ্ধতি গৃহীত হইত। সুতারাং উহা কোন টাঁকশাল হইতে নির্দ্ধারিত পরিমাণ প্রাপ্ত হইয়া, ঐ পরিমাণ বরাবর রক্ষার্থে বিশেষ কোন উপায়যুক্ত হইয়া বাহির হইত না। এখন পৃথিবীর মধ্যে প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্বেদে এ বিষয়ের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় কি না তাহা দেখা কর্ত্তব্য। ঋগ্বেদের বহুস্থানে উল্লেখ আছে, একস্থান মাত্র উদ্ধৃত করা যাইতেছে। যথা, "দশোহিরণ্যপিণ্ডম্ দিবোদাসান্ অসানিষম্।"— ৬।৪৭।২৩। এই হিরণ্যপিণ্ড কিরূপ পরিমাণ বিশিষ্ট তাহা ঋগ্বেদ দ্বারা স্পষ্টরূপে জ্ঞাত হওয়া যায় না। অনুমান হয় যে উহা সাদৃশ্যে শেকলের সঙ্গে সমজাতীয় হইতে পারে, অর্থাৎ শেকল পাশ্চাত্য ভূমিতে যে ভাবে যে অবস্থায় চলিত, ভারতে হিরণ্যপিণ্ডের অবস্থা তদপেক্ষা উন্নত বা অবনত বলিয়া বোধ হয় না। তথা হইতে রামায়ণের সময় অবতারণ করিলে দেখা যায় যে এখন আর হিরণ্যপিণ্ডের ব্যবহার নাই, তৎপরিবর্ত্তে সুবর্ণ ও নিষ্ক প্রচলিত হইয়াছে। ইহাদের আকার প্রকার বা পরিমাণ (১৩) যদিও রামায়ণে নাই, এবং থাকিবারও কোন আবশ্যক ছিল না, তথাপি ইহাদের উল্লেখেই অনুমান হয় যে, ইহারা ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণ বিশিষ্ট; এবং সর্ব্বদা সেই পরিমাণ রক্ষা করিয়াছে, কারণ যেখানেই উহার দান আদান ক্রিয়া, তথায়ই গণনা দ্বারা সিদ্ধ হইয়াছে, ওজনের দ্বারা কুত্রাপি নহে। এখন জিজ্ঞাস্য যে ইহাদের পরিমাণ সর্ব্বদা কি উপায়ে রক্ষিত হইতে পারে?

১৩। সুবর্ণ ও নিষ্কের পরিমাণ মনুসংহিতায় এরূপ দেওয়া আছে—

সর্ষপাঃ ষট্ যবোমধ্যস্ত্রিযবন্ত্বেক কৃষ্ণলং।
পঞ্চকৃষ্ণলকো মাষস্তে সুবর্ণস্তু ষোড়শ॥" ১৩৪।
"চতুঃ সৌবর্ণিকোনিষ্কঃ।" ১৩৭। ৮ অ

অর্থাৎ

৬ সর্ষপ = = ১ যবোমধ্য।
৩ যবোমধ্য = = ১ কৃষ্ণল।
৫ কৃষ্ণল = = ১ মাষা।
১৬ মাষা = = ১ সুবর্ণ।
৪ সুবর্ণ = = ১ নিষ্ক।

ইহাতে ব্যবহার সাক্ষ্য দিতেছে যে রাজনিয়মাধীন কোন চিহ্নে মুদ্রার চতুর্দ্দিক চিহ্নিত না হইলে অসৎগণের কৌশল হইতে পরিমাণ রক্ষা হয় না। রামানুজ রামায়ণের ২।২৩।১০ শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন যে "স্বনামাঙ্কিত নিষ্ক সহস্র।" পূর্ব্বোক্ত অনুমানস্থল না থাকিলে, রামানুজ আধুনিক লোক বলিয়া, তাঁহার কথা হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া যাইত এবং তাঁহার কথায় কখনই বিশ্বাস করিতাম না। 'নামাঙ্কিত', একান্তই না হউক কিন্তু কোন চিহ্নে চিহ্নিত ছিল তাহার সন্দেহ নাই। এই অনুমান ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের নিকট উপহাসাস্পদ হইতে পারে, কিন্তু ব্যথার ব্যথী আর্য্যসন্তানগণের নিকট হইবে না বোধ হয়। ফলতঃ ডিওমীড় প্রভৃতি হোমারিক ব্যক্তিগণ যখন পশ্বাদি বিনিময় দ্বারা অস্ত্রশস্ত্র ও দ্রব্যাদি খরিদ করিতেন, ভারত সে সময় প্রকৃত মুদ্রাপদে বাচ্য মুদ্রা ব্যবহার করিতেন। (১৪)

রাজাদিগের মধ্যে উপহার দেওয়ার নিমিত্ত কিরূপ দ্রব্যাদি ব্যবহৃত ছিল, তাহা কেকয় রাজ কর্ত্তৃক ভরতকে উপহার প্রদত্ত দ্রব্যদ্বারা অনেক পরিজ্ঞাত হওয়া যাইবে। তথায় (২) (৭০) ৪ কথিত হইয়াছে যে উৎকৃষ্ট হস্তী, বিচিত্র কম্বল, মৃগচর্ম্ম, অন্তঃপুরপালিত ব্যাঘ্রের ন্যায় বলসম্পন্ন বৃহৎকায় করালবদন কুক্কুর, দুই সহস্র নিষ্ক এবং ষোড়শশত অশ্ব ভরতকে উপহার দেওয়া হইয়াছিল।

ভারত এখন প্রাচীন গৌরবের প্রথম পর্য্যায়ের উচ্চতম সোপানে উঠিয়াছেন। এখন রাজন্যবর্গের তেজস্বিতা অপরিসীম। যদিও উহা ব্রহ্মতেজে এখন কিয়ৎপরিমাণে খর্ব্বগৌরব হইয়াছে, তথাপি তেজ সূর্য্যবৎ প্রদীপ্যমান। পূর্ব্বের ন্যায় এখন পশুবৎ তেজ নহে, তাহার সহ সদসদ্ বিবেচনা প্রকৃষ্টরূপে মিলিত হইয়াছে। সমাজে এখন বীর্য্যের গৌরব এত অধিক যে রাম এত গুণসম্পন্ন হওয়াতেও, বাল্মীকি তাঁহার বল পরীক্ষা ব্যতীত বিবাহ দিতে সক্ষম হইলেন না। সীতা স্ত্রীলোক হইয়াও বীর্য্যগৌরব এতদূর বুঝিতেন যে, তিনি রাবণ কর্ত্তৃক জয়লব্ধ না হইয়া হৃত হইয়াছেন বলিয়া, রাবণকে কতই ধিক্কার দিয়াছিলেন। আবার পরশুরামকে ব্রাহ্মণ জানিয়াও, যদিও রাম ব্রাহ্মণে ভক্তি বশতঃ প্রথমে অস্ত্রত্তোলন করেন নাই, কিন্তু পরশুরাম ভ্রমক্রমে তাহা ভীরুতা হেতু অর্থাৎ ভীরুতায়

---

(১৪) প্রিন্সেপ সাহেব যত প্রাচীন মুদ্রা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে তাঁহার Indian Antiquities vol I. পুস্তকে Plate VIIতে বিহাটের নিকট প্রাপ্তমুদ্রার যে সকল ছবি দেওয়া আছে, তাহার মধ্যে প্রথম সংখ্যক মুদ্রা নানা কারণে অনুমিত হয় যে উহা খ্রীষ্টের পাচ শত বৎসর পূর্ব্বের। ঐ মুদ্রারও আকার প্রকারে দেখা যায় যে উহার উভয় পার্শ্বে ও পৃষ্ঠে ছবি ও অক্ষরে অঙ্কিত। সত্যই মুদ্রার ওরূপ ভাব ঐ মুদ্রার তারিখ হইতে প্রচলিত হয় নাই। তাহার বহুপূর্ব্ব হইতে চলিত হইয়া আসিয়া থাকিবে বোধ হয়।

অস্ত্রত্তোলন করেন নাই জ্ঞান করিয়া, যখন ভৎর্সনা করিলেন, তখন রাম ভক্তি-মোহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সদর্পে কহিলেন,

"বীর্য্যহীনমিবাশক্তং ক্ষত্রধর্ম্মেণ ভার্গব।
অবজানাসি মে তেজঃ পশ্য মেহদ্য পরাক্রমম্॥"

কি মধুর বাক্য! এবাক্যের কি তখন প্রতিধ্বনি হইয়াছিল, না প্রতিধ্বনি উহা স্বীয় করগত রাখিয়া আজি পর্য্যন্ত ধ্বনিত করিবার নিমিত্ত সময় প্রতীক্ষা করিতেছেন? তবে কবে হইবে? যেদিন হইবে, সেই না জানি কি সুখের দিন! ভারত সন্তানেরা সেইদিন সে মধুর ধ্বনিতে কতই আনন্দ লাভ করিবেন, কতই পোষিত আশা ফলবতী ভাবিয়া মুগ্ধ হইতে থাকিবেন! তাঁহাদের সে সুখের চিন্তামাত্রেই আমরা যখন এত সুখী হইতেছি, তখন তাঁহাদের সে সুখ যে কত উন্নত তাহা কে বলিতে পারে!

ইতি পঞ্চম প্রস্তাব।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বিখ্যাতনামা বাণভট্টকৃত কাদম্বরী সংস্কৃত-সাহিত্য-সংসারমধ্যে একখানি অমূল্য রত্ন। এই গ্রন্থের প্রথম পূর্ব্বভাগ বা বাণভাগ; দ্বিতীয় উত্তরভাগ বা তত্তনয় ভাগ। গ্রন্থকার ইহা সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই, এজন্য তিনি লোকান্তর গমন করিলে তাঁহার পুত্র শেষভাগ রচনা করিয়া গ্রন্থ সম্পূর্ণ করেন। চার্‌লস্ ডিকেন্স্ "Mystery of Edwin Drood" নামক তাঁহার শেষ উপন্যাস গ্রন্থ সম্পূর্ণ করিতে না পারাতে, তাঁহার মৃত্যুর পর উহা অসম্পূর্ণ অবস্থায় প্রকাশিত হইয়াছে, এমন কি তাঁহার উপযুক্ত জামাতা বিখ্যাত লেখক উইল্কী কলিন্‌স্‌ও উহার শেষভাগ রচনা করিয়া সংযোজিত করিয়া দিতে পারেন নাই কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্য-ভাণ্ডারমধ্যে এতাদৃশ ঘটনা অতি বিরল। কোন সংস্কৃত গ্রন্থ অসম্পূর্ণ অবস্থায় প্রচারিত হয় নাই, সুতরাং বাণ-পুত্র দেখিলেন, তাঁহার পিতার অপূর্ব্ব কীর্ত্তি লোপ হইবার সম্ভাবনা, এজন্য কাদম্বরীর শেষভাগ লিখিয়া গ্রন্থখানি চিরস্থায়ী করিয়া দিয়াছেন। উত্তরভাগের রচনা যদিও পূর্ব্বভাগের ন্যায় ললিত, মনোহর এবং প্রসাদগুণবিশিষ্ট নহে, তথাপি উপন্যাসভাগ অসংলগ্ন হয় নাই এবং রচনা প্রণালীরও স্থানে স্থানে বিশেষ মধুরতা আছে। বাণতনয়ের গ্রন্থরচনা দ্বারা যশঃস্পৃহা ছিল না এবং তিনি কবিত্বেরও দর্প করেন নাই। গ্রন্থের মুখবন্ধে অতি বিনীতভাবে স্বীকার করিয়াছেন যে, তিনি পিতৃকীর্ত্তি চিরস্মরণীয় করিবার জন্য উত্তরভাগ রচনা করিয়া দিয়াছেন, এমন কি তাঁহার নাম পর্য্যন্ত প্রকাশ না করিয়া উদারতার একশেষ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি শেষভাগ রচনা না করিলে গ্রন্থখানির নাম পর্য্যন্ত বোধ করি এতদিন লোপ পাইত; সুতরাং এতাদৃশ কুল-পাবন পুত্রের জন্মগ্রহণ, বাণভট্টের পরম সৌভাগ্যের কারণ হইয়াছিল। কাদম্বরীর প্রারম্ভ শ্লোকমধ্যে বাণভট্ট স্বীয় বংশ বর্ণনা করিয়াছেন, যথা—

বভূব বাৎস্যায়ন বংশ সম্ভবো দ্বিজো জগদ্গীতগুণোঽগ্রণীঃ সতাম্।
অনেকগুপ্তার্চ্চিতপাদপঙ্কজঃ কুবের নামাংশ ইব স্বয়ম্ভুবঃ ॥

উবাস যস্য শ্রুতিশান্তকল্মষে সদা পুরোডাসপবিত্রিতাধরে ।
সরস্বতী সোমকষায়িতোদরে সমস্তশাস্ত্রস্মৃতিবন্ধুর মুখে ॥
জগুর্গৃহে ভ্যস্তসমস্তবাঙ্ময়ৈঃ সসারিকৈঃ পঞ্জরবর্ত্তিভিঃ শুকৈঃ ।
নিগৃহ্যমানা বটবঃ পদে পদে যজুংষি সামানি চ যস্য শঙ্কিতাঃ ॥
হিরণ্য গর্ভোভুবনাণ্ডকাদিব ক্ষপাকরঃ ক্ষীরমহার্ণবাদিব ।
অভূৎ সুপর্ণোবিনতোদরাদিব দ্বিজন্মনামর্থপতিঃ পতিস্ততঃ ॥
বিবৃন্বতো যস্য বিসারি বাঙ্ময়ং দিনে দিনে শিষ্যগণা নবা নবাঃ ।
উষস্সু লগ্নাঃ শ্রবণেঽধিকাং শ্রিয়ং প্রচক্রিরে চন্দনপল্লবা ইব ॥
বিধানসম্পাদিতদানশোভিতৈঃ স্ফুরন্মহাবীর সনাথ মূর্ত্তিভিঃ ।
মখৈরসংখ্যৈ রজয়ৎ সুরালয়ং সুখেনযো যূপকরৈর্গজৈরিব ॥
স চিত্রভানুং তনয়ং মহাত্মনাং সুতোত্তমানাং শ্রুতিশাস্ত্রশালিনাম্ ।
অবাপ মধ্যে স্ফটিকোপলামলং ক্রমেণ কৈলাসমিব ক্ষমাভৃতাম্ ॥
মহাত্মনো যস্য সুদূর নির্গতাঃ কলঙ্কমুক্তেন্দুকলামলত্বিষঃ ।
দ্বিষন্মনঃ প্রাবিবিশুঃ কৃতান্তরা গুণা নৃসিংহস্য নখাঙ্কুশা ইব ॥
দিশামলীকালকভঙ্গতাং গতস্ত্রয়ীবধূকর্ণতমালপল্লবঃ ।
চকার যস্যাধ্বরধূমসঞ্চয়ো মলীমসঃ শুক্লতরং নিজং যশঃ ॥
সরস্বতী পাণি সরোজ সম্পুটপ্রসুপ্তহোম শ্রমসীকরাম্ভস ।
যশোংশুশুক্লীকৃতসপ্তবিষ্টপাত্ততঃ সুতোবাণ ইতি ব্যজায়ত ॥

অর্থাৎ অশেষ গুণসম্পন্ন কুবের নামক এক ব্রাহ্মণ বাৎস্যায়ন বংশে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। ঐ ব্রাহ্মণ অদ্ভুত যাজ্ঞিক ও নিরতিশয় পণ্ডিত ছিলেন,(তাঁহার পাণ্ডিত্য ও যাজ্ঞিকতার বিষয় দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে) সেই কুবের হইতে অর্থপতি জন্মগ্রহণ করেন। এই মহাত্মারও প্রচুর পাণ্ডিত্য ছিল। অর্থপতি কেবল পণ্ডিত ছিলেন এমত নহে, অতিশয় যাজ্ঞিক ও বদান্য ছিলেন। অর্থপতির অনেকগুলি পুত্র জন্মিয়াছিল, তন্মধ্যে চিত্রভানু অতি ধীর ও গুণবান্ হইয়াছিলেন (৮) (৯) শ্লোকদ্বয়োক্ত বিশেষণ সম্পন্ন চিত্রভানুর যে তনয় জন্মে, তাঁহার নাম বাণ—

বাৎস্যায়ন
[গোত্র]
|
কুবের।
|
অর্থপতি।
|
চিত্রভানু।
|
বাণ।
|
তৎপুত্র।

বাণভট্ট গ্রন্থমধ্যে এই মাত্র আপন পরিচয় দিয়াছেন ; ইহাতে আমরা কবি-বৃত্তান্ত বিশেষ কিছুই অবগত হইতে পারিলাম না, কেবল তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষগণের নাম জানিতে পারিলাম। সারঙ্গধর পদ্ধতি ষষ্ঠ অধ্যায়ের শেষে রাজশেখর কৃত এই শ্লোকটি দৃষ্ট হয় যথা—

অহো প্রভাবো বাগ্দেব্যাযন্ মাতঙ্গ দিবাকরঃ ।
শ্রীহর্ষস্যাভব সভ্যঃ সমো বাণ ময়ূরয়োঃ ।

এই শ্লোকে মাতঙ্গ দিবাকর, বাণ ও ময়ূরকে শ্রীহর্ষরাজের সভ্য বলা হইয়াছে। বিলোচন কহেন বাণ ও ময়ূর সমসাময়িক কিন্তু মাতঙ্গ দিবাকরের নাম অন্য কোন গ্রন্থে দেখি নাই। পণ্ডিতবর হলসাহেব তাঁহাকে জৈনাচার্য্য মনাতঙ্গসূরি স্থির করিয়াছেন, এটী প্রামাণিক হইতেও পারে, কেননা, মনাতঙ্গ বাণভট্টের সমকালিক ইহা জৈন গ্রন্থেও দৃষ্ট হইয়া থাকে ; এক্ষণে এই তিন জনের আশ্রয়দাতা শ্রীহর্ষ কোন স্থানের নৃপতি তাহাই জিজ্ঞাস্য হইতেছে।

বাণভট্ট হর্ষচরিত-প্রণেতা। কাণ্যকুব্জাধিপতি হর্ষবর্দ্ধনের সহিত তাঁহার বাল-সখিতা ছিল, এজন্য তিনি হর্ষচরিতে তাঁহার গুণাবলী বর্ণন করিয়াছেন। হর্ষবর্দ্ধন ৬০৭ খৃঃ অঃ হইতে ৬৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজ্য করিয়াছিলেন কিন্তু চীনদেশীয় লেখক মাতনলিনের মতানুসারে তাঁহার ৬৭৮ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যু হইয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ চৈনিক বৌদ্ধ পরিব্রাজক হিয়াঙ সিয়াঙ হর্ষবর্দ্ধনের রাজ্যশাসন সময়ে কাণ্যকুব্জে গমন করিয়াছিলেন। আবুরিহান কহেন এই হর্ষবর্দ্ধন কর্ত্তৃক "শ্রীহর্ষ অব্দ" প্রচলিত হইয়াছিল। এই অব্দ ৬০৭ হইতে ১১০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কাণ্যকুব্জ ও মথুরায় প্রচলিত ছিল। এই শ্রীহর্ষ কাণ্যকুব্জাধিপতি হর্ষবর্দ্ধন এবং ইনিই হিয়াঙ সিয়াঙের হর্ষবর্দ্ধন শিলাদিত্য। বাণভট্ট তাঁহার পার্ষদ, সুতরাং তিনি খ্রীষ্টীয় সপ্তশতাব্দীর মধ্যে বর্ত্তমান ছিলেন।

ভদ্র এবং নারায়ণ বাণভট্টের সহাধ্যায়ী। তাঁহার গণপতি, অধিপতি, তারাপতি, এবং শ্যামল নামক পিতৃব্য-পুত্র ছিল। তিনি কিছু দিবস যষ্টীগৃহ এবং মণিপুরে বাস করিয়া কাণ্যকুব্জ গমন করেন। বাণভট্ট, ময়ূরভট্টের জামাতা। ইহাদিগের উভয়ের সম্বন্ধে একটি গল্প প্রচলিত আছে। ময়ূরভট্ট উজ্জয়িনীবাসী। তিনি এবং বাণভট্ট উভয়ে বৃদ্ধ ভোজের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা দুইজনেই সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী, এজন্য পরস্পর বিদ্যা বিষয়ে ঈর্ষা করিতেন। একদা তাঁহারা এই বিবাদে প্রবৃত্ত হইলে রাজা তাঁহাদিগকে কাশ্মীরে বিদ্যা পরীক্ষা জন্য গমন করিতে আজ্ঞা করিলেন। রাজাজ্ঞানুসারে তাঁহারা কাশ্মীরাভিমুখে যাত্রা করিয়া পথিমধ্যে ৫০০ শত বলীবর্দ্দ গ্রন্থভার বহন করিয়া যাইতেছে দেখিয়া পরিচালককে ঐ সকল গ্রন্থের নাম জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহাতে সে কহিল এই ৫০০ শত

বলীবর্দ্দ "ঙ" শব্দের টীকা বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে; এতৎশ্রবণে তাঁহারা গমন করিতে করিতে কিয়দ্দূরে দেখেন, পুনরায় ২০০০ সহস্র বলীবর্দ্দ "ঙ" শব্দের আর একখানি টীকা বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে; তদ্দর্শনে তাঁহারা আপনাদিগকে শত শত ধিক্কার দিয়া পরস্পরের গর্ব্ব খর্ব্ব করিলেন। তাঁহারা বিশ্রামশালায় উভয়ে নিদ্রাগত হইলে, ময়ূরভট্ট সরস্বতী কর্ত্তৃক জাগরিত হইলেন। দেবী তাঁহার পাণ্ডিত্যের পরীক্ষা জন্য প্রশ্ন করিলেন "শত চন্দ্রং নভস্থলং।" ময়ূর নিমেষমধ্যে তাঁহার পদ পূরণ করিয়া কহিলেন —

দামোদর করাঘাত বিহ্বলীকৃত চেতসা।
দৃষ্টং চানূরমল্লেন শতচন্দ্রং নভস্থলম্ ॥

এইরূপ সমস্যা পূরণ করিবামাত্র বাণ হুঙ্কার করিয়া সগর্ব্বে ভ্রুকুটী কুটিল করত ঐ সমস্যা ভিন্ন কবিতায় পূরণ করিলেন। দেবী কহিলেন "তোমরা উভয়েই সৎকবি এবং সুপণ্ডিত, কিন্তু বাণ তুমি গর্ব্বে হুঙ্কার ধ্বনি করাতে পণ্ডিতোচিত কার্য্য কর নাই। তোমার গর্ব্ব হ্রাস করিবার জন্য "ঙ" শব্দের ব্যাখ্যা দেখাইলাম, এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখ উক্ত টীপ্পনীকার অপেক্ষা তুমি বিদ্যাবিষয়ে কতদূর হীন। এই তুলনায় সমালোচন সময়ে তোমার বিদ্যাগৌরব খর্ব্ব হইল; অতএব পণ্ডিতগণের বিদ্যার গর্ব্ব করা সর্ব্বতোভাবে অকর্ত্তব্য।" সরস্বতীর বাক্য শ্রবণে উভয়ের চেতন হইল এবং সেই অবধি রাজনিকেতনে প্রত্যাগমন করিয়া সুখে বাস করিতে লাগিলেন।

একদিন বাণের স্ত্রীর সহিত বিবাদ ঘটিয়াছিল। তাঁহার স্ত্রীর প্রগল্‌ভতা বশতঃ সমস্ত রাত্রেই প্রায় বাগ্‌বিতণ্ডা হইয়াছিল। ময়ূরভট্ট তাঁহার কন্যার কণ্ঠস্বর শুনিয়া হঠাৎ গবাক্ষদ্বারের নিকট গিয়া দেখিলেন বাণ তাঁহার স্ত্রীর পদযুগল ধারণ করিয়া বার বার ক্ষমা প্রর্থনা করিতেছেন কিন্তু তাহাতেও কামিনীর ক্রোধের শান্তি না হইয়া দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইল এবং তিনি পদাঘাতে তাঁহাকে দূরে নিক্ষেপ করিলেন। বাণ অত্যন্ত স্ত্রৈণ ছিলেন, তিনি এতাদৃশ অপমানেও দুঃখিত না হইয়া নানাবিধ বিনয় বাক্যে ও শ্লোক দ্বারা স্তব করিতে লাগিলেন। ময়ূরভট্ট গোপনে এ সকল দেখিয়া এককালে ক্রোধে অধীর হইয়া তাঁহার কন্যাকে ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন। বাণের স্ত্রী পিতার কথায় ক্রুদ্ধা হইয়া তাঁহার অঙ্গে চর্ব্বিত - তাম্বুল নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, "এই চর্ব্বিত তাম্বুলের সঙ্গে তোমার অঙ্গে কুষ্ঠ নির্গত হউক।" প্রভাত হইবামাত্র ময়ূরভট্টের অঙ্গে কুষ্ঠ হইল। ময়ূরভট্ট রাজসভা ত্যাগ করিয়া রোগমুক্ত হইবার জন্য সূর্য্যদেবের মন্দিরে স্তব আরম্ভ করিলেন এবং একান্ত চিত্তে "জম্ভারাতীভকুম্ভোদ্ভবমিব দধতঃ" ইত্যাদি শ্লোকে স্তবারম্ভ করিলে, ষষ্ট শ্লোক —"শীর্ণঘ্রাণাঙ্‌ঘ্রি পানিন্" ইত্যাদি পাঠ মাত্র ভগবান্ অংশুমালী প্রসন্ন

হইয়া তাঁহাকে কুষ্ঠরোগ হইতে বিমুক্ত করিলেন। এইরূপে সূর্য্যশতক গ্রন্থের জন্ম হইল। এইরূপ অসার এবং অলৌকিক গল্পে প্রাচীন কবিদিগের জীবন বৃত্তান্ত পরিপূর্ণ, ইহা দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই।

বাণভট্ট বিদ্যাবিষয়ে ময়ূরভট্টের প্রতিদ্বন্দ্বী; ময়ূরভট্ট অলৌকিক ক্ষমতা প্রভাবে রোগমুক্ত হইয়া রাজসভায় প্রত্যাগত হইলেন দেখিয়া তাঁহার হৃদয় ঈর্ষ্যায় জর্জ্জরিত হইল। রাজা ময়ূরকে আদর করিতে লাগিলেন এবং সভাসদ্‌গণও তাঁহার প্রত্যাগমনে সুখী হইলেন, ইহা দেখিয়া বাণভট্টের অসহ্য বোধ হইল। তিনি এককালে ক্রোধে অধীর হইয়া স্বীয় হস্তপদ অস্ত্রদ্বারা খণ্ড করিয়া ফেলিয়া, কায়মনোবাক্যে চণ্ডীকা শতকে চণ্ডীর স্তব করাতে ভগবতী প্রসন্না হইয়া তাঁহাকে পুনরায় হস্তপদ বিশিষ্ট করিলেন। এই গল্প একজন জৈন টীকাকারের লিখিত, তাঁহার হিন্দুগণাপেক্ষাও জৈনদিগের অলৌকিক ক্ষমতা ইহাই বর্ণন করা মুখ্য উদ্দেশ্য। এজন্য ময়ূর ও বাণভট্টের বিষয় লিখিয়াই তাঁহাদিগের সমকক্ষ এবং সমসাময়িক জৈনাচার্য্য মনাতঙ্গ সূরীর বিষয়ে লিখিয়াছেন যে তিনি ইচ্ছানুসারে ৪৪টী লৌহ নিগড়ে আবদ্ধ হইয়া ৪৪টী "ভক্তামর স্তোত্র" শ্লোক প্রস্তুত করিয়া শৃঙ্খলমুক্ত হইয়াছিলেন। মনাতঙ্গ সূরী এই অলৌকিক ক্ষমতা প্রভাবে বৃদ্ধ ভোজকে জৈন ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। এগুলি যদিও গল্প কিন্তু তাহাতে এই সত্য প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে যে মনাতঙ্গ, ময়ূর, এবং বাণ এক সময়ে এক রাজার আশ্রয়ে বর্ত্তমান ছিলেন। সূর্য্য শতকের টীকাকার মধুসূদনও এইরূপ বাণ ও ময়ূরভট্ট সম্বন্ধে একটি গল্প লিখিয়াছেন কিন্তু তাহাতে মনাতঙ্গের উল্লেখ নাই।

মাধবাচার্য্য কৃত শঙ্করবিজয়ে দৃষ্ট হয়, খণ্ডনকার কবীন্দ্র শ্রীহর্ষ, বাণ, ময়ূর, উদয়ানাচার্য্য এবং শঙ্করাচার্য্য একসময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। তাহাতে লিখিত আছে, বাণ ও ময়ূর অবন্তীদেশবাসী।

বাণভট্ট হর্ষচরিত, চণ্ডীকাশতক, এবং কাদম্বরী গ্রন্থকর্ত্তা। হর্ষচরিতে শ্রীহর্ষরাজের বিবরণ বিবৃত হইয়াছে। ইহার শঙ্করভট্টকৃত টীকা আছে কিন্তু তাহা সুপ্রাপ্য নহে। মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত দেবীমাহাত্ম্য হইতে চণ্ডীকা শতক বিরচিত। উহা আদ্যোপান্ত শার্দ্দূলবিক্রীড়িতচ্ছন্দে গ্রথিত। সরস্বতীকণ্ঠাভরণে লিখিত আছে বাণভট্ট পদ্য অপেক্ষা গদ্য লিখিতে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। কাদম্বরী তাঁহার উৎকৃষ্ট গদ্যকাব্য। কবি ইহার প্রারম্ভ শ্লোকে লিখিয়াছেন "দ্বিজশ্রেষ্ঠ মহাত্মা বাণ স্বীয় অকুণ্ঠিত বুদ্ধি দ্বারা এই কথাগ্রন্থ নির্ম্মাণ করিতেছেন" * এ গর্ব্বোক্তি তাঁহার নিতান্ত অর্থশূন্য হয় নাই। সংস্কৃত ভাষায় দশকুমারচরিত, বাসবদত্তা

---

* দ্বিজেন তেনাক্ষত কণ্ঠ কৌণ্ঠ্যয়া মহামনোমোহমলীমসান্ধয়া
অলব্ধ বৈদগ্ধ্যবিলাসমুগ্ধয়া ধিয়া নিবদ্ধে মতিদ্বয়ী কথা।

এবং কাদম্বরী এই তিনখানি প্রসিদ্ধ গদ্যকাব্য, তাহার মধ্যে কাদম্বরী সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কুমার ভার্গবীয়, চম্পূভারত, চন্দ্রশেখর, চেতোবিলাস চম্পূ প্রভৃতির গদ্য রচনা কাদম্বরীর রচনার নিকট কোন গুণেই লক্ষিত হয় না। দীর্ঘ সমাসঘটিত বাক্য প্রয়োগ করাতে গ্রন্থখানির রচনা স্থানে স্থানে কিঞ্চিৎ নীরস হইয়াছে। সংস্কৃত ভাষায় একখানি কাদম্বরী-কথাসার নামক কাব্যগ্রন্থ আছে। উহা ৮ সর্গে বিভক্ত এবং উপন্যাসভাগ অবিকল বাণভট্টকৃত কাদম্বরী হইতে গৃহীত।

সম্প্রতি বাণভট্টকৃত পার্ব্বতী-পরিণয় নামক একখানি ক্ষুদ্র নাটক প্রকাশিত হইয়াছে; উহা কাদম্বরী গ্রন্থকর্ত্তার লেখনীপ্রসূত কি না, তাহা প্রকৃতরূপে নির্ণয় করা সুকঠিন। কোন অলঙ্কারগ্রন্থ মধ্যে পার্ব্বতীপরিণয়ের নামোল্লেখ দেখিতে পাই না কিন্তু ইহার প্রস্তাবনার শ্লোকের সহিত কাদম্বরী গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়ের ঐক্য আছে যথা——

অস্তি কবিসার্বভৌমো বৎস্যায়ন জলধি সম্ভবো বাণঃ।
নৃত্যতি যদ্রসনায়াং বেধোমুখলাসিকা বাণী॥

ইহাতেও স্পষ্ট বাৎস্যায়ন বংশোদ্ভব বলা হইয়াছে। রচনা দৃষ্টে নাটকখানি কাদম্বরী প্রণেতার লিখিত বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। ইহাতে গ্রন্থকার কিছুই কবিত্ব প্রকাশ করিতে পারেন নাই এবং ইহার অধিকাংশ ভাব কালিদাসের কুমারসম্ভব হইতে গৃহীত এবং কোন কোন কবিতার কুনারসম্ভবের কবিতার সহিত বিলক্ষণ সৌসাদৃশ্য আছে। এই নাটক ৫ অঙ্কে সম্পূর্ণ।

শ্রীরামদাস সেন

উপন্যাস

প্রথম পরিচ্ছেদ

তোমাদের সুখ দুঃখে আমার সুখ দুঃখ পরিমিত হইতে পারে না। তোমরা আর আমি ভিন্নপ্রকৃতি। আমার সুখে তোমরা সুখী হইতে পারিবে না—আমার দুঃখ তোমরা বুঝিবে না—আমি একটি ক্ষুদ্র যূথিকার গন্ধে সুখী হইব; আর ষোলকলা শশী আমার লোচনাগ্রে সহস্র নক্ষত্রমণ্ডল মধ্যস্থ হইয়া বিকসিত হইলেও আমি সুখী হইব না—আমার উপাখ্যান কি তোমরা মন দিয়া শুনিবে? আমি জন্মান্ধ।

কি প্রকারে বুঝিবে? তোমাদের জীবন দৃষ্টিময়—আমার জীবন অন্ধকার—দুঃখ এই, আমি ইহা অন্ধকার বলিয়া জানি না। আমার এ রুদ্ধনয়নে, তাই আলো! না জানি তোমাদের আলো কেমন!

তাই বলিয়া কি আমার সুখ নাই? তাহা নহে। সুখ দুঃখ তোমার আমার প্রায় সমান। তুমি রূপ দেখিয়া সুখী, আমি শব্দ শুনিয়াই সুখী। দেখ এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যূথিকাসকলের বৃন্তগুলি কত সূক্ষ্ম, আর আমার এই করস্থ সূচিকাগ্রভাগ আরও কত সূক্ষ্ম! আমি এই সূচিকাগ্রে সেই ক্ষুদ্র পুষ্পবৃন্ত সকল বিদ্ধ করিয়া মালা গাঁথি—আশৈশব মালাই গাঁথিয়াছি—কেহ কখন আমার গাঁথা মালা পরিয়া বলে নাই যে কাণায় মালা গাঁথিয়াছে।

আমি মালাই গাঁথিতাম। বালিগঞ্জের প্রান্তভাগে আমার পিতার একখানি পুষ্পোদ্যান জমা ছিল—তাহাই তাঁহার উপজীবিকা ছিল। ফাল্গুন মাস হইতে যতদিন ফুল ফুটিত, ততদিন পর্য্যন্ত পিতা প্রত্যহ তথা হইতে পুষ্পচয়ন করিয়া আনিয়া দিতেন, আমি মালা গাঁথিয়া দিতাম। পিতা তাহা লইয়া মহানগরীর পথে পথে বিক্রয় করিতেন। মাতা গৃহকর্ম্ম করিতেন। অবকাশ মতে পিতা মাতা উভয়েই আমাদিগের মালা গাঁথার সহায়তা করিতেন।

ফুল দেখিতে শুনি বড় সুন্দর—পরিতে বুঝি বড় সুন্দর হইবে—ঘ্রাণে পরম সুন্দর বটে। কিন্তু ফুল গাঁথিয়া দিন চলে না। অন্নের বৃক্ষের ফুল নাই। সুতরাং পিতা নিতান্ত দরিদ্র ছিলেন। মৃজাপুরে একখানি সামান্য খাপরেলের ঘরে বাস করিতেন। তাহারই একপ্রান্তে, ফুল বিছাইয়া, ফুল স্তূপাকৃত করিয়া, ফুল ছড়াইয়া, আমি ফুল গাঁথিতাম। পিতা বাহির হইয়া গেলে গান গাইতাম—

আমার এত সাধের প্রভাতে সই, ফুটলোনাকো কলি—

ও হরি—এখনও আমার বলা হয় নাই আমি পুরুষ কি মেয়ে। তবে, এতক্ষণে যিনি না বুঝিয়াছেন, তাঁহাকে না বলাই ভাল। আমি বলিব না।

পুরুষ হই, মেয়েই হই, অন্ধের বিবাহের বড় গোল। কাণা বলিয়া আমার বিবাহ হইল না। সেটা দুর্ভাগ্য কি সৌভাগ্য, যে চোখের মাথা না খাইয়াছে, সেই বুঝিবে। অনেক অপাঙ্গ রঙ্গরঙ্গিণী, আমার চিরকৌমার্য্যের কথা শুনিয়া বলিয়া গিয়াছে, "আহা আমিও যদি কানা হতেম!"

বিবাহ না হউক—তাতে আমার দুঃখ ছিল না। আমি স্বয়ম্বরা হইয়াছিলাম। একদিন পিতার কাছে কলিকাতার বর্ণনা শুনিতেছিলাম। শুনিলাম মনুমেণ্ট বড় ভারি ব্যাপার। অত্যুচ্চ, অটল অচল, ঝড়ে ভাঙ্গে না, গলায় চেন,—একা একাই বাবু। মনে মনে মনুমেণ্টকে বিবাহ করিলাম। আমার স্বামীর চেয়ে বড় কে? আমি মনুমেণ্ট-মহিষী।

কেবল একটা বিবাহ নহে। যখন মনুমেণ্টকে বিবাহ করি, তখন আমার বয়স্ পনের বৎসর। সতের বৎসর বয়সে—বলিতে লজ্জা করে, সধবাবস্থাতেই—আর একটা বিবাহ ঘটিয়া গেল। আমাদের বাড়ীর কাছে, কালীচরণ বসু নামে একজন কায়স্থ ছিল। চীনাবাজারে তাহার একখানি খেলানার দোকান ছিল। সেও কায়স্থ—আমরাও কায়স্থ—এজন্য একটু আত্মীয়তা হইয়াছিল। কালী বসুর একটি চারি বৎসরের শিশুপুত্র ছিল। তাহার নাম বামাচরণ। বামাচরণ সর্ব্বদা আমাদের বাড়ীতে আসিত। একদিন একটা বর বাজনা বাজাইয়া মন্দগামী ঝড়ের মত আমাদিগের বাড়ীর সমুখ দিয়া যায়। দেখিয়া বামাচরণ জিজ্ঞাসা করিল "ও কেও?"

আমি বলিলাম "ও বর।" বামাচরণ তখন কান্না আরম্ভ করিল—"আমি বল হব।"

তাহাকে কিছুতে থামাইতে না পারিয়া বলিলাম, "কাঁদিস না—তুই আমার বর।" এই বলিয়া একটা সন্দেশ তাহার হাতে দিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "কেমন, তুই আমার বর হবি?" শিশু সন্দেশ হাতে পাইয়া, রোদন সম্বরণ করিয়া বলিল "হব।"

সন্দেশ সমাপ্ত হইলে, বালক ক্ষণেককাল আমার মুখপ্রতি চাহিয়া বলিল, "হাঁগা বলে কি কলে গা ?" বোধ হয় তাহার ধ্রুব বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, বরে বুঝি কেবল সন্দেশই খায়। যদি তা হয়, তবে সে আর একটা আরম্ভ করিতে প্রস্তুত। ভাব বুঝিয়া আমি বলিলাম "বরে ফুলগুলি গুছিয়ে দেয়।" বামাচরণ স্বামীর কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বুঝিয়া লইয়া, ফুলগুলি আমার হাতে গুছাইয়া তুলিয়া দিতে লাগিল। সেই অবধি আমি তাহাকে বর বলি—সে আমাকে ফুল গুছাইয়া দেয়।

আমার এই দুই বিবাহ—এখন এ কালের জটিলা-কুটিলাদিগকে আমার জিজ্ঞাস্য—আমি সতী বলাইতে পারি কি ?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বড় বাড়ীতে ফুল যোগান বড় দায়। সেকালের মালিনীমাসী রাজবাড়ীতে ফুল যোগাইয়া মশানে গিয়াছিল। ফুলের মধু খেলে বিদ্যাসুন্দর, কিল খেলে হীরা মালিনী—কেননা সে বড়বাড়ীতে ফুল যোগাইত। সুন্দরের সেই রামরাজ্য হইল —কিন্তু মালিনীর কিল আর ফিরিল না।

বাবা ত "বেলফুল" হাঁকিয়া, রসিক-মহলে ফুল বেচিতেন, মা দুই একটা অরসিক মহলে ফুল নিত্য যোগাইতেন। তাহার মধ্যে রামসদয় মিত্রের বাড়ীই প্রধান। রামসদয় মিত্রের সাড়ে চারিটা ঘোড়া ছিল—(নাতিদের একটা পণি আর আদত চারিটা) সাড়ে চারিটা ঘোড়া—আর দেড়খানা গৃহিণী। একজন আদত—একজন চিররুগ্না এবং প্রাচীনা। তাহার নাম ভুবনেশ্বরী—কিন্তু তাঁর গলার সাঁই সাঁই শব্দ শুনিয়া রামমণি ভিন্ন অন্য নাম আমার মনে আসিত না।

আর যিনি পূরা একখানি গৃহিণী তাঁহার নাম লবঙ্গলতা। লবঙ্গলতা, লোকে বলিত, কিন্তু তাঁহার পিতা নাম রাখিয়াছিলেন ললিত-লবঙ্গলতা, এবং রামসদয় বাবু আদর করিয়া বলিতেন ললিত-লবঙ্গলতা-পরিশীলন-কোমল-মলয়-সমীরে। রামসদয় বাবু প্রাচীন, বয়ঃক্রম ৬৩ বৎসর। ললিত-লবঙ্গলতা নবীনা, বয়স ১৯ বৎসর, দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী—আদরের আদরিণী, গৌরবের গৌরবিণী, মানের মানিনী, নয়নের মণি, ষোলআনা গৃহিণী। তিনি রামসদয়ের সিন্দুকের চাবি, বিছানার চাদর, পানের চুন, গেলাসের জল। তিনি রামসদয়ের জ্বরে কুইনাইন, কাশীতে ইপিকা, বাতে ফ্লানেল, এবং আরোগ্যে সুরুয়া।

নয়ন নাই—ললিত-লবঙ্গলতাকে কখন দেখিতে পাইলাম না—কিন্তু শুনিয়াছি তিনি রূপসী। রূপ যাউক্, গুণ শুনিয়াছি। লবঙ্গ বাস্তবিক গুণবতী। গৃহকার্য্যে নিপুণা, দানে মুক্তহস্তা, হৃদয়ে সরলা, কেবল বাক্যে বিষময়ী। লবঙ্গ-

লতার অশেষ গুণের মধ্যে, একটি এই যে তিনি বাস্তবিক পিতামহের তুল্য সেই স্বামীকে ভালবাসিতেন—কোন নবীনা নবীন-স্বামীকে সেরূপ ভালবাসে কি না সন্দেহ। ভালবাসিতেন বলিয়া, তাঁহাকে নবীন সাজাইতেন—সে সজ্জার রস কাহাকে বলি? আপন হস্তে নিত্য শুভ্রকেশে কলপ মাখাইয়া কেশগুলি রঞ্জিত করিতেন। যদি রামসদয় লজ্জার অনুরোধে কোনদিন মলমলের ধুতি পরিত, স্বহস্তে তাহা ত্যাগ করাইয়া কোকিলপেড়ে, ঝিঙ্গেপেড়ে, কল্কাপেড়ে পরাইয়া দিতেন—মলমলের ধুতিখানি তৎক্ষণাৎ বিধবা দরিদ্রগণকে বিতরণ করিতেন। রামসদয় প্রাচীন বয়সে, আতরের শিশি দেখিলে ভয়ে পলাইত—লবঙ্গলতা, তাহার নিদ্রিতাবস্থায় সর্ব্বাঙ্গে আতর মাখাইয়া দিতেন। রামসদয়ের চসমাগুলি, লবঙ্গ প্রায় চুরি করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিত, সোণাটুকু লইয়া যাহার কন্যার বিবাহের সম্ভাবনা তাহাকে দিত। সদানন্দের নাক ডাকিলে, লবঙ্গ ছয়গাছা মল বাহির করিয়া পরিয়া, ঝমরময় ঝমঝম্ করিয়া রামসদয়ের নিদ্রা ভাঙ্গিয়া দিত।

লবঙ্গলতা আমাদের ফুল কিনিত—চারিআনার ফুল লইয়া দুইটাকা মূল্য দিত। তাহার কারণ আমি কাণা। মালা পাইলে লবঙ্গ গালি দিত, বলিত এমন কদর্য্য মালা আমাকে দিস কেন? কিন্তু মূল্য দিবার সময় ডবল পয়সার সঙ্গে ভুল করিয়া টাকা দিত। ফিরাইয়া দিতে গেলে বলিত—ও আমার টাকা নয়—দুইবার বলিতে গেলে গালি দিয়া তাড়াইয়া দিত। তাহার দানের কথা মুখে আনিলে মারিতে আসিত। বাস্তবিক, রামসদয় বাবুর ঘর না থাকিলে, আমাদিগের দিনপাত হইত না। তবে যাহা রয় সয়, তাই ভাল বলিয়া মাতা লবঙ্গের কাছে অধিক লইতেন না। দিনপাত হইলেই আমরা সন্তুষ্ট থাকিতাম। লবঙ্গলতা আমাদিগের নিকট রাশি রাশি ফুল কিনিয়া সদানন্দকে সাজাইত। সাজাইয়া বলিত, দেখ, রতিপতি। রামসদয় বলিত, দেখ, সাক্ষাৎ—অঞ্জনানন্দন। সেই প্রাচীনে নবীনে মনের মিল ছিল—দর্পণের মত দুইজনে দুইজনের মন দেখিতে পাইত। তাহাদের প্রেমের পদ্ধতিটা এইরূপ—

রামসদয় বলিত, "ললিত-লবঙ্গলতা-পরিশী?"—
লবঙ্গ। আজ্ঞে, ঠাকুরদাদা মহাশয়, দাসী হাজির।
রাম। আমি যদি মরি?
লব। আমি তোমার বিষয় খাইব।

লবঙ্গ মনে মনে বলিত "আমি বিষ খাইব।" রামসদয়, তাহা মনে মনে জানিত।

লবঙ্গ এত টাকা দিত, তবে বড়বাড়ীতে ফুল যোগান হইল কেন? শুন।

একদিন মার জ্বর। অন্তঃপুরে বাবা যাইতে পারিবেন না—তবে আমি বৈ আর কে লবঙ্গলতাকে ফুল দিতে যাইবে? আমি লবঙ্গের জন্য ফুল লইয়া চলিলাম। অন্ধ হই, যাই হই—কলিকাতার রাস্তাসকল আমার নখদর্পণ ছিল। বেত্রহস্তে সর্ব্বত্রে যাইতে পারিতাম, কখন গাড়িঘোড়ার সম্মুখে পড়ি নাই। অনেকবার পদচারীর ঘাড়ে পড়িয়াছি বটে—তাহার কারণ, কেহ কেহ অন্ধ যুবতী দেখিয়া সাড়া দেয় না বরং বলে, "আ মলো! দেখ্‌তে পাস্‌নে? কাণা নাকি?" আমি ভাবিতাম "দুজনেই।"

ফুল লইয়া গিয়া লবঙ্গের কাছে গেলাম। দেখিয়া লবঙ্গ বলিলেন, "কিলো কাণী—আবার ফুল লইয়া মর্‌তে এয়েছিস্‌ কেন?" কাণী বলিলে আমার হাড় জ্বলিয়া যাইত—আমি কি কদর্য্য উত্তর দিতে যাইতেছিলাম, এমত সময়ে সেখানে হঠাৎ কাহার পদধ্বনি শুনিলাম—কে আসিল। যে আসিল—সে বলিল, "একে ছোট মা?"

ছোট মা! তবে রামসদয়ের পুত্র। রামসদয়ের কোন্‌ পুত্র! বড় পুত্রের কণ্ঠ একদিন শুনিয়াছিলাম—সে এমন অমৃতময় নহে—এমন করিয়া কর্ণবিবর ভরিয়া সুখ ঢালিয়া দেয় নাই। বুঝিলাম, এ ছোট বাবু।

ছোট মা বলিলেন, এবার বড় মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, "ও কাণা ফুলওয়ালী।"

"ফুলওয়ালী! আমি বলিবা কোন ভদ্রলোকের মেয়ে।"

লবঙ্গ বলিলেন, "কেন গা, ফুলওয়ালী হইলে কি ভদ্রলোকের মেয়ে হয় না?"

ছোট বাবু অপ্রতিভ হইলেন। বলিলেন, "হবে না কেন? এটী ত ভদ্রলোকের মেয়ের মতই বোধ হইতেছে। তা ওটি কাণা হইল কিসে!"

লবঙ্গ। ও জন্মান্ধ।

ছোট বাবু। দেখি?

ছোট বাবুর বড় বিদ্যার গৌরব ছিল। তিনি অন্যান্য বিদ্যাও যেরূপ যত্নের সহিত শিক্ষা করিয়াছিলেন, অর্থের প্রত্যাশী না হইয়াও চিকিৎসাশাস্ত্রেও সেইরূপ যত্ন করিয়াছিলেন। লোকে রাষ্ট্র করিত যে, শচীন্দ্র বাবু (ছোট বাবু) কেবল দরিদ্রগণের বিনা মূল্যে চিকিৎসা করিবার জন্য চিকিৎসা শিখিতেছিলেন। "দেখি" বলিয়া আমাকে বলিলেন, "একবার দাঁড়াও ত গা।"

আমি জড় সড় হইয়া দাঁড়াইলাম।

ছোট বাবু বলিলেন, "আমার দিকে চাও!"

চাব কি ছাই!

"আমার দিকে চোখ ফিরাও।"

কাণা চোখে শব্দভেদী বাণ মারিলাম। ছোট বাবুর মনের মত হইল না। তিনি আমার দাড়ি ধরিয়া, মুখ ফিরাইলেন।

ডাক্তারির কপালে আগুণ জ্বেলে দিই। সেই চিবুক স্পর্শে আমি মরিলাম!

সেই স্পর্শ পুষ্পময়। সেই স্পর্শে যূথী, জাতি, মল্লিকা, শেফালিকা, কামিনী, গোলাপ, সেঁউতি। সব ফুলের ঘ্রাণ পাইলাম। বোধ হইল, আমার আশে পাশে ফুল, আমার মাথায় ফুল, আমার পায়ে ফুল, আমার পরণে ফুল, আমার বুকের ভিতর ফুলের রাশি। আ মরি মরি। কোন্ বিধাতা এ কুসুমময় স্পর্শ গড়িয়াছিল! বলিয়াছি ত, কাণার সুখ দুঃখ তোমরা বুঝিবে না। আ মরি মরি—সে নবনীত সুকুমার—পুষ্পগন্ধময়, বীণাধ্বনিবৎ স্পর্শ! বীণাধ্বনিবৎ স্পর্শ, যার চোখ আছে, সে বুঝিবে কি প্রকারে? আমার সুখ দুঃখ আমাতেই থাকুক। যখন সেই স্পর্শ মনে পড়িত, তখন কত বীণাধ্বনি কর্ণে শুনিতাম, তাহা তুমি, বিলোলকটাক্ষ-কুশলিনি! কি বুঝিবে।

ছোট বাবু বলিলেন, "না, এ কাণা সারিবার নয়।"

আমার ত সেইজন্য ঘুম হইতেছিল না।

লবঙ্গ বলিল, "তা না সারুক, টাকা খরচ করিলে কাণার কি বিয়ে হয় না?"

ছোট বাবু। কেন, এঁর কি বিবাহ হয় নাই?

লবঙ্গ। না। টাকা খরচ করিলে হয়?

ছোট বাবু। আপনি কি ইহার বিবাহ জন্য টাকা দিবেন?

লবঙ্গ রাগিল। বলিল "এমন ছেলেও দেখি নাই! আমার কি টাকা রাখিবার জায়গা নাই? বিয়ে কি হয়, তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি। মেয়েমানুষ, সকল কথা ত জানি না। বিবাহ কি হয়?"

ছোট বাবু ছোট মাকে চিনিতেন। হাসিয়া বলিলেন, "তা মা, তুমি টাকা রেখ আমি সম্বন্ধ করিব।"

মনে মনে ললিত-লবঙ্গলতার মুণ্ডপাত করিতে করিতে আমি সেস্থান হইতে পলাইলাম।

তাই বলিতেছিলাম, বড়মানুষের বাড়ী ফুল যোগান বড় দায়।

বহুমূর্ত্তিময়ি বসুন্ধরে। তুমি দেখিতে কেমন? তুমি যে অসংখ্য, অচিন্তনীয় শক্তিধর, অনন্তবৈচিত্রবিশিষ্ট জড়পদার্থ সকল হৃদয়ে ধারণ কর, সে সব দেখিতে কেমন? যাকে যাকে লোকে সুন্দর বলে, সে সব দেখিতে কেমন? তোমার হৃদয়ে যে অসংখ্য, বহুপ্রকৃতিবিশিষ্ট জন্তুগণ বিচরণ করে, তারা সব দেখিতে কেমন? বল মা, তোমার হৃদয়ের সারভূত পুরুষজাতি দেখিতে কেমন? দেখাও মা, তাহার মধ্যে, যাহার করস্পর্শে এত সুখ, সে দেখিতে কেমন? দেখা মা, দেখিতে

কেমন দেখায় ? দেখা কি ? দেখা কেমন ? দেখিলে কিরূপ সুখ হয় ? এক মুহূর্ত্ত জন্য এই সুখময়স্পর্শ দেখিতে পাই না ? দেখা মা ! বাহিরের চক্ষু নিমীলিত থাকে—থাকুক মা ! আমার হৃদয়ের মধ্যে চক্ষু ফুটাইয়া দে, আমি একবার অন্তরের ভিতর অন্তর লুকাইয়া, মনের সাধে রূপ দেখে, নারীজন্ম সার্থক করি। সবাই দেখে—আমি দেখিব না কেন ? বুঝি কীট পতঙ্গ অবধি দেখে—আমি কি অপরাধে দেখিতে পাইব না ? — শুধু দেখা—কারও ক্ষতি নাই, কারও কষ্ট নাই, কারও পাপ নাই, সবাই অবহেলে দেখে—কি দোষে আমি কখনও দেখিব না ?

না ! না ! অদৃষ্টে নাই। হৃদয় মধ্যে খুঁজিলাম। শুধু শব্দ স্পর্শ গন্ধ। আর কিছু পাইলাম না।

আমার অন্তর বিদীর্ণ করিয়া ধ্বনি উঠিতে লাগিল, কে দেখাবি দেখা গো—আমায় রূপ দেখা ! বুঝিল না ! কেহই অন্ধের দুঃখ বুঝিল না।

দেবতত্ত্ব

সচরাচর আমাদিগের চতুঃপার্শ্বে যে সকল সামান্য সামান্য ঘটনা ঘটিতেছে, অনুসন্ধান করিলে তাহাদিগের মধ্যে অনেক গূঢ় তত্ত্ব পাওয়া যায়। আমরা সর্ব্বদা দেখিয়া থাকি, মানবশিশু হাসিতে হাসিতে খেলিতে খেলিতে আনন্দে দৌড়িতেছে; সহসা কপাট, কাষ্ঠাসন বা দেওয়ালে বাধিয়া পড়িয়া গেল; কোমল অঙ্গে ব্যথা পাইল; অমনি উঠিয়া উক্ত কপাট, কাষ্ঠাসন বা দেওয়ালকে মারিতে লাগিল। মারি দেখিয়া আমরা হাসি। হাসি কেন? আমরা জানি যে কপাট, কাষ্ঠাসন বা দেওয়াল অচেতন, শিশু উহাকে সচেতন জ্ঞান করিতেছে, শিশু ভাবিতেছে যে মারিলে উহার গাত্রে বেদনা লাগিবে। কিন্তু আমরা যতবড় বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্ হই না কেন, আমাদিগের হাসিবার কারণ অতি অল্পই আছে। আমরাও এককালে ঐ শিশুর সদৃশ ছিলাম। জ্ঞানোন্নতিসহকারে শিশুর ভ্রম দূর হইবে; সে জানিতে পারিবে যে কপাট, কাষ্ঠাসন, দেওয়াল প্রভৃতি জড় পদার্থ, সচেতন নহে। কিন্তু প্রথমতঃ এই সকল বস্তুকে সচেতন জ্ঞান করাই শিশুর স্বভাবসিদ্ধ। আমরা যাহা কিছু জানি, তাহার সহিত সাদৃশ্য দেখিয়া অপর পদার্থের প্রকৃতি নির্ণয় করিতে অগ্রসর হই। শিশুও এইরূপ করিয়া থাকে। আদৌ যে পদার্থের কারণত্ব তাহার জ্ঞানগোচর হয়, সেটী তাহার সচেতন আত্মা; বিশ্বপুস্তক পাঠ করিতে আরম্ভ করিয়াই সে আপনাকে কতকগুলি কার্য্যের কর্ত্তা বলিয়া বুঝিতে পারে এবং জানিতে পায় যে সে নিজে ইচ্ছা ও চেতনাবিশিষ্ট। সুতরাং যেখানে কোন কার্য্য দেখে, সেখানেই সচেতন ও ইচ্ছাবিশিষ্ট অধিষ্ঠাতা কল্পনা করে। ইহাতে তাহার ভ্রম হয় বটে, কিন্তু অনুমানের অন্য পথ অবলম্বন করিবার শক্তি তাহার নাই। যখন তাহার বুদ্ধির স্ফূর্ত্তি হইবে, জ্ঞানের বৃদ্ধি হইবে, তখন সে বুঝিতে পারিবে যে প্রথমে যে সকল নির্জ্জীব পদার্থকে সচেতন বলিয়া জ্ঞান করিয়াছে, ইচ্ছা এবং চেতনার প্রধান লক্ষণগুলিই তাহাদিগের নাই; সুতরাং তখন তাহার ভ্রান্তির নিবৃত্তি হইবে।

জ্ঞানসম্বন্ধে আদিম কালের মানবগণ এখনকার শিশুদিগের ন্যায় ছিলেন। আমরা যে সকল নৈসর্গিক নিয়মদ্বারা জগৎ কার্য্যের ব্যাখ্যা করি, তাঁহারা সে সকল কিছুই জানিতেন না। এ বিশ্ব তাঁহাদিগের নিকটে অসম্বদ্ধ ঘটনাবলীপূর্ণ বোধ হইত। আপনাদিগের কর্ত্তৃত্বসাদৃশ্যে জগৎকার্য্যের কারণানুসন্ধান করিতে গিয়া তাঁহারা সর্ব্বত্রই সচেতন এবং ইচ্ছাবিশিষ্ট অধিষ্ঠাতা অনুমান করিতেন। তাঁহারা দেখিতেন যে বায়ুর প্রভাবে কখন বা লতাপল্লব মন্দ মন্দ সঞ্চালিত হইতেছে, কখন বা মহদাকার মহীরুহ ভগ্ন বা সমূলে উন্মূলিত হইতেছে; দেখিয়া তাঁহারা বিবেচনা করিতেন যে বায়ু সচেতন এবং ইচ্ছাপূর্ব্বকই এই সকল কার্য্য করিতেছেন। সূর্য্য কখন অন্ধকারবিনষ্ট এবং জগৎ আলোকিত করিতেছেন, কখন বা প্রখর উত্তাপদ্বারা পৃথিবীমণ্ডল দগ্ধ করিতেছেন; দেখিয়া তাঁহারা ভাবিতেন যে সূর্য্যও চেতনাবিশিষ্ট এবং কখন প্রসন্ন, কখন অপ্রসন্ন হন বলিয়াই ইচ্ছাক্রমেই এরূপ করেন। অগ্নি কখন শীতার্ত্তের ক্লেশমোচন করিতেছেন, কখন আহার সামগ্রী প্রস্তুত করিতেছেন, কখন তিমির হরণ পূর্ব্বক নিশাকালে পদার্থ প্রকাশ ও ভয় নিবারণ করিতেছেন, কখন বা ভীমমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক কাননরাজী বা গৃহাবলী ভস্মসাৎ করিতেছেন; দেখিয়া তাঁহারা কল্পনা করিতেন যে অগ্নি সচেতন এবং কখন তুষ্ট কখন রুষ্ট হন বলিয়া এই সকল কার্য্য স্বেচ্ছাপূর্ব্বক করিয়া থাকেন। এইরূপে পূর্ব্বকালে প্রাকৃতিক ঘটনাভেদে ভিন্ন ভিন্ন অতিমানুষিক সচেতন অধিষ্ঠাতা কল্পিত হইয়াছিল; তন্মধ্যে কোন কোনটী মনুষ্যের মঙ্গলকর, কোন কোনটী অমঙ্গলকর বলিয়া বিবেচিত হইত। প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণ প্রথমোক্তদিগকে দেব, এবং শেষোক্তদিগকে অসুর বা দৈত্য বলিতেন। তাঁহাদিগের লিখনভঙ্গী দেখিয়া অনুমান হয় যে তাৎকালিক অজ্ঞানাবস্থায় দেখিয়া শুনিয়া আত্মরক্ষা করিয়া চলিবার পক্ষে আলোক যেরূপ উপকারী বোধ হইত, সেরূপ আর কিছুই হইত না; এ নিমিত্ত তাঁহারা প্রভাশালী সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি প্রভৃতির স্তুতিবাদ ও সাহায্য প্রার্থনা করিতেন। এই কারণেই আবার, যে মেঘ দিনমণি ও নিশামণিকে আবৃত করিয়া জগৎপ্রকাশক জ্যোতিঃ হরণ করিত, যে রাত্রি পৃথিবীমণ্ডল তিমিরাচ্ছন্ন করিত, এবং যে রাহু করাল কবল ব্যাদানপূর্ব্বক প্রভাকর ও সুধাকরকে গ্রাস করিত, তাহাদিগের প্রতি তাঁহারা ক্রোধ বা ঘৃণা প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। আমরা যে কেবল প্রলাপ বাক্য বলিতেছি না, কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিলেই প্রতীতি হইবে। দেবগণ প্রাচীনদিগের আরাধ্য, এবং দীপ্ত্যর্থবোধক দিব্ ধাতু হইতে দেব শব্দের উৎপত্তি। দেবরাজ ইন্দ্রের প্রধান শত্রু বৃত্র, এবং বৃত্র শব্দের অর্থ মেঘ। (১) অসুরেরা

---

(১) তারানাথকৃত শব্দস্তোম মহানিধি দেখ।

দেব বিরোধী, এবং রাত্রির একটী নাম অসুরা। (২) রাহু গ্রহণের কারণ এবং একজন প্রবল দৈত্য।

ভাষাতত্ত্বের অনুশীলন দ্বারা জানা গিয়াছে যে মধ্য এসিয়ার আদিম বাসস্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রস্থান করিবার পূর্ব্বেই আর্য্যজাতির মধ্যে দেবোপাসনা প্রচলিত হইয়াছিল। সংস্কৃত দেবস্, (৩) লাটিন দেউস্ (Deus), গ্রীক্ থেওস (Theos), ইহার সাক্ষ্যপ্রদান করিতেছে। পারসিক ভাষায় দেউ শব্দে দৈত্য এবং অহুর শব্দে দেবতা বুঝায়। যে কারণে সংস্কৃত সপ্তাহ পারসীতে হপ্তা, সংস্কৃত সপ্তসিন্ধু পারসীতে হপ্তহেন্দু হইয়াছে, সেই কারণেই সংস্কৃত অসুর পারসীতে অহুর হইয়াছে। অসুর প্রাচীন পারসিকদিগের উপাস্য এবং দেব ঘৃণ্য; ইহা দেখিয়া অনুমান হয় যে ধর্ম্মসংক্রান্ত বিবাদ উপস্থিত হইয়া হিন্দু এবং পারসিকদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন।

যে যে নৈসর্গিক ঘটনা লইয়া যে যে দেবতা কল্পিত, সেই সেই নৈসর্গিক ঘটনা অবলম্বন করিয়া সেই সেই দেবতাকে পুরাতন ঋষিগণ কত আখ্যা দিয়াছিলেন। এই আখ্যাগুলি অনেক সময়ে প্রাকৃততত্ত্বসমুদ্ভবা কবিকল্পনার সৃষ্টি। কালক্রমে তাহাদিগের মূল ভুলিয়া গিয়া লোকে যখন তাহাদিগের ব্যাখ্যা চেষ্টা করিতে লাগিল, তখন দেবতত্ত্ব সংক্রান্ত নানাবিধ উপাখ্যানের উৎপত্তি হইল। ভট্টমোক্ষমূলর বলেন, "যে সকল লোকে সুবর্ণবর্ণ সৌরকররাজীকে তরুপল্লবের সহিত যেন খেলিতে দেখিয়াছে, এই সকল প্রসারিত করদিগকে হস্ত বা বাহু বলিয়া বর্ণনা করা সে সকল লোকের অতি স্বাভাবিক ভাব। সুতরাং আমরা দেখিতে পাই যে বেদে সূর্য্যের অন্যতর নাম সবিতা "হিরণ্য পাণি" বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। কে ভাবিতে পারিত যে এমন একটী সরল উপমা ঔপাখ্যানিক ভ্রমের কারণ হইবে? কিন্তু আমরা দেখিতেছি যে বেদের টীকাকারগণ সূর্য্যের হিরণ্যপাণি নামে তদীয় রশ্মির সুবর্ণ কান্তি না বুঝিয়া, তদুপাসকদিগের উপর বর্ষণ করিবার নিমিত্ত তদীয় হস্তে স্বর্ণ আছে, ইহাই বুঝিয়াছিলেন। পুরাতন স্বাভাবিক আখ্যা হইতে একপ্রকার উপদেশ গৃহীত হইয়াছে, এবং লোকে এই বলিয়া সূর্য্যের উপাসনা করিতে উৎসাহিত হইয়াছে যে তদীয় যাজকদিগকে দিবার জন্য তাঁহার হস্তে স্বর্ণ আছে।……তিনি যে কেবল উপদেশে পরিণত হইয়াছেন এমন নহে; তিনি একটী উত্তম উপাখ্যানের বিষয়ও হইয়াছেন। হিরণ্যপাণি সূর্য্যের প্রকৃত অর্থ বুঝিতে লোকে অশক্ত হউক বা অনিচ্ছুক থাকুক, ইহা নিশ্চিত যে দেবতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় পুরাতন ব্রাহ্মণ গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে যে যজ্ঞে সূর্য্য আপনার হস্ত কাটিয়া

---

(২) তারানাথকৃত শব্দস্তোম মহানিধি দেখ।

(৩) দেবশব্দের প্রথমার একবচন, দেবঃ বা দেবম্।

ফেলেন এবং যাজকেরা তৎপরিবর্ত্তে তাঁহাকে সুবর্ণহস্ত প্রদান করেন। উত্তরকালে সূর্য্য সবিতা নামে আপনি যাজক হইয়াছেন; এবং কিরূপে যজ্ঞবিশেষে স্বহস্ত কাটিয়া ফেলেন, আর কিরূপে অপর যাজকেরা তজ্জন্য স্বর্ণহস্ত নির্ম্মাণ করেন, তদ্বিষয়ক একটী উপাখ্যান কথিত হইয়াছে।*

কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিয়া দেখিলেই প্রতীতি হইবে যে অনেক দেবতাই সূর্য্যের নামান্তর মাত্র। সূর্য্যার্ঘ্য প্রদানকালে এই মন্ত্রটী উচ্চারিত হয়—

"নমোবিবস্বতে ব্রহ্মন্ ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে
জগৎসবিত্রে শুচয়ে সবিত্রে কর্ম্মদায়িনে।"

অর্থাৎ "ব্রহ্মপ্রভাযুক্ত বিষ্ণুতেজোময় জগৎ প্রসবিতা শুচিকর্ম্মফলদায়ী সবিতা বিবস্বৎকে নমস্কার।" ইহাতে স্পষ্টই অনুমান হয় যে ব্রহ্মা ও বিষ্ণু উভয়েই সূর্য্যের নামভেদ মাত্র। যখন আমরা সূর্য্যোদয়কালকে ব্রহ্মমুহূর্ত্ত বলি, এবং ব্রহ্মাকে রক্তবর্ণ বলিয়া বর্ণনা করি, তখন কি মনে হয় না যে, উদয়কালীন সূর্য্যকে প্রথমে ব্রহ্মা বলিত? আর ব্রহ্মা যে সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া গণ্য হইবেন, তাহাও আশ্চর্য্য নহে। সূর্য্যোদয়ে তিমিরাচ্ছন্ন জগতের প্রকাশ এবং নিদ্রিত জীবের

---

* It was, for instance, a very natural idea for people who watched the golden beams of the Sun playing as it were with the foliage of trees, to speak of these outstretched rays as hands or arms. Thus we see that in the Vedas, Savitar, one of the names of the Sun, is called golden-handed (হিরণ্য পাণি). Who would have thought that such a simple metaphor could have ever caused any mythological misunderstanding? Nevertheless we find that the commentators of the Vedas see in the name golden-handed, as applied to the Sun, not the golden splendour of his rays, but the gold which he carries in his hands, and which he is ready to shower on his pious worshippers. A kind of moral is drawn from the old natural epithet, and people are encouraged to worship the Sun, because he has gold in his hands to bestow on his priests……He was not only turned into a lesson, but he also grew into a respectable myth. Whether people failed to see the natural meaning of the golden-handed Sun, or whether thy would, not see it, certain it is that the early theological treatises of the Brahmans tell of the Sun as having cut his hand at a sacrifice, and the priests having replaced it by an artificial hand made of gold. Nay, in later times the Sun, under the name of Savitar, becomes himself a priest, and a legend is told, how at a sacrifice he cut off his hand, and how the other priests made a golden hand for him."

Max Muller's Lectures on the Science of Language.

2nd Series, Pages 378-79.

জাগরণরূপ পুনর্জ্জীবন হয়। নিশাবসানে প্রভাকর দর্শনে আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগের মনে যে গভীর ভাব ও আনন্দের উৎপত্তি হইত, তাহা আমাদিগের বুঝিয়া উঠা দুষ্কর। আমাদিগের ন্যায় তাঁহারা সবিতার উদয়াস্তের কারণ জানিতেন না; কিন্তু তৎসঙ্গে আপন আপন সুখ দুঃখের অনেক যোগ দেখিতে পাইতেন। দুর্দ্দান্ত নিশাচরদিগকে তাড়াইয়া, অন্ধকার বিনাশ করিয়া, কুজ্ঝটিকা নিবারণ করিতে করিতে, যখন দিনমণি পূর্ব্বদিক্ সমুজ্জ্বল করিয়া উদিত হইতেন, তাঁহার রশ্মির মৃত্যুসঞ্জীবনী শক্তির প্রভাবে যেন বিশ্বসংসার পুনর্জ্জীবিত হইত। মধুময়ী উষা তাঁহার আগমন সম্বাদ দিত, সুগন্ধ গন্ধবহ তাঁহার অভিনন্দন করিত, কলকণ্ঠ বিহঙ্গমগণ তাঁহার আগমনী গাইত, নব নব কুসুমে এবং নীহার মুক্তাফলে সুসজ্জিত হইয়া ধরণী নূতন সৌন্দর্য্য ধারণ করিত, এবং চতুর্দ্দিকে প্রফুল্ল জীবন স্রোত প্রবাহিত হইয়া নিঃশব্দে বা উচ্চ নিনাদে ঈদৃশ সুখপ্রদ দেবের মহিমা প্রচার করিত। যখন মেঘ আসিয়া দিবাপতির প্রভা আবরণ করিত, অবনী-সুন্দরী যেন দুঃখে ম্লানমূর্ত্তি হইতেন। প্রাচীন আর্য্যকবি এই দুঃখে দুঃখিত হইতেন; তাঁহার আননও বিবর্ণ হইত। কিন্তু যখন দিননাথ নীরদনাগপাশ ছিন্ন করিয়া বহির্গত হইতেন, উল্লাসে কবি বিজয় সঙ্গীত গাইতেন। যখন হীনপ্রভ রবি পশ্চিমে ডুবিতেন, আর্য্য ঋষির অন্তঃকরণের শক্তিও ডুবিত, এবং স্বনিবাসে গমনপূর্ব্বক এই ভাবিতে ভাবিতে নিদ্রার হস্তে আত্মসমর্পণ করিতেন যে পুনরায় আপনি অথবা সূর্য্য উঠিবেন কি না সন্দেহ। তৎকালে প্রভাকরের গতি বা পরিণাম সম্বন্ধে বিজ্ঞান কোন কথাই কহেন নাই; সুতরাং কল্পনার বিচিত্র সৃষ্টির বিস্তীর্ণ স্থান ছিল। আলোক এবং অন্ধকার, দিবা এবং রাত্রি, সূর্য্য এবং মেঘ ইত্যাদিগের পরস্পর যুদ্ধ মঙ্গলশক্তি ও অমঙ্গল শক্তির যুদ্ধের ন্যায় প্রাচীনকালের চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গের চক্ষে লাগিত। তাঁহারা অতিশয় উৎসাহ সহকারে এই সৌর-নাটকের অভিনয় সন্দর্শন করিতেন; এবং কখন ভক্তিতে, কখন যুক্তিতে, কখন বা কবিত্বে পরিপূর্ণ বাক্যে আপনাদিগের উচ্ছ্বসিত অন্তঃকরণের ভাব প্রকাশ করিতেন। দূর প্রতিধ্বনিবৎ সেই অপুনরাগম্য কালের কোন কোন বাক্য বেদে শ্রুত হয়; এবং তৎসমুদয়ের নির্দ্দেশে অনেক দেবতার প্রকৃতি নির্ণীত হয়।

আমরা বলিয়াছি যে সূর্য্যই ব্রহ্মা। এটী নূতন কথা নহে। সুবিখ্যাত কুমারিল্ল ভট্ট যখন বৌদ্ধদিগের সহিত বিচার করিয়াছিলেন, তখন তিনিও এই কথা বলিয়াছিলেন। কথিত আছে যে প্রজাপতি ব্রহ্মা তদীয় কন্যা উষাতে উপগত হইয়াছিলেন। বৌদ্ধেরা তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে এই আপত্তি করিলে কুমারিল্ল ভট্ট বলিয়াছিলেন,

"প্রজাপতিস্তাবৎ প্রজাপালনাধিকারাদাদিত্য এবোচ্যতে।

স চারুণোদয় বেলায়ামুষসমভ্যেতি সা তদাগমনাদেবোপজায়ত ইতিতদ্দুহিতৃত্বেন ব্যপদিশ্যতে। তস্যাং চারুণ কিরণাখ্যবীজ নিক্ষেপাৎ স্ত্রীপুরুষ সংযোগবদুপচারঃ।" অর্থাৎ—

"প্রজাপালন করেন বলিয়া সূর্য্যকে প্রজাপতি বলে। অরুণোদয় সময়ে তাঁহার আগমনে উষার উৎপত্তি, এজন্য উষাকে তাঁহার দুহিতা বলে। উষার সহিত তাঁহার তেজ সংযোগ ঘটে, এজন্য উভয়কে স্ত্রীপুরুষভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে।"

বিষ্ণু যে সূর্য্য, ইহার অপর প্রমাণ দেওয়া যাইতেছে। ঋগ্বেদে লিখিত আছে,

"ইদম্ বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদাধে পদং।"

অর্থাৎ "বিষ্ণু ইহা পরিক্রম করিয়াছিলেন। তিন স্থলে তিনি পদ-স্থাপন করিয়াছিলেন।" নিরুক্তকার যাস্ক ইহার পশ্চাদুক্ত অর্থ লিখিয়াছেন :—

"যদ্ ইদম্ কিঞ্চ তদ্ বিক্রমতে বিষ্ণুঃ। ত্রিধা নিধত্তে পদং।
ত্রেধাভাবা পৃথিব্যাম্ অন্তরীক্ষে দিবি" ইতি শাকপূণিঃ।
"সমারোহণে বিষ্ণুপাদে গয়াশিরসি" ইতি ঔর্ণবাভঃ।

অর্থাৎ "যাহা কিছু আছে, বিষ্ণু পরিক্রম করিয়াছেন। তাঁহার পদ তিনি ত্রিধা স্থাপন করিয়াছেন, অর্থাৎ শাকপূণির মতে পৃথিবীতে অন্তরীক্ষে এবং আকাশে; ঔর্ণবাভের মতে সমারোহণে, বিষ্ণুপাদে এবং গয়াশিরে।"

দুর্গাচার্য্য নিরুক্তের টিকার এই ব্যাখ্যা অবলম্বন করিয়া লিখিয়াছেন :—

"বিষ্ণুরাদিত্যঃ। কথং ইতি যত আহ 'ত্রেধা নিদাধে পদম্,' নিধত্তে পদং নিধানং পদৈঃ। ক তৎ তাবৎ।
পৃথিব্যামন্তরীক্ষে দিবি ইতি শাকপূণিঃ। পার্থিবোগ্নির্ভূত্বা।
পৃথিব্যাম্ যৎকিঞ্চিদস্তিতদ্ বিক্রমতে তদধিতিষ্ঠতি।
অন্তরীক্ষে বৈদ্যুতাত্মনা। দিবি সূর্য্যাত্মনা। সমারোহণে,
উদয়গিরাবুদ্যন্ পদমেকং নিধত্তে। বিষ্ণুপাদে, মধ্যন্দিনেঽন্তরীক্ষে।
গয়াশিরসি, অস্তগিরাবিত্যৌর্ণবাভ আচার্য্যোমন্যতে।"

অর্থাৎ "বিষ্ণু আদিত্য। কেন? কারণ, উক্ত হইয়াছে যে, তিন স্থলে তিনি পদ-স্থাপন করেন। কোথায় এরূপ করেন? শাকপূনির মতে, পৃথিবীতে, অন্তরীক্ষে এবং আকাশে। অগ্নিরূপে পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহাতে পরিক্রম, তাহাতে অধিষ্ঠান করেন। অন্তরীক্ষে বিদ্যুৎরূপে। আকাশে সূর্য্যরূপে।...... ঔর্ণবাভ আচার্য্যের মতে তিনি একপাদ উদয়কালে সমারোহণে অর্থাৎ উদয়গিরিতে স্থাপন করেন; একপাদ মধ্যাহ্নে বিষ্ণুপাদে বা অন্তরীক্ষে; একপাদ গয়াশিরে অর্থাৎ অস্তগিরিতে।"

গয়াশির শব্দের অর্থ ভুলিয়া গিয়া, বিষ্ণুগয়াশিরে একপাদ স্থাপন করিয়াছিলেন, ঔর্ণবাভ ঋষির এই কথা লইয়া লোকে যে গয়াসুরের গল্প রচনা করিয়াছে এবং সুবিধাক্রমে গয়ানামক একটী স্থান থাকায় এই উপলক্ষে তাহার মাহাত্ম্য জন্মিয়াছে, ইহা বোধ হয় পাঠকেরা সহজেই বুঝিতে পারিবেন। কোন একটী আখ্যার প্রকৃত অর্থভেদ করিতে না পারিয়া কল্পনাদ্বারা তাহার ব্যাখ্যা করিতে গিয়াই, অধিকাংশ দেবঘটিত উপাখ্যানের সৃষ্টি হইয়াছে, অনুসন্ধান করিলে পদে পদেই এই সত্যটী লক্ষিত হইবে।

কেবল ব্রহ্মা বিষ্ণু নহে, রুদ্র ও সূর্য্য। এবিষয়ে আমাদিগের অধিক কথা কহিবার প্রয়োজন নাই; প্রচলিত "রৌদ্র" শব্দই ইহার যথেষ্ট প্রমাণ। যখন সূর্য্য কিরণকে আমরা "রৌদ্র" বলিতেছি, তখন পূর্ব্বকালে যে সূর্য্যকে রুদ্র বলিত তাহার সন্দেহ নাই।

বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্মে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্রই দেবতাদিগের মধ্যে প্রধান, কিন্তু বৈদিক সময়ে অপর তিনটী প্রধান বলিয়া পরিগণিত হইত। নিরুক্তকার যাস্ক লিখিয়াছেন, "তিস্র এব দেবতা ইতি নৈরুক্তা অগ্নিঃ পৃথিবীস্থানোবায়ুর্ব্বা ইন্দ্রোবান্তরীক্ষস্থানঃ সূর্য্যো দ্যুস্থানঃ। তাসাম্ মহাভাগ্যাদেকৈকস্যাপি বহূনি নামধেয়ানি ভবন্তি। অপিবা কর্ম্ম পৃথক্ ত্বাদ্ যথা হোতাধ্বর্য্যু র্ব্রহ্মা উদ্গাতা ইত্যপ্যেকস্য সতঃ।"

অর্থাৎ "নিরুক্তকারদিগের মতে দেবতা তিনটী; অগ্নি, পৃথিবী যাহার স্থান; বায়ু বা ইন্দ্র, অন্তরীক্ষ যাহার স্থান; এবং সূর্য্য, আকাশ যাহার স্থান। তাঁহাদিগের মহিমা প্রকাশার্থে তাঁহাদিগকে বহু নাম প্রদত্ত হইয়া থাকে; অথবা তাঁহাদিগের কার্য্যভেদ প্রদর্শনার্থে, যথা একই ব্যক্তি কার্য্যভেদে হোতা, অধ্বর্য্যু, ব্রহ্মা, উদ্গাতা প্রভৃতি নামে অভিহিত হয়।"

আমরা দেখাইয়াছি যে ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র তিনটীই সূর্য্যের নামান্তর। এক্ষণে আমরা ইন্দ্রের সম্বন্ধে গুটিকতক কথা বলিব; কারণ তিনি অদ্যাপি নামে দেবাধিপতি, এবং বৈদিক কালে অতি প্রধান পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

শব্দস্তোম মহানিধিতে পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত তারানাথ তর্কবাচস্পতি ঐশ্বর্য্যার্থবোধক ইদি ধাতু হইতে ইন্দ্র শব্দের ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন, এবং উহার যে সকল অর্থ লিখিয়াছেন তন্মধ্যে দ্বাদশ অর্কের অন্তর্গত একটি অর্ক আছে।

কুমারিল ভট্টের মতেও, ইন্দ্র সূর্য্য। ইন্দ্র অহল্যার সতীত্ব হরণ করিয়াছিলেন বলিয়া যে অপবাদ আছে, তাহার প্রকৃত অর্থ বুঝাইতে গিয়া কুমারিল লিখিয়াছেন,

"সমস্ততেজাঃ পরমেশ্বরত্বনিমিত্তেন্দ্র শব্দবাচ্যঃ সবিতৈবাহনি লীয়মানতয়া রাত্রেরহল্যা শব্দ বাচ্যায়াঃ ক্ষয়াত্মকজরণ হেতুত্বাজ্জীর্যত্যস্মাদনেন বোদিতেন বেত্যহল্যা জার ইত্যুচ্যতে ন পরস্ত্রীব্যভিচারাৎ।"

অর্থাৎ "তেজোময় সবিতা ঐশ্বর্য্য হেতুক ইন্দ্রপদবাচ্য। অহন্ অর্থাৎ দিনকে লয় করে বলিয়া রাত্রির নাম অহল্যা। সেই রাত্রিকে ক্ষয় বা জীর্ণ করেন বলিয়া ইন্দ্র অর্থাৎ সবিতাকে অহল্যাজার বলে, ব্যভিচার জন্য নয়।"

এই উপাখ্যান সম্বন্ধে আরও দুই একটি কথা বলা যাইতে পারে। কথিত আছে যে অহল্যা গোতমের স্ত্রী ছিলেন। আমাদিগের বোধ হয় যে গোতম শব্দের অর্থ চন্দ্র, গো (রশ্মি) এবং তম্ (বাঞ্ছা করা) হইতে ইহার উৎপত্তি; কেন না চন্দ্র যে—সূর্য্যের নিকট হইতে আলোক প্রাপ্ত হন, ইহা এতদ্দেশীয় পণ্ডিতগণ জানিতেন, যথা—

> "পিতুঃ প্রযত্নাৎ স সমগ্রসম্পদঃ শুভৈঃ শরীরাবয়বৈর্দিনে দিনে।
> পুপোষ বৃদ্ধিং হরিদশ্বদীধিতে রনু প্রবেশাদিব বাল চন্দ্রমা ॥"
>
> রঘুবংশ।

অর্থাৎ "সমগ্রসম্পদসম্পন্ন পিতার প্রযত্নে তাঁহার সুন্দর শরীরাবয়ব দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, যেমন সূর্য্যরশ্মির অনুপ্রবেশে বাল চন্দ্রমা বৃদ্ধি পায়।"

অথবা এমনও হইতে পারে যে বাস্তবিক গোতম নামে একজন ঋষি ছিলেন, এবং তাঁহার স্ত্রীর নাম অহল্যা ছিল। পরে লোকে এই অহল্যার সহিত সূর্য্যহৃতা অহল্যার একতা অনুমান করিয়া গোতম মুনির স্ত্রীকে ইন্দ্র হরণ করেন, এই গল্পটার সৃষ্টি করিয়াছেন।

বোধ হয়, এক অহল্যাকে অপর অহল্যা ভাবিয়া এই উপাখ্যানের আর একটা অংশ কল্পিত হইয়াছে। কথিত আছে যে পতির অভিসম্পাতে অহল্যা পাষাণ হইয়াছিলেন; বহুকালান্তে রাম সীতা বিবাহ করিবার পূর্ব্বে তাঁহাকে উদ্ধার করেন। তারানাথ বলেন যে কর্ষণার্থ বোধক হল্ ধাতু হইতে অহল্যা শব্দের উৎপত্তি; সুতরাং এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে অহল্যা শব্দের অর্থ "যাহা কর্ষণযোগ্য নহে অর্থাৎ প্রস্তরময় ভূমি।" এই অহল্যার সহিত সূর্য্যহৃতা অহল্যার একতা ভাবিলে অহল্যার পাষাণ হইবার কথা সৃষ্ট হইবে, আশ্চর্য্য নহে। রাম সীতারে বিবাহ করিবার পূর্ব্বে অহল্যাকে মুক্ত করিলেন, ইহারও গূঢ় অর্থ আছে। রাম শব্দের উত্তর আরাম বা সুখস্বচ্ছন্দ; সীতা কৃষ্টভূমি; অহল্যা অকৃষ্য ভূমি। সুতরাং ভাবার্থ এই হইতেছে যে, অকৃষ্য ভূমি মুক্ত করিয়া কৃষিকার্য্য করিলে মনুষ্যে সুখস্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে। সীতার জন্মবিষয়ে যাহা কিছু লিখিত আছে; তাহাতেও

আমাদিগের কথারই প্রতিপোষকতা হয়। সীতা পৃথিবীর কন্যা, অযোণিসম্ভবা, ভূমিকর্ষণকালে লাঙ্গলের ফালে উঠিয়াছিলেন।

এই প্রসঙ্গে ইন্দ্রের দুইটি নামের ব্যাখ্যা করা যাইতেছে। তিনি নাকি প্রথমে গোতমের শাপে সহস্রযোণি, পরে সেই মুনির প্রসাদে সহস্রাক্ষ হইয়াছিলেন। আমাদিগের বোধ হয় ইন্দ্রকে সহস্রযোণি বলিবার অর্থ এই যে তিনি অসংখ্য ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন। তিনি কখন সূর্য্য, কখন বায়ু, কখন বিষ্ণু, কখন বৃত্রহন্ ইত্যাদি; কেননা কার্য্য বা মাহাত্ম্যভেদে তিনি ভিন্ন ভিন্নরূপে প্রতীয়মান হন। সহস্রাক্ষ বলিতে সূর্য্যের সহস্র দিক্-প্রকাশক কিরণমালা; নতুবা অন্তরীক্ষপতি বলিয়া ইন্দ্রকে আকাশের সহিত এক জ্ঞান করিয়া আকাশের অসংখ্য তারকানিচয়কে তাঁহার চক্ষু বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে।

মেঘের নাম বৃত্র; সেই বৃত্রের সহিত বেদে ইন্দ্রের অর্থাৎ সূর্য্যের ক্রমাগত যুদ্ধ। এই ঘটনা এবং দিবারাত্রির বিরোধ অবলম্বন করিয়াই বৃত্রাসুরের উপাখ্যান এবং দেবাসুরের সমর সৃষ্ট হইয়াছে। সুতরাং কখন কখন আমরা দেবতাদিগের পরাজয় দেখিতে পাই। মেঘ অথবা রাত্রি যেমন দিনমণিকে সময়ে সময়ে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, দৈত্যগণও তেমনিই দেবগণকে সময়ে সময়ে পরাভূত করে। দিনমণি যেমন তৎকালে মহিমাবিচ্যুত হইয়া কোথায় প্রচ্ছন্নভাবে থাকেন, তেমনই দৈত্যযুদ্ধে বিগতগৌরব দেবগণ রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া কোথায় লুক্কায়িত থাকেন। সময়ে সময়ে যেমন মেঘদল বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে এবং সূর্য্য মুক্ত হইবেন আশা জন্মে, তেমনই মধ্যে মধ্যে দৈত্যদল ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করে এবং দেবতাদিগের জয়ের সম্ভাবনা হইয়া উঠে। সহসা আবার যেমন নূতন মেঘ আসিয়া দিবাকরকে ঢাকিয়া ফেলে, তেমনই আবার নূতন দৈত্যসেনা সংগ্রামস্থলে উপস্থিত হইয়া বিজয়প্রত্যাশী দেবতাদিগকে অভিভূত করে। কিন্তু মেঘের যত কেন প্রতাপ হউক না, মেঘ অশ্ব, হস্তী, মহিষ প্রভৃতি যে কোন ভয়ানক মূর্ত্তি ধরুক না, পরিশেষে সূর্য্যের যেরূপ নিশ্চিত জয়লাভ হয়, তদ্রূপ দৈত্যগণ যত কেন প্রবল হউক না, তাহারা মায়াবলে যত কেন ভীষণাকার ধারণ করুক না, অবশেষে প্রভাশালী অমর নির্জ্জর দেবগণের জয়লাভ হইবেই হইবে।

দিনে সূর্য্যের আলোক আমাদিগের সহায়; রাত্রিকালে চন্দ্রের আলোক। চন্দ্রসংক্রান্ত দুই একটী কথা বলিয়া আমরা এবার এই প্রস্তাবের উপসংহার করিব।

দীপ্ত্যর্থবোধক চদ্ ধাতু হইতে চন্দ্র শব্দের উৎপত্তি। সুধাময়ী জ্যোৎস্না বিতরণ করিয়া নিশাসময়ে হিংস্রজন্তু ও শত্রুগণের হস্ত হইতে মুক্ত হইবার পথ চন্দ্র দেখাইয়া দিতেন। কেন তাঁহাকে দেবতা বলিয়া আদিকালের লোকে পূজা না করিবে? দিবাভাগে জ্বলিয়া পুড়িয়া যামিনীতে চন্দ্রালোকে বসিলে কাহার মন

না প্রফুল্ল হয় এবং কাহার চিত্তে না ভক্তি ও প্রীতি উচ্ছলিত হইয়া পড়ে? কিন্তু চন্দ্র যদিও উপাস্য দেবতা, তাঁহার অঙ্গে কৃষ্ণবর্ণ চিহ্ন কেন এই বিষয়ের চিন্তা প্রাচীন কবিদিগের মনে উঠিতে লাগিল। কেহ চিহ্নের আকার দেখিয়া কল্পনাবলে তাঁহাকে শশাঙ্ক, কেহ বা মৃগাঙ্ক বলিলেন। অমনি কেহ অনুমান করিলেন যে বাস্তবিক তাঁহার কোলে একটী মৃগশিশু বা শশশিশু আছে। কেহ বা আরও সূক্ষ্ম টানিয়া স্থির করিলেন যে, চন্দ্র মৃগ চুরি করিয়া কলঙ্কিত হইয়াছেন। অন্য একদল এই কলঙ্কের অপর কারণ কল্পনা করিলেন। ইঁহারা বলিলেন যে দেবগুরু বৃহস্পতির পত্নী তারাকে হরণ করিয়া চন্দ্র কলঙ্কিত হইয়াছেন। এ কথার মূল আমাদিগের যেরূপ বোধ হয় নিম্নে লিখিত হইতেছে। বৃহস্পতিগ্রহ দেবগুরু অর্থাৎ দীপ্তিতে শ্রেষ্ঠ; এই কারণেই তারকাসভামাঝে তাঁহার শোভাসন্দর্শন করিয়া বোধ হয় কোন কবি তাঁহাকে তারাপতি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন। চন্দ্র যেরূপে তারকামণ্ডলীতে বিরাজ করেন, তাহা দেখিয়া আর কোন কবি তাঁহাকে তারাপতি বলিয়াছিলেন। উত্তরকালে বৃহস্পতি ও চন্দ্র উভয়ের তারাপতিত্বের সামঞ্জস্য করিতে গিয়া একটি বিকৃত গল্পের সৃষ্টি হইয়াছে। দেবগুরু বলিয়া বৃহস্পতির স্কন্ধে না চাপিয়া, দোষটী চন্দ্রের স্কন্ধেই চাপিয়াছে; এবং বিচারকালে চন্দ্রের কলঙ্কও তাঁহার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছে। কে না জানে যে কোন উচ্চপদস্থ ব্যক্তির দোষ সহসা বিশ্বাস্য হয় না, বিশেষতঃ যদি তাহার বিপক্ষ দাগী লোক হয়?

যে শাস্ত্রকারেরা পরদারাকে মাতৃবৎ জ্ঞান করিতেন, তাঁহারা তাঁহাদিগের উপাস্য দেবতাদিগের চরিত্র সম্বন্ধে অশ্লীল উপাখ্যান লিপিবদ্ধ করিয়াছেন দেখিয়া অনেকে বিস্মিত হন। পুরাতন আখ্যার প্রকৃত অর্থ বুঝিতে না পারিবার দোষে যে প্রকারে কালক্রমে উক্তবিধ উপাখ্যানসকলের উৎপত্তি হয়, শব্দ-বিজ্ঞানের সাহায্য অবলম্বন পূর্ব্বক এই প্রবন্ধে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস প্রদত্ত হইল। যাঁহারা এই বিষয়ের অধিক সমালোচনা করিবেন, তাঁহারা পৌরাণিক উপাখ্যানাদির যথার্থ অর্থ অবগত হইয়া নূতন আনন্দ অনুভব করিবেন, সন্দেহ নাই।

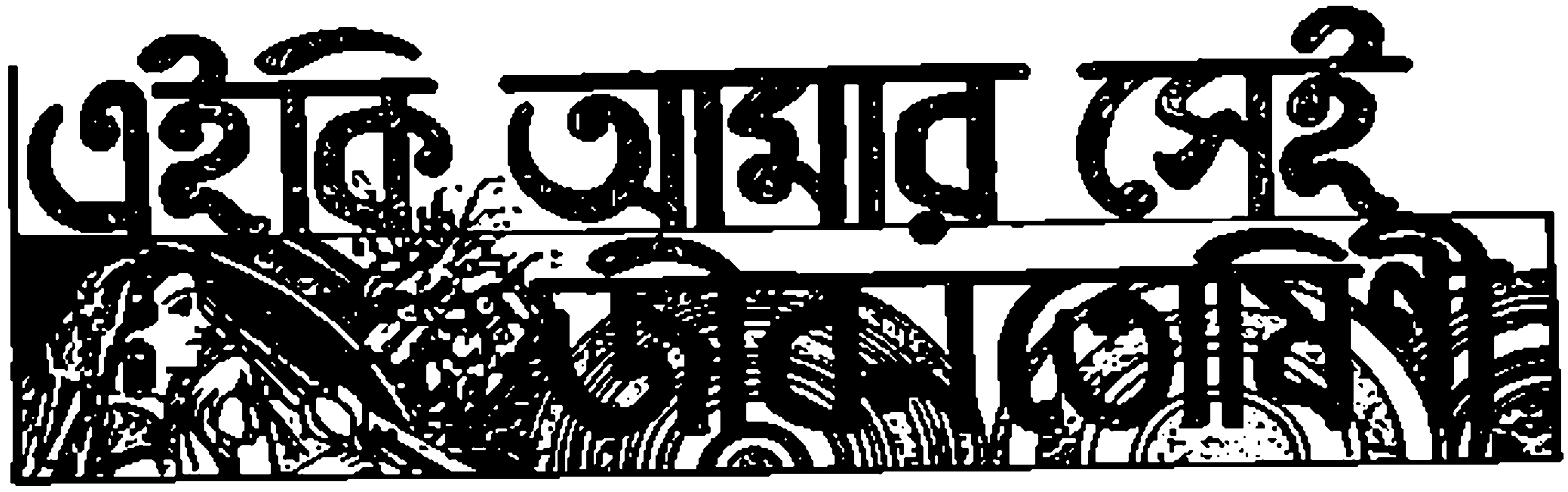

এই কি আমার সেই জীবনতোষিণী

১

এই কি আমার সেই জীবনতোষিণী ?
যৌবনের সুখময়ী সুধাতরঙ্গিণী !
এই কি সে করতল শিরীষ কোমল ?
ধরিতে হৃদয়ে যাহা হয়েছি পাগল !
এই কি সে প্রাণহরা চোরা প্রিয় আঁখি ?
সাধ্য নাহি ছিল যারে ক্ষণ ধরে রাখি !
এই কি রে সেই তনু স্বর্ণ জিনি যার
লবণ্য কম্পিত অঙ্গে—এই সে আমার ?—
পালঙ্ক উপরে নারী পার্শ্বদেশে বসি তারি
ধীরে কোন প্রৌঢ়জন বলে ;
অলকার কেশগুলি হেসে ধীরে করে তুলি
ঘরে দীপ ধিকি ধিকি জ্বলে ।

২

সাধের সামগ্রী যত, সকলি হেথায়
এইরূপে কলঙ্কিত কালের কলায় !
সোণার বিগ্রহে যদি পূজ একদিন,
সেও রে পরশ দোষে হয় রে মলিন !
হীরকে কাটিয়া কর চিকণ দর্পণ,
তাতেও কালের ছায়া কালেতে পতন !
কত শোভা পদ্মদলে জলে যবে ভাসে ;
পরশ বারেক তারে—তারো শোভা হ্রাসে !
সংসারের সুখ-পদ্ম নারীও শুকায় সদ্য
পুরুষের দরশ পরশে !
বলে আর ফিরে ফিরে নেহারে নেহারে ধীরে
নারী-অঙ্গ নিদ্রার সরসে ।

৩

প্রবেশি সংসারে যবে—কি সুখের কাল !
প্রকৃতির বুকে যেন সুবর্ণের জাল
যতনে ছড়ান ছিল—জড়ান তাহাতে
কত মোহকর চিত্র নয়ন জুড়াতে !
কিবা নিদ্রা, কি স্বপন, কিবা সে জাগিয়া
সকলি নিরখি বুক উঠিত নাচিয়া ;
ছুটিয়া বেড়াত প্রাণ আশার খেলায়,
ভাবিয়া মানসে এই তরুণী-লতায় !
ভেবেছিনু সমুদয় পৃথিবীর সুখচয়
নবতরু রোপেছি আনিয়া !
সে নবীন তরু এই হায়রে আজিও সেই
কোথা গেল সে আশা ভাসিয়া !

৪

"কেন, নাথ, কেন কেন" বলিয়া তখন
উঠিলা রমণী সেই ত্যজিয়া শয়ন ;
তুলিয়া পরিয়া গলে বিগলিত হার,
বলে "নাথ, হের দেখ এখনও বাহার ;
"চারা গাছে পাতা ছিল এবে ফুল তার
"ফুটেছে কেমন দেখ পাতায় পাতায় ;
"কে বলেছে ফুরায়েছে সে সাধের আশা
"সেই তুমি সেই আমি সেই ভালবাসা ।
"মন দিয়ে খেল নাথ ফিরে হবে বাজি মাৎ
সেই খেলা আবার খেলিব ;
সেই পুঁজি সেই পণ সেই প্রাণ সেই মন
প্রাণনাথ সকলি সে দিব ।"

৫

কি দিবিরে পাগলিনি—পাবি কি কোথায় ?
সাধের বাগান ভাঙ্গা চেয়ে দেখ [illegible]!
ছায়া করে ছিল তাহে যেই দুটি তরু,
বসিতাম তলে যার যবে ভার গুরু,
একটি তাহার হায়, সমূলে ভাঙ্গিয়া
গিয়াছে কোথায় চলে—সঙ্গিনী ছাড়িয়া।
বল্মীকিতে জর জর নীরস শরীর,
সেও হায় গতপ্রায় বজ্রাহত শির !
রোপিনু যে এত সাধে ফুলতরু কাঁধে কাঁধে
কটি তরু আছে বল তার ?
কটি বল ফুটে আছে দাঁড়াইলে কার কাছে
সেই ঘ্রাণ ছোটে পুনর্ব্বার !

৬

পাগলিনী কোথা পাবি সে শোভা আবার—
সে ফুলের মধু, বাস, এখন সে আবার !
"কোথা পাব ? এস নাথ দর্পণের কাছে,
"দেখাই সে শোভা গত, এবে কোথা আছে।
"কেন নাথ, নাই কি হে ?—এই ত সে সব ;
"সেই চারু চাঁদমুখ, প্রাণের বল্লভ,
"সেই ত অমিয় মাখা, এখনও তোমার,
"নয়ন বচন, হাসি—দর্পণ মাঝার !—
"সেই বাহুলতা এই অধরে সে তিল এই
তখনও যা ছিলে, নাথ, এখনও ত সেই ;
"সেই আমি সেই প্রাণ হৃদয়েতে সেই গান
তখন এখন্ কই প্রভেদ ত নেই।"

৭

"প্রভেদ কি নাই"—হায় হায় রে কপটী,
দেখ্ দেখি একবার নয়ন পালটি
যৌবনের কুঞ্জবন—কত ছিল তায়
সারি, শ্যামা, শুক, পিক পাতায় পাতায় !
যতনে ডাকিলে কাছে হরিষে আসিয়া,
হৃদয়ে মাথায়, কোলে পড়িত লুটিয়া ;
এখনও কি সেই পাখী, আছে কি সে রব ?
সেইরূপে কাছে এসে করে কিরে রব ?
কত উড়ে গেছে তার, উড়্ উড়্ কত আর,
কত হায় নীরবে বসিয়া
অসুখে শাখীতে লুটে ডাকিলে আসেনা ছুটে
কাঁদে বসি সংগীত ভুলিয়া !

৮

এখন বাজে না আর সে কুহক-বাঁশী
মোহিনী মায়ার মুখ—সকলি রে বাসি
নিগন্ধ জগতে এবে—নিগন্ধ হৃদয়
বসন্তের বাস শূন্য, ফণীর আলয় !
যাছিল স্নেহের মণি দিয়াছি বিলায়ে,
এখন ভিখারী—কাঁচ পাই না কুড়ায়ে।
ভেঙ্গেছে, প্রেয়সি, সেই আশার আরসি
হাসি, কাঁদি, খেলি বটে তবুও উদাসী।
"তবুও উদাসী ?" নাথ কর দেখি দৃষ্টিপাত
বারেক এ শিশুর বদন
বলে তুলে আনি সুখে রাখিলা স্বামির বুকে
পুনঃ মায়া-নিগড়ে বন্ধন !

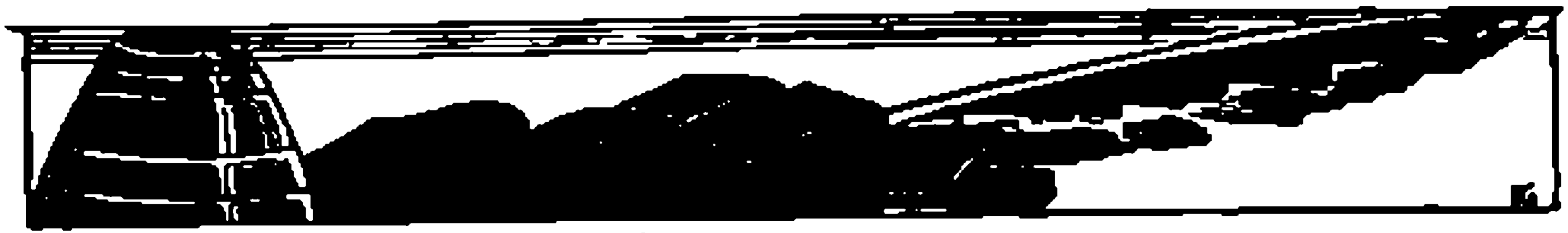

কমলাকান্তের দপ্তর

বড় বাজার

প্রসন্ন গোয়ালিনীর সঙ্গে আমার চিরবিচ্ছেদের সম্ভাবনা দেখিতেছি। আমি নশীরাম বাবুর গৃহে আসিয়া অবধি, তাহার নিকট ক্ষীর, সর, দধি, দুগ্ধ এবং নবনীত খাইতেছি। আহারকালে মনে করিতাম, প্রসন্ন কেবল পরলোকে সদ্গতির কামনায় অনন্ত পুণ্য সঞ্চয় করিতেছে;—জানিতাম, সংসারারণ্যে যাহারা পুণ্যরূপ মৃগ ধরিবার জন্য ফাঁদ পাতিয়া বেড়ায়, প্রসন্ন তন্মধ্যে সুচতুরা; ভোজনান্তে নিত্যই প্রসন্নের পরকালে অক্ষয় স্বর্গ এবং ইহকালে মৌতাত বৃদ্ধির জন্য দেবতার কাছে প্রার্থনা করিতাম। কিন্তু এক্ষণে হায়! মানবচরিত্র কি ভীষণ স্বার্থপরতায় কলঙ্কিত! এক্ষণে সে মূল্য চাহিতেছে!

সুতরাং তাহার সঙ্গে চিরবিচ্ছেদের সম্ভাবনা। প্রথমদিন সে যখন মূল্য চাহিল, রসিকতা করিয়া উড়াইয়া দিলাম—দ্বিতীয়দিনে বিস্মিত হইলাম—তৃতীয়দিনে গালি দিয়াছি। এক্ষণে সে দুধ দই বন্ধ করিয়াছে। কি ভয়ানক! এতদিনে জানিলাম মনুষ্যজাতি নিতান্ত স্বার্থপর; এতদিনে জানিয়াছি যে, যে সকল আশা ভরসা সযত্নে হৃদয়ক্ষেত্রে রোপণ করিয়া বিশ্বাস জলে পুষ্ট কর, সকলই বৃথা! এক্ষণে জানিয়াছি যে, ভক্তিপ্রীতি স্নেহ প্রণয়াদি সকলই বৃথা গন্ধ—আকাশ-কুসুম! ছায়াবাজি! হায়! মনুষ্যজাতির কি হইবে! হায়, অর্থলুব্ধ গোয়ালা জাতিকে কে নিস্তার করিবে! হায়! প্রসন্ন নামে গোয়ালার কবে গোরু চুরি যাবে!

প্রসন্নের দুগ্ধ দধি আছে, সে দিবে, আমার উদর আছে, খাইব; তাহার সঙ্গে এই সম্বন্ধ; ইহাতে সে মূল্য চাহে কোন্ অধিকারে, তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না। প্রসন্ন বলে, আমি অধিকার অনধিকার বুঝি না; আমার গোরু, আমার দুধ, আমি মূল্য লইব। সে বুঝে না যে, গোরু কাহারও নহে; গোরু, গোরুর নিজের; দুধ, যে খায় তারই।

তবে, এসংসারে মূল্য লওয়া একটা রীতি আছে, স্বীকার করি। কেবল খাদ্যসামগ্রী কেন, সকল সামগ্রীই মূল্য দিয়া ক্রয় করিতে হয়। দুধ দই, চাল

দাল, খাদ্য, পেয়, পরিধেয় প্রভৃতি পণ্যদ্রব্য দূরে থাকুক, বিদ্যা বুদ্ধিও মূল্য দিয়া কিনিতে হয়। কালেজে মূল্য দিয়া বিদ্যা কিনিতে হয়। অনেকে ভাল কথা মূল্য দিয়া কিনিয়া থাকেন। হিন্দুরা সচরাচর মূল্য দিয়া ধর্ম্ম কিনিয়া থাকেন। যশঃ মান অতি অল্প মূল্যেই ক্রীত হইয়া থাকে। ভাল সামগ্রী মূল্য দিয়া কিনিতে হইবে, ইহাও কতক বুঝিতে পারি, কিন্তু মনুষ্য এমনই মূল্যপ্রিয় যে, বিনামূল্যে মন্দ সামগ্রীও কেহ কাহাকে দেয় না। যে বিষ খাইয়া মরিবার বাসনা কর, তাহাও তোমাকে বাজার হইতে মূল্য দিয়া, কিনিয়া খাইতে হইবে।

অতএব এই বিশ্ব-সংসার একটি বৃহৎ বাজার—সকলেই সেখানে আপনাপন দোকান সাজাইয়া বসিয়া আছে। সকলেরই উদ্দেশ্য মূল্য প্রাপ্তি। সকলই অনবরত ডাকিতেছে "আমার দোকানে ভাল জিনিস—খরিদ্দার চলে আয়"—সকলেরই একমাত্র উদ্দেশ্য, খরিদ্দারের চোকে ধূলা দিয়া রদি মাল পাচার করিবে। দোকানদার খরিদ্দারে কেবল যুদ্ধ, কে কাকে ফাঁকি দিতে পারে। সস্তা খরিদের অবিরত চেষ্টাকে মনুষ্যজীবন বলে।

ভাবিয়া চিন্তিয়া, মনের দুঃখে, আফিঙ্গের মাত্রা চড়াইলাম। তখন জ্ঞাননেত্র ফুটিল। সম্মুখে ভবের বাজার সুবিস্তৃত দেখিলাম। দেখিলাম, অসংখ্য দোকানদার দোকান সাজাইয়া বসিয়া আছে—অসংখ্য খরিদ্দারে খরিদ করিতেছে—দেখিলাম, সেই অসংখ্য দোকানদারে অসংখ্য খরিদ্দারে পরস্পরকে অসংখ্য বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইতেছে। আমি গামছা কাঁধে করিয়া, বাজার করিতে বাহির হইলাম। প্রথমেই রূপের দোকানে গেলাম। যে জিনিস ঘরে নাই, সেই দোকানে আগে যাইতে হয়। দেখিলাম, যে সংসারের সেই মেছোহাটা। পৃথিবীর রূপসীগণ মাছ হইয়া ঝুড়ি চুপড়ির ভিতর প্রবেশ করিয়াছেন। দেখিলাম, ছোট বড় রুই কাতলা মৃগেল ইলিষ, চুনো পুঁটি কই মাগুর, খরিদ্দারের জন্য লেজ আছাড়াইয়া ধড় ফড় করিতেছে; যত বেলা বাড়িতেছে, তত কানসা ফুলাইয়া, হাঁ করিয়া, বিক্রয়ের জন্য খাবি খাইতেছে।—মেছুনীরা ডাকিতেছে, "মাছ নেবে গো! কুল-পুকুরের সস্তা মাছ, অমনি ছাড়ব—বোঝা বিক্রী হইলেই বাঁচি।" কেহ ডাকিতেছে, "মাছ নেবে গো—ধন-সাগরের মিঠা মাছ—যে কেনে তার পুনর্জ্জন্ম হয় না—ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ বিবির মুণ্ডে পরিণত হইয়া তার ঘর দ্বারে ছড়াছড়ি যায়, যার সাধ্য থাকে কিনিবে। সোনার হাঁড়িতে চোখের জলে সিদ্ধ করিয়া, হৃদয়-আগুনে কড়া জ্বাল দিয়া রাঁধিতে হয়—কে খরিদদার সাহস করিস্—আয়। সাবধান! হীরার কাঁটা—নাতি কাঁটা—গলায় বাঁধলে খাশুড়িরূপী বিড়ালের পায়ে পড়িতে হয়—কাঁটার জ্বালায়, খরিদ্দার হলে কি পালায়!" কেহ ডাকিতেছে "ওরে আমার শরম-পুঁটি, বিক্রী হইলেই উঠি। ঝোলে ঝালে অম্বলে, তেলে ঘিয়ে জলে, যাতে দিবে ফেলে,

রান্না যাবে চলে—সংসারের দিন সুখে কাটিবে আমার এই শয়ন-পুঁটির বলে।"* কেহ বলিতেছে "কাদা ছেঁচে চাঁদা এনেছি—দেখে খরিদ্দার পাগল হয়! কিনে নিয়ে ঘর আলো কর।"

এইরূপ দেখিয়া শুনিয়া মাছ কিনিতে প্রবৃত্ত হইলাম—কেন না আমার নিরামিষ ঘরকরনা। দেখিলাম, মাছের দালাল আছে; নাম পুরোহিত। দালাল খাড়া হইলে দর জিজ্ঞাসা করিলাম—শুনিলাম দর, "জীবন সর্ব্বস্ব।" যে মাছ ইচ্ছা সেই মাছ কেন, একই দর, "জীবন সর্ব্বস্ব।" জিজ্ঞাসা করিলাম, "ভাল এ মাছ কতদিন খাইব।" দালাল বলিল, "দুদিন চারিদিন, তারপর পচিয়া গন্ধ হইবে।" তখন "এত চড়া দরে, এমন নশ্বর সামগ্রী কেন কিনিব?" ভাবিয়া আমি মেছোহাটা হইতে পলায়ন করিলাম। দেখিয়া মেছনীরা গামছা কাঁধে মিন্‌সেকে গালি পাড়িতে লাগিল।

রূপের বাজার ছাড়িয়া বিদ্যার বাজারে গেলাম। দেখিলাম, এখানে ফলমূল বিক্রয় হয়। একস্থানে দেখিলাম, কতকগুলি ফোঁটাকাটা টিকিওয়ালা ব্রাহ্মণ তসর গরদ পরিয়া, নামাবলিগায়ে, ঝুনা নারিকেলের দোকান খুলিয়া বসিয়া খরিদ্দার ডাকিতেছেন—"বেচি আমরা ঘট পটত্ব ঘত্ব পত্ব,—ঘরে চাল থাকিলেই স-ত্ব, নইলে ন-ত্ব। দ্রব্যত্ব জাতিত্ব গুণত্ব পদার্থ—বাপের শ্রাদ্ধে বিদায় না দিলেই তুমি বেটা অপদার্থ। পদার্থতত্ত্ব নামে ঝুনানারিকেল—খাইতে বড় কঠিন—তাহার প্রথম ছোবড়ায় লেখে যে ব্রাহ্মণীই পরমপদার্থ। অভাব নামে নারিকেল চতুর্ব্বিধ†—তোমার ঘরে ধন আছে, আমার ঘরে নাই, ইহা অন্যোন্যাভাব। যতক্ষণ না পাই, ততক্ষণ প্রাগভাব; খরচ হইয়া গেলেই ধ্বংসাভাব; আর আমাদের ঘরে সর্ব্বদাই "অত্যন্ত অভাব!" অভাব নিত্য কি অনিত্য যদি সংশয় থাকে, তবে আমাদের ভাণ্ডারে উঁকি মার—দেখিবে নিত্যই অত্যন্ত-অভাব। অতএব আমাদের ঝুনানারিকেল কেন। ব্যাপ্য, ব্যাপক, ব্যাপ্তি এ নারিকেলের শাঁস, ব্রাহ্মণের হস্ত হইল ব্যাপ্য, রজত হইল ব্যাপক; আর তুমি দিলেই ঘটিল ব্যাপ্তি; এই ঝুনানারিকেল কেন, এখনই বুঝিবে। দেখ, বাপু, কার্য্য কারণ সম্বন্ধ বড় গুরুতর কথা; টাকা দাও, এখনই একটা কার্য্য হইবে, কম দিলেই অকার্য্য।

---

* এগুলি কমলাকান্তের লেখা নহে। আমি বসাইয়া দিয়াছি। সে দিন সাধারণীর চানাচুর দেখিয়া লোভ সামলাইতে পারিলাম না—এক আধ গ্রাস চুরি করিয়া খাইয়াছি। ভরসা করি চানাচুরওয়ালা পেটুক ব্রাহ্মণের অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।—শ্রীভীষ্মদেব খোষনবিশ।

† নৈয়ায়িকেরা বলেন, অভাব চতুর্ব্বিধ; অন্যোন্যাভাব, প্রাগভাব, ধ্বংসাভাব আর অত্যন্তাভাব। শ্রীকমলাকান্ত।

আর কারণ বুঝাইব কি, এই যে দুই প্রহর রৌদ্রে ঝুনানারিকেল বেচিতে আসিয়াছি, ব্রাহ্মণীই তাহার কারণ—কিছু যদি না কেন, তবে নারিকেল বহা,—অকারণ। অতএব নারিকেল কেন, নহিলে এই ঝুনানারিকেল মাথায় ঠুকিয়া মরিব।"

ব্রাহ্মণদিগের সেই প্রখর তপনতপ্ত ঘর্ম্মাক্ত ললাট এবং বাগ্বিতণ্ডাজনিত অধরসুধাবৃষ্টি দেখিয়া দয়া হইল—জিজ্ঞাসা করিলাম "হাঁ ভট্টাচার্য্য মহাশয়। ঝুনানারিকেল কিনিতে আপত্তি নাই, কিন্তু দোকানে দা আছে-? ছুলিবে কি প্রকারে?

"না বাপু দা রাখি না।"

"তবে নারিকেল ছোল কিসে?"

"আমরা ছুলিনা—আমরা কামড়াইয়া ছোবড়া খাই।"

শুনিয়া, আমি ব্রাহ্মণদিগকে নমস্কার করিয়া পাশের দোকানে গেলাম।

দেখিলাম, ইহাদিগের সম্মুখেই এক্স্পেরিমেণ্টেল সায়েন্সের দোকান। কতকগুলি সাহেব দোকানদার, ঝুনানারিকেল, বাদাম, পেস্তা, সুপারি প্রভৃতি ফল বিক্রয় করিতেছেন। ঘরের উপরে বড় বড় পিতলের অক্ষরে লেখা আছে—

MESSRS BROWN JONES AND ROBINSON
NUT SUPPLIERS. ESTABLISHED 1757
ON THE FIELD OF PLASSEY.
MESSRS BROWN JONES AND ROBINSON
Offer to the Indian Public a large assortment of
NUTS.
PHYSICAL, METAPHYSICAL, LOGICAL AND ILLOGICAL,
SUFFICIENT TO BREAK THE JAWS
and
DISLOCATE THE TEETH OF
ALL INDIAN YOUTHS
WHO STAND IN NEED OF HAVING
THEIR DENTAL SUPERFLUITIES CURTAILED.

দোকানদার ডাকিতেছেন—"আয় কালা বালক **Experimental Science** খাবি আয়। দেখ, ১নম্বর এক্সপেরিমেণ্ট—ঘুসি; ইহাতে দাঁত উপড়ে, মাথা ফাটে এবং হাড় ভাঙ্গে। আমরা এ সকল এক্স্পেরিমেণ্ট বিনামূল্যে দেখাইয়া থাকি—কালা মাথা বা বাঙ্গালীর হাড় পাইলেই হইল। আমরা স্থূল পদার্থের সংযোগ বিয়োগসাধনে পটু—রাসায়নিক বলে, বা বৈদ্যুতীয় বলে, বা চৌম্বক বলে,

জড়পদার্থের বিশ্লেষণে সুদক্ষ—কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা মুষ্ট্যাঘাতের বলে মস্তকাদির বিশ্লেষণেই আমরা কৃতকার্য্য। মাধ্যাকর্ষণ, যৌগিকাকর্ষণ, চৌম্বুকাকর্ষণ প্রভৃতি নানাবিধ আকর্ষণের কথা আমরা অবগত আছি, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা কেশাকর্ষণেই আমরা কৃতবিদ্য। এই সংসারে জড়পদার্থের নানাবিধ যোগ দেখা যায়; যথা বায়ুতে অম্লজন, ও যবক্ষারজনের সামান্য যোগ; জলে, জলজন ও অম্লজনের রাসায়নিক যোগ; আর তোমাদিগের পৃষ্ঠে, ও আমাদের হস্তে, মুষ্টিযোগ। অতএব, এই সকল আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিবে যদি, কালা মাথা বাড়াইয়া দাও; এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট করিব। দেখিবে, গ্রাবিটেশ্যনের বলে এই সকল নারিকেলাদি তোমার মস্তকে পড়িবে; পর্কশন নামক অদ্ভুত শাব্দিক রহস্যেরও পরিচয় পাইবে, এবং দেখিবে তোমার মস্তিষ্কস্থিত স্নায়ব পদার্থের গুণে তুমি বেদনা অনুভূত করিবে।

অগ্রিম মূল্য দিও; তাহা হইলে চ্যারিটিতে এক্সপেরিমেণ্ট খাইতে পারিবে।"

আমি এই সকল দেখিতে শুনিতেছিলাম, এমত সময়ে, সহসা দেখিলাম যে ইংরেজ দোকানদারেরা, লাঠি হাতে, দ্রুতবেগে ব্রাহ্মণদিগের ঝুনানারিকেলের গাদার উপর গিয়া পড়িলেন, দেখিয়া ব্রাহ্মণেরা নারিকেল ছাড়িয়া দিয়া, নামাবলি ফেলিয়া, মুক্তকচ্ছ হইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিতে লাগিলেন। তখন সাহেবেরা সেই সকল পরিত্যক্ত নারিকেল দোকানে উঠাইয়া লইয়া আসিয়া, বিলাতী অস্ত্রে ছেদন করিয়া, সুখে আহার করিতে লাগিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম যে, "এ কি হইল ?" সাহেবেরা বলিলেন "ইহাকে বলে Asiatic Researches." আমি তখন, ভীত হইয়া, আত্মশরীরে কোনপ্রকার Physiological researches আশঙ্কা করিয়া, সেখান হইতে পলায়ন করিলাম।

সাহিত্যের বাজার দেখিলাম। দেখিলাম, বাল্মীকি প্রভৃতি ঋষিগণ অমৃত ফল বেচিতেছেন; বুঝিলাম ইহা সংস্কৃত সাহিত্য; দেখিলাম, দেবর্ষিতুল্য জ্যোতির্ম্ময় মনুষ্যগণ নীচু, পীচ, পেয়ারা, আনারস, আঙ্গুর প্রভৃতি সুস্বাদু ফল বিক্রয় করিতেছে—বুঝিলাম, এ পাশ্চাত্য সাহিত্য। আরও একখানি দোকান দেখিলাম—অসংখ্য শিশুগণ তাহাতে ক্রয় বিক্রয় করিতেছে—ভিড়ের জন্য তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিলাম না—জিজ্ঞাসা করিলাম, এ কিসের দোকান ?

বালকেরা বলিল, "বাঙ্গালা সাহিত্য ?"

"বেচিতেছে কে ?"

"আমরাই বেচি। দুই একজন বড় মহাজনও আছেন। তদ্ভিন্ন বাজে দোকানদারের পরিচয় পশ্বাবলি নামক গ্রন্থে পাইবেন।"

"কিনিতেছে কে ?"

"আমরাই।"

বিক্রেয় পদার্থ দেখিবার বাসনা হইল। দেখিলাম—খবরের কাগজ জড়ান কতকগুলি অপক্ক কদলী।

তাহার পরে কলুপটিতে গেলাম। দেখিলাম, যত উমেদার, মোসায়েব, সকলে কলু সাজিয়া তেলের ভাঁড় লইয়া সারি সারি বসিয়া গিয়াছে। তোমার ট্যাকে চাকুরি আছে, শুনিতে পাইলেই, পা টানিয়া লইয়া, ভাঁড় বাহির করিয়া, তেল মাখাইতে বসে। চাকরি না থাকিলেও—যদি থাকে, এই ভরসায়, পা টানিয়া লইয়া, তেল লেপিতে বসে। তোমার কাছে চাকুরি নাই—নাই নাই—নগদ টাকা আছে ত—আচ্ছা ভাই দাও—তেল দিতেছি। কাহারও প্রার্থনা, তোমার বাগানে বসিয়া তুমি যখন ব্রাণ্ডি খাইবে, আমি তোমার চরণে তৈল মাখাইব—আমার কন্যার বিবাহটি যেন হয়। কাহারও আব্দার, তোমার কাণে অবিরত খোষামোদের গন্ধতেল ঢালিব—আমার বাড়ীর প্রাচীরটি যেন দিতে পারি। কাহারও কামনা, তোমার তোষাখানার বাতি জ্বালিয়া দিব—আমার খবরের কাগজখানি যেন চলে। শুনিয়াছি কলুদিগের টানাটানিতে অনেকের পা খোঁড়া হইয়া গিয়াছে। আমার শঙ্কা হইল, পাছে কোন কলু আফিঙ্গের প্রার্থনায় আমার পায়ে তেল দিতে আরম্ভ করে। আমি পলায়ন করিলাম।

তারপরে যশের বাজারে গেলাম—দেখিলাম সে ময়রাপটি। সম্বাদপত্র-লেখক নামে ময়রাগণ, গুড়েসন্দেশের দোকান পাতিয়া, নগদ মূল্যে বিক্রয় করিতেছে—রাস্তার লোক ধরিয়া সন্দেশ গতাইয়া দিয়া, হাত পাতিতেছে—মূল্য না পাইলেই কাপড় কাড়িয়া লইতেছে। এদিকে তাঁহাদের বিক্রেয় যশের দুর্গন্ধে পথিক নাসিকা আবৃত করিয়া পলায়ন করিতেছে। দোকানদারগণ বিনা ছানায়, শুধু গুড়ে, আশ্চর্য্য সন্দেশ করিয়া সস্তাদরে বিক্রয় করিতেছেন। কেহ টাকাটা সিকেটায় আনা দু আনায়, কেহ কেবল খাতিরে—কেহ বা এক সাঁজ জলাহার পেলেই ছাড়েন—কেহ বা বাবুর গাড়িতে চড়িতে পেলেই যশোবিক্রয় করেন। অন্যত্র রাজপুরুষগণ মিঠাইওয়ালা সাজিয়া, রায়বাহাদুর, রাজাবাহাদুর খেতাব, খেলাত, নিমন্ত্রণ, ধন্যবাদ প্রভৃতি মিঠাই লইয়া দোকান পাতিয়া বসিয়া আছেন, —চাঁদা, সেলাম, খোষামোদ, ডাক্তারখানা, রাস্তাঘাট, মূল্য লইয়া মিঠাই বেচিতেছেন। বিক্রয়ের বড় বেবন্দোবস্ত—কেহ সর্ব্বস্ব দিয়া এক ঠোঙ্গা পাইতেছে না—কেহ শুধু সেলামে দেড়মন লইয়া যাইতেছে। এইরূপ অনেক দোকান দেখিলাম—কিন্তু সর্ব্বত্রই পচা মাল আধা দরে বিক্রয় হইতেছে—খাঁটি দোকান দেখিলাম না। কেবল একখানি দোকান দেখিলাম—তাহা অতি চমৎকার।

দেখিলাম, দোকানের মধ্যে নিবিড় অন্ধকার—কিছু দেখা যায় না। ডাকিয়া দোকানদারের উত্তর পাইলাম না—কেবল এক সর্ব্বপ্রাণিভীতিসাধক অনন্ত গর্জ্জন শুনিতে পাইলাম—অল্পালোকে দ্বারে ফলকলিপি পড়িলাম।

যশের পণ্যশালা।

বিক্রেয়—অনন্তযশ।　　বিক্রেতা—কাল!

মূল্য—জীবন।

জীয়ন্তে কেহ এখানে প্রবেশ করিতে পারে না।

আর কোথাও সুযশঃ বিক্রয় হয় না।

পড়িয়া ভাবিলাম—আমার যশে কাজ নাই—কমলাকান্তের প্রাণ বাঁচিলে অনেক যশ হইবে।

বিচারের বাজারে গেলাম—দেখিলাম, সেটা কসাইখানা। টুপি মাথায় শামলা মাথায়—ছোট বড় কসাইসকল, ছুরি হাতে গোরু কাটিতেছে। মহিষাদি বড় বড় পশুসকল শৃঙ্গ নাড়িয়া ছুটিয়া পলাইতেছে—ছাগ মেষ এবং গোরু প্রভৃতি ক্ষুদ্র পশু সকল ধরা পড়িতেছে। আমাকে দেখিয়া গোরু বলিয়া একজন কসাই বলিল "এও গোরু, কাটিতে হইবে।" আমি সেলাম করিয়া পলাইলাম।

আর বড় বাজার বেড়াইবার সাধ রহিল না—তবে প্রসন্নের উপর রাগ ছিল বলিয়া একবার দইয়ে হাটা দেখিতে লাগিলাম—গিয়া প্রথমেই দেখিলাম যে সেখানে খোদ কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী নামে গোয়ালা—দপ্তররূপ পচা ঘোলের হাঁড়ি লইয়া বসিয়া আছে—আপনি ঘোল খাইতেছে, এবং পরকে খাওয়াইতেছে।

তখন চমক হইল—চক্ষু চাহিলাম—দেখিলাম, নশীবাবুর বাড়ীতেই আছি। ঘোলের হাঁড়ি কাছে আছে বটে। প্রসন্ন এক হাঁড়ি ঘোল আনিয়া আমাকে সাধিতেছে—"চক্রবর্ত্তী মশাই—রাগ করিও না। আজ আর দুধ দই নাই—এই ঘোলটুকু আনিয়াছি—ইহার দাম দিতে হইবে না।"

শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা

শিক্ষানবিশের পদ্য। শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রণীত। চুঁচুড়া কদমতলা, সাধারণী যন্ত্র। ১২৮১।

"শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার" এই নামযুক্ত গ্রন্থ এই প্রথম প্রচারিত হইল। অতএব এমন অনেক পাঠক থাকিতে পারেন যে, অক্ষয় বাবুর বিশেষ পরিচয় জানেন না। আমরা তাঁহার এইমাত্র বলিব যে, বঙ্গদর্শনের কতকগুলি অত্যুৎকৃষ্ট প্রবন্ধ তাঁহারই প্রণীত। সেগুলি তিনি স্বনামযুক্তে পুনর্মুদ্রিত করিবেন, এরূপ ভরসা আছে। তাঁহার প্রণীত সেই সকল প্রবন্ধগুলির সবিশেষ আলোচনা করিলে, অনেকেই স্বীকার করিবেন যে, অক্ষয় বাবুর ন্যায় প্রতিভাশালী গদ্যলেখক অল্পই বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

অক্ষয় বাবু গদ্যে যাদৃশ অদ্ভুত শক্তিশালী পদ্যে সেরূপ নহেন, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। অতএব শিক্ষানবিশের পদ্য, তাঁহার ক্ষমতার উপযুক্ত পরিচয় নহে। তবে, ইহা "শিক্ষানবিশের পদ্য।" শিক্ষানবিশের জন্য প্রণীত, এবং অক্ষয় বাবু যখন নিজে শিক্ষানবিশ ছিলেন, তৎকালে প্রণীত।

গ্রন্থভূমিকা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া, গ্রন্থের পরিচয় দিতেছি।

"বিষয়কার্য্যের শিক্ষানবিশী অবস্থায় অবকাশকালে বায়রণ হইতে একটু আধটু অনুবাদ করিতাম। তাহাতে দুইটি উদ্দেশ্য ছিল। প্রধান উদ্দেশ্য ছন্দোবন্ধ রচনা লিখিতে অভ্যাস করা; গৌণ উদ্দেশ্য অবকাশ কর্ত্তন; কোন কোন স্থানের অনুবাদ কিছু ভাল হইলে একটু আহ্লাদও হইত। এইরূপে 'বন্দীর বিলাপ,' 'ভারতবর্ষ,' ও 'সাগরের' জন্ম।

অবিকল ভাষানুবাদ করি নাই, রসানুবাদ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই তাহা জানি, সুতরাং প্রশংসাবাদপ্রাপ্তি লোভে এই গ্রন্থের প্রকাশ নহে। তবে রসজ্ঞ ভাল বলিলে কিছু আহ্লাদ হইবেই হইবে।"

কিন্তু গ্রন্থ প্রকাশের একটী বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। ইহাতে বালকবৃন্দের কিছু উপকার হইতে পারিবে। রসপূর্ণ কাব্যগ্রন্থ হইতে ছন্দোবন্ধে রসানুবাদের

চেষ্টা করিলে, অল্প অল্প ছন্দোবোধ হয়, রসগ্রাহকতা কিঞ্চিৎ জন্মে, এবং ভাষাজ্ঞানও কিছু পরিপুষ্ট হয়। যাঁহারা বালকবৃন্দের ঐ ত্রিবিধ উন্নতির কামনা করেন, তাঁহারা **শিক্ষানবিশের পদ্য** হইতে, বোধ হয় কিছু সাহায্য পাইতে পারিবেন। এবং এমনও বোধ হয় যে, বালকে আপনা আপনি এই ক্ষুদ্র পুস্তক হইতে কিছু ফল লাভ করিবে।

আর একটি কথা আছে। এই পুস্তকের অধিকাংশই বায়রণের অনুবাদ ও অনুকরণ। যাঁহারা ইংরাজি বুঝেন না তাঁহারা বায়রণের অনুবাদ হইতেও স্বদেশানুরাগ শিক্ষা করিতে পারিবেন। আর এ শিক্ষা সৎশিক্ষা।

আজিকালি বায়রণের কাব্যের সম্যক্ সমাদর দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। সর্ব্বত্রই বায়রণানুকরণ দেখিতে পাই। এমন সময় বায়রণ কোন্ বিষয়ে কিরূপ লিখিয়াছিলেন, তাহা জানিতে অনেকের ইচ্ছা হইতে পারে। যাঁহারা ইংরাজি বুঝেন না, তাঁহারা এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে বায়রণের কাব্যের কিঞ্চিৎ নমুনা পাইবেন।

অনুবাদ কিরূপ হইয়াছে, তাহার উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে।

Roll on, thou deep and dark blue Ocean, roll,
সুনীল গভীর সিন্ধো কল্লোলিয়া চল,
Ten thousand fleets sweep over thee in vain ;
লক্ষপোত বক্ষে তব বৃথা ভাসি যায় !
Man marks the earth with ruin—
ধরাধাম ধ্বংস করে মানবের বল,
                his control
Stops with the shore ;
নর-গরিমার সীমা সাগর বেলায়,
                upon the watery plain
The wrecks are all thy deed, nor doth remain
A shadow of man's ravage, save his own,
না থাকে আঁচড় কভু তব নীলকায়,
তব কীর্ত্তি তব অঙ্গে ; মানব যখন
When, for a moment, like a drop of rain
সহসা সাগর গর্ভে বৃষ্টিবিন্দু প্রায়
He sinks into thy depths with bubbling groan
হাবু ডুবু খেয়ে ডোবে, কেবল তখন
Without a grave, unknell'd unconffin'd and unknown.
সে দেহ বহন করে ? কে করে দহন ?
কেবা হরিবোল বলে ? কে করে ক্রন্দন ?

ইহা মুক্তকণ্ঠে বলা যাইতে পারে যে, ইংরাজি পদ্যের এরূপ উৎকৃষ্ট বাঙ্গালা পদ্যানুবাদ আমরা আর কোথায় দেখি নাই।

এ গ্রন্থে দুইটি মাত্র পদ্য, অনুবাদিত বা অনুকৃত নহে। তন্মধ্যে হাসিকান্নার প্রথমাংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

"মলিন ভুবন কেন বিষাদে বিকল ?
ধরাধর বরষিছে কেন আঁখিজল ?
কাছে গঙ্গা ভরাজলে, কিনারায় টলটলে,
প্রবল পবন বলে কেন করে কলকল ?
কূলেতে কদম্ব গাছে বিহঙ্গ বসিয়া আছে,
নাহি গায় নাহি নাচে, কেন অন্তরেতে বিহ্বল ?
পরপারে দৃষ্টি হয়, সব অন্ধকারময়,
সবে রুষ্ট তরুচয়, নীরবে নিচল !
এই যে চাহিল রবি, ধরাধরে নব ছবি,
পুলকে বলিছে কবি বলিহারি কল !
কাঁদে বিশ্ব কাঁদি আমি, হাসিয়ে হাসালে তুমি,
হাসিকান্না পূর্ণভূমি, তোমারি কৌশল !

দুঃখমালা। ভ্রাতৃ বিয়োগে ভগিনীর খেদ। কোন হিন্দুমহিলা প্রণীত। খেদের আর সমালোচন কি ? খেদে খেদই ভাল দেখায়। বিশেষ গ্রন্থে সন্নিবেশিত একখানি পদ্যময় পত্র ও প্রকাশকের একটী টীকা পাঠে জানিলাম যে, নবীনা রচয়িত্রী এখন কেবল ভ্রাতৃশোকে খিন্না নহেন, বালিকা, অল্প বয়সে একটি পুত্ররত্নে শোভিতা হইয়াছিলেন, বিধাতা সেই ছেলেবয়সের ছেলেটিকে স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছেন, সুতরাং দুঃখমালা এখন নিত্য নিত্য নূতন দুঃখই প্রদর্শন করে মাত্র।

"করিয়াছি কত পাপ, তাই পাই হেন তাপ,
জন্মান্তরে কারে বুঝি ভ্রাতৃহীন করেছি।
লয়ে কার ভ্রাতাধন, দিয়ে সুখে বিসর্জ্জন,
জন্মের মতন কারে শোকনীরে ফেলেছি।
হেন দুঃখ সেই পাপে, পুড়ি ভ্রাতা শোকতাপে,
শোকাগ্নিতে দগ্ধ আমি হই দিবানিশি।
ভুলি তারে মনে করি, কিন্তু যে ভুলিতে নারি,
সদা মনে জাগিতেছে সেই মুখশশী।
সে রূপ যে মধুময়, যখন হে মনে হয়,
সুধাংশু জিনিয়া তার ছিল যে বদন।

আকাশের চাঁদ মোরা হাতে পেয়ে চন্দ্র হারা,
পদ্মফুল দিয়ে জলে করি হে রোদন।

লেখাটি বেশ সরল, সরস এবং কষ্টকল্পনাসম্ভূত নহে বলিয়াই বোধ হয়। আমরা ভরসা করি, নবীনা লেখিকা শীঘ্র হৃদয়শান্তি লাভ করিবেন।

তারাবাই। ঐতিহাসিক নাটক। শ্রীগঙ্গাধর চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত।

গ্রন্থকার গ্রন্থখানি বঙ্গমহিলাকে উপহার প্রদান করিয়াছেন। এবং বলিয়াছেন;

"হয় যেন বঙ্গনারী সবে বীরাঙ্গনা,
গঙ্গাধর শর্ম্মণের একান্ত বাসনা ॥"

আমাদেরও একান্ত বাসনা যে ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ সফল হয়। সুতরাং কর্কশ কঠিন সমালোচনায় কোমল করে প্রদত্ত উপহার-রত্নের আর গৌরব লাঘব করিব না। বাস্তবিক গ্রন্থখানিতে প্রশংসা অপ্রশংসার কিছুই নাই। বীররস প্রধানা নায়িকা তারাবাই বলিতেছেন।—নায়ককে বলিতেছেন:—

"গুলরুর পতিনিষ্ঠা দেখে আমার ইচ্ছা হচ্চে যেন আমি তার মতন অনন্ত বাহুশৃঙ্খলে আবদ্ধ করে, নারিজীবনের সার পতিরূপ সারাল নিকতরুকে চিরকাল বক্ষঃস্থলে ধারণ করি—" এমন পিত্তনাশক উপমা কস্মিন্‌কালে দেখি নাই!

বিবাহ ও পুত্রত্ব সম্বন্ধে মনুর মত। স্থানাভাব প্রযুক্ত এই গ্রন্থ এবং অন্যান্য বহুসংখ্যক গ্রন্থের সমালোচনা হইতেছে না। ক্রমে হইবে। গ্রন্থকারগণ অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।

তৃতীয় বর্ষ : সপ্তম সংখ্যা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মনুষ্য সমাজে প্রধানতঃ দুই দলের লোক আছে। এক দলের দৃষ্টি সুখের দিকে, অন্য দলের দৃষ্টি ধর্ম্মের দিকে। এক দলের নিকটে পৃথিবী, আমোদপ্রমোদের স্থান, অপর দলের নিকটে দুঃখময় সঙ্কটভূমি। এক দল ইহলোকের ব্যাপার লইয়াই ব্যস্ত, অপর দল পারলৌকিক চিন্তায় মগ্ন। এক দল বিষয়ী, অপর দল বৈরাগী। একদলের অবলম্বন যুক্তি, অপর দলের অবলম্বন বিশ্বাস। এক দল জড় জগতের তত্ত্ব নির্ণয়ে সমুৎসুক, অপর দল জীবাত্মা এবং পরমাত্মার প্রকৃতি নিরূপণে যত্নশীল। এক দল প্রত্যক্ষগোচর পদার্থপুঞ্জে আকৃষ্টচিত্ত হইয়া অপ্রত্যক্ষ বস্তুর বিচার দ্বারা মস্তিষ্ক বিলোড়িত করিতে চাহেন না, অপর দল প্রত্যক্ষ জগৎ অসারবৎ জ্ঞান করিয়া অপ্রত্যক্ষ নিত্যপদার্থের ধ্যানে রত। এক দলের বিবেচনা এই যে আপনাদিগের বুদ্ধিবলে সকলই করিতে পারেন, অপর দল আপনাদিগকে অক্ষম জ্ঞান করিয়া পদে পদে দেবানুগ্রহের প্রার্থী। এক দল তার্কিক, অপর দল ভক্ত। এক দল কথায় কথায় প্রমাণ চাহেন, অপর দল শ্রদ্ধাস্পদ ব্যক্তির বাক্য শুনিলেই তাহার সত্যতা বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ করেন না। এক দল বর্ত্তমান সময় এবং উপস্থিত ঘটনাবলী হইতে সুখাকর্ষণে প্রবৃত্ত, অপর দল অতীতের উৎকর্ষ এবং ভবিষ্যতের মাহাত্ম্য চিন্তনে বিমুগ্ধ হইয়া সাংসারিক সম্পদকে অবহেলা করেন।

ইহা সহজেই অনুভূত হইবে যে চার্ব্বাকদর্শন প্রথম দলের শাস্ত্র। ইউরোপখণ্ডে আরিষ্টটল্, এপিকুরস্, বেকন্, বেন্থাম, কোম্ত, মিল প্রভৃতি যে দলের মুখপাত্র, ভারতবর্ষে বৃহস্পতি এবং চার্ব্বাকও সেই দলের চূড়ামণি। সত্য বটে, ইহাদিগের পরস্পরের মধ্যে অনেক মতভেদ আছে, কিন্তু ইহারা সকলেই সুখকে জীবনের উদ্দেশ্য জ্ঞান করেন, সকলেই যুক্তিমার্গানুগামী, এবং সকলেই ইহলোক লইয়া ব্যস্ত।

যাঁহারা দুঃখমিশ্রিত বলিয়া সুখভোগ করিতে চাহেন না, চার্ব্বাকমতাবলম্বীরা তাঁহাদিগকে পশুবৎ মূর্খ বলেন। মৎস্যে শল্ক এবং কণ্টক আছে বলিয়া কি মৎস্য ভক্ষণ করিব না ?* ধান্যের তুষ বাছিতে হইবে বলিয়া কি অন্নাহার পরিত্যাগ করিব ? কণ্টকের ভয়ে কি কমল তুলিব না ? শশধরের কলঙ্ক আছে বলিয়া কি তাহার সুধাময়ী জ্যোৎস্নায় অঙ্গ ঢালিয়া শরীর মন শীতল করিব না ? বায়ুতে ধূলা আছে আশঙ্কা করিয়া কি গ্রীষ্মকালে মন্দ মন্দ প্রবাহিত সুস্নিগ্ধ দক্ষিণানিল সেবন করিব না ? জলকর্দ্দমাক্ত হইবার ভয়ে কি কৃষ্ট এবং বৃষ্টিসিক্ত ক্ষেত্রে শস্য বপন করিতে বিরত থাকিব ? অথবা কি ভিক্ষুকের যাচ্ঞা আশঙ্কা করিয়া আহার সামগ্রী প্রস্তুত করিব না ?

বিমল সুখ যদিও এ সংসারে নাই, তথাপি যাহা আছে তাহা অগ্রাহ্য করিবার বস্তু নহে। আমরা যদি গৃহী হই, এক সময়ে যেমন দারা সুত বন্ধুগণের প্রফুল্ল আনন দেখিয়া সুখী হই, অপর সময়ে তেমনই তাহাদিগের পীড়া বা বিপজ্জনিত বিষণ্ণ বদন দেখিয়া দুঃখিত হই। এক সময়ে যেমন পুত্রের বিকসিত মুখকমলের হাস্যরাশি বা নন্দিনীর আনন্দময়ী মূর্ত্তির লাবণ্যছটা নিরীক্ষণ করিয়া আনন্দরসে অভিষিক্ত হই, অপর সময়ে, তাহাদিগের শীর্ণ কলেবর বা মৃতদেহ দর্শন করিয়া শোকসাগরে নিমগ্ন হই। এক সময়ে যাহার প্রণয়ে সংসার আলোকময় দেখি, অপর সময়ে তাহার বিরহে সমুদয় জগৎ অন্ধকার বোধ হয়। এইরূপে যাহা এক সময়ে সুখের কারণ হইতেছে, তাহাই অপর সময়ে দুঃখের কারণ হয়। যদি আমরা কাহারও সহিত সম্বন্ধ ন রাখি, যদি ভূমণ্ডলে এমন কেহই না থাকে যাহার দুঃখে বা অভাবে আমাদিগের ক্লেশ হয়, তাহা হইলেও আমরা দুঃখের হাত এড়াইতে পারি না। যে এই জনাকীর্ণ জগতীতলে একা আছে, যাহার মনের কথা বলিবার একটিমাত্র লোক নাই, যাহার প্রীতির পাত্র কেহই নাই, তাহার চিত্ত উৎসাহশূন্য, নির্জ্জীব, দুঃখময়, মরুতুল্য নীরস। যদি এরূপ অবস্থায় কাহারও অন্তঃকরণে শান্তি বিরাজ করে, সে ব্যক্তি সামান্য মানব নহে। কিন্তু সামাজিক সম্বন্ধ বিরহিত হইয়াও যে সুখী থাকিতে পারে, সেও রোগ এবং দৈব ঘটনার স্রোত হইতে আপনাকে মুক্ত রাখিতে পারে না। সহসা যন্ত্রণাদায়িনী পীড়া আসিয়া

---

* "সুখমেব পুরুষার্থঃ। ন চাস্য দুঃখ সংভিন্নতয়া পুরুষার্থত্বমেব নাস্তীতি মন্তব্যম্ অবর্জনীয়তয়া প্রাপ্তস্য দুঃখস্য পরিহারেণ সুখমাত্রস্যৈব ভোক্তব্যত্বাৎ। তদ্যথা মৎস্যার্থী সশল্কান্ সকণ্টকান্ মৎস্যানুপাদত্তে স যাবদাদেয়ং তাবদাদায় নিবর্ত্ততে। যথা বা ধান্যার্থী সপলালানি ধান্যান্যাহরতি স যাবদাদেয়ং তাবদাদায় নিবর্ত্ততে। তস্মাদ্দুঃখ ভয়ান্নানুকূলবেদনীয়ং সুখংত্যক্তুমুচিতম্।...যদি কশ্চিদ্ ভীরু দৃষ্টং সুখং ত্যজেৎ স তর্হি পশুবন্মূর্খো ভবেৎ।"

সর্ব্বদর্শনসংগ্রহান্তর্গত চার্ব্বাকদর্শনং।

সমুদায় উলট্ পালট্ করিতে পারে। স্বাস্থ্যের সঙ্গে সঙ্গে মনের আনন্দ দূরীভূত হয়। জ্যোৎস্নাময়ী রজনীর মনোহর শোভা, ঊষার শীতল সমীরণ, কুসুমের সৌন্দর্য্য ও সুগন্ধ, কলকণ্ঠ বিহঙ্গমগণের সুমধুর সংগীত, আর সুধাবর্ষণ করে না। যে বন্ধুবিনাও একাকী হর্ষোৎফুল্ল থাকিতে পারে, শারীরিক পীড়ায় তাহাকেও অস্থির করে, তাহাকেও কাতর করে। এতদ্ব্যতিরিক্ত কখন প্রবল ঝঞ্ঝাবাত, কখন বজ্রাঘাত, কখন দুর্ভিক্ষ, কখন ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তু, কখন অতিরিক্ত সূর্য্যোত্তাপ, কখন দুঃসহ বৃষ্টিপাত, কখন অতিশয় শৈত্য, উপস্থিত হইয়া আমাদিগের অশেষ ক্লেশ উৎপাদন করিতে পারে। তথাপি আমরা বলি যে এ সংসার দুঃখময় নহে। দুঃখ যদিও সর্ব্বত্র আছে, যদিও রাজার প্রাসাদে এবং দরিদ্রের কুটীরে, পণ্ডিতের উন্নত চিত্তে এবং মূর্খের সঙ্কীর্ণ মনে, বিলাসীর প্রিয় ভবনে এবং যোগীর গিরিগুহায়, দুঃখ অবস্থিতি করে; যদিও পথে, ঘাটে, ঘরে, দ্বারে, দেউলে, কাননে কান্তারে, শ্মশানে, মশানে, সকল স্থানেই দুঃখ বিরাজিত; তথাপি দুঃখ অপেক্ষা মানুষের সুখের ভাগ অনেক অধিক। নতুবা কেন লোকে ইচ্ছাপূর্ব্বক জীবনভার বহন করে? কেন লোকে মরিতে কুণ্ঠিত হয়? কেন রবিচন্দ্রতারাসুশোভিত তরুলতাপল্লবপুষ্পবিভূষিত পরিমলবহনলয়মারুতসেবিত বিবিধভোগ্যবস্তুপরিপূরিত ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া যাইতে অধিকাংশ মনুষ্যেই বিপদ্ জ্ঞান করে? যদি বাস্তবিক দুঃখই সুখাপেক্ষা সংসারে অধিক থাকিত, তাহা হইলে আত্মহত্যার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বুদ্ধিজীবী মানবজাতি জীবনজ্বালা হইতে মুক্তিলাভ করিত। অধিকাংশ লোকে মরিতে অনিচ্ছুক, ইহাতেই স্পষ্ট জানা যাইতেছে যে নরকুলের সুখের পরিমাণ দুঃখের পরিমাণাপেক্ষা অনেক অধিক।

আবারও ভাবিতে হয় যে দুঃখ আছে বলিয়া হয় ত সুখ অধিকতর বাঞ্ছনীয় হইয়াছে। যে পরিশ্রমক্লেশ সহ্য না করে, সে ভাল করিয়া বিশ্রামের সুখ অনুভব করিতে পারে না। যে কখন রোগগ্রস্ত হয় নাই, সে স্বাস্থ্যে যে কি আরাম ও স্বচ্ছন্দতা তাহা উত্তমরূপে বুঝিতে পারে না। ক্ষুধাজনিত কষ্ট হয় বলিয়াই আহারে এত তৃপ্তি জন্মে। তৃষ্ণায় যাতনা আছে বলিয়াই শীতল সলিলপানে এত সুখ। যে তামসী নিশাকালে আকাশমণ্ডল ঘনজলধরজালে আচ্ছাদিত হয়, নক্ষত্রমালা অদৃশ্য হইয়া যায়, তরুরাজি, গৃহাবলী প্রভৃতি লণ্ডভণ্ড করত প্রচণ্ড ঝটিকাপ্রবাহ বহিতে থাকে, তীরতুল্য তেজে অজস্র বৃষ্টিধারা পড়িতে থাকে, ভীষণ নিনাদে গগন মেদিনী কম্পমান করিয়া মাঝে মাঝে অশনিপাত হয়; সেই নিশার অবসানে যদি জলদদল অন্তর্হিত হয় এবং জগৎ শান্তভাব অবলম্বন করে, তাহা হইলে হাসিতে হাসিতে, মহিমারাশিতে তিমির বিনাশ করিয়া সৌন্দর্য্য ছড়াইতে ছড়াইতে, কমল ফুটাইতে ফুটাইতে, যখন দিবাকর উদিত হন, সেদিন তাঁহাকে অন্য দিনাপেক্ষা

কত মনোহর বোধ হয়। এইরূপে বিরহের মর্ম্মভেদী যন্ত্রণাভোগ করিয়া, আঁতে আঁতে জ্বলিয়া পুড়িয়া, অবিরল অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিয়া, বারম্বার দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া, যখন প্রিয়সমাগম পুনরায় হয়, তখন সে মিলনে যে গাঢ় সুখ জন্মে, তাহা বিচ্ছেদশূন্য ব্যক্তিবর্গের বুদ্ধির অতীত। বাস্তবিক একই অবস্থায় বহুকাল থাকা মনুষ্যের পক্ষে কষ্টকর, সে অবস্থা যতই কেন বাঞ্ছনীয় হউক না। যাহা কিছুকাল ভাল লাগে, পরে তাহাই বারম্বার উপভোগ দ্বারা বিরক্তিকর হইয়া উঠে। একটি সুস্বাদু বস্তু প্রতিদিন ভক্ষণ করিলে, কালক্রমে তাহার প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মে। অতএব, আস্বাদের পরিবর্ত্তন আবশ্যক। কেবল মধুর রস অবলম্বন করিলেই চলিবে না, কটু কষায় তিক্তও চাই।

যখন মানবজীবনে দুঃখাপেক্ষা সুখ অনেক অধিক, এবং যখন দুঃখ আছে বলিয়াই সুখের এত গৌরব, তখন দুঃখমিশ্রিত বলিয়া সুখের প্রতি অবহেলা করা মূর্খতা, সন্দেহ নাই। কিন্তু তাই বলিয়া আমরা চার্ব্বাকমতাবলম্বীদিগের ন্যায় সুখকেই জীবনের উদ্দেশ্য, সুখকেই পরম পুরুষার্থ জ্ঞান করিতে পারি না। সুখ বলিতে তাঁহারা যদি ইন্দ্রিয়সুখ অথবা আত্মসুখ বুঝিতেন, যেরূপ তাঁহাদিগের শত্রু হিন্দুগ্রন্থকারদিগের কথায় প্রকাশ পায়, তাহা হইলেই যে কেবল আমাদিগের আপত্তি হইত এরূপ নহে। যে হিতবাদে আন্তরিক সুখের এবং অধিকাংশ মনুষ্যের সুখের প্রাধান্য, সে হিতবাদও আমরা সম্পূর্ণ দোষশূন্য ভাবি না। আমাদিগের বিবেচনা এই যে আমরা কেবল সুখভোগ করিতে জন্মপরিগ্রহ করি নাই। সুখ যেমন আমাদিগের একটি লক্ষ্য, তেমনই আমাদিগের আরও দুইটী মহৎ লক্ষ্য আছে, সত্য এবং স্বাধীনতা। আমরা কেবল ভোগশক্তিশালী জীব নহি, আমাদিগের জ্ঞান এবং ইচ্ছাও আছে। ভোগশক্তি যেমন সুখ চায়, জ্ঞান তেমনই সত্য চায়, ইচ্ছাও তেমনি স্বাধীনতা চায়। ভক্ষ্য, পেয়, পরিধেয়ের পারিপাট্যে ভোগশক্তি সন্তুষ্ট হইতে পারে, কিন্তু বুদ্ধি সত্য বিনা ম্লান হইবে; ইচ্ছা স্বাধীনতা সংস্থাপন ও ক্ষমতাবিস্তার বিনা অসন্তুষ্ট হইবে। বুদ্ধি সত্য পাইলে, এবং ইচ্ছা স্বাধীনতা পাইলে, সুখ জন্মে, যথার্থ; কিন্তু যে কেবল সুখের জন্য সত্যের বা স্বাধীনতার অনুসরণ করে, আমরা বুঝি যে তাহার লক্ষ্য যে ব্যক্তি সত্যের জন্য সত্য এবং স্বাধীনতার জন্যই স্বাধীনতা চায় তাহার লক্ষ্যের ন্যায় মহৎ নহে।

দুঃখ আছে বলিয়া সুখের প্রতি উপেক্ষা করা মূর্খতা, এই সিদ্ধান্তের পরে স্থির করা আবশ্যক যে এই সুখ বলিতে কেবল ইহকালের সুখ বুঝাইবে, না পরকালের সুখও বুঝাইবে। চার্ব্বাকমতাবলম্বীরা বলেন, ইহকালের সুখ। পরকাল অসম্ভব। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ এই চারি ভূতের সংযোগে চৈতন্য

উৎপন্ন হয়, যেমন সুরা সমুৎপাদক দ্রব্যচয় সমবেত হইলে মাদকতাশক্তি জন্মে।* সুতরাং মৃত্যুকালে যখন উক্ত চারি ভূতের বিয়োগ ঘটিবে, তখন চৈতন্যও বিলুপ্ত হইবে। দেহাতিরিক্ত আত্মা কোন স্থলেই প্রত্যক্ষ করা যায় না ; যেখানে চৈতন্য লক্ষিত হয়, সেখানেই তাহা দেহান্তর্গত। অতএব দেহের বিনাশে তাহার অবস্থিতি অসম্ভব।

আবার দেখ যখন বলিতেছ, আমি স্থূল, আমি কৃশ, আমি গৌর, আমি কৃষ্ণ, আমি পীড়িত, আমি সুস্থ, আমি যুবা, আমি বৃদ্ধ, তখন তুমি দেহ হইতে আত্মাকে ভিন্ন জ্ঞান করিতেছ না।† সত্য বটে, আমার দেহ, এ কথাও তুমি বলিয়া থাক ; কিন্তু এটি ঔপচারিক প্রয়োগ, যেমন রাহুর মস্তক।‡ যেরূপ রাহুর মস্তক এবং রাহু অভিন্ন, কথার কৌশলে ভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও আমার দেহ এবং আমি সেইরূপ অভিন্ন। আমার দেহ, এই ব্যবহার অবলম্বন করিয়া যদি বলিতে চাও যে আত্মাই আমি, দেহ আমার বটে কিন্তু আমি নয় ; তাহা হইলে এ সিদ্ধান্ত যুক্তিসহ হইবে না। আমরা যেমন "আমার দেহ" বলি, তেমনই "আমার আত্মা"ও বলিয়া থাকি। যদি "আমার দেহ" এই প্রকার শব্দ প্রয়োগ দৃষ্টে আত্মাকে আমি বলিতে চাও, তবে "আমার আত্মা" এইরূপ ব্যবহার দৃষ্টে দেহকে আমি বলিতে হইবে।

দেহাতিরিক্ত আত্মার প্রমাণ নাই, চার্ব্বাকমতাবলম্বীদিগের এই বাক্যের প্রতিবাদ করিতে বিজ্ঞান অদ্যাপি অশক্ত। যে সকল প্রাকৃতিক তত্ত্ব এ পর্য্যন্ত অকাট্যরূপে নির্ণীত হইয়াছে, সে সকল বরং লোকায়তবাদের অনুকূল। বহুব্যাপী পর্য্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষা দ্বারা নিরূপিত হইয়াছে যে জীবদেহের স্নায়ুমণ্ডলের তারতম্যানুসারে মানসিক শক্তির তারতম্য ঘটে। মেষের এবং মানুষের মস্তিষ্কের প্রভেদ দেখিলেই জানা যায় যে উভয়ের বুদ্ধির অত্যন্ত প্রভেদ হইবে। আবার দেখা যায় যে মস্তিষ্কের অংশবিশেষের পীড়া হইলে মানসিক শক্তিবিশেষের হ্রাস বা লোপ হয়, এবং বৃদ্ধকালে মস্তিষ্কের ক্ষীণতা ও দুর্ব্বলতাসহকারে মনের ক্ষীণতা

---

* অত্র চত্বারি ভূতানি ভূমি বার্য্যনলানিলাঃ। চতুর্ভ্যঃ খলু ভূতেভ্যশ্চৈতন্যমুপজায়তে।
কিণ্বাদিভ্যঃ সমেতেভ্যো দ্রব্যেভ্যো মদশক্তিবৎ ॥
সর্ব্বদর্শনোদ্ধৃত লোকায়তবচনং।

† অহং স্থূলকৃশোঽস্মীতি সামানাধিকরণ্যতঃ।
দেহঃ স্থৌল্যাদি যোগাচ্চ স এবাত্মা ন চাপরঃ ॥
সর্ব্বদর্শনোদ্ধৃত লোকায়তবচনং।

‡ মমদেহোঽয়মিত্যুক্তিঃ সম্ভবেদৌপচারিকী ॥
সর্ব্বদর্শনোদ্ধৃতং।

এবং দুর্ব্বলতা বৃদ্ধি পায়। সুতরাং চৈতন্যসমন্বিত মানসিক ব্যাপার সমুদায়, স্নায়ুমণ্ডলের উপর, বিশেষতঃ মস্তিষ্কের উপর নির্ভর করে, ইহা বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ একপ্রকার স্থির করিয়াছেন। অতএব যখন দেহের কল ভাঙ্গিয়া যাইবে এবং স্নায়ুমণ্ডল তদীয় উপাদান নিচয়ে পরিণত হইবে, তখন চৈতন্যও বিলুপ্ত হইবে, ইহাই অনেকের বিশ্বাস, মুখে তাঁহারা কিছু বলুন বা না বলুন। কিন্তু এস্থলে একটি কথা বলা আবশ্যক। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবেত্তৃগণের মধ্যে আমেরিকা ও ইউরোপে কেহ কেহ প্রেততত্ত্বের পর্য্যালোচনা করিতেছেন। তাঁহাদিগের দল ক্রমেই পুষ্ট হইতেছে। তাঁহারা যদি সিদ্ধকাম হন, তাহা হইলে দেহাতিরিক্ত আত্মার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যাইবে।

একাল পর্য্যন্ত পরলোক এবং ঈশ্বরের অস্তিত্ব সংস্থাপন জন্য অনুমান প্রমাণই অবলম্বিত হইয়াছে। ইহলোকে শিষ্টের পুরস্কার এবং দুষ্টের দমন হয় না, ইহলোকে কর্ম্মানুরূপ ফলপ্রাপ্তি ঘটে না, অতএব পরলোক আছে। যেমন ঘটপটাদির কর্ত্তা আছে, তেমনই এই বিশাল জগতেরও একজন কর্ত্তা থাকিবে, অতএব ঈশ্বর আছেন। এইপ্রকার অনুমান অবলম্বন করিয়াই পরলোক এবং ঈশ্বরতত্ত্ব নির্ণয় করাই রীতি। চার্ব্বাকমতাবলম্বী পণ্ডিতগণ বলেন যে আদৌ অনুমান অগ্রাহ্য। অনুমান ব্যাপ্তিজ্ঞান সাপেক্ষ। কিন্তু এই ব্যাপ্তিজ্ঞান কিরূপে হইবে? যদি বল প্রত্যক্ষ দ্বারা। তবে কোন্ প্রকার প্রত্যক্ষ, বাহ্য না আন্তর? চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সহিত কোন পদার্থের সন্নিকর্ষ ঘটিলে, তাহার বাহ্য প্রত্যক্ষ হয়। সুতরাং এরূপ প্রত্যক্ষ বর্ত্তমানে সম্ভব হইলেও, ভূত ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অসম্ভব।* কিন্তু ব্যাপ্তি ত্রিকালব্যাপিনী। যখন আমরা ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তির উল্লেখ করি, তখন আমাদের বলিবার উদ্দেশ্য এই যে বহ্নি ধূমের নিয়ত সহচর, কেবল বর্ত্তমানের নহে, ভূত এবং ভবিষ্যৎকালেরও সহচর। যখন আমরা জন্মি নাই, তখনও বহ্নি ধূমের সহচর ছিল। যখন আমাদিগের মৃত্যু হইবে, তখনও বহ্নি ধূমের সহচর থাকিবে। এইরূপ ত্রিকালব্যাপিনী ব্যাপ্তির জ্ঞান কখন বর্ত্তমানকালসম্বন্ধ বাহ্য প্রত্যক্ষ দ্বারা হইতে পারে না। যদি বল মানস প্রত্যক্ষদ্বারা এরূপ জ্ঞান হইবে, তাহাও প্রামাণ্য নহে। সুখ দুঃখ প্রভৃতি আন্তরিক অবস্থার অতিরিক্ত বিষয়ের জ্ঞান নিমিত্ত মন বহিরিন্দ্রিয় সাপেক্ষ।† সুতরাং

---

* "ন তাবৎ প্রত্যক্ষং তচ্চ বাহ্যমান্তরং বাভিমতম্। ন প্রথমঃ তস্য সম্প্রযুক্ত বিষয়জ্ঞানজনকত্বেন ভবতি প্রসরসম্ভবেঽপি ভূতভবিষ্যতোস্তদসম্ভবেন সর্ব্বোপসংহারবত্যা ব্যাপ্তের্দুর্জ্ঞানত্বাৎ।"

সর্ব্বদর্শনান্তর্গত চার্ব্বাকদর্শনং।

† "নাপি চরমঃ অন্তঃকরণস্য বহিরিন্দ্রিয় তন্ত্রত্বেন বাহ্যেঽর্থে স্বাতন্ত্র্যেণ প্রবৃত্ত্যনুপপত্তেঃ। তদুক্তম্ চক্ষুরাদ্যুক্তবিষয়ং পরতন্ত্রং বহির্মন ইতি।" সর্ব্বদর্শনান্তর্গত চার্ব্বাকদর্শনং।

বাহ্য প্রত্যক্ষ দ্বারা ব্যাপ্তিজ্ঞান হইবার যে আপত্তি, মানস প্রত্যক্ষ দ্বারা ব্যাপ্তিজ্ঞান হইবারও সেই আপত্তি। যদি বল অনুমান দ্বারা ব্যাপ্তিজ্ঞানলাভ হয়, তাহা হইলে অনবস্থা দোষ ঘটে; * কারণ, যে ব্যাপ্তিজ্ঞান দ্বারা অনুমান সিদ্ধ করিতে চাও, সেই ব্যাপ্তিজ্ঞান অনুমান সাপেক্ষ বলিতেছ। যদি শব্দকে ব্যাপ্তিজ্ঞানের উপায় স্থির কর, তাহা হইলেও আপত্তি আছে। কাণাদ মতানুসারে শব্দ অনুমানের অন্তর্ভূত; যদি বল তদন্তর্ভূত নহে, ভাবিয়া দেখ শব্দের দ্বারা কিরূপে জ্ঞান হয়। লোকে যখন কোন শব্দ ব্যবহার করে, কোন্ পদার্থের উদ্দেশে ব্যবহার করিতেছে, অনুমান দ্বারা আমরা বিবেচনা করিয়া লই। মনে কর কেহ বলিল, ঘট লইয়া আইস; যাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া আদেশ হইল, সে ব্যক্তি বস্তু বিশেষ লইয়া আসিল; আমরা অমনি অনুমান করিলাম যে, এই বস্তুই ঘট। এইপ্রকার বৃদ্ধব্যবহার দৃষ্টে যখন শব্দার্থের অনুমান হয়, তখন অনুমানকে ব্যাপ্তিজ্ঞানের উপায় বলিলে যে দোষ হয় শব্দকে অনুমানের কারণ বলিলে সেই দোষই হইতেছে। † আবার দেখ, স্বার্থানুমানে শব্দ প্রয়োগ নাই; এস্থলে কিরূপে শব্দ ব্যাপ্তিজ্ঞানের উপায় হইবে? ‡ অনুমান সিদ্ধ করিতে যে ব্যাপ্তিজ্ঞান আবশ্যক, তাহা উপাধিশূন্য অর্থাৎ অন্যনিরপেক্ষ হওয়া উচিত। যখন আমরা অগ্নিকে ধূমের নিয়ত সহচর বলিতেছি, তখন আমাদিগের জানা কর্ত্তব্য যে ধূম অগ্নি ব্যতিরিক্ত অন্য কোন পদার্থসাপেক্ষ নহে। এরূপ অন্য নিরপেক্ষতার জ্ঞান যদিও প্রত্যক্ষ স্থলগুলিতে সম্ভব, তথাপি অপ্রত্যক্ষ ভূত ভবিষ্যদন্তর্গত বা দূরদেশবর্ত্তী স্থলে অসম্ভব। সুতরাং সর্ব্বত্র উপাধিশূন্যতা নির্ণয়াভাবে ব্যাপ্তিজ্ঞানও হইতে পারে না। ¶

, Compare with the dictum "Nothing is in the intellect which was not originally in the senses."

* "নাপ্যনুমানং ব্যাপ্তিজ্ঞানোপায়ঃ তত্র তত্রাপ্যেবমিতি অনবস্থাদৌস্থ্যপ্রসঙ্গাৎ।

সর্ব্বদর্শনান্তর্গত চার্ব্বাকদর্শনং।

† নাপি শব্দস্তদুপায়ঃ কাণাদ মতানুসারেণানুমান এবান্তর্ভাবাৎ অনন্তর্ভাবে বা বৃদ্ধব্যবহাররূপ লিঙ্গাবগতি সাপেক্ষ তয়া প্রাগুক্ত দূষণলঙ্ঘনাজঙ্ঘালত্বাৎ।

সর্ব্বদর্শনান্তর্গত চার্ব্বাকদর্শনং।

‡ অনুপদিষ্টাবিনাভাবস্য পুরুষস্যার্থান্তর দর্শনেনার্থান্তরানুমিত্যভাবে স্বার্থানুমান কথায়াঃ কথা শেষত্বপ্রসঙ্গাৎ।—সর্ব্বদর্শনসংগ্রহান্তর্গত চার্ব্বাকদর্শনং।

¶ উপাধ্যভাবোঽপি দুরবগমঃ উপাধীনাং প্রত্যক্ষত্ব নিয়মাসম্ভবেন প্রত্যক্ষাণামভাবস্য প্রত্যক্ষত্বেঽপি অপ্রত্যক্ষাণামভাবস্যাপ্রত্যক্ষতয়া অনুমাদ্যপেক্ষায়া দুক্ত দূষণানতিবৃত্তেঃ।

সর্ব্বদর্শনসংগ্রহান্তর্গত চার্ব্বাকদর্শনং।

যাঁহারা পরিজ্ঞাত স্থলগুলিতে বস্তুদ্বয়ের সাহচর্য্যমাত্র পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাহাদিগের নিয়ত সহচারিতা অনুমান করেন, পূর্ব্বোক্ত আপত্তিগুলি তাঁহাদিগের পক্ষে অকাট্য ; কিন্তু যাঁহারা সাহচর্য্যাতিরিক্ত কার্য্যকারণসম্বন্ধ বা নৈসর্গিক নিয়ম অবলম্বন করিয়া ব্যাপ্তি নিরূপণ করেন, তাঁহারা এপ্রকার তর্কে ভীত হইবেন না।* কিরূপ সাহচর্য্য হইতে ব্যাপ্তি নির্ণীত হয়, এ প্রবন্ধে তদ্বিষয়ের সমালোচনা অসম্ভব। যাঁহারা এতৎসংক্রান্ত বিস্তীর্ণ বিচার অবগত হইতে অভিলাষী, তাঁহারা নৈয়ায়িকদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিবেন।

যদি বেদদ্বারা ঈশ্বর এবং পরলোক সংস্থাপন করিতে যাও, চার্ব্বাকমতাবলম্বীরা বলেন যে বেদ আদৌ অপ্রামাণ্য ; কারণ উহা প্রত্যক্ষবিলোপী, যুক্তিবিরুদ্ধ ও ধূর্ত্ততাসমুদ্ভূত। প্রত্যক্ষে যাহাতে সুখ পাওয়া যায়, বেদে তাহাকে দুঃখের কারণ বলে ; প্রত্যক্ষে যাহাতে দুঃখ দেখা যায়, বেদে তাহা সুখের হেতু। সাংসারিক সুখদায়ী কত ভোগ্য বস্তু পারলৌকিক দুঃখমূলক বলিয়া বেদানুসারে পরিত্যজ্য ; এবং কষ্টকর উপবাস যজ্ঞ প্রভৃতি ভবিষ্যৎ সুখসম্পাদক বলিয়া শ্রুতিতে আদৃত। মৃতব্যক্তি দূরবর্ত্তী প্রেতলোকে থাকিয়া পৃথিবীতলে প্রদত্ত অথবা অপরভক্ষিত আহার দ্রব্যে পরিতৃপ্ত হয়, এইরূপ যুক্তিবিরুদ্ধ কথা বেদে কত আছে। আর সকল কার্য্যেই ব্রাহ্মণকে দানের বিধি থাকায়, এ সকল যে ব্রাহ্মণদিগের ধূর্ত্ততাসম্ভূত তাহা স্পষ্টই জানা যাইতেছে।† সুতরাং বেদবাক্যে নির্ভর করিয়া ঈশ্বর বা পরলোক মানা যায় না।

চার্ব্বাকমতাবলম্বীদিগের দ্বারা আমাদিগের বোধ হয় কয়েকটী উপকার সাধিত হইয়াছে। তাঁহারা দেখাইয়াছেন যে ইহলোক দুঃখময় নহে, এবং সুখ পরিত্যজ্য নহে। তাঁহারা শিখাইয়াছেন যে শাস্ত্রাপেক্ষা যুক্তি প্রবল। তাঁহারা অনুমানের মূল পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়া, নৈয়ায়িকদিগকে উক্ত মূলের প্রকৃত বলাবল বুঝিতে ও তাহা দৃঢ় করিতে সমর্থ করিয়াছেন।

---

* কার্য্যকারণভাবাদ্বা স্বভাবাদ্বা নিয়ামকাৎ।
অবিনাভাবনিয়মো দর্শনান্তরদর্শনাৎ॥

সর্ব্বদর্শনোদ্ধৃতং।

† সর্ব্বদর্শনোদ্ধৃত বৃহস্পতি বচনমালা এবং নৈষধ চরিতের সপ্তদশ সর্গ দেখ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নিগূঢ় মর্ম্ম

(দ্বিতীয় খণ্ডের ১৭৬-১৯২ এবং ৩৭৭-৩৯৭ পৃষ্ঠার পরে)

আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি যে, এতদ্দেশীয় জাতিভেদ প্রথার অনেক লক্ষণ অন্যান্য দেশেও দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ইহার মধ্যে প্রভেদ এই যে আমরাই কেবল লৌকিক নিয়ম পরিবর্ত্তন বিষয়ে কর্ত্তৃত্ব ত্যাগ করিয়াছি; অন্যত্র লোকে যখন বুঝিতে পারে যে প্রচলিত নিয়মের কিঞ্চিৎ ব্যত্যয় না করিলে ক্ষতিগ্রস্ত হইব তখন তাহারা সেই ক্ষতি নিবারণে প্রবৃত্ত হয়। আমরা বলি যে প্রাচীন প্রথা সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিতে পারিলেই ভাল; প্রাচীন প্রথা কেন? যে প্রথাটী প্রচলিত আছে তাহা অভিনব হইলেও তজ্জনিত ক্ষতি নিবারণের যথাযোগ্য উপায় অবলম্বনে আমরা নিতান্ত পরাঙ্মুখ। ফলতঃ আমাদিগের অবস্থা এখন এমনই মন্দ হইয়াছে যে কোন কোন কুপ্রথা হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য সমাজ ত্যাগ ভিন্ন উপায়ান্তর নাই।

পরন্তু আমাদিগের মধ্যে সামাজিক প্রথা আদৌ পরিবর্ত্তিত হয় না একথা সত্য নহে; তবে সমাজ একবাক্যে এরূপ কার্য্যে হস্তক্ষেপণ করিতে পারেন না। ক্রমশঃ নিয়মলঙ্ঘনকারী ব্যক্তিদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াই নূতন প্রথা প্রচলিত হয়। শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় যে সকল শাস্ত্রীয় তর্ক উত্থাপিত করিয়াছিলেন, তাহাতে যদি সকলকে নিরস্ত করিতে পারিতেন কিম্বা পণ্ডিতমাত্রেই যদি তাহার অনুমোদন করিতেন তথাচ তল্লিখিত প্রথা পরিবর্ত্তিত হইবার সম্ভাবনা ছিল না। যিনি প্রথমে প্রচলিত নিয়ম ভঙ্গ করিতেন তাঁহাকে অবশ্যই সমাজচ্যুত হইতে হইত। অতএব "লোকে যুক্তি অপেক্ষা শাস্ত্রীয় প্রমাণকে অধিকতর মান্য করে;" কার্য্যকালে এই কল্পনার স্থল দেখা যায় না।

পাশ্চাত্য মতের প্রভাব আর কিছুতে না হউক একটী বিষয়ে বিলক্ষণ প্রকাশ হইয়াছে। পূর্ব্বে পিতৃপৈতামহিক নিয়ম অবহেলন করা দূরে থাকুক

তাহার প্রতিবাদ করিলেও সমাজচ্যুত হইতে হইত। "অমুক নাস্তিক, উহার জলগ্রহণ করা হইবেক না।" এইরূপ কথা অনেকের মনেই উদয় হইত। শাস্ত্রোক্তি দেশের অমঙ্গলদায়ক একথা মুখাগ্র করিলে ব্রাহ্মণ, ধোপা, নাপিত বন্ধ হইবে, এজন্য আশঙ্কা বিলক্ষণ প্রবল ছিল। সুতরাং শাস্ত্রীয় বিধানের দোষ গুণ বিচার করিবার ক্ষমতা কাহারই ছিল না। কিন্তু এখন, কার্য্যে তুমি যদি কোন প্রথা অতিক্রম না কর তবে তোমার মতামত ব্যক্ত করিলে কেহ তোমাকে সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করিবেন না। তুমি যদি যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ কর, তবে কোন শাস্ত্রনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ তোমার স্পৃষ্ট জল গ্রহণ করিবেন না, কিন্তু যদি প্রকৃতপ্রস্তাবে যথানিয়মে গায়ত্রী আদি জপ কর এবং মুক্তকণ্ঠে বল যে বেদ মান্য করা ভ্রান্তি মাত্র, তবে তোমাকে কোন গুরুতর সামাজিক দণ্ড ভোগ করিতে হইবেক না।

আমরা যে লভ্য একবার আয়ত্ত করি পরে তাহার প্রতি তাদৃশ দৃষ্টি থাকে না; কিন্তু উপরোক্ত অভিনব রীতি সামান্য উন্নতির লক্ষণ নহে। ফলতঃ জনসাধারণের মতপরিবর্ত্তন হইলে যে তাহা ক্রমশঃ কার্য্যে পরিণত হইবেক না, এ কথা মনে করা ভ্রম। এবং কোন বিষয়ে পুনঃ পুনঃ আন্দোলন করিলে লোকের জ্ঞানযোগ হইবে না, ইহাও অসম্ভব কথা। অতএব আমাদিগের সামাজিক প্রথা সমগ্রের গুণাগুণ যতই সমালোচিত হয়—ততই মঙ্গলের বিষয়।

কিন্তু শাস্ত্রীয় বিধি অযৌক্তিক কিম্বা ক্লেশজনক, একথা বুঝিয়াও কি আমরা তাহা রক্ষা করি, না তাহা প্রতিপালনে আমাদিগের ক্লেশ বোধই হয় না?

শাসন যতই প্রবল হউক, কোন শাসন-প্রণালী এবং তদাশ্রিত লোকসমূহের প্রকৃতি মধ্যে বিশেষ সামঞ্জস্য না থাকিলে কখনই তাহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। রাজশাসন ও সমাজশাসন মধ্যে এক বিশেষ এই যে রাজা স্পষ্টাক্ষরে দণ্ডার্হ ব্যক্তিকে নিগ্রহ করেন। সমাজ তাদৃশ স্থলে আশ্রয় হরণ এবং অনুগ্রহ রহিত করিয়াই তাহাকে ক্লেশ দেন। সমাজ-বিক্রম বহু আধারে ব্যাপ্ত। তাহার সমষ্টি রাজ-বিক্রম অপেক্ষা হীন বলিতে পারি না। কিন্তু এই দ্বিবিধ দণ্ড অবলোকন করিলে রাজ-বিক্রমকে অপেক্ষাকৃত উগ্র বলিয়া বোধ হয়। সমাজ-বিক্রম রাজ-বিক্রমের ন্যায় ভয়াবহ নহে। রাজনিয়ম লঙ্ঘনে যেমন আশঙ্কা হয়, সমাজ-নিয়মের অন্যথা করিবার সময়ে লোকের মনে তাদৃশ ভীতি জন্মে না। অতএব যে স্থলে কোন সামাজিক নিয়ম বহুকাল পর্য্যন্ত প্রতিপালিত হইতেছে দেখা যায়, সেখানে সাধারণ লোকদিগকে তাহার অনুমোদনকারী মনে করা ন্যায়সঙ্গত। কেননা মনুষ্য উপস্থিত সুখ দুঃখের বিষয় অতি সূক্ষ্ম বিচার করিতে পারেন। দণ্ডাশঙ্কা দণ্ডেরই অঙ্গবিশেষ। যখন কোন নিয়ম প্রতিপালনের ক্লেশ তল্লঙ্ঘনজনিত দণ্ডাশঙ্কার যন্ত্রণাকে অতিক্রম করে, তখন সেই নিয়ম কোনমতে দীর্ঘকাল স্থায়ী

হইতে পারে না। সামাজিক দণ্ডের বিভীষিকা স্বভাবতঃই অল্প সুতরাং তদ্দ্বারা কোন নিয়ম প্রবর্ত্তনার্থ নিয়মটী এরূপ করা আবশ্যক যেন তাহা লোকের স্বভাবানুযায়ী এবং সহজে রক্ষিত হইবার যোগ্য হয়।

জাতিভেদের আদিবিষয়ে যিনি যেরূপ অনুমান করুন উহা যে এতদ্দেশে বহুকাল হইতে প্রচলিত আছে তাহাতে কাহারও সন্দেহ নাই। এবং বৌদ্ধ রাজ্য বিষয়ে যে মতামত থাকুক মুসলমান অধিকার হইতে এই প্রথা রক্ষণ বিষয়ের রাজসাহায্য অপসারিত হইয়াছে তদ্বিষয়ে কেহই দ্বিরুক্তি করিতে পারেন না। অতএব তদবধি জাতিভেদ একমাত্র সমাজশাসনের দ্বারাই প্রতিপালিত হইতেছে, একথা স্বীকার করিতে হইবেক সুতরাং আমাদিগের প্রকৃতির সহিত ইহার বিশেষ সম্বন্ধ থাকাও মানিতে হইবেক।

কিন্তু লোকের প্রকৃতি? প্রকৃতি কাহাকে বলি?—আমরা আত্মার অস্তিত্ব বা লক্ষণবিষয়ে কিছু বলিতেছি না, কিন্তু ব্যক্তি মাত্রের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিলে প্রকাশ হয় যে প্রত্যেকের কার্য্যের বিশেষ প্রণালী আছে। লোকের সমস্ত কার্য্য সর্ব্বতোভাবে সঙ্গত নহে, তথাপি স্থূল স্থূল বিষয়ে ব্যক্তি প্রতি এক একটী কার্য্যপ্রণালী নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে এবং সেই প্রণালী দেখিয়াই লোকের চরিত্র স্থির হয়। আবার ভিন্ন ভিন্ন লোকের চরিত্র বিষয়ে নানাপ্রকার ঐক্য দৃষ্ট হয় তদনুসারেই সেই শ্রেণীস্থ লোকের সাধারণ প্রকৃতি ধৃত হয়।

জাতিভেদ নিয়ম সমস্ত ভারতবর্ষ বিস্তার করিয়া আছে; অন্যত্র ইহার কোন কোন লক্ষণ থাকিলেও সমস্ত লক্ষণ দৃষ্ট হয় না এবং তৎসমুদায় এখানকার ন্যায় প্রবল নহে। আমরা চরিত্রগুণে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক এই নিয়ম প্রতিপালন করিতেছি, অন্যত্র এতদভাবে লোকে অসুখীও নহে। তাহারাও স্বদেশের প্রথার পরিবর্ত্তে এই প্রথা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইলে আপনাদিগকে নিতান্ত উৎপীড়িত জ্ঞান করিবেক সন্দেহ নাই। ইহার হেতু কি? আমরাই বা কেন নিকৃষ্টশ্রেণীস্থ ব্যক্তিকে শ্রেষ্ঠ পদাবলম্বন করিতে দেখিলে ছি ছি করি এবং অন্য দেশেই বা কেন এরূপ ঘটনা হইলে কিম্বা স্বেচ্ছামত সকলের অন্নগ্রহণ করিতে নিষেধ করিলে লোকে কষ্টবোধ করে?

লোকসংখ্যার দ্বারা জাতিভেদের দোষ-গুণ নিরাকরণ করিতে হইলে আমরা অন্য দেশের নিকট পরাস্ত হইব। কারণ আমরা কেবল জাতিভেদের প্রতি অনুরক্ত নহি। এদেশে ইহার যে সকল নিয়ম আছে, আমাদিগের মতে তাহাই উৎকৃষ্ট সামাজিক প্রথা; অন্যত্র বিভিন্ন প্রকার জাতিবিষয়ক ব্যবস্থা দেখিলে আমরা কখনই তাহার অনুমোদন করিব না। এই জন্য সমস্ত পৃথিবীর লোকের সহিত তুলনায় এতদ্দেশীয় জাতিভেদ নিয়মানুসারী লোকসংখ্যা অবশ্যই ন্যূন হইবেক।

যাহারা জাতিভেদ গ্রাহ্য করে না তাহার মধ্যে অনেকে আমাদিগের অপেক্ষা বুদ্ধি ও বিদ্যাতে শ্রেষ্ঠ। তন্মধ্যে কেহই আমাদিগের প্রাচীন ঋষিগণের তুল্য নহে, এ কথা বলিলেও এই সমস্যা উপস্থিত হয় যে যাঁহারা পদে পদে উন্নতির উদ্দেশে প্রথাপরিবর্ত্তনে উদ্যত, তাঁহারা কেন হিন্দুশাস্ত্রের বিধি অবলম্বন করেন না? পূর্ব্বে আমরা মনে করিতাম যে সংস্কৃত শাস্ত্র অন্য জাতির (nation) দুর্ব্বোধ্য, কিন্তু এখন ইংলণ্ডে, ফরাসি ও জরমাণিতে বেদপুরাণাদির যে সমাদর দৃষ্ট হয় তাহাতে এরূপ মনে করা অসঙ্গত। কিন্তু কই ঐ সকল দেশে ত জাতিভেদ নিয়মের প্রতি কোন আস্থা নাই! অতএব আমাদিগের পক্ষে লোকাধিক্য বা বুদ্ধি-প্রাখর্য্যের ভান করা যুক্তিসঙ্গত নহে। অবশ্যই অন্য কোন হেতু থাকিবেক যে তাহাতেই আমরা জাতিভেদ নিয়মের বশীভূত থাকিয়া ইহাতে কোন ক্লেশ বোধ করি না। অতএব এতদ্বিষয়ে বিশেষ আলোচনা করা কর্ত্তব্য।

প্রাণিতত্ব অনুসারে জাতিভেদের দোষগুণ বিচার।

আমাদিগের শারীরিক ও মানসিক বৃত্তির অনেকাংশ পিতৃ কিম্বা মাতৃপক্ষ হইতে উৎপন্ন হয় একথা সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত বিশেষ যত্নের প্রয়োজন নাই। কিন্তু অভিনব প্রাণিতত্ববেত্তৃগণ এক নূতন কথা প্রকাশ করিতেছেন। তাঁহারা বলেন যে অভ্যাসের এমন অদ্ভুত গুণ যে এতদ্দ্বারা স্নায়ুসমূহের প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হইয়া মস্তিষ্কের বিনা সংযোগে এবং আন্তরিক বাসনা অভাবে দৈহিক ক্রিয়া নিষ্পাদিত হইতে পারে। এমন কি যে এই ধর্ম্ম পুরুষানুক্রমে চালিত হইয়া একজনের দোষগুণ হইতে তদ্বংশজাত অন্য ব্যক্তির ইন্দ্রিয় এবং মনের আকৃতি-বিকৃতি উৎপন্ন হয়। কথিত আছে যে সুরাপায়ীদিগের বংশজাত সন্তানাদি কখন সুরাপান না করিয়াও সুরাসক্ত হয়।

অতএব কোন সম্প্রদায়ের প্রাধান্য বা স্বধর্ম্ম অক্ষতভাবে রক্ষা করিবার ইচ্ছা থাকিলে তন্নিকৃষ্ট সম্প্রদায়ের সহিত তাহাদিগের বিবাহ না করাই যুক্তিসঙ্গত; কারণ এতাদৃশ বিবাহ হইতে যে সন্তান উৎপন্ন হইবেক তাহারা কথঞ্চিৎ নিকৃষ্ট সম্প্রদায়ের দোষও অধিকার করিবে। অনুলোম ও প্রতিলোম বিবাহ এই বিষয়ের বিঘ্নদায়ক ছিল কিন্তু বোধ হয় স্বভাবসিদ্ধ বা প্রাচীন বলিয়া উহা সম্যক্‌রূপে নিষিদ্ধ হয় নাই। কালে তাহা রহিত হইয়া জাতিভেদ প্রথার উন্নতি হইয়াছে।

কিন্তু যতদিন কোন সমাজের লোকসংখ্যা অল্প থাকে, ততদিন এক এক সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম অন্যের অনায়ত্ত এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের নিকৃষ্ট ব্যক্তিগণ স্বশ্রেণীমধ্যে বিবাহার্থ পরিত্যাজ্য হয়। লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইলে বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি বিষয়ে উৎকৃষ্ট এবং অপকৃষ্ট লোক সর্ব্বশ্রেণীতে দৃষ্ট হয়। তখন প্রাগুক্ত উদ্দেশ্য

স্বকার্থ শ্রেণীর বিচার না করিয়া ব্যক্তিবিশেষের দোষগুণ বিচারপূর্ব্বক বিবাহ দিলেই ক্রমশঃ গুণবিশিষ্ট স্ত্রীপুরুষের সহযোগে বংশের উন্নতিসাধন হইতে পারে।

এতদ্ভিন্ন যেমন শ্রেষ্ঠবর্ণের ধর্ম্মরক্ষার নিমিত্ত নিকৃষ্ট বর্ণের সহিত বিবাহ নিষিদ্ধ, তদনুরূপ নিকৃষ্ট বর্ণের উন্নতির নিমিত্ত শ্রেষ্ঠ বর্ণের সহিত বিবাহ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। ফলতঃ যাহাতে উৎকৃষ্ট বর্ণের উপকার তাহাতেই যদি অপকৃষ্ট বর্ণের অপকার হয়, তবে এতাদৃশ নিয়মে সমগ্র সমাজের মঙ্গল কি ? এইজন্য কোন কোন লোক মনে করিয়া থাকেন যে ব্রাহ্মণগণের স্বার্থসাধনের নিমিত্তই হিন্দুশাস্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছিল। আমরা ইহার অনুমোদন করি না।

কিন্তু উল্লিখিত কয়েকটি হেতু মনে করিয়া কেহ জাতিভেদ সংস্থাপন করিয়াছিলেন, এতাদৃশ কল্পনা অপেক্ষা আর একটী সহজ কল্পনা প্রদর্শিত হইতে পারে।

নানা কারণে পৈতৃক ব্যবসা গ্রহণ করাই লোকের পক্ষে সুলভ। এবং এক এক বর্ণান্তর্গত লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে তাহাদিগের সকলের উপার্জ্জনের ব্যাঘাত হইবে বলিয়া তাদৃশ বৃদ্ধি নিবারণের ইচ্ছা স্বভাবসিদ্ধ ঘটনা, তদ্ভিন্ন অসবর্ণ বিবাহের সন্তানগণকে বহিষ্কৃত করিতে পারিলে এতাদৃশ কামনাসিদ্ধি হইতে পারিবে এইরূপ বিবেচনাও স্বভাবতঃ উৎপন্ন হইতে পারে। সুতরাং নিয়ামক-বিশেষের দুরভিসন্ধি বিনা লোকের বৃত্তিভেদ এবং অসবর্ণ বিবাহ নিষিদ্ধ হওয়া অসম্ভব নহে। কিন্তু ইহা সুসিদ্ধ হইতে কালবিলম্ব হয়।

যতদিন ধনসঞ্চয় না হয়, ততদিন দায়বিভাগের জন্য বিবাদও ঘটে না এবং দায়ক্রমনির্ণয় বা শাস্ত্রকারের প্রয়োজনও থাকে না। কিন্তু তৎপূর্ব্বেই লোকের আচরণ অনুসারে অনেকস্থলে এক একটী প্রথা নির্দ্দিষ্ট হইয়া যায়। এইজন্য শাস্ত্রকারেরা অনেক স্থলে কেবল পিতৃপৈতামহিক নিয়ম লিপিবদ্ধ করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। সেইরূপ উপজীবিকা নির্ব্বাহার্থে কোন্ ব্যবসা অবলম্বন করিতে হইবেক, জনসমাজে এতাদৃশ তর্ক উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই অনেকে স্বভাবতঃ পৈতৃক ব্যবসা অবলম্বন করিয়া থাকিবেক। এবং বিভিন্ন ব্যবসায়ীর মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধ হইলে কি ক্ষতি বৃদ্ধি হইবেক তাহার চিন্তা উদয় হইবার পূর্ব্বেই এক ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা এবং তদ্ধেতু বিবাহাদি সংঘটিত হওয়া অসম্ভব নহে। তখন অনুলোম প্রতিলোম বিবাহ এককালে নিষিদ্ধ হইবার কথা নহে। ক্রমশঃ নানা কারণে এতাদৃশ বিবাহ কুপ্রথাস্বরূপ গণ্য হইয়া পরিত্যক্ত এবং নিষিদ্ধ হওয়া সহজ কল্পনা। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে অন্যান্য দেশে এ প্রকার প্রথা কালসহকারে প্রায় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এবং আমাদিগের দেশে অসবর্ণ বিবাহ এককালেই রহিত হইয়াছে। আমাদিগের মনের গতিই ধারাবাহিক, সেইজন্য গতকল্য যাহা করিয়াছি

অন্য তাহার ব্যত্যয় করিতে ইচ্ছা হয় না এবং সেই হেতু অন্য ব্যবসা গ্রহণ করা সহজ হইলেও সেদিকে অন্তঃকরণ ধাবিত হয় না। বিধবা বিবাহ নিষিদ্ধ হউক না হউক তাহা আমাদিগের সমাজ-প্রচলিত নাই, ইহাই প্রথা রক্ষার যথেষ্ট হেতু। প্রথান্তর প্রবর্ত্তিত হইলে ক্ষতিবৃদ্ধি কি, হইবার উপায় আছে কি না সেদিকে মনই যায় না। নূতন প্রথা দেখিলে বিজাতীয় বলিয়া বিতৃষ্ণা জন্মে।

শিক্ষালাভ বিষয়ে জাতিভেদ প্রথার দোষগুণ বিচার।

জাতিভেদ নিয়ম হইতে ব্যবসা রক্ষার এক সদুপায় হইয়াছে। অন্যান্য দেশে কোন বিষয় শিখিবার জন্য দুই উপায় আছে। এক বিদ্যালয়, অপর আপ্রেণ্টিসের নিয়ম। কিছুদিন পূর্ব্বে বিদ্যালয়সমূহ কেবল শাস্ত্র অধ্যাপনের নিমিত্তই নির্দ্দিষ্ট ছিল। অধুনা বৃত্তি শিখিবার জন্যও বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইতেছে; যথা, এঞ্জিনিয়ারিং বৃত্তি ইত্যাদি।

আপ্রেণ্টিস হইবার প্রণালী এই। প্রথমতঃ যে ব্যবসা অবলম্বন করিতে হইবেক তাহা স্থির করিয়া সেই ব্যবসাবলম্বী কোন ব্যক্তির সহিত এইরূপ যুক্তি করিতে হয় যে "আমি এতদিন বিনা বেতনে তোমার নিকট থাকিয়া তোমার ব্যবসা শিক্ষা এবং তোমার অধীন কার্য্য করিব। যদি নিয়মিতকাল মধ্যে তোমার কার্য্য ত্যাগ করিয়া যাই তবে এত দণ্ড দিব।" কালপূর্ণ হইলে উভয়ে অন্য নিয়ম করিয়া একত্র কার্য্য করিতে এবং তদনুসারে লাভালাভ বিভাগ করিয়া লইতে পারে অথবা শিষ্য (আপ্রেণ্টিস) স্বয়ং পৃথক্‌রূপে অভ্যাসিত ব্যবসা অবলম্বন করিতে পারে। যদি কেহ গুরুর নিকট প্রতিষ্ঠাপত্র না পাইয়া কোন ব্যবসা আরম্ভ করে, তবে তাহাকে কেহ বিশ্বাস করিয়া কার্য্যে নিযুক্ত করে না। এবং সেই ব্যবসায়ী অন্যান্য ব্যক্তি তাহার সহিত একত্রে কার্য্য করে না। কিছুদিন পূর্ব্বে আমাদিগের মধ্যেও একবর্ণের লোক অন্যবর্ণের সহিত একত্র ব্যবসা করিত না। এখন ইহার এইমাত্র অবশেষ আছে যে বিভিন্ন বর্ণ মধ্যে আহার ও বিবাহ নিষিদ্ধ। এই সমস্ত নিষেধের নিগূঢ় মর্ম্ম এই যে, প্রথমতঃ কার্য্যগতিকে একটি প্রথা পড়িয়া যায় পরে সেই প্রথাই পিতৃপৈতামহিক ধর্ম্ম ও তাহা উল্লঙ্ঘন অধর্ম্ম এইরূপ বিশ্বাস হইয়া উঠে; শাস্ত্রকারেরা তাহাই লিপিবদ্ধ করেন এবং লোকে বৈরনির্য্যাতনার্থে তাহার সাহায্য গ্রহণ করে। এখনও ঠিক এরূপ ঘটনা চলিতেছে। যদি তোমার কোন আত্মীয় ব্যক্তি প্রথা লঙ্ঘন করে, তবে তুমি তাহার প্রতি উপেক্ষা কর, কিন্তু কোন বিপক্ষ তাদৃশ কার্য্য করিলে শাস্ত্র বা প্রথার উল্লেখ করিয়া দণ্ডবিধানের চেষ্টা কর সুতরাং ইহাতে প্রথাভঙ্গ গোপনীয় বিষয় হইয়া উঠে। অথবা কার্য্যে দোষ আছে কি না, ধারাবাহিক হইলে একথা মনে উদয় হইবে না সুতরাং সে বিচারের দোহাই দিবে কি প্রকারে?

জাতিভেদ এবং আপ্রেন্টিস বিষয়ক নিয়মদ্বয় তুলনা করিলে দৃষ্ট হইবেক যে উভয়ের কার্য্য-প্রণালী বিভিন্ন কিন্তু শাসন তুল্য। কেবল প্রথোমক্ত প্রথাতে আমরা শিক্ষক ও বৃত্তি অনুসন্ধান বিষয়ে ধারাবাহিকমতে পিতৃপিতামহের প্রতি নির্ভর করি এবং গুরুশিষ্য মধ্যে স্ব স্ব অবস্থা ও প্রয়োজনমতে নূতন নিয়ম না করিয়া এক পিতৃআজ্ঞা পালনের দ্বারা সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকি। ধারাবহন প্রকৃতির প্রাদুর্ভাব, ইহাতেই বিলক্ষণ প্রতীয়মান হইবেক যে, যে স্থলে পিতা কিম্বা তদভাবে স্বজাতীয় কোন ব্যক্তি শিক্ষক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়েন নাই, উপদেশের উৎকর্ষ সাধনের নিমিত্ত পৃথক্ গুরু গ্রহণ করিবার নিয়ম হইয়াছে। তাহাতেও গুরুশিষ্য মধ্যে স্বানুবর্ত্তী সম্বন্ধের পরিবর্ত্তে পৈতৃক সম্বন্ধ ঘটিয়াছে।

যদি সকলেরই এক একটি ব্যবসা নির্ব্বাচন করিয়া লইতে হয়, তবে অনেক বিষয়ের চিন্তা করা আবশ্যক হইবেক। যথা "আমি এই ব্যবসা দ্বারা উত্তমরূপে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারিব অথবা অন্য কোন ব্যবসা গ্রহণ করিলে তুল্য শ্রমের দ্বারা অতিরিক্ত ফললাভ করিব ? আমার মনস্তুষ্টির জন্য অন্য কোন ব্যবসা গ্রহণ করা কর্ত্তব্য কি না ? অমুক অমুক ব্যবসার লাভালাভ কি এবং লোকসংখ্যা কত? অমুক ব্যবসা গ্রহণান্তে অমুক স্থানে গিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিলে আমার লাভ বৃদ্ধি হইবেক কি না ?" ইত্যাদি। কিন্তু যাহারা শ্মশ্রুবিশিষ্ট হইবার পূর্ব্বে পরিবার রক্ষণের ভারগ্রস্ত হয় তাহাদিগের চিন্তা করিবার সময় কোথা ? একবার বিলাস সুখাস্বাদন করিলে মনে নানাবিধ ভাবের উদয় হয় এবং তাহাতে অন্য চিন্তার কথঞ্চিৎ ব্যাঘাত ঘটে ; বিশেষতঃ স্ত্রীপুত্রের গ্রাসাচ্ছাদনের নিমিত্ত ব্যস্ত হইলে স্বেচ্ছামত ব্যবসা গ্রহণ করা দুষ্কর। "কি জানি অধিক লাভের প্রত্যাশায় যদি সামান্য লাভেও বঞ্চিত হই, তবে এতগুলি পরিবারের উপায় কি হইবেক ?" এইরূপ চিন্তাপ্রযুক্ত ভগ্নোদ্যম হইয়া তাহারা সহজেই পৈতৃক ব্যবসা অবলম্বনে প্রবৃত্ত হয়। আর যাহাদিগের মন একেবারে নিস্পন্দপ্রায় হইয়া গিয়াছে তাহারা অবলীলাক্রমেই পিতৃপিতামহের অনুগামী হয়। "মাছিমারা কাপি" কেবল কেরাণীগণের স্বধর্ম্ম নহে। ধারাবহন প্রকৃতির ফল।

ফলতঃ জাতিভেদ, বাল্যবিবাহ, পৈতৃক আবাস ভদ্রাসনে আসক্তি এবং একান্নবর্ত্তী থাকিবার প্রথা সমস্তই যেন একটি শৃঙ্খলাবদ্ধ বলিয়া বোধ হয়। হঠাৎ পরস্পরের মধ্যে বিশেষ সম্বন্ধ দৃষ্ট হয় না কিন্তু একটি প্রথা লঙ্ঘন করিলেই অন্যগুলির অন্ততঃ কিয়ৎপরিমাণেও ব্যাঘাত হয়। একান্নবর্ত্তী পরিবার বিচ্ছিন্ন হইলে আবাস পরিবর্ত্তন করিতে হয়। নূতন আবাস অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে ভিন্ন গ্রাম ভিন্ন দেশের প্রতি দৃষ্টি পড়ে। এবং তাহা হইতে আচার-ব্যবহারের

অনেক ব্যত্যয় ঘটে।* ভদ্রাসন ত্যাগ করিলে বহু পরিবার একান্নে রক্ষা করা সহজ নহে। নূতন স্থানে নূতন সমাজে বৃত্তির কিঞ্চিৎ ব্যত্যয় সহজেই হইতে পারে।

কিন্তু বাল্যবিবাহ জাতিভেদ নিয়মের প্রধান সহকারী। লেখকের ধারণা এই যে স্ত্রীজাতির অন্তঃপুরে বাসও প্রাচীন প্রথা। যদি এ কথা সত্য হয়, তবে ইহাও বাল্যবিবাহের সহকারী। কন্যার বুদ্ধিশক্তি সম্যক্ পুষ্টিলাভ করিবার পূর্ব্বে তাহার পরিণয় ক্রিয়া সমাধা হইলে পিতৃমনোনীত সবর্ণপাত্রে বিবাহ করিতে অসম্মতি প্রকাশের সম্ভাবনা থাকে না, বুদ্ধিস্ফূর্ত্তি হইলে অসবর্ণপাত্রে স্বয়ংই চিত্ত সমর্পণ করিতে পারে। কন্যা বয়স্থা হইবার পূর্ব্বে বিবাহিতা হইলে এই সমস্ত ঘটনা উপস্থিত হইতে পারে না। অতএব এই অভিসন্ধিতেই হউক কিম্বা রাক্ষস, গান্ধর্ব্ব্য, পৈশাচ বিবাহ নিবারণার্থই হউক অথবা অন্য যে কোন কারণেই হউক, বালিকা-বিবাহপ্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়া অসবর্ণ বিবাহ এবং বর্ণসঙ্কর নিবারণের উৎকৃষ্ট উপায় হইয়াছে। আবার চিন্তা করিলে এ কথাও মনে হয় যে জাতিভেদ, ভদ্রাসনে আসক্তি এবং একান্নবর্ত্তী থাকিবার নিয়ম সমস্তই এক ধারাবাহিক প্রকৃতি হইতে স্বভাবতঃ উৎপন্ন হইতে পারে। বালিকাবিবাহ প্রথা যত্নসহকারে প্রবর্ত্তিত মনে হয় কিন্তু তাহা অপর প্রথা কয়েকটীর ফল কি হেতু ইহা বিশেষ করিয়া স্থির করা কঠিন। সে যাহা হউক, এ কথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবেক যে আপ্রেন্টিস শিখাইবার প্রথা অভাবে লোকের ব্যবসা শিক্ষার নিমিত্ত পিতৃ উপদেশই উৎকৃষ্ট উপায়।

তদ্ভিন্ন যদি উল্লিখিত প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণের কথা সত্য হয়, তবে পুরুষানুক্রমে এক বৃত্তি প্রতিপালিত হইলে ক্রমশঃ তদ্বংশজাত ব্যক্তিগণের পক্ষে জাতীয় ব্যবসা শিক্ষা বিলক্ষণ সহজ হইয়া উঠিবেক। সমাজের আস্থাবস্থাতে আপ্রেন্টিস-প্রণালী সংস্থাপিত হইবার সম্ভাবনা নাই সুতরাং উপদেশ দ্বারা সভ্যতার উন্নতিসাধন নিমিত্ত জাতিভেদ ব্যবস্থাই অত্যুৎকৃষ্ট।

কিন্তু ইহার দোষ এই যে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক কোন বৃত্তি অবলম্বন করিলে লোকে যেমন যত্নসহকারে তাহাতে নিযুক্ত হয় পৈতৃক বলিয়া গ্রহণ করিলে সচরাচর সেরূপ উৎসাহ হয় না।

---

* আমরা কোন বিশ্বস্ত ব্যক্তির মুখে শুনিয়াছি যে বারাণসীতে অনেক রাঢ়শ্রেণীয় ব্রাহ্মণ বৈদিকের কন্যা গ্রহণ করিয়াছেন। প্রয়াগে কয়েকজন কায়স্থ ও ব্রাহ্মণ জুতার ব্যবসা করিয়া থাকেন, তন্মধ্যে কায়স্থটী প্রয়োজনমতে স্বহস্তে চর্ম্ম সীবন পর্য্যন্ত করিয়া থাকেন। আর বিদেশবাসী কোন কোন বাঙ্গালি স্ত্রীগণের অন্তঃপুরাবাস মোচন করিয়াছেন এ কথা অনেকেই জানেন।

লোকে নিয়মাধীন থাকিতে হইলেই কষ্ট বোধ করে। "এই নিয়মের অন্যথা করিতে পারি না" এই কথা মনোমধ্যে উদয় হইলেই স্বভাবতঃ ক্লেশের স্থল হইয়া উঠে। কিন্তু আমাদিগের সেরূপ যন্ত্রণা বোধ হয় না, ইহাতেই স্পষ্ট প্রতীতি হইবে যে, আমরা নিতান্ত নিস্তেজ হইয়াছি। আমরা একজন সংস্কৃতভাষাজ্ঞ ধার্ম্মিক কায়স্থের কথা শুনিয়াছি যে তিনি কুলপুরোহিতের মূর্খতা নিবন্ধন বৈরক্তি প্রযুক্ত স্বয়ং দুর্গোৎসবের মন্ত্রপাঠ করিতে বসিয়াছিলেন। ইহাতে তিনি কোন কোন লোকের নিকট নিতান্ত অপদস্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু বাস্তবিক এই বৈরক্তি তেজের লক্ষণ। এবং নিজে মন্ত্রপাঠে সক্ষম হইলেও যে লোকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করিতে বাধ্য হইলে ক্ষুণ্ণচিত্ত হয় না ইহাই আশ্চর্য্য এবং কাপুরুষত্বের লক্ষণ।

বর্ণের তারতম্য অনুসারে বৃত্তির সমাদরের ন্যূনাতিরেক হয়। সুতরাং শ্রেষ্ঠবর্ণের বৃত্তিগুলিই বিশিষ্টরূপ উন্নতিলাভ করে, অন্যান্য বৃত্তি হেয় বলিয়া তাহার প্রতি কেহ যত্ন করে না। কিন্তু সংসারযাত্রা নির্ব্বাহার্থে সকলই প্রয়োজন। কোন পদার্থই তুচ্ছ নহে। আমাদিগের ব্রাহ্মণেরা ধর্ম্ম ও দর্শনশাস্ত্রের আলোচনাতে বিলক্ষণ নিপুণ হইয়াছিলেন কিন্তু শিল্প-কর্ম্ম কেবল নিকৃষ্ট বর্ণের ব্যবসা ছিল বলিয়া তাহার বিশেষ উন্নতি হয় নাই। বরং অভ্যাসগুণে ধারাবহন প্রকৃতি এতই প্রবল হইয়াছে যে, কি ব্রাহ্মণ কি নিকৃষ্টবর্ণ কেহই উন্নতি কি পরিবর্ত্তনের চিন্তাও করেন না। ভিন্ন ভিন্ন মনুষ্যের বুদ্ধি ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীতে নিযুক্ত হইয়া থাকে। যদি কেহ চিরকাল একস্থানে একই পদার্থ অবলোকন করে তাহা হইলে তাহার বুদ্ধির স্ফূর্ত্তি হয় না; নূতন পদার্থ দেখিলে যে সকল নূতন ভাব মনে উদয় হয় তাহা তাহার দুর্লভ। তদ্রূপ যদি বংশানুক্রমে একই কার্য্যে নিযুক্ত থাকা যায় তাহা হইলে কার্য্যান্তর দেখিবার ইচ্ছা হয় না এবং বুদ্ধির গতিরোধ হইয়া যায়।

কোন কায়স্থ একটি টাকা ব্যয় করিলে তাহার কপর্দ্দকের হিসাব দিবে। কিন্তু একজন কৃষককে বল "তোমার ক্ষেত্রে কি পরিমাণ বীজ রোপিত কত ধান্য উৎপন্ন হইয়াছে, সম্বৎসর কত ব্যয় কতই বা লাভ হইল?" সে কখনই ইহার সদুত্তর করিতে পারিবেক না। পূর্ব্বাপর যেরূপ শুনিয়াছে সেইরূপ উত্তর দিবে। কিন্তু যদি পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব লিখিয়া রাখিত তাহা হইলে কবে বীজের দোষে কবে ভূমির দোষে শস্যোৎপত্তির ন্যূনতা ঘটিল তাহা জানিতে এবং এতদুভয়ের হেতু বুঝিতে পারিয়া উন্নতির চেষ্টা করিতে পারিত। কৃষক কায়স্থের বুদ্ধি লইয়া এ সকল বিষয়ে হিসাব রাখে না। কায়স্থ ধারাবাহিক মতে হিসাবই লিখেন কিন্তু অনেক স্থলে হিসাবের উদ্দেশ্য ভুলিয়া যান। কৃষকের ন্যায় অভীষ্ট সিদ্ধির পক্ষে দৃক্‌পাত করেন না সুতরাং অনেক সময়ে অপ্রয়োজন হিসাবে বৃথা কালক্ষেপণ

করেন এবং মনকে এই বলিয়া প্রবোধ দেন যে "বিস্তর কার্য্য করিতেছি।" আর কৃষক বলেন যে "আমার অত কথায় কাজ কি ?"

আমরা সকলেই মনে করি যে গৃহাদি যত মজবুত হয় ততই ভাল। এঞ্জিনিয়ারেরা বলেন যে, যে কার্য্যে যত দৃঢ়তা আবশ্যক তদতিরিক্ত দৃঢ় করিলে বৃথা অর্থ ব্যয় হয়। কিন্তু যখন তত্তজ্জন্য মসলার বল ও গাঁথুনির দৃঢ়তা পরিমাণ করিবার সঙ্কেত স্থির করিয়া দেন নাই তখন তাহার প্রতি উপেক্ষা করাই ধারাবাহিক বাঙ্গালিদিগের স্বধর্ম্ম হইবেক ইহাতে বিচিত্র কি ?

আজিকালি জগৎ-প্রসিদ্ধ জর্ম্মান সৈন্যের কথা মনে করিলে আমাদিগের হীনতা বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইবেক। যুদ্ধকালে সেনাগণকে শ্রেণীবদ্ধ রাখা অধ্যক্ষদিগের প্রধান উদ্দেশ্য। যেন সকলে অনায়াসে আজ্ঞা শুনিতে পায় এবং কেহ ত্রুটি করিলে তাহা তৎক্ষণাৎ প্রকাশ হইয়া নিবারিত হইতে পারে। কিন্তু এখন কামান ছুঁড়িবার প্রণালী এতই পরিপক্ক হইয়াছে যে, ক্ষিপ্রহস্ত বিপক্ষের সম্মুখে সৈন্যগণ ঘন ঘন পঙ্‌ক্তিতে অগ্রসর হইতে পারে না ; কামান পর্য্যন্ত যাইয়া রঞ্জক ঘর বন্ধ করিবার পূর্ব্বেই বারম্বার গোলাবর্ষণে প্রায় সমুদায়কে ভূতলশায়ী হইতে হয় ; এতাদৃশ স্থলে সৈন্যগণ ফাঁক ফাঁক ছাড়া ছাড়া করিয়া অগ্রসর হইলে কার্য্য উদ্ধার হইবার সম্ভাবনা কিন্তু শ্রেণীবদ্ধ হইয়া না থাকিলে যে ক্ষতি হয় তাহা কি প্রকারে নিবারিত হইবে ? জর্ম্মান সৈন্যেরা ক্রমশঃ এমনি সুবোধ হইয়া উঠিয়াছে যে তাহাদিগকে যুদ্ধারম্ভকালে একটি আজ্ঞা দিলে সকলেই আপনাপনি তদনুসারে কার্য্য করিতে পারে, অন্যান্য সৈন্যের ন্যায় তাহাদিগের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে হয় না। যাঁহারা অধিক সংখ্যক লোককে কোন কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন তাঁহারাই জানেন যে শ্রমজীবীদিগের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণে কত বৃথা ব্যয় হয়। এবং তাঁহারাই বুঝিবেন যে জর্ম্মান সৈন্য কি অসাধারণ গুণসম্পন্ন হইয়াছে।

ইংলণ্ডীয় কৃষকগণ একাধারে এতদ্দেশীয় কায়স্থ ও কৃষকের বুদ্ধি একত্রিত করিয়াছেন। ইউরোপীয় এঞ্জিনিয়ারগণ গৃহনির্ম্মাণকার্য্যে গণিতশাস্ত্র নিয়োজিত করিয়াছেন। জর্ম্মান সেনাগণ নানা শাস্ত্রোপার্জ্জিত বুদ্ধি লইয়া যুদ্ধকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন। এই সকল দেশের শ্রমজীবিগণ আপনাদিগের আয় বৃদ্ধির উদ্দেশে নানা বিষয়ে আত্মসংযম করিতেছে এতদ্দেশে বিশ্বাস্য বোধ হয় না কিন্তু সুইটজরলণ্ড দেশের অতি দরিদ্র ইতর ব্যক্তিরা আপনাদিগের ভাবি অবস্থা সম্বন্ধে এত দূরদৃষ্টিসম্পন্ন হইয়াছে যে বংশ বৃদ্ধি হইলে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যাঘাত হইবেক বলিয়া সন্তানোৎপাদন বিষয়ে পদে পদে আত্মসম্বরণ করিয়া থাকে। কিন্তু বীজগণিত সৃষ্টিকর্ত্তাদিগের বংশাবলীর পক্ষে এতদূর গণনা করা অসাধ্য হইয়াছে। আমাদিগের মধ্যে যিনি অতি কর্ম্মঠ কি পণ্ডিত তিনি একাগ্রচিত্তে কার্য্য করিব এই বাসনাই

করেন। অন্যদিকে দৃষ্টিপাত করিতে পারেন না। কিন্তু বুদ্ধি মার্জ্জিত না হইলে ক্রমশঃ স্থূল হইয়া যায়। মনে নূতন ভাব উদিত না হইলে বুদ্ধির স্ফূর্ত্তি হয় না এবং চিন্তা স্তম্ভিত হইয়া যায়। নূতন ভাব সংগ্রহ করিবার জন্য সময়ে সময়ে মনকে নির্দ্দিষ্ট কার্য্য হইতে বিযুক্ত করিয়া অন্য বিষয়ে ব্যাপৃত করা আবশ্যক। এই জন্য সকল ব্যবসার প্রথমে লেখাপড়া শিক্ষা করা উচিত এবং যেমন বীজ পরিশোধনার্থ ভিন্ন বংশে বিবাহ করা প্রয়োজন তদ্রূপ মানসিক দর্শন বিস্তারিত করিবার জন্য নানা ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে হৃদ্যতা ও কুটুম্বিতা সংস্থাপন করা কর্ত্তব্য। আপ্রেন্টিস প্রথার দোষ নাই এ কথা বলি না। অন্যের অধীন না হইয়া পিতা-পিতৃব্য কিম্বা জ্ঞাতি-কুটুম্বের অধীন হইয়া ব্যবসা শিক্ষা করিলে শিষ্যের অনেক কষ্ট নিবারিত হইতে পারে কিন্তু পদে পদে ব্যবসা নির্ব্বাচন এবং পরের শিষ্য হইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হইলে যে স্বচিন্তা ও স্বাবলম্বনের প্রয়োজন হয় তাহা এক মহোপদেশ। আমাদিগের মধ্যেও গুরূপদেশের বিধান ছিল কিন্তু এখন তাহা কেবল ধর্ম্মশাস্ত্র এবং ব্যায়াম শিক্ষাতে দৃষ্ট হয়। অনেক স্থলে উহাতেও ধারাবহন-প্রণালী প্রবিষ্ট হইয়া নানা দোষের উৎপত্তি হইয়াছে। তবে উল্লিখিত প্রাণিতত্ত্বের নূতন আবিষ্কার অবশ্যই জাতিভেদ প্রথার সাপেক্ষ।

ভারতবর্ষীয় আর্য্যজাতির আদিম অবস্থা

শাসনপ্রণালী

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর সাক্ষিবিবরাদি)

স্থলবিশেষে সাক্ষীর পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য, স্থলবিশেষে পরীক্ষা না করিয়াই সাক্ষ্য গ্রহণ করা বিধেয় ; সাক্ষী পরীক্ষিত হউক আর নাই হউক, সাক্ষী উপস্থিত হইলেই কালক্ষয় না করিয়া সাক্ষ্য গ্রহণ করিবে। কালবিলম্বে সাক্ষীর দোষ হইলে বিচারক পাতকী হইবেন। (১)

বিচার-নিষ্পাদন সময়ে যেখানে সাক্ষীর আগমন সম্ভাবনা ও সামর্থ্য না থাকে তথায় তল্লিখিত পত্রাদি দ্বারা তাহার সাক্ষ্য প্রমাণ হয়। সেই লেখ্য তাহার কি না তদ্বিষয়ের সন্দেহ নিরাস জন্য তদীয় অন্য লেখ্যের সঙ্গে তুলনা করিয়া দেখা রীতি, ইহা চিরপ্রসিদ্ধ। (২)

পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিগণকে ঋষিগণ কেন সাক্ষিযোগ্য জ্ঞান করেন নাই তাহা শুন। অজ্ঞতা হেতু শিশুজন, স্ত্রীলোকের মিথ্যা কথন অস্বাভাবিক নহে, এই কারণে কামিনীকুল, (৩) জালকারী ব্যক্তিদিগের পাপকার্য্যে অভ্যাস আছে

---

(১) কাত্যায়ন {
ন কালহরণং কার্য্যং রাজ্ঞা সাক্ষিপ্রভাষণে।
মহান্ দোষো ভবেৎ কালাদ্ধর্ম্মবৃত্তিলক্ষণঃ।

নারদ {
অন্তর্বেশ্মনি রাত্রৌ চ বহির্গ্রামাচ্চ যদ্ভবেৎ।
এতস্মিন্নভিযোগে তু পরীক্ষা নাত্র সাক্ষিণাম্॥

মনু অঃ ৮ {
অনুভাবী তু যঃ কশ্চিৎ কুর্য্যাৎ সাক্ষ্যং বিবাদিনাম্।
অন্তর্বেশ্মন্যরণ্যে বা শরীরস্যাপি চাত্যয়ে॥ ৬৯
সাহসেষু চ সর্ব্বেষু স্তেয়সংগ্রহণেষু চ।
বাগ্দণ্ডয়োশ্চ পারুষ্যে ন পরীক্ষেত সাক্ষিণঃ॥ ৭২

(২) কাত্যায়ন {
অশক্য আগমো যত্র বিদেশপ্রতিবাসিনাম্।
ত্রৈবিদ্য প্রেষিতং তত্র লেখ্যং সাক্ষ্যং প্রদাপয়েৎ॥

(৩) কাত্যায়ন {
বালোঽজ্ঞানাদসত্যাৎ স্ত্রী পাপাভ্যাসাচ্চ কূটকৃৎ।
বিব্রূয়াদ্বান্ধবঃ স্নেহাদ্বৈরনির্যাতনাদরিঃ॥

সুতরাং তৎকথিত সত্য বাক্যকে লোকে কূট সাক্ষ্য জ্ঞান করে তন্নিবন্ধন জালকারী, বন্ধুজনেরা স্নেহ প্রযুক্ত অসত্য কহিতে সম্মত হইতে পারেন তদ্ধেতু সুহৃজ্জন, শত্রু ব্যক্তি পূর্ব্বাচরিত বৈর নির্য্যাতনের প্রতিশোধ বুদ্ধিতে বিপরীত কহিতে পারে অতএব ইহাদের সাক্ষী গ্রাহ্য নহে।

এইরূপ বিচার শাস্তিকার্য্যেই প্রচলিত; সাহসিক কার্য্যাদিতে ইহাদের সাক্ষীও গ্রাহ্য হয়। (৪)

পাঠক তোমাকে যাহা বলিতেছি তদ্বিষয়ে তোমার মতদ্বৈধ হইবার সম্ভাবনা, অতএব তুমি যেখানে যেখানে শাস্তিকার্য্যের নাম শুনিবে তাহাকে দেওয়ানী ও যেখানে যেখানে সাহসিক কার্য্য এই শব্দ শুনিবে তাহাকে ফৌজদারি বিচার মনে করিবে, তাহা হইলে তোমার মনে কোন দ্বিধা জন্মিবে না। পাঠক, তুমি এখন নিশ্চয় বুঝিলে যে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মত্ততা, ভয়, মৈত্র, রাগ, দ্বেষ ও অজ্ঞানাদি হেতু বশতঃ মিথ্যা বলিবার সম্ভাবনা, ইহা বিবেচনা করিয়াই ঋষিগণ সাক্ষী বিষয়ে অমুক্তহস্ত হইয়া রহিয়াছেন। (৫)

সাক্ষ্যকার্য্যে কামিনীজনের বিবাদে কামিনীকুল, দ্বিজাতির বিবাদে তৎসদৃশ দ্বিজাতি, শূদ্রগণের বিষয়ে শূদ্র ব্যক্তি, অন্ত্যজ ব্যক্তিবর্গের সাক্ষ্যে অন্ত্যজ মনুষ্যই সাক্ষী হইবে; সদৃশ সাক্ষী না হইলে শাস্তিকার্য্যে গ্রাহ্য হয় না। (৬)

উভয় পক্ষের সাক্ষ্যে তুল্যতা থাকিলে সদ্‌গুণাদিসম্বদ্ধ ব্যক্তির কথা বিশিষ্ট প্রামাণিক বলিয়া গ্রাহ্য হইয়া থাকে। (৭) সাক্ষীর বিষয় অদ্য এই পর্য্যন্ত রাখা গেল ইহা ক্রমে ক্রমে বলিব নতুবা পাঠকের বিরক্তি ও অরুচি জন্মিতে পারে।

---

(৪) উশনা { দাসোঽন্ধো বধিরঃ কুষ্ঠী স্ত্রীবালস্থবিরাদয়ঃ।
এতে হ্যনভিসম্বদ্ধাঃ সাহসে সাক্ষিণো মতাঃ॥

মনু অঃ ৮ { স্ত্রীনাম সম্ভবে কার্য্যং বালেন স্থবিরেণ বা।
শিষ্যেণ বন্ধুনা বাপি দাসেন ভৃতকেন বা॥ ৭০

নারদ { ব্যাঘাতাচ্চ নৃপাজ্ঞায়াং সংগ্রহে সাহসেষু চ।
স্তেয় পারুষ্যয়োশ্চৈব ন পরীক্ষেত সাক্ষিণঃ॥

(৫) যাজ্ঞবল্ক্য { অসাক্ষ্য পিহি শাস্ত্রেষু দৃষ্টঃ পঞ্চবিধঃ স্মৃতঃ।
বচনাদ্ দোষতো ভেদাৎ স্বয়মুক্তিমৃতান্তরঃ॥

(৬) মনু ৮ অঃ শ্লো ৬৮ { স্ত্রীণাং সাক্ষ্যং স্ত্রিয়ঃ কুর্য্যুর্দ্বিজানাং সদৃশদ্বিজাঃ।
শূদ্রাশ্চ সন্তি শূদ্রাণামন্ত্যানা মন্ত্যযোনয়ঃ॥

(৭) দ্বৈধে বহূনাং বচনং সমেষু গুণিনাং বচঃ।
গুণিদ্বৈধেতু বচনং গ্রাহ্যং যে গুণবত্তরাঃ॥

যাজ্ঞবল্ক সংহিতা।

সম্ভূয় সমুত্থান

অনেকেই কহিয়া থাকেন আর্য্যজাতির প্রবৃত্তি বাণিজ্যবিষয়ে বিস্তৃত ছিল না বলিয়া সম্মিলিত সম্প্রদায় পরিভুক্ত বাণিজ্যের গুণ জানিতে পারেন নাই। যদি তাহা অবগত হইতে পারিতেন, তবে কি আমাদের ভাবনা থাকিত ?

পাঠক, তুমি লেখকের কথাগুলি শুনিয়া যথার্থ মীমাংসা করিবে। তুমি জান আর্য্যজাতির বাণিজ্যকার্য্যের ভার বৈশ্যগণের প্রতি অর্পিত ছিল। তাহারা যে সম্মিলিত সম্প্রদায় পরিভুক্ত বাণিজ্য জানিত না তাহা কি বিশ্বাস কর ? যদি কর, তবে তোমার ভ্রমপ্রমাদ নিরাস করাই অগ্রে উচিত। সিংহলদ্বীপে, যবদ্বীপে ও পূর্ব্ব-উপদ্বীপের কতিপয় স্থলেও চীনের লোকের সঙ্গে যে বাণিজ্য চলিত তাহার প্রমাণ অনেক শুনিয়াছ। এক্ষণে তুমি কেবল এই কথার প্রমাণ চাও যে যদি সম্মিলিত সম্প্রদায় পরিভুক্ত বাণিজ্য থাকিত, তাহা হইলে তাহার কোন নাম (৮) অবশ্য আর্য্যগণের ধর্ম্ম শাস্ত্রাদিতে উল্লেখ থাকিত। তদনুসারে তোমাকে সম্ভূয়সমুত্থানের কথা বলিতেছি। বাণিজ্যব্যবসায়ী জনগণের মধ্যে যদি কতিপয় ব্যক্তি মিলিত হইয়া পরস্পরের অর্থ ও কায়িক শ্রম বিনিয়োগ পুরঃসর ক্ষতিবৃদ্ধির আনুমানিক সীমা নির্দ্ধারণপূর্ব্বক পরস্পর সমবায় সম্বন্ধে বাণিজ্য করে, তবে তাহাকে তদবস্থায় সম্ভূয়সমুত্থান কহা যায়। (৯)

পাঠক, যেদিন অবধি সম্ভূয়সমুত্থান কার্য্য স্থগিত হইয়াছে, সেই দিন অবধি ভারতের দুর্দ্দশার প্রাথমিক সূত্রপাত ধরা যাইতে পারে। কোন্ সময়ে এই যে জাতিসাধারণহিতকর কার্য্যের পথে কণ্টক পড়িয়াছে, তাহা নিশ্চয় করা সুকঠিন। তবে এইমাত্র বলা যায় যে কলিকালের আদিভাগেই উহার লোপ হইয়াছে। অন্য তিন যুগে যে সকল কার্য্য মানবগণের হিতজনক ও সুসাধ্য ছিল তাহার কতকগুলি কলিকালে মনুষ্যজাতির পক্ষে অত্যন্ত দুঃখজনক ও অকীর্ত্তিকর ও অসাধ্যসাধন ভাবিয়া ভবিষ্যদ্বক্তা ঋষিগণ শাস্ত্রে "মাতার দিব্বি" দিয়া (১০) সেগুলি

---

(৮) সাংযাত্রিকঃ পোতবণিক্ (কর্ণধারস্তু নাবিকঃ ।)
অমরকোষ পাতালবর্গ ।

(৯) সমবায়েন বণিজাং লাভার্থং কর্ম্ম কুর্ব্বতাং ।
লাভালাভৌ যথা দ্রব্যং যথা বাসম্বিদা কৃতৌ ॥
যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা ব্যবহার কাণ্ড । ২৬২
সম্ভূয় স্বানি কর্ম্মাণি কুর্ব্বদ্ভিরিহ মানবৈঃ ।
অনেন বিধিযোগেন কর্ত্তব্যাংশ প্রকল্পনা ॥ মনু অঃ ৮ শ্লো । ২১১

(১০) সর্ব্বে ধর্ম্মাঃ কৃতে জাতাঃ সর্ব্বে নষ্টাঃ কলৌ যুগে ।
চাতুর্বর্ণ্য সমাচারং কিঞ্চিৎ সাধারণং বদ ॥
ব্যাস প্রশ্নঃ পরাশর সংহিতা ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা ।

কলিতে অধর্ম্মজনক ও নরকপ্রাপ্তির কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভারতের আর্য্যগণের মন সর্ব্বদা স্বর্গের দিকে ধাবিত। সুতরাং অস্বর্গ কার্য্যে তাঁহাদিগের মন কেন যাইবে? কাজেই সমুদ্রযাত্রা রহিত হইল। এইটিই সম্ভূয়সমুত্থানের অন্তরায় বলিয়া অনুমিত হয়। বিদেশীয়দিগের সঙ্গে সংস্রব না থাকিলে বাণিজ্য-বিস্তার হয় না।

সম্ভূয়সমুত্থান বিবাদে কতদূর দণ্ডের পরিমাণ তাহা যখন শাস্ত্রে আছে তখন অবশ্যই ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত বলিয়া পরিগণিত। লেখক বলিতে পারে স্থলপথে বাণিজ্য সহজ নহে। দ্রব্যাদির আসার প্রসার অনায়াসসাধ্য না হইলে বাণিজ্যে লাভ হয় না। এই কারণেই প্রথমাবধি স্থলপথের ব্যাণিজ্যে লোকের তাদৃশ আস্থা দেখা যায় নাই। অবশেষে যখন সমুদ্রযাত্রা (১১) রহিত হইয়া গেল, তখন আর্য্যজাতির পতনের উন্মেষকাল, তৎকালে লোকের প্রতিভা লোপ হইবার উপক্রম। বিশেষতঃ তৎকালে ইহাদিগের গৃহ-বিচ্ছেদ আরম্ভ হইয়াছে। যখন আত্মীয়গণের সঙ্গে প্রণয় নাই, তখন অপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে কিরূপে পরিচয় হইতে পারে? সেই গৃহবিচ্ছেদকালে প্রজাগণ প্রাণরক্ষার আশঙ্কায় ব্যতিব্যস্ত ছিল, এরূপ অবস্থায় কি কোন ব্যক্তির স্বদেশানুরাগ প্রবল থাকে? তখন কেবল আত্মরক্ষার চিন্তা। সুতরাং সম্ভূয়সমুত্থান রহিত হইল।

পূর্ত্তকার্য্য (Public Works)

আমাদিগের সভ্যজাতিরা বলিবেন ভারতবর্ষীয়দিগকে তাঁহারা পূর্ত্তকার্য্যের ফল শিক্ষা দিয়াছেন। তাঁহাদের উপদেশ না পাইলে অথবা আদর্শ না দেখিলে ভারতের আর্য্যগণ কদাচ পূর্ত্তকার্য্য করিতে সমর্থ হইতেন না। বৈদেশিক

---

* বিষ্ণু পুরাণে বর্ণাশ্রমাচারবতী প্রবৃত্তির্ন কলৌযুগে নৃণাং।

আদি পুরাণে { যস্তু কার্ত্তযুগে ধর্ম্মো নকর্ত্তব্যঃ কলৌযুগে।
পাপ প্রসক্তাস্তু যতঃ কলৌ নার্য্যো নরস্তথা॥

(১১) সমুদ্রযাত্রা স্বীকারঃ কমণ্ডলুবিধারণং
দ্বিজানামসবর্ণাসু কন্যাসূপযমস্তথা॥
দেবরেণ সুতোৎপত্তির্ম্মধুপর্কে পশোর্বধঃ।
মাংসদানং তথাশ্রাদ্ধে বানপ্রস্থাশ্রমস্তথা॥
দত্তায়াশ্চৈব কন্যায়াঃ পুনর্দানং পরস্য চ।
দীর্ঘকালং ব্রহ্মচর্য্যং নরমেধাশ্বমেধকৌ॥
মহাপ্রস্থান গমনং গোমেধঞ্চ তথা মখং।
ইমান্ ধর্ম্মান্ কলিযুগে বর্জ্জ্যানাহুর্ম্মনীষিণঃ॥

উদ্বাহ তত্ত্ব ধৃত বৃহন্নারদীয় বচন।

পরিব্রাজক! তুমি একবার ভারত পরিভ্রমণ কর। ধর্ম্মশাস্ত্র, পুরাণ ও কাব্য পাঠ কর, অবশ্য নানাস্থলে পূর্ত্তকার্য্য দেখিতে পাইবে। যদি তোমার নারদ, মার্কণ্ডেয় মুনি, ভূষণ্ডী কাক অথবা কোন ভারতীয় উপন্যাসবক্তা বৃদ্ধের সহিত সাক্ষাৎ হয়, তবে অবশ্য পূর্ত্তকার্য্যের অনেক সমাচার পাইবে। নারদ ও যুধিষ্ঠির সম্বাদেও ঐরূপ কথাবার্ত্তা দেখা যায়, মহাভারত সভাপর্ব্ব দেখ।

পাঠক, তুমি কাশী চল; জ্ঞানবাপী ও মণিকর্ণিকা প্রভৃতি তীর্থ দেখ। যদি বৃন্দাবন যাও, তবে সেখানেও বনরাজী দেখিয়া পরিতোষলাভ করিতে পারিবে। তুমি কি অক্ষয় বটের কথা শুন নাই! অক্ষয় বটের এত মাহাত্ম্য কেন? ছায়াদান দ্বারা তিনি ক্লান্ত জনগণের শ্রান্তি অপনয়নপূর্ব্বক স্বস্তি ও শান্তি প্রদান করেন। পুরুষোত্তমক্ষেত্র দর্শন কর। নরেন্দ্রহ্রদ, চক্রতীর্থ, মার্কণ্ডেয়হ্রদ, ইন্দ্রদ্যুম্নসরোবর, শ্বেতগঙ্গা প্রভৃতি শ্রীক্ষেত্রের ইন্দ্রদ্যুম্নরাজার পূর্ত্তকার্য্য।

অক্ষয়বটের কথা শুনিয়াছ, সর্ব্বস্থানে তাঁহার পূজা হয়।

রাম ভরতকে কি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, নারদ আসিয়া যুধিষ্ঠিরকে কি কি বিষয়ের উপদেশ দিয়াছিলেন? (১২) পাঠক, তুমি রামায়ণ পড়: প্রজাদিগের জন্য রাম কত ব্যস্ত হইয়া ভরতকে কহিলেন, ভ্রাতঃ তুমি প্রজাদিগের সঙ্গে সমদুঃখসুখী কি না? তুমি প্রজাদিগকে স্থলবিশেষে বীজ, ভোজ্য ও ঋণ দিয়া থাক কি না? মরুদেশ ও অল্পতোয়বিশিষ্ট প্রদেশসকলে বৃহৎ বৃহৎ তড়াগাদি করিয়া দিয়াছ কি না? প্রজাগণ দেবমাতৃক বলিয়া কৃষির নিমিত্ত যে খেদ করিত, তাহাদের সে খেদ নিবৃত্তি করিয়াছ কি না? এখন সমুদায় রাজ্যকে অদেবমাতৃক বলিতে পারি কি না? বৈদেশিক, তুমি বলিতে পার যদি ইহাদিগের সে বুদ্ধিই ছিল, তবে প্রশস্ত রাজবর্ত্মের কথা শ্রবণ করা যায় না কেন? তুমি মনে করিয়াছ ইহাদিগের ইতিহাস নাই, তুমি যাহা বলিবে তাহার উত্তর দিতে পারিব না। মহাভারত ও রামায়ণকে কি পদার্থ জ্ঞান কর? তাহাতে প্রশস্ত রাজপথের লক্ষণ দেখিতে পাইবে। রাজমার্গ অপরিষ্কৃত করিলে সাপরাধ ব্যক্তির দণ্ডবিধান হয় ও স্থলবিশেষে তিরস্কার হইয়া থাকে তাহা তোমাকে দেখাইয়াছি। (মনু—অ ৯০—) ২৮২।২৮৩ শ্লোক। যদি বল বাঁধা রাস্তার ধারে সারি বাঁধা গাছ নাই। তাহার প্রমাণ জন্য আমি দীলিপ রাজার বশিষ্ঠের আশ্রমগমন ও রঘুরাজার দিগ্বিজয় যাত্রার কথা উল্লেখ করিব। দিলীপ যে সময়ে বশিষ্ঠের আশ্রমে যাইতেছেন, তখন

---

(১২) কচ্চিদ্রাষ্ট্রে তড়াগানি পূর্ণানিচ বৃহন্তিচ।
ভাগশো বিনিবিষ্টানি ন কৃষির্দেব মাতৃকা ॥ ৭৮
মহাভারত সভাপর্ব্ব অধ্যায় ৫

তাঁহার দর্শনলালসায় বৃদ্ধ গোপগণ সদ্যোজাত নবনীত উপহার সমভিব্যাহারে বশিষ্ঠাশ্রমাভিমুখের রাজমার্গে উপস্থিত আছে। রাজা সেই সকল বৃদ্ধদিগকে রাজবর্ত্মস্থিত বৃক্ষশ্রেণীগত বনজবৃক্ষগুলির নাম জিজ্ঞাসা করিতে করিতে বশিষ্ঠ-আশ্রমে চলিলেন। রঘু যে সময়ে যুদ্ধযাত্রা করেন তখন শরৎ কাল। অগাধ জলবিশিষ্ট নদীগুলি পয়ঃপ্রণালী দ্বারা জল নিঃসারণপূর্ব্বক সুখতার্য্য ও অল্পজলা করিয়াছিলেন। মরুদেশগুলিকে সজল করিয়াছিলেন। যে সকল নদী নাব্য ছিল, সেগুলি সেতুবন্ধন দ্বারা অনায়াসতার্য্য করিয়াছিলেন। রঘু যুদ্ধযাত্রাকালে যে স্থান মহারণ্য দেখিয়াছিলেন, তাহার ধ্বংস করিয়াছিলেন। তখনি সেস্থল সুগম্য সুপরিষ্কৃত ও অনাবৃত স্থল হয়। (১৩)

এখন পাঠক তুমি শাস্ত্রের আদেশ চাও; পূর্ত্তকার্য্যের শাস্ত্রীয় প্রশংসা শুনিতে মানস করিয়াছ; তুমি প্রাচীন ঋষিদের প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্র শ্রবণ কর। দ্বিজগণ সর্ব্বদা সমাহিতচিত্তে ইষ্ট ও পূর্ত্তকার্য্য সমাধা করিবেন। ইষ্টকার্য্য দ্বারা স্বর্গলাভ হয়। পূর্ত্তকার্য্যই মোক্ষপ্রাপ্তির কারণ। যে ব্যক্তি দিনেকের নিমিত্তে ভূমি খনন করিয়া সুস্বাদু বারি প্রদান করেন, তদীয় জলাশয়ে অন্য প্রাণিবর্গের জলপানের সম্ভাবনা না থাকিলেও তৃষ্ণার্ত্ত একমাত্র গোধনের তৃপ্তিসাধনেই তাঁহার জলাশয় করণের ফল জন্মে। (১৪) সেই বারিক্ষেত্রই তাঁহার সপ্তকুল উদ্ধারের কারণ বলিয়া পরিগণিত হয়।

যাঁহার প্ররোপিত তরুরাজীর সুস্নিগ্ধ ছায়াতলে উপবিষ্ট হইয়া জীবগণ ক্লান্তি দূর করে তাহার পক্ষে সেই পাদপশ্রেণীই ভূমিদাতা ও গোদান কর্ত্তার সহিত সালোক্য প্রদানের সোপানস্বরূপ। যে ধর্ম্মমতি পরকীয় বাপীকূপ তড়াগাদি

---

(১৩) সর্গ ১ — হৈয়ঙ্গবীনমাদায় ঘোষ বৃদ্ধানুপস্থিতান্।
নামধেয়ানি পৃচ্ছন্তৌ বন্যানাং মার্গ শাখিনাম্।

৪র্থ ২৪ শ্লো — সরিতঃ কুর্ব্বতী গাধাঃ পথশ্চাশ্যানকর্দ্দমান্।
যাত্রায়ৈ প্রেরয়ামাস তং শক্তেঃ প্রথমং শরৎ॥

ঐ ৩১ শ্লোক — মরুপৃষ্ঠান্যুদম্ভাংসি নাব্যাঃ সুপ্রতরা নদীঃ।
বিপিনানি প্রকাশানি শক্তিমত্ত্বাচ্চকার সঃ॥

রঘুবংশ

(১৪) ইষ্টাপূর্ত্ত ইষ্টা পূর্ত্তেতু কর্ত্তব্যো ব্রাহ্মণেন প্রযত্নতঃ।
ইষ্টেন লভতে স্বর্গং পূর্ত্তে মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ॥
একাহমপি কর্ত্তব্যং ভূমিষ্ঠমুদকং শুভং।
কুলানি তারয়েৎ সপ্ত যত্র গৌর্বিতৃষী ভবেৎ॥

লিখিত সংহিতা।

দেবমন্দিরাদির যথাসম্ভব পঙ্কোদ্ধার ও জীর্ণ সংস্কার করেন তিনিও পূর্ব্বোক্তরূপে স্বর্গফলভাগী হন। জীর্ণ সংস্কারাদিও অভিনব পূর্ত্তকার্য্যের সদৃশ গণ্য। ইষ্ট ও পূর্ত্তকার্য্যে দ্বিজাতিত্রয়েরই সমান অধিকার। শূদ্রগণের কেবল পূর্ত্তকার্য্যে অধিকার দেখা যায়। ইষ্টকার্য্যে শূদ্রগণ নিতান্ত অনধিকারী। (১৫)

অগ্নিহোত্র, তপস্যা, সত্যপালন, নাস্তিক হইতে বেদের রক্ষা, আতিথ্য, বৈশ্বদেবের পূজা, এই কয়েকটি কার্য্যের নাম ইষ্ট। (১৬)

জলাশয়, দান, বৃক্ষরোপন, প্রশস্ত বর্ত্ম নির্ম্মাণ, পঙ্কোদ্ধারকার্য্য ও জীর্ণসংস্কার, পান্থনিবাস, বাঁধাঘাট ও দেবমন্দিরাদি প্রতিষ্ঠা, অতিথিশালা প্রভৃতির নির্ম্মাণকার্য্য পূর্ত্তমধ্যে গণ্য। কুল্যাদির বিষয় ইংরাজী দেখ। তথায় ঋক্বেদের বচন প্রমাণ উদ্ধার করা গেল।

Vide Mur's Sanskrit Texts, Vol. V.

R. V. IV 57, is a Hymn in which the ক্ষেত্রস্থপতি, or deity who is the protector of the soil or of a husbandry, is addressed and a blessing is invoked on field operations, and their instruments, and on the Cultivators (কীনাস). Compare X. 117,7 উর্ব্বরা, Cultivated and fertile land, is mentioned in various places. Water courses (কুল্যা), which may or may not have been artificial, are alluded to in III, 45,3, and X 43, 7 (সমক্ষরন্ সোমাসঃ ইন্দ্রম্ কুল্যাঃ ইব হ্রদম্), as bending to ponds or lakes; and waters which are expressly referred to as following in channels which had been dug up for them are mentioned in VII 49,9 "যাঃ আপো দিব্যা উতবা স্রবন্তি খনিত্রিমাঃ উতবা যাঃ স্বয়ঞ্জাঃ।" And from this it is not unreasonable to infer that then Irrigation of lands under cultivations may have been practised (Page 465)

শ্রীলাল।

---

(১৫) ভূমিদানেন যে লোকা গোদানেনচ কীর্ত্তিতাঃ।
তাল্লোকান্ প্রাপ্নুয়ান্মর্ত্ত্যঃ পাদপানাং প্ররোপণে॥
বাপী কূপ তড়াগানি দেবতায়তনানিচ।
পতিতান্যুদ্ধরেদ্যস্তু সপূর্ত্ত ফলমশ্নুতে॥
লিখিত সংহিতা।

(১৬) অগ্নিহোত্রং তপঃ সত্যং বেদানাঞ্চৈব পালনং।
আতিথ্যং বৈশ্বদেবঞ্চ ইষ্টমিত্যভিধীয়তে॥
ইষ্টাপূর্ত্তে দ্বিজাতীনাং সামান্যো ধর্ম্ম উচ্যতে।
অধিকারী ভবেচ্ছূদ্রঃ পূর্ত্তে ধর্ম্মেণ বৈদিকে॥
লিখিত সংহিতা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সেই অবধি, আমি প্রায় প্রত্যহ রামসদয় মিত্রের বাড়ী ফুল বেচিতে যাইতাম। কিন্তু কেন তাহা জানি না। যাহার নয়ন নাই, তাহার এ যত্ন কেন? সে দেখিতে পাইবে না—কেবল কথার শব্দ শুনিবার ভরসা মাত্র। কেন শচীন্দ্রবাবু আমার কাছে আসিয়া কথা কহিবেন? তিনি থাকেন সদরে—আমি যাই অন্তঃপুরে। যদি তাঁহার স্ত্রী থাকিত, তবেবা কখন আসিতেন। কিন্তু বৎসরেক পূর্ব্বে তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যু হইয়াছিল—আর বিবাহ করেন নাই। অতএব সে ভরসাও নাই। কদাচিৎ কোন প্রয়োজনে মাতাদিগের নিকটে আসিতেন। আমি যে সময়ে ফুল লইয়া যাইব, তিনিও ঠিক সেই সময়ে আসিবেন, তাহারই বা সম্ভাবনা কি? অতএব যে এক শব্দ শুনিবার মাত্র আশা, তাহাও বড় সফল হইত না। তথাপি অন্ধ প্রত্যহ ফুল লইয়া যাইত। কোন্ দুরাশায়, তাহা জানি না। নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিবার সময় প্রত্যহ ভাবিতাম, আমি কেন আসি? প্রত্যহ মনে করিতাম, আর আসিব না। প্রত্যহই সে কল্পনা বৃথা হইত। প্রত্যহই আবার যাইতাম। যেন চুল ধরিয়া লইয়া যাইত। আবার নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিতাম, আবার প্রতিজ্ঞা করিতাম যাইব না—আবার যাইতাম। এরূপে দিন কাটিতে লাগিল।

মনে মনে আলোচনা করিতাম, কেন যাই? শুনিয়াছি, স্ত্রীজাতি পুরুষের রূপে মুগ্ধ হইয়া ভালবাসে। আমি কাণা, কাহার রূপ দেখিয়াছি? তবে কেন যাই? কথা শুনিব বলিয়া? কখন কেহ শুনিয়াছে যে কোন রমণী শুধু কথা শুনিয়া উন্মাদিনী হইয়াছে? আমিই কি তাই হইয়াছি? তাও কি সম্ভব? যদি তাই হয়, তবে বাদ্য শুনিবার জন্য, বাদকের বাড়ী যাই না কেন? সেতার সারেঙ্গ এসরার বেহালার অপেক্ষা কি শচীন্দ্র সুকণ্ঠ? সে কথা মিথ্যা।

তবে কি সেই স্পর্শ? আমি যে কুসুমরাশি রাত্রিদিবা লইয়া আছি, কখন পাতিয়া শুইতেছি, কখন বুকে চাপাইতেছি—ইহার অপেক্ষা তাহার

স্পর্শ কোমল? তা ত নয়। তবে কি? এ কথাকে কে বুঝাইবে, তবে কি?

তোমরা বুঝ না, বুঝাইবে কি? তোমাদের চক্ষু আছে, রূপ চেন, রূপই বুঝ। আমি জানি, রূপ-দ্রষ্টার মানসিক বিকারমাত্র—শব্দও মানসিক বিকার। রূপ, রূপবানে নাই, রূপ দর্শকের মনে—নহিলে একজনকে সকলে সমান রূপবান্ দেখে না কেন—একজনে সকলেই আসক্ত হয় না কেন? সেইরূপ শব্দও তোমার মনে। রূপ দর্শকের একটি মনের সুখমাত্র, শব্দও শ্রোতার একটি মনের সুখমাত্র, স্পর্শও স্পর্শকের মনের সুখমাত্র। যদি আমার রূপসুখের পথ বন্ধ থাকে, তবে শব্দ স্পর্শ গন্ধ কেন রূপসুখের ন্যায় মনোমধ্যে সর্ব্বময় না হইবে?

শুষ্কভূমিতে বৃষ্টি পড়িলে কেন না সে উৎপাদিনী হইবে? শুষ্ক কাষ্ঠে অগ্নি সংলগ্ন হইলে কেন না সে জ্বলিবে? রূপে হোক, শব্দে হোক, স্পর্শে হোক, শূন্য রমণীহৃদয়ে সুপুরুষ সংস্পর্শ হইলে কেন প্রেম না জন্মিবে? দেখ, অন্ধকারে ফুল ফুটে, মেঘে ঢাকিলেও চাঁদ গগনে বিহার করে, জনশূন্য অরণ্যেও কোকিল ডাকে, যে সাগরগর্ভে মনুষ্য কখন যাইবে না, সেখানেও রত্ন প্রভাসিত হয়, অন্ধের হৃদয়েও প্রেম জন্মে—আমার নয়ন নিরুদ্ধ বলিয়া হৃদয় কেন প্রস্ফুটিত হইবে না?

হইবে না কেন, কিন্তু সে কেবল আমার যন্ত্রণার জন্য। বোবার সুখস্বপ্ন, কেবল তাহার যন্ত্রণার জন্য। বধিরের সঙ্গীতানুরাগ যদি হয়, কেবল তাহার যন্ত্রণার জন্য; আপনার গীত আপনি শুনিতে পায় না। আমার হৃদয়ে প্রণয় সঞ্চার, তেমনই যন্ত্রণার জন্য। পরের রূপ দেখিব কি—আমি আপনার কখন আপনি দেখিলাম না। রূপ! রূপ! আমার কি রূপ! এই ভূমণ্ডলে রজনী নামে ক্ষুদ্র বিন্দু কেমন দেখায়? আমাকে দেখিলে, কখনও কি কাহার আবার ফিরিয়া দেখিতে ইচ্ছা হয় নাই? এমন নীচাশয়, ক্ষুদ্র কেহ কি জগতে নাই যে আমাকে সুন্দর দেখে? নয়ন না থাকিলে নারী সুন্দরী হয় না—আমার নয়ন নাই—কিন্তু তবে কারিগরে পাথর খোদিয়া চক্ষুঃশূন্য মূর্ত্তি গড়ে কেন? আমি কি কেবল সেই রূপ পাষাণী মাত্র? তবে বিধাতা এ পাষাণ মধ্যে এ সুখদুঃখসমাকুল প্রণয়লালসা-পরবশ হৃদয় কেন পুরিল? পাষাণের দুঃখ পাইয়াছি, পাষাণের সুখ পাইলাম না কেন? এ সংসারে এ তারতম্য কেন? অনন্ত দুষ্কৃতকারীও চক্ষে দেখে, আমি জন্মপূর্ব্বেই কোন্ দোষ করিয়াছিলাম যে আমি চক্ষে দেখিতে পাইব না? এ সংসারে বিধাতা নাই, বিধান নাই, পাপপুণ্যের দণ্ড পুরস্কার নাই—আমি মরিব।

আমার এই জীবনে বহুবৎসর গিয়াছে—বহুবৎসর আসিতেও পারে। বৎসরে বৎসরে বহুদিবস—দিবসে দিবসে বহু দণ্ড—দণ্ডে দণ্ডে বহু মুহূর্ত্ত—তাহার মধ্যে এক মুহূর্ত্ত জন্য, এক পলক জন্য, আমার কি চক্ষু ফুটিবে না? এক মুহূর্ত্ত

জন্য, চক্ষু মেলিতে পারিলে দেখিয়া লই এই শব্দস্পর্শময় বিশ্বসংসার কি—আমি কি—শচীন্দ্র কি?

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

তোমরা আমার গল্প শুনিতে বসিয়াছ কেন? আমার এ গল্পে রাজা নাই—রাজপুত্র নাই, বীরপুরুষ নাই—যুদ্ধ নাই—চুরি ডাকাতি নাই—লুকাচুরি নাই—খুন জখম নাই। অতি দীন দুঃখিনীর দুঃখের কথা। দুঃখিনী অতি সামান্য, কথাও সামান্য, কেবল দুঃখ অসামান্য। রস পাইবে কি? রসিক রসিকাগণকে অনুরোধ করিতেছি তাঁহারা অন্যত্র রসানুসন্ধান করুন। আমার দুঃখ আমাতেই থাক।

আমি প্রত্যহই ফুল লইয়া যাইতাম, ছোটবাবুর কথার শব্দশ্রবণ প্রায় ঘটিত না—কিন্তু কদাচিৎ দুই একদিন ঘটিত। সে আহ্লাদের কথা বলিতে পারি না। আমার বোধ হইত, বর্ষার জলভরা মেঘ যখন ডাকিয়া বর্ষে, তখন মেঘের বুঝি সেইরূপ আহ্লাদ হয়; আমারও সেইরূপ ডাকিতে ইচ্ছা করিত। আমি প্রত্যহ মনে করিতাম আমি ছোটবাবুকে কতকগুলি বাছা ফুলের তোড়া বাঁধিয়া দিয়া আসিব—কিন্তু তাহা একদিনও পারিলাম না। একে লজ্জা করিত—আবার, মনে ভাবিতাম ফুল দিলে তিনি দাম দিতে চাহিবেন—কি বলিয়া না লইব? মনের দুঃখে ঘরে আসিয়া ফুল লইয়া ছোটবাবুকেই গড়িতাম। কি গড়িতাম, তাহা জানি না—কখন দেখি নাই।

এদিগে আমার যাতায়াতে একটি অচিন্তনীয় ফল ফলিতেছিল—আমি তাহার কিছুই জানিতাম না। পিতামাতার কথোপকথনে তাহা প্রথম জানিতে পারিলাম। একদিন সন্ধ্যার পর, আমি মালা গাঁথিতে গাঁথিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। কি একটা শব্দে নিদ্রা ভাঙ্গিল। জাগ্রত হইলে কর্ণে পিতা মাতার কথোপকথনের শব্দ প্রবেশ করিল। বোধ হয়, প্রদীপ নিবিয়া গিয়া থাকিবে, কেন না পিতামাতা আমার নিদ্রাভঙ্গ জানিতে পারিলেন, এমত বোধ হইল না। আমিও আমার নাম শুনিয়া কোন সাড়া শব্দ করিলাম না। শুনিলাম, মা বলিতেছেন,

"তবে একপ্রকার স্থিরই হইয়াছে?"

পিতা উত্তর করিলেন, "স্থির বৈকি? অমন বড়মানুষ লোক, কথা দিলে কি আর নড়চড় আছে? আর আমার মেয়ের দোষের মধ্যে অন্ধ, নহিলে অমন মেয়ে লোকে তপস্যা করিয়া পায় না।"

মা। তা, পরে এত করবে কেন?

পিতা। তুমি বুঝিতে পার না যে ওরা আমাদের মত টাকার কাঙ্গাল নয়—হাজার দুহাজার টাকা ওরা টাকার মধ্যে ধরে না। যেদিন রজনীর সাক্ষাতে রামসদয় বাবুর স্ত্রী বিবাহের কথা প্রথম পাড়িলেন, সেইদিন হইতে রজনী তাঁহার কাছে প্রত্যহ যাতায়াত আরম্ভ করিল। তিনি ছেলেকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “টাকায় কি কাণার বিয়ে হয় ?” ইহাতে অবশ্য মেয়ের মনে আশাভরসা হইতে পারে যে, বুঝি ইনি দয়াবতী হইয়া টাকা খরচ করিয়া আমার মেয়ের বিবাহ দিবেন। সেইদিন হইতে রজনী নিত্য যায় আসে। সেইদিন হইতে নিত্য যাতায়াত দেখিয়া লবঙ্গ বুঝিলেন যে মেয়েটি বিবাহের জন্য বড় কাতর হয়েছে—না হবে কেন, বয়স ত হয়েছে। তাঁতে আর ছোটবাবুতে টাকা দিয়া হরনাথ বসুকে রাজি করিয়াছেন। গোপালও রাজি হইয়াছে।

হরনাথ বসু রামসদয় বাবুর বাড়ীর সরকার। গোপাল তাহার পুত্র। গোপালের কথা কিছু কিছু জানিতাম। গোপালের বয়স ত্রিশ বৎসর—একটি বিবাহ আছে, কিন্তু সন্তানাদি হয় নাই। গৃহধর্ম্মার্থে তাহার গৃহিণী আছে—সন্তানার্থ অন্ধ পত্নীতে তাহার আপত্তি নাই। বিশেষ লবঙ্গ তাহাকে টাকা দিবে। পিতা-মাতার কথায় বুঝিলাম গোপালের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে—টাকার লোভে সে কুড়িবৎসরের মেয়েও বিবাহ করিতে প্রস্তুত। টাকায় জাতি কিনিবে। পিতামাতা মনে করিলেন, এ জন্মের মত অন্ধ কন্যা উদ্ধার প্রাপ্ত হইল। তাঁহারা আহ্লাদ করিতে লাগিলেন। আমার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল।

তার পরদিন স্থির করিলাম, আর আমি লবঙ্গের কাছে যাইব না—মনে মনে তাহাকে শতবার পোড়ারমুখী বলিয়া গালি দিলাম। লজ্জায় মরিয়া যাইতে ইচ্ছা করিতে লাগিল। রাগে লবঙ্গকে মারিতে ইচ্ছা করিতে লাগিল। দুঃখে কান্না আসিতে লাগিল। আমি লবঙ্গের কি করিয়াছি যে, সে আমার উপর এত অত্যাচার করিতে উদ্যত ? ভাবিলাম, যদি সে বড়মানুষ বলিয়া, অত্যাচার করিয়াই সুখী হয়, তবে জন্মান্ধ দুঃখিনী ভিন্ন, আর কি অত্যাচার করিবার পাত্র পাইল না ? মনে করিলাম, না, আর একদিন যাইব, তাহাকে এমনই করিয়া তিরস্কার করিয়া আসিব—তারপর আর যাইব না—আর ফুল বেচিব না—আর তাহার টাকা লইব না—মা যদি তাহাকে ফুল দিয়া মূল্য লইয়া আসেন তবে, তাহার টাকার অন্ন ভোজন করিব না—না খাইয়া মরিতে হয়—সেও ভাল। ভাবিলাম, বলিব, বড় মানুষ হইলেই কি পরপীড়ন করিতে হয় ? বলিব, আমি অন্ধ—অন্ধ বলিয়া কি দয়া হয় না ? বলিব পৃথিবীতে যাহার কোন সুখ নাই, তাহাকে বিনাপরাধে কষ্ট দিয়া তোমার কি সুখ ? যত ভাবি, এই এই বলিব, তত আপনার চক্ষের জলে আপনি ভাসি। মনে ভয় হইতে লাগিল, পাছে বলিবার সময় কথাগুলি ভুলিয়া যাই।

যথাসময়ে, আবার রামসদয় বাবুর বাড়ী চলিলাম। ফুল লইয়া যাইব না মনে করিয়াছিলাম—কিন্তু শুধুহাতে যাইতে লজ্জা করিতে লাগিল—কি বলিয়া গিয়া বসিব। পূর্ব্বমত কিছু ফুল লইলাম। কিন্তু আজি মাকে লুকাইয়া গেলাম।

ফুল দিলাম—তিরস্কার করিব বলিয়া লবঙ্গের কাছে বসিলাম। কি বলিয়া প্রসঙ্গ উত্থাপন করিব? হরি! হরি! কি বলিয়া আরম্ভ করিব? গোড়ার কথা কোন্‌টা? যখন চারিদিকে আগুন জ্বলিতেছে—আগে কোন দিগ্‌ নিবাইব? কিছুই বলা হইল না! কথা পাড়িতেই পারিলাম না। কান্না আসিতে লাগিল।

ভাগ্যক্রমে লবঙ্গ আপনিই প্রসঙ্গ তুলিল, "কাণি—তোর বিয়ে হবে।"

আমি জ্বলিয়া উঠিলাম। বলিলাম "ছাই হবে।"

লবঙ্গ বলিল, "কেন, ছোটবাবু বিবাহ দেওয়াইবেন—হবে না কেন?"

আরও জ্বলিলাম। বলিলাম, "কেন, আমি তোমাদের কাছে কি দোষ করেছি?"

লবঙ্গও রাগিল। বলিল, "আমলো! তোর কি বিয়ের মন নাই নাকি?"

আমি মাথা নাড়িয়া বলিলাম, "না।"

লবঙ্গ আরও রাগিল, বলিল, "পাপিষ্ঠা কোথাকার! বিয়ে করবিনে কেন?"

আমি বলিলাম—"খুসি।"

লবঙ্গের মনে বোধ হয় সন্দেহ হইল—আমি ভ্রষ্টা—নহিলে বিবাহে অসম্মত কেন? সে বড় রাগ করিয়া বলিল, "আঃ মলো! বের বলিতেছি—নহিলে খেঙরা মারিয়া বিদায় করিব।"

আমি উঠিলাম—আমার দুই অন্ধচক্ষে জল পড়িতেছিল—তাহা লবঙ্গকে দেখাইলাম না—ফিরিলাম। গৃহে যাইতেছিলাম, সিঁড়িতে আসিয়া একটু ইতস্ততঃ করিতেছিলাম,—কই, তিরস্কারের কথা কিছুই ত বলা হয় নাই—অকস্মাৎ কাহার পদশব্দ শুনিলাম। অন্ধের শ্রবণশক্তি অনৈসর্গিক প্রখরতা প্রাপ্ত হয়—আমি দুই একবার সে পদশব্দ শুনিয়াই চিনিয়াছিলাম কাহার পদবিক্ষেপের এ শব্দ। আমি সিঁড়িতে বসিলাম। ছোটবাবু আমার নিকটে আসিলে, আমাকে দেখিয়া দাঁড়াইলেন। বোধ হয় আমার চক্ষের জল দেখিতে পাইয়াছিলেন,—জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে রজনি!"

সকল ভুলিয়া গেলাম! রাগ ভুলিলাম! অপমান ভুলিলাম, দুঃখ ভুলিলাম,—কাণে বাজিতে লাগিল—"কে রজনি।" আমি উত্তর করিলাম না—মনে করিলাম আর দুই একবার জিজ্ঞাসা করুন্—আমি শুনিয়া কাণ জুড়াই।

ছোটবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "রজনি! কাঁদিতেছ কেন?"

আমার অন্তর আনন্দে ভরিতে লাগিল—চক্ষের জল আরও উছলিতে লাগিল। আমি কথা কহিলাম না—আরও জিজ্ঞাসা করুন্। মনে করিলাম, আমি কি ভাগ্যবতী! বিধাতা আমায় কাণা করিয়াছেন, কালা করেন নাই।

তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন কাঁদিতেছ? কেহ কিছু বলিয়াছে।"

আমি সেবার উত্তর করিলাম—তাঁহার সঙ্গে কথোপকথনের সুখ, যদি জন্মে একবার ঘটিতেছে—তবে ত্যাগ করি কেন? আমি বলিলাম,

"ছোট মা তিরস্কার করিয়াছেন।"

ছোটবাবু হাসিলেন,—বলিলেন, "ছোট মার কথা ধরিও না—তাঁর মুখ ঐ রকম—কিন্তু মনে রাগ করেন না। তুমি আমার সঙ্গে এস—এখনই তিনি আবার ভাল কথা বলিবেন।"

তাঁহার সঙ্গে কেন না যাইব? তিনি ডাকিলে, কি আর রাগ থাকে? আমি উঠিলাম—তাঁহার সঙ্গে চলিলাম। তিনি সিঁড়িতে উঠিতে লাগিলেন—আমি পশ্চাৎ পশ্চাৎ উঠিতেছিলাম। তিনি বলিলেন, "তুমি দেখিতে পাও না—সিঁড়িতে উঠ কিরূপে? না পার, আমি হাত ধরিয়া লইয়া যাইতেছি।"

আমার গা কাঁপিয়া উঠিল—সর্ব্বশরীরে রোমাঞ্চ হইল—তিনি আমার হাত ধরিবেন! ধরুন না—লোকে নিন্দা করে করুক্—আমার নারীজন্ম সার্থক হউক! আমি পরের সাহায্য ব্যতীত কলিকাতার গলি গলি বেড়াইতে পারি, কিন্তু ছোট বাবুকে নিষেধ করিলাম না। ছোট বাবু—বলিব কি? কি বলিয়া বলিব—উপযুক্ত কথা পাই না—ছোট বাবু হাত ধরিলেন!

যেন একটি প্রভাত-প্রফুল্ল পদ্মদলগুলির দ্বারা আমার প্রকোষ্ঠ বেড়িয়া ধরিল—যেন গোলাবের মালা গাঁথিয়া কে আমার হাতে বেড়িয়া দিল! আমার আর কিছু মনে নাই। বুঝি, সেই সময়ে, ইচ্ছা হইয়াছিল—এখন মরি না কেন? বুঝি তখন গলিয়া জল হইয়া যাইতে ইচ্ছা করিয়াছিল—বুঝি ইচ্ছা করিয়াছিল শচীন্দ্র আর আমি, দুইটি ফুল হইয়া এইরূপ সংস্পৃষ্ট হইয়া, কোন বন্য বৃক্ষে গিয়া এক বোঁটায় ঝুলিয়া থাকি। আর কি মনে হইয়াছিল—তাহা মনে নাই। যখন সিঁড়ির উপরে উঠিয়া, ছোটবাবু হাত ছাড়িয়া দিলেন—তখন দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলাম—এ সংসার আবার মনে পড়িল—সেইসঙ্গে মনে পড়িল—"কি করিলে প্রাণেশ্বর! না বুঝিয়া কি করিলে! তুমি আমার পাণিগ্রহণ করিয়াছ। এখন তুমি আমায় গ্রহণ কর না কর—তুমি আমার স্বামী—আমি তোমার পত্নী—ইহজন্মে অন্ধ ফুলওয়ালীর আর কেহ স্বামী হইবে না।"

সেই সময়ে কি পোড়া লোকের চোখ পড়িল? বুঝি তাই

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ছোটবাবু ছোট মার কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "রজনীকে কি বলিয়াছ গা? সে কাঁদিতেছে।" ছোট মা আমার চক্ষে জল দেখিয়া অপ্রতিভ হইলেন,—আমাকে ভাল কথা বলিয়া কাছে বসাইলেন—বয়োজ্যেষ্ঠ সপত্নীপুত্রের কাছে সকল কথা ভাঙ্গিয়া বলিতে পারিলেন না। ছোটবাবু ছোট মাকে প্রসন্ন দেখিয়া, নিজ প্রয়োজনে বড় মার কাছে চলিয়া গেলেন। আমিও বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম।

এদিকে গোপাল বাবুর সঙ্গে আমার বিবাহের উদ্যোগ হইতে লাগিল। দিন স্থির হইল। আমি কি করিব? ফুলগাঁথা বন্ধ করিয়া, দিবারাত্রি কিসে এ বিবাহ বন্ধ করিব—সেই চিন্তা করিতে লাগিলাম। এ বিবাহে মাতার আনন্দ, পিতার উৎসাহ, লবঙ্গ-লতার যত্ন, ছোটবাবু ঘটক—এই কথাটি সর্ব্বাপেক্ষা কষ্টদায়ক—ছোট বাবু ঘটক! আমি একা অন্ধ কি প্রকারে ইহার প্রতিবন্ধকতা করিব? কোন উপায় দেখিতে পাইলাম না। মালা গাঁথা বন্ধ হইল। মাতাপিতা মনে করিলেন, বিবাহের আনন্দে আমি বিহ্বল হইয়া মালা গাঁথা ত্যাগ করিয়াছি।

ঈশ্বর আমাকে এক সহায় আনিয়া দিলেন। বলিয়াছি, গোপালবসুর বিবাহ ছিল—তাহার পত্নীর নাম চাঁপা—বাপ রেখেছিল, চম্পকলতা। চাঁপাই কেবল এ বিবাহে অসম্মত। চাঁপা একটু শক্ত মেয়ে। যাহাতে ঘরে সপত্নী না হয়—তাহার চেষ্টার কিছু ত্রুটি করিল না।

হীরালাল নামে চাঁপার এক ভাই ছিল—চাঁপার অপেক্ষা দেড় বৎসরের ছোট। হীরালাল মদ খায়—তাহাও অল্পমাত্রায় নহে। শুনিয়াছি গাঁজাও টানে। তাহার পিতা তাহাকে লেখাপড়া শিখান নাই—কোনপ্রকারে সে হস্তাক্ষরটি প্রস্তুত করিয়াছিল মাত্র, তথাপি রামসদয় বাবু তাহাকে কোথা কেরানিগিরি করিয়া দিয়াছিলেন। মাতলামির দোষে সে চাকরিটি গেল। হরনাথ বসু তাহার দমে ভুলিয়া, লাভের আশায় তাহাকে দোকান করিয়া দিলেন। দোকানে লাভ দূরে থাক, দেনা পড়িল—দোকান উঠিয়া গেল। তারপর কোন গ্রামে বার টাকা বেতনে হীরালাল মাষ্টার হইয়া গেল। সে-গ্রামে মদ পাওয়া যায় না বলিয়া হীরালাল পলাইয়া আসিল। তারপর সে একখানা খবরের কাগজ করিল। দিনকতক তাহাতে খুব লাভ হইল, বড় পসার জাঁকিল—কিন্তু লং সাহেবের আইনে বাধিয়া গেল—ভয়ে হীরালাল কাগজ ফেলিয়া রূপোষ হইল। আবার হঠাৎ ভাসিয়া উঠিয়া ছোটবাবুর মোসায়েবি করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু ছোটবাবুর কাছে মদের চাল নাই দেখিয়া আপনা আপনি সরিল। অনন্যোপায় হইয়া নাটক লিখিতে আরম্ভ করিল। নাটক একখানিও বিক্রয় হইল না। তবে ছাপাখানার দেনা শোধিতে হয় না বলিয়া সে যাত্রা রক্ষা পাইল। এক্ষণে এ

ভবসংসারে আর কূল কিনারা না দেখিয়া—হীরালাল চাঁপা দিদির আঁচল ধরিয়া বসিয়া রহিল।

চাঁপা হীরালালকে স্বকার্য্যোদ্ধার জন্য নিয়োজিত করিল। হীরালাল ভগিনীর কাছে সবিশেষ শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "টাকার কথা সত্য ত? যেই কাণীকে বিবাহ করিবে, সেই টাকা পাইবে?"

চাঁপা সে বিষয়ে সন্দেহভঞ্জন করিল। হীরালালের টাকার বড় দরকার। সে তখনই আমার পিতৃভবনে আসিয়া দর্শন দিল। পিতা তখন বাড়ী ছিলেন। আমি তখন সেখানে ছিলাম না। আমি নিকটস্থ অন্য ঘরে ছিলাম—অপরিচিত পুরুষে পিতার সঙ্গে কথা কহিতেছে, কণ্ঠস্বরে জানিতে পারিয়া, কাণ পাতিয়া কথাবার্ত্তা শুনিতে লাগিলাম। হীরালালের কি কর্কশ কদর্য্য স্বর!

হীরালাল বলিতেছে "সতীনের উপর কেন মেয়ে দিবে?"

পিতা দুঃখিতভাবে বলিলেন, "কি করি! না দিলে ত বিয়ে হয় না—এত কাল ত হলো না!"

হীরালাল। কেন, তোমার মেয়ের বিবাহের ভাবনা কি?

পিতা হাসিলেন, বলিলেন, "আমি গরিব—ফুল বেচিয়া খাই—আমার মেয়েকে বিবাহ করিবে? তাতে আবার কাণা মেয়ে, আবার বয়েসও ঢের হয়েছে।"

হীরা। কেন পাত্রের অভাব কি? আমায় বলিলে আমি বিয়ে করি। এখন বয়ঃস্থা মেয়ে ত লোকে চায়। আমি যখন স্বচ্ছ্‌বিচ্ছ্‌শাঃ পত্রিকার এডিটর ছিলাম, তখন আমি মেয়ে বড় করিয়া বিবাহ দিবার জন্য কত আর্টিকেল লিখেছি—পড়িয়া আকাশের মেঘ ডেকে উঠেছিল। বাল্যবিবাহ! ছি! ছি! মেয়ে ত বড় করিয়াই বিবাহ দিবে। এসো! আমাকে দেশের উন্নতির একজাম্পল্ সেট্ করিতে দাও—আমিই এ মেয়ে বিয়ে করিব।

আমরা তখন হীরালালের চরিত্রের কথা সবিশেষ শুনি নাই—পশ্চাৎ শুনিয়াছি। পিতা ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। এতবড় পণ্ডিত জামাই হাতছাড়া হয় ভাবিয়া শেষ একটু দুঃখিত হইলেন; শেষে বলিলেন, "এখন কথা ধার্য্য হইয়া গিয়াছে—এখন আর নড়চড় হয় না। বিশেষ এবিবাহের কর্ত্তা শচীন্দ্র বাবু। তাঁহারাই বিবাহ দিতেছেন। তাঁহারা যাহা করিবেন, তাহাই হইবে। তাঁহারাই গোপাল বাবুর সঙ্গে সম্বন্ধ করিয়াছেন।

হীরা। তাঁদের মতলব তুমি কি বুঝিবে? বড়মানুষের চরিত্রের অন্ত পাওয়া ভার। তাঁদের বড় বিশ্বাস করিও না। এই বলিয়া হীরালাল চুপিচুপি কি বলিল তাহা শুনিতে পাইলাম না। পিতা বলিলেন, "সে কি? না—আমার কাণা মেয়ে।"

হীরালাল তৎকালে ভগ্নমনোরথ হইয়া ঘরের এদিক্ সেদিক্ দেখিতে লাগিল। চারিদিক্ দেখিয়া বলিল, “তোমার ঘরে মদ নাই, বটে হে?” পিতা বিস্মিত হইলেন, বলিলেন, “মদ! কিজন্য রাখিব!”

হীরালাল মদ নাই জানিয়া, বিজ্ঞের ন্যায় বলিল, “সাবধান করিয়া দিবার জন্য বল্‌ছিলাম। এখন ভদ্রলোকের সঙ্গে কুটুম্বিতা করিতে চলিলে, ওগুলা যেন না থাকে।”

কথাটা পিতার বড় ভাল লাগিল না। তিনি চুপ করিয়া রহিলেন। হীরালাল না বিবাহে, না মদে, কোন দিকেই দেশের উন্নতির একজাম্পল্ সেট করিতে না পারিয়া, ক্ষুণ্ণমনে বিদায় হইল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বিবাহের দিন অতি নিকট হইল—আর একদিনমাত্র বিলম্ব আছে। উপায় নাই! নিষ্কৃতি নাই! চারিদিক্ হইতে উচ্ছ্বাসিত বারিরাশি গর্জ্জিয়া আসিতেছে—নিশ্চিত ডুবিব।

তখন লজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়া, মাতার পায়ে আছড়াইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলাম। যোড়হাত করিয়া বলিলাম—“আমার বিবাহ দিও না—আমি আইবড় থাকিব।”

মা বিস্মিতা হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেন?” কেন? তাহার উত্তর দিতে পারিলাম না। কেবল যোড়হাত করিতে লাগিলাম—কেবল কাঁদিতে লাগিলাম। মাতা, বিরক্ত হইলেন—রাগিয়া উঠিলেন, গালি দিলেন। শেষ পিতাকে বলিয়া দিলেন। পিতাও গালি দিয়া মারিতে আসিলেন। আর কিছু বলিতে পারিলাম না।

উপায় নাই! নিষ্কৃতি নাই! ডুবিলাম।

সেইদিন বৈকালে গৃহে কেবল আমি একা ছিলাম—পিতা বিবাহের খরচ সংগ্রহে গিয়াছিলেন—মাতা দ্রব্য সামগ্রী কিনিতে গিয়াছিলেন। এ সব সময়ে, হয় আমি দ্বার দিয়া থাকিতাম, না হয় বামাচরণ আমার কাছে বসিয়া থাকিত। বামাচরণ এ দিন বসিয়াছিল। একজন কে দ্বার ঠেলিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। চেনা পায়ের শব্দ নহে। জিজ্ঞাসা করিলাম, “কেগা?”

উত্তর “তোমার যম।”

কথা কোপযুক্ত বটে কিন্তু স্বর স্ত্রীলোকের। ভয় পাইলাম না। হাসিয়া বলিলাম—“আমার যম কি আছে? তবে এতদিন কোথা ছিলে।”

স্ত্রীলোকটির রাগ শান্তি হইল না। “এখন জানবি! বড় বিয়ের সাধ। পোড়ারমুখী; আবাগী।” ইত্যাদি গালির ছড়া আরম্ভ হইল। গালি সমাপ্তে

সেই মধুরভাষিণী বলিলেন, "হাঁ দেখ্, কাণি, যদি আমার স্বামীর সঙ্গে তোর বিয়ে হয়, তবে যেদিন তুই ঘর করিতে যাইবি, সেইদিন তোকে বিষ খাওয়াইয়া মারিব।"

বুঝিলাম চাঁপা খোদ। আদর করিয়া বসিতে বলিলাম। বলিলাম, "শুন—তোমার সঙ্গে কথা আছে।" এত গালির উত্তরে সাদর সম্ভাষণ দেখিয়া, চাঁপা একটু শীতল হইয়া বসিল।

আমি বলিলাম, "শুন, এ বিবাহে তুমি যেমন বিরক্ত, আমিও তেমনি। আমার এ বিবাহ যাহাতে না হয়, আমি তাহাই করিতে রাজি আছি। কিসে বিবাহ বন্ধ হয় তাহার উপায় বলিতে পার?"

চাঁপা বিস্মিত হইল। বলিল, "তা তোমার বাপ মাকে বল না কেন?"

আমি বলিলাম, "হাজার বার বলিয়াছি। কিছু হয় নাই।"

চাঁপা। বাবুদের বাড়ী গিয়া তাঁদের হাতে পায়ে ধর না কেন?

আমি। তাতেও কিছু হয় নাই।

চাঁপা একটু ভাবিয়া বলিল, "তবে এক কাজ করিবি?"

আমি। কি?

চাঁপা। দুদিন লুকাইয়া থাকিবি?

আমি। কোথায় লুকাইব? আমার স্থান কোথায় আছে?

চাঁপা আবার একটু ভাবিল। বলিল, "আমার বাপের বাড়ী গিয়া থাকিবি?"

ভাবিলাম, মন্দ কি? আর ত উদ্ধারের কোন উপায় দেখি না। বলিলাম, "আমি কাণা, নূতন স্থানে আমাকে কে পথ চিনাইয়া লইয়া যাইবে? তাহারাই বা স্থান দিবে কেন?"

চাঁপা আমার সর্ব্বনাশিনী কুপ্রবৃত্তি মূর্ত্তিমতী হইয়া আসিয়াছিল; সে বলিল, "তোর তা ভাবিতে হইবে না। সে সব বন্দোবস্ত আমি করিব। আমি সঙ্গে লোক দিব, আমি তাদের বলিয়া পাঠাইব। তুই যাস্ ত বল্?"

মজ্জনোন্মুখের সমীপবর্ত্তী কাষ্ঠফলকবৎ এই প্রবৃত্তি আমার চক্ষে একমাত্র রক্ষার উপায় বলিয়া বোধ হইল। আমি সম্মত হইলাম।

চাঁপা বলিল, "আচ্ছা, তবে ঠিক থাকিস্। রাত্রে সবাই ঘুমাইলে আমি আসিয়া দ্বারে টোকা মারিব, বাহির হইয়া আসিস্।"

আমি সম্মত হইলাম।

* * *

রাত্র দ্বিতীয় প্রহরে দ্বারে ঠক্ ঠক্ করিয়া অল্প শব্দ হইল। আমি জাগ্রত ছিলাম। দ্বিতীয় বস্ত্র মাত্র লইয়া আমি দ্বারোদ্ঘাটনপূর্ব্বক বাহির হইলাম। বুঝিলাম, চাঁপা দাঁড়াইয়া আছে। তাহার সঙ্গে চলিলাম। একবার ভাবিলাম না,

একবার বুঝিলাম না যে, কি দুষ্কর্ম্ম করিতেছি। পিতামাতার জন্য মন কাতর হইল বটে, কিন্তু তখন মনে মনে বিশ্বাস ছিল যে, অল্পদিনের জন্য যাইতেছি। বিবাহের কথা নিবৃত্তি পাইলেই আবার আসিব। রজনীনাম যে কলঙ্কে ডুবিবে, তাহা একবারও মনে পড়িল না।

আমি চাঁপার গৃহে—আমার শ্বশুর বাড়ী?—উপস্থিত হইলে চাঁপা আমায় সদ্যই লোক সঙ্গে দিয়া বিদায় করিল—পাছে তাহার স্বামী জানিতে পারে, এভয়ে বড় তাড়াতাড়ি করিল—যে লোক সঙ্গে দিল, তাহার সঙ্গে যাওয়ার পক্ষে আমার বিশেষ আপত্তি—কিন্তু চাঁপা এমনই তাড়াতাড়ি করিল যে, আমার আপত্তি ভাসিয়া গেল। মনে কর কাহাকে আমার সঙ্গে দিল? হীরালালকে।

হীরালালের মন্দ চরিত্রের কথা তখন আমি কিছুই জানিতাম না। সেজন্য আপত্তি করি নাই। সে যুবা পুরুষ—আমি যুবতী—তাহার সঙ্গে কি প্রকারে একা যাইব? এই আপত্তি। কিন্তু তখন আমার কথা কে শুনে? আমি অন্ধ, পথ অপরিচিত, রাত্রে আসিয়াছি—সুতরাং পথে যে সকল শব্দঘটিত চিহ্ন চিনিয়া রাখিয়া আসিয়া থাকি, সে সকল কিছু শুনিতে পাই নাই—অতএব বিনাসহায়ে বাড়ী ফিরিয়া যাইতে পারিলাম না—বাড়ী ফিরিয়া গেলেও সেই পাপ বিবাহ! অগত্যা হীরালালের সঙ্গে যাইতে হইল। তখন মনে হইল—আর কেহ অন্ধের সহায় থাক না থাক—আমার উপর দেবতা আছেন; তাঁহারা কখন দুর্ব্বলতার ন্যায়, পীড়িতকে পীড়ন করিবেন না; তাঁহাদের দয়া আছে, শক্তি আছে, অবশ্য দয়া করিয়া আমাকে রক্ষা করিবেন—নহিলে দয়া কার জন্য?

তখন জানিতাম না যে ঐশিক নিয়ম বিচিত্র—মনুষ্যের বুদ্ধির অতীত—আমরা যাহাকে দয়া বলি, ঈশ্বরের অনন্ত জ্ঞানে, তাহা দয়া নহে—আমরা যাহাকে পীড়ন বলি—ঈশ্বরের অনন্ত জ্ঞানের কাছে তাহা পীড়ন নহে। তখন জানিতাম না যে এই সংসারের অনন্ত চক্র দয়াদাক্ষিণ্যশূন্য, সে চক্র নিয়মিত পথে অনতিক্রান্ত রেখায় অহরহ চলিতেছে, তাহার দারুণ বেগের পথে যে পড়িবে—অন্ধ হউক, খঞ্জ হউক, আর্ত্ত হউক, সেই পিষিয়া মরিবে। আমি অন্ধ নিঃসহায় বলিয়া, অনন্ত সংসারচক্র পথ ছাড়িয়া চলিবে কেন?

হীরালালের সঙ্গে প্রশস্ত রাজপথে বাহির হইলাম—তাহার পদশব্দ অনুসরণ করিয়া চলিলাম—কোথাকার ঘড়িতে একটা বাজিল। পথে কেহ নাই—কোথায় শব্দ নাই—দুই একখানা গাড়ির শব্দ—দুই একজন সুরাপহৃতবুদ্ধি কামিনীর অসম্বদ্ধ গীতিশব্দ! আমি হীরালালকে সহসা জিজ্ঞাসা করিলাম—"হীরালাল বাবু, আপনার গায় জোর কেমন?"

হীরালাল একটু বিস্মিত হইল—বলিল, "কেন?"

আমি বলিলাম, "জিজ্ঞাসা করি ?"

হীরালাল বলিল, "তা মন্দ নয়।"

আমি। তোমার হাতে কিসের লাঠি ?

হীরা। তালের।

আমি। ভাঙ্গিতে পার ?

হীরা। সাধ্য কি !

আমি। আমার হাতে দাও দেখি।

হীরালাল আমার হাতে লাঠি দিল। আমি তাহা ভাঙ্গিয়া দ্বিখণ্ড করিলাম। হীরালাল আমার বল দেখিয়া বিস্মিত হইল। আমি আধখানা তাহাকে দিয়া, আধখানা আপনি রাখিলাম। তাহার লাঠি ভাঙ্গিয়া দিলাম দেখিয়া হীরালাল রাগ করিল। আমি বলিলাম,—"আমি এখন নিশ্চিন্ত হইলাম—রাগ করিও না। তুমি আমার বল দেখিলে—আমার হাতে এই আধখানা লাঠি দেখিলে—তোমার ইচ্ছা থাকিলেও তুমি আমার উপর কোন অত্যাচার করিতে সাহস করিবে না।"

হীরালাল চুপ করিয়া রহিল।

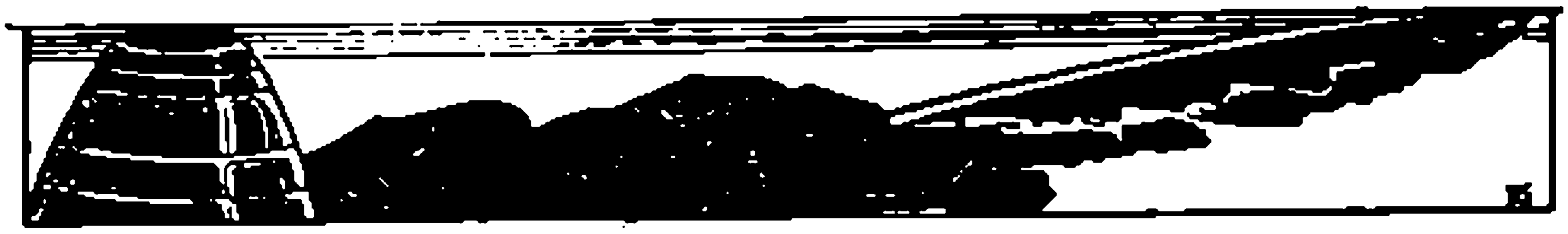

কমলাকান্তের দপ্তর

একাদশ সংখ্যা

আমার দুর্গোৎসব

সপ্তমী পূজার দিন কে আমাকে এত আফিঙ্গ চড়াইতে বলিল! আমি কেন আফিঙ্গ খাইলাম আমি কেন প্রতিমা দেখিতে গেলাম! যাহা কখন দেখিব না তাহা কেন দেখিলাম! এ কুহক কে দেখাইল!

দেখিলাম—অকস্মাৎ কালের স্রোতঃ, দিগন্ত ব্যাপিয়া প্রবলবেগে ছুটিতেছে—আমি ভেলায় চড়িয়া ভাসিয়া যাইতেছি। দেখিলাম—অনন্ত, অকূল, অন্ধকারে, বাত্যাবিক্ষুব্ধ তরঙ্গসঙ্কুল সেই স্রোতঃ—মধ্যে মধ্যে উজ্জ্বল নক্ষত্রগণ উদয় হইতেছে, নিবিতেছে—আবার উঠিতেছে, দিগন্ত আলো করিতেছে—আবার নিবিতেছে। আমি নিতান্ত একা—একা বলিয়া ভয় করিতে লাগিল—নিতান্ত একা—মাতৃহীন—মা! মা! করিয়া ডাকিতেছি। আমি এই কালসমুদ্রে মাতৃসন্ধানে আসিয়াছি। কোথা মা! কই আমার মা! কোথায় কমলাকান্তপ্রসূতি বঙ্গভূমি! এ ঘোর কালসমুদ্রে কোথায় তুমি? সহসা স্বর্গীয় বাদ্যে কর্ণরন্ধ্র পরিপূর্ণ হইল—দিঙ্মণ্ডলে প্রভাতারুণোদয়বৎ লোহিতোজ্জ্বল আলোক বিকীর্ণ হইল—স্নিগ্ধ মন্দ পবন বহিল—সেই তরঙ্গসঙ্কুলজলরাশির উপরে, দূরপ্রান্তে দেখিলাম—সুবর্ণমণ্ডিতা, এই সপ্তমীর শারদীয়া প্রতিমা! জলে হাসিতেছে, ভাসিতেছে, আলোক বিকীর্ণ করিতেছে! এই কি মা! হাঁ, এই মা। চিনিলাম, এই আমার জননী জন্মভূমি—এই মৃণ্ময়ী—মৃত্তিকারূপিণী—অনন্তরত্নভূষিতা—এক্ষণে কালগর্ভে নিহিতা। রত্নমণ্ডিত দশভুজ—দশদিক্—দশদিকে প্রসারিত; তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত; পদতলে শত্রুবিমর্দ্দিত, পদাশ্রিত বীরজনকেশরী শত্রুনিষ্পীড়নে নিযুক্ত! এ মূর্ত্তি এখন দেখিব না—আজি দেখিব না, কাল দেখিব না—কালস্রোত পার না হইলে দেখিব না—কিন্তু একদিন দেখিব—দিগ্ভুজা, নানা প্রহরণপ্রহারিণী, শত্রুমর্দ্দিনী, বীরেন্দ্রপৃষ্ঠবিহারিণী—দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী, বামে বাণী বিদ্যাবিজ্ঞানমূর্ত্তিময়ী,

সঙ্গে বলরূপী কার্ত্তিকেয়, কার্য্যসিদ্ধিরূপী গণেশ! আমি সেই কালস্রোতোমধ্যে দেখিলাম এই সুবর্ণময়ী বঙ্গপ্রতিমা!

কোথায় ফুল পাইলাম বলিতে পারি না—কিন্তু সেই প্রতিমার পদতলে পুষ্পাঞ্জলি দিলাম—ডাকিলাম, “সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে, আমার সর্ব্বার্থসাধিকে! অসংখ্য সন্তানকুলপালিকে! ধর্ম্ম অর্থ, সুখ দুঃখ দায়িকে! আমার পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ কর! এই ভক্তি প্রীতি বৃত্তি শক্তি করে লইয়া তোমার পদতলে পুষ্পাঞ্জলি দিতেছি, তুমি এই অনন্ত জলমণ্ডল ত্যাগ করিয়া এই বিশ্ববিমোহিনী মূর্ত্তি একবার জগৎ সমীপে প্রকাশ কর। এসো মা! নবরাগরঙ্গিণি, নববলধারিণি, নব দর্পে দর্পিণি, নবস্বপ্নদর্শিনি—এসো মা, গৃহে এসো—ছয়কোটি সন্তানে একত্রে, এক কালে, দ্বাদশকোটি করযোড় করিয়া, তোমার পাদপদ্ম পূজা করিব। ছয়কোটি মুখে ডাকিব, মা প্রসূতি অম্বিকে! ধাত্রিধরিত্রিধনধান্যদায়িকে! নগাঙ্কশোভিনি নগেন্দ্রবালিকে! শরৎসুন্দরি চারুপূর্ণচন্দ্রভালিকে! ডাকিব,—সিন্ধুসেবিতে সিন্ধুপূজিতে সিন্ধুমথনকারিণি, শত্রুবধে দশভুজে দশপ্রহরণধারিণি! অনন্তশ্রী অনন্তকালস্থায়িনি! শক্তি দাও সন্তানে, অনন্তশক্তিপ্রদায়িনি! তোমায় কি বলিয়া ডাকিব মা! এই ছয়কোটি মুণ্ড ঐ পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত করিব, এই ছয়কোটি কণ্ঠে ঐ নাম করিয়া হুঙ্কার করিব, এই ছয়কোটি দেহ তোমার জন্য পতন করিব—না পারি এই দ্বাদশকোটি চক্ষে তোমার জন্য কাঁদিব। এস মা গৃহে এস—যাঁহার ছয়কোটি সন্তান—তাঁহার ভাবনা কি?

দেখিতে দেখিতে আর দেখিলাম না—সেই অনন্ত কালসমুদ্রে সেই প্রতিমা ডুবিল! অন্ধকারে সেই তরঙ্গসঙ্কুল জলরাশি ব্যাপিল, জলকল্লোলে বিশ্বসংসার পূরিল! তখন যুক্ত করে, সজল নয়নে, ডাকিতে লাগিলাম, উঠ মা হিরণ্ময়ি বঙ্গভূমি! উঠ মা! এবার সুসন্তান হইব- সৎপথে চলিব—তোমার মুখ রাখিব। উঠ মা, দেবি দেবানুগৃহীতে - এবার আপনা ভুলিব—ভ্রাতৃবৎসল হইব, পরের মঙ্গল সাধিব—অধর্ম্ম, আলস্য, ইন্দ্রিয়-ভক্তি ত্যাগ করিব —উঠ মা—একা রোদন করিতেছি, কাঁদিতে কাঁদিতে চক্ষু গেল মা! উঠ উঠ, উঠ মা বঙ্গজননি!

মা উঠিলেন না। উঠিবেন না কি!

এস ভাই সকল! আমরা এই অন্ধকার কালস্রোতে ঝাঁপ দিই। এস আমরা দ্বাদশকোটি ভুজে ঐ প্রতিমা তুলিয়া, ছয়কোটি মাথায় বহিয়া, ঘরে আনি। এস, অন্ধকারে ভয় কি? ঐ যে নক্ষত্রসকল মধ্যে মধ্যে উঠিতেছে নিবিতেছে উহারা পথ দেখাইবে—চল! চল! অসংখ্য বাহুর প্রক্ষেপে, এই কালসমুদ্র তাড়িত, মথিত, ব্যস্ত করিয়া, আমরা সন্তরণ করি—সেই স্বর্ণপ্রতিমা মাথায় করিয়া আনি। ভয় কি? না হয় ডুবিব; মাতৃহীনের জীবনে কাজ কি? আইস, প্রতিমা

তুলিয়া আনি, বড় পূজার ধূম বাঁধিবে। সেবক ছাগকে হাড়িকাটে ফেলিয়া সংকীর্ত্তি খড়্গে মায়ের কাছে বলি দিব—কত পুরাবৃত্তকার ঢাকী, ঢাক ঘাড়ে করিয়া, বঙ্গের বাজনা বাজাইয়া আকাশ ফাটাইবে—কত ঢোল, কাঁশি, কাড়া, নাগরায় বঙ্গের জয় বাদিত হইবে। কত সানাই পোঁ ধরিয়া গাইবে "কত নাচ গো।—" বড় পূজার ধূম বাঁধিবে। কত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত লুচি মণ্ডার লোভে বঙ্গপূজায় আসিয়া পাতড়া মারিবে—কত দেশী বিদেশী ভদ্রাভদ্র আসিয়া মায়ের চরণে প্রণামি দিবে—কত দীন দুঃখী প্রসাদ খাইয়া উদর পূরিবে। কত নর্ত্তকী নাচিবে, কত গায়কে মঙ্গল গায়িবে, কত কোটি ভক্তে ডাকিবে মা। মা! মা!—

জয় জয় জয় জয়া জয়দাত্রি। জয় জয় কমলাকান্ত পালিকে।
জয় জয় জয় বঙ্গ জগদ্ধাত্রি॥ জয় জয় ভক্তি শক্তি দায়িকে,
জয় জয় জয় সুখদে বরদে। পাপ তাপ ভয় শোক নাশিকে॥
জয় জয় জয় বরদে শর্ম্মদে॥ মৃদুল গম্ভীর ধীর ভাষিকে।
জয় জয় জয় শুভে শুভঙ্করি। জয় মা কালি করালি অম্বিকে॥
জয় জয় জয় শান্তি ক্ষেমঙ্করি॥ জয় হিমালয় নগবাসিকে।
সেবক নন্দিনি, সন্তানপালিনি। অতুলিত পূর্ণচন্দ্র ভাসিকে॥
জয় জয় দুর্গে দুর্গতিনাশিনি॥ শুভে শোভনে সর্ব্বার্থ সাধিকে।
জয় জয় নন্দি নন্দীশ্বরবাসিকে। জয় জয় শান্তি শক্তি কালিকে॥
জয় মা কমলাকান্ত পালিকে॥

নমোঽস্তু তে দেবি বরপ্রদে শুভে।
নমস্তু তে কামচরে সদা ধ্রুবে॥
ব্রহ্মাণীন্দ্রাণি রুদ্রাণি ভূতভব্যে যশস্বিনি।
ত্রাহি মাং সর্ব্বদুঃখেভ্যো দানবানাং ভয়ঙ্করি॥
নমোঽস্তু তে জগন্নাথে জনার্দ্দনি নমোঽস্তু তে।
প্রিয়দাত্রে জগদ্ধাতঃ শৈলপুত্রি বসুন্ধরে।
ত্রায়স্ব মাং বিশালাক্ষি ভক্তানামার্ত্তনাশিনি।
নমামি শিরসা দেবীং বন্ধনোত্তবিমোচিতঃ॥*

---

* আর্য্যাস্তোত্র দেখ।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা

গৌড়েশ্বর নাটক। শ্রীরমেশচন্দ্র লাহিড়ী কর্ত্তৃক প্রণীত। সন ১২৮০ সাল। কলিকাতা শিবাদহ যন্ত্রে মুদ্রিত।

গ্রন্থকার পুস্তকের আবরণ পত্রে একটী "বিজ্ঞাপন" দিয়াছেন :—

বিজ্ঞাপন।

"সহৃদয় অথচ চিন্তাশীল পাঠকবর্গের হস্তে এই নাটক অর্পণ করিলাম।"

চিন্তাশীলের পক্ষে এই গ্রন্থ নূতন নহে। ইহা জাল রামায়ণ অথবা জাল অযোধ্যাকাণ্ড। লেখকের কবিত্বশক্তি আছে, সুতরাং তিনি এ পথ অবলম্বন করিয়া ভাল করেন নাই। স্বয়ং ভবভূতি যে বাল্মীকিকে প্রণাম করিয়া দূরে অবস্থান করেন, সেই বাল্মীকির অযোধ্যাকাণ্ডের কাপি করিয়া লাহিড়ী মহাশয় যে নাটক রচনা করিয়াছেন, ইহা তাঁহার ভ্রম মাত্র। শুদ্ধ কাপি করিলেও ক্ষতি ছিল না; গ্রন্থকার কাপি করেন নাই জ্ঞান করিয়াছেন। নামের, ঘটনার, সময়ের, চরিত্রের, ফেরফার করিয়া গৌড়েশ্বর নাটক প্রণয়ন করিয়াছেন। অথচ—

গৌড়েশ্বর চন্দ্রকেতু	রাজা দশরথ
সুধীর	রামচন্দ্র
রঘুবর সুরেন্দ্র	কুমার লক্ষ্মণ
বলরাম	ভরত
জাবালি	বশিষ্ঠ
বিজয়া	কৌশল্যা
কুন্তলা	কৈকেয়ী
তারা	মন্থরা
মনোরমা	সীতা
সুরসুন্দরী	ঊর্ম্মিলা

গৌড়েশ্বরে, সেই দশরথের স্ত্রৈণ্য, চাপল্য, স্নেহ, মায়া ও পরিণাম। কুমার সুবীরে, শ্রীরামচন্দ্রের সেই বীরত্ব ও ধীরত্ব। রঘুবর সুরেন্দ্রে, কুমার লক্ষ্মণের সেই প্রতাপ, সেই ঔদ্ধত্য সকলই সুস্পষ্ট দেখা যাইতেছে।

কুন্তলায়, কৈকেয়ীর সপত্নীভাব, ও তারাদাসীতে মন্থরার সেই কুচক্র সকলই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। সুতরাং এরূপ প্রতারণায় গ্রন্থকার কিছু লাভ করিতে পারেন নাই বরং ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন বলিয়াই বোধ হয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি গ্রন্থকারের কবিত্বশক্তি আছে। তাহার পরিচয়। সুরসুন্দরী রঘুবরকে বলিতেছেন :—

"নাথ ! নাহি দেখিয়াছি হেন কাল নিশি,
নাহি ছিল আশা দেখিব দিনের মুখ
আর ! পোহাইল যদি এ কাল শর্ব্বরী,
না দিব যাইতে রণে, আজ। সারা নিশি,
কাঁদিয়াছে আকুল পরাণ, প্রাণনাথ,
দেখিয়া স্বপনে অমঙ্গল ; রক্তবৃষ্টি
নাকে পড়ি নরমুণ্ড, কবন্ধ, ছাইয়া
মেদিনী. হাসিল বিকট হাসি, ব্যাদান
করিয়া মুখ, আইলা ধাইয়া, খাইতে
মোর হৃদয়ের প্রাণ, আতঙ্কে দিলাম
হাত হৃদে, দেখিলাম আকুল হইয়া
নাহি প্রাণ তাহে, আছে শুধু মৃতহৃদি
হরি লইয়াছে কেবা হৃদয়ের নিধি !!"

অন্য স্থান হইতে; আচার্য্য জাবালি গৌড়েশ্বরের মৃত্যুতে দুঃখ করিতেছেন :—

"দেখরে সংসার, রাজসুখ ! যাহে মুগ্ধ
সবে ; নরপাল হারাইল প্রাণ নিজে
অপালনে ! অন্তিমের বন্ধু তার নাহি
একজন ; কেহ নাহি বসিল শিয়রে
শুনাতে শেষের এ ভয়ঙ্কর দিনের
আশ্রয় রাম-নাম ! কেহ নাহি দেখিল
নিবিতে এ রাজদীপ ! নিমিলিতে রাজ
আঁখি এ মহানিদ্রায় ! না পড়িল এক
বিন্দু অশ্রুজল, ভিজাইতে সে দুর্গম
দেশের দারুণ পথ ! পাশরি রাজারে
এ সঙ্কটে, সবে মত্ত পূরণেতে নিজ

নিজ সাধ ! আহা ! কিবা রুক্ষ মরুভূম
রাজার জীবন ! এ সংসারে সুখউৎস
প্রেম আদান-প্রদান-স্নেহ ; কিন্তু হায় !
রাজন্য জীবন বঞ্চিত, প্রেম রত্নাকরে !"

আবার বলি, গ্রন্থকারের এরূপ রচনা-ভঙ্গি ও কবিত্ব আছে, তিনি এরূপ পথ অবলম্বন করিয়া ভাল করেন নাই।

বিবাহ ও পুত্রত্ব বিষয়ে মনুর মত। শ্রীঈশানচন্দ্র বসু কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। এলাহাবাদ বিক্টোরিয়া যন্ত্র।

এ গ্রন্থখানি উৎকৃষ্ট। এরূপ গ্রন্থের আমরা বিশেষ সমাদর করিয়া থাকি। ইহার ভূমিকা পাঠ করিতে পাঠকগণকে অনুরোধ করি। পাঠ করিয়া পাঠকগণ সন্তুষ্ট হইবেন। ইহার মতামতের সমালোচনায় আমরা প্রবৃত্ত হইলাম না—ভূমিকা হইতে শেষাংশ উদ্ধৃত করিয়া, গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য বুঝাইতেছি। গ্রন্থকারের মুখে, এরূপ পরিচয় দেওয়াই বিধেয়।

"আমি হিন্দুকুলশিরোমণি মনুর বিবাহ ও পুত্রত্ব বিষয়ক মত এই প্রস্তাবে প্রকাশ করিলাম। ইহাতে মনুর গভীর জ্ঞান, অসাধারণ ব্যবস্থা-প্রণয়ন-কৌশল ও তাঁহার মতের বিশুদ্ধতা প্রদর্শন ভিন্ন আরো কিছু লক্ষ্য আছে। ইহাতে উত্তম মধ্যম অধম বহু প্রকার বিবাহ-নিয়ম প্রদর্শিত হইয়াছে। সে সমুদায়ই প্রাচীন প্রথা ও তাহা মনুর ব্যবস্থাসম্মত। যে প্রচলিত হিন্দুবিবাহ-রীতির গুণ পূর্ব্বেই উক্ত হইল, যদি এই বিশুদ্ধ রীতি কাহারো দৃষ্টিতে অবিশুদ্ধ বোধ হয়—যদি ইহার ব্যত্যয় করিয়া অন্যবিধ বিবাহে প্রবৃত্ত হইতে কাহারো একান্ত আগ্রহ হয়, মনুর ব্যবস্থা তাঁহার অনুকূল হইবে। তাঁহার সহিত অন্য লোকের সহানুভূতি না হইতে পারে, কারণ "ভিন্নরুচির্হি লোকঃ" কিন্তু তাঁহার কার্য্য একান্ত শাস্ত্র-বহিষ্কৃত হইবে না—তাঁহাকে হিন্দু-সম্প্রদায়চ্যুত হইতে হইবে না। এইরূপ মনোমত বিবাহ করিতে পান না বলিয়া অনেকে হিন্দুদিগকে গালি দিয়া থান—অসভ্য বলিয়া বোধ করেন, তখন সকলের নিকট হিন্দু সভ্য হইবেন !

কিন্তু একটি কথা আছে। কতকগুলি বিবাহ-নিয়ম আছে, সেইগুলিকে মনু শ্রেষ্ঠ বিবাহ বলিয়াছেন, কতকগুলিকে অশ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন এবং তদনুসারে তাহাদের মর্য্যাদাও স্থাপন করিয়াছেন। সেই শ্রেষ্ঠ ও অশ্রেষ্ঠ বিবাহের পরস্পর যেরূপ মর্য্যাদা নিরূপিত আছে, বর্ত্তমানকালে তাহার তারতম্য হইতে পারে, কিন্তু সেই মর্য্যাদাভেদ চিরকাল থাকিবে। তাহা হিন্দুগণ প্রাণান্তেও ভুলিতে পারিবে না। তাহা হিমাচলের অঙ্গে উজ্জ্বল অক্ষরে খোদিত, সমুদায় ভারত-সমুদ্রের জলেও তাহা ধৌত হইবে না।"

প্রমোদকামিনী কাব্য। শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। কলিকাতা ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং।

গোল্ডস্মিথ প্রণীত "হর্মিট" নামক গীতিকাব্য অবলম্বন করিয়া এখানি রচিত হইয়াছে। পাঠকদিগের স্মরণ থাকিতে পারে, গোল্ডস্মিথের ঐ কাব্যও প্রাচীনতর গীতিকাব্যের অনুসারী। অতএব এখানি নকলের নকল। বাঙ্গালা গ্রন্থ অধিকাংশ এইরূপ হইতেছে।

"নকল" শুনিয়াই কেহ ঘৃণা করিবেন না; অনুকরণ হইলেই গ্রন্থ নিকৃষ্ট হয় না। ইহা প্রমাণ করা যাইতে পারে যে মহাভারত রামায়ণের অনুকরণ। বর্জিলের মহাকাব্য যে ইলিয়দের অনুকরণ, ইহা সর্ব্বত্র স্বীকৃত। স্বয়ং সেক্ষপীয়রও অনেক সময়ে, নিকৃষ্টতর কবিদিগের গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া আপন অপূর্ব্ব নাটক সকল রচনা করিয়াছিলেন। অনেক স্থলেই দেখা গিয়াছে, অনুকৃতের অপেক্ষা অনুকারী প্রতিভাশালী।

আমরা এই গ্রন্থ সম্বন্ধে সে কথা বলিতেছি না। ইহা গোল্ডস্মিথের কাব্য হইতে অনেকাংশে নিকৃষ্ট—কিন্তু মন্দও নহে; গোল্ডস্মিথের কাব্য ও এই কাব্য এক বিষয় লইয়া রচিত হইলেও, এতন্মধ্যে প্রকৃতিগত বিশেষ প্রভেদ দেখা যায়। হর্মিটের সরলতা ও মাধুর্য্য প্রমোদকামিনী কাব্যে নাই। ইহা অধিকতর জটিল, এ প্রেম তত পরিশুদ্ধ নহে, এবং অধিকতর পরিস্ফুট। সে অনির্ব্বচনীয় মাধুরি এবং কোমলতা দেখিলাম না। ইহাতে অনেক আবর্জ্জনা জন্মিয়াছে। কিন্তু কবির কবিত্বের অভাব নাই; এবং এক এক স্থানে মধুর বটে। গ্রন্থকার, নিতান্ত নকলনবিশও নহেন; অনেক স্থানে নূতন বিষয় সন্নিবেশ করিয়াছেন। ইঁহার কবিত্বের পরিচয় দিবার জন্য, একটি স্থান উদ্ধৃত করিলাম—

পরদিন বিধুমুখ উদিলে তপন,
—পরি পুরি পুরুষের সাজ,
খুঁজিব সে রসরাজ,
এ প্রতিজ্ঞা পুরাইতে করিল মনন।
কোকনদ-বিনিন্দিত চরণ-কমলে,
কিঞ্চিৎ কুণ্ঠিত হয়ে,
পোড়া লোক-লাজ ভয়ে
পরিল পাদুকা-যুগ বসিয়া বিরলে।
কাঁচলি উপরে বামা মুকুতার নরে,
ধরেছে অপূর্ব্ব বিভা,
পাইয়া রূপের নিভা,
নিশার শিশির যথা দিনকর করে!

জিনিয়া চম্পক-কলি অঙ্গুলি নিকরে,
    হীরক অঙ্গুরী ধরি
    পরিল যতন করি,
দ্বিতীয়ার চাঁদ যেন অমল অম্বরে !

মস্তকে পরিল তাজ মুনি-মনোহর ;
    মনের মতন করে
    সাজাইয়া অম্বরে,
চলিল মাধবীলতা যথা তরুবর ।

মনোগতি ছুটে অশ্ব দুলিছে কামিনী ;
    যথা সরোবর কোলে,
    মৃদু মলয় হিল্লোলে,
দোলে রে সুখের দোলে নবীনা নলিনী !

মধুকণা ঘর্ম্মবারি বদনকমলে,
    সেজেছে কি চমৎকার,
    যেন সুধার আধার,
তারা ঘেরা চাঁদ নরি উদিত ভূতলে ।

হিতাবলী । দ্বিতীয় ভাগ । অর্থাৎ হিতোপদেশপূর্ণ বাঙ্গালায় পদ্যগ্রন্থ । শ্রীপ্রসন্নচন্দ্র গুহ কর্ত্তৃক বিরচিত । কলিকাতা বাঙ্গালা সাপ্তাহিক রিপোর্ট যন্ত্র ।

এ গ্রন্থখানিও বালক শিক্ষার্থ । অতএব ইহা সম্বন্ধেও বিশেষ কিছু বলিতে আমাদের ইচ্ছা নাই । বিশেষ গ্রন্থকার সমালোচনাকারীর নিকট যেরূপ কাতরোক্তি করিয়াছেন, তাহাতে সুতরাং ক্ষান্ত হইতে হইতেছে । আমরা উদ্ধৃত করিতেছি—

এই যে নিষাদে হের মৃগ অন্বেষণে
ধাইতে কানন-মাঝে ; তীক্ষ্ণ অস্ত্র-শস্ত্র
পূর্ণ-তূণী পৃষ্ঠদেশে—সাক্ষাৎ শমন
সম । পরিহরি বৃক শার্দ্দূল বারণ
মৃগেন্দ্র ভীষণ-মূর্ত্তি, বিকট বরাহ
প্রচণ্ড মহিষ আদি বৃহজ্জন্তুগণ,
শাণিত সায়কে শুধু করিলে শিকার
বিড়াল বকক আদি ক্ষুদ্র পশুচয়
হয় কি পৌরুষ তার ? ইথে কি কখন
হয় সার্থকতা তার ভীষণ শরের ?

তেমন পুস্তক দোষ-গুণ-বিচারীর
হয় কি উচিত কভু ? যাপিতে সময়
কঠিন সমালোচনে নব লেখকের
কার্য্য, যাহার শকতি নহে পরিণত ।
যদি হও বহুদর্শী, বিচার তাদের
কাব্য সবিশেষ—খ্যাতাপন্ন কবি যাঁরা
দেশের ভিতর, যাঁদের কবিত্ব যশঃ
স্বদেশে বিদেশে ।

পাঠক হয়ত, শেষাংশ পড়িয়া ভাবিবেন যে, এরূপ গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করার অপেক্ষা "কঠিন সমালোচনা" আর কিছু হইতে পারে না, এবং "বিড়াল বঞ্চক আদি" শিকারের জন্য, ইহার অপেক্ষা ভীষণ শরের প্রয়োজন করে না। আমাদিগের সে অভিপ্রায় নহে, তাহা হইলে আরও তুলিতাম।

The Music and Musical Notation of Various Countries. By Loke Nath Ghose. Calcutta, J. N. Ghose and Biswas.

এখানি নানাদেশীয় স্বরলিপি বিষয়ক গ্রন্থ। গ্রন্থকার সংগীত-শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ নহেন, এবং তাঁহার সংগ্রহও বিস্তর, তবে আড়ম্বর অতি ভয়ানক। এ গ্রন্থ, "To His Excellency the Right Hon'ble Thomas George Baring Baron Northbrook of Stratton, G. M. S. I, Viceroy and Governor General of India" কে, উপহার প্রদত্ত হইয়াছে। ভূমিকায় কেবল একটি ক্ষুদ্র কথার উল্লেখ জন্য, Dr. Burney, Sir John Hawkins, Sir William Ouseley, Sir William Jones, Captain Willard, G. F. Graham Esq., Arthur Whitten Esq., W. C. Stafford Esq., Councillor Tilesius, M. Villoteau, এই সকল ব্যক্তির নাম নীত হইয়াছে, এবং গ্রন্থে আফ্রিকা, আমেরিকা, আরব, আরমাণি, আসিয়ায় ব্রহ্ম, সিংহল, চীন, দামাস্ক, মিশর, ফলাশা, গ্রীস, ইহুদা, ইস্কাপিক্ক, জাপান, কামস্কাট্কা, লুচু, মলয়, নবজীলণ্ড, পারস্য, সিম্পরপল, সণ্ডিচদ্বীপ, তিব্বত, যেজিদি, এই সকল দেশের স্বরলিপি-পদ্ধতি বর্ণিত হইয়াছে! বর্ষণ যত হউক না হউক, গর্জ্জন এ গ্রন্থের বিশিষ্টরূপে উদ্দেশ্য, ইহা দেখা যাইতেছে। বোধ হয়, সেই জন্যই ইহা ইংরেজিতে লিখিত হইয়াছে। দুর্ভাগ্যবশতঃ লেখক ইংরেজি লিখিতে জানেন না। এরূপ কদর্য্য ইংরেজির সঙ্গে লর্ড নর্থব্রুকের নাম গাঁথিয়া না দিলেই ভাল হইত। "বাবু ইংরেজির" উপর এত গালি বর্ষণ এই সকল লেখকের দোষে।

জীবন মরীচিকা। অর্থাৎ সংসারে সুখসাধনার্থ লোকেরা যে সকল চেষ্টা করেন, ধর্ম্মানুষ্ঠান ব্যতিরেকে তৎসমুদায় যে অকর্ম্মণ্য হয়, ইহাই প্রতীয়মান করণোপযোগী কতিপয় বিবরণ 'মিরাজ অব লাইফ' নামক ইংরেজি গ্রন্থ হইতে শ্রীগৌরনারায়ণ রায় কর্ত্তৃক অনুবাদিত। কলিকাতা। হিতৈষী যন্ত্র। ১২৭৬।

যাঁহারা অনুবাদ করেন, তাঁহারা যশের অল্পই আকাঙ্ক্ষা রাখেন। অনুবাদ ভাল হইলে প্রশংসার ভাগ মূলগ্রন্থকার পাইয়া থাকেন, অনুবাদ মন্দ হইলে, নিন্দার ভাগ অনুবাদকের। এই গ্রন্থে আমরা নিন্দার কিছুই পাইলাম না, ইহা বিশেষ প্রশংসা বলিতে হইবে। ফলতঃ গৌরনারায়ণ বাবু কেবল অনুবাদ করেন নাই, কচিৎ স্বকপোলকল্পিত ভাবগর্ভ কাব্যবাক্যও বিন্যস্ত করিয়াছেন। গৌরনারায়ণ বাবু সুশিক্ষিত এবং বিদ্বান্—তিনি যে এরূপ সামান্য বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হইয়াছেন, ইহা বলাই বাহুল্য।

গীতহার। অর্থাৎ নানাবিষয়ক শুদ্ধ সংগীত। শ্রীগঙ্গাধর চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। কলিকাতা বেঙ্গল সুপিরিয়র যন্ত্র। ১৮৭৪।

বাঙ্গালা ভাষায় বিশুদ্ধ ও রুচিকর গানের অভাব; কেননা অধিকাংশই বাঙ্গালা গীত আদিরস ঘটিত; এই অভাব দূরীকরণার্থ গঙ্গাধর বাবু কতকগুলি গীত রচনা করিয়া প্রচারিত করিয়াছেন। উদ্দেশ্যটি প্রশংসনীয়, কিন্তু গঙ্গাধর বাবু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। গীতগুলিতে কবিত্ব না থাকিলে তাহা সাধারণে চলিত হইবে না। এ গীতগুলি বিশুদ্ধ বটে, কিন্তু কবিত্বশূন্য। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের বিজ্ঞানসভা, অথবা সর্ জর্জ ক্যাম্বেল সাহেবের আক্রমণ হইতে উচ্চ শিক্ষা রক্ষা করিবার উপায় সম্বন্ধে গীত কিরূপ মুগ্ধকর হইবার সম্ভাবনা, তাহা পাঠক একপ্রকার অনুমান করিতে পারেন। প্রতিভাশালী ব্যক্তি সকলেই পারেন—কিন্তু গঙ্গাধর বাবু সে দরের কবি নহেন। উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধীয় গীত হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি—

দেশের হিতসাধনে হও আগুয়ান,
ধনবান বিদ্বান বল বুদ্ধিমান——(সবে)
কর এমন উপায়, যাহাতে উচ্চ শিক্ষায়,
সুলভে বঙ্গবাসীরে লভিতে পারে ॥

সভ্য ইউরোপে আর আমেরিকায়,
দলে বলে সত্বরে চল হে তথায়——
বিবিধ শিল্প সন্ধান, যন্ত্র কলাদি নির্ম্মাণ,
শিখে আসি কর দূর, নিজ অভাবেরে ॥

(ডাক্তার)

সরকারের প্রস্তাবিত বিজ্ঞান সভায়,
সাহায্য প্রদান সবে করহে ত্বরায়——
ধনী মানী জ্ঞানী ধীর, স্বাধীন সাহসী বীর,
অচিরে হইবে সবে বিজ্ঞানেরি জোরে ॥

পদ্যমুকুল । প্রথমভাগ । শ্রীরামলাল চক্রবর্ত্তি বিরচিত । কলিকাতা গুপ্ত প্রেস ।

এই গ্রন্থখানি বালিকাদিগের পাঠার্থ প্রণীত । কোন বালিকায় পড়ে পড়ুক । গ্রন্থের বিশেষ কোন গুণ নাই ।

নব মালিকা । বিবিধ বিষয়িণী পদ্যমালা । শ্রীদুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক (প্রণীত ?) । কলিকাতা ।

এরূপ কবিতা সম্বন্ধে অধিক কিছু বলিবার নাই । স্থানে স্থানে সুকবিত্ব আছে । উদাহরণে পাঠক বুঝিবেন । এ অংশ কিছু ভাল বলিয়াই, আমরা এত ছত্র উদ্ধৃত করিয়াছি—

ওই দেখ ; দেখ, দেখ, জন্মিল কুমার ;
আনন্দে পূরিল পুর ! জুড়ালো সংসার !
উঠিল উৎসবধ্বনি, বাদ্য-গণ্ডগোল !
মঙ্গল-শংখের শব্দে বাড়িল কল্লোল !

স্নেহ-নীরে ঢল ঢল জনক-নয়ন !
সহ উপজিল আশা, সংসার-বন্ধন !
অমৃত-লহরীসম শিশুর ক্রন্দন ।
শ্রবণে প্রবেশি মূর্চ্ছা করে রে হরণ !

ভুলিল প্রসবব্যথা ! উপজিল বল !
সিক্ত হলো রক্ত আঁখি পেয়ে হর্ষজল !
উৎসুক হইয়া মাতা ভাবে মনে মন,
কতক্ষণে স্তন দিয়া জুড়াই জীবন !

আগন্তুক, প্রতিবাসী, আত্মীয়, স্বজন,
সকলে প্রফুল্ল ! হেরি জুড়ায় জীবন ;
ইন্দ্রিয় সন্তুষ্ট হয় ; হৃদয় মোহিত,
আনন্দে ডুবিয়া রই ; শরীর হর্ষিত ।

কিসলয়সম শিশু বাড়ে দিন দিন !
জনক-জননী আশা ক্রমশঃ প্রবীণ !
হাত পা নাড়িয়া জাদু খেলে নিজ মনে !
বিস্তারে বংশের গর্ব্ব অঙ্গের ক্ষেপণে !

কাঁচা মুখে কাঁচা হাসি কাড়ি লয় মন !
জলদ-অন্তরে শোভে [illegible] বরণ !
আধা ঠোঁটে ভাঙ্গা কথা কত সুধা ধরে !
বুঝি না কি বলে বীণা, তবু প্রাণ হরে !

জুড়িয়া মায়ের কোলে বেঁচে থাক, ধন !
জনক জননী আশা করো রে পূরণ ।
ও কি হলো ! কেন, কেন, কর দরশন !
"কি হলো, কি হলো হায় !" উঠিল ক্রন্দন !

হায় রে নিঠুর কাল ! এ কি ব্যবহার !
অভাগীর আশা-বৃক্ষ করিলি সংহার !
হরেছ প্রাণের পতি, ভেঙ্গেছ তরণী ;
ফলক ধরিয়া তবু ভেসেছিল ধনী ।

সেটুকু লইলি কাড়ি, পাষাণ-সমান!
ডুবিল; ডুবিল ওই; হারালো পরাণ!
আহা; তার আর্তনাদে পূরিল হৃদয়!
অপার সংসার-জল! নারী বৈ ত নয়!

একি রে তামাসা তোর! একি খেলা খেল!
দেখ আঁখি মেলি কাল! ভয়ে মারা গেল!
কেন দিলি দেখাইলি, সুখের পুতলি?
কেন বা লইলি তার চক্ষে দিয়া ধূলি?

হাহাকার রবে বামা ধরণী লুটায়!
আক্ষেপ-কুঠার ধরি বুক ফাটি যায়!
এটি তারি; ওটি তার; এখানে বসিত।
হেথায় খেলিত; স্থান এটি গো বাসিত।

এতক্ষণে ঘরে আসি বসিত দুয়ারে;
সুধারবে মা! মা! বলে ডাকিত আমারে।
মুছায়ে গায়ের ধূলি, করিয়া চুম্বন,
কালি যে দিয়াছি তারে স্তন্য এতক্ষণ!

সেই ত রয়েছে সব বসন ভূষণ;
কেন নাহি হেরি মোর জীবনের ধন!
বাছার সামগ্রী তোরা বুক্‌জুড়ান ধন;
আজি কেন মনস্তাপ কর উৎপাদন।

সেই ত উঠিল রবি; আলো ত্রিসংসার;
মোর শয্যা ঘেরি কেন হলো অন্ধকার;
উঠ রে সোণার যাদু! হলো কত বেলা
এসেছে ওদের ছেলে; যাও কর খেলা।

সেই ত এসেছে সন্ধ্যা, অন্ধকার তায়;
মা বলি ডাকিয়া কেন ঝুলনা গলায়?
কি দোষ হয়েছে যাদু? কি কষ্ট পেয়েছ?
কেন রে এখনো মোরে ভুলিয়া রয়েছ?

এস না আমার বাছা; আমায় বল না;
ধনপ্রাণ দিয়া তোর পুরাই বাসনা।
সত্য কি ত্যজিলি মোরে? ওরে দাগাদার!
বলিয়া ডুকরে উঠে? করে হাহাকার!

মনে হলো গর্ভাবস্থা, প্রসব-যাতনা!
সত্য হতে কল্পনায় দ্বিগুণ তাড়না!
অজ্ঞান-তন্দ্রায় রহে অভিভূত-প্রায়;
শব্দমাত্রে "বাছা এলি" বলি উঠি চায়!

মোহবশে হেরিবারে তুলিয়া নয়ন,
চারিদিক্ শূন্য হেরি নামায় বদন!
জলে, স্থলে, শূন্যে, প্রাণী, অপ্রাণী, স্থাবরে
যেদিকে ফিরায় চক্ষু, ভাসে আঁখি-নীরে!

শয়নে, ভ্রমণে, নিদ্রা-আহার-ব্যবহারে,
আলাপে, আমোদ আর মন নাহি সরে!
ফুরালো সংসারসুখ! মিছে আর বাস
সংসারে! হয়েছে তার জীবিত বিনাশ!

সহজে অশক্ত নারী; তাহে শোক-ক্ষীণ;
কাঁদিয়া কাঁদিয়া পুন হলো আঁখি হীন;
সাহস হারালো; বুক ভাঙ্গিল এখন;
সংসারগহনে কিসে করে বিচরণ!

চারিদিক্ অন্ধকার; না চলে চরণ।
অণুমাত্র রশ্মি ছিল করিলি হরণ!
বৈশাখে পতাকা যেন কম্পিত-শরীর!
নিরন্তর হাহাকার! সতত অধীর!

আর না দেখিতে পারি; বাহিরায় প্রাণ,
কে পারে বারিতে কাল! তুমি বলবান্?

বিলাপতরঙ্গ। অর্থাৎ মাতৃবিয়োগবিধুর কতিপয় সন্তানের আক্ষেপ। শ্রীমহিমাচন্দ্র বসু প্রকাশিত। ঢাকা সুলভ যন্ত্র।

এরূপ বিষয় লইয়া যিনি অপকৃষ্ট কবিতা লিখিতে পারেন, তিনি অসাধারণ মনুষ্য সন্দেহ নাই। এই কাব্যের লেখক বা লেখকেরা অসাধারণ মনুষ্য নহেন, একারণ ইহাতে নিতান্ত অপকৃষ্ট কিছু নাই। বিশেষ ভালও কিছু নাই। গ্রন্থখানি অতি ক্ষুদ্র। ইহার অধিকাংশই চতুর্দ্দশপদী কবিতা।

শ্রীমন্মহীধরকৃত বেদদীপনামা সংহিতা উদাত্তাদি স্বরচিহ্নসমন্বিতা শ্রীশুক্লযজুর্ব্বেদঃ বাজসনেয়ি সংহিতা মাধ্যন্দিনী শাখা। কাব্যধীতবেদাদি শ্রীসত্যব্রত সামশ্রমিণা সংটিপ্য সংশোধ্য চ প্রকাশ্যতে। কলিকাতা, সত্যযন্ত্র।

আমরা দেখিলাম, মূল ও ভাষ্য ব্যতীত একটি বাঙ্গালা অনুবাদও ইহার সঙ্গে আছে। এবং তৎপূর্ব্বে একটি উৎকৃষ্ট ভূমিকা লিখিত হইয়াছে। সামশ্রমি মহাশয় বিখ্যাত পণ্ডিত। অতএব যজুর্ব্বেদ প্রকাশের তিনি উপযুক্ত। তাঁহার লিখিত বেদের পরিচয় হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি। পাঠক দেখিবেন, বেদ-ব্যাখ্যাকারী সাহেবদিগের পাণ্ডিত্যের সঙ্গে ইহার কত প্রভেদ।

"বেদ—ঋক্, যজু, সাম ও অথর্ব্ব এই চারি অংশে বিভক্ত। পদ্যময় রচনাবলি সংগৃহীত হইয়া ঋক্ নামে, গদ্যময় রচনাবলি সংগৃহীত হইয়া যজু নামে, গীতিময় রচনাবলি সংগৃহীত হইয়া সাম নামে প্রসিদ্ধ হয়; এইরূপ রচনানুসারে বেদ-বিভাগ হইবার পূর্ব্বে ঐ সমস্তই ত্রিবিধ রচনা-বিমিশ্র থাকায় ত্রয়ী নামে ব্যবহৃত হইত। সেই অবস্থাতেই ঐ ত্রয়ী বেদ হইতে অঙ্গিরোবংশাবতংস মহর্ষি অথর্ব্বা ঐহিক প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ শত্রুমারণাদির উপযোগী যজ্ঞাদির প্রকরণগুলি স্বতন্ত্র করিয়া তাহাই অধ্যাপন, যজনাদি দ্বারা সুপ্রচলিত করত স্বীয় নামে প্রথিত করেন। সুতরাং ত্রয়ী বেদের একটি ক্ষুদ্র অংশ অথর্ব্ব নামে অদ্যাপি পরিচিত রহিয়াছে, অপর বৃহৎ অংশটি মহর্ষি বেদব্যাস কর্ত্তৃক রচনানুসারে ভাগত্রয়ে বিভাগীকৃত হইয়া অবধি বেদ চতুরংশ ইহা সার্ব্বজনীন হইয়াছে।

এই স্থলে ইহাও বিশেষ জ্ঞাতব্য যে, ঐ ত্রয়ীর আদিবিভক্ত অংশদ্বয়ের কার্য্যতঃ দুইটি সম্প্রদায় দাঁড়াইয়াছে, যখন ঐ অথর্ব্ব নামক ক্ষুদ্রাংশের অনুসারে কোন যজ্ঞাদি অনুষ্ঠিত হয় তাহাতে এই ত্রিভাগীকৃত বৃহৎ অংশের কোনরূপ অপেক্ষা থাকে না—এইরূপ যখন এই বৃহদংশীয় কোন যাগাদির অনুষ্ঠান করিতে হয় তখন ঐ ক্ষুদ্রাংশ অথর্ব্বের কোন আবশ্যকই থাকে না। পরং বৃহদংশের তিন অংশই পরস্পর-সাপেক্ষ, বৃহদংশের অনুসারে কোন একটি যজ্ঞ আরব্ধ করিলে তাহাতে ঋগ্বেদের, যজুর্ব্বেদের ও সামবেদের এই বেদাংশত্রয়েরই আবশ্যক হয় অর্থাৎ যেমন

কেবল অথর্ব্ব বেদ লইয়া অথর্ব্ববেদীয় যাগানুষ্ঠান হইতে পারে, তদ্রূপ কেবল ঋগ্বেদ মাত্রে বা কেবল যজুঃ অথবা সামবেদমাত্রে কোন যাগই সম্পন্ন হইতে পারে না, উহারা সম্পূর্ণই পরস্পরাপেক্ষ—একটি অশ্বমেধ ক্রতু আরম্ভ করিলে উহাতে গদ্য, পদ্য, গীতি ত্রিবিধ মন্ত্রেরই অপেক্ষা হইয়া থাকে। পরং ঐ তিন প্রকারের সমস্ত মন্ত্র ত্রিভাগীকৃত বৃহদংশের একত্র দুর্লভ। সুতরাং ঐ ভাগত্রয়েরই উপযোগিতা উপস্থিত হয়। পক্ষান্তরে ঐ যজ্ঞের উপযোগী কোন মন্ত্রই অথর্ব্ব নামক ক্ষুদ্রাংশে না থাকায় তাহার কিছুমাত্র অপেক্ষা করিতে হয় না—এইরূপ অথর্ব্ববেদীয় শ্যেনাদি যাগের অনুষ্ঠানে প্রয়োজনীয় গদ্য, পদ্য, গীতিময় মন্ত্রগুলি একত্র অথর্ব্ব বেদেই সংগৃহীত থাকা প্রযুক্ত ঐ অনুষ্ঠানে ঐ ত্রিভাগীকৃত বৃহদংশের কিছুমাত্র অপেক্ষা থাকে না—অথর্ব্ব বেদের সহিত এই বেদত্রয়ের সর্ব্বথা অসম্বন্ধ ভাবের ইহাই একমাত্রনিদান।"

এই গ্রন্থ হিন্দুমাত্রেরই গৃহে থাকা কর্ত্তব্য। দ্বাদশ খণ্ডের অগ্রিম মূল্য দশ টাকা।

তৃতীয় বর্ষ : অষ্টম সংখ্যা

ভারতবর্ষীয় আর্য্যজাতির আদিম অবস্থা

ব্যবসায় বিভাগ

অনেকের মুখেই শুনা যায় যে ব্রাহ্মণগণ নিতান্ত স্বার্থপর ছিলেন, নিজের স্বত্ব বিলক্ষণ বুঝিতেন, অন্যজাতির প্রতি সমদুঃখ-সুখী ছিলেন না। প্রিয়দর্শন পাঠক, তুমি কি বিবেচনা কর ইহারা নিস্পৃহ ছিলেন না, ইহাদিগের সহানুভূতি ছিলনা ? আমি বিবেচনা করি আর্য্যজাতির ব্যবসায় শ্রেণীগত বৃত্তিবিভাগ ও বৈবাহিক প্রথার ইতরবিশেষ দেখিয়াই তোমার সে ভ্রম জন্মিয়াছে। তুমি মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রেণীগত বৃত্তিবিভাগ ও বৈবাহিক প্রথা আমূল পর্য্যালোচনা কর, তোমার সে ভ্রম অনেকাংশে দূর হইবার সম্ভাবনা। সংপ্রতি তোমার ভ্রমপ্রমাদ নিরাস জন্যই আর্য্যজাতির শ্রেণীগত বৃত্তি (ব্যবসায় বিভাগ) ও বিবাহ লিখিত হইল।

ব্রাহ্মণেরা ষট্‌কর্ম্মশালী ছিলেন। এই ছয়টীর নাম যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান ও প্রতিগ্রহ। এই ছয়টী বৃত্তির আশ্রয়গ্রহণ পূর্ব্বক বিপ্রগণ জীবিকা নির্ব্বাহে সমর্থ। অনাপত্‌ কালে এতদ্ব্যতীত বৃত্তিদ্বারা সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিলে দ্বিজবরেরা পতিত হইতেন। তাঁহাদিগের ব্রাহ্মণ্য লোপ পাইত। তাঁহারা তৎক্ষণাৎ শূদ্রমধ্যে পরিগণিত হইতেন। দেখ দেখি ইহারা কি নিতান্ত স্বার্থপর ছিলেন ? আপত্‌কাল ব্যতিরিক্তস্থলে ইহারা ক্ষত্রিয় বৃত্তিও অবলম্বনে সমর্থ ছিলেন না। মনু (৮৯ শ্লো অ ৩য়)

ক্ষত্রিয়গণ প্রজাপ্রতিপালন, দান, যজ্ঞ, ও অধ্যয়ন এই চারিটী বৃত্তির অনুসরণ পুরঃসর আত্মজীবিকা-নির্ব্বাহে অধিকারী। ব্রাহ্মণগণ অবিরত বিষয়বাসনায় প্রতিষিদ্ধ হইলেন। রাজন্যগণ স্পৃহাপরিশূন্য হইয়া নিরন্তর বিষয়বাসনাতে কালাতিপাত করিলেও শাস্ত্রানুসারে পতিত বা অশ্রদ্ধেয় হইবেন না, শাস্ত্রের আদেশ অনুসারে তাঁহারা এককালে যাবদীয় সাংসারিক সুখভোগের অধিকারী থাকিলেন। ব্রাহ্মণগণ যদি নিতান্ত স্বার্থপর হইতেন, তাহা হইলে কি ইহারা এ

অধিকারটী আপনাদিগের আয়ত্ত ও নিজস্ব করিতে পারিতেন না? মনু (শ্লো ৯০ অ ৩য়)

বৈশ্যজাতির প্রতি পশুরক্ষার ভার, দান, কৃষি, যজ্ঞ, অধ্যয়ন, বাণিজ্য ও কুসীদবৃত্তিদ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহের আদেশ হইল। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ পশুরক্ষা, বাণিজ্য অথবা কুসীদ্ ব্যবসায়দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ করিলে হেয় এবং সমাজ-বহিস্কৃত হইতেন। বাণিজ্য লাভকর কার্য্য, স্বার্থপর ব্যক্তিরা কি লাভের বস্তুটীকে স্বকীয় বৃত্তিমধ্যে রাখিতে যোগ্য হইতেন না? অন্যের বৃত্তি বলিয়া স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন কেন? মনু (শ্লো ৯১ অ ৩য়)

শূদ্রগণ অসূয়াপরিশূন্য হইয়া দ্বিজাতিদিগের সেবাশুশ্রূষাদ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ করিবেন ইহাই তাঁহাদিগের বৃত্তি। মনু (শ্লো ৯২ অ ৩য়)

ভবিষ্য পুরাণে অতি স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দিষ্ট আছে যে অষ্টাদশ পুরাণ রামায়ণ ও মহাভারতাদি ধর্মশাস্ত্রে শূদ্রগণের বিশেষ অধিকার থাকিল। অগ্রে বিদ্যা না হইলে পুরাণাদি পাঠ ও বিচারে কি প্রকারে ক্ষমতা জন্মিতে পারে? ব্রাহ্মণগণ অনেক সময়ে শূদ্রের প্রতি বাৎসল্য দেখাইয়াছেন; তৎসমস্ত শূদ্রকৃত্য বিচারস্থলে নির্দ্দেশ করা যাইবে। অদ্য শূদ্রের পুরাণাদি শাস্ত্রে অধিকার দেখান গেল। শূদ্রেরা কৃষি, বাণিজ্য ও পশুপালনেও প্রতিষিদ্ধ নন। (১)

দ্বিজগণের বৈদিক ক্রিয়াকলাপে অধিকার থাকায় তাঁহারা অনায়াসে ব্রহ্ম নির্ণয়ে অধিকারী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইলেন। অধ্যাপনার ভার কেবল ব্রাহ্মণের প্রতিই বর্ত্তিল। এখানে দেখা যাইতেছে যে, যে ব্যক্তি আত্মনিগ্রহ ও তপস্যাদি দ্বারা ব্রহ্মনির্ণয়ে সমর্থ হইয়াছেন কালক্রমে তিনিও ব্রাহ্মণশ্রেণীতে উন্নীত হইয়াছেন। তাহার প্রমাণ সর্ব্বত্র দেদীপ্যমান রহিয়াছে। বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয়কুল হইতে, প্রসকণ্ব বৈশ্য বংশ হইতে, শূদ্রক শূদ্রজাতি হইতে এবং যবন ঋষি ম্লেচ্ছ গোষ্ঠী হইতে প্রথমে ঋষি সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন, তৎপরে ব্রাহ্মণ্য অধিকার করিয়া বিপ্রগণ মধ্যে পরিগণিত হন।

---

(১) চতুর্ণামপি বর্ণানাং যানি প্রোক্তানি শ্রেয়সা।
ধর্মশাস্ত্রাণি রাজেন্দ্র শৃণু তানি নৃপোত্তম॥
বিশেষতস্ত শূদ্রাণাং পাবনানি মনীষিভিঃ।
অষ্টাদশ পুরাণানি চরিতং রাঘবস্যচ॥
রামস্য কুরুশার্দ্দূল ধর্মকামার্থ সিদ্ধয়ে।
তথোক্তং ভারতং বীর পারাশর্য্যেন ধীমতা।
বেদার্থং সকলং যানি ধর্মশাস্ত্রাণিচ প্রভো।
ভবিষ্যপুরাণীয় বচন (শূদ্রকৃত্য বিচারণাতত্ত্ব)

প্রিয়দর্শন পাঠক ও লীলাবতি, সদাচার সৎক্রিয়ান্বিত, আত্মমনঃসংযমী ও জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিদিগের মধ্যে বড় ইতরবিশেষ দেখিতে পাইবে না। (২)

দ্বিজাতিত্ব।

আর্য্যসন্তানগণ জন্মমাত্রেই দ্বিজাতিত্ব প্রাপ্ত হন না। প্রসূতির গর্ভে জন্মযোগ্য কালে তাঁহাদিগের গর্ভাধান ক্রিয়া শাস্ত্রানুসারে সম্পাদিত হয়। শিশু ভূমিষ্ঠ হইলে জাতকরণ হইয়া থাকে। অন্নপ্রাশন ক্রিয়ার সঙ্গে অথবা কুলাচার অনুযায়ী অন্নপ্রাশনের পূর্ব্বেই ধর্ম্মশাস্ত্রের মতে নামকরণ সমাধা হয়। তৎপরে চূড়াকরণ। এটি স্থলবিশেষে উপনয়নের পূর্ব্বে স্থলবিশেষে সমকালেও সম্পন্ন হইয়া থাকে। কেবল উপনয়ন সংস্কার দ্বারা দ্বিজপদ প্রাপ্ত হন না। উপনয়নের পূর্ব্বে গর্ভাধানাদি পঞ্চ মহা সংস্কার যথাবিধানে ও যথাকালে সমাহিত না হইলে দ্বিজাতি পদের অযোগ্য হন। উপনীত হইলেই ইঁহাদিগকে ঋষিযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, ব্রত, হোম, উপবাস এবং অন্যান্য মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান দ্বারা পাঞ্চভৌতিক দেহকে ব্রহ্মপ্রাপ্তিযোগ্য করিতে পারিলেই ব্রাহ্মণ শব্দের যোগ্য হন। ব্রাহ্মণের বংশে জন্মিলেই ব্রাহ্মণ হয় না। মনু (শ্লো ২৭।২৮ অধ্যায় ২)

উপনীত হইলেই ইঁহাদিগের দ্বিভোজন রহিত হয়। যাবৎকাল ব্রহ্মচর্য্যে থাকেন তাবৎকাল ইঁহাদিগকে একাহারে থাকিতে হয়। সমাবর্ত্তনবিধি সমাপ্তির পর রাত্রিকালে আহার করিতে নিষিদ্ধ নন বটে, কিন্তু কোন ব্রত নিয়মের অধীন হইয়া ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠানে রত হইতে হইলে ইঁহাদিগকে পূর্ব্বদিন হবিষ্যান্ন ভোজন করিতে হয় ও একাহারী থাকা বিধি। ক্রিয়াসমাপ্তির প্রাক্কালে আর জলগ্রহণেও অধিকারী নন। শূদ্রাদি এরূপ কঠোর ব্রতে কয় দিন সুস্থ মনে দিনযাপন করিতে সমর্থ হন! নিস্পৃহতা কাহার নাম জান? বিষয়াভিলাষ পরিত্যাগের নাম নিস্পৃহতা।

কেহ কেহ বলেন কেবল শূদ্রজাতির প্রতিই ব্রাহ্মণগণের দৌরাত্ম্য ছিল। লেখক সে কথা কহে না। লেখক বলে, কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, কি শূদ্র এবং স্ত্রীজাতি ইঁহাদিগের মধ্যে যিনিই ব্রহ্মনির্ণয়ে অক্ষম বলিয়া অনুমিত হইয়াছেন, তাঁহাকেই ধর্ম্মশাস্ত্রে অনধিকারী স্থির করিয়াছেন। জড়, মূক, বধির, স্ত্রী ও শূদ্র ইঁহাদিগকে বেদে অনধিকারী করিবার তাৎপর্য্য কি বিচার করিয়া দেখ, ঋষিগণকে স্বার্থপর বলিয়া বোধ হইবে না। মনু (শ্লোক ৫২ অ ২)

---

(২) শূদ্রোঽপি শীলসম্পন্নো গুণবান্ ব্রাহ্মণোভবেৎ।
ব্রাহ্মণোঽপি ক্রিয়াহীনঃ শূদ্রাৎপ্রত্যবরোভবেৎ।

পরাশর বচন।

ভোজ্য দ্রব্য।

শূদ্রাদি জাতিরা যত্র তত্র বাস করিতে পারে। তাহারা অপেয় পান, অখাদ্য ভোজন করিলেও এককালে শূদ্রত্ব পরিভ্রষ্ট হয় না। কিন্তু ব্রাহ্মণেরা অপেয় পান ও অভোজ্য ভোজন করিলেই পতিত ও ব্রাহ্মণ্য হইতে রহিত হন। ইঁহাদিগের পরিশুদ্ধ ভোজ্য দ্রব্য মধ্যে অতি অল্প সামগ্রী দেখা যায়। যথা—

প্রথম কল্প—যব, তিল, তণ্ডুল, মধু, ঘৃত, দুগ্ধ, হরিদ্রা, দধি।

দ্বিতীয় কল্প বা অপকর্ষ—গুড়, দাড়িম, বিল্বফল, আম্র, পনস, কদলী।

আর্য্যজাতির ধর্ম্মকর্ম্ম যিনি দেখিয়াছেন তিনি এতদ্ব্যতীত অন্য কোন দ্রব্য শ্রাদ্ধপাত্রে অথবা পূজার দ্রব্য মধ্যে অনুসন্ধান করিয়া পাইবেন না।

যাঁহারা আমিষভোজনের যোগ্য অর্থাৎ পিতৃযজ্ঞের বা দেবযজ্ঞের নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ, তাঁহাদিগকে মৎস্য মাংস ভোজন করান যাইতে পারে। শশক, শল্লকী, গোধা, কূর্ম্ম, গণ্ডার, ছাগ, মেষ ও হরিণ। অধুনা সভ্যলোকদিগের মধ্যে গোধিকা ভোজন দেখা যায় না। ইতর লোকের মধ্যে গোধিকা ভক্ষণ পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল। কবিকঙ্কণের ফুল্লরা ও কালকেতুর মাংস বিক্রয় দেখ।

মৎস্যের মধ্যে পাঠীন, রোহিত, মদ্গুরাদি কয়েকটি পবিত্র। অন্যগুলির মধ্যে একবিধ দুইটার এক এক জাতি পরিত্যাজ্য বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়া আছে। খাদ্য বিচারে সমুদায় বিবৃত হইবে।

দুগ্ধ নানাপ্রকার, তন্মধ্যে ছাগ, মেষ, মহিষ ও গোদুগ্ধ দুগ্ধমধ্যে গণ্য। গাভী-দুগ্ধই পবিত্র। অন্যগুলি তত পবিত্র নহে।

মর্য্যাদা।

আর্য্যেরা শূদ্রদিগকেও কার্য্যবিশেষে ও সময় অনুসারে মর্য্যাদার সহিত স্থান দান করিতেন। শূদ্রব্যক্তি অত্যন্ত বৃদ্ধ হইলেই বৃদ্ধ বলিয়া সভায় সম্মান পাইত। ইঁহাদিগের বিধান সংহিতায় অস্ত্রধারী ব্যক্তি, দশমীদশাগ্রস্তজন, রুগ্নশরীরী ভারবাহী শ্রান্তজন, স্ত্রীজাতি, স্নাতকব্রাহ্মণ, রাজা এবং বিবাহসময়ে বর সম্মানের যোগ্য। এসকল ব্যক্তি কালবিশেষে স্থলবিশেষে অগ্রগামী অথবা উচ্চ আসনে উপবিষ্ট হইলে দোষী হন না বরং অনেক সময়ে সম্মান প্রাপ্তি বিষয়ে ইঁহাদিগকে অগ্রসর করিতে হয় এবং ইঁহাদিগের জন্য পথ পরিত্যাগ করিতে হয়।

এবং যে স্থলে ইঁহাদিগের সকলের সমাবেশ হয় তথায় স্নাতক দ্বিজবর ও রাজা সর্ব্বাগ্রে মান্য। রাজা ও স্নাতকের মধ্যে স্নাতক নৃপকেই অগ্রসর করা বিধেয়। কিন্তু অস্নাতক রাজা ও স্নাতক ব্রাহ্মণের মধ্যে স্নাতক অগ্রগণ্য। (৩)

---

(৩) পঞ্চানাং ত্রিষু বর্ণেষু ভূয়াংসি গুণবন্তি চ।
যত্র স্যুঃ সোঽত্র মানার্হঃ শূদ্রোঽপি দশমীংগতঃ॥ ১৩৭

জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ।

পাঠক, তুমি কহিতে পার, যে ব্যক্তির বয়ঃক্রম অধিক সেই ব্যক্তিই মান্য। আর্য্যজাতিরা মান্যগণ্য ব্যক্তিবর্গকে সে প্রকারে গণনা করিতেন না। ইঁহারা সমবেত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের মধ্যে নিম্নলিখিত প্রকারে জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ সংজ্ঞা দিতেন। ব্রাহ্মণগণ বয়ঃক্রমে কনিষ্ঠ হইলেও যদি তিনি জ্ঞানাপন্ন হইতেন, তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা তথাকার শ্রেষ্ঠ। ক্ষত্রিয়গণ শৌর্য্য ও বীর্য্যে পরাক্রান্ত হইলেই জ্যেষ্ঠ। বৈশ্যগণ ঐশ্বর্য্যশালী হইলেই জ্যেষ্ঠ। শূদ্রব্যক্তি জন্ম অনুসারে বৃদ্ধ হইলেই জ্যেষ্ঠ। কেবল বয়োজ্যেষ্ঠতা নিবন্ধন সভামধ্যে জ্যেষ্ঠ কিন্তু সমাজমধ্যে জাতি অনুসারে জ্যেষ্ঠত্ব হয় না। জ্যেষ্ঠতা ও শ্রেষ্ঠতা অনেক পৃথক্ জানিতে হইবে। কেবল বয়ঃক্রম অথবা পক্ক কেশ ও শরীরের ললিত ও পলিতাদি দ্বারা মান্য হয় না—জ্ঞান ধনের দ্বারা যিনি মান্য তিনিই জ্যেষ্ঠ। বৃদ্ধের লক্ষণ তোমরা যাহা মনে কর তাহা নহে! (৪)

বিবাহ।

দ্বিজাতিরা বেদপাঠ সমাপ্তির পর গুরু অনুজ্ঞাক্রমে দারপরিগ্রহ পুরঃসর গৃহস্থাশ্রমে বাস করিতেন। নিতান্ত স্থূলবুদ্ধি হইলেও ষট্‌ত্রিংশৎ বর্ষের অধিক কাল গুরুকুলে থাকিয়া বেদাধ্যয়ন করিতে হইত না। মধ্যবিধ রূপ বুদ্ধিমান্ হইলে অষ্টাদশ বর্ষ তদপেক্ষা বুদ্ধিমত্তর হইলে নববর্ষ পর্য্যন্ত থাকিতে হইত। কুশাগ্রবুদ্ধি হইলে বেদের মর্ম্মগ্রহমাত্রেই তিনি গুরুগৃহ হইতে নিষ্কৃতি পাইতেন। তিনি তৎকালেই গুরুর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ ও সংসার আশ্রমের দ্বারস্বরূপ ভার্য্যাগ্রহণের অধিকারী হইতেন। মনু (শ্লো ১১২ অ ৩)

প্রিয়দর্শন পাঠক, তুমি কহিবে, বড় কঠোর নিয়ম ছিল, কালের গতি অনুসারে সংসারের স্রোত ফিরিয়াছে। ব্রাহ্মণের যেদিন উপনয়ন হয়, সেইদিন

চক্রিণো দশমীস্থস্য রোগিণো ভারিণঃ স্ত্রিয়াঃ।
স্নাতকস্য চ রাজ্ঞশ্চ পন্থা দেয়ো বরস্য চ॥ ১৩৮
তেষান্তু সমবেতানাং মান্যৌ স্নাতক পার্থিবৌ।
রাজস্নাতকয়োশ্চৈব স্নাতকো নৃপমানভাক্॥ ১৩৯ (মনু ২য় অ)

(৪) বিপ্রাণাং জ্ঞানতো জ্যৈষ্ঠ্যং ক্ষত্রিয়াণান্তু বীর্য্যতঃ।
বৈশ্যানাং ধান্যধনতঃ শূদ্রাণামেব জন্মতঃ॥ ১৫৫
ন হায়নৈর্ন পলিতৈর্ন বিত্তেন ন বন্ধুভিঃ।
ঋষয়শ্চক্রিরে ধর্ম্মং যোঽনূচানঃ স নো মহান্॥ ১৫৪
ন তেন বৃদ্ধো ভবতি যেনাস্য পলিতং শিরঃ।
যো বৈ যুবাপ্যধীয়ানস্তং দেবাঃ স্থবিরং বিদুঃ॥ ১৫৬ (মনু ২য় অ)

হইতে তিনি সাবিত্রী গ্রহণে অধিকারী ছিলেন। কিন্তু অধুনা অনেক স্থলে দেখিবে ঐ দিনেই সমুদায় ব্রহ্মচর্য্য আশুন্ত সমাপ্ত হয়। কোথাও বা ত্রিরাত্রি মাত্র ব্রহ্মচর্য্য কোথাও বা একাদশাহ কাল ব্যাপিয়া ব্রহ্মচর্য্য। তৎকাল মধ্যে যতদূর সম্ভবপর ততদূরই বৈদিক ব্রহ্মচর্য্যের সীমা। ঐ দিবসেই সমাবর্ত্তন বিধি সমাহিত হয়। সমাবর্ত্তনের পরেই বিবাহের যোগ্য, সুতরাং এক্ষণে বিপ্রগণ সাতবৎসর পরেই দারপরিগ্রহ করিবার ক্ষমতাপত্র পান। পূর্ব্বকাল ও বর্ত্তমান কালের কি ইতরবিশেষ তাহা দেখ।

সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগে দ্বিজগণ অসবর্ণা কন্যা গ্রহণে অধিকারী ছিলেন। তথাপি দ্বিজগণ সর্ব্বাগ্রে স্বজাতীয়া ও সুলক্ষণাক্রান্তা কন্যার পাণিগ্রহণেই অধিকারী। মনু (শ্লো ৪ অ ৩)

মাতামহ কুলে কুলগন্ধে যাহার সহিত সপ্তমপুরুষ অতিক্রান্ত হইয়াছে যে স্থলে কন্যা ও পাত্রের সঙ্গে উভয় কুলের গোত্রের বা প্রবরের ঐক্য না থাকে। পিতৃবন্ধু, মাতৃবন্ধুদিগের সঙ্গে রক্ত সংস্রবে পঞ্চমপুরুষের সীমা অতিক্রান্ত হইলে, সেইস্থলের সুলক্ষণাক্রান্তা কন্যা পাণিগ্রহণ কার্য্যে প্রশস্ত। মনু (শ্লো ৫ অ ৩)।

শাসনপ্রণালী।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

সাক্ষিবিষয়—মিথ্যা সাক্ষী ও দণ্ড। আর্য্যজাতিরা কোন্ কোন্ স্থলে কোন্ কোন্ সাক্ষীকে স্বভাবতঃ বিধান সংহিতার নিয়মানুসারে মিথ্যা জ্ঞান করেন তাহা প্রদর্শন করা গেল। যথা—

লোভহেতু যেব্যক্তি সাক্ষ্য দেয়, যে ব্যক্তি বন্ধুতার অনুরোধে সাক্ষ্য দিতে বাধ্য হয়। সাক্ষী দিয়া আমি যদি অমুকের এই এই কার্য্যটী সিদ্ধ করিয়া দিতে পারি, তাহা হইলে আমার কাম চরিতার্থ হইতে পারে—পূর্ব্বে কোন ব্যক্তি কোন ব্যক্তির নিকট কৃতাপরাধ আছে, এখন সময় পাইয়া পূর্ব্বকৃত অপরাধের প্রতিশোধ-মানসে ক্রোধ হেতু যথায় সাক্ষ্য দেয়, অজ্ঞানবশতঃ যথায় সাক্ষ্য দিতে প্রবৃত্ত হয় এবং যেস্থলে বালকত্ব নিবন্ধন চাপল্য হেতু সাক্ষ্য দেয় তৎ সমস্ত মিথ্যাজ্ঞান করা বিধেয়। (৫)

দণ্ডের পরিমাণ।

অর্থপ্রাপ্তির লালসা স্থলে ন্যূনকল্পে সহস্রতোলক পরিমিত রৌপ্যের দণ্ড হইত। মোহ হেতু প্রথম সাহস পরিমিত দণ্ড, ভয় হেতু মধ্যম সাহস, বন্ধুতা

---

(৫) লোভান্মোহাদ্ভয়ান্মৈত্রাৎ কামাৎ ক্রোধাত্তথৈবচ।
অজ্ঞানাৎ বালভাবাচ্চ সাক্ষ্যং বিতথমুচ্যতে ॥ ১১৮
লোভাৎ সহস্রং দণ্ড্যস্তু মোহাৎ পূর্ব্বন্তু সাহসং।
ভয়াদ্দ্বৌ মধ্যমৌ দণ্ডৌ মৈত্রাৎ পূর্ব্বং চতুর্গুণং। ১২০

হেতু সাহস দণ্ডের চতুর্গুণ পরিমিত দণ্ড নির্দ্ধারিত ছিল। এই দণ্ডগুলি ঋণ দান ও ঋণ পরিশোধ বিষয়ে। অন্য স্থলে অন্য সাক্ষীর অন্য প্রকার দণ্ড জানিবে। কাম হেতু সাহস দণ্ডের দশগুণ পরিমাণ দণ্ড হয়। ক্রোধ হেতু সাহস দণ্ডের ত্রিগুণ, অজ্ঞান হেতু দুইশত মুদ্রা, বালস্বভাবসুলভ অজ্ঞতা হেতু একশত মুদ্রা দণ্ড হয়। (৬)

জালকারীর দণ্ড।

আর্য্যজাতিরা জালকারী ব্যক্তিকে অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন, ইঁহারা মিথ্যা সাক্ষ্য, মিথ্যা শপথ, মিথ্যা ভাষণকে গুরুতর পাপ বলিয়া জানেন। জালকারী ও কূট সাক্ষীকে মনুষ্য-সমাজের কণ্টকস্বরূপ বলিয়া বিবেচনা করিতেন। ঋষিরা কূট সাক্ষীর কত নিন্দা করিয়াছেন! তাহাকে অপাংক্তেয় করিয়াছেন। মহা-পাতকীর যে দণ্ড সে দণ্ড দিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। রাজা ইহাকে কারাগারে স্থানদানেও শঙ্কিত হইতেন। বিচারকেরাও ইহাকে অশ্রদ্ধা করিতে ত্রুটি করেন নাই; এবং যে ব্যক্তির পক্ষ হইয়া ইহারা পক্ষ সমর্থন করে, তিনিও কার্য্য উদ্ধার করিয়া লইতে পারিলে তাহাকে কি আর কদাচ বিশ্বাস করেন? সে যখন রাজদ্বারে দণ্ডিত হয়, তদবধি তাহার আত্মীয়স্বজন ও পরিবারবর্গ তাহাকে আর সাদরে গ্রহণ করিতে সম্মত হয়? সেই ব্যক্তিই কি আপনাকে আপনি ধিক্কার দেয় না? তাহার অন্তরাত্মা কি তাহাকে কোন দিন অনুতাপে দগ্ধ করেন না? অবশ্য করিতে পারেন। এইগুলি বিবেচনা করিয়া ঋষিগণ কূট সাক্ষীর দণ্ড—অতি ভয়ানক করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য ব্যক্তিকে উচিত দণ্ডবিধান পূর্ব্বক স্বদেশ-বহিষ্কৃত করা হইত। ব্রাহ্মণের পক্ষে কেবল নির্ব্বাসন দণ্ড ছিল। দশবিধ পাপকর্ম্মের সাক্ষীর দশবিধ দণ্ড ছিল। উদর, জিহ্বা, হস্ত, পদ, চক্ষুঃ, নাসা, কর্ণ ও দেহের অন্যান্য অঙ্গ ইহার যে বিষয়ের সঙ্গে সংশ্রব হেতু যে বিষয়ে কূট সাক্ষ্য হইত, কূটকারীর (জালকারীর) সেই সেই অঙ্গের শাস্তিবিধান পূর্ব্বক নির্ব্বাসন প্রসিদ্ধ আছে। (৭)

---

(৬) কামাদ্দশগুণং পূর্ব্বং ক্রোধাত্তু ত্রিগুণং পরং।
অজ্ঞানাদ্দ্বেশতে পূর্ণে বালিশ্যাচ্ছতমেবতু ॥ ১২১ মনু ৮ম অ

(৭) এতানাহুঃ কৌটসাক্ষ্যে প্রোক্তান্ দণ্ডান্মনীষিভিঃ।
ধর্ম্মস্যাব্যভিচারার্থমধর্ম্ম নিয়মায়চ ॥১২২
কৌটসাক্ষ্যন্তু কুর্ব্বাণাং ত্রীন্ বর্ণান্ ধার্ম্মিকো নৃপঃ।
প্রবাসয়েদ্দণ্ডয়িত্বা ব্রাহ্মণন্তু বিবাসয়েৎ ॥১২৩
দশস্থানানি দণ্ডস্য মনুঃ স্বায়ম্ভুবোঽব্রবীৎ।
ত্রিষু বর্ণেষু যানি স্যুরক্ষতো ব্রাহ্মণো ব্রজেৎ ॥১২৪
উপস্থমুদরং জিহ্বা হস্তৌপাদৌচ পঞ্চমং।
চক্ষুর্নাসাচ কর্ণৌচ ধনং দেহস্তথৈবচ ॥ ১২৫ মনু ৮ অ

শ্রীলালমোহন শর্ম্মা

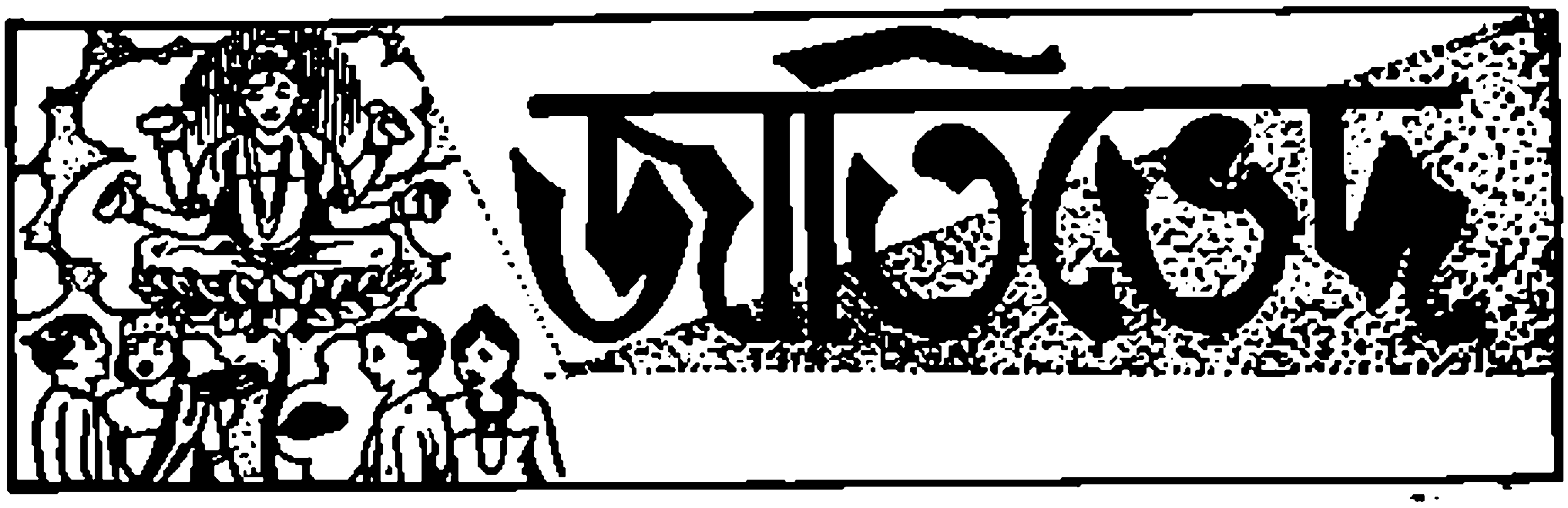

জাতিভেদ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সমাজ শাসন

জাতিভেদ প্রথা রাজ্যশাসনের সহকারী। শাসনের আতিশয্যে শাসিত ব্যক্তিগণের তেজোহ্রাস হয়, এইজন্য কোন কোন ইউরোপীয় শাস্ত্রবেত্তা বলেন যে শাসন সংকীর্ণ করিয়া স্বানুবর্ত্তিতা বৃদ্ধি করাই কর্ত্তব্য এবং তাহাতে যে কিছু ক্ষতি হইবেক তাহা প্রকারান্তরে গঠিত হইয়া যাইবেক। আর কেহ কেহ বলেন যে কালে লোকের বুদ্ধি ও আচরণের উন্নতি হইলে সমাজশাসন এবং রাজশাসনের সুপ্রণালী হইয়া লোকের স্বানুবর্ত্তিতা এবং আজ্ঞানুবর্ত্তিতা উভয়েই সামঞ্জস্য হইবেক। ফলতঃ শাসনপ্রণালীর উৎকর্ষ-সাধনের নিমিত্ত ইউরোপ ও আমেরিকাতে যে কত চেষ্টা হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে তাহার অবধি নাই।

শাসন দুইপ্রকার—রাজশাসন এবং সমাজশাসন। আমরা ধর্ম্মশাসনকে সমাজশাসনের মধ্যে গণ্য করিলাম। ন্যায়ানুসারে বিশ্লেষ করিলে রাজকার্য্য এক ব্যক্তি, সমগ্র সমাজ অথবা কতিপয় ব্যক্তির দ্বারা নির্ব্বাহিত বলিয়া গণ্য হইবেক। তন্মধ্যে দৃষ্ট হইবেক যে যদি পদে পদে রাজাকে কিম্বা রাজকর্ম্মচারীকে আসিয়া লোকের কুকর্ম্ম নিবারণ করিতে হয়, তবে কোন মতেই রাজ্যরক্ষা হয় না। বস্তুতঃ রাজ্যশাসন-প্রণালী সংস্থাপিত হইবার পূর্ব্বেই লোকে আত্মরক্ষা অভ্যাস করিয়াছে এবং কখন বলপ্রয়োগ কখন ভয়প্রদর্শন কখন মিত্রতা কখন নিন্দা এবং কখন বা সংসর্গ পরিত্যাগ দ্বারা পরস্পরের অসদাচরণ নিবারণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। লোকের নিজে নিজে বলপ্রয়োগ করিতে হইলেই সমাজের বিশৃঙ্খলা ঘটে, এইজন্য তাহার ভার রাজহস্তেই ন্যস্ত হইয়াছে। রাজশাসনের দ্বারা যাহা সুসিদ্ধ না হয় তাহা সমাজ কর্ত্তৃক নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। যে রাজ্য এক কিম্বা কতিপয় ব্যক্তির শাসনাধীন, সেখানে অবশিষ্ট লোকের কর্ত্তৃত্ব স্বভাবতঃ স্বল্প হয় কিন্তু যদি রাজা অথবা

রাজপদাভিষিক্ত ব্যক্তিগণ বাহুল্য-রূপে ক্ষমতা প্রয়োগ না করেন তবে সেখানে সমাজ, কার্য্যগতিকে শাসনক্রিয়ার অনেক ভার গ্রহণ করেন। আমাদিগের শাসন-প্রণালী কিরূপ ছিল তাহা পুরাবৃত্ত অভাবে স্থির করা যায় না কিন্তু পশ্চিমাঞ্চলে রাজগণ এখনও যেরূপ কার্য্য করিয়া থাকেন, বোধ হয় তাহা প্রাচীন প্রথার আদর্শ হইতে উদ্ভাবিত হইয়াছে এবং কিয়ৎপরিমাণে সেই আদর্শেই যে জমীদারগণও প্রজাদিগের উপর কর্ত্তৃত্ব করিয়া থাকেন এ কথা নিতান্ত অযৌক্তিক না হইতে পারে।

জাতিভেদ প্রথাতে রাজার একাধিপত্য নাই কারণ রাজা অন্যায় পূর্ব্বক ব্রাহ্মণের অবমাননা করিলে হিন্দুশাস্ত্রমতে রাজদ্রোহিতা নিষিদ্ধ নহে। তদ্ভিন্ন ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রমধ্যেও ক্ষমতার তারতম্য ছিল। একাকী ব্রাহ্মণেরাই যে সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন তাহাও নহে। মনে কর কোন গ্রামস্থ ব্রাহ্মণেরা সকলে একবাক্যে কোন হীনবর্ণ কিম্বা কুকর্ম্মান্বিত ব্যক্তির যাজন ক্রিয়া স্বীকার করিলেন, তাহা হইলেই যে গ্রামস্থ অপরাপর লোক ব্রাহ্মণগণের অনুগামী হইবেক এ কথা বলা যায় না।

কিন্তু যত লোকের মধ্যেই কর্ত্তৃত্ব বিস্তৃত থাকুক, তাঁহারা সকলে কখনই সমকক্ষ নহেন। রাজা কোন অন্যায় আজ্ঞা দিলে ব্রাহ্মণগণ প্রজাদিগকে তাহা প্রতিপালনে প্রতিষেধ করিতে পারেন না। রাজা সভাস্থ হইয়া অনেক কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। এক এক জন রাজার অধিকারও অতি সামান্য ছিল, এই জন্য তিনি একবারে আইনকারক জজ সৈন্যাধ্যক্ষ সমস্ত পদের ভারই গ্রহণ করিতেন। গ্রামে গ্রামে এখনকার ন্যায় বহুসংখ্যক রাজকর্ম্মচারী থাকিত না। তদভাবে গ্রামস্থ ভদ্রলোকেরা রাজ্যশাসনের কোন কোন কার্য্য করিতেন।

প্রাচীন ব্যক্তিদিগের মুখে শুনা যায় যে পূর্ব্বে পল্লীগ্রামে লোকে কখন মকদ্দামা করিত না। এখনও প্রবল জমীদারদিগের অধিকারস্থ প্রজাগণ নায়েব এবং জমীদার ভিন্ন অন্যের নিকট নালিশ করিতে সাহসী হয় না। তদ্রূপ পূর্ব্বে প্রতি গ্রামের এক এক জন বর্দ্ধিষ্ণু লোক সমস্ত প্রতিবাসীদিগের বিবাদ নিষ্পত্তি করিতেন। জাতিমর্য্যাদা রক্ষাপূর্ব্বক অন্যায়কারী ব্যক্তিগণের যথাযোগ্য দণ্ড করিতেন। লোকের জাতিপাত করিতেন। এখন সমস্তই গিয়াছে কেবল শেষোক্ত কার্য্য লইয়া পল্লীগ্রামে দলাদলি হইয়া থাকে। বস্তুতঃ উল্লিখিত ব্যক্তিগণের দ্বারা সমাজশাসন নির্ব্বাহিত হইত। তাঁহারা জাতিভেদ-প্রণালীর স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন। ইঁহারা যে ঠিক সর্ব্বত্র শাস্ত্রীয় বিধানমতে কার্য্য করিতেন তাহা নহে। বিচারকার্য্যের জন্য ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করিতেন না। বলপ্রয়োগের নিমিত্ত ক্ষত্রিয় সৈন্য সংগ্রহ করিতেন না। শূদ্রগণকে একান্ত দাসত্ব পদে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিতেন না। মুসলমান আধিপত্য হইতে সে সকল বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। তথাপি পূর্ব্ব প্রথা মতে কথঞ্চিৎরূপে সমাজ রক্ষা করিতেন। এখন আর সেরূপ নাই। নাই বলিয়া

অনেকেই আক্ষেপ করিয়া থাকেন। কিন্তু কিসে এই প্রথা গেল? অভিনিবেশ করিয়া দেখিলে প্রকাশ হইবে যে এখন রাজশাসন বৃদ্ধি হইয়াই সমাজশাসন খর্ব্ব হইয়া গিয়াছে। গ্রামে গ্রামে পুলিস, মধ্যে মধ্যে থানা তাহার উপরে ডেপুটি মেজেষ্টর এবং মূনসব প্রভৃতি নিযুক্ত হইয়া রাজদণ্ড অতি সামান্য লোকের বাসস্থান পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়াছে। রাজসাহায্য প্রাপ্ত হইলে লোকে তদপেক্ষা নিকৃষ্ট সামাজিক আধিপত্যে সন্তুষ্ট থাকিবে কেন? সামাজিক শাসনে জাতিভেদ নিয়মানুসারে ইতরজাতিগণের যে হীনতা ছিল রাজা তাহা গ্রাহ্য করেন না সুতরাং দুর্ব্বলের সহায় হইয়া ইতরলোকদিগকে ভদ্রমণ্ডলীর সমকক্ষ করিতেছেন।

কিন্তু এতদ্দেশে ধারাবহনপ্রকৃতি লোকের মনে কি দৃঢ়তা প্রাপ্ত হইয়াছে। এত বন্দোবস্ততেও গ্রাম্য কর্ত্তাদিগের সমস্ত প্রাধান্য বিনষ্ট হয় নাই। এখনও জমিদারগণ অনেকানেক বিবাদ ভঞ্জন করিয়া থাকেন। মফস্বলে পিনাল কোডের বিধান এখনও কেবল দুর্ব্বৃত্তের ভয়প্রদর্শক জুজু স্বরূপ হইয়া আছে। লোকে কার্য্য করিবার সময়ে পিতৃপৈতামহিক প্রথাই মান্য করে। চুরিকরা বস্তু ক্রয় করিতে নাই একথা প্রায় কেহই মানে না—কিন্তু মূল্য দিলে দ্রব্য পরিশুদ্ধ হয় এসংস্কার বিলক্ষণ বদ্ধমূল রহিয়াছে।

সে যাহা হউক, প্রাচীন ও অভিনব প্রথার মধ্যে ইতরবিশেষ কি?

অভিনব প্রথার মূল ইউরোপীয় সাধারণতন্ত্র। সমস্ত লোকের সমকক্ষতা বৃদ্ধি করিবার জন্য শাসনপ্রণালী স্থাপিত হইলে রাজকর্ম্মচারীর সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে হয়, ইহাতে সামাজিক শাসনের এই লাঘব হইয়া থাকে যে সমাজমধ্যে কেহ স্বতঃ প্রাধান্য লাভ করিয়া অন্যের প্রতি দণ্ডপ্রয়োগ করিতে পারেন না। সমস্ত লোক সমবেত হইয়া যাহাদিগকে শাসনকার্য্য নির্ব্বাহজন্য নিয়োগ করে, তাঁহারাই কর্ত্তৃত্ব করেন। সুতরাং বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের ক্ষমতা হ্রস্ব হইয়া সমাজনিয়োজিত কর্ম্মচারিগণের পদের মর্য্যাদা ও ক্ষমতা বৃদ্ধি হয়। কিন্তু ঐ সমস্ত কর্ম্মচারিনিয়োগ বিষয়ে সকলেরই অধিকার থাকাতে তৎকর্ত্তৃক কোন অত্যাচার হইলে সামান্য লোকেরাই সমবেত হইয়া তাহা নিবারণ করিতে পারে। বাস্তবিক যেখানে লোকসমূহ এমন বুদ্ধিমান্ ও তেজীয়ান্ হয় যে স্ব স্ব মনস্কামনা সিদ্ধির জন্য স্বেচ্ছামত ঐক্য প্রাপ্ত হইয়া লোকবল সংগ্রহ করিতে পারে সেখানে লোকের সমকক্ষতা স্বভাবতঃই বর্ত্তমান আছে, সাধারণতন্ত্র তাদৃশ লোকের প্রতিষ্ঠিত শাসনকার্য্যের প্রণালী মাত্র।

আমাদিগের দেশে জাতিভেদের ফল বলিয়াই হউক অথবা উহার হেতু স্বরূপই হউক লোকের সমকক্ষতা নাই। রাজা সাধারণতন্ত্রী বলিয়া স্বদেশের প্রথা এখানে প্রচলিত করিলেই যে লোক নূতন প্রণালীমতে কার্য্য করিতে পারিবে ইহা মহৎ ভ্রমের বিষয়।

ভবিষ্যতে কি হইবেক তাহার বিচার করা এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে কিন্তু বর্ত্তমান শাসনপ্রণালী এবং দেশস্থ লোকের প্রকৃতির মধ্যে এখনও যে সামঞ্জস্য হয় নাই তাহা বলা বাহুল্য।

আমরা বিদেশীয় রাজার অধীন। এদেশে এখন এক রাজার আধিপত্য নাই, সমগ্র ইংরাজ সম্প্রদায় আধিপত্য করিতেছেন। নামে সকল প্রজাই রাজসন্নিধানে তুল্য। কিন্তু উহা বাক্য মাত্র। আমাদিগের সমকক্ষতা করিবার ক্ষমতা ও বুদ্ধি না থাকিলে কেবল শাসনপ্রণালী ও রাজাজ্ঞাতে কি হয়? কিন্তু প্রণালীর গুণে কর্ম্মচারিগণের প্রাদুর্ভাব হইয়া দেশীয় লোকের মধ্যে ন্যূনাতিরেক প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছে, কেননা জাতিভেদ মতে যে সকল সম্প্রদায়ে প্রাধান্য ছিল, এখন তাহাদিগের স্থলে এক ইংরাজ জাতি উপবেশন করিয়াছেন। ইঁহারা দেশীয় ধর্ম্মানুসারে ব্যক্তির হস্তে না দিয়া পদের প্রতি ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছেন, সুতরাং সকল লোকেই পরস্পরে সমকক্ষ হইতেছে কিন্তু রাজসম্প্রদায়স্থ ব্যক্তিগণ পৃথক্ এবং দেশীয় ব্যক্তিমাত্রেই ইংরাজমণ্ডলীর অধীন। দেশীয় লোক সমকক্ষ হইয়া পরস্পরে বৈরিতা করিতে বিলক্ষণ সক্ষম হইয়াছেন কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে সাধারণ তন্ত্রের কোন লক্ষণ নাই। সকলেই সমান হইতেছেন কিন্তু সকলেই রাজসন্নিধানে বলহীন হইতেছেন। অতএব পূর্ব্বে সামাজিক শাসনে যাহারা নিকৃষ্ট ছিল তাহারা তেজোলাভ করে নাই। তদূর্দ্ধস্থ সম্প্রদায়ে অত্যাচার দমন হইয়াছে কিন্তু তাহাদিগের নিজের আত্মসংযম বা অধীন শ্রেণীর তেজোবৃদ্ধি প্রযুক্ত এই ঘটনা হয় নাই। অপর এক সম্প্রদায়, রাজা ও সমাজ উভয়েরই শাসন একায়ত্ত করাতে এইরূপ ঘটনা হইয়াছে। এতাদৃশ প্রণালীতে অত্যাচার নিবারিত হইলে সভ্যতার বৃদ্ধি বলিয়া গণ্য হইবেক কিনা তাহা বিচক্ষণ ব্যক্তিরা বিবেচনা করিবেন।

যে তিন প্রকার শাসনপ্রণালীর কথা বলা গিয়াছে তাহার প্রতি অভিনিবেশ পূর্ব্বক দৃষ্টি করিলে প্রতীতি হইবেক যে মনুষ্য মনুষ্যের উপর কয়েকটী বলের দ্বারা কর্ত্তৃত্ব করিয়া থাকে। বাহুবল; বুদ্ধিবল, ধর্ম্মবল এবং এই তিনের ফলস্বরূপ অর্থবল ও বংশমর্য্যাদা। তন্মধ্যে বাহুবল বিচারে নিকৃষ্ট কিন্তু কার্য্যে প্রধান, পণ্ডিতেরা বলেন যে কালে বুদ্ধি কিম্বা ধর্ম্মবলই প্রধান হইবেক। বাহুবল কথঞ্চিৎরূপে বুদ্ধি ও ধর্ম্মের আয়ত্ত হইলে প্রথমতঃ বংশমর্য্যাদা অনন্তর অর্থবলেরই প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে।

জাতিভেদ বংশমর্য্যাদা রক্ষা করিবার প্রণালীবিশেষ। ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বোচ্চপদাভিষিক্ত বিদ্যা এবং ধর্ম্মালোচনাতে নিয়োজিত হওয়াতে তাঁহাদিগের গুণে বুদ্ধি ও ধর্ম্মের মাহাত্ম্যও রক্ষিত হইয়াছিল। বাহুবলের প্রাধান্যে অর্থবল

স্বভাবতঃ হীন থাকিত কেবল ব্রাহ্মণপ্রসাদাৎ ধর্ম্মবৃদ্ধিসহকারে বাহুবলের সাম্য হইয়া শূদ্র ও বৈশ্যবর্ণের কথঞ্চিৎ শ্রীবৃদ্ধি হয়। ইহাতেও তাহাদিগের নিজের কোন মাহাত্ম্য ছিল না ; আপনাদিগের তেজ অভাবে কেবল ব্রাহ্মণ আশ্রয়েই ইহারা ধনশালী হইয়াছিলেন। কিন্তু ধারাবহন প্রকৃতির বশতাপন্ন হইয়া ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ আপনাদিগের দুরবস্থা বুঝিতে পারেন নাই। তাঁহারা শূদ্র ও বৈশ্যের গুণসমূহে অবহেলা করাতে অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ হইয়াছেন সুতরাং তাঁহাদিগের হস্ত হইতে রাজধন হৃত হইলে নিকৃষ্ট বর্ণের পূর্ব্বোন্নতি বিলক্ষণ প্রভাসম্পন্ন হইয়া উঠিল। কারণ যে সকল বিদ্যা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের একায়ত্ত ছিল তাহা সকলেরই অনায়ত্ত হইল। কিন্তু যদি বাহুবল সম্প্রদায়বিশেষের হস্তগত না হইয়া সকলের আয়ত্ত থাকিত এবং রাজভয়ে না হইয়া আত্মসংযমের দ্বারা সকলেই প্রথমতঃ অর্থ ক্রমশঃ ধর্ম্ম লাভ করিত, তাহা হইলে ক্ষত্রিয়-বিনাশেই দেশের তেজোনাশ এবং ব্রাহ্মণ বিনা দেশের বিদ্যালোপ হইত না এবং পূর্ব্বে যাঁহারা এইসকল বিষয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন, তাঁহারা শূদ্রের শ্রমশীলতা অভাবে উহাদিগের তুল্য হইয়া পড়িতেন না। এখন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় উভয়েই স্ব স্ব ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছেন সুতরাং ধর্ম্ম ও বাহুবলের অভাবে অর্থবলেরই প্রদুর্ভাব। একবার অর্থবলের প্রাদুর্ভাব না হইয়া গেলে লোকে অর্থের অসারতা বুঝিয়া কখন ধর্ম্মে নিবিষ্ট হইতে পারে না। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থাতে এই কুলক্ষণ দৃষ্ট হইবেক যে লোকে বাহুবলের দোষগুণ বুঝিতে পারে নাই। আত্মরক্ষার্থ বাহুবল প্রয়োজন কিন্তু তাহা এই প্রকারে সম্বরণ করিতে হইবেক যেন তুমি পরের হানি করিতে নিযুক্ত না হও। ক্ষত্রিয় ভিন্ন অপর জাতি বাহুবলের আস্বাদই জানিত না, অতএব সম্বরণের দ্বারা তাহাদিগের ধর্ম্মলাভ কি প্রকারে হইবেক ? এখন দুর্ব্বল শূদ্র প্রভৃতি ব্যক্তিগণ বাহুবলের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য অর্থবলের প্রয়োগ করিতে বাধ্য হইয়াছে। তাহাতে আত্মসংযম শিখিবার সম্ভাবনা নাই। কারণ ভীরুগণের স্বধর্ম্ম হইতে নিষ্ঠুরতা উৎপন্ন হয় এবং ধনবৃদ্ধিতে তাহার সম্যক্ প্রতিকার হওয়া অসম্ভাবিত। আর যুদ্ধশিক্ষা না করিলে কখন সুচারু মতে লোকবল সংগৃহীত হইতে পারে না। কোম্‌ৎ বলেন, সমাজে সর্ব্বাগ্রে যুদ্ধপ্রিয়তা সর্ব্বান্তে শ্রমপ্রিয়তা ঘটিয়া থাকে। তাঁহার মতে শ্রমজীবিগণ সৈনিক পুরুষদিগের ন্যায় তেজীয়ান ও আজ্ঞাবাহী হইলেই পূর্ণোন্নতি হইবেক। আমাদিগের দুর্দ্দশা প্রযুক্ত যুদ্ধপ্রিয়তা সর্ব্বব্যাপী হইবার পূর্ব্বেই শ্রমের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে সুতরাং সমস্ত লোকে ভীরু ও স্বেচ্ছাচারী হইয়া লোকবল সমাহরণের অযোগ্য হইয়াছে।

জাতিভেদ নিয়মে বংশানুসারে ব্যবসা নির্দ্দেশ দ্বারা সকল লোক সকল বিষয় শিক্ষা করিতে পারে না। সুতরাং তদ্দ্বারা যে শাসনপ্রণালীর কার্য্যসিদ্ধি হইত, তাহাতে দুষ্টের দমন হইলেও সমগ্র সমাজের জ্ঞানবৃদ্ধি হইতে পারে নাই।

এখন সে নিয়ম ভঙ্গ হইয়া যে শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে তাহাতেও মঙ্গল নাই। বংশানুক্রমে কার্য্য করিবার বাসনা দূরীকৃত না হইলে জাতিভেদ-প্রথা অতিক্রান্ত হইবেক না। নূতন নিয়ম প্রচারিত হইয়া কেবল লোকের অবরুদ্ধ কুপ্রবৃত্তি সমূহ স্ফূর্ত্তি পাইয়া পরে আসিয়া অধীনতা মোচন করিলে কখনই মুক্ত ব্যক্তির মাহাত্ম্য থাকে না।

অনেকে বলেন, বাঙ্গালিরা অত্যন্ত মোকদ্দামাপ্রিয়; চিন্তা করিলে প্রকাশ হইবেক যে মোকদ্দামাপ্রিয়তার মধ্যে প্রথম অর্থলাভ অথবা পরের ক্ষতি করিবার বাসনা, দ্বিতীয়, এই বাসনা বলদ্বারা সুসিদ্ধ না করিয়া রাজার সাহায্য গ্রহণ,— এই দুটী লক্ষণ আছে। অর্থলাভেচ্ছা শ্রমপ্রিয়তা হইতে উৎপন্ন হয়। কতপ্রকারে অর্থলাভ করা যাইতে পারে তাহা আমাদিগের অপেক্ষা ইউরোপীয়েরা ভাল বুঝেন। এইজন্যই রেলওয়ে গাড়ীতে পা ভাঙ্গিলে তাহার প্রতিকারার্থে কোম্পানীর নামে নালিশ করিবার বাসনা বাঙ্গালির বুদ্ধিতে কখন প্রবেশ করে না। আমাদিগের মোকদ্দামার অধিকাংশ আন্তরিক বিরোধ ও পরের ক্ষতি করিবার বাসনা হইতে উত্থাপিত হয়। ইংরাজেরা এরূপ স্থলে, হয় ক্রোধসম্বরণ করেন নচেৎ অসহ্য হইলে বাহুবলের দ্বারা শত্রুদমন করিয়া মনের ক্লেশ দূর করেন। আমরা তাহাতে নিতান্ত পরাঙ্মুখ। অপমানিত হইলে হুরমুতের দাবিতে নালিশ করিতেই ভালবাসি। অতএব শ্রমশীল ব্যক্তিগণের মধ্যে যেরূপ মোকদ্দামা উপস্থিত হয় তাহার সংখ্যা আমাদিগের মধ্যে অল্প। আর জেদের মোকদ্দামাই অধিক। কারণ আমাদিগের যুদ্ধশিক্ষা হয় নাই। পশ্চিমাঞ্চলের ক্ষত্রিয়গণের আচরণ আমাদিগের বিপরীত, অন্যান্য বর্ণ আমাদিগের সদৃশ। রাজসাহায্য গ্রহণেচ্ছা শ্রমপ্রিয়তার ফল বটে কিন্তু ক্রোধ নিবৃত্তির নিমিত্ত তদবলম্বন, তাদৃশ ইচ্ছার বিকৃতি। আমাদিগের মিথ্যা-কথন বিষয়ে যে নিন্দা আছে তাহার এক হেতু, যথাযথ জ্ঞানলাভের প্রতি উপেক্ষা এবং অপর হেতু উল্লিখিত ক্রোধ শান্তির নিমিত্ত রাজসাহায্য অবলম্বন। নিজের লাভালাভের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া পরের ক্ষতি করিতে ব্যগ্র হইলে ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার থাকে না। এইজন্যই যুদ্ধপ্রিয়তা ধর্ম্ম-বিচারে নিন্দনীয়। কিন্তু তাহা হইতে মুক্তিলাভ করিবার জন্য আত্মসংযম আবশ্যক। দুর্ব্বল ও ভীতগণ যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হয় বটে কিন্তু তাহাতে ধর্ম্ম নাই।

আমরা দ্বিতীয় প্রস্তাবে লিখিয়াছি যে বঙ্গবাসিগণের মধ্যে কায়স্থবর্ণের ক্ষত্রিয়ত্ব ও সুবর্ণবণিকদিগের বৈশ্যত্বের কথা পরিত্যাগ করিলে ব্রাহ্মণ ভিন্ন যত বর্ণ দৃষ্ট হয় সকলেই বর্ণসঙ্কর, কেহই প্রকৃত শূদ্র বলিয়া গণ্য নহে। এইজন্য বর্ত্তমান কালে শূদ্রশব্দে মিশ্রবর্ণ সমূহ বলিয়া উপলব্ধি হইয়াছে। ইহাদিগের ব্যবসা কবে নির্দ্দিষ্ট হইল? ঐ সকল বর্ণোৎপত্তি ও তাহাদিগের ব্যবসা বিভেদ

কি সমসাময়িক ? ইহা কিরূপে হইবে ? পূর্ব্বে কি গোপ মালাকরের ব্যবসা ছিল না ?

প্রথম কল্পে মিশ্রবর্ণগণ অবশ্যই স্বেচ্ছামতে ব্যবসা গ্রহণ করিয়া থাকিবেক এবং বোধ হয় যৎকালে এত মিশ্রবর্ণ ছিল না তখন শূদ্রেরাও স্বেচ্ছানুসারে বর্ত্তমান ব্যবসা সমূহের এক একটি অবলম্বন করিত।

কিন্তু তাহাতে বংশানুক্রম রক্ষা হইত কি না ? মনে কর, যখন সূত্রধার ও কর্ম্মকার এই মিশ্রবর্ণদ্বয় উৎপন্ন হয় নাই, তৎকালে ইহাদিগের ব্যবসা কে নির্ব্বাহ করিত ? শূদ্রগণ অথবা অন্য মিশ্রবর্ণ। কিন্তু তাহারা কি বংশানুক্রমে ধারাবাহিক মতে স্ব স্ব ব্যবসা প্রতিপালন করিত না স্বেচ্ছাক্রমে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের নিষিদ্ধ যে কোন ব্যবসা অবলম্বন করিত ? যদি প্রথম কল্পনা গ্রহণ করা যায় তবে প্রাচীন কালের নিমিত্তেও শূদ্র শব্দে পৃথক্ বর্ণসমষ্টি মনে করিতে হইবেক। কিন্তু তাহাদিগের আদি প্রকাশ নাই অতএব কোন সময়ে তাহারা অবশ্যই অভিন্ন অবস্থায় থাকিবেক। উভয় কল্পনাতেই স্বীকার করিতে হইবেক যে মিশ্রবর্ণ উৎপত্তির পরে হউক কিম্বা পূর্ব্বেই হউক কোন এক সময়ে দ্বিজগণের নির্দ্দিষ্ট ব্যবসা ভিন্ন আর যে যে ব্যবসা তত্তৎকালে প্রচলিত ছিল তৎসমুদায় শূদ্র বা মিশ্রবর্ণগণ বংশানুক্রমে না হইয়া স্বেচ্ছামতে অবলম্বন করিত।

অনন্তর এই সকল ব্যবসা, জাতিভেদ ও বংশানুক্রম প্রথা প্রবিষ্ট হইবার হেতু কি ? আর কিছুই নহে, কেবল পূর্ব্বপ্রচলিত জাতিভেদ বিধানের অনুকরণ হইতেই এত বর্ণ উপস্থিত হইয়াছে। যতদিন অনুলোম ও প্রতিলোম বিবাহ প্রচলিত ছিল, ততদিন মিশ্রবর্ণের লোকেরা হয় পিতৃমাতৃবর্ণের মধ্যে পরিগণিত হইয়া তাহাদিগের ব্যবসা অবলম্বন করিত নতুবা তাঁহাদিগের সমাজ হইতে বহিষ্কৃত হইলে স্বেচ্ছামত অন্য কোন ব্যবসা অবলম্বন করিয়া স্ব স্ব বংশে তাহাই রক্ষা করিত। পরে জাতিভেদ প্রথার অধিকতর শ্রীবৃদ্ধি হইয়া এতাদৃশ নূতন বর্ণোৎপত্তি স্থগিত হইয়া গেলে প্রকৃত শূদ্রগণ তদনুকরণে প্রবৃত্ত হইয়া আবার পৃথক্ বর্ণ সংস্থাপন করিতে লাগিল এবং মিশ্রবর্ণদিগের দৃষ্টান্তে আপনাদিগের মিশ্র আদিকল্পনা করিয়া লইল। ইহার স্থল এখনও কোথাও কোথাও দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণগণ অনেকেই যজনযাজনাদি বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়াছেন কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে তাঁহারা কোন্ ব্যবসা অবলম্বন করিতেছেন ? সকলেই নানাবিধ চাকরি করেন নিতান্ত দুর্দ্দশাপন্ন পাচকদিগকে পরিত্যাগ করিলে এই সকল চাকরির অধিকাংশ লেখাপড়া সংসৃষ্ট। লেখকের বিবেচনাতে এগুলি প্রকৃত প্রস্তাবে কায়স্থবর্ণের ব্যবসা। আবার দেখ, অধুনাতন প্রথানুসারে অনেক নিকৃষ্ট বর্ণের লোকও লেখাপড়া শিখিতেছে কিন্তু শিখিয়া তাহারা কি পৈতৃক ব্যবসা প্রতিপালন

করে? কেহই না। সকলেই এক কায়স্থ বর্ণের ব্যবসা করিতেছেন। কিন্তু ব্রাহ্মণই বল কি নিকৃষ্ট বর্ণ ই বল, একবার উল্লিখিত মতে নূতন ব্যবসা গ্রহণ করিলে তাঁহাদিগের বংশাবলীও তাহাতেই অনুরক্ত থাকেন। অতএব শূদ্র নাম যেমন হইয়াছে, সেইরূপ কায়স্থ ব্যবসাও ক্রমে বহুবর্ণাধিকৃত বলিয়া গণ্য হইবেক। কিন্তু উভয় স্থলেই এক ধারাবহন প্রকৃতিই অধিষ্ঠান করিতেছে। অভিনব বিদ্যাশিক্ষাপ্রণালী ইউরোপীয় সভ্যতার ফল কিন্তু সেই বীজ বঙ্গে রোপিত হইয়া ফলস্বরূপ কেবল এক নূতন প্রকার কায়স্থ উৎপন্ন হইতেছে।

আবার দেখ, যখন বঙ্গে হিন্দু-বৌদ্ধের বিবাদ সমতা প্রাপ্ত হইয়াছিল, যবনের প্রাদুর্ভাবে সমাজ এখনকার ন্যায় আলোড়িত হয় নাই, তখন হিন্দু সমাজ লোকের উন্নতির জন্য কি করিয়াছেন? বল্লালসেন কৌলীন্য সংস্থাপন এবং দেবীবর ঘটক কুলীনদিগের মেল বন্ধ করেন। মধুমক্ষিকা গৃহসংস্কারে প্রবৃত্ত হইলে একই প্রকার সম ষড়্‌ভুজ কোষ নির্ম্মাণ করে। হিন্দুগণ কেবল জাতির মধ্যে জাতি ভিন্ন আর কিছুই করিতে পারেন নাই।

ইদানীন্তন কৃতবিদ্য যুবকগণের মধ্যে অনেকে মনে মনে হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন। কেহবা প্রকাশ্যরূপে খ্রীষ্টান কেহ ব্রাহ্ম হইয়াছেন। পূর্ব্বেও ধর্ম্ম লইয়া বিস্তর আন্দোলন হইয়া গিয়াছে। শাক্ত শৈবের কথা দূরে যাউক, দেশীয় মুসলমানের অধিকাংশ হিন্দুবংশোদ্ভূত তাহাতে সন্দেহ নাই। * বৈষ্ণবেরাই কি? সকলেই ধর্ম্মোদ্দেশে গমন করিয়া এক একটী পৃথক্ বর্ণ হইয়াছেন। যখন সেদিন ব্রাহ্মগণ একান্ত ব্যস্ত হইয়া রাজসাহায্য অবলম্বন পূর্ব্বক তাঁহাদিগের বিবাহবিধান হিন্দুশাস্ত্র হইতে পৃথক্ বলিয়া নূতন আকারে সংস্কৃত করিলেন, তখনই মনে করিয়াছি যে ঐ দেখ মধুমক্ষিকা আর একটী কোষ নির্ম্মাণ করিতেছে।

ব্রাহ্মগণ উপলক্ষে আমাদিগের মহা আক্ষেপ এই যে তাঁহারাও একটী জাতি হইতে চলিলেন। আমরা বিদ্যা বুদ্ধি বল অর্থ সকল বিষয়েই এখনও জগতের নানা জাতি অপেক্ষা নিকৃষ্ট। এখান হইতে সমস্ত জগতের ধর্ম্মের একতা সংস্থাপন করিবার চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র। এখন জাতিভেদ বিনষ্ট হইতেছে। তাহা সুসিদ্ধ না হইলে ভারতবাসিগণের মন সতেজ এবং কর্ম্মঠ হইবেক না; এখন অনন্যমনা হইয়া কালের সহকারিতা করিয়া যদি এই প্রথা অপনীত করিতে পারা যায় তাহা হইলেই এ যুগের কীর্ত্তি সম্পন্ন হইবেক। খ্রীষ্টান ব্রাহ্মেরা যে একথা বুঝেন না ইহা বড় দুঃখের কথা। কিন্তু আবার যখন দেখি যে এদেশীয় আর এক সম্প্রদায়—

---

* একথা স্থির করিবার উৎকৃষ্ট উপায় ভাষা-পরীক্ষা। অনেক মুসলমান পুরুষেরা কখন বাঙ্গালা কখন উর্দ্দুতে কথা কহেন বটে কিন্তু প্রকৃত বঙ্গীয়দিগের মহিলাগণ স্বভাবতঃ বঙ্গভাষাতেই আলাপ করিয়া থাকেন।

(ইহাদিগকে rationalist নামে আখ্যায়িত করাই সহজ) ধর্ম্ম লইয়া আন্দোলনে বিরত হইয়াছেন, আবার ব্যবহারে কোন দ্বিধা করেন না কেবল ন্যায়পরতা সত্যনিষ্ঠা আদি কতিপয় নিয়মকেই সকল শাস্ত্রের নিদানভূমে স্থির করিয়াছেন। যখন দেখি যে ইহারাও মুসলমানদিগের প্রতি বিমুখ, তখন মনে হয় বুঝি আমরা কখনই জাতিভেদ ও ধারাবহনপ্রকৃতি অতিক্রান্ত করিতে পারিব না।

ধারাবহনপ্রকৃতি কেবল এই সকল করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই। অনুলোম ও প্রতিলোম বিবাহ নিবারণ দ্বারা বর্ণভেদ পূর্ণতালাভ করিলে জাতিবিদ্বেষ বিলক্ষণ বলবৎ হইতেছে। কোন বর্ণ শ্রেষ্ঠ এবং কেহ নিকৃষ্ট ও অস্পর্শীয় ইত্যাকার ধারণা বহুকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। বরং ইহার হ্রাসে কতক মঙ্গল লক্ষণ মনে করা যায় কিন্তু পূর্ব্বে জাতি পরম্পরার মধ্যে প্রকৃতির নিন্দাবাদ ছিল না। এখন কায়স্থ, নাপিত, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ, এবং সমস্ত পূর্ব্বাঞ্চলবাসীদিগকে ধূর্ত্ত এবং পক্ষান্তরে তন্তুবায় বর্ণ এবং রাঢ়শ্রেণীকে নির্ব্বোধ মনে করা এতই প্রবল হইয়াছে যে লোকে ইহার প্রতি লক্ষ্যই করেন না।

কিন্তু জাতিভেদ প্রথা হইতে যত ক্ষতি হইয়াছে তন্মধ্যে বিভিন্ন বর্ণের স্বস্থতা নাশের ন্যায় আর কিছুই নহে। আমরা পূর্ব্বে জাতি (nation) ও বর্ণ (caste) শব্দের বিভিন্নতা সংস্থাপন করিতে চেষ্টা পাইয়াছি। কিন্তু দেশের অবস্থাগুণেই তাদৃশ প্রয়োজনের উৎপত্তি হইয়াছে। বর্ণসমূহের মধ্যে বিভেদ বলবৎ হইয়া বিভিন্ন বর্ণের স্থলে এক একটি পৃথক্ জাতি হইয়া উঠিয়াছে। ব্রাহ্মণ কায়স্থ আদির মধ্যে যদি বিন্দুমাত্র নৈকট্য লক্ষিত হইত, তাহা হইলে লোকে মুসলমান ইংরাজকে জাতি নামে ব্যক্ত করিত না। এখন রাজপীড়নে উৎকণ্ঠিত হইয়া আমরা বর্ণসমূহের ঐক্য স্থাপনে ব্যগ্র হইয়াছি। ইহাতেও এত মতভেদ এই বড় দুঃখ।

শ্রীয।

ষষ্ঠ প্রস্তাব—ব্রাহ্মণবর্গ

ব্রাহ্মণবর্গ প্রাচীন ভারতের শিরোভূষণস্থ সর্ব্বোত্তম রত্ন। ভারত-অদৃষ্টক্ষেত্রে ইঁহারা বিধাতাস্বরূপ। তাঁহাদের অপরিসীম গুণে উক্তরূপ উচ্চাভিধান প্রদান করিয়াও তৃপ্তি বোধ হয় না। যে গুণ হেতু ব্রাহ্মণেরা সভ্যতম সমাজমধ্যেও "দেব" ইত্যাখ্যায় নির্ব্বিবাদে পূজিত হইয়াছিলেন, সে গুণ কখনই সাধারণ নহে। কিন্তু হতভাগ্য ভারত-অদৃষ্টে তাঁহাদের সেই গুণ, গুণ হইয়া দোষ হইয়াছে, তাঁহারা যদি এতদূর গুণশালী না হইতেন, সাধারণে বোধ হয় তাঁহাদের বাক্যে মোহিত হইয়া যথাপ্রদর্শিত পথে অন্ধের ন্যায় ধাবিত হইত না এবং দুর্দ্দশার দিন আগমন আরও কিছু দিন স্থগিত করিয়া রাখিতে সমর্থ হইত। ফলতঃ ব্রাহ্মণেরা ভারতকে যেমন প্রাচীন সভ্যতার উচ্চতম সোপানে উঠাইয়াছিলেন,—যে সোপান তাঁহার পদস্পর্শে ধন্য বলিয়া জগৎস্থ জনগণ প্রগাঢ় ভক্তিশ্রদ্ধাসংযুত হইয়া দর্শনার্থে ক্রমেই আগ্রহযুক্ত হইতেছেন; সেই ভারতকে আবার তাঁহারা তেমনিই অধঃপাতিত করিয়াছেন। অবনতিকারক ব্রাহ্মণদিগের সহিত এখানে কোন সম্বন্ধ নাই, যাঁহারা উন্নতিকারক, উন্নতিসাধন করিয়া কিঞ্চিৎ অলস ভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহাদিগের সহিত সম্বন্ধ।

ব্রাহ্মণদিগের বিষয় আলোচনা করিতে হইলে, প্রথমে তাঁহাদের গুণভাগ পরিদর্শন দ্বারা মানসিক গতি অবগত না হইলে, সমাজের উপর ইঁহাদের কত দূর প্রভুত্ব এবং ইঁহাদের দ্বারা ইতিহাস কিরূপ পুষ্টতা প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহা সম্যক্ অবগত হওয়া যায় না। ব্রাহ্মণদিগের গুণবত্তা সাধারণতঃ শাস্ত্র-বিদ্যায়। এই শাস্ত্রবিদ্যা সম্ভবতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করিলে দোষ হয় না,—লৌকিক ও পারলৌকিক ভেদে অর্থবিদ্যা ও ব্রহ্মবিদ্যা। ব্রহ্মবিদ্যা দ্বিবিধ, কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। বাল্মীকির সাময়িক অর্থবিদ্যা ও ব্রহ্মবিদ্যার কর্ম্মকাণ্ড ভাগের যথাযথ আলোচনা প্রবন্ধের তৃতীয় প্রস্তাবে করা হইয়াছে, এবং প্রদর্শিত হইয়াছে যে

কর্ম্মকাণ্ড ক্রমেই জটিলতা প্রাপ্ত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এক্ষণে ব্রাহ্মণদিগের রীতিনীতি বর্ণনের পূর্ব্বে জ্ঞানকাণ্ড কিঞ্চিৎ পর্য্যালোচনা করিলে বোধ হয় কাহারও অরুচিকর হইবে না। বিষয় অতি বৃহৎ, সঙ্কীর্ণ স্থানে সমাধা হওয়ার কথা নহে, সুতরাং যাহা কিছু হয়, তাহাতেই পরিতৃপ্ত হইতে হইবে।

জ্ঞানকাণ্ড সম্বন্ধে রামায়ণে দুইরূপ মত দৃষ্ট হয়। একটি জাবালি কর্ত্তৃক রামকে প্রবোধ দেওয়ার ছলে [(২) ১০৮] নিরীশ্বর ভাব, অপরটি, যদিও বিশেষরূপে বিবৃত নাই, বৈদান্তিক অর্থাৎ ঔপনিষদিক মত। জাবালি যেরূপ মত বিস্তার করিয়াছেন, তাহা ঐ সর্গের শেষ ভাগে "যথাহি চোরঃ স তথাহি বুদ্ধঃ" এই পদ থাকায় কেহ কেহ অনুমান করেন যে উহা বুদ্ধমত। কিন্তু বুদ্ধদিগের মধ্যে সৌত্রান্তিক, যোগাচার ও বৈভাষিক এই তিন সম্প্রদায়ের মতের সঙ্গে উহার কোন সংস্রব নাই। মাধ্যমিকদিগের সহ মূল তত্ত্বের সাদৃশ্য আছে বটে, কিন্তু মাধ্যমিকাচার জাবালির মতের ন্যায় কুৎসিত বিলাসপ্রিয়তা, পশুভাব ও নিকৃষ্টাচার যুক্ত নহে। জাবালির মতের অধিক ঘনিষ্টতা চার্ব্বাকদর্শনের সঙ্গে। (ক) এই সাধ্য সাধনাবলম্বনে সাধিত দর্শনের সারাংশ যেরূপ মাধবাচার্য্য সর্ব্বদর্শন সংগ্রহে সংগৃহীত করিয়াছেন, জাবালির মতের সহ তাহার বহুল ঐক্য। পূর্ব্বোক্ত শ্লোকোক্তের আদর্শ বলিলে ক্ষতি হয় না। ফলতঃ জাবালির মত অতি আধুনিক ও পরে যোজিত ইহা সহজেই উপলব্ধি হয়। অনেক ইউরোপীয় পণ্ডিতেরাও এই কথা প্রতিপোষণ করিয়া থাকেন। (১)

দ্বিতীয় মত বৈদান্তিক। আর্য্যগণের মতে শ্রুতিপ্রতিপাদিত ধর্ম্মই উৎকৃষ্ট এবং সনাতন ধর্ম্ম। শ্রুতি দুইভাগে বিভক্ত, মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ। মন্ত্রভাগ অতি প্রাচীন ঋষিদিগের দ্বারা গীত। ব্রাহ্মণভাগ বহু পরে রচিত। ভিন্ন ভিন্ন বেদশাখায় মন্ত্রোক্ত কর্ম্মকাণ্ডের বিধি প্রদানার্থে এবং বিবৃত করণ উদ্দেশে অঙ্কুর ধরিয়া ইতিহাসাদি কথন অর্থে ব্রাহ্মণভাগ রচিত হয়। ব্রাহ্মণের প্রথমাংশে এইরূপ কর্ম্মকাণ্ড প্রভৃতি বর্ণিত হইয়া শেষভাগে জ্ঞানকাণ্ড বিবৃত হইয়াছে, সেই অংশকেই উপনিষদ্ বা বেদের অন্তভাগ বলিয়া বেদান্ত বলে। বেদশাখা সমূহ সেই সকল শাখার আদি শিক্ষকের নামানুসারে প্রায় নামিত, ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ্ও তদ্রূপ। কিন্তু প্রতি বেদশাখাতেই যে নূতন নূতন ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ্ ছিল এমন নহে। এক শাখার

(ক) এই প্রস্তাব লিখিত হইলে পর দেখিলাম যে বর্ত্তমান শ্রাবণ মাসের বঙ্গদর্শনস্থ চার্ব্বাকদর্শনের সমালোচক এই প্রস্তাব-লেখকের সহ একমতস্থ।

(১) "Schlegel regrets that he did not exclude them all from his edition. These lines are manifestly spurious".—Griffith's Ramayana, Vol. II. p 440 এবং extracts from Schlegel, do. do. pp. 498-499 দ্রষ্টব্য।

তা অন্য শাখাতেও গ্রহণ করিয়াছিলেন। মক্ষমূলরের মতে প্রত্যেক বেদশাখার নিমিত্ত এক এক উপনিষদ্ ছিল। তত্কৃত মুক্তিকা অনুসারে ১১৮০ বেদশাখা, (২) সুতরাং ঐ সংখ্যক উপনিষদ্ও ছিল। কিন্তু এখন ১০৮ খানি মাত্র পাওয়া যায়। (৩) হিন্দুদিগের জ্ঞানকাণ্ড উপনিষদের উপরেই প্রধানতঃ নির্ভর করে। উহা যোগধর্ম্মের উৎসস্বরূপ। যোগধর্ম্ম সম্বন্ধে যাহা কিছু পরে রচিত হইয়াছে, উহা উপনিষদের দুহিতাস্বরূপ, বিরুদ্ধ মত অশ্রদ্ধেয়। এই নিমিত্তই জ্ঞানকাণ্ড বা দর্শনাদি সম্বন্ধে যাহা কিছু পরে রচিত হইয়াছে, প্রায় সকল রচয়িতাই আপন আপন মতের গৌরবরক্ষার্থে উপনিষদের দোহাই দিয়াছেন। এমন কি নিরীশ্বর সাংখ্যও, যদি বিজ্ঞানভিক্ষুর ভাষ্য গ্রাহ্য হয়, উপনিষদের দোহাই দিতে ক্রটি করেন নাই। এইরূপ দোহাই দেওয়ার প্রথায় অনিষ্ট ঘটিতেও ক্রটি হয় নাই। দুষ্ট বিদ্যাভিমানিগণের আপন আপন মত প্রতিপোষকতার নিমিত্ত অনেক জাল উপনিষদ্ সৃষ্ট হইয়াছে। (৪) সুতরাং উপনিষদ্ও নির্ব্বিবাদে নাই। যাহা হউক, বাল্মীকির সময়ে যোগধর্ম্ম কতদূর উন্নতিসাধন করিয়াছিল, তাহা বাল্মীকির দ্বারা উল্লিখিত বেদশাখা, ব্রাহ্মণ, উপনিষদ্ এবং আর যাহা যাহা তাঁহার পূর্ব্বের, সেই সকল হইতে যোগধর্ম্মের সারাংশ মূল প্রস্তাবে প্রদর্শিত হইতেছে। পরবর্ত্তী সময়ে তত্তৎ ভাব কতদূর অনুসৃত বা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিশিষ্ট হইয়াছে এবং মূল বিষয়ের সহিত কিরূপ সম্বন্ধ ধারণ করে, তাহা প্রায় টীকাকারে অন্যান্য বিষয়ের সহ পার্শ্ববর্ত্তিভাবে প্রদর্শিত হইবে।

উপনিষদ্ সমূহের উদ্দেশ্য যদিও এক কিন্তু তাহাতে আরও নানা বিষয় বিবৃত হইয়াছে, এবং প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন পথাবলম্বনে সেই উদ্দেশ্য সাধিত হইয়াছে। সে সকলের সহিত এখানে সংস্রব রাখা অনাবশ্যক এবং তদুপযুক্ত স্থানও নাই। উদ্দেশ্য মাত্র নিম্ন মত কয়ভাগে বিভক্ত করিয়া, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, যোগধর্ম্ম আলোচিত হইতেছে। ঈশ্বরের স্বরূপ, সৃষ্টির ব্যক্তাব্যক্ততা, জীবাত্মার সহ পরমাত্মার সম্বন্ধ, জীবাত্মার অবস্থান, মুক্ত্যুপায় এবং যোগ সাধনোপায়।

বৈদান্তিক কর্ম্মের মূল প্রস্থান "আত্মৈবেদমগ্র আসীদেক এব" এবং লব্ধ ফল "এতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তৎসত্যং স আত্মাতত্ত্বমসি শ্বেতকেতো।"

---

(২) বেদশাখার সংখ্যা নিরূপণ অক্ষমতে "একবিংশতিধা বাহ্বৃচ্যং। একশতধা আধ্বর্য্যবং। সহস্রধা সামবেদং। নবধা আথর্বণং।"—দুর্গাচার্য্যের নিরুক্তভাষ্য ১।২০।

(৩) Max Muller's Ans : Saas: Lit p. 325.

(৪) Max Muller's Ans : Saas Lit

স্বকৃত স্বয়ম্ভু এবং যাঁহাকে অপর কিছুতেই ব্যক্ত করিতে সমর্থ হয় না, এবং যাঁহার দ্বারা অপর সকলই ব্যক্ত হইয়া থাকে, ও "এষ সর্ব্বেশ্বর এষ সর্ব্বজ্ঞ এষোহন্তর্য্যাম্যেষ যোনিঃ সর্ব্বস্য প্রভবাপ্যয়ৌহি ভূতানাং" এরূপ একমাত্র পরমেশ্বর আদিতে বিরাজমান ছিলেন। তাঁহা ব্যতীত আর দ্বিতীয় সকাম বা নিষ্কাম কোন পদার্থই ছিল না। এই নিত্য অবিনাশী জ্ঞানময় আত্মা বহুধা হইতে কামনাযুক্ত হইলেন। তজ্জন্য তপঃসাধন অর্থাৎ সৃষ্টির প্রক্রিয়া নিরূপণ করিয়া এই সমস্ত সৃষ্টি করিলেন। প্রথমে আকাশের উৎপত্তি হইল, অনন্তর ক্রমান্বয়ে আকাশ হইতে মরুৎ, মরুৎ হইতে তেজঃ, তেজঃ হইতে অপ্, অপ্ হইতে ক্ষিতি, ক্ষিতি হইতে উদ্ভিদ্, উদ্ভিদ্ হইতে অন্ন, অন্ন হইতে রেতঃ, রেতঃ হইতে মনুষ্যের উৎপত্তি হইল। (৫) সৃষ্টির পরিরক্ষকগণ সৃষ্টির মানসে কারণজল মধ্যে সৃষ্ট একটি নরাকার পুরুষকে গ্রহণ করিলেন, ইনি হিরণ্যগর্ভ। সেই পুরুষের শরীর উদ্ভিন্ন করিয়া অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য, দিক্, উদ্ভিদ্, চন্দ্র, মৃত্যু এবং জল অর্থাৎ এই সকলের অধিষ্ঠাতৃ-দৈবতা নিচয়ের উদ্ভব হইল। (৬) ইঁহারা মনুষ্য-শরীরে প্রবেশ করিয়া—যথাক্রমে বাগিন্দ্রিয়, শ্বাসেন্দ্রিয়, দর্শনেন্দ্রিয়, শ্রবণেন্দ্রিয়, কেশাবলী, মনঃ, প্রাণবায়ু এবং উৎপাদিকা শক্তি, এই সকলের অধিপতিভাবে অবস্থিতি করিলেন। অনন্তর পরমাত্মা সৃষ্ট সমস্তে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে প্রদত্ত যে স্বভাব তাহা ব্যক্ত করিলেন। এ নিমিত্ত সাকার, নিরাকার, সৎ, অসৎ, বিদ্যা, অবিদ্যা, উভয়বিধ ভাবই তাঁহাতে আশ্রয় করিল। (৭) পরমাত্মার আপন ভাবযুক্ত অবস্থাকে পরমাত্মা, এবং জীবের

---

(৫) ছান্দোগ্যে (৬।২-৩) ঈশ্বর বহুধা হইতে বাঞ্ছা করিলে প্রথমে তেজ সৃষ্ট হইল, তেজ হইতে জল, জল হইতে অন্ন; অন্ন হইতে স্বেদজ, অণ্ডজ ও উদ্ভিজ্জের উৎপত্তি হইল। মুণ্ডকে (১।১।৮) অন্ন হইতে যথাক্রমে প্রাণ মন সত্যলোক কর্ম্ম এবং অমৃতত্ব উৎপাদিত হইল। এতৎ প্রাচীন উপনিষদদ্বয়ে উল্লিখিত মতবৈলক্ষণ্য লক্ষিত হয়।

(৬) রামায়ণে ২।১১০।৩

"সর্ব্বং সলিলমেবাসীৎ পৃথিবী তত্র নির্ম্মিতা।
ততঃ সমভবদ্‌ব্রহ্মা স্বয়ম্ভূর্দ্দৈবতৈঃ সহ॥"

পুনশ্চ মনুতে (১।৬-৯) অব্যক্ত সূক্ষ্ম পরমাত্মা সৃষ্টি করণেচ্ছুক হইয়া পঞ্চভূতাদির সৃষ্টি করিলেন। তাহাতে আপন শক্তিরূপ বীর্য্য অর্পণ করায়, একটি অণ্ডের উৎপত্তি হইল। ঐ অণ্ডে ধাতা হিরণ্যগর্ভ জন্মপরিগ্রহ করিলেন।

(৭) বেদান্ত সূত্রের শাঙ্কর ভাষ্য মতে ঈশ্বর সত্য আর সমস্ত অসত্য অর্থাৎ অবিদ্যা বা মায়া। এই সৃষ্টি সেই অবিদ্যা প্রপঞ্চ। অবিদ্যার শক্তি দ্বিবিধ বিক্ষেপ শক্তি ও আবরণ শক্তি, এতদুভয় শক্তিযোগে জীবাত্মা অবিদ্যা আবদ্ধ হইয়া থাকে। পরমাত্মার সহ জীবাত্মার একত্ব দর্শন দ্বারা অবিদ্যা পরিত্যাগ করিতে পারিলে জীবাত্মা মোক্ষ দ্বারা আপন স্বভাবে লীন হইয়া থাকে। জরা মরণ সুখ দুঃখ পুনর্জ্জন্মাদি সমস্তই অবিদ্যাজনিত। পুনশ্চ মহানির্ব্বাণ তন্ত্র

চৈতন্যস্বরূপ পদার্থ, যাহা বৈদান্তিক মতে বিজ্ঞানকোষাশ্রয়ী পরমাত্মা স্বয়ং, তাহাকে জীবাত্মা বলিয়া কহিব। জীবাত্মা এবং পরমাত্মা উভয়ে অভেদ, পূর্ব্বকথিত যিনি জীব-শরীরে প্রবেশ করিয়া তাহাদের স্বভাব ব্যক্ত করিলেন, তিনিই জীবশরীরস্থ হইয়া পরমাত্মারূপী জীবাত্মা পদবাচ্য হইলেন। আকাশ যেমন ঘটাশ্রয় করিলেও, স্বভাবযুক্ত আকাশের সহ একই পদার্থ, পরমাত্মা তদ্বৎ অবিদ্যা আশ্রয় করিয়া জীবাত্মা সংজ্ঞা ধারণ করিলেও উভয়ে একই বস্তু হয়েন। (৮) এবং যেমন সূর্য্য যে সকল বস্তুর উপর কর প্রসারিত করেন, সেই সেই বস্তুর গুণানুসারে বা দর্শকের নেত্রদোষ অনুসারে, ভিন্ন ভিন্ন দোষগুণবিজ্ঞাপক সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়েন, অর্থাৎ মিথ্যা দৃষ্টি বশতঃ তত্তৎ ভাব তাঁহাতে আরোপিত হয়, কিন্তু সূর্য্য বস্তুতঃ সর্ব্বদাই আপন স্বভাবে রহিয়াছেন, জীবাত্মা তদ্বৎ কর্ম্মাশ্রয় অবিদ্যা প্রভাবে সুখদুঃখময়, মোহযুক্ত এবং বিচালিত বলিয়া পরিদৃশ্যমান হইয়া থাকেন, বস্তুতঃ তিনি সুখ দুঃখ আদি সমুদয় হইতেই নির্লিপ্ত। (৯) সুখ দুঃখ আদি ভোগ পঞ্চীকৃত ভৌতিক প্রভাবেরই হইয়া থাকে, অর্থাৎ উহা অবিদ্যালীলা প্রপঞ্চ, সুতরাং ক্ষণিক। জীবাত্মা অবিদ্যা প্রভাবে আবদ্ধ বশতঃ যদিও গমনবিমুখ, তথাপি মন অপেক্ষা দ্রুতগামী, নৈকট্য এবং দূরত্ব তাঁহার নিকট উভয়ই সমান, তিনি অন্তরাকাশে থাকিয়াও অন্তর বাহির উভয় স্থানে অবস্থান করেন। তিনি সর্ব্বব্যাপী প্রভাবিত,

---

“ব্রহ্মাদি তৃণপর্য্যন্তং মায়য়াং কল্পিতং জগৎ।” এবং স্বমায়া রচিতং বিশ্বং ইত্যাদি। অবিদ্যা দ্বারা জীবাত্মা আবদ্ধ হইতে পারে কি না, তাহা সাংখ্য সূত্রের প্রথম অধ্যায়ে ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪ সূত্রে মীমাংসিত হইয়াছে।—“নাবিদ্যাতোঽপ্যবস্তুনাবন্ধাযোগাৎ” ইত্যাদি। ব্রহ্মে এই বিশ্ব যেরূপ নির্ভর করিয়া আছে তাহা অতি সুন্দরভাবে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে চক্র ও নদীর রূপকে প্রদর্শিত হইয়াছে।

(৮) এতদ্ভাবের বিস্তার ভগবদ্গীতায় ১৫।১৫ “সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ” ইত্যাদি, পুনশ্চ ৬।২৯-৩১ “সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।” ইত্যাদি, পুনশ্চ ১৫।১৪ “অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ। প্রাণাপান সমাযুক্তঃ” ইত্যাদি। যোগবাশিষ্ঠে ৩।৫-৬ “জগদ্ভ্রমোঽয়ং” ইত্যাদি। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণান্তর্গত উত্তরগীতার প্রথম অধ্যায়ে “অহমেবমিদং সর্ব্বং” ইত্যাদি। ভগবতী গীতাতেও এতৎ ভাবের ছায়া মাতঃ সর্ব্বময়ি প্রসীদ পরমে বিশ্বেশি বিশ্বাশ্রয়ে। ত্বং সর্ব্বং নহি কিঞ্চিদস্তি ভুবনে বস্তু ত্বদন্যৎ শিবে।” ইত্যাদি।

(৯) ভগবদ্গীতায় আত্মা জীবশরীরস্থ হইয়াও কিরূপ নির্লিপ্ত ভাবযুক্ত, তাহা সাংখ্যের ছায়া অল্প আশ্রয় করিয়া বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা সুন্দর এবং দ্রষ্টব্য। ১৩।২৯—৩৪ “প্রকৃত্যৈব চ কর্ম্মাণি” ইত্যাদি। পুনশ্চ মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে “অয়মাত্মা সদামুক্তো নির্লিপ্তঃ সর্ব্ববস্তুষু। কিমস্য বন্ধনং।” ইত্যাদি।

অশরীরী, শিরামস্তিষ্কবিহীন, নির্ম্মল ও পাপরহিত। (১০) নিত্য, সূক্ষ্ম, অবিনাশী, কিছু হইতে উৎপন্ন নহেন, স্বয়ম্ভূ, হন্তাও নহেন, হন্তব্যও নহেন। বাক্য, নেত্র, শ্রোত্র, শ্বাসপ্রশ্বাস প্রভৃতির যিনি অতীত, এবং যাহা হইতে ঐ সকল ব্যক্ত হইয়া জগৎ প্রকাশিত হইতেছে এবং যিনি কেবল অধ্যাত্ম যোগ দ্বারা প্রাপ্তব্য, অথবা "অয়মাত্মা ব্রহ্ম মনোময়ঃ প্রাণময়শ্চক্ষুর্ময়ঃ পৃথিবীময় আপময়ো বায়ুময় আকাশময়স্তেজোময়োঽ তেজোময়ঃ কামময়োঽকামময়ঃ ক্রোধময়োঽক্রোধময়ো ধর্ম্মময়োঽধর্ম্মময়ঃ সর্ব্বময়ঃ।"

অবিদ্যাবদ্ধ পরমাত্মার অন্তর, মনঃ, অহঙ্কার, অজ্ঞান, বিজ্ঞান, প্রজ্ঞান, মেধা; ধৃতি, মতি, মনীষা, জুতি, স্মৃতি, ক্রতু, অসু, ইচ্ছা ইত্যাদি পরিচায়ক হয়। পরমাত্মা এ সকল পরিচায়কবিহীন নিরাকার। আত্মা জীবস্থ হইলে, জৈব যন্ত্রাবলী সহ সম্বন্ধে আত্মা রথী, শরীর রথ, সত্ত্ব সারথি, মন বল্গা, ইন্দ্রিয়গণ অশ্ব, এবং উদ্দেশ্য পথ। আত্মার শারীরিক সম্বন্ধে অবস্থান এরূপ, অন্নকে অবলম্বন করিয়া প্রাণবায়ুর অবস্থান, প্রাণবায়ু অবলম্বনে মনঃ, মন অবলম্বনে বিজ্ঞান, বিজ্ঞান অবলম্বনে জ্ঞান, জ্ঞান অবলম্বনে আনন্দ, সেই আনন্দ অবলম্বনে জীবাত্মার অবস্থান। এই জীবাত্মার জীবভাবে আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতায় ইন্দ্রিয় হইতে উদ্দেশ্য মহৎ, উদ্দেশ্য হইতে মন মহৎ, মন হইতে সত্ত্ব মহৎ, সত্ত্ব হইতে ব্যক্ত জীবাত্মা, তদূর্দ্ধে অব্যক্ত পরমাত্মা, উহা সীমা। (১১)

অন্নময় কোষমধ্যে মনোময় কোষ, তন্মধ্যে যথাক্রমে বিজ্ঞানময়, জ্ঞানময় এবং আনন্দময় কোষ। এই আনন্দময় কোষমধ্যে সূক্ষ্ম দেহযুক্ত জীবাত্মা। জীবাত্মা অদৃষ্ট পরিমাণ, নবদ্বারপুরে শয়নশায়ী। ইহার অবস্থা বা ভাব চারি প্রকার। প্রথমে বৈশ্বানর, ইনি শরীরস্থ হইয়া সকল জীবকে পরিচালনা করেন। ইহা জীবের জাগ্রতাবস্থা। এই সময়ে জীবাত্মা ঊনবিংশ ইন্দ্রিয় (১২) বিশিষ্ট

---

(১০) ভগবদ্গীতায় ২।১৭-২০ "অবিনাশী তু তদ্বিদ্ধি" ইত্যাদি, পুনশ্চ ২৩।১৩-১৫ "সর্ব্বতঃ পাণিপাদন্তৎ সর্ব্বতোঽক্ষি শিরোমুখং" ইত্যাদি। সুন্দর সাদৃশ্য।

(১১) এরূপ উৎকর্ষতার পর্য্যায় কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য সহ ছান্দোগ্যে ৭।২-১৫ প্রদর্শিত হইয়াছে। যথা, বাক্য হইতে মন মহৎ, মন হইতে সঙ্কল্প, সঙ্কল্প হইতে চিত্ত, চিত্ত হইতে ধ্যান, ধ্যান হইতে বিজ্ঞান, বিজ্ঞান হইতে ক্ষমতা, ক্ষমতা হইতে অন্ন, অন্ন হইতে জল, জল হইতে তেজঃ, তেজ হইতে আকাশ, আকাশ হইতে স্মৃতি, স্মৃতি হইতে আশা, আশা হইতে প্রাণ, এই প্রাণকে যে সাধনা দ্বারা জ্ঞাত হইতে পারে সেই অতিবাদী। এরূপ ভগবদ্গীতায় ৩।৪২ শরীর হইতে ইন্দ্রিয় শ্রেষ্ঠ, ইন্দ্রিয় হইতে মনঃ, মন হইতে বুদ্ধি, বুদ্ধি হইতে আত্মা। এরূপ তুলনায় বস্তুবিশেষে গুরুত্বভাব প্রদানরূপ কার্য্য পর্য্যালোচনা করিলে সময়ভেদে চিন্তাশক্তির উন্নত বা অবনত ভাব অনেক উপলব্ধি হইতে পারে।

(১২) পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ বায়ু, মনঃ, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত।

হইয়া স্থূল বস্তু ভোগ করিয়া থাকেন। (১৩) দ্বিতীয় তৈজস, উহা জীবের স্বপ্নাবস্থা, এই সময়ে উক্তরূপ ইন্দ্রিয় বিশিষ্ট পুরে আবদ্ধ হইয়া সূক্ষ্ম বস্তু ভোগ করিয়া থাকেন। তৃতীয় প্রাজ্ঞ, ইহা সুষুপ্তাবস্থা, ঐরূপ আবদ্ধ থাকিয়া পরমানন্দ ভোগ করিয়া থাকেন। চতুর্থ সর্ব্ববন্ধন বিচ্ছিন্ন ব্রহ্ম। এই চতুর্ব্বিধ ভাব যথাক্রমে 'অ,' 'উ,' 'ম,' এবং 'ওম্' দ্বারা সাধিত হয়। (১৪) বৈশ্বানরভাবে জীবাত্মার অবস্থান দক্ষিণ নেত্রে, তৈজসভাবে মনোমধ্যে। প্রাজ্ঞভাবে অন্তরাকাশে,—অন্তর হইতে ১০১ নাড়ীর উৎপত্তি, প্রত্যেকে শতধাবিভক্ত, সেই প্রত্যেকের আবার ৭২০০ উপশাখা আছে, (১৫) সুতরাং সমস্ত নাড়ীর সংখ্যা ৭২৭২,০০০,০০; উহার মধ্যে পরিচালিত বায়ুপ্রবাহ, তাহা বিশেষ বিশেষ কার্য্যানুসারে প্রাণ, অপান, উদান, ব্যান ও সমান এই পঞ্চ নামে নামিত। এই পঞ্চ বায়ু অবলম্বন করিয়া পঞ্চ অগ্নির অবস্থান, যথা, গার্হপত্য, দক্ষিণাগ্নি, আহবনীয়, সভ্যাগ্নি ও আবসথ্যাগ্নি। এ সকলের মধ্য দিয়া নাড়ী প্রধানা সুষুম্না (Coronal artery) অন্তরের ঊর্দ্ধভাগে উৎপন্ন হইয়া, তালুস্থ নাড়ীদ্বয়ের মধ্যস্থল অবলম্বন করিয়া এবং তালুস্থ মাংসখণ্ড ভেদ করিয়া করোটী নামক মস্তকাস্থির ভিতর দিয়া কেশমূলে সীমা প্রাপ্ত হইয়াছে। এই নাড়ীতে প্রবেশ করিয়া তদবলম্বনে জ্ঞান ও আনন্দময় স্বর্ণপ্রভ আত্মা অন্তরাকাশে পদ্মবৎ গৃহমধ্যে বাস করিতেছেন। ভূর্ভুব অগ্নি বায়ু সকলেই তথায় বর্ত্তমান আছেন। (১৬)

---

(১৩) স্থূল দৃষ্টিতে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বাক্যের সহ এ স্থল সহসা বিরোধী বোধ হয়, কিন্তু বিশেষ দর্শনে তাহা হইবে না। মায়াজনিত স্থূলদেহী জীবাত্মা এবম্ভূত ভাবে দৃষ্ট।

(১৪) অ+উ+ম্=ওম্ এতদ্ মাহাত্ম্য ও সাধনোপায় মাণ্ডুক্যে এবং ছান্দোগ্য উপনিষদের প্রথমে দ্রষ্টব্য।

(১৫) ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে উত্তর গীতা ২য় অধ্যায়েতেও "দ্বিসপ্ততি সহস্রাণি" ইত্যাদি।

(১৬) পরবর্ত্তী গ্রন্থকলাপে এই ভাব এতদ্রূপে স্পষ্টীকৃত বা শাখা প্রশাখা সহ বিস্তার প্রাপ্ত হইয়াছে। দত্তাত্রেয় ষট্ চক্রভেদে।

"মেরোর্ব্বাহ্য প্রদেশে শশিমিহিরশিরে সব্য দক্ষে নিষণ্ণে।
মধ্যে নাড়ী সুষুম্না ত্রিতয় গুণময়ী চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিরূপা॥
ধুস্তূর স্মের পুষ্প গ্রথিততম বপুঃ কন্দ মধ্যাচ্ছিরস্থা।
বজ্রাখ্যা মেঢ্রদেশাচ্ছিরসি পরিগতা মধ্যমস্তা জ্বলন্তী॥"
এবং "তন্মধ্যে পরমস্মরক মধুরং" ইত্যাদি।

উত্তর গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে

"দীর্ঘাস্থি মূর্দ্ধি পর্য্যন্তং ব্রহ্মদণ্ডেতি কথ্যতে॥
তস্যান্তে সুষিরং সূক্ষ্মং ব্রহ্ম নাড়ীতি সূরিভিঃ।
ইড়া পিঙ্গলয়োর্মধ্যে সুষুম্না সূক্ষ্মরূপিণী॥

জীবাত্মা অবিদ্যাপ্রভাবে পুনঃ পুনঃ জন্ম পরিগ্রহ করিয়া থাকে। (১৭) অবিদ্যা মুক্ত হইলেই আত্মার মুক্তিসাধন হয়। এই মুক্তি সমান বায়ু অবলম্বী সপ্তশিখাময়ী (১৮) অগ্নিতে আহুতি দান বা বেদবিধানোক্ত অন্যান্য কর্ম্মের দ্বারা সাধিত হয় না। (১৯) ছান্দোগ্যে (৭।১।১-৩) নারদ সনৎকুমারের নিকট আক্ষেপ করিয়া কহিতেছেন যে চতুর্ব্বেদ, পুরাণ, ইতিহাস, বেদানাং বেদ অর্থাৎ ব্যাকরণ, কর্ম্মকাণ্ড, মন্ত্রভাগ, রাশি* দৈব,† নিধি,‡ বাকোবাক্যম্ ও একায়নম্,§ দেববিদ্যা,¶

সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং যস্মিন্ সর্ব্বগং সর্ব্বতোমুখং।
তস্য মধ্যগতা সূর্য্য সোমাগ্নি পরমেশ্বরাঃ॥
ভূতলোকাঃ দিশঃ ক্ষেত্রং সমুদ্রাঃ পর্ব্বতাঃ শিলাঃ।
দ্বীপাশ্চ নিম্নগাবেদাঃ শাস্ত্রবিদ্যাকলাক্ষরাঃ॥
স্বরশ্চ পুরাণানি গুণাশ্চৈতানি সর্ব্বগাঃ।
বীজ জীবাত্মকঞ্চ যেষাং ক্ষেত্রজ্ঞাঃ প্রাণবায়বঃ।
সূক্ষ্মাত্মগতং বিশ্বং তস্মিন্ সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং॥"
ইত্যাদি।

(১৭) ভগবদ্গীতা অনুসারে জীবের পাপ পুণ্য কর্ম্ম সুখ দুঃখাদি ঈশ্বর সৃষ্টি করেন না, উহা স্বভাব হইতে প্রবর্ত্তিত হয়। ৫। ১৪-১৫

"নকর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্ম্মফল সংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে॥
নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং নচৈব সুকৃতং বিভুঃ।
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ॥"

(১৮) এই সপ্তশিখা কালী, করালী, মনোজবা, সুলোহিতা, সুধূম্রবর্ণা, স্ফুলিঙ্গিনী, ও বিশ্বরূপা।

(১৯) এতদ্বিষয় মহানির্ব্বাণতন্ত্রে "নমুক্তির্জপনাদ্ধোমাদুপবাসশতৈরপি" ইত্যাদি। অধ্যাত্ম রামায়ণে উত্তরকাণ্ডে পঞ্চমাধ্যায়ে "সা তৈত্তিরীয় শ্রুতিরাহ সাদরং, ন্যাসং প্রশস্তাখিল কর্ম্মণাং স্ফুটং। এতাবদিত্যাহচ বাজিনাং শ্রুতি, জ্ঞানং বিমোক্ষায় নকর্ম্ম সাধনং।" ভগবদ্গীতায় ২।৪৫ "ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।" এই গীতায় কথিত হইয়াছে যে মোহাবৃত জড়বুদ্ধিদিগের প্রবোধার্থে গুণাত্মক কর্ম্মভাগের সৃষ্টি।

* Arithmetic and Algebra.
† Physics.
‡ Chronology.
§ Logic and Polity.
¶ Technology.

ব্রহ্মবিদ্যা,¶ ভূত বিদ্যা, • • ক্ষেত্রবিদ্যা, † † জ্যোতিষ, সর্পবিদ্যা ‡ ‡ দেবজ্ঞানবিদ্যা, § § প্রভৃতি অভ্যাস করিয়াও ব্রহ্মজ্ঞান অভাবে খেদযুক্ত হইতেছেন। জ্ঞান এবং অজ্ঞান এতদুভয়ের মধ্যে জ্ঞান মোক্ষের কারণ, অজ্ঞান কর্ম্মভোগ আশ্রয় করিয়া থাকে। কর্ম্মভোগ উন্নত বা অবনত হইলে তদনুসারে উচ্চ নীচ লোক সকল প্রাপ্ত হইয়া, পুণ্য বা পাপক্ষয়ে পুনর্ব্বার জীবের জন্ম পরিগ্রহ হইয়া থাকে। (২০) পুণ্যসঞ্চিত লোক ব্রহ্মলোক তুলনায় কতদূর স্থায়ী তাহা এবম্ভূত দৃষ্টান্তে প্রদর্শিত হইয়াছে।—দর্পণে, প্রতিবিম্বের ন্যায় ইহলোকে বাস, স্বপ্নে দৃষ্ট বস্তুর ন্যায় পিতৃলোকে, জলেতে প্রতিবিম্বের ন্যায় গন্ধর্ব্ব লোকে, এবং সূর্য্যাতপ প্রতিভাসিত চিত্রফলকস্থ উজ্জ্বল মূর্ত্তির ন্যায় ব্রহ্মলোকে। কিন্তু ইহা বলিয়া কর্ম্মভোগ একেবারে পরিত্যাগ করা বিধি নহে। ব্রহ্মবিদ্যা অধ্যয়ন গ্রহণের পূর্ব্বে কর্ম্মকাণ্ড ও গৃহধর্ম্ম পালন ভূয়োভূয়ঃ বিধানিত হইয়াছে। (২১) প্রথমে

¶ Articulation, Cerimonials and Prosody.

• • Science of spirits.

† † Archery.

‡ ‡ Science of Antidotes.

§ § Fine arts.

উপরে গৃহীত ইংরেজি নামগুলি বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্রের অনুবাদিত।

(২০) পুনর্জন্ম কিরূপে হইয়া থাকে তাহা ছান্দোগ্যে ৫।১০ প্রদর্শিত হইয়াছে।—মনুষ্য কর্ম্মানুসারে ভিন্ন ভিন্ন দেবলোক পিতৃলোক বা নিকৃষ্টলোকে কর্ম্মফল ভোগ করিয়া, ভোগ শেষ হইলে, যদ্রূপ পর্য্যায়ক্রমে গন্তব্য স্থানে গমন করিয়াছিল, প্রত্যাবর্ত্তনে তদ্রূপ পর্য্যায়ের বিপরীত ভাবে নীত হইয়া আকাশে পতিত হয়। তথায় বায়ুসঙ্গে মিলিত হইয়া ধূমত্ব প্রাপ্ত হওত ছিন্ন মেঘের সহ মিশ্রিত হয়। অনন্তর ঘন মেঘের সহ লিপ্ত হইয়া জলধারা ক্রমে চাউল বা অপর কোন আহারীয় দ্রব্যে প্রবেশ করে। অনন্তর পূর্ব্ব কর্ম্মানুসারে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বা নিকৃষ্ট জাতি বা অধম জীবজন্তু দ্বারা আহারিত হইয়া রেতরূপে পরিণত হয়। এবং স্ত্রীপুরুষ উভয় যোগে পুনর্ব্বার পৃথিবীতে নীত হইয়া থাকে। ভগবতী গীতাতেও উমা হিমালয়ের নিকট এতদর্থে মানবজন্ম তত্ত্ব কহিয়াছেন। পুনশ্চ যোগবাশিষ্ঠে ১।৩৯ "ক্ষীণ পুণ্যে" ইত্যাদি, পুণ্যক্ষয়ে পুনর্জন্ম প্রতিপাদিত হইয়াছে, রামায়ণেও সর্ব্বত্র তদ্রূপ।

(২১) মনুর বিধি মতেও ৬।৩৬,৩৭ "অধীত্য বিধিবদ্বেদান্" ইত্যাদি। আগে কর্ম্মকাণ্ড ও গৃহধর্ম্ম সমাধা করিয়া মোক্ষ চেষ্টা করিবে, নতুবা নরকে গমন হয়। অনন্তর ৬।৩৯-৪৮ "যো দত্বা সর্ব্বভূতেভ্যঃ" ইত্যাদি, মোক্ষার্থী ব্যক্তির যেরূপ আচরণ কর্ত্তব্য তৎপক্ষে বিধি দেওয়া হইয়াছে। যোগবাশিষ্ঠে মুমুক্ষু প্রকরণে (১১) সর্গে (৩১,৩২) কর্ম্মকাণ্ড শেষ করিলে কাকতালীয়বৎ জীবের পরমাত্ম তত্ত্বে প্রবৃত্তি জন্মে। ভগবদ্গীতায় ৩।৭। কর্ম্মের দ্বারা জ্ঞানলাভ করিয়া মোক্ষ চেষ্টা করিবে।

কর্ম্মের দ্বারা অসৎ পথ পরিত্যাগ করণ, জিতেন্দ্রিয় হওন, এবং বুদ্ধি বশীভূত করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানসাধন করিতে হইবে। অনন্তর প্রাপ্তজ্ঞান ব্রহ্মবিদ কামনারহিত হইয়া,—যে হেতু ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইলে আর কোন বস্তুতে কামনা থাকে না— সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া পরিব্রাজক হইতে পারেন। (২২) অথবা নিষ্কাম হইয়া অর্থাৎ কার্য্যের ফলবাঞ্ছাশূন্য হইয়া এবং সফল নিষ্ফল এ উভয়েতেই সমান চিত্তপ্রসাদ যুক্ত হইয়া গৃহে অবস্থান পূর্ব্বক তদনুযায়ী কার্য্যে রত থাকিতে পারেন।

নানা নাম ও আকার বিশিষ্ট নদী সমূহ পৃথক্ পৃথক্ বোধ হইলেও সমুদ্রে পতিত হইলে যেমন আর তাহার পৃথক্ত্ব থাকে না, তদ্বৎ অবিদ্যাবদ্ধ আত্মা ও স্বভাবস্থ পরমাত্মায় সম্বন্ধ। একজন মায়াবন্ধনে কর্ম্মফল বশে পুনঃ পুনঃ মুহ্যমান্ এবং তন্নিমিত্ত হীনতা জনিত খেদবান্ হইতেছেন, অপর নির্লিপ্ত ভাবে সাক্ষ্য স্বরূপ তাহা দর্শন করিতেছেন। কিন্তু মুহ্যমান আত্মা যখন সেই সাক্ষ্য স্বরূপ আত্মার সহ আপনার একত্ব অবলোকন করিতে সমর্থ হয়, তখন সেই আত্মা মোহমুক্ত হইয়া আপন স্বাভাবিকী শ্রীধারণ করিয়া থাকে। কিন্তু কথিত হইয়াছে যে উহা কর্ম্মভাগ দ্বারা সাধিত হয় না। পরমাত্মা যখন বাঙ্মনোনেত্রকর্ণাদির অগোচর, তখন তাহাদিগের সাহায্যে তিনি প্রাপ্তব্য হইতে পারেন না। কেবল যাহাতে তাঁহার অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতেছে তাহারই দ্বারা তিনি দৃষ্ট, এবং প্রাপ্ত হইতে পারেন অর্থাৎ স্বীয় দেহস্থ আত্মার পরমাত্মা সহ অভেদত্ব দর্শিত হয়। যখন জীবাত্মা নিষ্কাম হইয়া কেবল পরমাত্মায় মনোনিবেশ করত আমিই অন্ন, আমিই অন্নের ভোক্তা, আমিই তাহার একীভূত কারণ, আমিই বিশ্বের আদিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, দেবতাদিগের পূর্ব্ব হইতেও আমি অমৃতত্ব ভোগ করিতেছি, আমিই সেই সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী, আমিই "ধর্ম্মময়োহধর্ম্মময়ঃ সর্ব্বময়ঃ" এইরূপ জ্ঞানযুক্ত হইয়া, পরমাত্মা সহ আপনার একত্ব অবলোকন করিয়া থাকে, সেই আত্মাই মায়া বন্ধন ছিন্ন করিয়া ব্রহ্মলোকে আনন্দধাম অধিকার করিয়া থাকে অর্থাৎ পরমানন্দময় ব্রহ্মে লীন হয় বা আপন স্বভাবস্থ হয়। তখন শরীরী অবস্থায় যত দিন জগৎ বাস হয়, আর

---

(২২) ভগবদগীতায় ৫।৩ সন্ন্যাসীর স্বভাব এরূপ বর্ণিত হইয়াছে,

"জ্ঞেয়ং স নিত্যঃ সন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি নাকাঙ্ক্ষতি।
নির্দ্বন্দ্বোহি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে।"

২।১৭,১৮ শ্লোকের যদিও কিঞ্চিৎ বিরোধী, তথাপি তৎপরে ও পূর্ব্বে জ্ঞানলাভ সত্ত্বেও কর্ম্মের আবশ্যকতা দেখান হইয়াছে। ২।২৫ অজ্ঞানী যদ্রূপ কর্ম্মে রত থাকে, জ্ঞানীও তদ্রূপ লোকহিত, লোকসংগ্রহ এবং অজ্ঞান ব্যক্তিদিগকে প্রবৃত্তি প্রদানার্থে নিষ্কামভাবে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন।

তীর্থাদির আবশ্যক থাকে না, সে সকলই তাহার শরীরে বর্ত্তমান। (২৩) তখন তাহার পক্ষে পিতাও নাই, মাতাও নাই, পৃথিবী, দেবতা, বেদ কেহই ভিন্ন ভাব ধরে না, চোর চোর নহে, ব্রহ্মহা ব্রহ্মহা নহে, চণ্ডাল চণ্ডাল নহে, পাপ পুণ্য হইতে পৃথক্, যেহেতু তিনি তখন এই সকলের অতীত হয়েন, তিনি তখন পরমাত্মা আপন স্বভাবস্থ। (২৪) বেদান্ত ধর্ম্মের এই লক্ষ্য মূলই ছান্দোগ্যে পিতাকর্ত্তৃক পুত্রের নিকট উক্ত হইয়াছে "এতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তৎসত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো।"

ব্রহ্মলোকের উচ্চতা ও ভাব বৃহৎ আরণ্যকে ৩।৬।১ গার্গী যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদে বর্ণিত হইয়াছে। গার্গী কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া যাজ্ঞবল্ক্য অন্তরীক্ষ, গন্ধর্ব্ব, আদিত্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, দেব, ইন্দ্র, প্রজাপতি এই সকল লোকের ক্রমান্বয়ে অবলম্বন ও অবস্থান কথিত হইলে, পুনর্ব্বার ব্রহ্মলোকের অবস্থান ও অবলম্বন কিরূপ তাহা জিজ্ঞাসিত হইয়া, ভৎর্সনা সহকারে কহিলেন যে এরূপ অযথা প্রশ্ন বিধিবহির্ভূত, এরূপ প্রশ্নে প্রশ্নকারিণীর মুণ্ড নিপাত হইবার সম্ভাবনা। পুনশ্চ ছান্দোগ্যে ৮।৪।১-২ ব্রহ্মলোকের ভাব অতি চমৎকাররূপে বর্ণিত হইয়াছে। ঐ অংশ বাবু রাজনারায়ণ বসুও আপন হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা বিষয়ক পুস্তকে উদ্ধৃত করিয়াছেন। ঐ অংশ উদ্ধৃত করিব, কিন্তু আমার অপেক্ষা তাঁহার কৃত অনুবাদে অধিক মনোহারিত্ব বোধ হওয়ায় তাহাই উদ্ধৃত করিলাম। "এই আত্মার সেতুর এপারে দিনরাত্র নিয়মিত হইতেছে, ওপারে দিনও নাই রাত্রিও নাই, সুকৃতিও নাই দুষ্কৃতিও নাই, ইহা পুণ্য জ্যোতিতে সদা পবিত্র রহিয়াছে। জীব ইহার ওপারে উত্তীর্ণ হইলে, যে অন্ধ সে অনন্ধ হয়, যে সংসারে দুঃখক্লেশে বিদ্ধ সে অবিদ্ধ হয়, যে পাপ ও দোষে উপতাপী সে অনুপতাপী হয়। এই সেতুকে উত্তীর্ণ হইয়া রাত্রিদিনের সমান আলোক ধারণ করে। এই ব্রহ্মলোক, ইহার দিবালোক কখন অস্ত হয় না; ইহা সদাই প্রকাশিত রহিয়াছে।"

---

(২৩) যতীন্দ্র ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য এই ভাব গ্রহণ করিয়াই বোধ হয় যতি পঞ্চকে কহিয়াছেন

"কাশীক্ষেত্রং শরীরং ত্রিভুবন জননীব্যাপিনী জ্ঞানগঙ্গা
ভক্তিশ্রদ্ধা গয়েয়ং নিজগুরুচরণ ধ্যানযুক্ত প্রয়াগঃ।
বিশ্বেশোঽয়ং তুরীয়ং সকলজনমনঃ সাক্ষি ভূতান্তরাত্মা,
দেহে সর্ব্বং মদীয়ং যদি বসতি পুনস্তীর্থমন্যৎ কিমস্তি॥"

(২৪) এই ভাবে ভগবান শঙ্করাচার্য্যের নির্ব্বাণ ষটকে

"নমৃত্যুর্নশঙ্কা ন মে জাতি ভেদাঃ।
পিতানৈব মে নৈব মাতা ন জন্ম॥
নবন্ধুর্নমিত্রং গুরুর্নৈব শিষ্য,
চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহং॥"

ব্রহ্মানন্দের উৎকর্ষ প্রদর্শনার্থে কথিত হইয়াছে যে ধনশালী অপেক্ষা শিক্ষিতের আনন্দ শতগুণ, এইরূপে উত্তরোত্তর গন্ধর্ব্বভাবপ্রাপ্ত মনুষ্যের, দেবত্ব-ভাবপ্রাপ্ত গন্ধর্ব্বের, পিতৃলোকের, দেবলোকের, ইন্দ্রলোকের, বৃহস্পতির ও প্রজাপতির যথাক্রমে শতগুণ অতিক্রম করিয়া আনন্দের উৎকর্ষ। ব্রহ্মানন্দ এ সকলের অতীত ও পরিমাণবিহীন। ব্রহ্মবিদ্যাবিশারদ ব্যক্তি সেই আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন।

যোগসাধনের প্রণালী শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে (২৫) এরূপে বর্ণিত হইয়াছে।—যে গুহায় বায়ু বৃক্ষ পল্লব ও জলের মনোহর শব্দ প্রবেশ করিয়া থাকে, যথা হইতে কোন কুদৃশ্য দৃষ্টিপথে পতিত না হয়, তথা সমভূমি স্থানে শিলাখণ্ড প্রভৃতি পরিষ্কার করিয়া যোগী অবস্থান পূর্ব্বক বক্ষঃ গ্রীবা ও শরীরের অপর ঊর্দ্ধাংশ উন্নত রাখিয়া মনঃ সংযম পূর্ব্বক জিতকাম ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া, নাসিকাগ্রে প্রাণবায়ুর প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া একাগ্রচিত্ত হইবে এবং 'ওম্' শব্দ দ্বারা যোগ সাধন করিবে। যোগী যখন যোগে পরমাত্মাতত্ত্ব লাভ করিবে, তখন সাংসারিক সুখ দুঃখ পরাজয় করিয়া ব্রহ্মানন্দ লাভে সমর্থ হইবে। (২৬)

ইহা বলা বাহুল্য যে পূর্ব্বোক্ত যোগশাস্ত্র, বাল্মীকির সাময়িক এবং তৎপূর্ব্ব হইতে প্রচলিত শ্রুতি গ্রন্থকলাপ হইতে সঙ্কলিত। উহা অদ্বৈতবাদ। সভ্যতার আদি প্রবর্ত্তক সাধারণতঃ ভারতীয় ও গ্রীসীয়দিগকে বলা গিয়া থাকে। উভয়েই মনুষ্যজাতিকে মনুষ্যপদে পদবিক্ষেপ কার্য্য শিক্ষা দিয়াছেন। এতদুভয়ের মধ্যে আবার আদি শিক্ষক ভারতীয়েরা। গ্রীসীয়দের মধ্যে যখন কেহ জল, কেহ বায়ু, কেহ অগ্নি, কেহ ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ ও মরুতের সমাবেশ আদি কারণ বলিয়া বাগ্‌বিতণ্ডা করিতেছেন, যখন সত্যের অনুরোধে একজন জগদ্‌গুরু মহাত্মা সক্রেটিসকে বিষপানে দেহপাত করিতে হইতেছে, ভারতীয়েরা তাহার বহুপূর্ব্ব হইতেই নির্ব্বিবাদে এবং পূজনীয়ভাবে মানবচিত্তের অতি উচ্চতম আকাঙ্ক্ষা বহুল পরিমাণে পরিতৃপ্ত করিয়া বিশ্রাম সুখাভিলাষ ব্যক্ত করিতেছেন। তাঁহাদিগের প্রচারিত সেই শ্রুতিগ্রন্থকলাপ এতদূর গাঢ়তা পরিপূর্ণ যে এ অল্পস্থানে তাহার শতাংশের একাংশ পরিচয় দিয়াছি বলিলেও ধৃষ্টতা বোধ হয়। (২৭)

---

(২৫) শ্বেতাশ্বতর অপেক্ষাকৃত অনেক আধুনিক।

(২৬) ব্রহ্মধ্যান সম্বন্ধে কি কি উপায় এবং সেই সেই উপায়ের কি কি বিঘ্ন তাহা বেদান্তসারের শেষভাগে দ্রষ্টব্য।

পুনশ্চ যোগসাধন সম্বন্ধে পাতঞ্জল দর্শনের প্রথম পাদে দ্রষ্টব্য।

(২৭) বেদান্তভাগের শ্রেষ্ঠতা বিষয়ে একজন বিখ্যাত বিজাতীয় পণ্ডিত এরূপ বলেন :—"There are passages in these works, unequalled in any language for grandeur, boldness and simplicity." পুনশ্চ

"These are the relics of a better age."—Max Muller.

ভারতীয় শাস্ত্র যিনিই পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা করিয়াছেন, তিনিই দেখিয়াছেন যে ভারতের ধর্ম্মপ্রচারক কোন মনুষ্যবিশেষ নহে, প্রকৃতিমাতা স্বয়ং। জননী সন্তানকে স্বয়ং আপন ক্রোড়ে লালন পালন সময়ে বাক্যস্ফূর্ত্তি করিতে শিক্ষা দিয়াছেন। বাল্যকালে তাহার অর্দ্ধস্ফুট অমৃতময় ধ্বনি শুনিয়া শ্রবণসুখে ভাসিয়াছেন, যৌবনে যৌবনশ্রীসম্পন্ন ও উদ্ভিন্নজ্ঞানাঙ্কুর বদনে অর্দ্ধ জ্ঞান অর্দ্ধ চাপল্য উভয় মিশ্রিত মধুরবাক্য শুনিয়া স্নেহসাগরে ভাসিয়াছেন, অভাগিনী আশা করিয়াছিলেন সেই সন্তানকে তাহার প্রাচীনাবস্থায় সর্ব্বকৃতি দেখিয়া আপনার জন্মসার্থক করিবেন। কিন্তু অপরিণামদর্শিনী জননীর সীমাতিরিক্ত উৎসাহে, অপরিণামদর্শী যুবা উন্নতি কামনায় পশ্চাদ্গত সকলকে আরও পশ্চাতে রাখিতে গিয়া শ্রমক্লিষ্টতায় কাতর হইয়া নির্জ্জীব হইয়া পড়িয়াছে, জননী অশ্রুবর্ষণ করিতেছেন। ঈশ্বর করুন সেই অশ্রু শীঘ্রই মোচন হয়।—আদিমকালে ভারতীয় আর্য্যেরা তাৎকালিকী চিত্তের অপ্রশস্ততা অনুসারে দর্শন মোহকর প্রাকৃতিক পদার্থ মালায় স্রষ্টার রূপ কল্পনা করিয়া ভক্তিমার্গ শিক্ষা করিয়াছেন। দ্বিতীয়কালে চিত্তের অপেক্ষাকৃত উন্নত ভাবানুসারে উন্নততত্ত্ব আবিষ্কার পূর্ব্বক চিত্ততৃপ্তি সাধন করিয়াছেন। পুরাণ তন্ত্রোক্ত ধর্ম্ম অতিশয়তার ক্ষণিক কুপরিণাম মাত্র। কিন্তু যেখানে ঈশ্বরভক্তি এত প্রবল যে

"বিদ্বেষাদপি গোবিন্দং দমঘোষাত্মজঃ স্মরন্।
শিশুপালো গতঃ স্বর্গং কিংপুনস্তৎ পরায়ণঃ॥"

সেখানে যে কালে আরও উন্নত ধর্ম্মতত্ত্ব উদ্ভাবিত হইবে ইহা আশা করা যাইতে পারে। মনুষ্যমাত্রেরই হৃদয়ে ঈশ্বর ধর্ম্মবীজমাত্র নিহিত করিয়াছেন, দেশকালপাত্রভেদে অনুরূপ ফলোৎপাদন হইয়া থাকে।

এখন জিজ্ঞাস্য যে যথায় চিন্তাশক্তি এতদূর উচ্চ গগনবিহারিণী, তথায় অদ্বৈতবাদ এবং আনুষঙ্গিক মায়াবাদ, পুনর্জ্জন্মতত্ত্ব এবং তদানুষঙ্গিক উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট লোকের অস্তিত্ব কোথা হইতে আসিল। যেখানে ঈশ্বরের স্বরূপতা সম্বন্ধে যতদূর উৎকৃষ্ট তত্ত্ব উদ্ভাবিত হওয়া সম্ভব তাহা প্রায় হইয়াছে, তথায় তাহার সঙ্গে সঙ্গে এগুলি দেখিলে সহজে চক্ষু ফিরাইতে পারা যায় না। ইহা বোধ হয় এরূপে উদ্ভূত।—

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে জ্ঞানকাণ্ড অপেক্ষা মন্ত্রভাগ অতি পুরাতন। পরবর্ত্তী আর্য্যেরা জ্ঞানতত্ত্ব আবিষ্কারকালে যদিও বৈদিক স্বভাবোপাসনা অতিক্রম করিয়া উঠিয়াছিলেন, কিন্তু কালসহকারে তাঁহাদের এ সংস্কারও জন্মিয়াছিল যে বেদ অপৌরুষেয়। সুতরাং তাঁহাদিগের উদ্ভাবিত তত্ত্বসহ প্রাচীন বেদভাগের সামঞ্জস্য সাধন করা অবশ্য কর্ত্তব্য বোধ করিয়াছিলেন। তত্ত্বজ্ঞানালোচনার উদ্রেকে

তাঁহারা ভৌতিক পদার্থ মাত্রের পরিবর্ত্তন ও ক্ষণিকতা অবলোকন করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, যে সমস্ত এরূপ তাহা কখন নিত্য পদার্থ হইতে পারে না, ভৌতিক পদার্থের সূক্ষ্ম হইতে যতই সূক্ষ্ম অনুসন্ধান করিলেন, ততই ঐ ভাব দৃঢ় বদ্ধমূল হইয়া আসিল। কিন্তু সেই অনিত্য পদার্থনিচয়ের মধ্যে জীবাত্মা যদিও শরীরসহ দৃষ্টিপথ বহিভূ্ত হইয়া থাকেন, তথাপি তাহাকে ক্ষণিক বলিতে সাহসী হইলেন না, যেহেতু বেদে জীবাত্মা অমৃতত্বময় বলিয়া কথিত। ঈশ্বরের কামনা-জনিত সৃষ্ট বস্তু যদিও নিত্য নহে কিন্তু অমৃতত্বময় হইতে পারে, ইহা তাঁহারা না ধরিয়া, অমৃতত্ব অর্থে নিত্য ভাব গ্রহণ করিয়াছিলেন যেহেতু একাধারে অসীম এবং সসীমতা অসম্ভব বোধ করিয়া থাকিবেন। আত্মা নিত্য, জীব বহুসংখ্যক, সুতরাং বহুসংখ্যকই নিত্য আত্মা, ঈশ্বর ব্যতীত যদি পৃথক্ পৃথক্ আত্মার এরূপ নিত্যতা স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে ঈশ্বরে আরোপিত মহিমার ব্যতিক্রম ঘটিয়া উঠে, কিন্তু তাহা হইবার নহে, অতএব জীবাত্মা এবং পরমাত্মা উভয়ে একই পদার্থ। নিত্যবস্তু সম্বন্ধে এরূপ মীমাংসিত হইল বটে, কিন্তু পরিদৃশ্যমান অনিত্য বস্তু কোথায় যাইবে, এবং বেদে যে পুনর্জ্জন্মতত্ব ও ভিন্ন ভিন্ন লোকভোগ কথিত হইয়াছে তাহাও ত কখন মিথ্যা হইতে পারে না।—সুতরাং অবিদ্যা বা মায়াতত্ব, এবং তাহার আনুষঙ্গিক কর্ম্ম প্রয়োজন হইল, ও তৎসঙ্গে বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডেরও আবশ্যকতা রক্ষিত হইল। আর্য্যেরা এরূপ উভয় কূল রক্ষা করিতে গিয়া কথিতরূপ ভোগশাস্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

এই মায়াবাদ এবং অদ্বৈততত্বের বেদভাগের শাসন পরিত্যাগ করিলে, কেবল যুক্তি-অনুসারী মায়াবাদতত্ব মাত্র অবশিষ্ট থাকে। বুদ্ধ শাক্যসিংহ, যাঁহার যুক্তির উপর কেবল নির্ভর, বেদভাগ যাঁহার নিকট ঘৃণিত, বোধ হয়, মায়াবাদ শ্রুতি হইতেই গ্রহণ করিয়াছিলেন, বস্তুতঃ মায়াবাদই বৌদ্ধ মত। কোন কোন পণ্ডিতবিশেষ বিবেচনা করেন যে হিন্দুরা মায়াবাদ বৌদ্ধদিগের নিকট গ্রহণ করিয়াছেন, একথা তত প্রামাণিক বলিয়া বোধ হয় না, যেহেতু বেদান্ত ভাগে বুদ্ধের আবির্ভাবের বহুপূর্ব্বে উহা উদ্ভাবিত হইয়াছে।

অদ্বৈতবাদ ভাল কি মন্দ তাহা জিজ্ঞাসিত হইলে, রামানুজ স্বামীর সহ এক-বাক্যে বলি যে “নিত্যং স্বয়ং জ্যোতিরনা বৃতোহসাবতীব শুদ্ধো জগদেক সাক্ষী। জীবস্তু নৈবংবিধ এব তস্মাদভেদ বৃক্ষোপরি বজ্রপাতঃ। ন্যস্তঃ শ্রীপরমেশ্বরস্য কৃপয়া চৈতন্যলেশস্ত্বয়ি তং তস্মাৎ পরমেশ্বরঃ স্বয়মহো নায়াতি বক্তুং শঠ।” অদ্বৈতবাদ পরবর্ত্তী দোষবিশেষের হেতু বলিয়া কেহ কেহ নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং আদর্শস্বরূপ ব্রজপুরে কৃষ্ণের যথেচ্ছা বিহার এবং আধুনিক গোসাইদিগের অত্যাচার প্রদর্শিত হইয়াছে, অর্থাৎ সর্ব্বজীব কৃষ্ণময় বলিয়া সেই সেই কার্য্য

নির্দ্দোষ এবং ধর্ম্মসঙ্গত বলিয়া উদ্ধৃত ও গৃহীত হইয়াছে। হিন্দুশাস্ত্রের কর্দ্দমভাগ মাত্র যাহাদের আদর্শ এবং সমাজের অপকৃষ্ট অংশমাত্র যাহারা অবলোকন করিয়াছে, তাহারাই ঐরূপ দোষ সামাজিক সর্ব্ববস্তুতে আরোপ করিয়া থাকে। অদ্বৈতবাদ হইতে অনেক দোষ উৎপত্তি হইয়াছে তাহা স্বীকার্য্য; আলোক এবং অন্ধকার পরস্পর বিরোধী হইলেও একাধারে থাকে, ও তাহার কখন অন্যথা হয় না; সেই অন্ধকার আপন নির্দ্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করিয়া আলোকের অধিকৃত স্থান এবং ক্রমান্বয়ে তাহার মূলভাগ পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছে কি না, যদি না করিয়া থাকে সে অন্ধকার অনিষ্টজনক নহে। খ্রীষ্টধর্ম্মমূলআশ্রয়ে পোপীয় ধর্ম্ম যদ্রূপ, এবং পোপদিগের মধ্যে ষষ্ঠ আলেকজণ্ডার যদ্রূপ, বৈদিক অদ্বৈতবাদের সহ কৃষ্ণের ব্রজবিহারের বর্ণনভাগের নিকৃষ্ট অংশ ও আধুনিক গোঁসাইজীর সেই সম্বন্ধ। কৃষ্ণপ্রণয় ও ভক্তি সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট ভাবও যদৃচ্ছা দৃষ্টি করিলে প্রাপ্ত হওয়া যায়, যদৃচ্ছা উল্লেখ যথা—

"তচ্চিন্তাবিপুলাহ্লাদ ক্ষীণপুণ্যচয়াসতী।
তদপ্রাপ্তিমহাদুঃখ বিলীনাশেষপাতকা ॥১৪
চিন্তয়ন্তী জগৎসূতিং পরব্রহ্ম স্বরূপিণম্।
নিরুচ্ছ্বাসতয়া মুক্তিং গতান্যা গোপকন্যকা ॥"১৫

বিষ্ণুপুরাণ ৫।১৩

পুনশ্চ মহাভারতে শান্তিপর্ব্বে ৩৪৬ অধ্যায়ে

"সমাহিত মনস্কাশ্চ নিয়তাঃ সংযতেন্দ্রিয়াঃ।
একান্তভাবোপগতা বাসুদেবং বিশন্তি তে ॥"

পরবর্ত্তী দার্শনিকদিগের দ্বারা অদ্বৈতবাদ যুক্তিসহকারে বারম্বার দূষিত হইলে, বেদান্তভাগ-পরায়ণ ব্যক্তিগণ পূর্ব্বাপর সংযোগ বিহীন করিয়া শ্রুতির খণ্ডশ্লোকসমূহ উদ্ধৃতপূর্ব্বক শ্রুতির দ্বৈতমত প্রতিপাদন করিয়া, অদ্বৈতবাদিতার দোষ সেই অদ্বিতীয় এবং অসাধারণ ব্যক্তি শঙ্করাচার্য্যের উপর আরোপ করিয়া থাকেন। ইহা কেবল শ্রুতির মান অযথাভাবে রক্ষার্থে হইয়াছে। পুরাণবিশেষেও উক্তরূপ উপায়ে—যদিও শঙ্করের উপর দোষ চাপাইয়া না হউক—অদ্বৈতবাদকে দূষিয়াছে, যথা পদ্মে—

"বেদার্থবন্মহাশাস্ত্রং মায়াবাদমবৈদিকং।
ময়ৈব কথিতং দেবি জগতাং নাশকারণম্ ॥"

শঙ্করাচার্য্য আরও নূতন নূতন যুক্তির দ্বারা অদ্বৈতবাদের সম্প্রসারণ করিয়াছেন মাত্র। শঙ্করের পর হইতেই বেদান্তধর্ম্ম গ্রহণ করিলেই সন্ন্যাসধর্ম্ম ভিন্ন গত্যন্তর নাই, এই রীতি, কিন্তু প্রাচীনকালে তাহা ছিল না। এ বিষয় পূর্ব্বেই একবার

উক্ত হইয়াছে যে উহা সাধকের ইচ্ছাধীন ছিল। সন্ন্যাসভাবে ইচ্ছা কদাচিৎ কাহার হইত, এবং অধিকাংশ গৃহস্থ আশ্রমে থাকিতেন বা সময়কালে তৎকার্য্য অনুষ্ঠানে বিমুখ ছিলেন না। রামায়ণে ১।৩৩ "ঊর্দ্ধ রেতাঃ শুভাচারো ব্রাহ্মং তপ উপাগমৎ" ও, ন লক্ষাসমুদিতা ব্রাহ্ম্যা ব্রহ্মভূতো মহাতপাঃ।" চূলী নামক জনৈক ব্রহ্মর্ষি সোমদা নামক গন্ধর্ব্বকন্যা কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া তাহাকে ব্রহ্মদত্ত নামে পুত্র প্রদান করিয়াছিলেন। এইরূপ সেই প্রাচীন কালের যে কোন ব্রহ্মর্ষির নাম শুনিতে পাওয়া যায়, সকলেই গৃহধর্ম্মযুক্ত। ব্রহ্মর্ষিদিগের অলৌকিক কার্য্য সম্পাদনের ক্ষমতা রামায়ণ ও তদ্রূপ অন্যান্য প্রাচীন ও আধুনিক গ্রন্থে কথিত হইয়াছে, যদি এরূপ প্রাচীন ও আধুনিক গ্রন্থে কথিত না থাকিত তবে কাব্যে কাব্যাংশ বলিয়া ধরা যাইতে পারিত। কিন্তু তাহা নহে। এ বিশ্বাস বোধ হয় এরূপে উৎপন্ন হইয়াছে।—যোগশাস্ত্রের যেরূপ প্রকৃতি এবং সাধনের উপায় যেরূপ, তাহাতে সিদ্ধ হওয়া মনুষ্যের সাধ্যাতীত, যাহা মনুষ্যের সাধ্যাতীত তাহা স্থূল বুদ্ধিতে অসাধারণ ও অলৌকিক, অসাধারণ ও অলৌকিক হইলেই তাহার তদ্বৎ ক্ষমতা আছে, এবং যে সিদ্ধ হইবে সে সেই ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু কেহ সিদ্ধও হয় নাই, বিশ্বাস্য বিষয়ও আকাশ-কুসুমবৎ রহিয়া গিয়াছে। যদি বা কেহ কোন ঘটনাক্রমে সিদ্ধ বলিয়া পরিচিত হইতেন, তপোবলক্ষয়রূপ পরিণাম হেতু তাঁহারা সেই অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শন করিতেন না, এইরূপ কল্পিত হেতু দ্বারা বিশ্বাস অচল থাকিত। বর্ত্তমান সন্ন্যাসীদিগের অলৌকিক ক্ষমতায় সাধারণের যেরূপ বিশ্বাস তাহা উপর্য্যুক্ত বাক্যের সহ তুলনা করিলেই প্রতীত হইবে। এ জগতে বিশ্বাস এইরূপ!—ইতি যোগশাস্ত্র।

প্রস্তাব অসমাপ্ত।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

হীরালাল, জগন্নাথের ঘাটে গিয়া নৌকা করিল। রাত্রিকালে দক্ষিণা বাতাসে পাল দিল। সে বলিল তাহাদের পিত্রালয় হুগলী। আমি তাহা জিজ্ঞাসা করিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম।

পথে হীরালাল বলিল, "গোপালের সঙ্গে তোমার বিবাহ ত হইবে না—আমায় বিবাহ কর।" আমি বলিলাম "না।" হীরালাল বিচার আরম্ভ করিল। তাহার মত্ত যে বিচারের দ্বারা প্রতিপন্ন করে যে, তাহার ন্যায় সংপাত্র পৃথিবীতে দুর্লভ; আমার ন্যায় কুপাত্রীও পৃথিবীতে দুর্লভ। আমি উভয়ই স্বীকার করিলাম—তথাপি বলিলাম যে "না, তোমাকে বিবাহ করিব না।"

তখন হীরালাল বড় ক্রুদ্ধ হইল। বলিল, "কাণাকে কে বিবাহ করিতে চাহে।" এই বলিয়া নীরব হইল। উভয়ে নীরবে রহিলাম—এইরূপে রাত্রি কাটিতে লাগিল।

তাহার পরে, শেষ রাত্রে, হীরালাল অকস্মাৎ মাঝিদিগকে বলিল, "এইখানে ভিড়ো।" মাঝিরা নৌকা লাগাইল—নৌকাতলে ভূমিস্পর্শের শব্দ শুনিলাম। হীরালাল আমাকে বলিল "নাম—আসিয়াছি।"—সে আমার হাত ধরিয়া নামাইল। আমি কূলে দাঁড়াইলাম।

তাহার পরে, শব্দ শুনিলাম, যেন হীরালাল আবার নৌকায় উঠিল। মাঝিদিগকে বলিল "দে নৌকা খুলিয়া দে।" আমি বলিলাম, "সে কি ? আমাকে নামাইয়া দিয়া নৌকা খুলিয়া দাও কেন ?"

হীরালাল বলিল, "আপনার পথ আপনি দেখ।" মাঝিরা নৌকা খুলিতে লাগিল—দাঁড়ের শব্দ শুনিলাম। আমি তখন কাতর হইয়া বলিলাম, "তোমার পায়ে পড়ি ! আমি অন্ধ—যদি একান্তই আমাকে ফেলিয়া যাইবে, তবে কাহারও বাড়ী পর্য্যন্ত আমাকে রাখিয়া দিয়া যাও। আমি ত এখানে কখনও আসি নাই—এখানকার পথ চিনিব কি প্রকারে ?"

হীরালাল বলিল, "আমাকে বিবাহ করিতে সম্মত আছ ?"

আমার কান্না আসিল। ক্ষণেক রোদন করিলাম ; রাগে হীরালালকে বলিলাম, "তুমি যাও, তোমার কাছে কোন উপকারও পাইতে নাই—রাত্র প্রভাত হইলে তোমার অপেক্ষা দয়ালু শত শত লোকের সাক্ষাৎ পাইব। তাহারা অন্ধের প্রতি তোমার অপেক্ষা দয়া করিবে।"

হী। দেখা পেলে ত ? এ যে চড়া ! চারিদিকে জল। আমাকে বিবাহ করিবে ?

হীরালালের নৌকা তখন কিছু বাহিরে গিয়াছিল। শ্রবণশক্তি আমার জীবনাবলম্বন—শ্রবণেই আমার চক্ষের কাজ করে। কেহ কথা কহিলে—কত দূরে, কোন্ দিকে কথা কহিতেছে তাহা অনুভব করিতে পারি। হীরালাল কোন্ দিক্, কতদূরে থাকিয়া কথা কহিল, তাহা মনে মনে অনুভব করিয়া, জলে নামিয়া সেইদিগে ছুটিলাম—ইচ্ছা নৌকা ধরিব। গলাজল অবধি নামিলাম। নৌকা পাইলাম না। নৌকা আরও বেশী জলে। নৌকা ধরিতে গেলে ডুবিয়া মরিব। কাতর হইয়া বলিলাম, "বাবু, আমার কি উপায় করিবে না ? আমাকে কি এইখানে মরিতে হইবে ?"

হীরালাল বলিল, "আমাকে অগ্র বিবাহ কর।" কাতরে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি অন্ধ ভার্য্যা লইয়া কি করিবে ?"

হীরালাল বলিল, "বাবুদিগের টাকাগুলি গণিয়া লইব। তার পরে, তোমায় পরিত্যাগ করিব। তখন তুমি অন্যকে ভজনা করিতে পারিবে ; আমি কিছু বলিব না।"

আর সহ্য হইল না। তালের লাঠি তখনও হাতে ছিল। আবার ঠিক করিয়া শব্দানুভব করিয়া বুঝিলাম হীরালাল এই দিকে, এতদূর হইতে কথা কহিতেছে। পিছু হটিয়া, কোমর জলে উঠিয়া, শব্দের স্থানানুভব করিয়া, সবলে সেই তালের লাঠি নিক্ষেপ করিলাম।

চীৎকার করিয়া হীরালাল নৌকার উপর পড়িয়া গেল। "খুন হইয়াছে, খুন হইয়াছে !" বলিয়া মাঝিরা নৌকা খুলিয়া দিল। বাস্তবিক—সেই পাপিষ্ঠ খুন হয় নাই। তখনই তাহার মধুর কণ্ঠ শুনিতে পাইলাম—নৌকা বাহিয়া চলিল—সে উচ্চৈঃস্বরে আমাকে গালি দিতে দিতে চলিল—অতি কদর্য্য, অশ্রাব্য ভাষায় পবিত্রা গঙ্গা কলুষিত করিতে করিতে চলিল। আমি স্পষ্ট শুনিতে পাইলাম যে সে শাসাইতে লাগিল যে, আবার খবরের কাগজ করিয়া, আমার নামে আর্টিকেল লিখিবে। আমি একটু ভীত হইলাম—কেন না আর্টিকেল কাহাকে বলে, তাহা তখন জানিতাম না ; মনে করিলাম কোন পৈশাচিক মন্ত্র তন্ত্র হইবে,

হইলে দেবতা রাক্ষসের অপেক্ষা সহস্রগুণে নিকৃষ্ট। তবে কি আমার কর্ম্মফল ? কোন্ পাপে আমি জন্মান্ধ ?

দুই এক পা করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম—মরিব। গঙ্গার তরঙ্গরব কাণে বাজিতে লাগিল—বুঝি মরা হইল না—আমি মিষ্টশব্দ বড় ভালবাসি। না, মরিব। চিবুক ডুবিল। অধর ডুবিল! আর একটু মাত্র। নাসিকা ডুবিল। চক্ষু ডুবিল। আমি ডুবিলাম!

ডুবিলাম, কিন্তু মরিলাম না। কিন্তু এ যন্ত্রণাময় জীবনচরিত, আর বলিতে সাধ করে না। আর একজন বলিবে।

মরিলেই ভাল হইত। তাহার পরে, জীবন পাইয়া যে ভয়ানক কথা শুনিলাম, তাহা শুনার অপেক্ষা, মরাই ভাল ছিল। একদিন শুনিতে হইল যে, হীরালাল কলিকাতায় গিয়া শচীন্দ্রের সাক্ষাতে বলিয়াছিল যে আমি তাহার প্রণয়ের বশবর্ত্তিনী হইয়া কুলত্যাগ করিয়া গিয়াছিলাম।

আমি সেই প্রভাতবায়ুতাড়িত গঙ্গাজলপ্রবাহমধ্যে নিমগ্ন হইয়া ভাসিতে ভাসিতে চলিলাম। ক্রমে শ্বাস নিশ্চেষ্ট, চেতনা বিনষ্ট হইয়া আসিল।

দ্বিতীয় খণ্ড

(শচীন্দ্র বক্তা)

প্রথম পরিচ্ছেদ

এ ভার আমার প্রতি হইয়াছে—রজনীর জীবনচরিতের এ অংশ আমাকে লিখিতে হইবে। লিখিব।

আমি রজনীর বিবাহের সকল উদ্যোগ করিয়াছিলাম—বিবাহের দিন প্রাতে শুনিলাম যে রজনী পলাইয়াছে, তাহাকে আর পাওয়া যায় না। তাহার অনেক অনুসন্ধান করিলাম, পাইলাম না। কেহ বলিল, সে ভ্রষ্টা। আমি বিশ্বাস করিলাম না। আমি তাহাকে অনেকবার দেখিয়াছিলাম—শপথ করিতে পারি সে কখন ভ্রষ্টা হইতে পারে না। তবে ইহা হইতে পারে যে সে কুমারী, কৌমার্য্যাবস্থাতেই কাহারও প্রণয়াসক্ত হইয়া, বিবাহাশঙ্কায় গৃহত্যাগ করিয়াছে। কিন্তু ইহাতেও দুটি আপত্তি; প্রথম, যে অন্ধ, সে কি প্রকারে সাহস করিয়া আশ্রয় ত্যাগ করিয়া যাইবে ? দ্বিতীয়তঃ, যে অন্ধ সে কি প্রণয়াসক্ত হইতে পারে ? মনে করিলাম, কদাচ না। কেহ হাসিও না, আমার মত গণ্ডমূর্খ অনেক আছে। আমরা খান দুই তিন বহি পড়িয়া, মনে করি জগতের চেতনাচেতনের গূঢ়াদপিগূঢ়তত্ত্ব সকলই নখদর্পণ করিয়া ফেলিয়াছি, যাহা আমাদের বুদ্ধিতে ধরে না, তাহা বিশ্বাস করি না।

ঈশ্বর মানি না, কেননা আমাদের ক্ষুদ্র বিচারশক্তিতে সে বৃহত্তত্ত্বের মীমাংসা করিয়া উঠিতে পারি না। অন্ধের রূপোন্মাদ কি প্রকারে বুঝিব?

সন্ধান করিতে করিতে জানিলাম, যে রাত্র হইতে রজনী অদৃশ্য হইয়াছে, সেই রাত্র হইতে হীরালালও অদৃশ্য হইয়াছে। সকলে বলিতে লাগিল, হীরালালের সঙ্গে সে কুলত্যাগ করিয়া গিয়াছে। অগত্যা আমি এই সিদ্ধান্ত করিলাম যে, হীরালাল রজনীকে ফাঁকি দিয়া লইয়া গিয়াছে। রজনী পরমা সুন্দরী; কাণা হউক, এমন লোক নাই, যে তাহার রূপে মুগ্ধ হইবে না। হীরালাল তাহার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে বঞ্চনা করিয়া লইয়া গিয়াছে। অন্ধকে বঞ্চনা করা বড় সুসাধ্য।

কিছুদিন পরে হীরালাল দেখা দিল। আমি তাহাকে বলিলাম, "তুমি রজনীর সংবাদ জান?" সে বলিল "জানি।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "কোথায় সে?" সে বলিল, "জানিলে আমি বলিব কেন?" সে কিছু সন্ধান বলিল না, কিন্তু একপ্রকার বলিল যে, রজনী তাহার প্রতি অনুরক্তা হইয়া, তাহার সঙ্গে কুলত্যাগ করিয়া গিয়াছে।

কি করিব। নালিশ, ফরিয়াদ হইতে পারে না। আমার দাদাকে বলিলাম। দাদা বলিলেন, "রাস্কেলকে মার।" আমারও সেই ইচ্ছা। কিন্তু আমার একটু সন্দেহ ছিল। আমার মধ্যে মধ্যে বোধ হইতেছিল, হীরালালের সকল কথাই মিথ্যা। কেবল বড়াই। হীরালালও ইঙ্গিতে ভিন্ন স্পষ্ট কিছু বলে নাই। আমি সম্বাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিতে আরম্ভ করিলাম। যে রজনীর সন্ধান দিবে, তাহাকে অর্থ পুরস্কার দিব, ঘোষণা করিলাম। কিছু ফল ফলিল না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রজনী জন্মান্ধ, কিন্তু তাহার চক্ষু দেখিলে অন্ধ বলিয়া বোধ হয় না। চক্ষে দেখিতে কোন দোষ নাই। চক্ষু বৃহৎ, সুনীল, ভ্রমরকৃষ্ণ তারাবিশিষ্ট। অতি সুন্দর চক্ষুঃ—কিন্তু কটাক্ষ নাই। চাক্ষুষ স্নায়ুর দোষে অন্ধ। স্নায়ুর নিশ্চেষ্টতা বশতঃ রেটিনাস্থিত প্রতিবিম্ব মস্তিষ্কে গৃহীত হয় না। রজনী সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী; বর্ণ উদ্ভেদ-প্রমুখ নিতান্ত নবীন কদলীপত্রের ন্যায় গৌর; গঠন, বর্ষাজলপূর্ণ তরঙ্গিণীর ন্যায় সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত; মুখকান্তি গম্ভীর; গতি অঙ্গভঙ্গী সকল, মৃদু, স্থির, এবং অন্ধতা বশতঃ সর্ব্বদা সঙ্কোচজ্ঞাপক; হাস্য, দুঃখময়। সচরাচর, এই স্থিরপ্রকৃতি সুন্দর শরীরে, সেই কটাক্ষহীন দৃষ্টি দেখিয়া কোন ভাস্কর্য্যপটু শিল্পকরের যত্ননির্ম্মিত প্রস্তরময়ী স্ত্রীমূর্ত্তি বলিয়া বোধ হইত।

রজনীকে প্রথম দেখিয়াই আমার বিশ্বাস হইয়াছিল যে, এই সৌন্দর্য্য অনিন্দনীয় হইলেও মুগ্ধকর নহে। হীরালালের কিরূপ মন বলিতে পারি না,

কিন্তু সে বিশ্বাস আমার আজিও আছে। রজনী রূপবতী, কিন্তু তাহার রূপ দেখিয়া কেহ কখন পাগল হইবে না। তাহার চক্ষের সে মোহিনী গতি নাই। সৌন্দর্য্য দেখিয়া লোকে প্রশংসা করিবে; বোধ হয়, সে মূর্ত্তি সহজে ভুলিবেও না, কেননা সে স্থির, গম্ভীর কান্তির একটু অদ্ভুত আকর্ষণী শক্তি আছে, কিন্তু সেই আকর্ষণ অন্তর্বিধ; ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। যাহাকে "পঞ্চবাণ" বলে, রজনীর রূপের সঙ্গে তাহার কোন সম্বন্ধ নাই।

সে যাহাই হউক—আমি মধ্যে মধ্যে চিন্তা করিতাম—রজনীর দশা কি হইবে? সে ইতরলোকের কন্যা, কিন্তু তাহাকে দেখিয়াই বোধ হয় যে, সে ইতর প্রকৃতিবিশিষ্টা নহে। ইতরলোক ভিন্ন, তাহার অন্যত্র বিবাহের সম্ভাবনা নাই। ইতরলোকের সঙ্গেও এতকালে বিবাহ ঘটে নাই। দরিদ্রের ভার্য্যা গৃহকর্ম্মের জন্য, যে ভার্য্যার অন্ধতানিবন্ধন গৃহকর্ম্মের সাহায্য হইবে না—তাহাকে কোন্ দরিদ্র বিবাহ করিবে? কিন্তু ইতরলোক ভিন্ন এই ইতরবৃত্তিপরায়ণ কায়স্থের কন্যা কে বিবাহ করিবে? তাহাতে আবার এ অন্ধ। এরূপ স্বামীর সহবাসে রজনীর দুঃখ ভিন্ন সুখের সম্ভাবনা নাই। দুশ্ছেদ্য কণ্টককাননমধ্যে যত্নপালনীয় উদ্যানপুষ্পের জন্মের ন্যায়, এই রজনীর পুষ্পবিক্রেতার গৃহে জন্ম ঘটিয়াছে। কণ্টকাবৃত হইয়াই ইহাকে মরিতে হইবে। তবে আমি গোপালের সঙ্গে ইহার বিবাহ দিবার জন্য এত ব্যস্ত কেন? ঠিক জানি না। তবে ছোট মার দৌরাত্ম্য বড়, তাঁহারই উত্তেজনাতে ইহার বিবাহ দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। আর বলিতে কি, যাহাকে স্বয়ং বিবাহ করিতে না পারি, তাহার বিবাহ দিতে ইচ্ছা করে।

একথা শুনিয়া অনেক সুন্দরী মধুর হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, তোমার মনে মনে রজনীকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা আছে কি? না, সে ইচ্ছা নাই। রজনী সুন্দরী হইলেও অন্ধ; রজনী পুষ্পবিক্রেতার কন্যা এবং রজনী অশিক্ষিতা। রজনীকে আমি বিবাহ করিতে পারি না, ইচ্ছাও নাই। আমার বিবাহে অনিচ্ছাও নাই। তবে মনোমত কন্যা পাই না। আমি যাহাকে বিবাহ করিব, সে রজনীর মত সুন্দরী হইবে, অথচ বিদ্যুৎকটাক্ষবর্ষিণী হইবে, বংশমর্য্যাদায় শাহ আলমের বা মহলার রাও হল্কারের প্রপরাপসং পৌত্রী হইবে, বিদ্যায় লীলাবতী বা শাপভ্রষ্টা সরস্বতী হইবে; এবং পতিভক্তিতে সাবিত্রী হইবে; চরিত্রে লক্ষ্মী, রন্ধনে দ্রৌপদী, আদরে সত্যভামা, এবং গৃহকর্ম্মে গদার মা। আমি পান খাইবার সময়ে পানের লবঙ্গ খুলিয়া দিবে, তামাকু খাইবার সময়ে হুঁকায় কলিকা আছে কি না বলিয়া দিবে, আহারের সময়ে মাছের কাঁটা বাছিয়া দিবে, এবং স্নানের পর গা মুছিয়াছি কি না, তদারক করিবে। আমি চা খাইবার সময়ে, দোয়াতের ভিতরে চামচে পুরিয়া চার অনুসন্ধান না করি, এবং কালির অনুসন্ধানে চার পাত্রমধ্যে কলম না

দিই, তদ্বিষয়ে সতর্ক থাকিবে ; পিকদানিতে টাকা রাখিয়া বাক্সের ভিতর ছেপ না ফেলি, তাহার খবরদারি করিবে। বন্ধুকে পত্র লিখিয়া আপনার নামে শিরোনামা দিলে, সংশোধন করাইয়া লইবে, পয়সা দিতে টাকা দিতেছি কি না খবর লইবে, নোটের পিঠে দোকানের চিঠি কাটিতেছি কি না দেখিবে, এবং তামাসা করিবার সময়ে বিহাইনের নামের পরিবর্ত্তে ভক্তিমতী প্রতিবাসিনীর নাম করিলে, ভুল সংশোধন করিয়া লইবে। ঔষধ খাইতে, ফুলোল তৈল না খাই, চাকরাণীর নাম করিয়া ডাকিতে, হৌসের সাহেবের মেমের নাম না ধরি, কাহাকে আদর করিয়া বাছা বলিতে শ্যালী না বলি, এ সকল বিষয়ে সর্ব্বদা সতর্ক থাকিবে। এমত কন্যা পাই, তবে বিবাহ করি। আপনারা যে ইনি ও কে টিপিয়া হাসিতেছেন, আপনাদের মধ্যে যদি কেহ অবিবাহিতা, এবং এই সকল গুণে গুণবতী থাকেন, তবে বলুন, আমি পুরোহিত ডাকি।

লোকের বিশ্বাস আছে যে, কেবল শত্রু, অথবা স্নেহদয়াদাক্ষিণ্যশূন্য ব্যক্তিই আমাদিগের উপর অত্যাচার করিয়া থাকে। কিন্তু তদপেক্ষা গুরুতর অত্যাচারী যে আর একশ্রেণীর লোক আছে, তাহা সকল সময়ে আমাদের মনে পড়ে না। যে ভালবাসে সেই অত্যাচার করে। ভালবাসিলেই, অত্যাচার করিবার অধিকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমি যদি তোমাকে ভালবাসি, তবে তোমাকে আমার মতাবলম্বী হইতে হইবে; আমার কথা শুনিতে হইবে; আমার অনুরোধ রাখিতে হইবে। তাহাতে তোমার ইষ্ট হউক, অনিষ্ট হউক, আমার মতাবলম্বী হইতে হইবে। অবশ্য ইহা স্বীকার করিতে হয় যে, যে ভালবাসে সে, যে কার্য্যে তোমার অমঙ্গল, জানিয়া শুনিয়া তাহাতে তোমাকে অনুরোধ করিবে না। কিন্তু কোন্ কার্য্য মঙ্গলজনক, কোন্ কার্য্য অমঙ্গলজনক, তাহার মীমাংসা কঠিন; অনেক সময়েই দুই জনের মত এক হয় না। এমতাবস্থায় যিনি কার্য্যকর্ত্তা, এবং তাহার ফলভোগী, তাঁহার সম্পূর্ণ অধিকার আছে যে, তিনি আত্মমতানুসারেই কার্য্য করেন; এবং তাঁহার মতের বিপরীত কার্য্য করাইতে রাজা ভিন্ন কেহই অধিকারী নহেন। রাজাই কেবল অধিকারী এই জন্য যে, তিনি সমাজের হিতাহিতবেত্তাস্বরূপ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন; কেবল তাঁহারই সদসৎ বিবেচনা অভ্রান্ত বলিয়া তাঁহাকে আমাদিগের প্রবৃত্তি দমনের অধিকার দিয়াছি; যে অধিকার তাঁহাকে দিয়াছি, সে অধিকার অনুসারে তিনি কার্য্য করাতে কাহারও প্রতি অত্যাচার হয় না। এবং সকল সময়ে এবং সকল বিষয়ে আমাদিগের প্রবৃত্তি দমন করিবার তাঁহারও অধিকার নাই; যে কার্য্যে অন্যের অনিষ্ট ঘটিবে বিবেচনা করেন, তৎপ্রতি প্রবৃত্তির নিবারণেই তাঁহার অধিকার; যাহাতে আমার কেবল আপনারই অনিষ্ট ঘটিবে বিবেচনা করেন, সে প্রবৃত্তি নিবারণে তিনি অধিকারী নহেন। যাহাতে কেবল আমার নিজের অনিষ্ট, তাহা হইতে বিরত হইবার পরামর্শ দিবার জন্য মনুষ্যমাত্রেই অধিকারী; রাজাও পরামর্শ দিতে পারেন, এবং যে আমাকে ভালবাসে, সেও পারে। কিন্তু পরামর্শ ভিন্ন আমাকে তদ্বিপরীত পথে বাধ্য করিতে কেহই অধিকারী নহেন।

সমাজস্থ সকলেরই অধিকার আছে যে, সকল কার্য্যই, পরের অনিষ্ট না করিয়া আপনাপন প্রবৃত্তি মত সম্পাদন করে। পরের অনিষ্ট ঘটিলেই ইহা স্বেচ্ছাচারিতা; পরের অনিষ্ট না ঘটিলেই ইহা স্বানুবর্ত্তিতা। যে এই স্বানুবর্ত্তিতার বিঘ্ন করে, যে পরের অনিষ্ট না ঘটিবার স্থানেও আমার মতের বিরুদ্ধে আপন মত প্রবল করিয়া তদনুসারে কার্য্য করায়, সেই অত্যাচারী। রাজা ইহা পারেন না বা করেন না। কেবল এক সমাজ, অপর প্রণয়ী, এই দুই জনে এরূপ অত্যাচার করিয়া থাকেন।

সমাজের এই অত্যাচার নিবারণ জন্য কোন কোন পূর্ব্ব পণ্ডিত ধৃতাস্ত্র হইয়াছেন, এবং তদ্বিষয়ে জন ষ্টুয়ার্ট মিলের যত্ন ও বিচারদক্ষতা, অনন্তকাল পর্য্যন্ত তাঁহার মাহাত্ম্যের পরিচয় দিবে। কিন্তু ভালবাসার অত্যাচার নিবারণের জন্য যে কেহ কখন যত্নশীল হইয়াছেন, এমত আমাদিগের স্মরণ হয় না। কবিগণ সর্ব্বতত্ত্বদর্শী এবং অনন্ত জ্ঞানবিশিষ্ট, তাঁহাদের কাছে কিছুই বাদ পড়ে নাই। কৈকেয়ীর অত্যাচারে দশরথকৃত রামের নির্ব্বাসনে, দ্যূতাসক্ত যুধিষ্ঠির কর্তৃক ভ্রাতৃগণের নির্ব্বাসনে, এবং অন্যান্য শত শত স্থানে, কবিগণ এই মহতী নীতি প্রতিপাদিতা করিয়াছেন। কিন্তু কবিগণ নীতিবেত্তা নহেন; নীতিবেত্তারা এ বিষয়ে প্রকাশ্যে হস্তক্ষেপ করেন নাই। যিনিই লৌকিক ব্যাপারসকল মনোভিনিবেশপূর্ব্বক পর্য্যবেক্ষণ করিবেন, তিনিই এ তত্ত্বের সমালোচনা যে বিশেষ প্রয়োজনীয়, তদ্বিষয়ে নিঃসংশয় হইবেন। কেননা এ অত্যাচারে প্রবৃত্ত অত্যাচারী অনেক। পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, পুত্র, কন্যা, ভার্য্যা, স্বামী, আত্মীয়, কুটুম্ব, সুহৃৎ, ভৃত্য, যেই ভালবাসে, সেই একটু অত্যাচার করে, এবং অনিষ্ট করে। তুমি সুলক্ষণান্বিতা, সদ্বংশজা, সচ্চরিত্রা কন্যা দেখিয়া, তাহার পাণিগ্রহণ করিবে বাসনা করিয়াছ, এমন সময়ে, তোমার পিতা আসিয়া বলিলেন, বিশু দত্ত বিষয়াপন্ন লোক, তাহার কন্যার সঙ্গেই তোমার বিবাহ দিব। তুমি যদি বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া থাক, তবে তুমি এ বিষয়ে পিতার আজ্ঞাপালনে বাধ্য নহ; কিন্তু পিতৃপ্রেমে বশীভূত হইয়া, সেই কালকূটরূপিণী ধনি-কন্যা বিবাহ করিতে হইল। মনে কর, কেহ দারিদ্র্যপীড়িত, দৈবানুকম্পায় উত্তম পদস্থ হইয়া দূরদেশে যাইয়া, দারিদ্র্য মোচনের উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময়ে, মাতা তাহাকে দূরদেশে রাখিতে পারিবেন না বলিয়া কাঁদিয়া পড়িলেন, তাহাকে যাইতে দিলেন না, সে মাতৃপ্রেমে বদ্ধ হইয়া নিরস্ত হইল, মাতার ভালবাসার অত্যাচারে সে আপনাকে চিরদারিদ্র্যে সমর্পণ করিল। কৃতী সহোদরের উপার্জ্জিত অর্থ, অকর্ম্মা অপদার্থ সহোদর নষ্ট করে, এটী নিতান্তই ভালবাসার অত্যাচার, এবং হিন্দু সমাজে সর্ব্বদাই প্রত্যক্ষ গোচর হইয়া থাকে। ভার্য্যার ভালবাসার অত্যাচারের কোন উদাহরণ, নব বঙ্গবাসীদিগের কাছে প্রযুক্ত

করা আবশ্যক কি ? আর স্বামীর অত্যাচার সম্বন্ধে, ধর্ম্মতঃ এটুকু বলা কর্ত্তব্য যে, কতকগুলি ভালবাসার অত্যাচার বটে, কিন্তু অনেকগুলিই বাহুবলের অত্যাচার।

যাহা হউক, মনুষ্যজীবন, ভালবাসার অত্যাচারে পরিপূর্ণ। চিরকাল মনুষ্য অত্যাচারপীড়িত। প্রথমাবস্থায় বাহুবলের অত্যাচার; অসভ্যজাতিদিগের মধ্যে যেই বলিষ্ঠ সেই পরপীড়ন করে। কালে, এই অত্যাচার, রাজার অত্যাচার এবং অর্থের অত্যাচারে পরিণত হয়; কোন সমাজে কখন একেবারে লুপ্ত হয় নাই। দ্বিতীয়াবস্থায়, ধর্ম্মের অত্যাচার; তৃতীয়াবস্থায়, সামাজিক অত্যাচার; এবং সকলাবস্থাতেই ভালবাসার অত্যাচার। এই চতুর্ব্বিধ পীড়নের মধ্যে, প্রণয়পীড়ন কাহারও অপেক্ষা হীনবল বা অল্পানিষ্টকারী নহে। বরং ইহা বলা যাইতে পারে যে, রাজা, সমাজ বা ধর্ম্মবেত্তা কেহই প্রণয়ীর অপেক্ষা বলবান্ নহেন, বা কেহ তেমন সদা সর্ব্বক্ষণ, সকল কাজে আসিয়া হস্তক্ষেপণ করেন না—সুতরাং প্রণয়পীড়ন যে সর্ব্বাপেক্ষা অনিষ্টকারী ইহাই বলা যাইতে পারে। আর, অন্য অত্যাচারকারীকে নিবারণ করা যায়, অন্য অত্যাচারের সীমা আছে। কেননা অন্যান্য অত্যাচারকারীর বিরোধী হওয়া যায়। প্রজা প্রজাপীড়ক রাজাকে রাজ্যচ্যুত করে, কখনও মস্তকচ্যুত করে। লোকপীড়ক সমাজকে পরিত্যাগ করা যায়। কিন্তু ধর্ম্মের পীড়নে এবং স্নেহের পীড়নে নিষ্কৃতি নাই—কেননা ইহাদিগের বিরোধী হইতে প্রবৃত্তিই জন্মে না। হরিদাস বাবাজী পাঁটার বাটি দেখিলে কখন কখন লাল ফেলিয়া থাকেন বটে কিন্তু কখন গোস্বামীর সম্মুখে মাংসভোজনের ঔচিত্য বিচার করিতে ইচ্ছা করেন না—কেননা জানেন যে, ইহলোকে যতই কষ্ট পান না কেন, বাবাজী পরলোকে গোলোক প্রাপ্ত হইবে।

মনুষ্য যে সকল অত্যাচারের অধীন, সে সকলের ভিত্তিমূল মনুষ্যের প্রয়োজনে। জড় পদার্থকে আয়ত্ত না করিতে পারিলে, মনুষ্যজীবন নির্ব্বাহ হয় না, এজন্য বাহুবলের প্রয়োজন। এবং সেই জন্যই বাহুবলের অত্যাচারও আছে। বাহুবলের ফল বৃদ্ধি করিবার জন্য, সমাজের প্রয়োজন; এবং সমাজের অত্যাচারও সঙ্গে সঙ্গে। যেমন পরস্পরে সমাজবন্ধনে বদ্ধ না হইলে, মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য সুসম্পন্ন হয় না, তেমনি পরস্পরে আন্তরিক বন্ধনে বদ্ধ না হইলে, মনুষ্যজীবনের সুনির্ব্বাহ হয় না। অতএব সমাজের যেরূপ প্রয়োজন, প্রণয়েরও তদ্রূপ বা ততোধিক প্রয়োজন এবং বাহুবলের বা সমাজের অত্যাচার আছে বলিয়াই যেমন বাহুবল বা সমাজ মনুষ্যের ত্যাজ্য বা অনাদরণীয় হইতে পারে না, প্রণয়ের অত্যাচার আছে বলিয়াই তাহাও ত্যাজ্য বা অনাদরণীয় হইতে পারে না। অপিচ যেমন্ বাহুবল বা সমাজবলকে অত্যাচারী দেখিয়া তাহাকে পরিত্যক্ত বা অনাদৃত না করিয়া, মনুষ্য ধর্ম্মের দ্বারা তাহার শমতার চেষ্টা পাইয়াছে, প্রণয়ের অত্যাচারও

সেইরূপ ধর্ম্মের দ্বারা শমিত করিতে যত্ন করা কর্ত্তব্য। ধর্ম্মেরও অত্যাচার আছে বটে, এবং ধর্ম্মের অত্যাচার শমতার জন্য যদি আরও কোন শক্তি প্রযুক্তা হয়, তাহারও অত্যাচার ঘটিবে, কেননা অত্যাচার শক্তির স্বভাবসিদ্ধ। যদি ধর্ম্মের অত্যাচার শমতায় সক্ষম কোন শক্তি থাকে, তবে জ্ঞান সেই শক্তি। কিন্তু জ্ঞানেরও অত্যাচার আছে। তাহার উদাহরণ, হিতবাদ এবং প্রত্যক্ষ বাদ। এতদুভয়ের বেগে মনুষ্যহৃদয়-সাগরে অনন্ত ভাগ চড়া পড়িয়া যাইতেছে। বোধ হয় জ্ঞান ব্যতীত জ্ঞানের অত্যাচার শাসনের জন্য অন্য কোন শক্তি যে মনুষ্যকর্ত্তৃক ব্যবহৃত হইবে, এক্ষণে এমন বিবেচনা হয় না।

সেইরূপ ইহাও বলা যাইতে পারে যে, প্রণয়ের দ্বারাই প্রণয়ের অত্যাচার শমিত হওয়াই সম্ভব। এ কথা যথার্থ, স্বীকার করি। স্নেহ যদি স্বার্থপরতাশূন্য হয়, তবে তাহাই ঘটিতে পারে। কিন্তু সাধারণ মনুষ্যের প্রকৃতি এইরূপ যে, স্বার্থপরতাশূন্য স্নেহ দুর্লভ। এই কথার প্রকৃত তাৎপর্য্য গ্রহণ না করিয়া, অনেকেই মনে মনে ইহার প্রতিবাদ করিতে পারেন। তাঁহারা বলিতে পারেন যে, যে মাতা স্নেহবশতঃ পুত্রকে অর্থান্বেষণে যাইতে দিল না—সে কি স্বার্থপর? বরং যদি স্বার্থপর হইত, তাহা হইলে পুত্রকে অর্থান্বেষণে দূরদেশে যাইতে নিষেধ করিত না, কেননা পুত্র অর্থোপার্জ্জন করিলে কোন্ না মাতা তাহার ভাগিনী হইবেন?—অতএব ঐরূপ দর্শনমাত্র আকাঙ্ক্ষী স্নেহকে অনেকেই অস্বার্থপর স্নেহ মনে করেন। বাস্তবিক সে কথা সত্য নহে—এ স্নেহ অস্বার্থপর নহে। যাঁহারা ইহা অস্বার্থপর মনে করেন তাঁহারা অর্থপরতাকে স্বার্থপরতা মনে করেন; যে ধনের কামনা করে না, তাহাকে স্বার্থপরতাশূন্য মনে করেন। ধনলাভ ভিন্ন পৃথিবীতে যে অন্যান্য সুখ আছে, এবং তন্মধ্যে কোন কোন সুখের আকাঙ্ক্ষা ধনাকাঙ্ক্ষা হইতে অধিকতর বেগবতী, তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারেন না। যে মাতা অর্থের মায়া পরিত্যাগ করিয়া, পুত্রমুখ দর্শনসুখের বাসনায় পুত্রকে দারিদ্র্যে সমর্পণ করিল, সেও আত্মসুখ খুঁজিল। সে অর্থজনিত সুখ চায় না, কিন্তু পুত্রসন্দর্শনজনিত সুখ চায়। সে সুখ মাতার, পুত্রের নহে; মাতৃদর্শনজনিত পুত্রের যদি সুখ থাকে, থাক;—সে স্বতন্ত্র, পুত্রের প্রবৃত্তিদায়ক, মাতার নহে। মাতা এখানে আপনার একটি সুখ খুঁজিল—নিত্য পুত্রমুখ দর্শন; তাহার অভিলাষিণী হইয়া পুত্রকে দারিদ্র্য দুঃখে দুঃখী করিতে চাহিল; এখানে, মাতা স্বার্থপর, কেননা আপনার সুখের অভিপ্রায়ে অন্যকে দুঃখী করিল।

মনুষ্যের স্নেহ অধিকাংশই এইরূপ; প্রণয়ী, প্রণয়ভাজন উভয়েরই চিত্ত সুখকর, কিন্তু স্বার্থপর, পশুবৃত্ত। কেবল, প্রণয়ী অন্য সুখাপেক্ষা প্রণয়সুখের অভিলাষী, এইজন্য লোকে এইরূপ স্নেহকে অস্বার্থপর বলে। কিন্তু স্নেহের যে

সুখ, সে স্নেহযুক্তের ; স্নেহযুক্ত আপন সুখের আকাঙ্ক্ষী বলিয়া, সাধারণ মনুষ্য-স্নেহকে স্বার্থপর বৃত্তি বলিতেই হইবে।

কিন্তু স্বার্থসাধন জন্য, স্নেহ মনুষ্য-হৃদয়ে স্থাপিত নহে। মানুষের যতগুলি বৃত্তি আছে, বোধ হয়, সর্ব্বাপেক্ষা এইটি পবিত্র ও মঙ্গলকর। মনুষ্যের চরিত্র এ পর্য্যন্ত তাদৃশ উৎকর্ষলাভ করে নাই বলিয়াই মনুষ্য-স্নেহ অদ্যাপিও পশুবৎ। পশুবৎ, কেননা, পশুদিগেরও বৎসস্নেহ, দাম্পত্যপ্রণয় এবং বাৎসল্য দাম্পত্য ব্যতীত, পরস্পর প্রণয় আছে। প্রথমটি মানুষের অপেক্ষা অল্প পরিমাণে নহে।

স্নেহের যথার্থ স্বরূপই অস্বার্থপরতা। যে মাতা পুত্রের সুখের কামনায়, পুত্রমুখ দর্শন কামনা পরিত্যাগ করিলেন, তিনিই যথার্থ স্নেহবতী। যে প্রণয়ী, প্রণয়ের পাত্রের মঙ্গলার্থ আপনার প্রণয়জনিত সুখভোগও ত্যাগ করিতে পারিল, সেই প্রণয়ী।

যতদিন না সাধারণ মনুষ্যের প্রেম, এইরূপ বিশুদ্ধতা প্রাপ্ত হইবে, ততদিন মানুষের ভালবাসা হইতে অস্বার্থপরতা কলঙ্ক ঘুচিবে না। এবং স্নেহের যথার্থ স্ফূর্ত্তি ঘটিবে না। যেখানে ভালবাসা, এইরূপ বিশুদ্ধি প্রাপ্ত হইবে, বা যাহার হৃদয়ে হইয়াছে, সেইখানে ভালবাসার দ্বারায়, ভালবাসার অত্যাচার নিবারণ হইতে পারে, এবং হইয়াও থাকে। এরূপ বিশুদ্ধ প্রণয়বিশিষ্ট মনুষ্য দুর্লভ নহে। কিন্তু এ প্রবন্ধে তাঁহাদিগের কথাও বলিতেছি না—তাঁহারা অত্যাচারীও নহেন।

অন্যত্র, ধর্ম্মের শাসনে প্রণয় শাসিত করাই ভালবাসার অত্যাচার নিবারণের একমাত্র উপায়। সে ধর্ম্ম কি ?

ধর্ম্মের যিনি যে ব্যাখ্যা করুন না, ধর্ম্ম এক। দুইটি মাত্র মূল সূত্রে সমস্ত মনুষ্যের নীতিশাস্ত্র কথিত হইতে পারে। তাহার মধ্যে একটি আত্মসম্বন্ধীয়, দ্বিতীয়টি পরসম্বন্ধীয়। যাহা আত্মসম্বন্ধীয়, তাহাকে আত্মসংস্কারনীতির মূল বলা যাইতে পারে,—এবং আত্মচিত্তের স্ফূর্ত্তি এবং নির্ম্মলতা রক্ষাই তাহার উদ্দেশ্য। দ্বিতীয়টি, পরসম্বন্ধীয় বলিয়াই তাহাকে যথার্থ ধর্ম্মনীতির মূল বলা যাইতে পারে। "পরের অনিষ্ট করিও না ; সাধ্যানুসারে পরের মঙ্গল করিও।" এই মহতী উক্তি জগতীয় তাবদ্ধর্ম্মশাস্ত্রের একমাত্র মূল, এবং একমাত্র পরিণাম। অন্য যে কোন নৈতিক উক্তি বল না কেন, তাহার আদি ও চরম ইহাতেই বিলীন হইবে। আত্মসংস্কারনীতির সকল তত্ত্বের সহিত, এই মহানীতিতত্ত্বের ঐক্য আছে। এবং পরহিতনীতি এবং আত্মসংস্কারনীতি একই তত্ত্বের ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা মাত্র। পরহিত রতি এবং পরের অহিতে বিরতি, ইহাই সমগ্র নীতিশাস্ত্রের সার উপদেশ।

অতএব এই ধর্ম্মনীতির মূল সূত্রাবলম্বন করিলেই ভালবাসার অত্যাচার নিবারণ হইবে। যখন স্নেহশালী ব্যক্তি স্নেহের পাত্রের কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপণ

করিতে উদ্যত হয়েন, তখন তাঁহার মনে দৃঢ় সঙ্কল্প করা উচিত যে, আমি কেবল আপন সুখের জন্য হস্তক্ষেপণ করিব না ; আপনার ভাবিয়া, যাহার প্রতি স্নেহ করি, তাহার কোন প্রকার অনিষ্ট করিব না। আমার যতটুকু কষ্ট সহ্য করিতে হয়, করিব ; তথাপি তাহার কোন প্রকার অহিতে তাহাকে প্রবৃত্ত করিব না।

এ কথা শুনিতে অতি ক্ষুদ্র, এবং পুরাতন জনশ্রুতির পুনরুক্তি বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু ইহার প্রয়োগ সকল সময়ে তত সহজ বোধ হইবে না। উদাহরণ স্বরূপ, দশরথকৃত রাম-নির্ব্বাসন, মীমাংসার্থ গ্রহণ করিব ; তদ্দ্বারা এই সামান্য নিয়মের প্রয়োগের কঠিনতা অনেকের হৃদয়ঙ্গম হইতে পারিবে। এস্থলে কৈকেয়ী এবং দশরথ উভয়েই ভালবাসার অত্যাচারে প্রবৃত্ত ; কৈকেয়ী দশরথের উপরে ; দশরথ রামের উপরে। ইহার মধ্যে কৈকেয়ীর কার্য্য স্বার্থপর এবং নৃশংস বলিয়া চিরপরিচিত। কৈকেয়ীর কার্য্য স্বার্থপর ও নৃশংস বটে, তবে তৎপ্রতি যতটা কটূক্তি হইয়া আসিতেছে ততটা বিহিত কি না বলা যায় না। কৈকেয়ী আপনার কোন ইষ্ট কামনা করে নাই ; আপনার পুত্রের শুভ কামনা করিয়াছিল। সত্য বটে পুত্রের মঙ্গলেই মাতার মঙ্গল ; কিন্তু যে বঙ্গীয় পিতামাতা, স্বীয় জাতিপাতের ভয়ে পুত্রকে শিক্ষার্থ ইংলণ্ডে যাইতে দেন না, কৈকেয়ীর কার্য্য তদপেক্ষা যে শতগুণে অস্বার্থপর, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই।

সে কথা যাউক, কৈকেয়ীর দোষগুণ বিচারে আমরা প্রবৃত্ত নহি। দশরথ সত্যপালনার্থ রামকে বনপ্রেরণ করিয়া ভরতকে রাজ্যাভিষিক্ত করিলেন। তাহাতে তাঁহার নিজের প্রাণবিয়োগ হইল। তিনি সত্যপালনার্থ আত্মপ্রাণবিয়োগ এবং প্রাণাধিক পুত্রবিরহ স্বীকার করিলেন, ইহাতে ভারতবর্ষীয় সাহিত্যেতিহাস তাঁহার যশোকীর্ত্তনপরিপূর্ণ। কিন্তু উৎকৃষ্ট ধর্ম্মনীতির বিচারে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, দশরথ পুত্রকে স্বাধিকারচ্যুত এবং নির্ব্বাসিত করিয়া, সত্যপালন করায়, ঘোরতর অধর্ম্ম করিয়াছিলেন।

জিজ্ঞাসা করি, সত্য মাত্র কি পালনীয়? যদি সতী কুলবতী, কুচরিত্র পুরুষের কাছে ধর্ম্মত্যাগে প্রতিশ্রুতা হয়, তবে সে সত্য কি পালনীয়? যদি কেহ, দস্যুর প্ররোচনায় সুহৃদ্‌কে বিনা দোষে বধ করিতে সত্য করে, তবে সে সত্য কি পালনীয়? যে কেহ ঘোরতর মহাপাতক করিতে সত্য করে, তাহার সত্য কি পালনীয়?

যেখানে সত্য লঙ্ঘনাপেক্ষা সত্য রক্ষায় অধিক অনিষ্ট, সেখানে সত্য রাখিবে, না সত্য ভঙ্গ করিবে? অনেকে বলিবেন, সেখানেও সত্য পালনীয়, কেননা, সত্য নিত্য ধর্ম্ম, অবস্থাভেদে তাহা পুণ্যত্ব পাপত্ব প্রাপ্ত হয় না। যদি পাপপুণ্যের এমন নিয়ম কর যে, যখন যাহা কর্ম্মকর্ত্তার বিবেচনায় ইষ্টকারক তাহাই কর্ত্তব্য ; যাহা

তাঁহার তাৎকালিক বিবেচনায় অনিষ্টকারক তাহা অকর্ত্তব্য, তবে পুণ্য পাপের প্রভেদ থাকে না—লোকে পুণ্য বলিয়া ঘোরতর মহাপাতকে প্রবৃত্ত হইতে পারে। আমরা এ তত্ত্বের মীমাংসা এ স্থলে করিব না—কেননা হিতবাদীরা ইহার এক প্রকার মীমাংসা করিয়া রাখিয়াছেন। স্থূল কথার উত্তর দিব।

যখন এরূপ মীমাংসার গোলযোগ হইবে, তখন ধর্ম্মনীতির যে মূল সূত্র সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহার দ্বারা পরীক্ষা কর।

সত্য কি সর্ব্বত্র পালনীয়? এ কথার মীমাংসা করিবার আগে জিজ্ঞাস্য, সত্য পালনীয় কেন? সত্যপালনের একটি মূল ধর্ম্মনীতিতে, একটি মূল আত্মসংস্কার-নীতিতে। আমরা আত্মসংস্কার-নীতিকে ধর্ম্মনীতির অংশ বলিয়া পরিগণিত করিয়া অস্বীকার করিয়াছি; ধর্ম্মনীতির মূলই দেখিব। বিশেষ উভয়ের ফল একই। ধর্ম্মনীতির মূল সূত্র, পরের অনিষ্ট যাহাতে হয়, তাহা অকর্ত্তব্য। সত্যভঙ্গে পরের অনিষ্ট হয়, এজন্য সত্য পালনীয়। কিন্তু যখন এমন ঘটে যে, সত্যপালনে পরের গুরুতর অনিষ্ট, সত্যভঙ্গে ততদূর নহে, তখন সত্য পালনীয় নহে। দশরথের সত্যপালনে রামের গুরুতর অনিষ্ট; সত্যভঙ্গে কৈকেয়ীর তাদৃশ কোন অনিষ্ট নাই। দৃষ্টান্তজনিত জনসমাজের যে অনিষ্ট, তাহা রামের স্বাধিকারচ্যুতিতেই গুরুতর। উহা দস্যুতার রূপান্তর। অতএব এমত স্থলে দশরথ সত্যপালন করিয়াই মহাপাপ করিয়াছিলেন।

এখানে দশরথ স্বার্থপরতাশূন্য নহেন। সত্যভঙ্গে জগতে তাঁহার কলঙ্ক ঘোষিত হইবে, এই ভয়েই তিনি রামকে অধিকারচ্যুত এবং বহিষ্কৃত করিলেন; অতএব যশোরক্ষারূপ স্বার্থের বশীভূত হইয়া রামের অনিষ্ট করিলেন। সত্য বটে, তিনি আপনার প্রাণহানিও স্বীকার করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার কাছে প্রাণাপেক্ষা যশঃ প্রিয়, অতএব আপনার ইষ্টই খুঁজিয়াছিলেন। এজন্য তিনি স্বার্থপর। স্বার্থপরতাদোষযুক্ত যে অনিষ্ট তাহা ঘোরতর পাপ।

অস্বার্থপর প্রেম, এবং ধর্ম্ম, ইহাদের একই গতি, একই চরম। উভয়ের সাধ্য অন্যের মঙ্গল। বস্তুতঃ প্রেম, এবং ধর্ম্ম একই পদার্থ। সর্ব্ব সংসার প্রেমের বিষয়ীভূত হইলেই ধর্ম্ম নাম প্রাপ্ত হয়। এবং ধর্ম্ম যত দিন না সর্ব্বজনীন প্রেমস্বরূপ হয়, ততদিন সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না। কিন্তু মনুষ্যগণ, কার্য্যতঃ স্নেহকে ধর্ম্ম হইতে পৃথগ্‌ভূত রাখিয়াছে, এজন্য ভালবাসার অত্যাচার নিবারণ জন্য ধর্ম্মের দ্বারা স্নেহের শাসন আবশ্যক।

১

বাগানে যাবিরে ভাই? চল সবে মিলে যাই,
যথা হর্ম্ম্য সুশোভন, সরোবর তীরে।
যথা ফুটে পাতিপাতি, গোলাব মল্লিকাজাতি,
বিমোহিয়া লতা দোলে মৃদুল সমীরে
নারিকেল বৃক্ষরাজি, চাঁদের কিরণে সাজি,
নাচিছে দোলায়ে মাথা চমকে চমকে।
চন্দ্রকর লেখা তাতে, বিজলি চমকে॥

২

চল যথা কুঞ্জবনে, নাচিবে নাগরীগণে,
রাঙ্গা সাজ পেসোয়াজ, পরশিবে অঙ্গে।
তম্বুরা তবলা চাটি, আবেশে কাঁপিবে মাটী,
সারঙ্গ তরঙ্গ তুলি, সুর দিবে সঙ্গে॥
ঝিনিঝিনিঝিনিঝিনি, ঝিনিকি ঝিনিকি ঝিনি
তাধিম তাধিম তেরে, গাওনা বাজনা।
চমকে চাহনি চারু ঝলকে গহনা॥

৩

ঘরে আছে পদ্মমুখী, কভু না করিল সুখী,
শুধু ভালবাসা নিয়ে, কি হবে সংসারে?
নাহি জানে নৃত্যগীত, ইয়ারকিতে নাহি চিত;
একা বসি ভালবাসা, ভাল লাগে কারে?
গৃহ ধর্ম্মে রাখে মন, হিত ভাবে অনুক্ষণ,
সে বিনা দুঃখের দিনে অন্য গতি নাই।
এ হেন সুখের দিনে, তারে নাহি চাই॥

৪

আছে ধন গৃহপূর্ণ, যৌবন যাইলে তূর্ণ,
যদি না ভুঞ্জিনু সুখ, কি কাজ জীবনে?
ঢেলে মদ্য লও সাতে, যেন না ফুরায় রাত,
সুখের নিশান গাড় প্রমোদ ভবনে।
খাদ্য লও বাছা বাছা, দাড়ি দেখে লও চাচা,
চপ্ সুপ কারি কোর্ম্মা, করিবে বিচিত্র।
বাঙ্গালির দেহরত্ন, ইহাতে করিও যত্ন
ইংরেজ-পাদুকা স্পর্শে, হয়েছে পবিত্র॥
গঠিত ইংরাজি ছাঁচে, আমার চরিত্র॥

৫

বঙ্গ মাতঃ সুরধুনি, কাগজে মহিমা শুনি
বোতল বাহিনী পুণ্যে, একুল নন্দিনি!
করি ঢক ঢক নাদ, পুরাও ভকত সাধ,
লোহিতবরণি বামা, তারেতে বন্দিনি!
প্রণমামি মহানীরে, ছিপির কীরিটি শিরে,
উঠ শিরে ধীরে ধীরে, শরুত জননি!
তোমার কৃপার জন্য, যেই পড়ে সেই ধন্য
শয্যার পতিত নাথ, পতিতপাবনি!
বাক্স বাহনে চল, ভবন ভজনি॥

৬

কি ছার সংসারে আছি, বিষম অরণ্যে মাছি,
মিছা করি ভন্‌ভন্ চাকরি কাঁটালে।
মারে জুতা সই সুখে, লম্বা কথা বলি মুখে,
উচ্চকরি ঘুটি তুলি রেখিলে কাঙ্গালে।

শিখিয়াছি লেখা পড়া, ঠাণ্ডা দেখে হই কড়া,
কথা কই চড়া চড়া, ভিখারী ফকিরে।
বল যত রোখ তত, বাঙ্গালি শরীরে॥

৭

পূর পাত্র মদ্য ঢালি, দাও সবে করতালি,
কেন তুমি দাও গালি, কি দোষ আমার?
দেশের মঙ্গল চাও? কিসে তার ত্রুটি পাও?
লেক্‌চরে কাগজে বলি, কর দেশোদ্ধার।
ইংরেজের নিন্দা করি, আইনের দোষ ধরি,
সম্বাদ পত্রিকা পড়ি, লিখি কভু তায়।
আর কি করিব বল স্বদেশের দায়?

৮

করেছি ডিউটির কাজ, বাজা ভাই পাকোয়াজ
কামিনি গোলাপি সাজ, ভাসি আজ রঙ্গে।
গেলাস পূরে দে মদে, দে দে আর আর দে,
দে দে এরে দে ওরে দে, ছড়ি দে সারঙ্গে।
কোথায় ফুলের মালা? আইস্ দেনা? ভাল জ্বালা
"বংশী বাজায় চিকন কালা?" সুর দাও সঙ্গে।
ইন্দ্র স্বর্গে খায় সুধা, স্বর্গ ছাড়া কি বসুধা?
কত স্বর্গ বাঙ্গালায় মদের তরঙ্গে।
টলমল বসুন্ধরা ভবানী ভ্রূভঙ্গে॥

৯

যে ভাবে দেশের হিত, না বুঝি তাহার চিত,
আত্মহিত ছেড়ে কেবা, পরহিতে চলে।
না জানি দেশ বা কার? দেশে কার উপকার?
আমার কি লাভ বল, দেশ ভাল হলে?
আপনার হিত করি, এত শক্তি নাহি ধরি,
দেশহিত করিব কি, একা ক্ষুদ্র প্রাণী!
ঢাল মদ! তামাক দে! দাও ব্রাণ্ডি পানি।

১০

মনুষ্যত্ব? কারে বলে? স্পিচ দিই টৌনহলে,
লোক আসে দলে দলে, শুনে পায় প্রীত।
নাটক নবেল কত, লিখিয়াছি শত শত,
এ কি নয় মনুষ্যত্ব? নয় দেশহিত?
ইংরেজি বাঙ্গালা কেঁদে, পলিটিক্স লিখি কেঁদে,
পদ্য লিখি নানা ছাঁদে, বেটি সতী দহে।
অশিষ্টে অথবা শিষ্টে, গালি দিই অষ্টপৃষ্ঠে,
তবু বল দেশহিত কিছু নাহি করে?
নিপাত যাউক দেশ! দেখি বসি ঘরে॥

১১

হাঁ! চামেলি কুলিচম্পা! মধুর অধরকম্পা!
হাম্বীর কেদার ছায়া, নট মহাসুর!
হুকা না দুরস্তবোলে! সেতারে সুর না ডোলে।
পিয়ালা ভর দে বুঝে! রঙ্‌ ভরপুর!
সুপ্ চপ্ কটলেট্, আন বাবা প্লেট প্লেট,
কুক্ বেটা কাট্রেট, যত পার খাও!
মাথামুণ্ড পেটে দিলে পড় বাপু জমী নিয়ে,
জনমি বাঙ্গালি কুলে, সুখ করে যাও।
পতিতপাবনি সুরে, পতিতে তরাও॥

১২

যাব ভাই অধঃপাতে, কে যাইবি আয় সাতে,
কি কাজ বাঙ্গালি নাম, রেখে ভূমণ্ডলে?
লেখাপড়া ভস্ম ছাই, কে কবে শিখেছে তাই
লইয়া বাঙ্গালি দেহ, এই বঙ্গস্থলে?
হংসপুচ্ছ লয়ে করে, কেরাণিত্ব কাজ করে,
মুন্সেফি চাপ্রাশি কিম্বা ডিপুটিগিরাদা।
অথবা স্বাধীন হয়ে, ওকালতি পাস লয়ে,
খোষামুদি জুয়াচুরি, শিখিছে জিয়াদা!
সার কথা বলি ভাই, বাঙ্গালিতে কাজ নাই,
কি কাজ সাধিব মোরা, এ সংসারে থাকি,
মনোবৃত্তি আছে যাহা, ইন্দ্রিয় সাগরে তাহা
বিসর্জ্জন করিয়াছি, কিবা আছে বাকি?
কেন দেহভার বয়ে, যমে দাও ফাঁকি?

১৩

ধর তবে গ্লাস খাঁটি, অনন্ত কিবের বাটী
শুন তবলার চাটি, বাজে খন্ খন্।

নাচে বিবি নানাছন্দ, সুন্দর ঘামিয়া গন্ধ,
গম্ভীর জীমূতমন্দ্র হুঁকার গর্জ্জন।
সেজে-এসো সবে ভাই, চল অধঃপাতে যাই,
অধম বাঙ্গালি হতে, হবে কোন কাজ ?
ধরিতে মানুষ দেহ, নাহি করে লাজ ?

১৪

মর্কটের অবতার, রূপ গুণ সব তার,
বাঙ্গালির অধিকার, বাঙ্গালি ভূষণ !
হা ধরণি ! কোন্ পাপে, কোন্ বিধাতার শাপে,
হেন পুত্রগণ গর্ভে, করিলে ধারণ ?
বঙ্গদেশ ডুবাবারে, মেঘে কিম্বা পারাবারে
ছিল না কি জলরাশি ? কে শোষিল নীরে ?
আপনা ধ্বংসিতে রাগে, কতই শকতি লাগে,
নাহিকি শকতি তত, বাঙ্গালি শরীরে ?
কেন আর জ্বলে আলো, বঙ্গের মন্দিরে ?

১৫

মরিবে না ? উঠ তবে, ভাই ভাই মিলি সবে,
লভি নাম পৃথিবীতে, অক্ষয়, অতুল !
ছাড়ি দেহ খেলা ধুলো ! তাস বাস্তাও গুলা
মারি খেদাইয়া দাও, নর্ত্তকীর কুল।
মারিয়া লাঠির বাড়ি, বোতল ভাঙ্গহ পাড়ি,
বাগান ভাঙ্গিয়া ফেল, পুকুরের তলে
সুখ নামে দিয়ে ছাই, দুঃখসার কর ভাই,
কভু না মুছিবে কেহ, নয়নের জলে,
যত দিন রবে দুঃখ, এ বঙ্গ মণ্ডলে।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা

চিত্তবিনোদ কাব্য। শ্রীঈশানচন্দ্র বসু প্রণীত। বর্দ্ধমান অর্য্যমা যন্ত্রে প্রোপ্রাইটর শ্রীহরিমোহন চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত। সন ১২৭৩ সাল। মূল্য ।।৵ দশ আনা।

এই কাব্যখানি ভালও নহে, মন্দও নহে সুতরাং ইহার বিস্তৃত সমালোচন সম্ভব নহে। তবে পাঠ করিতে করিতে দুই পংক্তি পাওয়া গেল তাহাতে বাস্তবিক-চিত্তবিনোদ কোন কোন সময়ে হইতে পারে। যথা—

গঙ্গাজল-বিসর্জ্জিত শবমাংসাস্বাদে
প্রহৃষ্ট জম্বুকগণ হোক্কা হোক্কা নাদে।

কবি মধুসূদনের অনুকরণে সেনাগম বর্ণন করিয়াছেন; অনুকরণ প্রায়ই হাস্যরসোদ্দীপক হইয়া থাকে, নিম্নোদ্ধৃত অংশে সে রূপ হয় নাই, প্রশংসার কথা বটে।

সিন্ধুসহ দ্বন্দ্বী বায়ু দ্বন্দ্ব আরম্ভিলে
ভৈরব কল্লোল নাদ উদ্ভবে যেমন,
তেমনি বিক্রান্ত সৈন্যকুল কোলাহলে,
ঘোরতর বাদ্যনাদে পূরিল কানন—
ভূমি, আচম্বিতে। যেন, সে নিনাদে মাতি
শব্দবাহ, উল্লম্ফিয়া উঠিল আক্রোশে,
অন্তরীক্ষে, অভ্রপুঞ্জে দিতে রে গঞ্জনা।
রুষিয়া অম্বুদবৃন্দ, গম্ভীর নির্ঘোষে—
আবরিল নভঃস্থল, ভীষণ অশনি—
নাদে কম্পে বিশ্বম্ভরা, শঙ্কায় শশাঙ্ক
লুকাইল, তমোরাশি, গ্রাসিল কৌমুদী।

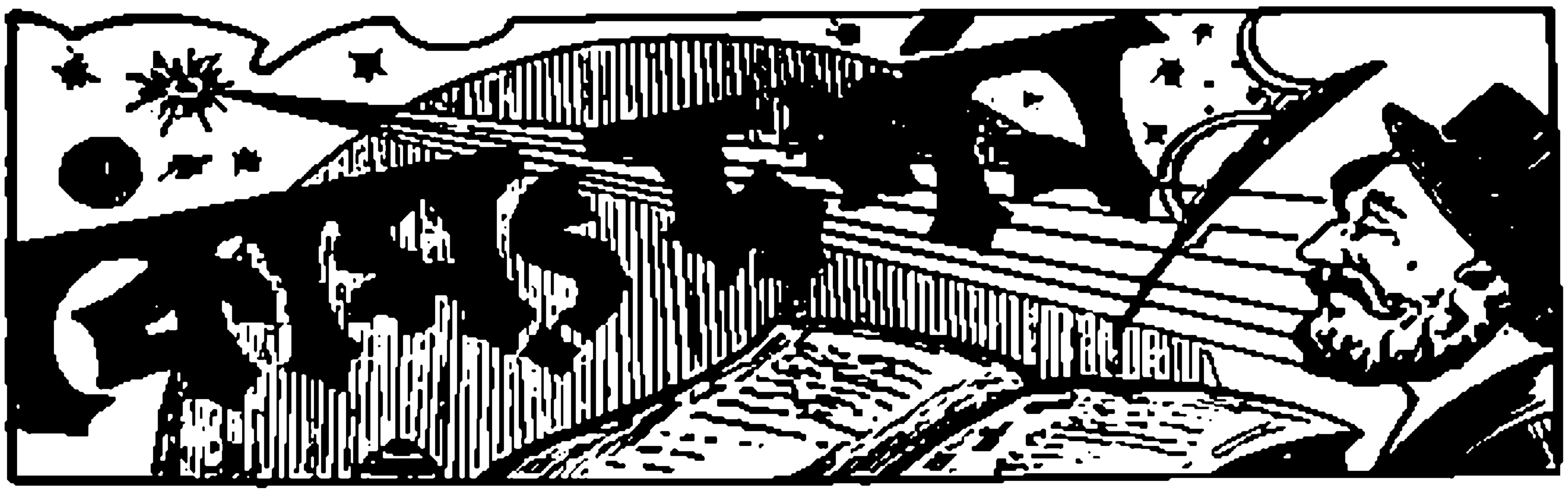

কোমৎ দর্শন লইয়া এক্ষণে এতদ্দেশীয় কৃতবিদ্য সমাজে অনেক আন্দোলন চলিতেছে। কেহ কেহ উক্ত সুপ্রসিদ্ধ ফরাসিস্ পণ্ডিতের মতের প্রতিবাদ চেষ্টা করিতেছেন। কেহ কেহ বা তাঁহাকে গুরু বলিয়া গ্রহণ করিতেছেন। এরূপ অবস্থায় পক্ষপাত পরিত্যাগপূর্ব্বক তদীয় প্রধান প্রধান মতগুলি পর্য্যালোচনা করা আবশ্যক হইতেছে।

কোমত্ কেবল দার্শনিক নহে, তিনি একজন নূতন ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রবর্ত্তক। এই প্রবন্ধে আমরা তদীয় positive philosophy অর্থাৎ "প্রামাণিক দর্শনের" স্থূল স্থূল কথাগুলি বলিব।

কোমত বলেন যে, জগৎকার্য্য সম্বন্ধে মনুষ্য-সমাজে যথাক্রমে তিন প্রকার ব্যাখ্যা অবলম্বিত হইয়া থাকে; প্রথম, পৌরাণিক, আধ্যাত্মিক বা ইচ্ছামূলক; দ্বিতীয়, দার্শনিক, কাল্পনিক বা শক্তিমূলক; তৃতীয়, বৈজ্ঞানিক, প্রামাণিক বা নিয়মমূলক। সকল বিষয়ের জ্ঞানেরই উন্নতিপথে ক্রমান্বয়ে এই তিনটী সোপান আছে।

লোকে যখন প্রথমে বিশ্বব্যাপার বুঝিতে যায়, তখন প্রত্যেক কার্য্যের একটি একটি সচেতন ইচ্ছাবিশিষ্ট কর্ত্তা অনুমান করিয়া থাকে। ইহার একটি গূঢ় কারণ আছে। আমাদিগের জ্ঞান স্ফূর্ত্তি হইতে হইতেই আমরা জানিতে পারি যে, আমরা যে সকল কার্য্য করি, সে সকল আমাদিগের সচেতন ইচ্ছাবিশিষ্ট আত্মা হইতেই সমুদ্ভূত। এ নিমিত্ত প্রথমাবস্থায় যেখানে যে কার্য্য প্রত্যক্ষ করি, সেখানেই সচেতন ইচ্ছাবিশিষ্ট কর্ত্তার কল্পনা করি। এই কারণেই শিশুগণ গতিবিশিষ্ট বা কার্য্যকারী নির্জ্জীব পদার্থদিগকে সজীব জ্ঞান করে। এই কারণেই প্রাচীনকালে মানবগণ প্রচণ্ড ঝটিকা প্রবাহে, ক্ষুব্ধ সিন্ধুসলিলে, তিমিরবিনাশী দিবাকরে, গৃহ কাননগ্রাসী অনল রাশিতে, বিদ্যুন্মালাশোভিত বজ্রগর্জ্জনে, দেবতা দেখিতেন।

এইরূপে পুরাকালে পুরাণবর্ণিত বায়ু, বরুণ, সূর্য্য, অগ্নি, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাগণের সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া, জ্ঞানের প্রথম সোপানকে পৌরাণিক বলা

গিয়াছে ; আর প্রত্যেক ঘটনাতে তাঁহাদিগের জ্ঞান ও ইচ্ছা বিদ্যমান দৃষ্ট হইত বলিয়া, পৌরাণিক ব্যাখ্যাকে আধ্যাত্মিক ও ইচ্ছামূলক আখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

কালে কালে যত জগতের প্রকৃত তত্ত্ব প্রকাশিত হয়, ততই লোকে জানিতে পারে যে, পূর্ব্বে যে সকল পদার্থকে সচেতন বিবেচনা করিয়াছিল, চৈতন্যের পরিচায়ক লক্ষণগুলিই তাহাদিগের নাই। তখন তাহাদিগের দ্বারা কিরূপে কার্য্যসাধন হয় এইরূপ বিতর্ক উপস্থিত হইয়া, স্থিরীকৃত হয় যে তাহাদিগের অন্তর্নিহিত কার্য্যসাধিকা শক্তি আছে। এপ্রকার অনুমান অস্বাভাবিক নহে। ইচ্ছার চৈতন্যাংশ বাদ দিলে, কার্য্যসাধিকা শক্তি ভিন্ন আর কি থাকে ? কিন্তু এতদ্দ্বারা কি কোন কার্য্যের প্রকৃত ব্যাখ্যা হয় ? আদিমাবস্থায় লোকে ভাবে অগ্নি দেবতা, আমাদিগের ন্যায় ইচ্ছাপূর্ব্বক বস্তুনিচয় ধ্বংস করেন ; দ্বিতীয়াবস্থায় লোকে কল্পনা করে যে অগ্নিতে দাহিকা শক্তি আছে, তাহাতেই পদার্থসকল দগ্ধ হয়। কিন্তু অগ্নিতে পদার্থনিচয় দগ্ধ হয়, এতদতিরিক্ত কি জ্ঞান দাহিকাশক্তির নিকটে পাওয়া গেল ? যখন পৌরাণিক মতে অনাস্থা জন্মিয়া দর্শনশাস্ত্রের আলোচনার আরম্ভ হয়, তখন ঈদৃশ শক্তিসকল বহুলপরিমাণে কল্পিত হয় বলিয়া, জ্ঞানের দ্বিতীয় সোপানের নাম দার্শনিক, কাল্পনিক বা শক্তিমূলক রাখা হইয়াছে।

পরিণামে অনেক দেখিয়া শুনিয়া লোকে অবগত হয় যে, সকল কার্য্যেরই নিয়ম আছে ; অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট পূর্ব্বোত্তরত্ব এবং সাদৃশ্য সম্বন্ধ আছে। নিয়মাতিরিক্ত আর কিছুই জানিবার ক্ষমতা আমাদিগের নাই, এইরূপ বিবেচনা করিয়া যখন আমরা কোন বিষয়ে অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এবং কার্য্যসাধিকা শক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিয়মানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই, তখনই আমরা তদ্বিষয়ের বৈজ্ঞানিক সোপানে উপস্থিত হই। নিয়মই বিজ্ঞানের প্রধান লক্ষ্য, এবং বিজ্ঞান পদে পদে প্রমাণ চায়। এ নিমিত্ত জ্ঞানের চরম সোপানের নাম বৈজ্ঞানিক, প্রামাণিক, বা নিয়মমূলক বলিয়া নির্দ্দেশ করা গিয়াছে।

কোম্‌ত বলেন যে বিশ্বমণ্ডলের সকল বস্তুই নিয়মের অধীন। আকাশে যে ধূমকেতু কখন কখন দেখা যায়, আর মানুষের মনে যখন যে ইচ্ছা উদিত হয়, সকলই নিয়মের অধীন। পৃথিবীতে লোকের পদাঘাতে যে রেণুরাশি উড়িতে থাকে, নভোমণ্ডলে যে অসংখ্য জ্যোতিষ্কগণ বিরাজিত, মনুষ্য-সমাজে যখন যে ঘটনা ঘটে, সকলই নিয়মের অধীন। উল্কা ছুটিতেছে, মেঘ উঠিতেছে, পাখী উড়িতেছে, মৎস্য সন্তরণ করিতেছে, মানব-সন্তান হাসিতেছে, কাঁদিতেছে, নাচিতেছে, গাইতেছে, সমাজবিশেষের উদয়, উন্নতি বা বিলয় হইতেছে, সকলই নিয়মানুসারে। কিন্তু কোম্‌ত যদিও নিয়ম-ভক্ত, তথাপি তিনি অদৃষ্টবাদী নহেন। তিনি বলেন, বিজ্ঞানের অধিকার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তৎপ্রতি অদৃষ্টবাদ দোষ যে আরোপিত হইবে,

ইহা আশ্চর্য্য নহে। কারণ, যখন কোন প্রকার কার্য্য ইচ্ছার অধিকার হইতে নিয়মের অধিকারে আইসে, নিয়মের স্থৈর্য্য ইচ্ছার অস্থিরতার সহিত তুলনায় এত অবিচলিত লক্ষিত হয় যে, অদৃষ্টশাসনবৎ প্রতীয়মান হইবারই কথা। প্রথমে গগনের জ্যোতিষ্কগণের গতি হইতে নৈসর্গিক নিয়মের যে প্রকার জ্ঞান লাভ হয়, তাহাতেও এইরূপ ভ্রান্তি হইবারই সম্ভাবনা; যেহেতু যত কেন ইচ্ছা করি না, আমরা তাহাদিগের গতি পরিবর্ত্তন করিতে সক্ষম নহি। যদিও প্রকৃতির নিয়মাবলী অপরিবর্ত্তনীয়, তথাপি জ্যোতিশাধিকার-বহির্ভূত জগৎ-কার্য্যসকল অনেক দূর পরিবর্ত্তনীয়। তাপ, তড়িৎ প্রভৃতি পদার্থ, রাসায়নিক প্রক্রিয়া, বিবিধ প্রকার জীব, এবং সামাজিক ঘটনা, কত দূর মনুষ্যের ক্ষমতাধীন, প্রতিদিনই দৃষ্ট হইতেছে।* যদিও নিয়মানুসারে সকলই ঘটে, তথাপি ইচ্ছানুসারে তাপ, তড়িৎ প্রভৃতি কমাইয়া বাড়াইয়া, রাসায়নিক প্রক্রিয়াবিশেষ অবলম্বন করিয়া, জীব-বিশেষকে কার্য্যবিশেষে নিয়োগ করিয়া, কোনরূপ সমাজসংস্কার কার্য্যের সূচনা করিয়া অভিমতানুরূপ সংযোগ বিয়োগ দ্বারা মানবগণ জগতে কত প্রকার পরিবর্ত্তন সংঘটন করিতেছে।

কোম্‌ত যদিও বিবেচনা করেন যে জগৎ-কার্য্য এবং তদীয় নিয়ম এতদ্ব্যতিরিক্ত আর কিছুই জানিবার অধিকার আমাদিগের নাই, যদিও তিনি বলেন জগতের মূলকারণ ও চরম লক্ষ্য অপরিজ্ঞেয়, তথাপি তিনি নাস্তিক নহেন। তাঁহার মতে নাস্তিকেরা অজ্ঞেয় বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত; তাহারা জগতের উৎপত্তি, জীবের উৎপত্তি প্রভৃতি অননুসন্ধেয় ব্যাপার লইয়া ব্যস্ত। তিনি কহেন যে, যদি নৈসর্গিক নিয়মাতিরিক্ত জগৎকার্য্য শৃঙ্খলসমুৎপাদক গূঢ় কারণের তত্ত্বানুসন্ধান কর, তাহা হইলে তন্নিহিত বা তদ্বহিঃস্থ ইচ্ছাবিশেষ কল্পনা করা যেমন সঙ্গত এমন আর কিছুই নহে; কারণ, এরূপ অনুমান দ্বারা আমাদিগের কার্য্যসম্ভবা ইচ্ছার সহিত তাহার সাদৃশ্য রক্ষিত হয়। দার্শনিকশিক্ষাজনিত অহঙ্কার না থাকিলে, কেহই এমন সহজ ব্যাখ্যা পরিত্যাগ করিয়া অন্যরূপ কষ্টকল্পনা করিতে যাইত না; এবং যতদিন না লোকে নির্ব্বিকল্পক সত্যানুসন্ধানের নিষ্ফলতা বুঝিয়াছিল, ততদিন এই ব্যাখ্যাতেই মনুষ্যবুদ্ধি সন্তুষ্ট ছিল। কোম্‌তের বিবেচনায় প্রকৃতির পদ্ধতিতে নিঃসন্দেহ অনেক দোষ আছে; কিন্তু সচেতন ইচ্ছা হইতে ইহার উৎপত্তি হইয়াছে, এ অনুমানটি যেমন সঙ্গত, অচেতন যন্ত্রবাদ তেমন নহে। সুতরাং তিনি বলেন যে নাস্তিকেরা পৌরাণিকদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা যুক্তিহীন; কারণ, তাহারা

---

* See general view of Positivism translated from the French of Auguste Comte by J. H. Bridges, pages 57 and 58.

পৌরাণিক বিষয় লইয়া ব্যস্ত, অথচ তত্ত্বপযোগী অনুসন্ধান-প্রণালী পরিত্যাগ করিয়াছে। •

কোম্‌ত প্রকৃতির পদ্ধতিতে কিরূপে দোষারোপ করেন, আমরা বুঝিতে পারি না। তাঁহার চক্ষে যাহা দোষ বলিয়া লাগে, তাহাই কি প্রকৃত দোষ? বিজ্ঞানবিৎ ও বহুদর্শী হইয়া তিনি কি প্রকারে এরূপ অযৌক্তিক মত প্রচার. করিলেন? আমরা জগতের একদেশ মাত্র দেখিতেছি, তত্ত্বপযোগী যাহা লক্ষিত না হয়, সমুদয় বিশ্বমণ্ডল সম্বন্ধে তাহার অস্তিত্বের আবশ্যকতা নাই, আমরা কি সাহসে বলিব? যদি বলিতে যাই, তাহা হইলে কি আমরা ধরিয়া লই না যে আমরা সকল বস্তুর বা প্রাকৃতিক কার্য্যের চরম উদ্দেশ্য জানি? যাহারা বিবেচনা করে যে সূর্য্য, চন্দ্র, তারা আমাদিগকে আলোক প্রদান করিবার জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে, প্রকৃতির কার্য্যে দোষারোপ করিয়া কি কোম্‌ত তাহাদিগের দলে পড়িতেছেন না?

জগতীস্থ সমস্ত ব্যাপারই যে নিয়মের অধীন, কোম্‌ত যদিও এ মতের প্রতিপোষক অনেক কথা বলিয়াছেন, তথাপি তিনি ইহার সংস্থাপক নহেন। বহুকাল হইতে বিজ্ঞানবিৎ সমাজে এ মতটী চলিয়া আসিতেছে; এবং বহুবিস্তীর্ণ পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষাদ্বারা ইহা সংস্থাপিত হইয়াছে। এক একটী নৈসর্গিক নিয়মের আবিষ্ক্রিয়া ইহার এক একটী মূল; এবং প্রাচীন কাল হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত অনেক প্রতিভাশালী ব্যক্তির যত্নে ইহার পুষ্টিসাধন হইয়াছে। কিন্তু বিগত তিন

• "If we insist upon penetrating the unattainable mystery of the essential Cause that produces phenomena, there is no hypothesis more satisfactory than that they proceed from Wills dwelling in them or outside them; an hypothesis which assimilates them to effect, produced by the desires which exist within ourselves. Were it not for the pride induced by metaphysical and scientific studies it would be inconceivable that any atheist ancient or modern should have believed that his vague hyphothesis on such a subject were preferable to this direct mode of explanation. And it was the only mode which really satisfied the reason, until men began to see the utter inanity and inutility of all search for absolute truth. The order of Nature is doubtless very imperfect in every respect; but its production is far more compatible with the hyphothesis of an Intelligent-Will than with that of a blind mechanism. Persistent atheists therefore would seem to be the most illogical of theologists, because they occupy themselves with theological problems and yet reject the only appropriate method of handling them." General view of Positivism p. 50.

শত বৎসরের মধ্যে ইহার প্রভাবের অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে। গালিলিও গতির নিয়ম, এবং নিউটন মাধ্যাকর্ষণ, আবিষ্কার করিয়া দেখাইয়াছেন যে গগনমণ্ডলস্থ জ্যোতিষ্কগণ নিয়ম শৃঙ্খলে বদ্ধ। লাভইসর, ডেবি, ফ্যারাডে, ড্যাল্টন প্রভৃতির যত্নে প্রকাশিত হইয়াছে যে-পদার্থসকল নির্দ্দিষ্ট নিয়মে সংযুক্ত বিযুক্ত হয়। বিশা (Bichat), গল (Gall) প্রভৃতির পরীক্ষা দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে, শারীরিক যন্ত্রনিচয়ের কার্য্যসকলও নিয়মের অধীন। অর্থশাস্ত্রবিৎ, নীতিশাস্ত্রবিৎ এবং ইতিহাসবিৎ পণ্ডিতেরা সামাজিক ঘটনাসমূহের নিয়মপরতন্ত্রতা প্রদর্শন করিয়াছেন। এইরূপে বিজ্ঞানবেত্তৃদলে এই সংস্কারটী দৃঢ়ীভূত হইয়াছে যে সূক্ষ্মতম পরমাণু হইতে বৃহত্তম জ্যোতিষ্কমণ্ডল পর্য্যন্ত, নির্জ্জীব ধূলীকণা হইতে বুদ্ধিশালী মনুষ্য মনের চিন্তা পর্য্যন্ত, সমুদয় বিশ্ব ব্যাপারই নিয়মের অধীন।

আমরা জগৎ-কার্য্য সম্বন্ধে যথাক্রমে তিন প্রকার ব্যাখ্যা অবলম্বন করি এ মতটীও সম্পূর্ণরূপে নূতন নহে। হিউম্ এবং তুর্গোর গ্রন্থে ইহার আভাস পাওয়া যায়। [See Hume's Natural History of Religion and Turgot's Sur les Progres successifs de l'esprit humain] কিন্তু কোম্‌ত যেরূপ নানাপ্রকার ঘটনার ব্যাখ্যা এতদ্দ্বারা করিয়াছেন, সেরূপ আর কেহই করেন নাই; এবং ইহার কীদৃশ বহুবিস্তীর্ণ প্রয়োগস্থল আছে, আর কেহই বিশদরূপে বুঝিয়াছিলেন কিনা সন্দেহ। সুতরাং সম্পূর্ণরূপ নূতন না হউক কোম্‌ত যে ইহাকে অনেক নূতনত্ব দিয়া নিজস্ব করিয়া লইয়াছেন এবং একপ্রকার যে তিনি ইহার প্রকাশক নামের অধিকারী, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ সূর্য্যকে পরিবেষ্টন করিয়া ঘুরিতেছে, পিথাগোরস্ এবং আর্য্যভট্ট যদিও পূর্ব্বকালে একথা কহিয়াছিলেন, তথাপি কোপর্নিকস এতৎ সংক্রান্ত প্রবল যুক্তি ও প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন বলিয়া যেরূপ সৌরকেন্দ্রিক জ্যোতিষিক মত সংস্থাপক রূপে পরিগণিত, তদ্রূপ জ্ঞানোন্নতি বিষয়ক সোপানত্রয়ের আভাস হিউম্ এবং তুর্গোর লিখিত প্রবন্ধে লক্ষিত হইলেও কোম্‌তকে উহার সংস্থাপক বলিয়া গণ্য করিতে হইবে।

জ্ঞানানুশীলনের প্রারম্ভ সময়ে সমুদায় বিজ্ঞানশাখার সমান অবস্থা ছিল; সর্ব্বত্রই পৌরাণিক ব্যাখ্যা অবলম্বিত হইত। কিন্তু সমকালে সকল শাখা সমান উন্নতিলাভ করিতে পারে নাই। কোনটা বৈজ্ঞানিক সোপানে উঠিয়াছে, কোনটা দার্শনিক সোপানে; কোনটা বা পৌরাণিক সোপানেই পড়িয়া রহিয়াছে। কোম্‌ত বলেন, যাহার বিষয় যত সরল তাহা তত শীঘ্র বৈজ্ঞানিক সোপানে উপস্থিত হইয়াছে। বিষয়ের জটিলতা নিবন্ধন কোনটা বা দার্শনিক, কোনটা বা পৌরাণিক সোপানেই আছে। এইরূপে দৃষ্ট হয় যে একই ব্যক্তির কোন বিষয়ে বৈজ্ঞানিক মত,

কোন বিষয়ে দার্শনিক মত, এবং কোন বিষয়ে পৌরাণিক মত। জাতিভেদেও ভিন্ন ভিন্ন ফল লক্ষিত হয়। যে বিষয়ে জাতিবিশেষের বৈজ্ঞানিক মত, তদ্বিষয়েই জাত্যন্তরের দার্শনিক বা পৌরাণিক মত। এইপ্রকারে সংসারে অনেক মতবৈষম্য ঘটিয়াছে। প্রথমে যেমন সকল বিষয়ে, পৌরাণিক ব্যাখ্যা গৃহীত হইত বলিয়া লোকসমাজে ঐকমত্য ছিল, পরিশেষে কোম্‌তের বিবেচনায় বিজ্ঞান দ্বারা তদ্রূপ একতাসংস্থাপিত হইবে। যে সকল শাস্ত্র সম্যক্‌রূপে বৈজ্ঞানিক পদ পাইয়াছে, পণ্ডিত সমাজে তাহাদিগের সম্বন্ধে মতভেদ অত্যল্পই দেখা যায়; যৎকিঞ্চিৎ যাহা দৃষ্ট হয় তাহাও বিষয়ের জটিলতার ফল। ক্রমেই বিজ্ঞানের অধিকার বাড়িতেছে, এবং দর্শন ও পুরাণের অধিকার কমিতেছে সুতরাং এরূপ আশা করা অন্যায় নহে যে কালক্রমে বিজয়ী বিজ্ঞানের রাজ্য সর্ব্বব্যাপ্ত হইয়া সর্ব্বত্র ঐকমত্য বিধান করিবে।

ভূমণ্ডলের বর্ত্তমান অবস্থা এবং ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টি করিলে, সাধারণতঃ কোম্‌তের মতের সত্যতা অনেক দূর দেখা যায়। জ্ঞানবিভূষিত ইউরোপখণ্ডে গণিত, জ্যোতিষ, পদার্থতত্ত্ব ও রসায়ন বৈজ্ঞানিক সোপানে উঠিয়াছে; কিন্তু শারীরতত্ত্ব এবং সমাজতত্ত্বের অনেকাংশ দার্শনিক বা পৌরাণিক সোপানে রহিয়াছে। এতদ্দেশে কেহ চন্দ্র সূর্য্যকে দেবতা জ্ঞান করিয়া তাহাদিগের উপাসনা করিতেছেন, কেহ তাহাদিগকে জড় বিবেচনা করিয়াও তাহাদিগের শুভাশুভ ফলবিধায়িনী শক্তিতে প্রত্যয় স্থাপনা করেন, এবং কেহ বা তাহাদিগের আকার, গতি প্রভৃতি জানিয়াই সন্তুষ্ট। ভারতবর্ষে জল প্রথমে বরুণ দেবের আবাস বলিয়া গণ্য হইত; পরে স্নেহশক্তিসম্পন্ন বলিয়া তাহার কার্য্যকলাপের ব্যাখ্যা হইত; এক্ষণে উদজান ও অম্লজানের সমষ্টি বলিয়া উহা শিক্ষিত সমাজে পরিগৃহীত। অগ্নি পূর্ব্বে দেবতা ছিলেন, পরে দাহিকাশক্তিশালী বলিয়া দহননিপুণ হইয়াছিলেন; এক্ষণে রাসায়নিক কার্য্যবিশেষের ফল বলিয়া পরিচিত।

কিন্তু ভাল করিয়া কোম্‌তের মত বুঝিতে হইলে তদীয় বিজ্ঞান বিভাগের প্রতি দৃষ্টি করা আবশ্যক। তিনি বলেন যে বিজ্ঞানসকল দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, ১ মুখ্য বা সামান্য এবং ২ গৌণ বা বিশেষ। সম্ভবস্থল মাত্রে খাটিবে, এরূপ নিয়মাবলীর আবিষ্কার করা মুখ্য বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য, এবং এই সকল নিয়ম দ্বারা বর্ত্তমান পদার্থপুঞ্জের প্রকৃত ইতিবৃত্ত ব্যাখ্যা করা গৌণ বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য।* সুতরাং জানা যাইতেছে যে শারীরতত্ত্ব মুখ্য বিজ্ঞান, কিন্তু উদ্ভিজ্জবিদ্যা এবং প্রাণি-

---

* "We must distinguish between the two classes of natural science:—the abstract or general which have for their object the discovery of the laws which regulate phenomena in all concievable cases and the concrete, particular, or descriptive, which are some-

বিদ্যা গৌণ বিজ্ঞান ; রসায়ন মুখ্য বিজ্ঞান এবং খনিজবিদ্যা গৌণ বিজ্ঞান ইত্যাদি। প্রত্যেক গৌণ বিজ্ঞানে অনেকগুলি মুখ্য বিজ্ঞানের সাহায্য লাগে। উদ্ভিজ্জবিদ্যা এবং প্রাণিবিদ্যা অধ্যয়ন করিতে হইলে কেবল শারীরতত্ত্ব জানিলে চলিবে না। উদ্ভিদ্ এবং জীবদেহে তাপাদির কার্য্য বুঝিতে পদার্থতত্ত্ব, পুষ্টিসাধনাদি বুঝিতে রসায়ন, এবং বর্ত্তমান জীবোদ্ভিদ্গণের সংস্থান ও গুণসকল বুঝিতে মনুষ্য-প্রভাব-প্রকাশক সমাজতত্ত্ব জানা আবশ্যক। এইরূপ খনিজবিদ্যা শিক্ষা করিতে হইলে রসায়ন, পদার্থতত্ত্ব এবং শারীরতত্ত্ব জানা চাই। পাথুরিয়া কয়লাও একটি খনিজ পদার্থ, কিন্তু পদার্থতত্ত্ব ও শারীরতত্ত্ব না জানিলে কে উহার প্রকৃতি এবং উপাদান প্রভৃতি নির্ণয় করিতে পারে ?

মুখ্য বিজ্ঞানদিগকে আবার পরস্পরের সাপেক্ষতা অবলম্বন করিয়া কোম্‌ত শ্রেণীবদ্ধ করিয়াছেন প্রথম স্থান তিনি গণিতকে দিয়াছেন ; কারণ, ইহার বিষয় সংখ্যা, বিস্তৃতি ও গতি, এবং এ সকলের তত্ত্বানুসন্ধান করিতে অন্য কোন বিজ্ঞানের সাহায্য আবশ্যক করে না। তাঁহার মতে, জ্যোতিষ দ্বিতীয় স্থানের যোগ্য, কারণ, ইহাতে গাণিতিক তত্ত্বাতিরিক্ত মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম মাত্র লইতে হয়। তৃতীয় স্থান পদার্থতত্ত্বকে প্রদত্ত হইয়াছে ; যেহেতু উহাতে গণিতের সাহায্য আবশ্যক এবং মাধ্যাকর্ষণজনিত গুরুত্বাতিরিক্ত তাপ, তাড়িত, শব্দ প্রভৃতির তত্ত্ব নির্ণীত হয়। চতুর্থ স্থানে রসায়ন সংস্থাপিত হইয়াছে ; কেননা, তাপতাড়িতাদির সহায়তায় পদার্থসংযোগের নিয়মাবলী নিরূপণ করাই রসায়নের উদ্দেশ্য। পঞ্চম স্থানে শারীরতত্ত্ব সন্নিবেশিত হইয়াছে ; কারণ ইহাতে রাসায়নিক কার্য্যাতিরিক্ত অনেক দৈহিক ব্যাপারের মীমাংসা করিতে হয়। ষষ্ঠ স্থান সমাজতত্ত্বকে দেওয়া হইয়াছে ; কারণ, শারীরিক তত্ত্বনিচয়কে মূল করিয়া সামাজিক নিয়মাবলীর ব্যাখ্যা করাই ইহার অভিপ্রায়। সপ্তম স্থানে নীতিতত্ত্ব রক্ষিত হইয়াছে ; কারণ, প্রত্যেক ব্যক্তির সহিত সমাজের সম্বন্ধ নিরূপণ করাই ইহার প্রধান লক্ষ্য। বিজ্ঞানশাখাগুলির পরস্পর সাপেক্ষতানুসারে শ্রেণীবন্ধনের প্রতি দৃষ্টি করিলেই প্রতীতি হইবে যে, যাহার বিষয় যত জটিল তাহাই তত অন্য সাপেক্ষ, এবং যাহার বিষয় যত সরল তাহাই তত অন্যনিরপেক্ষ। গণিতের বিষয় সর্ব্বাপেক্ষা সরল ; এবং গণিতই সর্ব্বনিরপেক্ষ। নীতিতত্ত্বের বিষয় সর্ব্বাপেক্ষা জটিল, এবং নীতিতত্ত্বই সর্ব্বসাপেক্ষ। অন্যান্য বিজ্ঞানশাখাগুলি জটিলতার তারতম্যানুরূপ অপরসাপেক্ষ।

---

times called natural science in a restricted sense, whose function it is to apply these laws to the actual history of existing beings."—Positive Philosophy, freely translated and condensed by Harriet Martineau.

কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিলেই বুঝা যায় যে, যে বিজ্ঞানশাখা যত দূর অন্য সাপেক্ষ তাহা তত বিলম্বে বৈজ্ঞানিক সোপানে আরোহণ করিবে। ইতিহাসও এইরূপ সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে, গণিতই সর্ব্বাগ্রে বৈজ্ঞানিক সোপানে উঠিয়াছে ; তদনন্তর জ্যোতিষ ; তারপর পদার্থতত্ত্ব ; তৎপরে রসায়ন। শারীরতত্ত্বের কিয়দংশ মাত্র বৈজ্ঞানিক পদে উন্নত হইয়াছে ; সমাজতত্ত্ব এবং নীতিতত্ত্ব প্রায় সর্ব্বত্রই পৌরাণিক বা দার্শনিক সোপানে পড়িয়া রহিয়াছে। কালসহকারে বিজ্ঞানশাখা নিচয়ের যে প্রকার উন্নতি হইয়াছে, তাহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে যাহার বিষয় যত সরল তাহা তত শীঘ্র বৈজ্ঞানিক সোপানে উত্তীর্ণ হয়।

কোম্‌ত মুখ্য বিজ্ঞানগুলিকে যেরূপে শ্রেণীবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাতে দুইটি দোষ দৃষ্ট হয় ; প্রথম এই যে তিনি অন্যায় পূর্ব্বক জ্যোতিষকে মুখ্য বিজ্ঞানদলভুক্ত করিয়াছেন, দ্বিতীয় এই যে তিনি মনস্তত্ত্বকে অবিবেচনা পূর্ব্বক উক্ত দলে স্থান দেন নাই। তিনি যখন বলিয়াছেন যে, বর্ত্তমান পদার্থপুঞ্জের প্রকৃত ইতিবৃত্ত ব্যাখ্যা করা গৌণবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য, এবং যখন তিনি এই কারণে খনিজবিদ্যা, উদ্ভিজ্জবিদ্যা, এবং প্রাণিবিদ্যাকে গৌণবিজ্ঞানশ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন, তখন তিনি কি প্রকারে জ্যোতির্ব্বিদ্যাকে গৌণবিজ্ঞান না বলিবেন ? বর্ত্তমান সূর্য্য, গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু এবং তারকাপুঞ্জের প্রকৃত ইতিবৃত্ত ব্যাখ্যা করাই জ্যোতিষের উদ্দেশ্য। যদি বল সম্ভবস্থল মাত্রে খাটে এরূপ মাধ্যাকর্ষণ নিয়ম নির্ণয়ও জ্যোতিষের কার্য্য, আমাদিগের বিবেচনায় এটি ভ্রম। গণিতের যে ভাগ দ্বারা গতির নিয়মাবলী নির্ণীত হয়, মাধ্যাকর্ষণ তাহারই আলোচ্য একটি বিষয় মাত্র।

আমাদিগের বোধ হয় যে সমাজতত্ত্বের অব্যবহিত পূর্ব্বেই মনস্তত্ত্ব সংস্থাপন করা আবশ্যক। কেবল কতকগুলি শরীরীর সংযোগে সমাজ সংগঠিত হয় না। কাননে অসংখ্য তরুলতা একত্রে আছে ; কিন্তু সেখানে আমরা সমাজের অস্তিত্ব স্বীকার করি না। যেখানে আমরা মনের সহিত মনের ঘাত প্রতিঘাত উপলব্ধি করি, যেখানে অনেকের মন একত্রিত হইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত দেখি সেখানেই কেবল আমরা সমাজ আছে বলিয়া থাকি। অতএব যে মন সমাজের মূলস্বরূপ, তদ্বিষয়ক বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সংগ্রহ না হইলে সমাজতত্ত্বের ভিত্তি নির্ম্মাণই হয় না। সুতরাং সমাজতত্ত্বের পূর্ব্বে মনস্তত্ত্ব সন্নিবেশ করা চাই। আবারও ভাবিয়া দেখ, শরীরী মাত্রেই মনবিশিষ্ট নহে। জন্ম, পুষ্টিসাধন, বংশ বৃদ্ধি, মৃত্যু প্রভৃতি শরীরী সকলেরই আছে ; কিন্তু অর্দ্ধেকের প্রায়, অর্থাৎ উদ্ভিজ্জদলের কাহারও, মন নাই। সুতরাং শরীরী মাত্রের সাধারণ তত্ত্বগুলি শারীরতত্ত্ব বিজ্ঞানের বিষয় রাখিয়া মানসিকতত্ত্ব সমুদায় লইয়া একটি বিজ্ঞানশাখা সংস্থাপন করা উচিত। এতৎসম্বন্ধে

আরও একটি কথা বলা যাইতে পারে। গণিত হইতে শারীরতত্ব পর্য্যন্ত সকল শাস্ত্রের তথ্য নির্ণয়ার্থে আমরা কেবল বহিরিন্দ্রিয়সাপেক্ষ। মনস্তত্বানুসন্ধানার্থে আমরা একটি নূতন যন্ত্র পাইতেছি; সেটি আমাদিগের অন্তরিন্দ্রিয়। কোম্‌ত বলেন যে আন্তরিক ঘটনা পর্য্যবেক্ষণ করিবার শক্তি আমাদিগের নাই; কারণ, যখনই আমরা কোন মানসিক ব্যাপারের প্রতি লক্ষ্য করিতে যাই তখনই তাহা বিলীন হইয়া যায়। এ বিষয়ে আমাদিগের উত্তর এই, যখন আমরা প্রতিক্ষণে জানিতে পারিতেছি যে আমাদিগের মনে সুখ দুঃখ কি কোনরূপ চিন্তা উদিত হইয়াছে, তখন আমাদিগের আপন আপন মানসিক ব্যাপার পর্য্যবেক্ষণ করিবার ক্ষমতা আমাদিগের কিয়ৎপরিমাণে আছে, তাহার সন্দেহ নাই। আর ইহাও কাহারও অবিদিত নাই যে স্মৃতি দ্বারা বিগত মানসিক অবস্থার জ্ঞান অনেক দূর লাভ করা যায়। সুতরাং অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা মনস্তত্ব সম্বন্ধীয় সত্য নির্ণয় বিষয়ে কোম্‌তের আপত্তি বিফল হইতেছে।

কোম্‌তের মতে, জ্ঞানোপার্জ্জনের উপায় তিনটি; পর্য্যবেক্ষণ, পরীক্ষা এবং উপমা। যখন যে নৈসর্গিক ব্যাপার স্বতঃ আমাদিগের ইন্দ্রিয়গোচর হয়, তাহার পর্য্যালোচনাকে পর্য্যবেক্ষণ বলে। ইচ্ছাপূর্ব্বক অবস্থা পরিবর্ত্তন করিয়া কোন বিষয়ের পর্য্যালোচনাকে পরীক্ষা কহে। অনুসন্ধেয় তত্বটি বিশদ করিয়া বুঝিবার জন্ত দেশকালপাত্রভেদে তদীয় পর্য্যালোচনাকে উপমা বলে। আমাদিগের বোধ হয় যে অন্তরিন্দ্রিয় গোচর বলিয়া আমাদিগের মানসিক ব্যাপারও পর্য্যবেক্ষণের বিষয়; এবং উপমাটি একপ্রকার কৌশল-প্রতিষ্ঠিত পরীক্ষামাত্র। কোম্‌ত দেখাইয়াছেন যে, বিষয়ের জটিলতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তত্ব নিরূপণের উপায়বৃদ্ধি ঘটে। গণিতে পর্য্যবেক্ষণ করিতে হয় কিনা আমরা বুঝিতে পারি না। জ্যোতিষে কেবল চক্ষুদ্বারা পর্য্যবেক্ষণ করিতে হয়। পদার্থতত্ব এবং রসায়নে সমুদায় ইন্দ্রিয়ের সহযোগে পর্য্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষা চলে। শারীরতত্ব, সমাজতত্ব এবং নীতিতত্বে পর্য্যবেক্ষণ, পরীক্ষা, এবং উপমা তিনটিরই অনেক স্থল ঘটে। কোম্‌ত যদি মনস্তত্ব পরিত্যাগ না করিতেন, তাহা হইলে তিনি যে আর একটি তত্বনির্ণায়ক উপায়ের বিশেষ উল্লেখ করিতেন, ইহা বলা পুনরুক্তি মাত্র।

সেকাল আর একাল

জগদীশ্বর কৃপায়, ঊনবিংশ শতাব্দীতে আধুনিক বাঙ্গালি নামে এক অদ্ভুত জন্তু এই জগতে দেখা দিয়াছে। পশুতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা পরীক্ষাদ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, এই জন্তু বাহ্যতঃ মনুষ্য-লক্ষণাক্রান্ত; হস্তে পদে পাঁচ পাঁচ অঙ্গুলি, লাঙ্গুল নাই, এবং অস্থি ও মস্তিষ্ক "বাইমেনা" জাতির সদৃশ বটে। তবে অন্তঃস্বভাব সম্বন্ধে সেরূপ নিশ্চয়তা এখনও হয় নাই। কেহ কেহ বলেন, ইহারা অন্তঃসম্বন্ধেও মনুষ্য বটে, কেহ কেহ বলেন, ইহারা বাহিরে মনুষ্য, এবং অন্তরে পশু। এই তত্ত্বের মীমাংসা জন্য শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু ১৭৯৪ শকের চৈত্রমাসে বক্তৃতা করেন। এক্ষণে তাহা মুদ্রিত করিয়াছেন। তিনি এ বক্তৃতায় পশু পক্ষই সমর্থন করিয়াছেন।

আমরা কোন্ মতাবলম্বী? বঙ্গদর্শনের পাঠকেরা জানেন যে, আমরাও বাঙ্গালির পশুবাদী। এবং অনেক সময়েই বাঙ্গালির পশুত্বই সমর্থন করিয়াছি। বিধাতা ত্রিলোকের সুন্দরীগণের সৌন্দর্য্য তিল তিল সংগ্রহ করিয়া তিলোত্তমার সৃজন করিয়াছিলেন; সেইরূপ পশুবৃত্তির তিল তিল করিয়া সংগ্রহ পূর্ব্বক এই অপূর্ব্ব নব্য বাঙ্গালি চরিত্র সৃজন করিয়াছেন। শৃগাল হইতে শঠতা, কুক্কুর হইতে তোষামোদ ও ভিক্ষানুরাগ, মেষ হইতে ভিরুতা, বানর হইতে অনুকরণপটুতা, এবং গর্দ্দভ হইতে গর্জন,—এই সকল একত্র করিয়া, দিঙ্মণ্ডল উজ্জ্বলকারী, ভারতবর্ষের ভরসার বিষয়ীভূত, এবং ভট্ট মক্ষমূলরের আদরের স্থল, নব্য বাঙ্গালিকে সমাজাকাশে উদিত করিয়াছেন। যেমন সুন্দরীমণ্ডলে তিলোত্তমা, গ্রন্থমধ্যে রিচার্ডসনস্ সিলেক্‌সন্স্, যেমন পোষাকের মধ্যে ফকিরের জামা, মদ্যের মধ্যে পঞ্চ, খাদ্যের মধ্যে খিচুড়ি, তেমনি মনুষ্যের মধ্যে নব্য বাঙ্গালি। যেমন ক্ষীরোদ সমুদ্র মন্থন করিলে চন্দ্র উঠিয়া জগৎ আলো করিয়াছিল—তেমনি পশু-চরিত্রসাগর মন্থন করিয়া, এই অনিন্দনীয় বাবু-চাঁদ উঠিয়া ভারতবর্ষ আলো করিতেছেন। রাজনারায়ণ বাবুর ন্যায় যে সকল অমৃতলুব্ধ লোক রাহু হইয়া এই কলঙ্কশূন্য চাঁদকে গ্রাস করিতে যান,

---

সেকাল আর একাল। শ্রীরাজনারায়ণ বসু প্রণীত। কলিকাতা বাল্মীকি যন্ত্র।

আমরা তাঁহাদের নিন্দা করি। বিশেষতঃ রাজনারায়ণ বাবুকে বলি না, আপনিই এই গ্রন্থমধ্যে গোমাংস ভোজন করিতে নিষেধ করিয়াছেন, তবে বাঙ্গালির মুণ্ড খাইতে বসিয়াছেন কেন?—গোরু হইতে বাঙ্গালি কিসে অপকৃষ্ট? গোরুও যেমন উপকারী, নব্য বাঙ্গালিও সেইরূপ। ইহারা সম্বাদপত্ররূপ, ভাণ্ড ভাণ্ড সুস্বাদু দুগ্ধ দিতেছে; চাকরি-লাঙ্গল কাঁধে লইয়া, জীবনক্ষেত্র কর্ষণ পূর্ব্বক ইংরেজ-চাষার ফসলের যোগাড় করিয়া দিতেছে; বিদ্যার ছালা পিঠে করিয়া, কালেজ হইতে ছাপাখানায় আনিয়া ফেলিয়া, চিনির বলদের নাম রাখিতেছে; সমাজসংস্কারের গাড়িতে বিলাতি মাল বোঝাই দিয়া, রসের বাজারে ঢোলাই করিতেছে; এবং দেশহিতের ঘানিগাছে স্বার্থ-শর্ষপ পেষণ করিয়া, যশের তেল বাহির করিতেছে। এত গুণের গোরুকে কি বধ করিতে আছে?

আমরা নব্য বাঙ্গালির প্রতি এইরূপ প্রশংসাবাক্যই ব্যবহার করিয়া থাকি—এবং রাজনারায়ণ বাবুও সেই পথের পথিক। আমরা যে বাস্তবিক বাঙ্গালিকে এতই অপদার্থ মনে করি, ইহা বোধ হয় সকলে সত্য বিবেচনা করেন না। আত্মনিন্দায় দোষ নাই—উপকার আছে। আমরা বাঙ্গালি হইয়া, বাঙ্গালির নিন্দা করিতে অধিকারী—নিন্দার একটু অন্যায় আতিশয্য হইলেও লাভ আছে। আমাদিগের যে অবস্থা, তাহাতে আপনা আপনি ধন্যবাদ আরম্ভ করার অপেক্ষা অমঙ্গলকর আর কিছুই হইতে পারে না।

সত্য কথা এই যে আমরা বাঙ্গালির যত নিন্দা করি, বাঙ্গালি তত নিন্দনীয় নহে। রাজনারায়ণ বাবুও বাঙ্গালির যত নিন্দা করিয়াছেন, বাঙ্গালি তত নিন্দনীয় নহে। আমরা যে অভিপ্রায়ে বাঙ্গালির নিন্দা করি, রাজনারায়ণ বাবুও সেই অভিপ্রায়ে বাঙ্গালির নিন্দা করিয়াছেন—বাঙ্গালির হিতার্থ। সেকালে আর এ কালে নিরপেক্ষ ভাবে তুলনা তাঁহার উদ্দেশ্য নহে—একালের দোষনির্ব্বাচনই তাঁহার উদ্দেশ্য। একালের গুণগুলির প্রতি তিনি বিশেষ দৃষ্টিক্ষেপ করেন নাই—করাও নিষ্প্রয়োজন, কেননা আমরা আপনাদিগের গুণের প্রতি পলকের জন্য সন্দেহযুক্ত নহি।

রাজনারায়ণ বাবুর সঙ্গে অনেক সময় আমাদিগের একমত, ইহা আমরা আত্মশ্লাঘার বিষয় মনে করি। অনেকস্থানে গুরুতর মতভেদও আছে—কিন্তু উদ্দেশ্য এক বলিয়া প্রতিবাদ নিষ্প্রয়োজনীয় বিবেচনা হইল।

তবে একটি তত্ত্ব সম্বন্ধে আমাদিগের কিছু বলিবার ইচ্ছা আছে—বাঙ্গালির অনুচিকীর্ষা। তিনবৎসর ধরিয়া বাঙ্গালিকে গালি দিয়া আসিতেছি একদিন একটা ভাল কথা বলিলে অপাত্রে পড়িবে না।

নব্য বাঙ্গালির অনেক দোষ। কিন্তু সকল দোষের মধ্যে, অনুকরণানুরাগ সর্ব্ববাদিসম্মত। কি ইংরেজ কি বাঙ্গালি সকলেই ইহার জন্য বাঙ্গালি জাতিকে অহরহ তিরস্কৃত করিতেছেন। তদ্বিষয়ে রাজনারায়ণ বাবু যাহা বলিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিবার আবশ্যকতা নাই—সেসকল কথা আজকালি সকলেরই মুখে শুনিতে পাওয়া যায়।

আমরা সে সকল কথা স্বীকার করি, এবং ইহাও স্বীকার করি যে, রাজনারায়ণ বাবু যাহা বলিয়াছেন, তাহার অনেকগুলিই সঙ্গত। কিন্তু অনুকরণ সম্বন্ধে দুই একটি সাধারণ ভ্রম আছে।

অনুকরণ মাত্র কি দূষ্য? তাহা কদাচ হইতে পারে না। অনুকরণ ভিন্ন প্রথম শিক্ষার উপায় কিছুই নাই। যেমন শিশু বয়ঃপ্রাপ্তের বাক্যানুকরণ করিয়া কথা কহিতে শিখে, যেমন সে বয়ঃপ্রাপ্তের কার্য্যসকল দেখিয়া কার্য্য করিতে শিখে, অসভ্য এবং অশিক্ষিত জাতি সেইরূপ সভ্য এবং শিক্ষিত জাতির অনুকরণ করিয়া সকল বিষয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়। অতএব বাঙ্গালি যে ইংরেজের অনুকরণ করিবে, ইহা সঙ্গত ও যুক্তিসিদ্ধ। সত্য বটে, আদিম সভ্যজাতি বিনানুকরণে স্বতঃশিক্ষিত এবং সভ্য হইয়াছিলেন; প্রাচীন ভারতীয় ও মিসরীয় সভ্যতা কাহারও অনুকরণলব্ধ নহে। কিন্তু যে আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতা সর্ব্বজাতীয় সভ্যতার মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তাহা কিসের ফল? তাহাও রোমক ও যুনানী সভ্যতার অনুকরণের ফল। রোমক সভ্যতাও যুনানী সভ্যতার অনুকরণের ফল। যে পরিমাণে বাঙ্গালি, ইংরেজের অনুকরণ করিতেছে, পুরাবৃত্তজ্ঞ জানেন যে ইউরোপীয়েরা প্রথমাবস্থাতে তদপেক্ষা অল্প পরিমাণে যুনানীয়ের, বিশেষতঃ রোমকীয়ের অনুকরণ করেন নাই। প্রথমাবস্থাতে অনুকরণ করিয়াছিলেন বলিয়াই এখন এ উচ্চসোপানে দাঁড়াইয়াছেন। শৈশবে পরের হাতে ধরিয়া যে জলে নামিতে না শিখিয়াছে, সে কখনই সাঁতার দিতে শিখে নাই; কেননা ইহজন্মে তাহার জলে নামাই হইল না। শিক্ষকের লিখিত আদর্শ দেখিয়া যে প্রথমে লিখিতে না শিখিয়াছে, সে কখনই লিখিতে শিখে নাই। বাঙ্গালি যে ইংরেজের অনুকরণ করিতেছে, ইহাই বাঙ্গালির ভরসা।

তবে লোকের বিশ্বাস এই যে, অনুকরণের ফল কখন প্রথম শ্রেণীর উৎকর্ষ প্রাপ্তি হয় না। কিসে জানিলে?

প্রথম, সাহিত্য সম্বন্ধে দেখ। পৃথিবীর কতকগুলি প্রথম শ্রেণীর কাব্য, কেবল অনুকরণ মাত্র। ড্রাইডেন এবং বোয়ালোর অনুকারী পোপ, পোপের অনুকারী জন্‌সন, এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লেখকদিগের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া আমরা এ কথা সপ্রমাণ করিতে চাহি না। বর্জ্জিলের মহাকাব্য, হোমরের প্রসিদ্ধ মহাকাব্যের অনুকরণ। সমুদায় রোমক সাহিত্য, যুনানীয় সাহিত্যের অনুকরণ। যে রোমক

সাহিত্য বর্ত্তমান ইউরোপীয় সভ্যতার ভিত্তি, তাহা অনুকরণ মাত্র। কিন্তু বিদেশী উদাহরণ দূরে থাকুক। আমাদিগের স্বদেশে দুইখানি মহাকাব্য আছে—তাহাকে মহাকাব্য বলে না, গৌরবার্থ ইতিহাস বলে— তাহা পৃথিবীর সকল কাব্যের শ্রেষ্ঠ। গুণে উভয়ে প্রায় তুল্য; অল্প তারতম্য। একখানি আর একখানির অনুকরণ।

মহাভারত যে রামায়ণের পরকালে প্রণীত, তাহা হুইলর সাহেব ভিন্ন বোধ হয় আর কেহই সহজ অবস্থায় অস্বীকার করিবে না। অন্যান্য অনুকৃত এবং অনুকরণের নায়ক সকলে যতটা প্রভেদ দেখা যায়, রামে ও যুধিষ্ঠিরে তাহার অপেক্ষা অধিক প্রভেদ নহে। রামায়ণের অমিতবলধারী বীর, জিতেন্দ্রিয়, ভ্রাতৃবৎসল লক্ষণ মহাভারতে অর্জ্জুনে পরিণত হইয়াছেন, এবং ভরত শত্রুঘ্ন নকুল সহদেব হইয়াছেন। ভীম, নূতন সৃষ্টি, তবে কুম্ভকর্ণের একটু ছায়ায় দাঁড়াইয়াছেন। রামায়ণে রাবণ, মহাভারতে দুর্য্যোধন; রামায়ণে বিভীষণ, মহাভারতে বিদুর; অভিমন্যু, ইন্দ্রজিতের অস্থি-মজ্জা লইয়া গঠিত হইয়াছে। এদিকে রাম ভ্রাতা ও পত্নী সহিত বনবাসী; যুধিষ্ঠিরও ভ্রাতা ও পত্নী সহিত বনবাসী। উভয়েই রাজ্যচ্যুত। একজনের পত্নী অপহৃতা, আর একজনের পত্নী সভামধ্যে অপমানিতা; উভয় মহাকাব্যের সারভূত সমরানলে সেই অগ্নি জ্বলন্ত; একে স্পষ্টতঃ, অপরে অস্পষ্টতঃ। উভয় কাব্যের উপন্যাস ভাগ এই যে, যুবরাজ রাজ্যচ্যুত হইয়া, ভ্রাতা ও পত্নীসহ বনবাসী, পরে সমরে প্রবৃত্ত, পরে সমরবিজয়ী হইয়া পুনর্ব্বার স্বরাজ্যে স্থাপিত। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাতেই সেই সাদৃশ্য আছে; কুশীলবের পালা মণিপুরে বভ্রুবাহন কর্ত্তৃক অভিনীত হইয়াছে; মিথিলায় ধনুর্ভঙ্গ, পাঞ্চালে মৎস্য বিন্ধনে পরিণত হইয়াছে; দশরথকৃত পাপে এবং পাণ্ডুকৃত পাপে বিলক্ষণ ঐক্য আছে। মহাভারতকে রামায়ণের অনুকরণ বলিতে ইচ্ছা না হয়, না বলুন; কিন্তু অনুকরণীয়ে এবং অনুকৃতে ইহার অপেক্ষা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ অতি বিরল। কিন্তু মহাভারত অনুকরণ হইয়াও কাব্যমধ্যে পৃথিবীমধ্যে অন্যত্র অতুল—একা রামায়ণই তাহার তুলনীয়। অতএব অনুকরণ মাত্র হেয় নহে।

পরে, সমাজ সম্বন্ধে দেখ। যখন রোমকেরা যুনানীয় সভ্যতার পরিচয় পাইলেন, তখন তাঁহারা কায়মনোবাক্যে যুনানীয়দিগের অনুকরণে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহার ফল, কিকিরোর বাগ্মিতা, তাসিতসের ইতিবৃত্তগ্রন্থ, বর্জ্জিলের মহাকাব্য, প্লতস ও টেরেন্সের নাটক, হরেস ও ওবিদের গীতিকাব্য, পেপিনিয়নের ব্যবস্থা, সেনেকার ধর্ম্মনীতি, আন্টনৈনদিগের রাজধর্ম্ম, লুকালসের ভোগাসক্তি, জনসাধারণের ঐশ্বর্য্য, এবং সম্রাট্‌গণের স্থাপত্যকীর্ত্তি। আধুনিক ইউরোপীয়দিগের কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে; ইতালীয়, ফরাসি-সাহিত্য, গ্রীক ও রোমীয় সাহিত্যের অনুকরণ; ইউরোপীয় ব্যবস্থা-শাস্ত্র, রোমক ব্যবস্থা-শাস্ত্রের অনুকরণ; ইউরোপীয় শাসনপ্রণালী রোমকীয়ের অনুকরণ। কোথাও সেই ইম্পিরেটর, কোথাও সেই

সেনেট, কোথাও সেই প্লেবের শ্রেণী, কোথাও সেই ফোরম্‌, কোথাও সেই মিউনিসিপিয়ম্‌। আধুনিক ইউরোপীয় স্থাপত্য ও চিত্রবিদ্যাও যুনানী ও রোমক মূলবিশিষ্ট। এই সকলই প্রথমে অনুকরণ মাত্রই ছিল ; এক্ষণে অনুকরণাবস্থা পরিত্যাগ করিয়া পৃথগ্‌ভাবাপন্ন ও উন্নত হইয়াছে। প্রতিভা থাকিলেই এইরূপ ঘটে ; প্রথম অনুকরণ মাত্র হয় ; পরে অভ্যাসে উৎকর্ষ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে শিশু প্রথম লিখিতে শিখে, তাহাকে প্রথমে গুরুর হস্তাক্ষরের অনুকরণ করিতে হয়—পরিণামে তাহার হস্তাক্ষর স্বতন্ত্র হয়, এবং প্রতিভা থাকিলে সে গুরুর অপেক্ষা ভাল লিখিয়াও থাকে।

তবে প্রতিভাশূন্যের অনুকরণ বড় কদর্য্য হয় বটে। যাহার যে বিষয়ে নৈসর্গিক শক্তি নাই, যে চিরকালই অনুকারী থাকে, তাহার স্বাতন্ত্র্য কখন দেখা যায় না। ইউরোপীয় নাটক ইহার বিশিষ্ট উদাহরণ। ইউরোপীয় জাতিমাত্রেরই নাটক আদৌ যুনানী নাটকের অনুকরণ। কিন্তু প্রতিভার গুণে স্পেনীয় এবং ইংলণ্ডীয় নাটক শীঘ্রই স্বাতন্ত্র্য লাভ করিল—এবং ইংলণ্ড এ বিষয়ে গ্রীসের সমকক্ষ হইল। এদিকে, এতদ্বিষয়ে স্বাভাবিক শক্তিশূন্য রোমীয়, ইতালীয়, ফরাসি এবং জর্ম্মনীয়গণ অনুকারীই রহিলেন। অনেকেই বলেন যে, শেষোক্ত জাতিসকলের নাটকের অপেক্ষাকৃত অনুৎকর্ষ তাঁহাদিগের অনুচিকীর্ষার ফল। এটি ভ্রম। ইহা নৈসর্গিক ক্ষমতার অপ্রতুলেরই ফল। অনুচিকীর্ষাও সেই অপ্রতুলের ফল। অনুচিকীর্ষাও কার্য্য, কারণ নহে।

অনুকরণ যে গালি বলিয়া আজিকালি পরিচিত হইয়াছে, তাহার কারণ প্রতিভাশূন্য ব্যক্তির অনুকরণে প্রবৃত্তি। অক্ষম ব্যক্তির কৃত অনুকরণ অপেক্ষা ঘৃণাকর আর কিছুই নাই ; একে মন্দ তাহাতে অনুকরণ। নচেৎ অনুকরণমাত্র ঘৃণ্য নহে ; এবং বাঙ্গালির বর্ত্তমান অবস্থায় তাহা দোষের নহে। বরং এরূপ অনুকরণই স্বভাবসিদ্ধ। ইহাতে যে বাঙ্গালির স্বভাবের কিছু বিশেষ দোষ আছে এমন বোধ করিবার কারণ নির্দ্দেশ করা কঠিন। ইহা মানুষের স্বভাবসিদ্ধ দোষ বা গুণ। যখন উৎকৃষ্টে এবং অপকৃষ্টে একত্রিত হয়, তখন অপকৃষ্ট স্বভাবতঃই উৎকৃষ্টের সমান হইতে চাহে। সমান হইবার উপায় কি ? উপায়, উৎকৃষ্ট যেরূপ করে, সেইরূপ কর, সেইরূপ হইবে। তাহাকেই অনুকরণ বলে। বাঙ্গালি দেখে, ইংরেজ সভ্যতায়, শিক্ষায়, বলে, ঐশ্বর্য্যে, সুখে, সর্ব্বাংশে বাঙ্গালি হইতে শ্রেষ্ঠ। বাঙ্গালি কেন না ইংরেজের মত হইতে চাহিবে ? কিন্তু কি প্রকারে সেরূপ হইবে ? বাঙ্গালি মনে করে, ইংরেজ যাহা যাহা করে, সেইরূপ সেইরূপ করিলে, ইংরেজের মত সভ্য, শিক্ষিত, সম্পন্ন, সুখী হইব। অন্য যে কোন জাতি হউক না কেন, ঐ অবস্থাপন্ন হইলে ঐরূপ করিত। বাঙ্গালির স্বভাবের দোষে এ অনুকরণপ্রবৃত্তি

নহে। অন্ততঃ বাঙ্গালির তিনটি প্রধান জাতি—ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ আর্য্যবংশসম্ভূত; আর্য্যশোণিত তাহাদের শরীরে অদ্যাপি বহিতেছে; বাঙ্গালি কখনই বানরের ন্যায় কেবল অনুকরণের জন্যই অনুকরণপ্রিয় হইতে পারে না। এ অনুকরণ স্বাভাবিক, এবং পরিণামে মঙ্গলপ্রদ হইতে পারে। যাঁহারা আমাদিগের কৃত ইংরেজের আহার ও পরিচ্ছদের অনুকরণ দেখিয়া রাগ করেন, তাঁহারা ইংরেজকৃত ফরাসীদিগের আহার পরিচ্ছদের অনুকরণ দেখিয়া কি বলিবেন? এ বিষয়ে বাঙ্গালির অপেক্ষা ইংরেজেরা অল্পাংশে অনুকারী? আমরা অনুকরণ করি, জাতীয় প্রভুর;—ইংরেজেরা অনুকরণ করেন—কাহার?

ইহা আমরা অবশ্য স্বীকার করি যে, বাঙ্গালি যে পরিমাণে অনুকরণে প্রবৃত্ত, ততটা বাঞ্ছনীয় না হইতে পারে, এবং আমরাও এই অনুকরণ-প্রবৃত্তিকে সর্ব্বদা ভর্ৎসনা ও ব্যঙ্গ করিয়া থাকি। বাঙ্গালির মধ্যে প্রতিভাশূন্য অনুকারীরই বাহুল্য; এবং তাঁহাদিগকে প্রায় গুণভাগের অনুকরণে প্রবৃত্ত না হইয়া দোষভাগের অনুকরণেই প্রবৃত্ত দেখা যায়। এইটি মহা দুঃখ। বাঙ্গালি গুণের অনুকরণে তত পটু নহে; দোষের অনুকরণে ভূমণ্ডলে অদ্বিতীয়। এইজন্যই আমরা বাঙ্গালির অনুকরণপ্রবৃত্তিকে গালি পাড়ি, এবং এইজন্যই রাজনারায়ণ বাবু যাহা যাহা বলিয়াছেন, তাহার অনেকগুলি যথার্থ বলিয়া স্বীকার করিতেছি।

যেখানে অনুকারী প্রতিভাশালী সেখানেও অনুকরণের দুইটি মহৎ দোষ আছে। একটি বৈচিত্রের বিঘ্ন। এ সংসারে একটি প্রধান সুখ, বৈচিত্র ঘটিত। জগতীতলস্থ সর্ব্ব পদার্থ যদি এক বর্ণের হইত তবে জগৎ কি এত সুখদৃশ্য হইত? সকল-শব্দ যদি এক প্রকার হইত—মনে কর, কোকিলের স্বরের ন্যায় রব ভিন্ন পৃথিবীতে অন্য কোন প্রকার শব্দ না থাকিত, তবে কি শব্দ সকলের কর্ণ-জ্বালাকর হইত না? আমরা সেরূপ স্বভাব পাইলে, না হইতে পারিত। কিন্তু এক্ষণে আমরা যে প্রকৃতি লইয়া পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, তাহাতে বৈচিত্রেই সুখ। অনুকরণে এই সুখের ধ্বংস হয়। মাকবেথ উৎকৃষ্ট নাটক, কিন্তু পৃথিবীর সকল নাটক মাকবেথের অনুকরণে লিখিত হইলে, নাটকে আর কি সুখ থাকিত? সকল মহাকাব্য রঘুবংশের আদর্শে লিখিত হইলে, কে আর কাব্য পড়িত?

দ্বিতীয়, সকল বিষয়েই যত্নপৌনঃপুন্যে উৎকর্ষের সম্ভাবনা। কিন্তু পরবর্ত্তী কার্য্য পূর্ব্ববর্ত্তী কার্য্যের অনুকরণমাত্র হইলে, চেষ্টা কোনপ্রকার নূতন পথে যায় না; সুতরাং কাব্যের উন্নতি ঘটে না। তখন ধারাবাহিকতা প্রাপ্ত হইতে হয়। ইহা কি শিল্প সাহিত্য বিজ্ঞান, কি সামাজিক কার্য্য, কি মানসিক অভ্যাস, সকল সম্বন্ধেই সত্য।

এই তত্ত্বের অন্তর্গত একটি গুরুতর তত্ত্ব আছে—স্বানুবর্ত্তিতার বিনাশ। স্বানুবর্ত্তিতা কি, তাহা বিস্তারিত বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। যাঁহারা মিলের মূলগ্রন্থ পাঠ না করিয়াছেন, তাঁহারা বঙ্গদর্শনের প্রথম খণ্ডের ২৫৫, ২৭২ পৃষ্ঠাস্থিত প্রবন্ধদ্বয় পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন। মিল প্রণীত এই গ্রন্থ * ভবিষ্যতে মানব সমাজ-শাস্ত্রের মূলস্বরূপ পরিণাম লাভ করিবার সম্ভাবনা; এবং আমাদিগের বিবেচনায় সমাজনীতির সকল তত্ত্বই তৎপ্রণীত নীতিসূত্রের সাহায্যে পর্য্যবেক্ষিত হওয়া উচিত। সেই নীতিসূত্রের সাহায্যে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, মনুষ্যের শারীরিক ও মানসিক বৃত্তি সকলেরই সমকালিক যথোচিত স্ফূর্ত্তি এবং উন্নতি মনুষ্যদেহধারণের প্রধান উদ্দেশ্য। তবে যাহাতে কতকগুলির অধিকতর পরিপুষ্টি, এবং কতকগুলির প্রতি তাচ্ছীল্য জন্মে, তাহা মনুষ্যের অনিষ্টকর। মনুষ্য অনেক, এবং একজন মনুষ্যের সুখও বহুবিধ। তত্তাবৎ সাধনের জন্য বহুবিধ ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যের আবশ্যকতা। ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের কার্য্য ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির লোকের দ্বারা ভিন্ন সম্পন্ন হইতে পারে না। একশ্রেণীর চরিত্রের লোকের দ্বারা, বহু প্রকারের কার্য্য সাধিত হইতে পারে না। অতএব সংসারে চরিত্র-বৈচিত্র, কার্য্য-বৈচিত্র, এবং প্রবৃত্তির বৈচিত্র প্রয়োজন। তদ্ব্যতীত সমাজের সকল বিষয়ে মঙ্গল নাই। অনুকরণ প্রবৃত্তিতে ইহাই ঘটে যে, অনুকারীর চরিত্র, তাহার প্রবৃত্তি, এবং তাহার কার্য্য, অনুকরণীয়ের ন্যায় হয়, পথান্তরে গমন করিতে পারে না। যখন সমাজস্থ সকলেই বা অধিকাংশ লোক বা কার্য্যক্ষম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ, একই আদর্শের অনুকারী হয়েন, তখন এই বৈচিত্রহানি অতি গুরুতর হইয়া উঠে। মনুষ্যচরিত্রের সর্ব্বাঙ্গীণ স্ফূর্ত্তি ঘটে না; সর্ব্বপ্রকারের মনোবৃত্তি সকলের মধ্যে, যথোচিত সামঞ্জস্য থাকে না, সর্ব্বপ্রকারের কার্য্য সম্পাদিত হয় না, মনুষ্যের কপালে সকল প্রকার সুখ ঘটে না—মনুষ্যত্ব অসম্পূর্ণ থাকে, সমাজ অসম্পূর্ণ থাকে, মনুষ্যজীবন অসম্পূর্ণ থাকে।

✓ আমরা যে কয়টি কথা বলিয়াছি, তাহাতে নিম্নলিখিত তত্ত্বসকলের উপলব্ধি হইতে পারে—

১। সামাজিক সভ্যতার আদি দুই প্রকার; কোন কোন সমাজ স্বতঃ সভ্য হয়, কোন কোন সমাজ অন্যত্র হইতে শিক্ষা লাভ করে। প্রথমোক্ত সভ্যতালাভ বহুকাল সাপেক্ষ; দ্বিতীয়োক্ত আশু সম্পন্ন হয়।

২। যখন কোন অপেক্ষাকৃত অসভ্য জাতি, অধিকতর সভ্যজাতির সংস্পর্শ লাভ করে, তখন দ্বিতীয় পথে সভ্যতা অতি দ্রুতগতিতে আসিতে থাকে। সেস্থলে

---

* On Liberty.

সামাজিক গতি এইরূপ হয় যে, অপেক্ষাকৃত অসভ্য সমাজ সভ্যতর সমাজের সর্ব্বাঙ্গীণ অনুকরণে প্রবৃত্ত হয়। ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম।

৩। অতএব বঙ্গীয় সমাজের দৃশ্যমান অনুকরণপ্রবৃত্তি অস্বাভাবিক বা বাঙ্গালির চরিত্রদোষজনিত নহে।

৪। অনুকরণমাত্রই অনিষ্টকারী নহে, কখন কখন তাহাতে গুরুতর সুফলও জন্মে; প্রথমাবস্থায় অনুকরণ, পরে স্বাতন্ত্র্য আপনিই আসে। বঙ্গীয় সমাজের অবস্থা বিবেচনা করিলে, এই অনুকরণপ্রবৃত্তি যে ভাল নহে, এমত নিশ্চয় বলা যাইতে পারে না। ইহাতে ভরসার স্থলও আছে।

৫। তবে অনুকরণে গুরুতর কুফলও আছে। উপযুক্ত কাল উত্তীর্ণ হইলেও অনুকরণপ্রবৃত্তি বলবতী থাকিলে অথবা অনুকরণের যথার্থ সময়েই অনুকরণপ্রবৃত্তি অব্যবহিতরূপে স্ফূর্ত্তি পাইলে, সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইবে।

স্থূল প্রশ্ন এই যে, এক্ষণে বঙ্গসমাজে যেরূপ অনুকরণ প্রচলিত, ইহা যথা-পরিমিত কি আত্যন্তিক? চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ, চিন্তা করিয়া, একথার মীমাংসা করিবেন। রাজনারায়ণ বাবু চিন্তাশীল কিন্তু তিনি ততদূর চিন্তা করিয়া এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পরিচয় গ্রন্থমধ্যে পাই নাই। অতএব তাঁহার কৃত মীমাংসা প্রতিবাদের অতীত বলিয়া আমরা এক্ষণে গ্রহণ করিতে পারিলাম না। যদি তিনি বা তাঁহার ন্যায় অন্য কেহ নিরপেক্ষ, কুসংস্কারবর্জ্জিত, এবং চিন্তাভিনিবিষ্ট হইয়া এ তত্ত্বের আলোচনা করেন, তবে সমাজের বিশেষ উপকার করিবেন সন্দেহ নাই। কথাটি রূপান্তরে এই যে, এ অনুকরণের এক্ষণে বহুবিধ মন্দ ফল দেখিতেছি, চরমে কি তাহার ফল ভাল দাঁড়াইবে না?

দ্বিতীয় প্রবন্ধ

[এই প্রবন্ধ যন্ত্রস্থ হইলে পর আমরা কোন কৃতবিদ্য লেখকের নিকট হইতে রাজনারায়ণ বাবুর পুস্তকের নিম্নলিখিত সমালোচনা প্রাপ্ত হইলাম। লেখকের মতের সঙ্গে আমাদিগের নিজমতের সর্ব্বত্র ঐক্য নাই কিন্তু নব্য সম্প্রদায় আত্মপক্ষ সমর্থনে যাহা বলিতে ইচ্ছা করেন, তাহা তাঁহারা বলিতে অধিকারী; আমরা প্রবন্ধান্তরে অন্যপ্রকার গ্রন্থ সমালোচনা করিয়াছি বলিয়া, এই লেখকের মতগুলি অপ্রচারিত রাখিতে অধিকারী নহি। ইচ্ছা করিলে সকল সম্প্রদায়ের লোক, আপন আপন মত বঙ্গদর্শনে প্রকাশ করিতে পারেন; ইহা বঙ্গদর্শনের উদ্দেশ্য। অতএব আমরা দ্বিতীয় প্রবন্ধটিকেও এই স্থানে সন্নিবেশিত করিলাম।]

বং সম্পাদক।

অহঙ্কার ও আত্মগৌরব মানবস্বভাবজনিত ধর্ম্ম। আপনাকে অপেক্ষাকৃত হীনাবস্থা হইতে মহৎ জ্ঞান করা সম্যক্ প্রকারে দূষণীয় নয়। কারণ, এই প্রকার জ্ঞান থাকিলে কুসংসর্গ ও নীচ প্রবৃত্তি হইতে অনেকাংশে জনসমাজকে বিরত রাখে। নচেৎ নিস্তেজ কাপুরুষ লোকের জলপ্রবাহের ন্যায় সর্ব্বদাই অধোগতি হয়। কিন্তু অবিমিশ্রগুণ পৃথিবীতে অত্যন্ত বিরল। বিশুদ্ধ ধর্ম্ম হইতেও কি না দুর্ঘটনা, মনস্তাপ ও যন্ত্রণাভার লোকসমাজকে বহন করিতে হইয়াছে। সকল বিষয়েই আধিক্য প্রবল হইলে তাহাতে গুণ না দর্শাইয়া বরং অনিষ্ট উৎপাদন হয়। 'সর্ব্বমত্যন্ত গর্হিতং' এই যে কথাটি সকল সময়ে এবং সকল বিষয় আলোচনায় আমাদিগের হৃদয়ে স্থানদান করা উচিত। জীবনসাংঘাতিক হলাহলও অল্প পরিমাণে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে কত প্রকার হিতসাধন করিতেছে।

"আমি মহৎ এবং তুমি আমা অপেক্ষা অধম" এই প্রকার আত্মগৌরব যুবকমণ্ডলীর মধ্যে সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় কিন্তু 'আমরা মহৎ ও তোমরা অধম' এই প্রকার দৃষ্টান্ত বঙ্গদেশের সামাজিক নিয়মমধ্যে বিলক্ষণ প্রবল আছে। এই বিশ্বাসটি আমাদের দলাদলীঘটনার মূলীভূত কারণ। যদ্যপি ভিন্ন ভিন্ন দলস্থ লোকেরা নিজের মহত্ত্ব ও উৎকর্ষসাধনে যত্নবান্ হইয়া অপরকে অপদস্থ করিতে চেষ্টা না করিতেন, তাহা হইলে এই বর্ত্তমান জঘন্য ব্যাপার হইতে দেশের কি পর্য্যন্ত শ্রীবৃদ্ধি ও সুখোন্নতি হইত। এখন দলাদলী কেবল হিংসা ও কুপ্রবৃত্তির আলয় হইয়াছে। নিজের উন্নতিসাধন দূরে থাকুক, এখন কি প্রকারে অন্যকে উন্নত অবস্থা হইতে অবতরণ করাইব এই আন্দোলন লইয়া দলপতি মহাশয়েরা ব্যতিব্যস্ত। হৃদয় বিষাক্ত ও কলুষিত হইলে, যত প্রকার নীচ প্রবৃত্তি তাহা হইতে উৎপত্তির সম্ভাবনা, তখন সকলই উত্তেজিত হইয়া ঐ পাপাচারকে আশ্রয় করে। এই প্রকার দলাদলী ঘটনাতে অনেক সুশিক্ষিত যুবকও অনুমোদন করেন, ইহাই বর্ত্তমান বঙ্গদেশের অবস্থাতে শোচনীয়।

ইংরাজী ভাষার পর্য্যালোচনায় আমাদিগের ভাবের অনেক প্রকার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এখন আমরা অনেক বিষয় সভ্যতার নয়নে দৃষ্টি করি। সামাজিক দলাদলী ব্যতীত এখন আর এক প্রকার দলাদলীর উৎপত্তির চিহ্ন লক্ষিত হইতেছে। কিন্তু আমাদের এই বাঞ্ছা যে কে উন্নত ইহা স্থির করিবার জন্য আমরা যেন হীন প্রবৃত্তির আশ্রয় না লই। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে নিজের কিম্বা নিজদলের গৌরব করা এবং সেই গৌরব সম্বর্দ্ধন এবং প্রতিপালনার্থ চেষ্টিত হওয়া সামাজিক উন্নতির এক মূলীভূত উপায়।

উল্লিখিত বিষয়ের সমালোচনা বাবু রাজনারায়ণ বসু প্রণীত 'একাল আর সেকাল' অভিধেয় পুস্তক পাঠে হৃদয়স্থ হইল। তিনি পূর্ব্বকালের সহিত একালের

তুলনা করিয়া অধুনাতন যুবকগণের অধোগতি প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ইহা যদ্যপি সত্য হয়, তাহা হইলে কি বঙ্গদেশের সামান্য দুরবস্থা বলিতে হইবেক? এত যে ইংরাজী বিদ্যালাভের জন্য প্রয়াস, এত রাজস্বব্যয়, এত জীবন-হ্রাসকর নিশীথ অধ্যয়ন, সকল কি আমাদের অনিষ্টের কারণ? তাহা হইলে ইংরাজি চর্চ্চা যত শীঘ্র আমাদের দেশ হইতে অন্তর্ধান হয় ততই দেশের মঙ্গল। তবে কেন সভা সমবেত করিয়া উচ্চ বিদ্যাশিক্ষার সুলভতাজন্য গবর্ণমেণ্টকে আবেদন করা হইয়াছিল? বিবেচনা দ্বারা সমালোচনা করিলে উক্ত গ্রন্থকর্ত্তার ভ্রম প্রতীয়মান হইবেক। তিনি মানবস্বভাবসুলভ আত্মগৌরবে পতিত হইয়া সেকালের অবস্থাসকল সুচক্ষে দৃষ্টি করিয়াছেন। বোধ হয় আমরাও বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে আমাদিগের পুত্র পৌত্রাদির নিকট সেই স্বর্ণযুগের গৌরব করিব। কিন্তু বাস্তবিক সময়প্রবাহের সহিত যে দেশের শ্রীবৃদ্ধি সকল অংশেই লক্ষিত হইতেছে তাহা বলা বাহুল্য। পূর্ব্বকালের এবং একালের লোকের সহিত চন্দ্র সূর্য্য প্রভেদ বলিলেও বলা যায়। সেকালের সরলতার দৃষ্টান্তগুলি যাহা লিখিত হইয়াছে সে সরলতা কেবল মূর্খতার চিহ্ন। (১) পাঠকবর্গ মনে করুন যে যদি একালের কোন ব্রাহ্মণ নিজ প্রণয়িনীর সম্মুখে গলবস্ত্র দণ্ডায়মান হইয়া তুমি কে অধিষ্ঠাত্রী দেবী, প্রশ্ন করেন এবং উদ্বেলিত ব্যঞ্জনে তৈল নিক্ষেপ দ্বারা তাহার উচ্ছ্বাসন নিবারণ দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হয়েন, তবে তাঁহাকে দ্বিপদবিশিষ্ট পশু ভিন্ন আর কি ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে? একালের লোক স্বার্থপর, তাহার কারণ এই যে বুদ্ধির মার্জ্জনা দ্বারা সকলেই নিজ নিজ অধিকার হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছে। ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে দিনান্ত পরিশ্রম করিয়া স্ব স্ব উপার্জ্জিত ধন দ্বারা আলস্যপরবশ নিষ্কর্ম্মা দূরস্থ আত্মীয় কুটুম্বের উদর পোষণ কি প্রশংসনীয় কর্ম্ম? (২) পূর্ব্বকালে এক এক ধনী আত্মীয়ের বাড়ী কত নিষ্কর্ম্মা ভাগিনেয় এবং গৃহ-জামাতা নির্ব্বিঘ্নে দিনাতি-

---

(১) ইহা যদি মূর্খতার চিহ্ন হয়, তবে ইউরোপীয় অনেক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতও মূর্খ ছিলেন। তাঁহাদিগের জীবনচরিত অনুসন্ধান করিয়া, এরূপ উদাহরণ সংগ্রহ করা যাইতে পারে। যাঁহারা আপনার অধীত শাস্ত্রবিশেষকে একমাত্র চিন্তার বিষয় করিয়া তুলেন, তাঁহারা সামান্য সাংসারিক ব্যাপারে এইরূপ অমনোযোগী হয়েন। আমরা বিশেষ অবগত আছি, এরূপ দৃষ্টান্ত আধুনিক কৃতবিদ্য বাঙ্গালি সম্প্রদায়ের মধ্যেও দুষ্প্রাপ্য নহে।

বং সং।

(২) যে খাইতে না পায়, তাহাকে খাইতে দেওয়া প্রশংসনীয় নহে কিসে? ইহাতে অলসের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং সামাজিক ধনক্ষতি হয় বটে। যিনি তাহা ভাবিয়া দরিদ্র আত্মীয়জনের আনুকূল্য করেন না, তাঁহার সমাজনীতিজ্ঞতার প্রশংসা করিব; কিন্তু মনুষ্যত্বের নহে। যিনি আনুকূল্য করেন, তিনি অজ্ঞানী হইলে হইতে পারেন, কিন্তু মনুষ্য বটে। বং সং।

পাত করিতেন। এখন সেই সকল রক্তশোষক জলৌকার সংখ্যা হ্রাস হওয়া কি সমাজের উন্নতির লক্ষণ নয়? (৩) যে ব্যক্তি পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া নিজের ভরণপোষণে সমর্থ নয়, সে কেবল সমাজের ভারস্বরূপ, যত শীঘ্রই ঐ সকল লোকের সংখ্যা হইতে বঙ্গমাতাকে উদ্ধার করা যায়, ততই তাঁহার উন্নতির সাধন। (৪)

পুরাকালের দান দাতব্যের বিষয় এবং একালের তাহার হ্রাসের নিমিত্ত আক্ষেপ করা হইয়াছে। যদ্যপি রাজনারায়ণ বাবু ব্রাহ্মণবংশোদ্ভব হইতেন তবে তাঁহার আক্ষেপোক্তি নিতান্ত দূষণীয় হইত না। (৫) এই যে দুর্ভিক্ষ যাহার করাল গ্রাস হইতে আমরা অদ্যাপি সম্যক্ প্রকারে নিস্তার পাই নাই ইহা কি একবারে তাঁহার স্মরণপথ হইতে অন্তর্দ্ধান হইল? ব্রাহ্মণ পণ্ডিত গোঁসাই বৈরাগী ইত্যাদি ভিক্ষাবলম্বী মনুষ্যকে দাতব্য বিতরণে কুণ্ঠিত হওয়া কি দেশের অমঙ্গলের চিহ্ন? যদ্যপি ইহা সত্য হয় তবে ভরসা করি উক্ত মহাত্মারা যেন পৈতা ছিঁড়িয়া অভিসম্পাত দ্বারা আমাদের উৎসন্নে পাঠাইবেন না।

কেবল দুইটি বিষয়ে তিনি স্বমুখে উন্নতির চিহ্ন স্বীকার করিয়াছেন যথা, উৎকোচ লওনে পরাঙ্মুখ হওয়া এবং স্বদেশপ্রিয়তা। যদ্যপি পূর্ব্বোক্ত সকলগুলিকে দোষ বলিয়া স্বীকার করা যায়, তথাপি শেষোক্ত দুইটি গুণ সকল দোষকে আচ্ছাদিত করে। দেশের উপর মমতা দেশের উন্নতির সোপান এবং উৎকোচ-পরাঙ্মুখ হওয়া সত্যের নিদর্শন। যদ্যপি এই দুইটি সমাজমধ্যে লক্ষিত হইয়া থাকে তবে ভবিষ্যতে নৈরাশের কারণ কি? দুর্ভাগ্যবশতঃ মার্জ্জিত বুদ্ধির সহিত লোকের খলতারও বৃদ্ধি পায়। সভ্যতার সহিত অনেক দোষ সমাজকে আশ্রয় করে। তজ্জন্য কি সভ্যতাকে পদতলে নিক্ষেপ করিয়া ব্রাহ্মণের দৃষ্টান্ত অনুকরণে ইচ্ছুক হইতে হয়?

যতই নিগূঢ় বিদ্যা সমালোচনার বৃদ্ধি হইবে ততই কুসংস্কার ও সামাজিক দোষের লয় হইবে। কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত সেই অবস্থা উপস্থিত না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত দোষ সকল লুপ্ত হওয়া আশা করা আকাশ-পুষ্পের আশার ন্যায় অমূলক। তত্রাপি এতৎসম্বন্ধেও অনেক উৎকর্ষসাধন হইয়াছে বলিতে হইবেক। পূর্ব্বের

---

(৩) বোধ হয় এটি ধনবৃদ্ধির ফল, ইংরেজি শিক্ষার নহে।

(৪) প্রাচীন ভারতবর্ষীয় সভ্যতা ব্রাহ্মণদিগের সৃষ্টি। তাঁহারা পরান্নভোজী ছিলেন।
বং সং।

(৫) বঙ্গদর্শন সম্পাদক ব্রাহ্মণবংশোদ্ভব। তবে বোধ হয় তৎকৃত রাজনারায়ণ বাবুর পক্ষসমর্থন দূষণীয় নহে। রাজনারায়ণ বাবু না পারুন, নিতান্ত পক্ষে আমরা বলিতে পারি, "দেহি দানং দ্বিজাতিভ্যঃ" বং সং।

ন্যায় বাহ্যজ্ঞানরহিত উন্মত্ত ডাক্তার এখন অতি বিরল! বলিতে কি 'ডাক্তার হইলেই মাতাল হয়' এই ভ্রমটি ক্রমে ক্রমে উচ্ছেদিত হইতেছে এবং বেশ্যাগমন, পক্ককেশ মৃত্যুপথগামী ঠাকুরদাদার মধ্যেই বিশেষ প্রবল। (৬) ধর্ম্ম সম্বন্ধে হ্রাস হওয়া যথার্থ শোচনীয় বটে কিন্তু এখনকার যুবকদলের মধ্যে পরমেশ্বরের উপর বিশ্বাস, ভক্তি ও প্রণয় অনেকেরই দৃষ্ট হয়। বিশেষতঃ ব্রাহ্মধর্ম্ম বিদ্যালয়স্থ ছাত্রদিগের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ভবিষ্যতের জন্য পথ পরিষ্কার করিতেছে। এই সকল লক্ষণ পরীক্ষা করিয়া যদ্যপি কেহ সমাজের উন্নতি বিবেচনা না করেন তবে তিনি নিতান্ত অদূরদর্শী বলিতে হইবেক। অনেকে একালকে হিন্দুরাজদিগের স্বাধীনতার কালের সহিত তুলনা করেন। কিন্তু সে সময়ের সহস্র গুণবিভূষিত সামাজিক নিয়ম এখনকার সহস্র দোষবর্জ্জিত নিয়মাবলীর সহিত সমতুল করিতে গেলে তত্রাপি উন্নতি ভিন্ন অবনতি দৃষ্টিগোচর হয় না। (৭)

বিলাত হইতে প্রত্যাগত সুশিক্ষিত যুবকদল দুর্ভাগ্যবশতঃ সকল সমাজেরই অপ্রিয়। সকল অপেক্ষা তাঁহারা উক্ত পুস্তকে গ্রন্থকর্ত্তার নিন্দাস্পদ হইয়াছেন। যাঁহাদের নিকট হইতে অধিক আশা ভরসা করা যায়, সেই আশায় নৈরাশ হইলে তাঁহাদের উপর বিশেষ বিদ্বেষ ভাব জন্মিবার সম্ভাবনা। কিন্তু এস্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে, উক্ত কতিপয় ব্যক্তির মধ্যে কাহার চরিত্র অপযশোভাজন? কেই বা তাঁহাদের মধ্যে মন্দ উদাহরণ প্রদর্শন করিতেছেন এবং কেই বা ক্ষমতা সত্বেও দেশের অমঙ্গল প্রার্থনা করেন? যদ্যপি কেহ একটি দৃষ্টান্ত বাহির করিতে পারেন তবে অবশ্যই তাহার বাক্য গ্রাহ্য স্বীকার করি। যদ্যপি না পারেন, তবে কেন অকারণ তাঁহাদের অপযশ করিয়া লৌকিকে ও পারত্রিকে পতিত হয়েন? তাঁহাদের দোষের মধ্যে এই যে তাঁহারা পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিয়াছেন এবং সাহেবদিগের মত বাস ও আহারাদি করেন। তাহাতে অন্যের ক্ষতি কি? আমরা অব্যর্থ এবং আমাদের মত সকল লোক হীনাবস্থায় দরিদ্র ও অপরিষ্কার অবস্থায় কালাতিপাত করুক এই ইচ্ছা কেবল স্বার্থপর কাপুরুষ ব্যক্তির হীনতা প্রচার করে। (৮)

---

(৬) আমাদের বিবেচনায়, ইহা সত্য। বং সং।

(৭) যিনি পূর্ব্বতন হিন্দুরাজনীতি এবং হিন্দুসমাজের অবস্থা সবিশেষ অবগত আছেন, তিনি কখন একথা বলিবেন না। বং সং।

(৮) কোট পেণ্টুলন এবং পিতলের কাঁটা চামচে অতি অল্প মূল্য। ইচ্ছা করিলে সকলেই সংগ্রহ করিতে পারে। রাগ সেজন্য নহে। তবে যিনি বাঙ্গালি হইয়া বাঙ্গালির আচার ব্যবহার ত্যাগ করেন, তাঁহাকে বাঙ্গালি বলিয়া স্বীকার করিতে কেহই ইচ্ছা করেন না। বং সং।

তৃতীয় পরিচ্ছেদের পরিশিষ্ট

অর্থনীতিমতে জাতিভেদের বিচার

অতঃপর জাতিভেদ নিয়মে সমাজের ধনবৃদ্ধি কিরূপ হয় তাহার প্রতি অনুধাবন করা যাইবেক।

লোকে পৃথক পৃথক কার্য্যে নিযুক্ত না থাকিলে ধনবৃদ্ধি হইতে পারে না। এইরূপ কার্য্যপ্রণালীর নাম শ্রমবিভাগ। অর্থনীতিমতে এতদ্দ্বারা নিম্নলিখিত ফললাভ হয়।

(১) যে ব্যক্তি যে ব্যবসাতে নিযুক্ত থাকে তাহাতে তাহার নিপুণতা বৃদ্ধি হয়।

(২) এক ব্যক্তি নানাবিধ কার্য্যে নিযুক্ত থাকিলে তাহার এককার্য্য ত্যাগ করিয়া অন্য কার্য্য আরম্ভ করিতে কালহরণ এবং তেজঃক্ষয় হয়। কিন্তু সেই সকল কার্য্যের প্রত্যেক কার্য্যে পৃথক্ লোক নিযুক্ত থাকিলে, এই ক্ষতিদ্বয় নিবারিত হইতে পারে।

প্রথম ক্ষতি প্রসিদ্ধ, কিন্তু দ্বিতীয়টির বিষয়ে এস্থলে এইমাত্র বক্তব্য যে মনঃসংযোগ শ্রান্তির এক প্রধান হেতু। মন অল্পকালমধ্যে বহু চিন্তাতে ব্যাপৃত হইলে আমরা সাতিশয় পরিশ্রান্ত হই। নিরবচ্ছিন্ন একটা কার্য্যে ৪ ঘণ্টা পরিশ্রম করিতে যত আয়াস প্রয়োজন, ২ ঘণ্টা করিয়া তুল্য মনঃসংযোগের সহিত দুটি কার্য্যে নিযুক্ত থাকিলে তদপেক্ষা অধিকতর শ্রান্তি হয়। এই জন্য তেজঃক্ষয় নিবারণকে শ্রমবিভাগের একটি গুণস্বরূপ গণনা করা গেল।

(৩) ক্রমশঃ একই কার্য্যে নিযুক্ত থাকিলে শ্রম সুলভ করিবার উপযোগী যন্ত্র আবিষ্কৃত হইতে পারে।

(৪) উল্লিখিত নিপুণতা হইতে ব্যবসার দ্রব্যক্ষয় নিবারিত হয়।

(৫) নানা প্রকারে শ্রম বিভক্ত হইলে নিকৃষ্ট শ্রমজীবিগণ পৃথক্ হইয়া অপেক্ষাকৃত অল্প বেতনে নিযুক্ত হয়, তদ্দ্বারা ব্যবসার উন্নতি ও জনসমাজের লাভ হয়।

অতএব জাতিভেদ প্রথার দ্বারা এই সমস্ত উপকারই হইতেছে এবং শূদ্র বা মিশ্রবর্ণের সংখ্যা বৃদ্ধি ও ব্যবসা পৃথক্ হইয়া সভ্যতার বিলক্ষণ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। কিন্তু সকলেই বুঝিবেন যে ইদানীন্তন যে সকল কার্য্য হইতেছে, তাহার উপযোগী ব্যবসা ভাগ এতদ্দেশে অদ্যাপি হয় নাই। এক কর্ম্মকারের কার্য্য এখন বহুসংখ্যাতে বিভক্ত হইয়াছে। লৌহ উৎপন্ন, লৌহ ঢালাই ও লৌহ পেটাই এবং এইগুলির কত কত প্রকরণ হইয়াছে। ইউরোপীয় প্রথামতে কুম্ভকার কখন নিজে মৃত্তিকাহরণে কালক্ষেপ করিবে না। এইরূপ সকল বিষয়েই এতদ্দেশীয় জাতিভেদ প্রথানুযায়ী শ্রমবিভাগ এবং অন্যদেশের কার্য্যপ্রণালী মধ্যে এই মহাপ্রভেদ দৃষ্ট হইবেক যে এখানে সম্যক্‌রূপে শ্রম বিভক্ত হয় নাই।

আমরা স্থানে স্থানে নানা ব্যবসা হইতে বুদ্ধিসংগ্রহের কথা বলিয়াছি। উল্লিখিত প্রথম ও দ্বিতীয়সংখ্যক বচনে তাহার কোন প্রতিবাদ করা যায় নাই বরং তৃতীয় ফলের সহিত এতদ্দেশের অবস্থা তুলনা করিলে পূর্ব্বোক্ত কথার একটী নূতন প্রমাণ প্রকাশ হইবেক। সকলেই জানেন যে ইউরোপীয়েরা কল প্রয়োগে আমাদিগের অপেক্ষা সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ কিন্তু এতদ্দেশে কলের কোন উন্নতি হয় না কেন ? ইহার যত কারণ থাকুক তন্মধ্যে একটী এই যে, কেহ ব্যবসান্তর হইতে বুদ্ধি সংগ্রহ করে না। ফলতঃ শ্রমবিভাগার্থ অন্য ব্যবসার মর্ম্ম এবং কৌশল জ্ঞাত হইয়া স্ব স্ব ব্যবসাতে তাহা প্রয়োগ করা নিষিদ্ধ নহে বরং নিতান্ত কর্ত্তব্য। আর একটী কথা এই যে, ব্যবসা পৃথক্ হইলে যত কলের বৃদ্ধি না হউক কলের উন্নতিতে শ্রমবিভাগের বিলক্ষণ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। যদি জাতিভেদ নিয়মে কলবৃদ্ধির ব্যাঘাত হওয়া সত্য হয়, তবে তদ্দ্বারা শ্রমবিভাগেরও প্রতিবন্ধকতা হইতেছে।

এ সমস্তই সত্য বটে কিন্তু বংশানুক্রমে ব্যবসাপালনে লাভ কি ?

এতদ্বিষয়ে শিক্ষালাভের সুযোগের কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে। তদ্ভিন্ন বক্তব্য এই যে, যখন মনুষ্য প্রথমতঃ সমাজবদ্ধ হইয়াছিলেন, যখন সকলে জীবিকানির্ব্বাহের নিমিত্ত সর্ব্বতোভাবে স্ব স্ব যত্নের প্রতি নির্ভর না করিয়া, কেহ ভক্ষ্য সংগ্রহার্থে কেহ বা তদুপযোগী অস্ত্রনির্ম্মাণে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, সে সময়ে বংশানুক্রমে ব্যবসা গ্রহণ করাই তাবতের পক্ষে মঙ্গলজনক হইয়াছিল। সন্তান পিতা কর্তৃক প্রতিপালিত হইয়া স্বভাবতঃ তাঁহারই অনুকরণ করিত। পিতাও আপন অর্জ্জিত পশুচর্ম্ম, শুষ্ক ফলমূলাদি অথবা নিতান্ত দুর্লভ অগ্নি এবং একমাত্র আয়ুধ

ধনুর্ব্বাণ স্নেহবশতঃ সন্তানের হস্তেই সমর্পণ করিতেন এবং যিনি এইরূপে যে দ্রব্য পাইতেন, তিনি তদুপযোগী ব্যবসাতেই নিযুক্ত থাকিতেন। অর্থাৎ যখন টাকার সৃষ্টি হয় নাই, তখন দায়াদগণ পূর্ব্বাধিকারীর বৃত্তি গ্রহণ করিলেই কার্য্যের সুবিধা হইত।

কিন্তু এখন পিতৃত্যক্ত ব্যবসার সামগ্রী অবিক্রেয় বলিয়া পৈতৃক ব্যবসা প্রতিপালন করিতে হয়, একথা কেহই বলিতে পারেন না। স্থূল কথা, আলস্য এবং ধারাবহন প্রকৃতিই ইহার মূল।

এস্থলে জাতিভেদসংক্রান্ত কয়েকটী কথা বুঝিবার জন্য ইউরোপীয় বিশেষতঃ ইংলণ্ডের কারখানার কার্য্যপ্রণালীর প্রতি দৃষ্টিপাত করা আবশ্যক। তথায় লোকে পৈতৃক ব্যবসা অবলম্বন করিতে বাধ্য নহে। বাল্যকালে যাহার যেমন সাধ্য কিছুদিন পঠদ্দশাতে থাকিয়া সকলেই এক একটি বৃত্তি গ্রহণ করিবার জন্য কোন ব্যবসায়ীর নিকট আপ্রেন্টিস হয়। নিতান্ত দরিদ্র হইলে সামান্য মজুরি করে কিন্তু তথায় এত বড় বড় কারখানা আছে যে একস্থানে প্রবেশ করিলে নানাপ্রকার কার্য্য দেখিতে পায়, সুতরাং বুদ্ধিমান্ হইলে সামান্য মজুর থাকিয়াও কোন একটী কার্য্য শিখিতে পারে। এবং কর্ত্তার অনুগ্রহভাজন হইলে এরূপ অবস্থা হইতেও বিলক্ষণ উন্নতি লাভ করে, কিন্তু এইসকল লোক কেবল পরের অধীনে কার্য্যে করিয়া সাপ্তাহিক বেতনের দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিয়া থাকে। ইহারা কেহই আপনাদিগের নির্ম্মিত পদার্থ বাজারে বিক্রয় করে না। তাহাদিগের এমন মূলধন নাই যে তদ্দ্বারা দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া কোন গঠন প্রস্তুত করে। তদ্ভিন্ন বড় বড় কারখানা হইতে এত অল্প ব্যয়ে নানা সামগ্রী প্রস্তুত হইয়া থাকে যে, একজন মিস্ত্রি নিজের সঞ্চিত ধন লইয়া একাকী কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে তাহা হইতে জীবিকা লাভ করিতে পারে না। সুতরাং মিস্ত্রিদিগের উন্নতির একমাত্র উপায় বেতনবৃদ্ধি। কারখানাতে বহুসংখ্যক লোকে কার্য্য করে। একজনকে কিঞ্চিৎ বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিলে মালিকের নিষ্কৃতি নাই, কেননা, সকলকেই সেইরূপ বৃদ্ধি দিতে হয়, এই হেতু মিস্ত্রিবর্গ ও কারখানার মালিকগণের মধ্যে তুমুল বিবাদ উপস্থিত হইয়া থাকে।

ইংলণ্ডদেশে কৃষিকার্য্যও সর্ব্বতোভাবে এক একজন সামান্য প্রজার আয়ত্ত নহে। এখানে কৃষকেরা স্বহস্তেই কর্ষণ রোপণাদি করে এবং উৎপন্ন শস্য বিক্রয় পূর্ব্বক জমিদারের কর দেয়, আর বঙ্গীয় জমিদারগণ গোমস্তাদিগের উপর কর সংগ্রহের ভার দিয়া বসিয়া থাকেন। তদ্ভিন্ন শস্যক্ষেত্রগুলি অতি ক্ষুদ্র। ২৫/ ৩০/ বিঘা অপেক্ষা বৃহৎ ক্ষেত্র প্রায় দেখা যায় না। আঢ্য প্রজা হইলে এইরূপ বহু ক্ষেত্র অধিকার করে। কিন্তু ইংলণ্ডের অবস্থা অন্যরূপ। তথায় ১০০০/ ১৫০০/

২০০০/ বিঘা পরিমিত এক একটি ক্ষেত্র *। এক এক জন ব্যক্তি নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য ভূম্যধিকারীর নিকট এইরূপ এক একটী ক্ষেত্র জমা লইয়া তাহাতে গোলাবাটী আদি নির্ম্মাণ করেন এবং ভূমি কর্ষণ ও বীজ রোপণ আদি কার্য্যের নিমিত্ত নানাবিধ কল ও বহুসংখ্যক মজুর নিযুক্ত করেন। নিজেও নিষ্কর্ম্মা থাকেন না, সেসকল বিষয়ে বাহুল্য বর্ণনার প্রয়োজন নাই। এখানকার নীলকর সাহেবগণ ইংলণ্ডীয় কৃষকশ্রেণীর মধ্যে গণ্য। কিন্তু এখানে মজুর না পাইলে ইহাদিগের কার্য্য চলে না।

ইংলণ্ডের মজুরদিগের মধ্যেও বৃত্তিভেদ আছে। কেহই বংশানুক্রমে এক একটি বৃত্তি সেবাতে বাধ্য নহে কিন্তু সকলেরই উপজীবিকা একমাত্র বেতন। শস্যের সহিত কাহারও সম্পর্ক নাই। সুতরাং ইংলণ্ডে কারখানার মিস্ত্রিগণ ও মালিক-সমূহের মধ্যে যেরূপ, কৃষক এবং কৃষিকার্য্যের মজুরগণের মধ্যেও সেইরূপ বেতন বৃদ্ধি বিষয়ে মহাবিবাদ হয়।

মজুর ও মিস্ত্রিগণ আপনাদিগের উদ্দেশ্যসাধনের জন্য সময়ে সময়ে এক-মতাবলম্বী হইয়া স্ব স্ব কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হয়। এদিকে মহাজনের কারখানা বন্ধ থাকিলে নানা ক্ষতি, মূলধনের সুদ লোকসান হয়। অর্দ্ধপ্রস্তুত দ্রব্যজাত ও অর্দ্ধ-কর্ষিত ক্ষেত্র অকর্ম্মণ্যপ্রায় হইয়া উঠে। এবং অন্যান্য কর্ম্মচারিগণকে বসাইয়া বেতন দিতে হয়। সুতরাং অনেক সময়ে অগত্যা বেতনবৃদ্ধি স্বীকার অথবা কোন প্রকারে রফা করিতে হয়।

শ্রমজীবিগণ আপনাদিগের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য এই নিয়মে দলবদ্ধ হইয়া থাকে যে সকলেই সম্প্রদায়ের মঙ্গলার্থ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অর্থদান এবং একবাক্যে মহাজনের সহিত বিসম্বাদ করিয়া বেতন বৃদ্ধির চেষ্টা করিবেক। এতদর্থে দল ও যথাযোগ্য কর্ম্মচারী নিযুক্ত আছে, তাহাদিগের অনভিমতে কেহ কার্য্য করিলে

---

* আমরা এতদ্দেশের একটী ক্ষুদ্র সম্পত্তির চিঠা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলাম। তাহাতে ৪৫৭টী দাগের মধ্যে ক্ষুদ্রতম ক্ষেত্র /২॥ কাঠা এবং বৃহত্তম ক্ষেত্র ৩২॥৪॥ বত্রিশ বিঘা সাড়ে চৌদ্দ কাঠা পরিমিত। সমস্তগুলির গড়হিসাবে প্রতি ক্ষেত্রের পরিমাণ ৪৷১ চারি বিঘা এগার কাঠা মাত্র। ইংলণ্ডদেশস্থ ক্ষেত্রের পরিমাণ সম্প্রতি পুস্তকাভাবে লেখক নির্দ্দিষ্ট বলিতে পারিলেন না কিন্তু তথায় যে সকল প্রাচীন ভূস্বত্বাধিকারী শ্রমজীবীদিগের সম্পত্তি বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে তাদৃশ কোন কোন ক্ষুদ্র ক্ষেত্রের যৎকিঞ্চিৎ নিদর্শন অদ্যাপি ওয়েষ্টমোর্লাণ্ড ও কম্বর্লাণ্ড প্রদেশে আছে। এইরূপ এক একটী ক্ষেত্রের পরিমাণ একস্থানে দেখা গেল ৩০/ একর অর্থাৎ প্রায় ৯০/ বিঘা। এই সকল ক্ষুদ্র সম্পত্তি লোপ হইতেছে বলিয়া অর্থনীতিবেত্তৃগণ আক্ষেপ করেন বটে। কিন্তু ইহা আমাদিগের দেশের ২০।২৫ টী ক্ষেত্রের তুল্য। অতএব তাঁহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষেত্রের যে গুণ বর্ণনা করিয়াছেন তাহা বঙ্গদেশের ক্ষেত্রের প্রতি বর্ত্তে না।

তাহাকে সমাজচ্যুত করে এতাদৃশ সমাজচ্যুত ব্যক্তি আমাদিগের ন্যায় নিমন্ত্রণ বিবাহাদিতে নিগৃহিত হয় না। কিন্তু তাহার সহিত কোন মিস্ত্রি কি মজুর একত্র কার্য্য করে না—সুতরাং মহাজনেরা অগত্যা তাহাকে পরিত্যাগ করেন এবং তাহার জীবিকা লাভ করা দুর্ঘট হইয়া উঠে। এই ভয়ে মজুরগণ বিবাদ করিতে যায় না, সমাজের অনুগত হইয়া থাকে। কিন্তু ইংলণ্ডীয় মজুরদিগের যেমন তেজ অধ্যবসায় ও কার্য্যক্ষমতার প্রশংসা করিতে হয় তদ্রূপ তাহাদিগের দোষও আছে, মজুর সমাজ হইতে বিলক্ষণ দুর্ব্বলের পীড়নও হইয়া থাকে। উল্লিখিত চাঁদার দ্বারা শ্রমজীবীদিগের সমাজে যে ধনসঞ্চিত হয়, মহাজনের সহিত বিবাদ উপস্থিত হইলে তাহা হইতে দরিদ্র মজুরগণ গ্রাসাচ্ছাদনের নিমিত্ত কিছু কিছু পাইয়া থাকে কিন্তু তাহাতে সম্পূর্ণ উদর পোষণ না হইলে সে স্বেচ্ছামত বেতন লইয়া কার্য্য করিতে পারে না সুতরাং তাহাকে অনেক কষ্ট সহ্য করিতে হয়।

ইংলণ্ডীয় শ্রমজীবিগণ সম্পত্তিবিহীন এবং প্রতি সপ্তাহে কিছু কিছু বেতন পায় বলিয়া বিস্তর অপব্যয় করে ও কাঁচা পয়সা হইতে ধনসঞ্চয় করিতে পারে না। বার্দ্ধক্য কি রোগগ্রস্ত বিধায় নিঃসহায় এবং অক্ষম হইলে তাহাদিগের দুর্দ্দশার সীমা থাকে না। বাস্তবিক ইংলণ্ডে এই সকল কারণে শ্রমজীবীদিগের মধ্যে নিঃস্ব ব্যক্তির সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং তাহাদিগের অবস্থা যারপরনাই শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে।

আমাদিগের জাতিভেদ প্রথাতে এরূপ কোন অত্যাচার বা যন্ত্রণা নাই। শ্রমজীবী ও মহাজনের বিবাদ শ্রমকারীদিগের মধ্যে বলবান্ কর্তৃক দুর্ব্বলের পীড়ন অথবা নিঃসহায়ের ক্ষতিবৃদ্ধি কিছুই নাই। ইহা সামান্য সৌভাগ্যের বিষয় নহে।

সম্প্রতি উল্লিখিত দুরবস্থামোচনার্থ ইউরোপে এক নূতন ব্যবসাপ্রণালী উদ্ভাবিত হইয়াছে। আমরা অনুমান করি যে তাহার সহিত জাতিভেদ প্রথার এক নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে। ঐ প্রণালীর স্থূল কথা এই যে শ্রমজীবিগণ মহাজনের অধীন কার্য্য না করিয়া বহুসংখ্যক লোক স্ব স্ব যৎসামান্য সঞ্চিত ধন একত্রিত করণান্তর আপনারাই মহাজন মিস্ত্রি ও মজুর হইয়া কার্য্য করে।

ইদানীন্তন অর্থশাস্ত্রবেত্তারা “কু-অপরেটিভ” (co-operative) নামক এই কার্য্যপ্রণালীর মহাসুখ্যাতি করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের মতে এতদ্দ্বারা শ্রমজীবীদিগের দুই মহোপকার হয়। তাহাদিগের অর্জ্জিত সমস্ত ধন উহারা নিজেই লাভ করে এবং তাহা মহাজনের হস্তগত হইতে পায় না। আর তাহাদিগের ধনবৃদ্ধি এবং দারিদ্র্য মোচনের উপায় হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন এই প্রণালীতে শ্রমজীবিগণ স্ব স্ব কার্য্যে অধিকতর মনঃসংযোগ করে এবং তদ্ধেতু তাহাদিগের শ্রমোৎপন্ন কার্য্য অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠতর হয়।

কিন্তু একটী বিষয়ে আমরা অর্থনীতি পুস্তকাদিতে কোন উল্লেখ দেখি নাই।

উল্লিখিত কু-অপরেটিভ কার্য্যপ্রণালীর সার মর্ম্ম এই যে ধন ও শ্রম একই আধারে একত্রিত হইলে পরস্পরের বিসম্বাদ অপনীত হয়। কিন্তু ধন বংশানুক্রমে অধিকৃত হইয়া থাকে, অতএব যদি শ্রম অর্থাৎ বৃত্তি ধনের অনুগামী হয় তবে ক্রমশঃ জাতিভেদ নিয়ম সংস্থাপিত হওয়া অসম্ভাবিত নহে। মনে কর, একদল মজুর প্রাগুক্ত প্রণালীতে একটী তুলার কারখানা স্থাপন করিল। উহারা ঐ কারখানায় কার্য্য করিবেক। এবং উহাদিগের সন্ততিগণ পৈতৃক সম্পত্তি অর্থাৎ কারখানায় সেয়ার অধিকার করিলে তাহা রক্ষা করিবার জন্য পৈতৃক ব্যবসা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইবেক। ইংলণ্ডবাসীদিগের প্রকৃতিগুণে অথবা তথায় ক্রয়বিক্রয়ের প্রাদুর্ভাবে কু-অপরেটিভ শ্রমজীবীদিগের সেয়ার যদি বিক্রীত হইয়া এত ক্ষতি নিবারিত হয়, সেকথা এখন বলা যায় না। কিন্তু শ্রম ও ধন একাধারে একত্রিত হইলে জাতি উৎপন্ন হইতে পারে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

আমরা জাতিভেদ প্রথার বিরোধী। তথাচ একথা স্বীকার করিতে হইবেক যে ইংলণ্ডে এই নিয়ম প্রচলিত থাকিলে তথাকার শ্রমজীবীদিগের এমত দুরবস্থা হইত না। কিন্তু তাহাদিগের এতাদৃশ দুর্দ্দশার এক হেতু এই যে ইংলণ্ডে শ্রমজীবীদিগের ভূমিসম্পত্তি নাই; এবং কারখানার ব্যাপার অন্যান্যদেশ অপেক্ষা বিস্তৃত। এতদ্দেশীয় ভূসম্পত্তিতে কৃষকদিগের যে কিঞ্চিৎ স্বত্ব আছে, তাহাই উহাদিগের এক প্রধান রক্ষার স্থল। আর এই কারণ হইতেই বোধ হয় একপক্ষে কৃষকগণের জাতীয় ব্যবসা পরিত্যাগ করা কঠিন এবং পক্ষান্তরে কারখানার উন্নতির প্রতি কিঞ্চিৎ ব্যাঘাতও হইতেছে।

অনেকে এতদ্দেশের জমিদারী বন্দোবস্ত ও জমিদারদিগকে বিস্তর দোষ দিয়া থাকেন, কেননা, এখানে জমিদারেরা ইংলণ্ডের কৃষকদিগের অর্থাৎ নীলকরসাহেবদিগের ন্যায় ভূমিসম্পত্তির শ্রীবৃদ্ধির নিমিত্ত সম্যক্ প্রকারে যত্নবান হন না। কিন্তু ভূস্বত্ব বিভাগ হইলে বিস্তর অনর্থ উপস্থিত হইয়া থাকে। প্রজাগণের কিছু স্বত্ব আছে বলিয়াই জমিদারেরা আপনাদিগের স্বত্ব ও ক্ষমতানুসারে অর্থব্যয় করিয়া লভ্য বৃদ্ধির চেষ্টা করেন না। ফলতঃ তাঁহারা প্রজার সহিত শ্রমবিভাগ করিয়া কেবল করসংগ্রহের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। বস্তুতঃ পূর্ব্বে রাজাগণ যেরূপ আচরণ করিতেন, জমিদারেরা তাহারই অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন।* যদি ইঁহারা তৎপরিবর্ত্তে নীলকরদিগের ন্যায় ব্যয় ভূষণ করিয়া ভূমির উন্নতি

---

*এই বিষয়ে Baillie সাহেবকৃত The Land Tax of India নামক পুস্তকের xxxvii পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। তাহাতে এতদ্বিষয়ে যে কল্পনা প্রকাশ হইয়াছে তাহা পাঠ করিবার পূর্ব্বে এই প্রবন্ধ রচিত হইয়াছিল। ভূ: নঃ।

করিতেন, তাহা হইলে অচিরাৎ কৃষিবর্গ ইংলণ্ডীয় শ্রমজীবীদিগের ন্যায় নিঃস্ব হইয়া যাইত। কারণ কৃষিকর্ম্মে প্রজাগণ এখন কিয়ৎপরিমাণে ধনের মালিক ও সর্ব্বতোভাবে শ্রমের কর্ত্তা। কিন্তু তাহাদিগের হস্ত হইতে ধনব্যয়ের ভার জমিদার কর্ত্তৃক গৃহীত হইলে লভ্যের ভাগও অল্প হইয়া যাইত এবং প্রকৃত প্রস্তাবে উহারা ইংলণ্ডীয় শ্রমজীবীদিগের ন্যায় হইয়া উঠিত।

আমরা জাতিভেদ প্রথাতে শ্রমবিভাগের কথা বলিয়াছি কিন্তু বিভিন্ন প্রকার শ্রমের সমাহরণ না করিলে পূর্ণ উন্নতি হইতে পারে না। আমরা পূর্ব্বে চতুর্ব্বর্ণকে এক ব্রহ্মদেহে সমাহৃত বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছি। ইদানীন্তন নানাবিধ কলের প্রতি লক্ষ্য করিলে প্রকাশ হইবেক যে শ্রমসমাহরণ কি অদ্ভুত পদার্থ। উদাহরণস্থলে বক্তব্য এই যে একজন লোক এক উদ্দেশ্যে পৃথক্‌রূপে নিযুক্ত থাকিয়া প্রত্যহ ১৫,৫০০ খানা তাস প্রস্তুত করিয়া থাকে কিন্তু এই কার্য্য একক নির্ব্বাহ করিতে হইলে প্রত্যেক ব্যক্তি দিনে ঊর্দ্ধসংখ্যা ২খানা প্রস্তুত করিতে পারে। ইহাতে শ্রমবিভাগ ও শ্রমসমাহরণ উভয়েরই দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইল। কেননা, যেমন এই কার্য্য ত্রিশ জনের মধ্যে বিভক্ত হইয়া শ্রম লাঘব হইয়াছে সেইরূপ ঐ ত্রিশ জন একই উদ্দেশ্যে এবং পরস্পরের সাহায্যে নিযুক্ত হওয়াতেই এই উপকার হইতেছে। জাতিভেদক্রমে শ্রমবিভাগের লক্ষণ এখনও দৃষ্ট হয় কিন্তু শ্রমসমাহরণের কথা যে শাস্ত্রকারদিগের মনে কখন উদয় হইয়াছিল তাহার বিষয় উল্লিখিত ব্রহ্মদেহবিষয়ক রূপক ব্যতীত অন্য প্রমাণাভাব।

এই দীর্ঘ প্রস্তাবের উপসংহারস্থলে ইহার সারকথার পুনরুক্তি করা যাইতেছে।

১। হিন্দুশাস্ত্রে জাতিভেদের আদি বিষয়ে নানা বৃত্তান্ত দৃষ্ট হয়। এবং পাশ্চাত্যগণও বিবিধ কল্পনা করিয়া থাকেন। স্থূল কথা এই যে এতদ্দেশীয় জাতিসমগ্রের আদিবৃত্তান্ত স্থির করা অসাধ্য।

২। অনন্তর অন্যান্য দেশেও জাতিভেদের কতিপয় লক্ষণ প্রদর্শিত হইয়াছে। তাহার সারকথা এই যে অন্যত্র লোকে আমাদিগের ন্যায় সামাজিক প্রথা পরিবর্ত্তন করণের অধিকার ত্যাগ করে নাই।

৩। পরে, জাতিভেদ ও কৌলীন্যপ্রথার তুলনা করিয়া উভয়েই অনুলোম ও প্রতিলোম বিবাহ বিষয়ক নিয়ম এবং তদ্ধেতুক কৌলীন্যপ্রথাতে বহু বিবাহ ও বিবাহসঙ্কট উৎপত্তি প্রদর্শিত হইয়া তুলনার দ্বারা এই কল্পনা করা গিয়াছে যে ঐ দুই দোষ নিবারণ করা, অনুলোম বিবাহ রহিত করিবার আংশিক উদ্দেশ্য ছিল।

৪। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে জাতিভেদের বর্ত্তমান অবস্থা পর্য্যবেক্ষণে প্রবৃত্ত হইয়া আমরা **বংশ** যথা আর্য্যবংশ, **জাতি** যথা ইংরেজ, ফরাসিজাতি এবং **বর্ণ** যথা

ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ইত্যাদি এইরূপে উক্ত তিনটি শব্দের বিভিন্ন অর্থ করিয়াছি। এবং তাহাকেই জাতীয় ঐক্যের লক্ষণ বলিয়া গ্রহণ করা গিয়াছে।

৫। পরে বিভর্লি সাহেবের লোকসংখ্যা রিপোর্টে কতকগুলি বর্ণকে পৃথক্ জাতি বলিয়া গণ্য করাতে এবং সমগ্র বঙ্গভাষিগণের সংখ্যা না করা কারণে তাঁহার নিন্দা করা গিয়াছে।

৬। তদনন্তর কোন কোন পুরাণ ও লোকাচার অনুসারে প্রদর্শিত হইয়াছে যে অমিশ্র শূদ্র বর্ণ এখন দেখা যায় না এবং বর্ত্তমান বর্ণসমূহের তারতম্যভেদ বিষয়ে বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণের বাক্য গ্রহণ করা গিয়াছে।

৭। পরিশেষে উক্ত পুরাণানুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের ও সমস্ত বঙ্গভাষিগণের আনুমানিক সংখ্যা দেওয়া গিয়াছে।

৮। তৃতীয় পরিচ্ছেদে জাতিভেদ প্রথার নিগূঢ় মর্ম্ম অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া প্রদর্শন করা গিয়াছে যে এতদ্দেশেও দেশাচার পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে এবং জাতিভেদের নিগূঢ় মর্ম্মের আলোচনা করিলে লোকে ক্রমশঃ কুপ্রথা পরিত্যাগ করিবেক এমত প্রত্যাশা করা যাইতে পারে।

৯। সর্ব্বশেষে প্রাণিতত্ত্ব মতে এবং ব্যবসা শিক্ষা ও সমাজ শাসনের নিমিত্তে জাতিভেদ প্রথা হইতে কোন কোন উপকার হইয়া থাকে এবং ধনবৃদ্ধি বিষয়ে বৃত্তিবিভাগের গুণ ও জাতিভেদ হইতে শ্রমজীবীদিগের কোন কোন দুরবস্থা নিবারণ হয়, এই সকল তত্ত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু অধিকাংশ স্থলে এই কথা লক্ষিত হইয়াছে যে সভ্যতার আদিম অবস্থায় জাতিভেদ হইতে যতই মঙ্গল উৎপন্ন হইয়া থাকুক, বর্ত্তমানকালে কেবল ধারাবহনপ্রকৃতি হইতে উক্ত প্রথা এতদ্দেশে রক্ষিত হইতেছে। অন্যত্র লোকে ঐ প্রকৃতির এতাদৃশ বশবর্ত্তী নহে এবং বাহুল্য পরিমাণে শ্রমশীল। এইজন্যই তাহাদিগের মধ্যে এই প্রথার অঙ্কুর থাকাতেও তাহা প্রকৃষ্টরূপে বদ্ধমূল হইতে পারে নাই।

১০। পরিশেষে দুইটী কথার প্রতি লক্ষ্য করা আবশ্যক (১) জাতিভেদ মঙ্গলজনক নহে। (২) প্রকৃতি সহজে পরিবর্ত্তন হইবার নহে। অতএব জাতিভেদ নির্ম্মূল করিবার জন্য উৎসাহিত হইবার সময়ে স্মরণ করা কর্ত্তব্য যে এই উদ্যমে সহসা ফললাভ করিবার সম্ভাবনা নাই। বৈষ্ণব, খ্রীষ্টান ও ব্রাহ্মগণ এই চেষ্টাতে নিযুক্ত হইয়া কেবল তিনটী নূতন বর্ণ সংস্থাপন করিয়াছেন। জাতিভেদবিশিষ্ট সমাজের সহিত বিবাদ করিলে উভয় পক্ষেই ধারাবহন প্রকৃতি বরং বদ্ধমূল হইবেক। অতএব স্বানুবর্ত্তিতা অভাবে কেবল সংকল্প করিয়া আচার ব্যবহারের পরিবর্ত্তন চেষ্টা করা বৃথা। কিন্তু যদি কোন প্রথা দূরীকৃত করিলে জাতিভেদ অপনীত হইবার সম্ভাবনা থাকে, তবে সেই প্রথা বালিকা-বিবাহ।

উন্নতিপ্রিয় ব্রাহ্মগণও কেমন ধারাবহন প্রকৃতিতে আচ্ছন্ন তাহা এই কথাতে ব্যক্ত হইবেক যে তাঁহারা বিস্তর যত্ন করিয়া বিবাহ বিষয়ে ন্যূন বয়সের এক আইন করিয়া লইয়াছেন। তাঁহাদিগের এবং সকল সমাজসংস্কারকের স্থূল উদ্দেশ্য এই যে বিবাহ বিষয়ে লোকের যতদূর সম্ভব স্বাধীনতা বর্দ্ধিত হউক, কিন্তু যেন ব্যভিচার বৃদ্ধি না ঘটে। শাস্ত্রকারেরা যে অভিসন্ধিতেই হউক, এই নিয়ম করিয়াছিলেন যে এত বয়সের মধ্যে সকল কন্যার বিবাহ দিতেই হইবেক। ইহাতে স্বাধীনতার ব্যাঘাত হইয়াছিল, কারণ, কেহ বয়ঃক্রমের ঊর্দ্ধ সীমা অতিক্রম করিতে পারিতেন না এবং কন্যাগণ পিতামাতার গলগ্রহ হইয়া উঠিলেন। অতএব এই নিষেধ মুক্ত করিলেই যথেষ্ট। কিন্তু ব্রাহ্মগণ ধারাবহনপ্রকৃতির বশবর্ত্তী হইয়া শাস্ত্রকারদিগের ঊর্দ্ধ সংখ্যার স্থলে একটী ন্যূন সংখ্যা প্রবর্ত্তন করিতে যত্ন পাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতেও প্রকারান্তরে স্বাধীনতার বিঘ্ন হয়। মানব মনের প্রকৃতিই এইরূপ যে একটীর স্থলে আর একটী প্রথা স্থাপন না করিলে যেন ফাঁক ফাঁক বোধ হয়। আমাদিগের সমাজ এখন শাস্ত্রীয় নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এখন কন্যার বিবাহ না দিলে নয় এই সংস্কার বিনষ্ট হইলে অনেক উন্নতির সোপান হইবেক।

কন্যার বিবাহ দেওয়া কঠিন বলিয়া আমরা লোকমুখে অনেক আক্ষেপ শুনিয়া থাকি। কিন্তু যাঁহারা আক্ষেপ করেন, বোধ হয়, তাঁহারা বিপরীত অবস্থার প্রতি সম্যক্‌রূপে লক্ষ্য করেন না। পূর্ব্বে পুত্রসন্তানের সংখ্যাধিক্য জন্য অথবা কৌলীন্য মর্য্যাদা হেতুক কিম্বা অন্য যে কারণেই হউক কন্যার বিবাহ দেওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ ছিল। তাহার ফল এই হইয়াছিল যে, পঞ্চম বৎসর অতীত হইবার পূর্ব্বেই অনেক কন্যার বিবাহ হইত। গৌরীদান আদি সেই সময়ের কীর্ত্তি। এখনও ইতরবর্ণদিগের মধ্যে কন্যার সংখ্যা অল্প হইলে এইরূপ হইয়া থাকে। এইরূপ এক একটি কন্যার বিস্তর পণ এবং তাহারা অর্থলোলুপ জনক জননীর সম্বলবিশেষ। এস্থলে শ্রোত্রীয় ও বংশজ ব্রাহ্মণদিগের কথা স্মরণ হইবেক। অতএব যাঁহারা বর্ত্তমান অবস্থার নিন্দা করেন, তাঁহারা কি এইরূপ প্রথার প্রত্যাবর্ত্তন কামনা করেন? নতুবা পাত্রের "পাস" সংখ্যা করিয়া পণ দিতে হয় বলিয়া এত কাতরোক্তি কেন?

ধারাবহন প্রকৃতির মূল কি? ইহা বিশ্লেষকার্য্যে অক্ষমতা এবং দৈববলে বিশ্বাস হইতে উৎপন্ন হয়। এইরূপ বিশ্বাস ব্যক্তিবিশেষের উপরে স্থাপিত হইলে তাহা হইতে একপ্রকার আজ্ঞানুবর্ত্তিতার উদয় হয়—তাহাতে কোন বিষয়ের নিগূঢ় অনুসন্ধানের বাসনা থাকে না, স্থূল স্থূল দুই একটী বিষয় উপলব্ধ করিয়া পূর্ব্বাশ্রিত বিশ্বাস অনুসারেই লোকে বিবেচ্য বিষয়ের মর্ম্ম স্থির করে। কিন্তু যাহারা জ্ঞানসহকারে আত্মসংযমের দ্বারা আজ্ঞানুবর্ত্তী হয় তাহাদিগের প্রকৃতি বিভিন্ন। মনুষ্য যে মনের জড়তা জন্য নূতন ভাবের অভ্যুদয়হেতুক ব্যক্তি বা উক্তিবিশেষের অনুসারী

হয় তাহা নিতান্ত মূঢ়তার ফল। ইহাতেই লোকে নৃপতি, গো, ব্রাহ্মণে ঐশীশক্তি-সম্পন্ন মনে করে।

আজ্ঞানুবর্ত্তী ব্যক্তি আজ্ঞাদাতা দেখিলেই তাহার অধীনতা স্বীকার করে। আজ্ঞাদাতৃগণও তুল্যপ্রকৃতিসম্পন্ন, অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের আজ্ঞানুবর্ত্তী। ইহাই বর্ণসমুচ্চয়ের পারম্পর্য্য বিধানের হেতু। অনন্তর শ্রমশীলতার উন্নতি সহকারে বৃত্তিভেদ এবং স্বার্থরক্ষার নিমিত্ত বিবাহসম্বন্ধীয় নিয়ম ইহার উপরে আশ্রয় করিয়াছে।

দুর্ব্বল ব্যক্তি আজ্ঞানুবর্ত্তী হইলে তাহার প্রকৃতিতে একপ্রকার কোমলতা উৎপন্ন হয়, তাহাতে লোক বলবানের বশবর্ত্তী হইয়া থাকে। কিন্তু স্বাধীনতা পাইলে কেবল ধারাবাহিক মতেই কার্য্য করে। তখন আজ্ঞানুবর্ত্তিতা, মনুষ্য দেবতা অভাবে, লোকাচার অথবা শাস্ত্রোক্তির অনুগামী হয়। এবং যদি কোন প্রকারে এই ভক্তি বিচলিত হইয়া যায়, অথচ পাত্রান্তরে স্থাপিত না হয়, তাহা হইলে বুদ্ধি-বিবেচনার নিয়ামক অভাবে এতাদৃশ লোকের চরিত্রে মহা বিকৃতি উপস্থিত হয়। এদেশীয় লোকেরা এখন এই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে।

কেহ কেহ বলিতে পারেন যে এতদ্দেশস্থ প্রাচীন নিরীশ্বরবাদিগণ দৈবশক্তি বিশ্বাস করিতেন না এবং নৈয়ায়িকদিগকে বিশ্লেষ কার্য্যে অপটু বলা অসঙ্গত। বস্তুতঃ ইহারা অন্য হেতু বশতঃ ধারাবহনপ্রকৃতির অপনয়নে পরাঙ্মুখ হইয়াছিলেন। ঈশ্বরবাদী হউন বা নিরীশ্বরবাদী হউন, এতদ্দেশের জ্ঞানী ব্যক্তিগণ সকলেই দুটী বিষয়ে ঐক্য ছিলেন। ১। জীবনের উদ্দেশ্য সুখ। ২। সংসারে যে সুখলাভ হয় তাহাকে সর্ব্বতোভাবে দুঃখ হইতে বিচ্ছিন্ন করা অসাধ্য, অতএব নির্ব্বাণস্বরূপ সুখই সর্ব্বপ্রধান। নির্ব্বাণলাভের জন্য চিত্তচাঞ্চল্যজনক কার্য্যমাত্রই নিষিদ্ধ; ধারাবহন প্রকৃতি এই নিষেধের মহোপযোগী। সুতরাং জ্ঞানী মূর্খ উভয়েই ধারাবাহন বিষয়ে একমতাবলম্বী হইয়াছিলেন।

ইহার মীমাংসা এইরূপে হইতে পারে। জীবনের উদ্দেশ্য সুখ একথা স্বীকার করিলেও, একথা প্রসিদ্ধ যে সুখ লাভ করিব মনে করিয়া যে কোন কার্য্য কর তাহাতে সুখ হয় না, কিন্তু অন্য উদ্দেশে যে কার্য্যেই তদ্গতচিত্তে প্রবৃত্ত হও তাহাতেই সুখলাভ হয়। অতএব হিন্দুশাস্ত্রবেত্তৃগণের প্রতিষ্ঠিত বৈরাগ্যের উপাসনাতে কোন আতিশয্য নাই। সংসারের উৎকৃষ্ট কার্য্যকে জীবনের উদ্দেশ্য গণ্য করিলেই উভয় দিক্ রক্ষা হয়। যথা কোমৎ বলেন উন্নতিই জীবনের উদ্দেশ্য, শৃঙ্খলা কার্য্যের ভিত্তিস্বরূপ এবং মায়া সকল ক্রিয়ার নিয়ম হউক।

শ্রীযঃ।

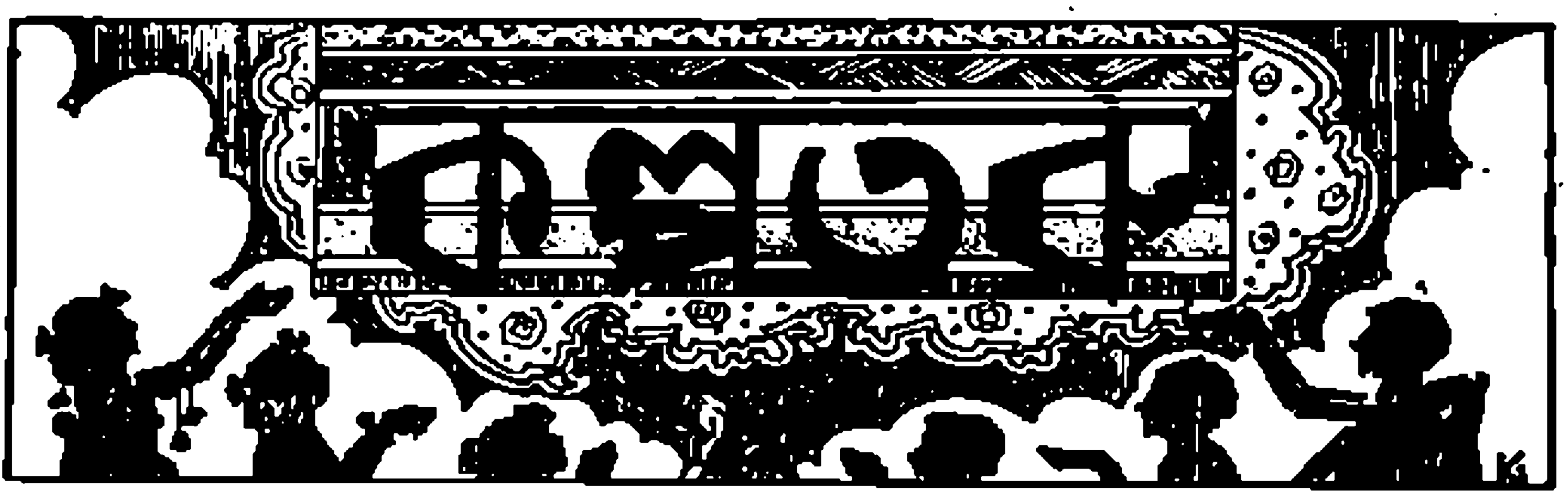

গদ্যোপন্যাসকে সচরাচর আমরা কাব্যই বলিয়া থাকি। কাব্যের বিষয় মনুষ্যচরিত্র। মনুষ্যচরিত্র ঘোরতর বৈচিত্রবিশিষ্ট। মনুষ্য স্বভাবতঃ স্বার্থপর, এবং মনুষ্য, স্বভাবতঃ পরদুঃখে দুঃখী এবং পরোপকারী। মনুষ্য পশুবৃত্ত এবং মনুষ্য দেবতুল্য। সকল মনুষ্যের চরিত্রই এইরূপ বৈচিত্রবিশিষ্ট; এমন কেহ নাই যে, সে একান্ত স্বার্থপর, এবং এমন কেহ নাই যে সে একান্ত স্বার্থবিস্মৃত পরহিতানুরক্ত; কেহই নিতান্ত পশু নহে, কেহই নিতান্ত দেবতা নহে। এই পশুত্ব ও দেবত্ব, একত্রে, একাধারে সকল মনুষ্যেই কিয়ৎপরিমাণে আছে; তবে সর্ব্বত্র উভয়ের মাত্রা সমান নহে। কাহারও সদ্গুণের ভাগই অধিক, অসদ্গুণের ভাগ অল্প; সে ব্যক্তিকে আমরা ভাল লোক বলি; যাহার সদ্গুণের ভাগ অল্প, অসদ্গুণের ভাগ অধিক তাহাকে মন্দ বলি। কিন্তু এইরূপ দ্বিপ্রকৃতিত্ব সকল মনুষ্যেরই আছে; মনুষ্যচরিত্রই দ্বিপ্রাকৃতিক; দুইটি বিসদৃশ ভাগে মনুষ্য হৃদয় বিভক্ত।

কাব্যের বিষয় মনুষ্যচরিত্র; যে কাব্য সম্পূর্ণ, তাহাতে এই দুই ভাগই প্রতিবিম্বিত হইবে। কি গদ্য, কি পদ্য, প্রথম শ্রেণীর গ্রন্থ মাত্রেই এইরূপ সম্পূর্ণতাযুক্ত। কিন্তু কোন কোন কবি, এক এক ভাগ মাত্র গ্রহণ করেন। তাঁহারা যে মনুষ্যের দ্বিপ্রকৃতিত্ব অবগত নহেন, এমত নহে; তবে তাঁহারা বিবেচনা করেন যে, যেমন একত্রে সমাবিষ্ট মনুষ্যচরিত্রের ভাল মন্দ অধীত এবং পর্য্যবেক্ষিত করা আবশ্যক, তেমনি উহা পৃথক্ পৃথক্ করিয়া অধীত এবং পর্য্যবেক্ষিত করাও আবশ্যক। যেমন একটি যুক্ত বর্ণের উচ্চারণ শিখিবার পূর্ব্বে যে বর্ণদ্বয়ের যোগে তাহা নিষ্পন্ন হইয়াছে, তত্তৎ উচ্চারণ অগ্রে পৃথক্ পৃথক্ করিয়া শিখা কর্ত্তব্য, তেমনি মনুষ্যচরিত্রের অংশদ্বয়কে বিযুক্ত করিয়া পৃথক্ পৃথক্ অধ্যয়ন করা বিধেয়। এইরূপ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া কতকগুলি কবি মনুষ্যচরিত্রের অংশমাত্র গ্রহণ করেন। যাঁহারা মহদংশ গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের গ্রন্থের এক বিশিষ্ট উদাহরণ বিক্টর

কল্পতরু। শ্রীইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। কলিকাতা। ক্যানিং লাইব্রেরী। ১২৮১।

হ্যুগোর গদ্য কাব্যাবলী। যাঁহারা অসদ্ভাগ গ্রহণ করেন, তাঁহারা প্রায় রহস্য-লেখক। ইঁহাদিগের চূড়ামণি সরবন্টিস্। ইঁহাদিগের গ্রন্থসকল অতি উৎকৃষ্ট হইলেও, অসম্পূর্ণ কাব্য।

এই সম্প্রদায়ের কেবল দুইজন লেখক বাঙ্গালা ভাষায় সুপরিচিত; প্রথম, টেকচাঁদ ঠাকুর; দ্বিতীয়, হুতোম পেঁচা লেখক। অদ্য সেই সম্প্রদায়ের তৃতীয় লেখকের পরিচয় দিতেছি।

বাবু ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় একখানি মাত্র গ্রন্থ প্রচার করিয়া, বাঙ্গালায় প্রধান লেখকদিগের মধ্যে স্থান পাইবার যোগ্য বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। রহস্যপটুতায়, মনুষ্যচরিত্রের বহুদর্শিতায়, লিপিচাতুর্য্যে, ইনি টেকচাঁদ ঠাকুর এবং হুতোমের সমকক্ষ, এবং হুতোম ক্ষমতাশালী হইলেও পরদ্বেষী, পরনিন্দক, সুনীতির শত্রু, এবং বিশুদ্ধ রুচির সঙ্গে মহাসমরে প্রবৃত্ত। ইন্দ্রনাথ বাবু পরদুঃখে কাতর, সুনীতির প্রতিপোষক, এবং তাঁহার গ্রন্থ সুরুচির বিরোধী নহে। তাঁহার যে লিপিকৌশল, যে রচনাচাতুর্য্য, তাহা আলালের ঘরের দুলালে নাই—সে বাক্‌শক্তি নাই। তাঁহার গ্রন্থে রঙ্গদর্শনপ্রিয়তার ঈষৎ মধুর হাসি ছত্রে ছত্রে প্রভাসিত আছে, অপাঙ্গে যে চতুরের বক্র দৃষ্টিটুকু পদে পদে লক্ষিত হয়, তাহা না হুতোমে, না টেকচাঁদে, দুইয়ের একেও নাই। তাঁহার গ্রন্থ রত্নময়, সর্ব্বস্থানেই মুক্তা প্রবালাদি জ্বলিতেছে। দীনবন্ধু বাবুর মত, তিনি উচ্চ হাসি হাসেন না, হুতোমের মত "বেলেল্লা গিরিতে" প্রবৃত্ত হয়েন না, কিন্তু তিলার্দ্ধ রসের বিশ্রাম নাই। সে রসও উগ্র নহে, মধুর, সর্ব্বদা সহনীয়। "কল্পতরু" বঙ্গভাষায় একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ।

যাহাকে সম্পূর্ণ কাব্য বলিয়াছি, এগ্রন্থ তাহার মধ্যে গণ্য নহে। যিনি মনুষ্যের শক্তি, মনুষ্যের মহত্ব,—সুখের উচ্ছ্বাস, দুঃখের অন্ধকার দেখিতে চাহেন, তিনি এগ্রন্থে পাইবেন না। যিনি মনুষ্যের ক্ষুদ্রতা, নীচাশয়তা, স্বার্থপরতা, এবং বুদ্ধির বৈপরীত্য দেখিতে চাহেন, তিনি ইহাতে যথেষ্ট পাইবেন। যিনি তমোভিভূত অথচ ভীরু, নির্ব্বোধ, ভণ্ড, ইন্দ্রিয়পরবশ আধুনিক যুবা দেখিতে চাহেন, তিনি নরেন্দ্রনাথকে দেখিবেন। যিনি শঠ, বঞ্চক, লুব্ধ, অপরিণামদর্শী, বাচাল, "চালাকদাস" দেখিতে চাহেন, তিনি রামদাসকে দেখিবেন। যে সকল বন্য জন্তুগণ অনতিপূর্ব্বকালে সাহেবের কাছে নথি পড়িয়া অর্থ ও মেদ সঞ্চয় করিত, কালীনাথ ধরে, তাহারা জাজ্বল্যমান; এবং ধরপত্নী গৃহিণীর চূড়া। গবেশচন্দ্র নায়কের চূড়া। তাঁহার মত সুদক্ষ, অস্বার্থপর মনুষ্যরত্নের পরিচয়—পাঠক স্বয়ং লইবেন!

এই সকল চিত্র প্রকৃতিমূলক—কিন্তু তাহাদিগের কার্য্য আত্যন্তিকতাবিশিষ্ট। যে যাহাতে উপন্যাসের বিষয়, রহস্যলেখক তাহার সেই প্রবৃত্তিঘটিত কার্য্যকে

আত্যন্তিক বৃত্তি দিয়া চিত্রিত করেন। এ আত্যন্তিকতা দোষ নহে—এটি লেখকের কৌশল। এই গ্রন্থে বিবৃত সকল কার্য্যই আত্যন্তিকতাবিশিষ্ট। গ্রন্থে এমন কিছুই নাই, যে আত্যন্তিকতাবিশিষ্ট নহে।

মনুষ্যহৃদয়ের যে সকল সৎপ্রবৃত্তি, গ্রন্থকার তাহা গ্রন্থমধ্যে একবারে প্রবেশ করিতে দেন নাই। মধুসূদন ভ্রাতৃবৎসল, এবং নিতান্ত নিরীহ—তদ্ভিন্ন গ্রন্থোক্ত নায়ক নায়িকার কাহারও কোন সদ্‌গুণ নাই। মনুষ্যহৃদয়ের সদ্‌গুণের পরিচয়ও লেখকের অভিপ্রেত নহে। যাহা তাঁহার অভিপ্রেত তাহাতে তিনি সিদ্ধকাম হইয়াছেন বলিতে হইবে।

গল্পটি অতি সামান্য; সহজে বলিতে ছত্র দুই লাগে। আলালের ঘরের দুলাল ইহা অপেক্ষা বৈচিত্রবিশিষ্ট। আর আলালের ঘরের দুলাল উচ্চনীতির আধার—ইহা সেরূপ নহে। আলালের ঘরের দুলালের উদ্দেশ্য নীতি; কল্পতরুর উদ্দেশ্য ব্যঙ্গ। আলালের ঘরের দুলালের লেখক মনুষ্যের দুষ্প্রবৃত্তি দেখিয়া কাতর, ইনি মনুষ্যচরিত্র দেখিয়া ঘৃণাযুক্ত। কল্পতরুর অপেক্ষা আলালের ঘরের দুলালের সম্পূর্ণতা এবং উচ্চাশয়তা আছে।

যে গ্রন্থের আমরা এত প্রশংসা করিলাম, তাহা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া লেখকের লিপিপ্রণালীর পরিচয় দিব। যে অংশ উদ্ধৃত করিলাম, গ্রন্থকার তাহাতে একটু বীভৎস রসের অন্যায় অবতারণা করিয়াছেন, এটি রুচির দোষ বটে। ভরসা করি অন্যান্য গুণে প্রীত হইয়া পাঠক তাহা মার্জনা করিবেন।

“মধুসূদন খর্ব্বাকৃতি, কৃষ্ণবর্ণ, কৃশ, এবং তাহার চুল কাফ্রির মত, এই অপরাধে নরেন্দ্রনাথ তাহাকে বিশেষ ভালবাসিতে পারিতেন না। এরূপ সহোদরকে বারংবার ‘পরম পূজনীয় শ্রীযুক্ত অগ্রজ মহাশয়’ বলিয়া পত্র লিখিতে ঘৃণা হইত, এই হেতু প্রতিবার বন্ধের পর বাটী হইতে কলিকাতা যাইবার সময়, যতদিন থাকিতে হইবে অনুমান করিয়া, খরচের টাকা একবারে সঙ্গে লইয়া যাইতেন। পাছে নরেন্দ্রের কোন কষ্ট হইবে, এই ভাবিয়া মধুসূদনও যেমন করিয়া হউক সমস্ত টাকা সংগ্রহ করিয়া দিতেন।

দুমাস আড়াই মাস অন্তরে নরেন্দ্রনাথ বাটীতে নিজদেহের কুশল লিখিতেন। একবার, বহুকাল পত্র না পাইয়া মধুসূদন চিন্তাকুল হন, এবং পিসীর পরামর্শে নরেন্দ্রকে কলিকাতায় দেখিতে যান। নরেন্দ্রনাথ ইঁহাকে দুই দিবসের অধিক বাসায় থাকিতে দেন নাই, এবং বন্ধুবর্গের নিকট জ্যেষ্ঠকে বাটীর সরকার বলিয়া পরিচিত করেন, ইহা আমরা উত্তমরূপ জানি। নরেন্দ্রনাথ সেই অবধি জ্যেষ্ঠের প্রতি অনিবার্য্য ঘৃণাকে হৃদয়ে লালন পালন করিতে লাগিলেন।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে, নরেন্দ্রনাথ কলিকাতায় কি কি করিয়া অবশেষে কিরূপে সেই ভয়ঙ্কর রজনীতে তদীয় শ্রীচরণ-দ্বয়কে কষ্ট দিয়াছেন। ঐ সমস্ত ঘটনার বহুকাল, এমন কি ৪।৫ মাস পূর্ব্ব হইতে নরেন্দ্রনাথ বাটীর কথা একবারে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। ক্রমে অগ্রহায়ণ মাস শেষ হইল, পরীক্ষার কাল উত্তীর্ণ হইয়া গেল, তথাপি নরেন্দ্র বাড়ী আসিলেন না। ক্রমে পৌষ মাঘ মাসও গেল। তখন মধুসূদনের মনে বড়ই ভাবনা হইল। পিসী গৃহকার্য্য সমাপন করিয়া প্রতিদিন বিকালে কান্না ধরিলেন।

'একে পিসী, তায় বয়সে বড়', সুতরাং শঙ্করী ঠাকুরাণীকে আমরা কখন নাম ধরিয়া ডাকিব না। পিসী অথবা পিসীমা বলিতে থাকিব। হে হৃদয়গ্রাহিপাঠক মহাশয়! যদি আপনার পিসী—আপনাদের 'পরমারাধ্য পরমপূজনীয়' পিতামহের চিরবিধবা কন্যা থাকেন, তবেই আমাদের ভক্তির স্বরূপ বুঝিতে সমর্থ হইবেন।

দিন যায়, রাত্রি আইসে; কিন্তু মধুসূদনের 'ভাই নরেন্দ্র' বাটী আইসে না। রাত্রি যায় দিন আইসে, কিন্তু পিসীমার 'নরেন' ঘরে আইসে না। দিন রাত্রির কেহ নাই, কাজেই তাহারা না চাইতে আইসে, না চাইতে যায়। আমাদের 'নরেনের' পিসী আছেন, সুতরাং তিনি কাঁদিয়াও নরেন্দ্রনাথকে পান না। পাইবেন কেমনে? ছেলের যখন ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে, তখন বাপ মায় পান না, তায়, পিসী কোন্ ছার?

মধুসূদন পিসীমার অনুরোধে তাঁহাদের গ্রামের গদিয়ান বাবুকে নরেন্দ্রনাথের সংবাদ জানিবার জন্য একখানি সজলনয়ন পত্র কলিকাতায় লিখিলেন। উত্তর আসিল যে অগ্রহায়ণ মাস অবধি গদিয়ান বাবু নরেন্দ্রনাথের কোন সমাচার পান নাই।

তখন বাড়ীতে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। পিসীমার নাকঝাড়াতে উঠান্ সর্ব্বদা সপ্ সপ্ করিতে লাগিল; ঘরের মিষ্টান্ন পর্য্যন্ত পিসীমার চক্ষের জলে লোণা হইতে লাগিল। শোক-সন্তপ্তা পিসী সর্ব্বদাই নাক ঝাড়িতে আরম্ভ করিলে, প্রতিবেশিনীরাও তাঁহার বাড়ী যাওয়া পরিত্যাগ করিল।

পিসী মধুসূদনকে কলিকাতায় নরেন্দ্রের সন্ধান করিতে যাইবার জন্য বলিলেন। মধু একবার মাত্র কলিকাতায় গিয়াছিলেন; তখন গবেশ রায় সঙ্গে ছিল। এখন গবেশ বিদেশ গিয়াছেন; সুতরাং কলিকাতার গলির ভয়ে, বিনা গবেশ রায়ে, মধুসূদনের যাওয়া ঘটিল না।

একদিন রাত্রি-প্রভাতে পিসীমা ভারি মুখভার করিয়া শয্যা হইতে উঠিলেন, এবং গুণ্ গুণ্ স্বরে গৃহকার্য্য আরম্ভ করিলেন। কাজ সারা হইল, স্নানে যাইবার জন্য তেলের বাটি গামছা লইয়া ঘর হইতে বাহির হইলেন; কিন্তু যাইতে পারিলেন

না। পরচালায়, বামহস্ত ভূমিতে পাতিয়া, দুই পা ছড়াইয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন।

গ্রামের উত্তর পাড়ার একটী স্ত্রীলোক পরম্পরায় শুনিতে পাইল যে, মধুর পিসী কাঁদিতেছেন। ইহার একটু কবিকল্পনা ছিল; পাড়াগেঁয়ে অনেক স্ত্রীলোকেরই থাকে। 'ঘটকদের নরেন্দ্র কাল্ রেতে বাড়ী এসেছিল, সকাল বেলা তারে সাপে খেয়েছে, তাই তার পিসী কেঁদে গাঁ মাথায় করেছে' যাহাকে দেখে এই কথা বলিতে বলিতে সে ঘটক-বাড়ী অভিমুখে চলিল। যখন পঁহুছিল, তখন বাড়ী লোকারণ্য; বোধ হয় যেন ব্রহ্মাণ্ডে আর স্ত্রীলোক নাই। সকলেই বলিতেছে 'অমন ছেলে হয় না, হবে না।' ইহারই মধ্যে কেহ আর একজনের নিকট 'সুদের পয়সা কটা' চাহিতেছে। পিসীর দিকে যেই মুখ ফিরায়, অমনি তাহার চক্ষু ছলছল, কে যেন লঙ্কা বাটিয়া দেয়; যেই বিমুখ হয়, অমনি ভাবান্তর, যেন 'পিসীর' দুঃখের কথা তাহারা শুনেও নাই। কিন্তু পিসীমা এক-চিত্তে এক-ভাবে, বসিয়া কেবল চীৎকার করিতেছেন। রোদনের বিরাম নাই, বৈজাত্য নাই। অল্পবয়স্কা একটী স্ত্রীলোক—সেও কাঁদিতে গিয়াছিল—ফিরিয়া যাইবার সময় বলিয়া গেল 'বেটী বসে কাঁদ্চে, যেন আলকাৎরা মাখান বড় চরকা ঘুরছে।'

একটু একটু কাঁদিয়া যখন সকলেই একে একে চলিয়া যাইতে লাগিল, তখন পিসীমা রোদনের বেগ কিঞ্চিৎ সম্বরণ করিলেন, দুটী একটী কথা কহিতে লাগিলেন।

'আহা বাছা আমার এত গুণের ছেলে! এমন ছেলে কি কারও হয়। ভাই মরেছে, সয়েছে। বলি, নরেন্দ্র বড় হবে, আমার সকল দুঃখ যাবে,—' পিসীমা নাক ঝাড়িলেন, একটী স্ত্রীলোকের গায় লাগিল, সে নাক তুলিয়া চলিয়া গেল। পিসীর কি দুঃখ, নরেন্দ্র হইতে কেমন করিয়াই বা সে দুঃখ মোচন হইবে, তাহা আমরা জানি না। পিসী-লোকের জ্ঞান পিসীদেরই আছে, নরলোকের সম্ভবে না।

পিসী পুনশ্চ চীৎকার ধরিলেন; আবার কান্নার বেগ থামাইলেন, আবার কথা আরম্ভ হইল। 'নরেন্ আমার পিসীমা বৈ পিসী বলে না, এমন ছেলে কোথায় পাব? আর কি এমন হবে? নরেন্ তুই একবার দেখা দে, আবার যাস্। প্রাণ না বেরুলে যে মরণ হয় না। এখন আমি কোথায় যাই?”

নানা ছাঁদে বিনাইয়া পিসী কাঁদিতেছেন, কথা কহিতেছেন, আবার কাঁদিতেছেন। কিন্তু ইহার মূল কারণ কেহই কিছু জানিতে পারে না। অবশেষে একজন বৃদ্ধা বলিল 'যা হয়েছে, তা ফের্বার নয়, এখন তোমার মধু বেঁচে থাকুক, আশীর্ব্বাদ কর। কপালে যা ছিল, হ'ল; কাঁদ্লে কি হবে? শুন্লে কবে? এ দারুণ কথা ব'ল্লে কে, কেমন ক'রেই বা ব'ল্লে?'

পিসীমা চমকিয়া উঠিলেন—বলিলেন। 'ষাট্! ষাট্! বুড়ীর দাস আমার। তা কেন হবে? ছেলের খপর পাই নাই, তায় রেতে স্বপন দেখেছি, তাই বড় ভাবনা হয়েছে।'

নরেন্দ্রনাথের মৃত্যু হয় নাই, একথা তখন জানিতে পারিয়া দুইজন অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া চলিয়া গেল। পিসী তখন স্বপ্নবৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন।

'নিজের ভাল দেখিলে মন্দ হয়' তাহাতেই পিসীর এত শোক দুঃখ উপস্থিত হইয়াছিল। রাত্রি-শেষে পিসী স্বপ্ন দেখেন যে মুলুকের ছোট লাট সাহেব মরেছে, তাতে লাটহস্তী ক্ষেপে বেড়ায়। পথে নরেন্দ্রনাথকে দেখিতে পাইয়া, তাহাকে শুঁড়ের দ্বারা মস্তকে তুলিয়া লইয়া গিয়া লাটসিংহাসনে বসাইয়া দেয়, তাহার পর নরেন্দ্রনাথ মেম বিবাহ করিয়াছে। তাহাতে পিসীমা বলিলেন 'জাত যা'ক তবুও বউ নিয়ে ঘরে এস'—নরেন্দ্রনাথ এল না। তখন পিসী নরেন্দ্রনাথের হাতে ধরিয়া আনিতে চাহিলেন। নরেন্দ্র হাত ছাড়াইয়া লইল। অমনি পিসীর নিদ্রাভঙ্গ।

ইহাতেই পিসীর শঙ্কা, শঙ্কা হইতে দুঃখ, দুঃখ হইতে শোক, শোক হইতে গুণ্ গুণ্ স্বরে গৃহকার্য্য সারা, গুণ্ গুণ্ স্বর হইতে পরিশেষে পা ছড়াইয়া চীৎকার-ধ্বনিতে কান্না ও পাড়ার লোক জোটা।

অনেক প্রবোধে পিসীমার কান্নার 'ইতি' হইল। আমরাও পাঠকবর্গকে বিরাম দিবার জন্য পরিচ্ছেদের উপসংহার করিলাম।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আমাদের বাড়ীতে এক সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত হইল। কেহ সন্ন্যাসী বলিত, কেহ ব্রহ্মচারী, কেহ দণ্ডী, কেহ অবধূত। পরিধানে গৈরিক বাস, কণ্ঠে রুদ্রাক্ষ মালা, মস্তকে রুক্ষ কেশ, জটা নহে, রক্তচন্দনের ছোট রকমের ফোঁটা। বড় একটা ধূলা কাদার ঘটা নাই—সন্ন্যাসী জাতির মধ্যে ইনি একটু বাবু। খড়ম চন্দন কাষ্ঠের, তাহাতে হাতীর দাঁতের বৌল। তিনি যাই হউন, বালকেরা তাঁহাকে সন্ন্যাসী মহাশয় বলিত বলিয়া আমিও তাঁহাকে তাহাই বলিব।

পিতা কোথা হইতে তাঁহাকে লইয়া আসিয়াছিলেন। অনুভবে বুঝিলাম, পিতার মনে মনে বিশ্বাস ছিল, সন্ন্যাসী নানাবিধ ঔষধ জানে। বিমাতা বন্ধ্যা।

দেখিলাম, পিতার অনুকম্পায় সন্ন্যাসী উপরের একটি বৈঠকখানা আসিয়া দখল করিল। আমার একটু বিরক্তিকর হইয়া উঠিল। আবার সন্ধ্যাকালে সূর্য্যের দিকে মুখ করিয়া সারঙ্গ রাগিণীতে আর্য্যাচ্ছন্দে বেদমন্ত্র পাঠ করিত। ভণ্ডামি আর আমার সহ্য হইল না। আমি তাহার অর্দ্ধচন্দ্রের ব্যবস্থা করিবার জন্য তাহার নিকটে গেলাম।

বলিলাম, "সন্ন্যাসী ঠাকুর, ছাদের উপর মাতা মুণ্ড কি বকিতেছিলে?"

সন্ন্যাসী হিন্দুস্থানী, কিন্তু আমাদিগের সঙ্গে যে ভাষায় কথা কহিত, তাহার চৌদ্দ আনা নিভাজ সংস্কৃত, এক আনা হিন্দি, এক আনা বাঙ্গালা। আমি বাঙ্গালাই রাখিলাম। সন্ন্যাসী উত্তর করিলেন, "কেন কি বকি, আপনি কি জানেন না?"

আমি বলিলাম, "বেদ মন্ত্র?"

স। হইলে হইতে পারে।

আমি। পড়িয়া কি হয়?

স। কিছু না।

উত্তরটুকু সন্ন্যাসীর জিত—আমি এটুকু প্রত্যাশা করি নাই। তখন জিজ্ঞাসা করিলাম, "তবে পড়েন কেন?"

স। কেন, শুনিতে কি কষ্টকর?

আমি। না, শুনিতে মন্দ নয়, বিশেষ আপনি সুকণ্ঠ। তবে যদি কিছু ফল নাই, তবে পড়েন কেন?

স। যেখানে ইহাতে কাহারও কোন অনিষ্ট নাই, সেখানে পড়ায় ক্ষতি কি?

আমি জারি করিতে আসিয়াছিলাম,—কিন্তু দেখিলাম যে একটু হটিয়াছি—সুতরাং আমাকে চাপিয়া ধরিতে হইল। বলিলাম, "ক্ষতি নাই, কিন্তু নিষ্ফলে কেহ কোন কাজ করে না—যদি বেদগান নিষ্ফল, তবে আপনি বেদগান করেন কেন?"

স। আপনিও ত পণ্ডিত, আপনিই বলুন দেখি, বৃক্ষের উপর কোকিল গান করে কেন?

ফাঁপরে পড়িলাম। ইহার দুইটি উত্তর আছে, এক—"ইহাতেই কোকিলের সুখ"—দ্বিতীয়, "স্ত্রী-কোকিলকে মোহিত করিবার জন্য।" কোন্‌টি বলি? প্রথমটি আগে বলিলাম, "গাইয়াই কোকিলের সুখ।"

স। গাইয়াই আমার সুখ।

আমি। তবে টপ্পা, খেয়াল প্রভৃতি থাকিতে বেদগান করেন কেন?

স। কোন্ কথাগুলি সুখকর—সামান্যা গণিকাগণের কদর্য্য চরিত্রের গুনগান সুখকর, না দেবতাদিগের অসীম মহিমাগান সুখকর?

হারিয়া, দ্বিতীয় উত্তরে গেলাম। বলিলাম, "কোকিল গায়, কোকিলপত্নীকে মোহিত করিবার জন্য। মোহনার্থ যে শারীরিক স্ফূর্ত্তি, তাহাতে জীবের সুখ। কণ্ঠস্বরের স্ফূর্ত্তি সেই শারীরিক স্ফূর্ত্তির অন্তর্গত। আপনি কাহাকে মুগ্ধ করিতে চাহেন?"

সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিলেন, "আমার আপনার মনকে। মন, আত্মার অনুরাগী নহে, আত্মার হিতকারী নহে। তাহাকে বশীভূত করিবার জন্য গাই।"

আমি। আপনারা দার্শনিক, মন এবং আত্মা পৃথক্ বলিয়া মানেন। কিন্তু মন একটি পৃথক্, আত্মা একটি পৃথক্ পদার্থ ইহা মানিতে পারি না। মনেরই ক্রিয়া দেখিতে পাই—ইচ্ছা, প্রবৃত্ত্যাদি আমার মনে। সুখ আমার মনে, দুঃখ আমার মনে। তবে আবার মনের অতিরিক্ত আত্মা, কেন মানিব? যাহার ক্রিয়া দেখি, তাহাকেই মানিব। যাহার কোন চিহ্ন দেখি না, তাহাকে মানিব কেন?

স। তবে বল না কেন, মন ও শরীর এক। শরীর ও মনের প্রভেদ কেন মানিব? যে কিছু কার্য্য করিতেছ সকলই শরীরের কার্য্য—কোন্‌টি মনের কার্য্য?

আমি। চিন্তা প্রবৃত্তি ভোগাদি।

স। কিসে জানিলে সে সকল শারীরিক ক্রিয়া নহে ?

আমি। তাহাও সত্য বটে। মন, শরীরের ক্রিয়া* মাত্র।

স। ভাল, ভাল। তবে আর একটু এসো। বলনা কেন যে, শরীরও পঞ্চভূতের ক্রিয়া মাত্র ? শুনিয়াছি তোমরা পঞ্চভূত মাননা—তোমরা বহুভূতবাদী, তাই হউক ; বলনা কেন যে ক্ষিত্যাদি বা অন্য ভূতগণ, শরীর রূপ ধারণ করিয়া সকলই করিতেছে ? এই যে তুমি আমার সঙ্গে কথা কহিতেছ—আমি বলি যে কেবল ক্ষিত্যাদি আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া শব্দ করিতেছে, শচীন্দ্রনাথ নহে। মন ও শরীরাদির কল্পনার প্রয়োজন কি ? ক্ষিত্যাদি ভিন্ন শচীন্দ্রনাথের অস্তিত্ব মানি না।

হারিয়া, ভক্তিভাবে সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া গেলাম। কিন্তু সেই অবধি সন্ন্যাসীর সঙ্গে একটু সম্প্রীতি হইল। সর্ব্বদা তাঁহার কাছে আসিয়া বসিতাম ; এবং শাস্ত্রীয় আলাপ করিতাম। দেখিলাম, সন্ন্যাসীর অনেক প্রকার ভণ্ডামি আছে। সন্ন্যাসী ঔষধ বিলায়, সন্ন্যাসী হাত দেখিয়া গণিয়া ভবিষ্যৎ বলে, সন্ন্যাসী যাগ হোমাদিও মধ্যে মধ্যে করিয়া থাকে—নল চালে, চোর বলিয়া দেয়, আরও কত ভণ্ডামি করে। একদিন আমার অসহ্য হইয়া উঠিল। একদিন আমি তাঁহাকে বলিলাম, "আপনি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ; আপনার এ সকল ভণ্ডামি কেন ?"

স। কোন্‌টা ভণ্ডামি ?

আমি। এই নল চালা, হাত গণা প্রভৃতি।

স। কতকগুলা অনিশ্চিত বটে, কিন্তু তথাপি কর্ত্তব্য।

আমি। যাহা অনিশ্চিত জানিতেছেন, তদ্দ্বারা লোককে প্রতারণা কেন করেন ?

স। তোমরা মড়া কাট কেন ?

আমি। শিক্ষার্থ।

স। যাহারা শিক্ষিত, তাহারা কাটে কেন ?

আমি। তত্ত্বানুসন্ধান জন্য।

স। আমরাও তত্ত্বানুসন্ধান জন্য এ সকল করিয়া থাকি। শুনিয়াছি বিলাতি পণ্ডিতের মধ্যে অনেকে বলেন, লোকের মাথার গঠন দেখিয়া তাহার চরিত্রের কথা বলা যায়। যদি মাথার গঠনে চরিত্র বলা যায়, তবে হাতের রেখা দেখিয়াই বা কেন না বলা যাইবে। ইহা মানি যে, হাতের রেখা দেখিয়া, কেহ এ পর্য্যন্ত ঠিক বলিতে পারে নাই। ইহার কারণ এই হইতে পারে যে, ইহার প্রকৃত

---

* Function of the Brain.

সঙ্কেত অদ্যাপি পাওয়া যায় নাই, কিন্তু ক্রমে ক্রমে হাত দেখিতে দেখিতে প্রকৃত সঙ্কেত পাওয়া যাইতে পারে। এজন্য হাত পাইলেই দেখি।

আমি। আর নল চালা?

স। তোমরা লোহের তারে পৃথিবীময় লিপি চালাইতে পার, আমরা কি নলটি চালাইতে পারি না? তোমাদের একটি ভ্রম আছে, তোমরা মনে কর যে, যাহা ইংরেজেরা জানে তাহাই সত্য, যাহা ইংরেজে জানে না, তাহা অসত্য, তাহা মনুষ্যজ্ঞানের অতীত, তাহা অসাধ্য। বস্তুতঃ তাহা নহে। জ্ঞান অনন্ত। কিছু তুমি জান, কিছু আমি জানি, কিছু অন্যে জানে, কিন্তু কেহই বলিতে পারে না যে আমি সব জানি, আর কেহ আমার জ্ঞানের অতিরিক্ত কিছু জানে না। কিছু ইংরেজে জানে, কিছু আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা জানিতেন। ইংরেজেরা যাহা জানে, ঋষিরা তাহা জানিতেন না; ঋষিরা যাহা জানিতেন, ইংরেজেরা এ পর্য্যন্ত তাহা জানিতে পারেন নাই। সেই সকল আর্ষবিদ্যা প্রায় লুপ্ত হইয়াছে, আমরা কেহ কেহ দুই একটি বিদ্যা জানি। যত্নে গোপন রাখি—কাহাকেও শিখাই না।

আমি হাসিলাম। সন্ন্যাসী বলিলেন, "তুমি বিশ্বাস করিতেছ না? কিছু প্রত্যক্ষ দেখিতে চাও?"

আমি বলিলাম, "দেখিলে বুঝিতে পারি।"

সন্ন্যাসী বলিল, "পশ্চাৎ দেখাইব। এক্ষণে তোমার সঙ্গে আমার একটি বিশেষ কথা আছে। আমার সঙ্গে তোমার ঘনিষ্ঠতা দেখিয়া, তোমার পিতা আমাকে অনুরোধ করিয়াছেন যে, তোমাকে বিবাহে প্রবৃত্তি দিই।"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "প্রবৃত্তি দিতে হইবে না, আমি বিবাহে প্রস্তুত—কিন্তু—"

স। কিন্তু কি?

আমি। কন্যা কই?

স। এ বাঙ্গালাদেশে কি তোমার যোগ্য কন্যা নাই?

আমি। হাজার হাজার আছে, কিন্তু বাছিয়া লইব কি প্রকারে? এই শত সহস্র কন্যার মধ্যে কে আমাকে চিরকাল ভালবাসিবে, তাহা কি প্রকারে বুঝিব?

স। আমার একটি বিদ্যা আছে। যদি পৃথিবীতে এমত কেহ থাকে যে, তোমাকে মর্ম্মান্তিক ভালবাসে, তবে তাহাকে স্বপ্নে দেখাইতে পারি, কিন্তু যে তোমাকে এখন ভালবাসে না, ভবিষ্যতে বাসিতে পারে, তাহা আমার বিদ্যার অতীত।

আমি। এ বিদ্যা বড় আবশ্যক বিদ্যা নহে। যে যাহাকে ভালবাসে, সে তাহাকে প্রায় প্রণয়শালী বলিয়া জানে।

স। কে বলিল? অজ্ঞাত প্রণয়ই পৃথিবীতে অধিক। তোমাকে কেহ ভালবাসে? তুমি কি তাহাকে জান?

আমি। আত্মীয়স্বজন ভিন্ন কেহ যে আমাকে বিশেষ ভালবাসে, এমত আমি জানি না।

স। তুমি আমাদের বিদ্যা কিছু প্রত্যক্ষ করিতে চাহিতেছিলে, আজ এইটি প্রত্যক্ষ কর।

আমি। ক্ষতি কি!

স। তবে শয়নকালে আমাকে শয্যাগৃহে ডাকিও।

আমার শয্যাগৃহ বহির্ব্বাটীতে। আমি শয়নকালে সন্ন্যাসীকে ডাকাইলাম। সন্ন্যাসী আসিয়া আমাকে শয়ন করিতে বলিলেন। আমি শয়ন করিলে, তিনি বলিলেন, "যতক্ষণ আমি এখানে থাকিব, চক্ষু চাহিও না। আমি গেলে যদি জাগ্রত থাক, চাহিও।" সুতরাং আমি চক্ষু মুদিয়া রহিলাম—সন্ন্যাসী কি কৌশল করিল, কিছুই জানিতে পারিলাম না। সন্ন্যাসী যাইবার পূর্ব্বেই আমি নিদ্রাভিভূত হইলাম।

সন্ন্যাসী বলিয়াছিল, পৃথিবীমধ্যে যে নায়িকা আমাকে মর্ম্মান্তিক ভালবাসে, অদ্য তাহাকেই আমি স্বপ্নে দেখিব। স্বপ্ন দেখিলাম বটে। কল কল গঙ্গাপ্রবাহমধ্যে সৈকত ভূমি; তাহার প্রান্তভাগে অর্দ্ধ জলমগ্না—কে?

রজনী!

পরদিন প্রভাতে, সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাহাকে স্বপ্নে দেখিয়াছিলে?"

আমি। কাণা ফুলওয়ালী।

স। কাণা?

আমি। জন্মান্ধ।

স। আশ্চর্য্য! কিন্তু যেই হউক, তাহার অধিক পৃথিবীতে আর কেহ তোমাকে ভালবাসে না।

আমি নীরব হইয়া রহিলাম।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সেই দিবসেই আমার নিকট রজনীর পিতা রাজচন্দ্র, একটি ভদ্রলোককে সঙ্গে লইয়া আসিল। আমি রাজচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি, রাজচন্দ্র সম্বাদ কি? তোমার কন্যার কোন সম্বাদ পাইয়াছ কি?"

রাজচন্দ্র বলিল, "মহাশয়, আমি কিছু বুঝিতে পারিতেছি না। আপনি ইহার সঙ্গে কিছু কথাবার্ত্তা কহুন; আমি সেইজন্যই ইহাকে লইয়া আসিয়াছি। আপনি আমাদিগের মুরুব্বি; আপনার পরামর্শ না লইয়া কোন কাজ করিব না। বিশেষ আমি মূর্খ লোক।"

এই বলিয়া রাজচন্দ্র সঙ্গীকে দেখাইয়া দিল। তাঁহাকে ভদ্রলোক দেখিয়া বসিতে বলিলাম। তিনি আসন গ্রহণ করিলেন। রাজচন্দ্র বাহিরে গিয়া বসিল। কথোপকথন আরম্ভার্থ, জিজ্ঞাসা করিলাম, "রাজচন্দ্রের সঙ্গে পূর্ব্বে কি আপনার আলাপ ছিল?"

তিনি বলিলেন, "না। আমার নিবাস কলিকাতায় নহে। আমার নাম অমরনাথ ঘোষ, আমার নিবাস শান্তিপুর। আমি যে জন্য রাজচন্দ্রের কাছে আসিয়াছি, তাহা আপনার নিকট জানাইবার জন্য রাজচন্দ্র আমাকে লইয়া আসিয়াছে।"

এই বলিয়া অমরনাথ, আমার টেবিলের উপরে স্থিত "সেক্ষপিয়র গেলেরির" পাতা উল্টাইতে লাগিলেন। ততক্ষণ আমি অমরনাথকে দেখিয়া লইতে লাগিলাম। অমরনাথ দেখিতে সুপুরুষ; গৌরবর্ণ, কিঞ্চিৎ খর্ব্ব, স্থূলও নহে, শীর্ণও নহে; বড় বড় চক্ষুঃ, কেশগুলি সূক্ষ্ম, কুঞ্চিত, যত্নরঞ্জিত। বেশভূষার পারিপাট্যের একটু বাড়াবাড়ি; কিন্তু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বটে। তাঁহার কথা কহিবার ভঙ্গী অতি মনোহর; কণ্ঠ অতি সুমধুর। দেখিয়া বুঝিলাম, লোক অতি সুচতুর।

সেক্ষপিয়র গেলেরির পাতা উল্টান শেষ হইলে, অমরনাথ নিজ প্রয়োজনের কথা কিছু না বলিয়া, ঐ পুস্তকস্থিত চিত্রসকলের সমালোচনা আরম্ভ করিলেন। আমাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, যাহা বাক্য এবং কার্য্যদ্বারা চিত্রিত হইয়াছে, তাহা চিত্রফলকে চিত্রিত করিতে চেষ্টা পাওয়া ধৃষ্টতার কাজ। সে চিত্র, কখনই সম্পূর্ণ হইতে পারে না; এবং এসকল চিত্রও সম্পূর্ণ নহে। ডেসডিমনার চিত্র দেখাইয়া কহিলেন, আপনি এই চিত্রে ধৈর্য্য, মাধুর্য্য, নম্রতা পাইতেছেন, কিন্তু ধৈর্য্যের সহিত সে সাহস কই? নম্রতার সঙ্গে সে সতীত্বের অহঙ্কার কই? জুলিয়েটের মূর্ত্তি দেখাইয়া কহিলেন, এ নবযুবতীর মূর্ত্তি বটে, কিন্তু ইহাতে জুলিয়েটের নবযৌবনের অদমনীয় চাঞ্চল্য কই?

অমরনাথ এইরূপে কত বলিতে লাগিলেন। সেক্ষপিয়রের নায়িকাগণ হইতে শকুন্তলা, সীতা, কাদম্বরী, বাসবদত্তা, রুক্মিণী, সত্যভামা প্রভৃতি আসিয়া পড়িল। অমরনাথ একে একে তাহাদিগের চরিত্রের বিশ্লেষ করিলেন। প্রাচীন সাহিত্যের কথায় ক্রমে প্রাচীন ইতিহাসের কথা আসিয়া পড়িল, তৎপ্রসঙ্গে তাসিতস, প্লুটার্ক, থুকিদিদিস প্রভৃতির অপূর্ব্ব সমালোচনার অবতারণা হইল।

প্রাচীন ইতিবৃত্ত-লেখকদিগের মত লইয়া অমরনাথ, কোম্‌তের ত্রৈকালিক উন্নতি সম্বন্ধীয় মতের সমর্থন করিলেন। কোম্‌ৎ হইতে তাঁহার সমালোচক মিল ও হকস্‌লীর কথা আসিল। হকস্‌লী হইতে ওয়েন ও ডারুইন, ডারুইন হইতে বুকনেয়র সোপেনহয়র প্রভৃতির সমালোচনা আসিল। অমরনাথ অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্যস্রোতঃ আমার কর্ণরন্ধ্রে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। আমি মুগ্ধ হইয়া আসল কথা ভুলিয়া গেলাম।

বেলা গেল দেখিয়া, অমরনাথ বলিলেন, "মহাশয়কে আর বিরক্ত করিব না। যে জন্য আসিয়াছিলাম, তাহা এখনও বলা হয় নাই। রাজচন্দ্রের একটি কন্যা আছে ?"

আমি বলিলাম, "আছে বোধ হয়।"

অমরনাথ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "বোধ হয়, কেননা সে নিরুদ্দেশ, আছে কিনা সংশয় ? যাই হৌক, তাহাকে পাওয়া গেলে যাইতেও পারে। আপনি তাহার সঙ্গে গোপালের সম্বন্ধ করিয়াছেন। যদি তাহাকে পাওয়া যায়, তবে গোপালকেই দেওয়া কি এখনও আপনার মত ?"

ইহার অভিসন্ধি ত কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। বলিলাম, "কি জানি। তাহাকে কি অবস্থায় কোথায় পাওয়া যাইবে, তাহাতে গোপাল আর তাহাকে গ্রহণ করিবে কি না তাহা ত বলিতে পারি না।"

অমর। যদি গোপাল সম্মতই থাকে ?

আমি বলিলাম, "যদি তাহাকে পাওয়া যায়, বিবাহের কোন বিঘ্ন না থাকে, গোপালও অসম্মত না হয়—তবে গোপালকেই—"

আমার সেই স্বপ্নটি মনে পড়িল। আমি কি বলিয়া কথা শেষ করিতাম তাহা বলিতে পারি না। আমাকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া অমরনাথ বলিল, "যদি আপনাদিগের মত হয়, তবে আমি রজনীর পাণিগ্রহণে ইচ্ছুক। আমার এই কথা বলিতে আসা।"

আমি অবাক্ হইলাম। অমরনাথ বলিতে লাগিলেন, "আমি রাজচন্দ্রের নিকটে এই কথা বলিতেই গিয়াছিলাম। রাজচন্দ্র আপনার অনভিমতে কিছু করিবেন না বলিয়া আপনার নিকট আনিয়াছে।"

অন্ধ ফুলওয়ালীর এরূপ বর, আমরা কেহ কখন স্বপ্নেও ভরসা করি নাই। যদি ঘটে, তবে রজনীর বড় সৌভাগ্য বটে। তাহার প্রতিবন্ধকতা করা আমার অকর্ত্তব্য। কিন্তু গুটি দুই তিন কথা মনে পড়িল। প্রথমতঃ, গোপালকে কথা দেওয়া হইয়াছে। ধনাদির লোভে কি বাক্যলঙ্ঘনে পরামর্শ দিব ? দ্বিতীয়তঃ, এব্যক্তি অপরিচিত ; তৃতীয়তঃ,—দূর হৌক, তৃতীয়টি ছাড়িয়া দাও। আমার বোধ

হইল, যখন রাজচন্দ্র আমার উপর ভার দিয়াছে, তখন কিছু বিবেচনা করিয়া কার্য্য করা উচিত। আমি বলিলাম, “এখন রজনীর কোন সন্ধানই নাই। যতদিন না তাহাকে পাওয়া যায় ততদিন এসকল কথার আন্দোলন বৃথা। এখন এসকল কথা থাক। তাহাকে পাওয়া গেলে, এ বিষয়ে মহাশয়ের সঙ্গে কথাবার্ত্তা হইবে।”

অমরনাথ বলিলেন, “আমার সঙ্গে কথাবার্ত্তা হইলেই তাহাকে পাওয়া যাইবার সম্ভাবনা।”

আমার ঘোরতর সন্দেহ উপস্থিত হইল—বলিলাম, “তবে কি আপনি তাহার কোন সন্ধান জানেন?”

অমর। না। কিন্তু সন্ধান করিতে পারি।

আমি। তাহা আমরাও করিতেছি। কই আমরা ত কোন উদ্দেশ পাইতেছি না?

অমর। আপনারা পাইবেন না—কিন্তু আমি পল্লীগ্রামে নানাস্থানে যাই। আমি অবশ্য সন্ধান পাইব।

কথা শুনিয়া আমার বোধ হইল যে, এ ব্যক্তি নিশ্চিত রজনীর সন্ধান জানে, কিন্তু বলিতেছে না। আমি তখন স্থির করিলাম যে ইহার দ্বারা রজনীর পুনরুদ্দেশ করিব। তাহাকে বলিলাম, “ভালই। আপনার ন্যায় সুপাত্র কোথায় পাওয়া যাইবে? আপনি অনুগ্রহ করিয়া তাহার সন্ধান করুন্। যদি সন্ধান পান, তবে আমাদিগকে সম্বাদ দিবেন। তাহাকে পাওয়া গেলে, আপনার সঙ্গে পুনর্ব্বার এবিষয়ে কথাবার্ত্তা হইবে।”

অমরনাথ অতি চতুর। বলিলেন, “তবে বুঝিতেছি যে, তাহাকে পাওয়া গেলে পরে, আমার সঙ্গে তাহার বিবাহ হওয়ার প্রতি আপনার আপত্তি নাই?”

আমি বলিলাম, “রজনী বয়ঃস্থা—বোধ হয়, তাহাকেও আমাদিগের একবার জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক হইবে। তাহাকে না জিজ্ঞাসা করিয়া কি প্রকারে আপনাকে কথা দিব?”

অমরনাথ হাসিয়া বলিল, “যখন গোপালের সঙ্গে সম্বন্ধ করিয়াছিলেন, তখন কি রজনীর মত লইয়াছিলেন?”

এই প্রশ্নে আমার অপ্রতিভ হইবার কথা, কিন্তু সে ভাব আমার মনে আসিল না—আমার মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল।—তবে কি রজনীর সঙ্গে ইহার সাক্ষাৎ ও আলাপ হইয়াছে? নহিলে রজনীর অনভিমতে যে গোপালের সঙ্গে সম্বন্ধ করিয়াছিলাম, এ কথা জানিল কি প্রকারে? এই কি রজনীর জার? আবার মনে হইল, পাপিষ্ঠ হীরালালের কাছে এ একথা জানিয়া থাকিবে, অথবা ইহার পিতার কাছে কথা বাহির করিয়া লইয়া থাকিবে, অথবা অনুভবে বুঝিয়া থাকিবে।

যাহা হউক, সবিশেষ জানিতে হইল। বলিলাম, "মহাশয়, একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব, মার্জ্জনা করিবেন ত ?"

অমর। কি? আজ্ঞা করুন।

আমি। আপনি কি এই প্রথম সংসার করিবেন, না আর বিবাহ আছে ?

অমর। এই প্রথম বিবাহ করিব।

আমি। আপনি দেখিতেছি ভদ্রসন্তান, বিদ্বান্, সুপুরুষ, সর্ব্বপ্রকারে সুজন, আপনার ন্যায় জামাতা সকলেই আদর করিয়া গ্রহণ করে। আপনি মনে করিলে এই বঙ্গদেশের অতিপ্রধান ঘরে অতি সুন্দরী কন্যা বিবাহ করিতে পারেন। আপনি দরিদ্র-কন্যা অন্ধ রজনীকে বিবাহ করিবার জন্য এত ব্যস্ত কেন, ইহা জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি ?

অমর। দেখুন, আমি বালক নহি। যেখানে বিবাহ করিব, বালিকা বিবাহ করিতে হইবে। রজনীর ন্যায় বয়ঃস্থা কন্যা কোথায় পাইব ?

আমি। আপনি কি রজনীকে দেখিয়াছেন ?

অমর। দেখিয়াছি।

আমি। কিছু মনে করিবেন না—দায়ে পড়িয়া অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিতে হইতেছে। কোথায় দেখিলেন ?

অমর। কলিকাতাতেই দেখিয়াছি, সে ফুল বেচে, অনেকদিন হইতে দেখি।

এইবার অমরনাথ ঠকিল। রজনী কোথাও ফুল বেচিত না, কেবল আমাদের বাড়ী ফুল লইয়া আসিত। অতএব অমরনাথ একটি মিথ্যা কথা বলিল। আমি নিশ্চিত বুঝিলাম যে, সে রজনীর পলায়নের পর তাহাকে দেখিয়াছে। সে কথা কিছু বলিলাম না। কেবল বলিলাম, "রজনী বয়ঃস্থা বটে, কিন্তু তাহার দুইটি গুরুতর দোষ আছে। আপনি ভদ্রলোক, হঠাৎ তাহাকে বিবাহ করিবেন, অতএব আমার সেগুলি দেখাইয়া দেওয়া উচিত। এক সে অতি সামান্য ইতর লোকের কন্যা—অতি দরিদ্র।"

অমর। ইতর ব্যবসায়ী বটে, কিন্তু আমাদের স্বজাতীয়—তাহাতে দোষ নাই। আর দারিদ্র্যের জন্য আসিয়া যায় না। রজনীর ধন না থাকে, আমার আছে, তাহাতে আমাদের সংসারযাত্রা নির্ব্বিঘ্নে নির্ব্বাহ হইতে পারিবে।

আমি। সে জন্মান্ধ। অন্ধপত্নী লইয়া কি প্রকারে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন ?

অমর। যে খেলে সে কাণা কড়িতেও খেলে। যে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে জানে, সে কাণা স্ত্রী লইয়াও সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে।

আমি। আপনার সন্তানাদি অন্ধ হইবার সম্ভাবনা।

অমর। কে বলিয়াছে ! আমার দৌহিত্র পৌত্রাদির মধ্যে কেহ কেহ অন্ধ হইতে পারে বটে ; না হইতেও পারে। আমি অত ভাবিয়া কাজ করিতে চাহি না। যাহা অনিশ্চিত, ঘটিলেও বহুকালে ঘটিবে, তাহার জন্য উপস্থিত কালে বিড়ম্বনা ভোগ করা, বুদ্ধিমানের কাজ নহে।

আমি। আপনার যেমন ইচ্ছা তেমনি করিতে পারেন। তবে আমি যদি সাহায্য করিয়া আপনার কোন উপকার করিতে পারি, তাহাতেও আমি প্রস্তুত আছি। এক্ষণে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রসাদে কলিকাতায় অনেক বয়ঃস্থা কন্যা পাওয়া যায়। বলেন ত আপনাকে তাঁহাদিগের রক্ষকদিগের নিকট পরিচিত করিয়া দিতে পারি।

অমরনাথ তখন গম্ভীরভাবে বলিলেন, "যদি অত পীড়াপীড়ি করিলেন, তবে আমাকে অগত্যা সকল কথা বলিতে হইল। বাস্তবিক, সে কথা আমার আগেই বলা উচিত ছিল, কিন্তু যে কথা ভদ্রলোকে মুখে আনিতে লজ্জা করে, তাহা যে এতক্ষণ বলিতে পারি নাই, সেজন্য আমাকে অপরাধী করিবেন না। যাহা বলিতেছি, ইহা কেবল আপনিই জানিলেন, আর কন্যাকর্ত্তাকে জানাইবেন, আর কাহাকেও বলিবার আবশ্যকতা হইবে না। কোন ভদ্র ঘরে, আমাকে কন্যা দিবে না। আমাদিগের বংশে একটি গুরুতর কলঙ্ক আছে। আমার খুল্লতাতের একটি কন্যা গৃহত্যাগ করিয়া বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে। এজন্য ভদ্রপরিবারে, আমাকে কন্যা দিবেও না, আমিও সেরূপ সম্বন্ধ লজ্জাবশতঃ খুঁজি নাই। এ বয়স পর্য্যন্ত আমার বিবাহ না হইবার কারণ এই। এ কথা আমার প্রথমেই বলা উচিত ছিল—কিন্তু আপনার কুলকলঙ্ক কে আপন মুখে সহসা ব্যক্ত করিতে পারে ? বিশেষ আপনাদিগের সঙ্গে এই প্রথম আলাপ। ইহার পরে বলিব, ইচ্ছা ছিল। সে অপরাধ লইবেন না। বোধ করেন কি যে ইহাতে রজনীর পিতা কি কোন আপত্তি করিবেন ?"

আমি সুতরাং নিরস্ত হইলাম। অমরনাথ সকল কথাই ভাঙ্গিয়া বলিলেন। কেবল একটি কথা এখনও গোপন রহিল। রজনী কোথায়, অমরনাথ তাহা জানেন, কিন্তু কিছুতেই প্রকাশ করিলেন না। তিনি যেরূপ সুচতুর, কথা তাঁহার কাছে বাহির করিয়াও লওয়া যায় না। এদিকে গোপালকে বাক্যদত্ত আছি—অমরনাথকে কথা দিতে পারিতেছি না—না দিলে রজনীকে পাওয়া যায় না। বিষম সঙ্কটে পড়িয়া গোপালকে ডাকাইলাম।

গোপাল আসিল। অমরনাথের সাক্ষাতে, গোপালকে বলিলাম, "রজনীকে ত পাওয়া গেল না—এখন কি কর্ত্তব্য ?"

গোপাল বিরক্তভাবে বলিল, "কর্ত্তব্য আর কি ?"

আমি বলিলাম, "যদি কেহ রীতিমত তাহার অনুসন্ধানে নিযুক্ত হয়, তবে তাহাকে পাওয়া যাইতে পারে।"

গোপাল। কে যাইবে?

আমি। তোমার সঙ্গে তাহার বিবাহ হইবে, তোমারই যাওয়া কর্ত্তব্য।

গোপাল পূর্ব্ববৎ বিরক্তির সহিত বলিল, "আমি যাইতে পারিব না।"

আমি। আমরা স্থির করিয়াছি যে, যে রজনীকে সন্ধান করিয়া লইয়া আসিবে, সে অপাত্র না হইলে, তাহার সঙ্গেই রজনীর বিবাহ দিব।

গোপাল। সেই ভাল। আর কাহাকে বলুন। আমি রজনীকে খুঁজিয়া আনিতে পারিব না—তাহাকে বিবাহ করিতেও চাহি না। আমার পরিবার আছে।

এই বলিয়া গোপাল উঠিয়া গেল। অমরনাথ বলিলেন, "এখন আপনি সত্যচ্যুতির দায় হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন?"

আমি। অতএব আপনি রজনীর সন্ধান করিয়া তাহাকে আনুন।

অমর। তাহার পর আপনারা এ বিবাহে আর কোন আপত্তি করিবেন না?

সাত পাঁচ ভাবিয়া, কিছু ইতস্ততঃ করিয়া, পূর্ব্বরাত্রের স্বপ্নটি দুই চারিবার স্মরণ করিয়া, বলিলাম, "আপনি সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন।"

অমরনাথ, সন্দিহান হইয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিল। মনে করিল বুঝি, যে আমার অঙ্গীকার দ্ব্যর্থ। যাহা হউক, আর কিছু বলিতে পারিল না। "রজনীকে সন্ধান করিয়া লইয়া আসিব, নচেৎ আর আসিব না।" এই কথা বলিয়া চলিয়া গেল।

অমরনাথ বাহির হইবামাত্র, আমি "বাদল"কে ডাকিলাম। বাদল একটি ভদ্রসন্তান—বাদলের দিনে জন্ম বলিয়া, সকলে তাহাকে বাদল বলে—কোন কর্ম্ম কাজ করে না—আমাদিগের বাড়ীতে থাকে—বুদ্ধিমান্, সচ্চরিত্র এবং আমার নিতান্ত প্রিয়। বাদল আসিল। আমি বাদলকে বলিলাম, "যে বাবুটি এই বাহির হইয়া যাইতেছেন উঁহাকে দেখিয়াছ?"

বাদল। দেখিয়াছি।

আমি। উঁহার পিছু পিছু যাও। ও যদি গাড়িতে আসিয়া থাকে, তবে আমার বগি এতক্ষণ তৈয়ার আছে, তাহা লইয়া তুমি উঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হও। আর যদি দেখ যে হাঁটিয়াই যাইতেছে, তুমিও সেইরূপে উঁহার পিছু পিছু যাইবে। কিন্তু দেখিও, ও যেন কিছুতেই না জানিতে পারে যে, তুমি উঁহার পিছু লইয়াছ।

বা। তারপর?

আমি। লোকটা কে, কোথায় থাকে, জানিয়া আসিবে।

বাদল তখনই ছুটিল।

ইহার পর রাজচন্দ্রকে বিদায় দিলাম, বলিয়া দিলাম, "এক্ষণে এ বিবাহে সম্মত হইও না। রজনীকে পাওয়া গেলে যাহা হয় হইবে।" রাজচন্দ্র কাঁদিতে কাঁদিতে গেল।

তাহার পর আমাদিগের একজন সরকার, নাম মার্কণ্ডদেব গাঙ্গুলি, তাহাকে সেই দিনের ট্রেনেই শান্তিপুর পাঠাইলাম। বলিয়া দিলাম যে "শান্তিপুরে অমরনাথ ঘোষ কেহ আছে কি না, যদি থাকে, তবে সে কে, কিরূপ বিষয়াপন্ন, কি চরিত্রের লোক, এবং এপর্য্যন্ত কেন তাহার বিবাহ হয় নাই, তাহা সবিশেষ জানিয়া আসিবে। অতি সত্বরেই আসিবে।"

রাত্র নয়টার সময়ে বাদল ফিরিয়া আসিলে জিজ্ঞাসা করিলাম, "সম্বাদ কি?"

বাদল বলিল, "বাবু গাড়ি করিয়া গেলেন। আমি তাঁহার গাড়ির উপর দৃষ্টি রাখিয়া দুইশত হাত তফাৎ পিছু পিছু গেলাম। চোর বাগানের মোড়ে তিনি ভাড়াটিয়া গাড়ি বিদায় দিলেন। আমিও সেইখানে বগি হইতে নামিলাম। তিনি চোর বাগানের ভিতরে অতি ক্ষুদ্র গলির মধ্যে, একটি উত্তম বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন। আমি সেই দ্বারের নিকট বসিলাম। দ্বার আর কেহ খুলিল না। এতরাত্র অবধি সেইজন্য বসিয়াছিলাম। কেহ দ্বারও খুলিল না—বাড়ীতে কাহারও সাড়া শব্দ পাইলাম না। প্রতিবাসীদিগকে ছলক্রমে জিজ্ঞাসাবাদ করিলাম। কেহ কিছু বলিতে পারিল না। সকলেই বলে, 'কে এক বাবু বাড়ীতে থাকে বটে, আমরা বিশেষ জানি না। আসে যায় দেখিতে পাই।' অগত্যা ফিরিয়া আসিয়াছি।"

আমি বলিলাম, "কালি অতিভোরে আবার যাইও।"

বাদল পরদিন অতিপ্রত্যূষে আবার গেল। তখনই আবার ফিরিয়া আসিল, বলিল, "মহাশয়, পাখী পলাইয়াছে।"

"সে কি হে?"

"খাঁচা খালি।"

"সে কি?"

"আজ গিয়া দেখিলাম, বাড়ীর দ্বার খোলা—বাড়ীতে কোথায় কেহ নাই। প্রতিবাসীরা কেহ কিছু বলিতে পারিল না।"

দুই তিন দিনে মার্কণ্ড শান্তিপুর হইতে ফিরিল। সে বলিল, "অমরনাথ ঘোষের বাড়ীতে গিয়াছিলাম। তিনি বাড়ী নাই। তিনি অতি ধনাঢ্য, বড় ভদ্র-

লোক। তাঁহার একটি খুড়াত ভগিনী বাহির হইয়া যাওয়ায়, যোগ্য ঘরে তাঁহার বিবাহের সম্ভাবনা নাই বলিয়া, তিনি আর বিবাহ করেন নাই। তাঁহাদিগের কুলে সেই কলঙ্ক হওয়া অবধি তিনি বড় আর দেশে থাকেন না—প্রায় বিদেশে বিদেশেই ফিরেন।"

তাহারই দুই একদিন পরে ডাকে এক পত্র পাইলাম। পত্র এই—।

"সবিনয় নিবেদন।

আমার পশ্চাতে লোক লাগাইয়াছেন কেন? আপনি ভদ্রলোক—আমিও তাই। ভদ্রোচিত ব্যবহারেরই প্রত্যাশা করি।

শ্রীঅমরনাথ ঘোষ।"

ডাকের মোহর—কলিকাতার।

আমি মনে মনে নিতান্ত লজ্জিত হইলাম।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা

ভারতে যবন। শ্রীকিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। কলিকাতা।

“ভারত মাতার” ন্যায়, এখানি রূপক। ইহাতে ভাল বলিতে পারি, এমত কিছুই দেখিলাম না।

বালা-বোধিনী। প্রথম ভাগ। শ্রীমধুসূদন সেন প্রণীত। ঢাকা।

আমরা এ গ্রন্থের এইরূপ সমালোচনা করিব। ইহা দৈর্ঘে তিন ইঞ্চি, প্রস্থে দুই ইঞ্চি। এবং ঊর্দ্ধ ১৫ পৃষ্ঠা। বোধ হয় লিলিপটের আমদানি—গলিবরের পকেটে আসিয়াছিল। গ্রন্থের ভিতরে, মাথা, মুণ্ড, ছাই, ভস্ম।

ভূগোলসার। অল্পবয়স্ক বালকবালিকাদিগের ব্যবহারার্থ শ্রীনরেন্দ্রনাথ কোঙর সঙ্কলিত। কলিকাতা।

সমালোচনা নিষ্প্রয়োজনীয়।

পদ্য পাঠাবলী। প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ। শ্রীলোকনাথ গুহ প্রণীত। কলিকাতা নূতন সংস্কৃত যন্ত্র।

এই গ্রন্থদ্বয়, সমালোচনার অভিপ্রায়ে আমাদিগের নিকট প্রেরিত হইয়াছে কি না, আমরা ঠিক্ জানিতে পারি নাই। যাহা হউক, শিশুশিক্ষার্থ প্রণীত গ্রন্থ সম্বন্ধে সচরাচর আমাদিগের বিশেষ কিছু বক্তব্য থাকে না।

তৃতীয় বর্ষ : দশম সংখ্যা

১ সংখ্যা।

সকলে রাত্রিদিন খাইবার জন্য ব্যস্ত। মনুষ্যের প্রধান কার্য্য আহারান্বেষণ। কিন্তু কি খাই? কেন খাই? কি খাওয়া উচিত? তাহা সকলেরই কিছু কিছু জানাকর্ত্তব্য।

সকলেই পরামর্শ দেন, যাহা পুষ্টিকর, তাহাই খাইতে হয়। কিন্তু কোন্ সামগ্রী পুষ্টিকর? ইহার সচরাচর উত্তর এই, যাহাতে শরীর গড়ে, তাহাই পুষ্টিকর। কিন্তু শরীর কিসে গঠিত? তাহা কোন্ দ্রব্যেই বা পাওয়া যাইবে?

শারীরতত্ত্ববিদেরা নিরূপণ করিয়াছেন যে, সুস্থ সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ মনুষ্যের শরীরে প্রায় চারি ভাগের তিন ভাগ * জল। অতএব শরীর প্রধানতঃ জলে গঠিত, এবং খাদ্যপেয়র মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা জলেরই অধিক প্রয়োজন। যাহাতে শরীর গড়ে তাহাই যদি পুষ্টিকর হয়, তবে জলই সর্ব্বাপেক্ষা পুষ্টিকর। বাস্তবিক, একথা সম্পূর্ণরূপে মিথ্যাও নহে, তবে জলের অভাব কাহারও ঘটে না বলিয়া, কেহ কাহাকেও কখন জল খাইতে পরামর্শ দেয় না।

আর জল শরীরনির্ম্মাণকারী বলিয়া, ক্রমাগত গেলাস গেলাস জলপান করিতে হইবে, এমত নহে। যত জল খাইবে, তত শরীরের উপকার হইবে এমত নহে। শরীরের যে পরিমাণে জলের আবশ্যক, তাহার উপর বিন্দুমাত্র খাইলে, তাহা তখনই প্রস্রাবাদির দ্বারা পরিত্যক্ত হইবে। না হইলে উপকার হওয়া দূরে থাকুক অনিষ্ট ঘটিবে।

জল ভিন্ন অন্যান্য সামগ্রী সম্বন্ধেও এইরূপ। অন্যান্য সামগ্রী যাহা শরীরে আছে, তাহা জলের তুলনায় অতি অল্প পরিমাণে আছে; কিন্তু অল্প পরিমাণে থাকুক, আর অধিক পরিমাণে থাকুক, সকলই তুল্যরূপে প্রয়োজনীয়। কোনটির

---

* ১৪৪ ভাগের মধ্যে ১১৬ ভাগ। *Quetelet.*

অল্পতা ঘটিলে, শরীরের অনিষ্ট ঘটিবে ; আধিক্য ঘটিলে যতটুকু বেশী হইয়াছে, ততটুকু পরিত্যক্ত হইবে ; না পরিত্যক্ত হইলে, অনিষ্ট ঘটিবে ।

অতএব শারীরিক সামগ্রী সকলই তুল্যরূপে পুষ্টিকর । এমন খাদ্য খাইতে হইবে যে তাহাতে সকলই পাওয়া যায় ।

দেখা যাউক, শরীরের গঠন-সামগ্রী কি কি । অস্থি, রক্ত, মাংস, মেদ, স্নায়ু, ত্বক্ প্রভৃতির সমষ্টির নাম শরীর । সকলগুলিতে জল আছে ; অনেকগুলিতে জলের ভাগই অধিক ।

জলভিন্ন শুষ্ক পদার্থ যাহা আছে, তাহা দ্বিবিধ ; কতকগুলি জৈব, চেতন জীব বা উদ্ভিদেই প্রাপ্য, আর কতকগুলি অচেতন বা ধাতব পদার্থ । ধাতব পদার্থ পরিমাণে অতি অল্প ।

জৈব পদার্থের মধ্যে একটি প্রধানের নাম গ্লুটেন । ময়দা মাখিয়া, তাহা ক্রমে ক্রমে কচলাইয়া কচলাইয়া জলে ধৌত করিলে যে আটার মত অবশিষ্ট ভাগ থাকে, তাহা গ্লুটেনের উদাহরণ । ছিন্ন মাংসের রক্ত উত্তম করিয়া ধৌত করিয়া ফেলিয়া, তাহা স্পিরিটে রাখিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, পূর্ব্বে তাহার ফিব্রিন নাম ব্যবহার হইত, এক্ষণে উহাকে মাস্কুলাইন বা মাংসিক বলা যায় । উহা ও গ্লুটেন একই পদার্থ বলা যাইতে পারে । শত ভাগ মাংসে, ৭৮ ভাগ জল বা রক্ত, ১৯ ভাগ মাংসিক এবং তিন ভাগ মেদ ।

ডিম্বের যে অংশ শ্বেত, তাহাতে দুই ভাগ জল, অবশিষ্ট এক ভাগ কিঞ্চিৎ মেদ ভিন্ন যাহা থাকে তাহার আলবুমেন নাম দেওয়া যায় । গ্লুটেন মাংসিক, এবং এই আলবুমেন বা আণ্ডিক, প্রায় একই পদার্থ । মাংস পিষিয়া রস বাহির করিয়া তাহা জ্বাল দিয়া ফুটাইলে, এই আণ্ডিক উপরে ভাসিতে থাকে ।

মেদ বা চর্‌বি, প্রায় সর্ব্বত্র পাওয়া যায় । মাংসে যে ইহা আছে, তাহা কথিত হইয়াছে । শুষ্ক রক্তে ইহা শত ভাগে তিন ভাগ আছে ।—মস্তিষ্কের শ্বেতভাগে ২১ ভাগ মেদ, এবং কপিশে ৬ ভাগ মেদ । মনুষ্যশরীরে সর্ব্বসমেত কতটুকু মেদ থাকে তাহা স্থির হয় নাই, কিন্তু বোধ হয়, শুষ্কপদার্থের পঁচিশ ভাগের এক ভাগ হইতে পারে ।

ধাতব পদার্থ অধিকাংশ, অস্থিতে আছে । ধাতব পদার্থ নাম সকল বিজ্ঞানের অনভিজ্ঞ ব্যক্তির বোধগম্য নহে । তবে ইহা বলা যাইতে পারে যে, রক্তে লৌহ, চুলে গন্ধক, এবং অন্যান্য স্থানে অন্যান্য সামগ্রী আছে ।*

---

* "The bones specially select and appropriate phosphate of lime, while the muscles take phosphate of magnesia and phosphate of potash. The cartilages build in soda, in preference to potash. The

মস্যুর কোয়েটেলেটের পরীক্ষানুসারে যে মনুষ্য ৭৭ সের ওজনে, তাহার শরীরে ৫৮ সের জল। তাহা বাদে যে শুষ্কভাগ ১৯ সের থাকে, তাহার মধ্যে—

মেদ	...	/৩
অস্থি	জৈবপদার্থ	/২½
	অজৈব বা ধাতব	/৪½
অবশিষ্ট—		
রক্ত মাংস ত্বক		/৯
	মোট	/১৯

শুষ্ক মাংসের শত ভাগে—

মাংসিক বা গ্লুটেন	৮৪ ভাগ
মেদ	৭
রক্ত এবং ধাতব লবণ	৯ „
	১০০

শুষ্ক রক্তের শত ভাগের মধ্যে—

ফিব্রিন, আলবুমেন ইত্যাদি	৯২ ভাগ
মেদ ও অম্ল শর্করা	৩ „
ধাতব লবণাদি	৫
	১০০

অতএব শরীর-গঠনের যে সকল সামগ্রী তন্মধ্যে প্রধান জল, তৎপরে গ্লুটেন, তৎপরে মেদ, এবং ধাতব পদার্থ।

শরীরের এই মূলধন। কথিত হইয়াছে যে ইহার কোনটির আধিক্য ঘটিলে, শরীরে তাহা গৃহীত হয় না, পরিত্যক্ত হয়। তবে নিত্য সঞ্চয়ের অর্থাৎ আহারে প্রয়োজন কি ?

---

bones and teeth specially extract flourine. Silica is almost monopolised by the hair, skin, and nails of man...Iron abound chiefly in the colouring matter of the blood (*hematin*) in the black pigment of the eye, and in the hair. Sulphur exists largely in hair, and phosphorus or phosphoric acid in the brain.” *Johnstone's Chemistry of Common Life*, vol. ii, p. 372.

প্রয়োজন এই যে, অহরহ, পলকে পলকে, মুহুর্মুহুঃ, এই মূলধন ব্যয়িত হইতেছে। যাহা ব্যয়িত হইতেছে, তৎস্থলে নূতন সঞ্চয় না হইতে থাকিলে, অল্পকালে, মূলধন ফুরাইয়া যাইবে। মহাজন ফেইল হইবে।

দেখা যাউক, কি প্রকারে এই মূলধন মুহুর্মুহুঃ ব্যয়িত হইতেছে।

১ম। নিশ্বাস প্রশ্বাস। আমরা নিশ্বাসে বায়ু গ্রহণ করিয়া পুনস্ত্যাগ করি। যাহা গ্রহণ করি, ঠিক তাহাই আর ফিরিয়া বাহির হয় না। উপযুক্তমত পরীক্ষার দ্বারা সহজেই নির্ণয় করা যায় যে, ঐ বায়ুর গুরুতর পরিবর্তন ঘটিয়াছে।

১। সহজ বায়ু, যাহা আমরা নাসিকায় গ্রহণ করি, তাহা অম্লজান এবং যবক্ষারজানে মিশ্রিত। শতভাগ সহজ বায়ুতে ২১ ভাগ অম্লজান থাকে। যাহা পরিত্যাগ করি, তাহা পরীক্ষার দ্বারা দেখিলে জানা যাইবে যে, অম্লজানের ভাগ কমিয়া গিয়াছে। ২১ ভাগের স্থানে ১৬, ১৭ বা ১৮ ভাগ মাত্র আছে। অবশিষ্ট ভাগ অম্লজান শরীরে গৃহীত হইয়াছে।

২। অম্লজানে, অঙ্গারজানে কার্ব্বনিক আসিড বা আঙ্গারিক অম্লের উৎপত্তি হয়। সহজ বায়ুতে ইহা পাঁচ হাজার ভাগে দুই ভাগ মাত্র থাকে। কিন্তু নিশ্বাসে যে বায়ু নির্গত হয়, তাহাতে ১০০ ভাগে ৩।। ভাগ থাকে অর্থাৎ ৫০০০ ভাগে ১৭৫ থাকে। অতএব নিশ্বাস-ক্রিয়ার দ্বারা শরীরমধ্য হইতে আঙ্গারিক অম্ল নির্গত হইতেছে।

৩। ঐরূপ নিশ্বাসের সহিত জলীয় বাষ্প নির্গত হইয়া থাকে। আয়না বা পালিশ করা ধাতুপাত্রে নিশ্বাস ত্যাগ করিলেই ইহা দেখা যায়।

এখন, যে বায়ু আমরা নিশ্বাসে গ্রহণ করিয়াছিলাম তাহার কয় ভাগ অম্লজান কোথায় গেল? আর এই আঙ্গারিক অম্ল ও জল কোথা হইতে আসিল?

জল, অম্লজান ও জলজানের রাসায়নিক সংযোগে জন্মে। অতএব দেখা যাইতেছে, নিশ্বাসে যে জলীয় বাষ্প নির্গত হইয়াছে, তাহার সৃজনার্থ, গৃহীত অম্লজানের কিয়দংশ লাগিয়াছে। কিন্তু জলজান ত নিশ্বাসে গৃহীত হয় নাই। তাহা নহিলে জলও হয় নাই। অতএব ইহা শরীর হইতে আসিয়াছে।

আঙ্গারিক অম্ল, অঙ্গারজান ও অম্লজানের রাসায়নিক সংযোগে জন্মে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, গৃহীত বায়ুর অম্লজান কিয়ৎপরিমাণে এই আঙ্গারিক অম্লের সৃজনে লাগিয়াছে। কিন্তু অঙ্গারজান ত গৃহীত বায়ুতে ছিল না। অতএব এই অঙ্গারজান শরীর মধ্য হইতে আসিয়াছে।

অতএব বায়ু নিশ্বাসদ্বারা শরীরমধ্যে প্রবেশ করিয়া শরীর ভাঙ্গিয়া তাহা হইতে জলজান ও অঙ্গারজান কাড়িয়া আনিয়াছে। দেখা যাউক, কিরূপে কোথা হইতে কাড়িয়া আনিয়াছে।

দের জলজান, অম্লজান, এবং অঙ্গারজানের সংযুক্ত ফল, যথা—

অঙ্গারজান	৩৭ ভাগ
জলজান	৩৬ „
অম্লজান	৫

নিশ্বাসের অম্লজান, শ্বাসকোষে রক্তের সঙ্গে মিশিয়া, সমস্ত শরীর পরিভ্রমণ করে। তথায় মেদের জলজান ও অঙ্গারজানের সঙ্গে মিশিয়া মেদকে জলে এবং আঙ্গারিক অম্লে পরিণত করে। এক পরমাণু মেদে ১০৫ পরমাণু অম্লজানের সংঘটনে মেদ বিনষ্ট হইবে—যথা—

মেদ ১ পরমাণুতে

অঙ্গারজান	৩৭
জলজান	৩৬
অম্লজান	৫

তাহাতে মিলিল

অম্লজান	১০৫

মোট হইল

অঙ্গারজান	৩৭
জলজান	৩৬
অম্লজান	১০০

পরিবর্ত্তন হইয়া হইবে

অম্লজান	জলজান	অঃজান
৭৪		৩৭ = ৩৭ আঃ অম্ল
৩৬	৩৬	০ = ৩৬ জল
১১০	৩৬	৩৭

অতএব শারীরিক ১ ভাগ মেদ ও নিশ্বাসগৃহীত শোণিতসঞ্চারী ১০৫ ভাগ অম্লজান, উভয়ে অন্তর্হিত হইয়া যায়, তৎস্থানে ৩৬ ভাগ জল ও ৩৭ ভাগ আঙ্গারিক অম্ল নির্গত হয়। নিশ্বাসে গৃহীত বায়ুস্থ অম্লজান যদি শোণিতমধ্যে মেদ না পায়, তবে শরীরের অন্যান্য অংশ আক্রমণ করিয়া শরীরকে মেদশূন্য করিবে।

২য়। ঘর্ম্মাদি। যেমন নিশ্বাসে আমরা বায়ু গ্রহণ করিয়া থাকি, এমনি ত্বগের দ্বারাও গ্রহণ করি। চর্ম্মের সর্ব্বত্র অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সহজ দর্শনের অতীত ছিদ্র আছে। সেই সকল ছিদ্র, এক একটি প্রণালীর মুখ। এবং সেই সকল

ছিদ্র দিয়া আমরা বায়ুশোষণ করিতেছি। শারীরতত্ত্ববিদেরা বলেন, কোন সম্পূর্ণাকৃত পুরুষের গাত্রে সর্ব্বশুদ্ধ এরূপ সত্তর লক্ষ ছিদ্র আছে, এবং এই ছিদ্রগুলিন যে সকল প্রণালীর মুখ, তাহা সকল যোড়া দিলে, চৌদ্দ ক্রোশ দীর্ঘ হয়! শুনিয়া অনেক পাঠক মনে করিতে পারেন যে আমরা আবকারি মহল লুঠ করিয়া এ প্রবন্ধ লিখিতে বসিয়াছি।

এই সত্তর লক্ষ ছিদ্র দিয়া অনুদিন অবিশ্রান্ত বায়ুশোষণ হইতেছে। এবং নিশ্বাসগৃহীত বায়ুস্থ অম্লজান যেমন শরীরের মেদকে জল এবং আঙ্গারিক অম্ল করিয়া বাহির করিয়া দেয়, ত্বক্‌শোষিত বায়ুও সেইরূপ করে। ত্বকের অসংখ্য ছিদ্র দিয়া অনুদিন অবিশ্রান্ত জলীয় বাষ্প, আঙ্গারিক অম্ল, এবং অন্যান্য শারীরিক সামগ্রী নির্গত হইতেছে। ইহা শরীরের দ্বিতীয় ব্যয়। ইহাকে অজ্ঞাত ঘর্ম্ম বলা যায়।

৩য়। প্রস্রাবাদি। অহরহ শরীর ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে। সর্ব্বাঙ্গের সর্ব্বাংশই এই ক্ষয়ের অধীন। শারীরিক গতিমাত্র শারীরিক ক্ষয়ের কারণ। তুমি যদি অঙ্গুলিমাত্র সঞ্চালন করিলে, সেই সঞ্চালনে যে সকল মাংসপেশী, স্নায়ু, শিরা, অস্থি যাহা যাহা সঞ্চালিত হইল তাহাই অবস্থান্তরিত হয়; তাহারই কিয়দংশ ক্ষয় হইয়া যায়। যেমন শিল্পকারের যন্ত্রসকল কার্য্য মাত্রে কিঞ্চিৎ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়; যেমন ছুতারের বাঁটালি যতবার কাষ্ঠে আহত হইবে, ততবার একটু ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে, এও সেইরূপ। সে [illegible], এইরূপ অনুমিত হইয়াছে যে, নিশ্বাসাগত বায়ুস্থ অম্লজান যাহা শোণিতে আরোহণ করিয়া শরীরের সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেছে, যাহার কিয়দংশে পরিত্যজ্য জল ও আঙ্গারিক অম্ল জন্মে, তাহার আর একভাগ শারীরিক সামগ্রীর সহিত সংযুক্ত হয়। তৎকর্ম্মে প্রাস্রাবিক এবং প্রাস্রাবিক অম্ল নামক সামগ্রী জন্মে; তাহা শরীরের গঠনোপযোগী নহে; শরীরমধ্যে থাকিতে পায় না; তাহা প্রাস্রাবযোগে পরিত্যক্ত হয়। অম্লজান সংযোগে অন্যান্য পদার্থ, ঐরূপে সৃষ্ট হইয়া ঐরূপে পরিত্যক্ত হয়।

এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখ যে মনুষ্য এক মুহূর্ত্তের জন্য স্থির নহে। সর্ব্বদা হয় চলিতেছে, নয় নড়িতেছে, নয় কথা কহিতেছে, নহে আর কিছু করিতেছে। যাহা করিতেছে, তাহাতেই চাঞ্চল্যের পরিমাণে শরীর ক্ষয় হইতেছে। যদি কেহ কিছু না করিয়া কেবল বসিয়া চিন্তা করে, তাহাতেও মস্তিষ্কের চাঞ্চল্য; তাহাতেও ক্ষয় আছে। যদি চিন্তাও না করিয়া নিদ্রা যায়, তাহাতেও নিষ্কৃতি নাই, কেননা, তখনও নিশ্বাস-প্রশ্বাস, হৃদ্‌ঘাত রক্তবহন, জীরণ প্রভৃতি কার্য্য চলিতে থাকে, তাহাতে কত অসংখ্য মাংসপেশী, শিরা, স্নায়ু প্রভৃতি খাটিতে থাকে। অতএব মনুষ্য-শরীর,

অহরহ অনন্ত চাঞ্চল্যবিশিষ্ট; অহরহ মেদ, অস্থি, মাংস, মস্তিষ্ক, স্নায়ু প্রভৃতি সর্ব্বাঙ্গের সর্ব্বাংশ অবাধে ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে। ইহার শান্তি নাই, নিবারণ করিবার উপায় নাই। শরীরের এইরূপ ব্যয়। জগতে এমত কেহ ব্যয়শীলও নাই যে, এরূপ নিরন্তর অবাধে, অনিবার্য্য হইয়া, আপন স্বত্ব ব্যয় করে।

যদি পুনঃসঞ্চয়ের উপায় না থাকিত, তবে শরীরের এই ভয়ঙ্কর ব্যয়ে অল্প কালেই মূলধন ক্ষয় হইয়া শরীরের ধ্বংস হইত। এই পুনঃসঞ্চয়ের উপায় আহার।

আমরা দেখাইলাম শরীরের মূলধন কি, এবং তাহা কি প্রকারে ব্যয়িত হয়। সে ব্যয়িত ধনের স্থলে নূতন ধন সঞ্চয় করা, অথবা ব্যয় জন্য পৃথক্ ধন সঞ্চয় করা, আহারের উদ্দেশ্য। অতএব যাহা ব্যয় হয়, তাহাই আহার্য্য। যাহাতে ব্যয়িত সামগ্রী থাকে, তাহাই খাদ্য। এক্ষণে আমরা পরসংখ্যায় দেখাইব, কোন্ সামগ্রীতে কি প্রকার আহার্য্য পাওয়া যায়।

আমার সঙ্গীত

১

কি!—
গাইব না—কেন?—অবশ্য গাইব।
গায় না কি কভু সুস্বর বিহীনে?
হরিষে, বিষাদে,—প্রণয়ে, বিরহে,—
শোকে, সুখে,—হায়! হলে উচ্ছ্বসিত
হৃদয় তাহার? ছুটিলে হায় রে!
মানব-হৃদয়ে ভাবের প্রবাহ?

২

আসিলে বরষা, সলিল প্রবাহে
হয় না কি শুষ্ক পর্ব্বত-বাহিনী,
কল কল্লোলিনী,—কূল বিপ্লাবিনী?
আসিলে বসন্ত, গোলাপের সনে
ফুটে না ধুস্তূর, কুৎসিত কাননে?
গায় না কি কাক কোকিলের সনে?

৩

হায় এই জড়, অজড় জগতে,
কে বল নীরব? গাইছে সকল।
গর্জ্জিছে জলধি, মন্দ্রিছে জীমূত,
ডাকে পশু, গায় বিহঙ্গ নিকর।
আমি নর কেন নীরবে থাকিব?
গাইব না কেন?—অবশ্য গাইব।

৪

"গাও তুমি; কিন্তু শুনিবে না কেহ,
কর্কশ কণ্ঠের নির্ঘোষ তোমার;—"
বলিতেছ তুমি? শুনিও না তুমি
সঙ্গীত আমার। ডমরু নিনাদে,
নাচিবে ভুজঙ্গ ফণা আস্ফালিয়া;
পশিবে মণ্ডূক সভয়ে বিবরে।

৫

মন্দ্রিলে জীমূত; ঘোর গরজনে
গায় গিরি, নাচে গায় পারাবার;
হাসে "বিদ্যুদ্দাম স্ফুরণ চকিত;"
সে রণ সঙ্গীতে,—মরি হাসি পায়,—
তুলি অভিমানে উড়ায়ে পেখম,
নাচে সগরবে নির্লজ্জ—শিখিনী!

৬

আজি বঙ্গ দেশ নির্লজ্জশিখিনী,
তুমি এক ক্ষুদ্র চন্দ্রক তাহার;
মুহূর্ত্ত অলসি দর্শক নয়ন,
ষাটি কোটি পুচ্ছে—পশিবে আবার।
তব তরে নহে মম এ সঙ্গীত,
তব নাট্যশালা: ওই [illegible]!

৭

গাইছে রমণী, শুনিছে রমণী,
নাচিছে রমণী, দেখিছে রমণী,
রমণীর নৃত্য ; রমণীর গীত ;
রমণীর রাজ্য ; রমণী-শাসিত ;
বভ্রুবাহ পুরি, আজি বঙ্গদেশ !
মম এ সঙ্গীত বিড়ম্বনা শেষ।

৮

যথায় আদর কোকিলা কণ্ঠের ;
অবশ পুরুষ দেয় করতালি
রমণী ব্যায়ামে,—অশক্ত খেমটায়।
যথায় দাসত্ব-শৃঙ্খল শিক্ষিত ;
লক্ষ্ণৌ চেয়ে, লক্ষ্ণৌ টপ্পার আদর ;
তথা এ সঙ্গীত, মানি—হাস্যকর।

৯

গর্জ্জে ছিল এই সঙ্গীত আমার,
পাঞ্চজন্যে শঙ্খ কুরুক্ষেত্ররণে ;
শিঞ্জিনী শিঞ্জনে, অস্ত্রের ঝঞ্জনে,
রথের ঘর্ঘরে, ঘোর সিংহনাদে।
সেই সঙ্গীতের হইয়াছে হায় !
শেষ তান লয় 'চিনের ওয়ালায়'।

১০

আজি সেই বীর সমাধি ভবনে,
জাগিবে কি সেই সঙ্গীত আবার ?
এই রাশীকৃত শীতল অঙ্গারে,
এক কণা অগ্নি হইবে সঞ্চার ?
লোহে লোহে হয় অগ্নি উদ্দীরণ ;
লোহার অঙ্গারে, ?—ভস্মের নির্গম !

১১

ভস্মরাশিময় আজি এ ভারত,
কে শুনিবে বীর—সঙ্গীত আমার ?
কি আছে ভারতে গাইবে যে কবি,
ঢালিয়া অমৃত ভস্মের ভিতর ?
বরঞ্চ পশিয়া হিমাদ্রি কন্দরে
শুনিবে সঙ্গীত ওই কেশরীরে।

১২

গাইব তাহার তীব্র পরাক্রম,
গাইব তাহার বীর অবয়ব,
গাইব তাহার দুর্জ্জয় নখর,
গাইব তাহার গর্জ্জন ভীষণ।
অতৃপ্ত উদর,—অসংখ্য দশন,—
গাইব তাহার, রক্তিম লোচন।

১৩

শুনিয়া সঙ্গীত, নাচিবে নির্জ্জীব
মহীরুহচয় ভুজ আস্ফালিয়া ;
হাসিবে পাষাণ, গর্জ্জিবে জীমূত ;
বনে দাবানল উঠিবে জ্বলিয়া।
গাবে প্রতিধ্বনি ভীষণ নির্ঘোষে,
দূরে মহাসিন্ধু—উত্তরিবে শেষে।

১৪

কিম্বা বসি সেই মহাসিন্ধু তীরে,
মহা অম্বু-সহ কণ্ঠ মিশাইয়া—
গাইব নির্ঘোষে সঙ্গীত আমার,
মহানন্দে, মহা সিন্ধু উচ্ছ্বসিয়া।
শুনিয়া সঙ্গীত ঘন গরজিয়া,
ঘন ঘনরাশি, আসিবে উড়িয়া !

১৫

ফাটিবে জলদ ; ছুটিবে বিদ্যুৎ—
তীব্র অগ্নি-বাণ,—বিদারি গগন !
মাতিবে জলধি ; ছুটিবে তরঙ্গ—
বরুণাস্ত্র শত, সহস্র—ভীষণ !
তখন আনন্দে করিয়া ঝঙ্কার,
রণরঙ্গে কবি পাবে পুরস্কার।

শ্রীনঃ।

ভারতবর্ষীয় আর্য্যজাতির আদিম অবস্থা

বিবাহবিধি ও বিবাহবিষয়

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের শেষ)

শূদ্র জাতি কেবল শূদ্রা বিবাহ করিতে পারে। বৈশ্য বৈশ্যা ও শূদ্রা কন্যা, ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রা কন্যা। ব্রাহ্মণ জাতি চারি বর্ণের কন্যা গ্রহণ করিতে পারেন। দ্বিজাতিগণ অগ্রে স্ববর্ণা কন্যার পাণিগ্রহণ করিবেন। কামবশতঃ বিবাহ করিতে ইচ্ছা হইলে ক্রমে অসবর্ণা কন্যাও বিবাহ করিতে সমর্থ হইবেন অর্থাৎ ব্রাহ্মণ প্রথমে ব্রাহ্মণ কন্যা তৎপরে ক্ষত্রিয়া তৎপরে বৈশ্যা ও অবশেষে শূদ্রা কন্যাকেও গ্রহণ করিতে পারিবেন। ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপর তিন বর্ণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ক্রমে বিবাহ করিতে নিষিদ্ধ নহেন। বৈশ্য জাতি বৈশ্যা ও শূদ্রা বিবাহ করিবেন, অগ্রে বৈশ্যা পরে শূদ্রা ভার্য্যা স্বীকারে নিন্দনীয় হইবেন না। (১)

ব্রাহ্মণের শূদ্রা ভার্য্যায় নিষেধ না থাকিলেও শূদ্রার গর্ভে সন্তান উৎপাদনে ও শূদ্রার সহবাসে ব্রাহ্মণ্য নষ্ট হয় বলিয়া ইঁহারা আপত্‌কালেও কদাচ শূদ্রা ভার্য্যা স্বীকার করেন নাই। মোহবশতঃ যদি দ্বিজাতিগণ অপকৃষ্ট বর্ণের কন্যা ভার্য্যারূপে গ্রহণ করেন, তাহা হইলে সেই দ্বিজগণ ও তৎসন্ততি শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইবেন। (২)

---

(১)	শূদ্রৈব ভার্য্যা শূদ্রস্য সা চ স্বা চ বিশঃ স্মৃতে।
অ ৩। ১৩।	তে চ স্বা চৈব রাজ্ঞশ্চ তাশ্চ স্বা চাগ্রজন্মনঃ ॥
মনু	সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাম্ প্রশস্তা দারকর্ম্মণি।
অ ৩। ১২।	কামতস্তু প্রবৃত্তানাং ইমাঃ স্যু ক্রমশোঽবরাঃ ॥
(২)	শূদ্রাং শয়নমারোপ্য ব্রাহ্মণো যাত্যধোগতিং।
অ ৩। ১৪।	জনয়িত্বা সুতং তস্য ব্রাহ্মণ্যাদেব হীয়তে ॥ ১৭
মনু	ন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়োরাপত্তপি তিষ্ঠতোঃ।
	কস্মিংশ্চিদপি বৃত্তান্তে শূদ্রা ভার্য্যোপদিশ্যতে ॥
	হীনজাতিস্ত্রিয়ং মোহাদুদ্বহন্তো দ্বিজাতয়ঃ।
	কুলান্যেব নয়ন্ত্যাশু সসন্তানানি শূদ্রতাম্ ॥ ১৫

বিবাহ অষ্টবিধ। যথা—ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ। (৩)

আট প্রকার বিবাহের লক্ষণ। যথা—যে বিবাহে দানকর্ত্তা স্বয়ং বরকে আহ্বান করিয়া বস্ত্রালঙ্কার দ্বারা তাঁহার বরণ পুরঃসর সবস্ত্রা ও সালঙ্কৃতা কন্যাদান করেন, সেই বিবাহকে ব্রাহ্ম বিবাহ কহা যায়। (৪)

দৈব বিবাহ।—অতি বিস্তৃত জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞের যাজক পুরোহিতকে যদি যজ্ঞ আরম্ভের পূর্ব্বে গার্হস্থ ধর্ম্ম সম্পাদন নিমিত্ত তদীয় করে সালঙ্কৃতা কন্যা দান করা যায়, তাহা হইলে সেই বিবাহের নাম দৈব বিবাহ।

আর্ষ বিবাহ।—ধর্ম্মকার্য্য সম্পন্ন নিমিত্ত একধেনু, একবৃষ অথবা গোমিথুন-দ্বয় বরপক্ষ হইতে লইয়া যথাবিধানে সবস্ত্রা ও সালঙ্কৃতা কন্যা দান করার নাম আর্ষ।

প্রাজাপত্য বিবাহ।—এই বিবাহে কন্যাদাতা বরকে ও কন্যাকে যথাবিধি অর্চ্চনা করিয়া বলেন, তোমরা উভয়ে ধর্ম্মাচরণ কর, অদ্যাবধি তোমাদিগের দাম্পত্য চির সুখদায়ক হউক।

আসুর বিবাহ।—কন্যার পিত্রাদি এবং কন্যাকে যথাশক্তি পণ দিয়া বর আপনি যে স্থলে কন্যা গ্রহণ পূর্ব্বক বিবাহ করে, তথায় আসুর বিবাহ কহা যায়।

গান্ধর্ব্ব বিবাহ।—বর ও কন্যা উভয়ে ইচ্ছানুসারে পরস্পর আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক যে বিবাহ করে, তাহাকে গান্ধর্ব্ব বলা যায়।

---

(৩) ব্রাহ্মো দৈবস্তথৈবার্ষঃ প্রাজাপত্যস্তথাসুরঃ।
গান্ধর্ব্বো রাক্ষসশ্চৈব পৈশাচশ্চাষ্টমোঽধমঃ ॥ ২১
(৪) আচ্ছাদ্য চার্চ্চয়িত্বা চ শ্রুতশীলবতে স্বয়ং।
আহূয় দানং কন্যায়া ব্রাহ্মোধর্ম্ম প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ২৭
যজ্ঞে তু বিততে সম্যগৃত্বিজে কর্ম্মকুর্ব্বতে।
অলঙ্কৃত্য সুতাদানং দৈবং ধর্ম্মং প্রচক্ষতে ॥ ২৮
একং গোমিথুনং দ্বে বা বরাদাদায় ধর্ম্মতঃ।
কন্যাপ্রদানম্ বিধিবদার্ষো ধর্ম্মঃ স উচ্যতে ॥ ২৯
সহোভৌ চরতাং ধর্ম্মমিতি বাচোঽনুভাষ্য চ।
কন্যাপ্রদানমভ্যর্চ্চ্য প্রাজাপত্যো বিধিঃ স্মৃতঃ ॥ ৩০
জ্ঞাতিভ্যো দ্রবিণং দত্ত্বা কন্যায়ৈ চৈব শক্তিতঃ।
কন্যাপ্রদানং স্বাচ্ছন্দ্যাদাসুরোধর্ম্ম উচ্যতে ॥ ৩১

মনু ৩য় অধ্যায়।

রাক্ষস।—ইহাতে কন্যা হরণ করিয়া বিবাহ সম্পন্ন হয়। কন্যা হরণকালে কন্যার পিতৃপক্ষের সঙ্গে যুদ্ধাদিও বটে তাহাতে কন্যাপক্ষেরা হত ও আহত হয়। কন্যাও হা তাতঃ, হা মাতঃ বলিয়া রোদন করিয়া থাকে।

পৈশাচ।—এ অতি অপকৃষ্ট বিবাহ। সুষুপ্তা, প্রমত্তা অথবা অনবধানশীলা কন্যাকে নির্জ্জনে পত্নীরূপে ব্যবহার করাকে পৈশাচ বলা যায়। (৫)

আর্য্যেরা অনিন্দিত বিবাহোৎপন্ন সন্তানকেই বংশধর জ্ঞান করিতেন। নিন্দিত বিবাহসম্ভব সন্তানকে বংশের অকীর্ত্তিকর জ্ঞান করিতেন। তাঁহাদের মতে পশ্চাদ্বর্ণিত পরিণয়গুলি নিন্দনীয়। তাঁহারা উদ্বাহবিষয়ে বিশেষ সাবধান ছিলেন। (৬)

অষ্টবিধ বিবাহের মধ্যে প্রথম ছয় প্রকার বিপ্রজাতির পক্ষে ধর্ম্ম্য। ক্ষত্রিয় জাতির পূর্ব্বোক্ত ষড়্বিধ বিবাহের মধ্যে ব্রাহ্ম ও দৈব ব্যতীত অবশিষ্ট চারিটী ধর্ম্ম্য। বৈশ্য ও শূদ্রের সম্বন্ধে আসুর, গান্ধর্ব্ব ও পৈশাচ এই তিনটী ধর্ম্মজনক বলিয়া ব্যবস্থাপিত আছে।

পূর্ব্বকথিত বিবাহের মধ্যে আর্ষ বিবাহে বরপক্ষ হইতে গোমিথুন লইবার ব্যবস্থা থাকায় ও রাক্ষস বিবাহে বিবাদ বিসম্বাদ সহকারে কন্যাহরণরূপ অপকার্য্যনিবন্ধন এবং পৈশাচ বিবাহে অত্যন্ত ঘৃণিত ও নীচাশয়তার কার্য্য বিদ্যমান বশতঃ এই তিন প্রকার বিবাহ সকল জাতির পক্ষেই অকর্ত্তব্য।

ক্ষত্রিয়জাতি রাজ্যশাসন করিতেন, তাঁহাদিগের বাহুবল ছিল সুতরাং তাঁহাদিগের পক্ষে কন্যাহরণ পূর্ব্বক বিবাহ করা অসম্ভব হইত না, এই নিমিত্ত রাক্ষস বিবাহ তাঁহাদিগের পক্ষে সুসঙ্গত।

বৈশ্যজাতি বণিক্‌বৃত্তি করিত, শূদ্রজাতি সেবাতৎপর ছিল, বরপক্ষে অথবা কন্যাপক্ষে শুল্ক দিয়া বিবাহ করা ইহাদিগের পক্ষে অকীর্ত্তিকর ছিল না। সুসাধ্য বলিয়া তাহাদিগের পক্ষে উহাই প্রশস্ত। (৭)

---

(৫) অ ৩। ৩২ ইচ্ছয়ান্যোন্যসংযোগঃ কন্যায়াশ্চ বরস্য চ।
গান্ধর্ব্বঃ স তু বিজ্ঞেয়ো মৈথুন্যঃ কামসম্ভবঃ।
অ ৩। ৩৩ হত্বা ছিত্ত্বা চ ভিত্ত্বা চ ক্রোশন্তীং রুদতীং গৃহাৎ।
প্রসহ্য কন্যাহরণং রাক্ষসো বিধিরুচ্যতে॥
অ ৩। ৩৪ সুপ্তাং মত্তাং প্রমত্তাং বা রহো যত্রোপগচ্ছতি।
স পাপিষ্ঠো বিবাহানাং পৈশাচশ্চাষ্টমোঽধমঃ॥

(৬) অ ৩। ২৩ মনু ষড়ানুপূর্ব্ব্যা বিপ্রস্য ক্ষত্রস্য চতুরোঽবরান্।
বিট্‌শূদ্রয়োস্তু তানেব বিদ্যাদ্ধর্ম্ম্যানরাক্ষসান্॥

(৭) অ ৩। ২৪ মনু চতুরো ব্রাহ্মণস্যাদ্যান্ প্রশস্তান্ কবয়ো বিদুঃ।
রাক্ষসং ক্ষত্রিয়স্যৈকমাসুরং বৈশ্যশূদ্রয়োঃ॥
অ ৩। ২৫ পঞ্চানান্তু ত্রয়োধর্ম্ম্যা দ্বাবধর্ম্ম্যৌ স্মৃতাবিহ।

আর্য্যজাতিরা কিরূপ পাত্রের, কিরূপ কন্যার পাণিগ্রহণ সুলক্ষণ জ্ঞান করিতেন তাহা নির্ণয় করা যাউক।

কন্যা

যে কন্যা রোগবিহীনা, যাহার অঙ্গবৈকল্য অথবা কোন অবয়বের ন্যূনাধিক্য নাই। যাহার অঙ্গ অধিক লোমে আচ্ছাদিত অথবা একেবারেই লোমশূন্য নহে, যাহার বাক্‌চাপল্য নাই, যাহার নয়নদ্বয় বিড়ালের নয়নতুল্য নহে এবং বর্ণ ও কেশ কটা বলিয়া প্রতীতি না হয়, সেই কন্যাই সুলক্ষণা বলিয়া পরিগণিত হয়।

বিবাহ বিষয়ে আর্য্যজাতিদিগের বড় কড়াকড়ি। ইহারা কন্যা গ্রহণ সময়ে অত্যন্ত সাবধানতা দেখান। ইহাদিগের মতে অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তিও সদাচার-সম্পন্ন না হইলে তদীয় কন্যা পাণিগ্রহণ কার্য্যে প্রশস্ত নহে। যাহাদিগের কন্যা বিবাহ কার্য্যে নিন্দিত, তন্মধ্যে পশ্চাদ্বর্ত্তী দশটী কুল অবশ্য পরিত্যাজ্য বলিয়া পরিগণিত আছে।

১ম। যে বংশে ক্ষয়রোগ (অর্শ, রাজযক্ষ্মা, বহুমূত্র প্রভৃতি ক্ষয়কারী রোগ) অপস্মার (মৃগীনাড়া) শ্বিত্র (ধবল) কুষ্ঠকুনখ অথবা কোন প্রকার পৈতৃক পীড়া সংক্রান্ত হইয়া থাকে কিম্বা উদরাময়াদি অলক্ষিত পীড়া আছে, সে বংশের কন্যা কদাচ বিবাহ করা যুক্তিসিদ্ধ নহে।

২য়। যে বংশের লোকেরা সংক্রিয়াপরিশূন্য এবং প্রায়ই কোন ব্যক্তির ভাগ্যে বিদ্যা শাস্ত্রাধ্যয়ন সংশ্রব হয় নাই, সে কুলও প্রার্থনীয় নয়।

৩য়। নিষ্পুরুষ কুলও পরিত্যাজ্য। তাহার কারণ এই, যে বংশে কেবল মাত্র কন্যা জন্মে, সে কুলের কন্যা গ্রহণ করিলে পুত্রসন্তান জন্মিবার তাদৃশ সম্ভাবনা থাকে না। যদি বা পুত্র জন্মে অনেক সময়ে মাতামহগণ দৌহিত্রকে পুত্রিকা পুত্র করিতেন বলিয়া সহসা সকলে সে বিবাহকে প্রশস্ত মনে করিতেন না। (৮)

বিবাদ বিষয়

আর্য্যজাতির শাসনপ্রণালী অনুসারে বিবাদ অষ্টাদশ প্রকার।

পৈশাচশ্চাসুরশ্চৈব নকর্ত্তব্যৌ কদাচন ॥

(৮) মহান্ত্যপি সমৃদ্ধানি গোহজা বিধন ধান্যতঃ।
স্ত্রীসম্বন্ধে দশৈতানি কুলানি পরিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৬। ৩ অ
হীনক্রিয়ং নিষ্পুরুষং নিশ্ছন্দোরোম শার্শসং।
ক্ষয়ামযা বাপস্মারি শ্বিত্রিকুষ্ঠি কুলানিচ ॥ ৭। ৩ অ
নোদ্বহেৎ কপিলাম্ কন্যাম্ নাধিকাঙ্গীম্ ন রোগিণীং।
নালোমিকাং নাতিলোমাং ন বাচাটাং ন পিঙ্গলাং ॥ ৮। ৩ অ

ঋষিগণ ঐ অষ্টাদশবিধ বিবাদের নিষ্পত্তি বিষয়ে পৃথক্ পৃথক্ নিবন্ধ গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন।

যে বিবাদের নিষ্পত্তি বিষয়ে যে নিবন্ধকে প্রমাণ জ্ঞান করেন, সে বিবাদ সেই নিবন্ধের যুক্তি অনুসারে বিবেচিত হয়। অষ্টাদশ বিবাদের নাম, যথা—ঋণ গ্রহণ। নিঃক্ষেপ। অস্বামিবিক্রয়। সম্ভূয় সমুত্থান। দান প্রাদানিক। ভৃত্যবেতন-দানকাল শৈথিল্য। সম্বিদ্ব্যতিক্রম। ক্রয়বিক্রয়ানুশয়। স্বামিপাল বিবাদ। সীমা বিবাদ। বাক্‌পারুষ্য। দণ্ড পারুষ্য। স্তেয় বা চৌর্য্য। সাহস। (ডাকাতী) স্ত্রীসংগ্রহ। বিভাগ। দ্যূত। আহ্বয়। (৯)

১ম, ঋণ গ্রহণ—ইহা আবার সাত প্রকারে বিভক্ত। কোন ঋণ অবশ্য পরিশোধের যোগ্য।

২য়, সুরাপায়ী বা উন্মত্ত কিম্বা বেশ্যাসক্ত পিতার কৃত ঋণ, পুত্রের পরিশোধ্য নহে।

৩য়, অপ্রাপ্তব্যবহার কালে পুত্র পিতৃকৃত ঋণ পরিশোধের অযোগ্য।

৪র্থ, প্রাপ্তব্যবহার পুত্রের অগোচরে পিতৃকৃত ঋণ পুত্রের দেয় বলিয়া গ্রাহ্য হয় না।

৫ম, প্রোষিত বা নিরুদ্দিষ্ট পিতৃকৃত ঋণ বিংশতিবর্ষ পরে পুত্রের অবশ্য দেয় বলিয়া পরিগণিত।

৬ষ্ঠ, বৃদ্ধি (কুসীদ) দিবার প্রতিজ্ঞা থাকিলে সুদ সহিত মূল ঋণ পরিশোধ করা কর্ত্তব্য।

---

(৯) অষ্টাদশ বিবাদ পদ।

প্রত্যহং দেশদৃষ্টৈশ্চ শাস্ত্রদৃষ্টৈশ্চ হেতুভিঃ।
অষ্টাদশস্থ মার্গেষু নিবদ্ধানি পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৩
তেষামাদ্যমৃণাদানং নিঃক্ষেপোঽস্বামি বিক্রয়ঃ।
সম্ভূয় চ সমুত্থানং দত্তস্যানপ কর্ম্মচ ॥ ৪
বেতনস্যৈব চাদানং সংবিদশ্চ ব্যতিক্রমঃ।
ক্রয় বিক্রয়ানুশয়ো বিবাদঃ স্বামি পালয়োঃ ॥ ৫
সীমাবিবাদ ধর্ম্মশ্চ পারুষ্যে দণ্ড বাচিকে।
স্তেয়ঞ্চ সাহসঞ্চৈব স্ত্রীসংগ্রহণমেবচ ॥ ৬
স্ত্রী পুংধর্ম্মোবিভাগশ্চ দ্যূতমাহ্বয় এবচ।
পদান্যষ্টাদশৈতানি ব্যবহার স্থিতাবিহ ॥ ৭

মনু ৮

নারদ বচন—

ঋণংদেয় মদেয়ঞ্চ যেন যত্র যথাচ যৎ।

নিঃক্ষেপ—২

উত্তমর্ণ ও অধমর্ণে যে আদান প্রদান হয় তাহার নাম নিঃক্ষেপ। ইহাও সাত প্রকার। উহা যথস্থানে দেখান যাইবে।

অস্বামি বিক্রয়—৩

যে বস্তুতে যাহার স্বত্ব নাই সেই ব্যক্তি কৃত তদ্বস্তু বিক্রয়কে অস্বামিবিক্রয় কহা যায়।

সম্ভূয় সমুত্থান—৪

ইহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে।

দত্তা প্রাদানিক—৫

প্রচলিত কথায় যাহাকে দত্তাপহার কহা যায়।

ভৃত্য বেতনাদান—৬

যথাকালে ভৃত্যদিগকে বেতন না দেওয়াকে ভৃত্য বেতনাদান কহা যায়।

সম্বিদ্ব্যতিক্রম—৭

কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায় যদি অমুক দিন অথবা অমুক পণে এই কার্য্য সিদ্ধ করিয়া দিব বলিয়া প্রতিশ্রুত বা প্রতিজ্ঞারূঢ় হয় অথবা পণ করে কিম্বা লেখ্য দেয় এবং যথাকালে উহা সম্পন্ন না করে, তাহা হইলে তাহাকে সম্বিদ্ব্যতিক্রম বা চুক্তিভঙ্গ কহা যায়।

ক্রয়বিক্রয়ানুশয়—৮

কোন বস্তু ক্রয় করিয়া তৎকালে বিক্রয় করিয়া যদি কোন ব্যক্তি পরিতাপ করে এবং বস্তুটী মূল্যবান্ বা প্রিয় বলিয়া ক্রেতার নিকট হইতে পূর্ব্বমূল্যে প্রতিগ্রহ করিতে ইচ্ছা করে ও অকৃতার্থ হইলে অনুতাপ করে তবে এই অনুতাপকে ক্রয় বিক্রয়ানুশয় কহা যায়।

স্বামিপাল বিবাদ—৯

পশুপালক (রাখাল) ও পশুর অধিকারীর (গৃহস্থের) সঙ্গে যে বিবাদ তাহার নাম স্বামিপাল বিবাদ বলা যায়।

সীমা বিবাদ—১০

ইহা সকল লোকেই জানেন।

বাক্‌পারুষ্য ও দণ্ডপারুষ্য—১১

কলহ (গালাগালি) কিম্বা মুখ বিকৃতাদির নাম বাক্‌পারুষ্য। কেশাকেশি, চুলোচুলি, মুষ্টামুষ্টি (কিলোকিলি) দণ্ডাদণ্ডি, লাঠালাঠি প্রভৃতির নাম দণ্ডপারুষ্য।

স্তেয় (চৌর্য্য)—১২

চুরির নাম স্তেয়।

দানগ্রহণ ধর্ম্মাশ্চ দত্তানাদানিকমুচ্যতে ॥

কুল্লূকভট্ট কৃত মনু টীকা ॥

সাহস—১৩

বলপূর্ব্বক অন্যের ধন গ্রহণ অর্থাৎ ডাকাতি প্রভৃতি সাহসিক দস্যু কার্য্যকে সাহস কহা যায়।

স্ত্রীসংগ্রহ—১৪

পরস্ত্রীতে রতি কামনায় যে সম্ভাষণ ও আকার ইঙ্গিতাদি দ্বারা অভিলাষাদি জ্ঞাপন ও দূতী প্রেরণাদিকে স্ত্রীসংগ্রহ কহা যায়।

স্ত্রী পুং ধর্ম্ম—১৫

দম্পতীর মধ্যে পরস্পরের কর্ত্তব্যবোধে যে সকল নিয়ম প্রতিপাল্য হয় তাহাকে স্ত্রী পুং ধর্ম্ম কহা যায়।

বিভাগ—১৬

সহোদরাদি অথবা অন্য দায়াদের সহিত পৈতৃক বিত্ত অংশ করাকে বিভাগ বলা যায়।

দ্যূত—১৭

অক্ষক্রীড়াদিকে দ্যূত কহা যায়।

আহ্বয়—১৮

যেস্থলে ব্যক্তিবিশেষের শিক্ষিত পশু বা পক্ষীর সহিত অপর ব্যক্তির শিক্ষিত পশু বা পক্ষীর যুদ্ধ হয় এবং ঐ সকল পশুপালকেরা ঐ উপলক্ষে কোন প্রকাশ্য প্রদর্শনস্থলে পশুপক্ষ্যাদির যুদ্ধ নৈপুণ্যের পরীক্ষা প্রদান পূর্ব্বক উহাদিগের জয় পরাজয়কে আত্মকৃত জ্ঞান করে তথায় আহ্বয় কহা যায়।

হলসামগ্রী কথন

বঙ্গদর্শনের পাঠকমাত্রেরই হল দেখা আছে। যদি না থাকে সেটি লেখকের দোষ নহে। যাঁহারা ধান্যবৃক্ষের গাছ চেনেন না, তাঁহাদিগের নিমিত্ত বঙ্গদর্শনে হল (লাঙ্গলের ছবি) চিত্র দেওয়া যাইতে পারে না। যাঁহারা হল দেখিবার নিতান্ত অভিলাষী ও চিত্র না দেখিলে বুঝিতে পারিবেন না, তাঁহারা শ্রমস্বীকার পূর্ব্বক মাঠে অথবা সুবিধা হইলে কলিকাতার যাদুঘরে যাইয়া দেখিতে পারেন। যিনি নিতান্ত অলস তিনি যেন সেকেলে শিশুবোধের ক = করাৎ, খ = খরা, গ = গোরু, ঘ = ঘোড়া, ঙ = লাঙ্গল চিত্র দেখেন, তাহা হইলেই তাঁহার বুভুৎসা চরিতার্থ হইতে পারিবে।

আর্য্যজাতিরা যে বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করিয়াছেন এমন বিষয়ই অপ্রসিদ্ধ। আমরা যাহাকে এক্ষণে অতি সামান্য মনে করি, তাহার জন্য কোন চিন্তা করিয়া পূর্ব্বতন ঋষিগণ সেই সকল বিষয়ের সুশৃঙ্খলার জন্য আপনাদিগের মস্তিষ্কক্ষয়

করিয়াছেন। তাঁহাদিগের সেরূপ সহায়তা না পাইলে আমরা কিছুই করিতে পারিতাম না।

কি দুঃখ ও কি পরিতাপের বিষয় দেখ দেখি, পরাশর ঋষির সময়ে আমাদিগের কৃষিকার্য্যের উন্নতিজন্য যতদূর শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল অদ্য পর্য্যন্ত তদপেক্ষা কোন অংশে তাহার উৎকর্ষ সাধিত হয় নাই বরং অনেকাংশে অপকর্ষ দেখা যায়।

পূর্ব্বকালে ঋষিগণ কৃষকগণকে ও ক্ষেত্রস্বামীদিগকে সর্ব্ব বিষয়ে শিক্ষা দিতেন। এক্ষণে শিক্ষা দেওয়া দূরে থাকুক, পিতা যতদূর কৃষিকার্য্য জানে ও যত দূর পারগতা দেখায়, পুত্র তদপেক্ষা ন্যূনতাব্যতীত আধিক্য দেখাইতে পারে না। কোন্ মেঘে কেমন জল, কোন্ বায়ুতে কিরূপ মেঘ উৎপন্ন হয়, ঋষিগণ তাহা নির্ণয় করিতে সমর্থ ছিলেন। বাহন লক্ষণ বুঝিতেন, গোশালার দোষ বুঝিতে পারিতেন, বীজের গুণাগুণ নির্দ্ধারণে সমর্থ ছিলেন, বপন ও রোপণ প্রকরণ উত্তম জানিতেন, মৃত্তিকাখনন ও সার দেওয়ার সময়ের রীতি বিশেষ অবগত ছিলেন, কোন্ সময়ে জলসেক ও কোন্ সময়ে জলাগম করা আবশ্যক তৎসমস্তই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিতে পারিতেন, ক্ষেত্রে জলরক্ষণ ও তাহা হইতে জলমোচন প্রকরণ বিষয়ে বিশেষ নৈপুণ্য দেখাইতে পারিতেন। আমরা সভ্য, ভদ্রলোক বলিয়া লোকের নিকট পরিচয় দিয়া থাকি; আমরা যদি কৃষিবিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিবার জন্য কৃষকদিগকে জিজ্ঞাসা করি, তাহা হইলে অন্যে আমাদিগকে বিদ্রূপ করিতে পারে সেই ভয়ে ভদ্র আখ্যাধারী কেহই কৃষিবিষয়ে কোন সন্ধান লয়েন না। এমন কি ক্ষেত্রকর্ষণ করিতে হইলে কি সামগ্রীর আবশ্যক হয় তাহাও অনেকে জানেন না। যে ভদ্রসন্তান ঐসকল বস্তুর নাম জানেন বলিয়া পরিচয় দিতে চাহেন, হয়ত আমাদিগের পাঠকবর্গের কেহ কেহ তাহাকে পাড়াগেঁয়ে বলিয়া উপহাস করিবেন। বঙ্গদর্শনের এ প্রস্তাব উপহাসরসিক পাঠকের জন্য নহে। তাঁহাদিগের জন্য রসাল রসাল প্রবন্ধ আছে। তাঁহারা ইহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য বিষয় পাঠ করিতে পারেন।

সহৃদয় পাঠক, তুমি দেখ, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি চারিযুগ অতিক্রান্ত হইতে চলিল, তখনও কৃষিকার্য্যের যাদৃশ অবস্থা ছিল, অধুনাও তাহার বিন্দুবিসর্গও বৃদ্ধি হয় নাই।

পাঠক, তুমি রাখালের নিকট কৃষাণের মুখে গাড়োয়ানের ঋষভস্বরে পাঁচনীর নাম শুনিয়াছ ও এক হস্ত পরিমিত একখানি পশুশাসন দণ্ড দেখিয়াছ। সংস্কৃতে উহার নাম পাজনী। সুসভ্য ইংরাজ জাতি ইহাকে সংস্কৃত করিয়া রুল নাম

দিয়াছেন এবং পুলিসের কনিষ্টবলের করে সমর্পণ করিয়াছেন। উহা তাঁহাদিগের শাসনদণ্ড।

পাঁচ ছয় হস্ত পরিমিত যে একখানি সাপলেজা তালকাষ্ঠ দলের সঙ্গে যোজিত থাকে তাহার নাম ঈশ (বাঙ্গালাভাষায় লাঙ্গলের ঈশ ।)

লাঙ্গলে যোজিত বৃষভদ্বয়ের স্কন্ধে যে কাষ্ঠফলক সংস্থাপিত হয় তাহার নাম যুগ। সংস্কৃত কাব্যকারেরা যাহার সহিত প্রশস্ত বাহুর উপমা দিয়া থাকেন, ইহার নাম যোয়াল।

লাঙ্গলের মুড়া যাহাকে বলে সংস্কৃতে তাহারই নাম স্থানু।

যাহাকে মুট কহা যায় সেই বস্তুই নির্যোল বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহার উচ্চতা যুগের ফলের সঙ্গে সমান হইবে।

যুগের পার্শ্বে যে যষ্টিদ্বারা বৃষদ্বয় পরিবদ্ধ থাকে তাহা আড়া বা খিল কহা যায়—সংস্কৃতে তাহার নাম অড্ড। শোয়াল বা সোয়াজী।

যাহাকে বিদা বলা যায় তাহার নাম বিদাকাঠি। ইহারই নাম শল্য।

আমরা যাহাকে বাঁওই বা বৈ কহি তাহার খিলগুলিকে পাশিকা বলা যায়। (১০)

---

(১০) ঈশা যুগো হল স্থাণু নির্যোল স্তস্যপাশিকা ।
অড্ডচল্লশ্চ শলাশ্চ পাচ্চনীয় হলাষ্টকং ॥
পঞ্চহস্তো ভবেদিশঃ স্থাণুঃ পঞ্চ বিতস্তিকঃ ।
সার্দ্ধহস্তস্ত নির্যোলো যুগঃ কর্ণ সমানকঃ ॥
নির্যোল পাশিকা চৈব অড্ডচল্লস্তথৈবচ ।
দ্বাদশাঙ্গুল মানোহি শৌলোরত্নি প্রমাণকঃ ॥
সার্দ্ধদ্বাদশ মুষ্টির্ব্বা কার্য্যা বা নবমুষ্টিকা ॥
দৃঢ়া পাচ্চনিকা জ্ঞেয়া লৌহাগ্রা বংশসম্ভবা ॥
আবন্ধো মণ্ডলাকারঃ বৃত্তঃ পঞ্চদশাঙ্গুলঃ ।
যোত্রং হস্তচতুষ্কঞ্চ রজ্জুঃ পঞ্চ করাশ্রিকা ॥
পঞ্চাঙ্গুলাধিকো হস্তো হস্তৌ বা ফালকঃ স্মৃতঃ ।
অর্কপত্র সদৃশী পশিকার নবাঙ্গুলা ॥
একবিংশতি শৈল্যস্ত বিদ্ধকঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ।
নবহস্তাতু মদিকা প্রশস্তা কৃষি কর্ম্মসু ॥
ইয়ংহি হল সামগ্রী পরাশর মুনের্ম্মতা ।
সুদৃঢ়া কৃষকৈঃ কার্য্যা শুভদা সর্ব্বকর্ম্মণি ॥
অদৃঢ়া যুজ্যমানা সা সামগ্রী বাহনেসাচ ।
বিঘ্নং পদে পদে কুর্য্যাৎ সর্ব্বকালে নসংশয়ঃ ॥

এই অষ্টবিধ দ্রব্য লইয়া পুরাকালে কৃষিকার্য্য হইত, এখনও হইয়া থাকে। তৎকালে পরস্পর শিক্ষা করিত, এক্ষণে প্রায় সকলেই স্বয়ং সিদ্ধ। প্রমাণ প্রয়োজন আবশ্যক করে না, পূর্ব্বকালে পুতি পত্র ছিল, এক্ষণে সেই পুরাণ ভুলটের পুতি হইতে যাহা পাওয়া গেল তাই লিখিত হইল। ফালক পরিমাণ এক হাত পাঁচ অঙ্গুলি। উহার আকার আকন্দপত্রের সদৃশ করা উচিত। চারি হস্ত, পরিমিত যুগ করিবার নিয়ম। লাঙ্গলের মুড়া দেড় হাত।

নিঙ্গান (মুট) কণে পরিমাণ দ্বাদশ বা নবমুষ্টি। পশিকা বা বাঙ্ঁয়ের খিল নয় অঙ্গুলের অধিক করা আবশ্যক ছিল না।

শল্য বিদা এক প্রদেশ ঊন এক হাত (মুটুম হাত) করা হইত।

রাস রজ্জু বৃষভের নাসিকা হইতে হলচালকের হস্ত পর্য্যন্ত শিথিলভাবে থাকিবে। ইহাতে প্রত্যেক দিগে চারি হস্তের অধিক হইবে না। অদ্য এই পর্য্যন্ত।

শ্রীলালমোহন শর্ম্মা।

বাঙ্গালার ইতিহাস

সাহেবেরা যদি পাখী মারিতে যান, তাহারও ইতিহাস লিখিত হয়, কিন্তু বাঙ্গালার ইতিহাস নাই। গ্রীনলণ্ডের ইতিহাস লিখিত হইয়াছে; মাওরিজাতির ইতিহাসও আছে, কিন্তু যে দেশে গৌড়, তাম্রলিপ্তি, সপ্তগ্রামাদি নগর ছিল, যেখানে নৈষধচরিত ও গীতগোবিন্দ লিখিত হইয়াছে, যে দেশ উদয়নাচার্য্য, রঘুনাথ শিরোমণি ও চৈতন্যদেবের জন্মভূমি, সে দেশের ইতিহাস নাই। মার্শমান, ষ্টুয়ার্ট প্রভৃতি প্রণীত পুস্তকগুলিকে আমরা সাধ করিয়া ইতিহাস বলি; সে কেবল সাধ পূরাণ মাত্র।

ভারতবর্ষীয়দিগের যে ইতিহাস নাই তাহার বিশেষ কারণ আছে। কতকটা ভারতবর্ষীয় জড়প্রকৃতির বলে প্রপীড়িত হইয়া, কতকটা আদৌ দস্যুজাতীয়দিগের ভয়ে ভীত হইয়া, ভারতবর্ষীয়েরা ঘোরতর দেবভক্ত। বিপদে পড়িলেই দেবতার প্রতি ভয় বা ভক্তি জন্মে। যে কারণেই হউক জগতের যাবতীয় কর্ম্ম দৈবানুকম্পায় সাধিত হয়, ইহা তাঁহাদিগের বিশ্বাস। ইহলোকের যাবতীয় অমঙ্গল দেবতার অপ্রসন্নতায় ঘটে ইহাও তাঁহাদিগের বিশ্বাস। এজন্য শুভের নাম "দৈব," অশুভের নাম, "দুর্দ্দৈব।" এরূপ মানসিক গতির ফল এই যে, ভারতবর্ষীয়েরা অত্যন্ত বিনীত; সাংসারিক ঘটনাবলীর কর্ত্তা আপনাদিগকে মনে করেন না; দেবতারাই সর্ব্বত্র সাক্ষাৎ কর্ত্তা বিবেচনা করেন। এজন্য তাঁহারা দেবতাদিগেরই ইতিহাস-কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত; পুরাণেতিহাসে কেবল দেবকীর্ত্তিই বিবৃত করিয়াছেন; যেখানে মনুষ্যকীর্ত্তি বর্ণিত হইয়াছে, সেখানে সে মনুষ্যগণ, হয়, দেবতার আংশিক অবতার, নয়, দেবতানুগৃহীত; সেখানে দৈবের সংকীর্ত্তনই উদ্দেশ্য। মনুষ্য কেহ নহে; মনুষ্য কোন কার্য্যেরই কর্ত্তা নহে; অতএব মনুষ্যের প্রকৃত কীর্ত্তিবর্ণনে প্রয়োজন নাই। এ বিনীত মানসিক ভাব ও দেবভক্তি, অস্মজ্জাতির ইতিহাস না থাকার কারণ। ইউরোপীয়েরা অত্যন্ত গর্ব্বিত; তাঁহারা মনে করেন, আমরা যাহা

প্রথম শিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাস। শ্রীরাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, এম-এ, বি-এল, বিরচিত। মেসূর্স্ জে, জি, চাটুর্য্যা এণ্ড কোং কলিকাতা।

করিতেছি, ইহা আমাদিগেরই কীর্ত্তি; আমরা যদি হাই তুলি, তাহাও বিশ্বসংসারে অক্ষয়কীর্ত্তিস্বরূপ চিরকাল আখ্যাত হওয়া কর্ত্তব্য; অতএব তাহাও লিখিয়া রাখা যাউক। এইজন্য গর্ব্বিত জাতির ইতিহাসের বাহুল্য; এইজন্য আমাদের ইতিহাস নাই।

অহঙ্কার, অনেকস্থলে মনুষ্যের উপকারী; এখানেও তাই। জাতীয় গর্ব্বের কারণ লৌকিক ইতিহাসের সৃষ্টি বা উন্নতি; ইতিহাস সামাজিক বিজ্ঞানের এবং সামাজিক উচ্চাশয়ের একটি মূল। ইতিহাসবিহীন জাতির দুঃখ অসীম। এমন দুই একজন হতভাগ্য আছে যে পিতৃপিতামহের নাম জানে না; এবং এমন দুই এক হতভাগ্য জাতি আছে যে কীর্ত্তিমন্ত পূর্ব্বপুরুষগণের কীর্ত্তি অবগত নহে। সেই হতভাগ্য জাতিদিগের মধ্যে অগ্রগণ্য বাঙ্গালি। উড়িয়াদিগেরও ইতিহাস আছে।

একণে বাঙ্গালার ইতিহাসের উদ্ধার কি অসম্ভব? নিতান্ত অসম্ভব নহে। কিন্তু সে কার্য্যে ক্ষমবান্ বাঙ্গালি অতি অল্প। কি বাঙ্গালি, কি ইংরেজ, সকলের অপেক্ষা যিনি এই দুরূহ কার্য্যের যোগ্য, তিনি ইহাতে প্রবৃত্ত হইলেন না। বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র মনে করিলে স্বদেশের পুরাবৃত্তের উদ্ধার করিতে পারিতেন। কিন্তু একণে তিনি যে এ পরিশ্রম স্বীকার করিবেন, আমরা এত ভরসা করিতে পারি না। বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের নিকট আমরা অন্ততঃ এমন একখানি ইতিহাসের প্রত্যাশা করিতে পারি যে, তদ্দারায় আমাদের মনোদুঃখ অনেক নিবৃত্তি পাইবে। রাজকৃষ্ণ বাবুও একখানি বাঙ্গালার ইতিহাস লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাতে আমাদের দুঃখ মিটিল না। রাজকৃষ্ণ বাবু মনে করিলে বাঙ্গালার সম্পূর্ণ ইতিহাস লিখিতে পারিতেন; তাহা না লিখিয়া তিনি বালকশিক্ষার্থ একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক লিখিয়াছেন। যে দাতা মনে করিলে অর্দ্ধেক রাজ্য এক রাজকন্যা দান করিতে পারে, সে মুষ্টিভিক্ষা দিয়া ভিক্ষুককে বিদায় করিয়াছে।

মুষ্টিভিক্ষা হউক কিন্তু সুবর্ণের মুষ্টি। গ্রন্থখানি মোটে ৯০ পৃষ্ঠা, কিন্তু ঈদৃশ সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ বাঙ্গালার ইতিহাস বোধ হয় আর নাই। অল্পের মধ্যে ইহাতে যত বৃত্তান্ত পাওয়া যায় তত বাঙ্গালা ভাষায় দুর্লভ। সেই সকল কথার মধ্যে অনেকগুলি নূতন এবং অবশ্যজ্ঞাতব্য। ইহা কেবল রাজগণের নাম ও যুদ্ধের তালিকা মাত্র নহে; ইহা প্রকৃত সামাজিক ইতিহাস। বালকশিক্ষার্থ যে সকল পুস্তক বাঙ্গালাভাষায় নিত্য নিত্য প্রণীত হইতেছে, তন্মধ্যে ইহার ন্যায় উত্তম গ্রন্থ অল্প। ইংরেজিতেও যে সকল ক্ষুদ্র ইতিহাস বালকশিক্ষার্থ প্রণীত হয়, তন্মধ্যে এরূপ ইতিহাস দেখা যায় না। কেবল বালক নহে, অনেক বৃদ্ধ ইহাতে শিক্ষাপ্রাপ্ত

হইতে পারেন। যাঁহারা বালপাঠ্য পুস্তক বলিয়া ঘৃণা করিয়া ইহা পড়িবেন না, তাঁহাদিগের জন্য, এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানিকে উপলক্ষ করিয়া, আমরা বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে গুটিকত কথা বলিব। সকলই অধ্যয়নীয় তত্ত্ব ইহাতে পাওয়া যায় বলিয়া আমরা এ ক্ষুদ্র গ্রন্থের বিস্তারিত সমালোচনায় প্রবৃত্ত, নচেৎ বালপাঠ্য পুস্তক আমরা সমালোচনা করি না।

প্রথম। কাম্বেল সাহেব যখন বাঙ্গালির প্রতি সদয় হইয়াছিলেন, তখন বলিয়াছিলেন, বাঙ্গালিরা আসিয়া-খণ্ডের মধ্যে এথিনীয় জাতিসদৃশ। বাস্তবিক একদিন, বাঙ্গালিরা আর কিছুতে হউক্ না হউক, উপনিবেশিকতায় এথিনীয়দিগের তুল্য ছিল। সিংহল বাঙ্গালি কর্ত্তৃক পরাজিত এবং পুরুষানুক্রমে অধিকৃত ছিল। যবদ্বীপ ও বালিদ্বীপ বাঙ্গালির উপনিবেশ, ইহাও অনেকে অনুমিত করেন। তাম্রলিপ্তি, ভারতবর্ষীয়ের সমুদ্রযাত্রায় স্থান ছিল। ভারতবর্ষীয় আর কোন জাতি এরূপ উপনিবেশিকতা দেখান নাই।

দ্বিতীয়। বাঙ্গালি রাজগণ অনেক সময়ে উত্তর ভারতে বৃহৎ সাম্রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন। পালবংশীয় দেবপাল দেব ভারতবর্ষের সম্রাট্ বলিয়া কীর্ত্তিত। লক্ষ্মণ সেনের জয়স্তম্ভ বারানসী, প্রয়াগ ও শ্রীক্ষেত্রে সংস্থাপিত হইয়াছিল। অতএব তিনি অন্ততঃ ভারবর্ষের তৃতীয়াংশের অধীশ্বর ছিলেন। বাঙ্গালিরা গঙ্গাবংশ পরিচয়ে বহুকাল পর্য্যন্ত উড়িষ্যার অধীশ্বর ছিলেন। যে জাতি মিথিলা, মগধ, কাশী, প্রয়াগ, উৎকলাদি জয় করিয়াছিল, যাহার জয়পতাকা হিমালয়মূলে, যমুনা-তটে, উৎকলের সাগরোপকূলে, সিংহলে, যবদ্বীপে এবং বালিদ্বীপে উড়িত, সে জাতি কখন ক্ষুদ্র জাতি ছিল না।

তৃতীয়। সপ্তদশ পাঠান কর্ত্তৃক বঙ্গজয় হইয়াছিল, এ কলঙ্ক মিথ্যা। সপ্তদশ পাঠানকর্ত্তৃক কেবল নবদ্বীপের রাজপুরী বিজিত হইয়াছিল। তৎসঙ্গী সেনাকর্ত্তৃক কেবল মধ্যবঙ্গ বিজিত হইয়াছিল। ইহার পরেও বহুদিন পর্য্যন্ত সেনবংশীয়েরা পূর্ব্ব ও দক্ষিণ বাঙ্গালার অধিপতি থাকিয়া স্বাধীনভাবে সপ্তগ্রামে ও সুবর্ণগ্রামে রাজত্ব করিয়াছিলেন। "পাঠানেরা ৩৭২ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন, তথাপি কোন কালে সমুদায় বাঙ্গালার অধিপতি হয়েন নাই। পশ্চিমে বিষ্ণুপুর ও পঞ্চকোটে তাঁহাদিগের ক্ষমতা প্রবিষ্ট হয় নাই; দক্ষিণে সুন্দরবন-সন্নিহিত প্রদেশে স্বাধীন হিন্দু রাজা ছিল; পূর্ব্বে চট্টগ্রাম, নোয়াখালী এবং ত্রিপুরা, আরাকানরাজ ও ত্রিপুরাধিপতির হস্তে ছিল; এবং উত্তরে কুচবেহার স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিতেছিল। সুতরাং পাঠানেরা যে সময়ে উড়িষ্যা জয় করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, যে সময়ে তাঁহারা ১,৪০,০০০ পদাতিক, ৪০,০০০ অশ্বারোহী এবং ২ ০ কামান দেখাইতে

পারিতেন, সে সময়েও বাঙ্গালির অনেকাংশ তাঁহাদিগের হস্তগত হয় নাই।”[*] বাঙ্গালার অধঃপতন একদিনে ঘটে নাই।

চতুর্থ। পরাধীন রাজ্যের যে দুর্দ্দশা ঘটে, স্বাধীন পাঠানদিগের রাজ্যে বাঙ্গালার সে দুর্দ্দশা ঘটে নাই। রাজা ভিন্নজাতীয় হইলেই রাজ্যকে পরাধীন বলিতে পারা যায় না। সে সময়ের জমীদারদিগের যেরূপ বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে তাঁহাদিগকেই রাজা বলিয়া বোধ হয়; তাঁহারা করদ ছিলেন মাত্র। পরাধীনতার একটি প্রধান ফল ইতিহাসে এই শুনা যায় যে, পরাধীন জাতির মানসিক স্ফূর্ত্তি নিবিয়া যায়। পাঠানশাসনকালে বাঙ্গালির মানসিক দীপ্তি অধিকতর উজ্জ্বল হইয়াছিল। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ কবিদ্বয়, এই সময়েই আবির্ভূত; এই সময়েই অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক, ন্যায়শাস্ত্রের নূতন সৃষ্টিকর্ত্তা, রঘুনাথ শিরোমণি; এই সময়ে স্মার্ত্ততিলক রঘুনন্দন; এই সময়েই চৈতন্যদেব; এই সময়েই রূপসনাতনের অপূর্ব্ব গ্রন্থাবলী; এই সময়েই চৈতন্যদেবের পরগামী অপূর্ব্ব বৈষ্ণব সাহিত্য। পঞ্চদশ ও ষোড়শ খ্রীষ্ট শতাব্দীর মধ্যেই ইঁহাদিগের সকলেরই আবির্ভাব। এই দুই শতাব্দীতে বাঙ্গালির মানসিক জ্যোতিতে বাঙ্গালার যেরূপ মুখোজ্জ্বল হইয়াছিল, সেরূপ তৎপূর্ব্বে বা তৎপরে আর কখন হয় নাই।

সেই সময়ের বাহ্য সৌষ্ঠব সম্বন্ধে রাজকৃষ্ণ বাবু কি বলিতেছেন, তাহাও শুনুন।

“লিখিত আছে যে হোসেন শাহার রাজ্যারম্ভ সময়ে এতদ্দেশীয় ধনিগণ স্বর্ণ পাত্র ব্যবহার করিতেন, এবং যিনি নিমন্ত্রিত সভায় যত স্বর্ণপাত্র দেখাইতে পারিতেন তিনি তত মর্য্যাদা পাইতেন। গৌড় ও পাণ্ডুয়া প্রভৃতি স্থানে যে সকল সম্পূর্ণ বা ভগ্ন অট্টালিকা লক্ষিত হয়, তদ্দ্বারাও তাৎকালিক বাঙ্গালার ঐশ্বর্য্য শিল্প-নৈপুণ্যের বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়। বাস্তবিক তখন এদেশে স্থাপত্য বিদ্যার আশ্চর্য্য-রূপ উন্নতি হইয়াছিল, এবং গৌড়ে যেখানে সেখানে মৃত্তিকা খনন করিলে যেরূপ ইষ্টক দৃষ্ট হয়, তাহাতে অনুমান হয় যে, নগরবাসী বহুসংখ্যক ব্যক্তি ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহে বাস করিত।[†] দেশে অনেক ভূম্যধিকারী ছিলেন এবং তাঁহাদিগের বিস্তর ক্ষমতা ছিল। পাঠান রাজ্য ধ্বংসের কিয়ৎকাল পরে সঙ্কলিত আইন আকবরিতে

---

[*] বাঙ্গালার ইতিহাস ২৯ পৃষ্ঠা।

[†] গৌড়ের ইষ্টক লইয়া, মালদহ, ইংরেজবাজার, ভোলাহাট, রাইপুর, শিলাবাড়ী, কাশিমপুর প্রভৃতি অনেকগুলি নগর নির্ম্মিত হইয়াছে। এই সকল নগর অট্টালিকাপূর্ণ, কিন্তু তথায় অন্য কোন ইষ্টক ব্যবহৃত হয় নাই। গৌড়ের ইষ্টক মুরশিদাবাদের ও রাজমহলের নির্ম্মাণেও লাগিয়াছে। এখনও যাহা আছে, তাহাও অপরিমিত। গৌড়ের ভগ্নাবশেষের বিস্তার দেখিয়া বোধ হয় যে, কলিকাতা অপেক্ষা গৌড় অনেক বড় ছিল।

লিখিত আছে যে, বাঙ্গালার জমীদারেরা ২৩,৩৩০ অশ্বারোহী, ৮,০১,১৫৮ পদাতিক, ১৮০ গজ, ৪,২৬০ কামান এবং ৪৪০০ নৌকা দিয়া থাকেন। এরূপ যুদ্ধের উপকরণ যাহাদিগের ছিল, তাহাদিগের পরাক্রম নিতান্ত কম ছিল না।”

পঞ্চম। অতএব দেখা যাইতেছে যে, যে আকবর বাদশাহের আমরা শত মুখে প্রশংসা করিয়া থাকি, তিনিই বাঙ্গালার কাল। তিনিই প্রথম প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালাকে পরাধীন করেন। সেইদিন হইতে বাঙ্গালার শ্রীহানির আরম্ভ। মোগল-পাঠানের মধ্যে, আমরা মোগলের অধিক সম্পদ্ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া মোগলের জয় গাইয়া থাকি, কিন্তু মোগলই আমাদের শত্রু, পাঠান আমাদের মিত্র। মোগলের অধিকারের পর হইতে, ইংরেজের শাসন পর্য্যন্ত একখানি ভাল গ্রন্থ বঙ্গদেশে জন্মে নাই। যেদিন হইতে দিল্লীর মোগলের সাম্রাজ্যে ভুক্ত হইয়া বাঙ্গালা দুরবস্থা প্রাপ্ত হইল, সেইদিন হইতে বাঙ্গালার ধন আর বাঙ্গালায় রহিল না, দিল্লীর বা আগ্রার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ প্রেরিত হইতে লাগিল। যখন আমরা তাজমহলের আশ্চর্য্য রমণীয়তা দেখিয়া আহ্লাদসাগরে ভাসি, তখন কি কোন বাঙ্গালির মনে হয় যে, যে সকল রাজ্যের রক্তশোষণ করিয়া এই রত্নমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে, বাঙ্গালা তাহার অগ্রগণ্য? তক্ত তাউসের কথা পড়িয়া যখন মোগলের প্রশংসা করি, তখন কি মনে হয়, বাঙ্গালার কত ধন তাহাতে লাগিয়াছে? যখন জুমা মসজিদ্, সেকন্দরা, ফতেপুরসিকরি বা বৈজয়ন্ততুল্য শাহাজাহানাবাদের ভগ্নাবশেষ দেখিয়া মোগলের জন্য দুঃখ হয়, তখন কি মনে হয় যে বাঙ্গালার কত ধন সে সবে ক্ষয় হইয়াছে? যখন শুনি যে নাদের শাহা বা মহারাষ্ট্রীয় দিল্লী লুঠ করিল, তখন কি মনে হয়, বাঙ্গালার ধনও তাহারা লুঠ করিয়াছে? বাঙ্গালার ঐশ্বর্য্য দিল্লীর পথে গিয়াছে; সে পথে বাঙ্গালার ধন ইরান তুরান পর্য্যন্ত গিয়াছে। বাঙ্গালার সৌভাগ্য মোগলকর্তৃক বিলুপ্ত হইয়াছে। বাঙ্গালায় হিন্দুর অনেক কীর্ত্তির চিহ্ন আছে, পাঠানের অনেক কীর্ত্তির চিহ্ন পাওয়া যায়, শতবৎসর মাত্রে ইংরেজ অনেক কীর্ত্তি সংস্থাপন করিয়াছেন, কিন্তু বাঙ্গালায় মোগলের কোন কীর্ত্তি কেহ দেখিয়াছে? কীর্ত্তির মধ্যে “আসল তুমার জমা।” কীর্ত্তি কি অকীর্ত্তি বলিতে পারি না, কিন্তু তাহাও একজন হিন্দুকৃত।

কলেজ রি-ইউনিয়ন

(এই কবিতাটি কালেজ রি-ইউনিয়নে পঠিত হইয়াছিল)

১ খেদ ২ নিন্দা ৩ আশা

১

প্রভাত ফুটিল,
পূরব গগনে উজলি উঠিল
মনোহর-শোভা কনকবরণ ।
তপন উঠিলে,
কেন দুখ দিলে ?
জান ত, তরুণ বয়সে গিয়াছে ঘুচিয়ে
বঙ্গের শোভন ;
যাই প্রকাশিল,
অমনি নিবিল
প্রফুল্ল প্রভাতে চপলা যেমন
সোনার লিখন ।
দেখাবার হীরা লয়েছে কাড়িয়ে,
তপন—কেন তুমি এলে আলোক জ্বালিয়ে ?
দেখাবার "দ্বারি"* লয়েছে কাড়িয়ে,
আজ—কেন তুমি এলে আলোক জ্বালিয়ে ?
আলোক জ্বালিলে দেখাবে কাহারে
এত আড়ম্বর দেখাতে আঁধারে !
গৌরব তোমার
জগতে কে আর,
সমান হীরার করে পরচার,
হাসিয়ে হাসিয়ে জ্যোতির কথায়,
যতনে আদরে জ্যোতির লেখায় ?
তপন – তোমার আদেশে তোমার শাসনে,
ধরিয়ে মাথায় কাজের বোঝায়
পালে পালে প্রাণী ইতি উতি ধায় ;
তুমি প্রতিনিধি জগতগুরুর,
তুমি হে তপন কাজের ঠাকুর ;
গৌরবে বসিয়ে প্রতাপে শাসিয়ে,
অলস জগত নিয়ত চালাও,
প্রাণিকুল তুমি বসিয়ে খাটাও ;
তোমার শাসনে
চকিত নয়নে
অলস শয়ন ত্যজে জীবগণ ;
তোমার কৃপায়
জগত হাসায়
আঁধার অসুখ কোথায় পলায় ;
হইয়ে দয়াল, তবু জাগাইলে,
আগুন জ্বালিলে, হৃদয়ে দহিলে,
নিঠুর হইয়ে ;
নিশার শিশিরে ছিল ত নিবিয়ে !

---

* দ্বারিকানাথ মিত্র ।

মধুময় "মধু"* গিয়াছে উপিয়ে,
বঙ্গীয় মধুপ কি মরে খুঁজিয়ে ?
কেন তুমি এলে আলোক লইলে ?
আলোক জ্বালিলে দেখাবে কাহারে
এত আড়ম্বর দেখাতে আঁধারে !

২

জ্ঞানের জোনাকি এসে বিএ গণ
বঙ্গের আঁধার করে প্রকাশন ॥
বঙ্গে অন্ধকার তাই এত মান
ঝকমক করে রাজার উদ্যান ॥
তুমি হে—মোহনে ভুলিয়ে দুর্জ্জনে 'গরবে'
ভাব সাধুসখা, চিরদিন রবে ;
সেযে—সুখের কোকিল, সুখের বসন্তে,
মনোমত গায় কুসুম যোগায়,
হিমে শীতে দুখে ছাড়িয়ে পলায় ॥
মোহে—বল আপনার কি আছে তোমার
মিছে ধনী ভাণ,
জলে কলবান,
ঘড়ি বুট ছড়ি, মোহন ফিটান,
কলের বাদন,
ধনীর সকলি অপরের ধন ;
পরের গৌরব করেছে ধারণ,
তপন কিরণে জলদে রঞ্জন,
ডুবিলে তপন লুকাবে শোভন ॥
তুমি হে—রাজপথধূলি,
যেদিকে পবন সেদিকে গমন,
পবনের সনে পরশ গগন,
ছাড়িলে, তোমার ভূতলে পতন ॥
বিলাতী পরবে,
ভজনে পরাও আলোকভূষণ
নাচিয়ে বেড়াও যোগাইতে মন ;
পালিত বানর করে নরতন
আপন হরষে নাচে কি কখন ?
কুহরে কুহরী নানরূপ তান
কভু বা ক্রন্দন কভু হর্ষগান,
জানায়ে যেমন
বাঁশীর হরষ বাঁশীর ক্রন্দন ;
তোষামোদ করি
পরের সুখের হইয়ে বাঁশরী
হেসে কেঁদে তুমি কাটাও জীবন ॥
সত্য বটে হায় !
দাসত্ব কলঙ্কে সব শোভা পায় ;
তথাপি কভু কি
অশীতল জলে অভিরুচি যায়
শীতের তৃষায় ?
জরের তৃষায় বল কে কোথায় উষ্ণ জল চায় ?

কত—উলঙ্গ অসভ্য উঠিল মাথায়
জ্ঞানে মানে বলে ধনে একতায় ;
আরব তনয় চরণে লুটায়,
গরব হিংসায় ভারত ডুবায় ;
সুরভিবিহীন নির্ম্মধু 'বোচায়'
যেন স্বর্ণময় সুমধুর ফল !
যোজনসুরভি কাঁটালি চাঁপায়
ফল পরিণামে কুরস গরল !
পড়ে—উথলি সীমায় দুগধ যেমতি
অভিমান পাপে ভসমে চুলায়,
উঠিয়ে চূড়ায় গৌরবী তেমতি
অভিমানমদে পড়েছে ধূলায় ॥
গরব তেজিয়ে
শৈশব [illegible]
একত্রে মিলন,
একি অঘটন !
বুঝি—নব অনুরাগে মিলেছ এবার
দিবসের শেষে থাকিবে না আর
লঘু কাঠে আগুন কতক্ষণ রহে

---

* মধুসূদন দত্ত।

হুংকারে জাগিয়ে লোহিত হইয়ে ?
বঙ্কিম বরণ
প্রবাল স্তন
যেমনি দেখায়, ভসম পড়িয়ে
অমনি লুকায় ॥

৩

কোথায় সে দিন ! ভগন ভারত
প্রেমের মিলনে হবে একাকার,
যেন জলকণা পুঞ্জে পুঞ্জ মিলি
সাজিবে ক্রমে জলধি অপার ।
দীন হীন কণা ! শত শত বার,
ক্ষীণ লুতাজালে থাকেত বন্ধনে !
হেন দীনযোগে ভীষণ সাগর ;
তাহার প্রতাপ বিদিত ভুবনে
যবে প্রভঞ্জন ক্ষেপান গরবে,
বঙ্গ সাগর সমরে পাগল ;
সেই ত সলিল বিনীত দুর্ব্বল,
পরশে রমণী কমল কোমল !
ঐ দেখ এখন ভৈরব নটন !
বিশাল ধরিত্রী কাঁপে থর থর,
মহীবক্ষ হতে আনিছে ছিনিয়ে
প্রাসাদ কানন শিখরী নগর ;
আকাশের পাখী আনিছে কাড়িয়ে,
কাহার শকতি সম্মুখে দাড়ায়,
পবনের মেঘ আনিতে ছিঁড়িয়ে,
তুঙ্গ আরোহণে জলদে শাসায় ॥
সমর উল্লাসে নাচে ঘোর নাটে
উত্তাল তরঙ্গে যবে রত্নাকর,
বিরোধী বিদেশী সাগর সলিল
নাচে কি কখন ঘটের ভিতর ?
হবে কি সেদিন ?—মিলিবে ভারত তুলিবে নিনাদ
'জয় জগদীশ প্রেমের আধার'
সরব শরীরে কাঁপিবে পবন,
ছুটিবে নিনাদ বায়ু সিন্ধু পার ॥

এত কহিলাম কেহ ত শুনেনা
কনক কুসুমে ভ্রমরা ভুলে না,
রজত কুসুমে মধুপ বসে না,
মোমের কমলে দ্বিরেফ উড়ে না ॥
অথবা—কুরসিক নদকের রস বধূ
বরটী—চাহে নাক নিরমল ফুলমধু ॥

—শ্রীকৃষ্ণ ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

স্থূল কথা ছাড়িয়া, আত্মপরিচয় কিছু দিতে হইল। আমার নাম শ্রীশচীন্দ্রনাথ মিত্র, আমার পিতার নাম শ্রীযুক্ত রামসদয় মিত্র; পিতামহের নাম ৺বাঞ্ছারাম মিত্র; প্রপিতামহের নাম ৺ কেবলরাম মিত্র। আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষের বাস কলিকাতায় নহে—আমার পিতা প্রথমে কলিকাতায় বাস করেন। আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষের বাস ভবানীনগর নামক গ্রামে। আমার প্রপিতামহ দরিদ্র নিঃস্ব ব্যক্তি ছিলেন। পিতামহ বুদ্ধিবলে ধনসঞ্চয় করিয়া আমাদিগের ভোগ্য ভূসম্পত্তি সকল ক্রয় করিয়াছিলেন।

পিতামহের এক পরম বন্ধু ছিলেন, নাম মনোহর দাস। পিতামহ মনোহর দাসের সাহায্যেই এই বিভবের অধিপতি হইয়াছিলেন। মনোহর প্রাণপাত করিয়া পিতামহের কার্য্য করিতেন, নিজে কখন ধনসঞ্চয় করিতেন না। পিতামহ তাঁহার এই সকল গুণে অত্যন্ত বাধ্য ছিলেন। মনোহরকে সহোদরের ন্যায় ভাল বাসিতেন এবং মনোহর বয়োজ্যেষ্ঠ বলিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় তাঁহাকে মান্য করিতেন। আমার পিতার সঙ্গে পিতামহের তাদৃশ সম্প্রীতি ছিল না। বোধ হয় উভয় পক্ষেরই কিছু কিছু দোষ ছিল; কিন্তু আমি একজনের পুত্র অপরের পৌত্র; কি প্রকারে পিতৃ পিতামহের দোষ নির্ব্বাচনে প্রবৃত্ত হইব? অতএব সে সকল কথা অব্যক্ত রহিল।

একদা আমার পিতার সঙ্গে মনোহর দাসের ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হইল। মনোহর দাস পিতামহকে বলিলেন যে, পিতা তাঁহাকে কোন বিষয়ে সহনাতীত-অপমান করিয়াছেন। মনোহর আমার পিতামহের কাছে যাহা বলিলেন, তাহাও আমি লিখিতে পারিব না। অপমানের কথা পিতামহকে বলিয়া, মনোহর পিতামহের কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া সপরিবারে ভবানীনগর হইতে উঠিয়া গেলেন। পিতামহ, মনোহরকে অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন; মনোহর কিছুই শুনিলেন না। উঠিয়া কোন্ দেশে গিয়া বাস করিলেন, তাহাও কাহাকে জানাইলেন না।

পিতামহ আমার পিতার প্রতি যত স্নেহ করুন বা না করুন, মনোহরকে ততোধিক স্নেহ করিতেন। সুতরাং আমার পিতার উপর তাঁহার ক্রোধ অপরিসীম হইল। পিতামহ অত্যন্ত কটূক্তি করিয়া গালি দিলেন, পিতাও সকল কথা নিঃশব্দে সহ্য করিলেন না।

কষ্টকর কথা সবিস্তারে লিখিতে পারি না। পিতা-পুত্রের বিবাদের ফল এই দাঁড়াইল যে, পিতামহ পুত্রকে গৃহবহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। পিতাও গৃহত্যাগ করিয়া শপথ করিলেন, আর কখনও পিতৃভবনে মুখ দেখাইবেন না। পিতামহ রাগ করিয়া এক উইল করিলেন। উইলে লিখিত হইল যে, বাঞ্ছারাম মিত্রের সম্পত্তিতে তস্য পুত্র রামসদয় মিত্র কখন অধিকারী হইবেন না। বাঞ্ছারাম মিত্রের অবর্ত্তমানে মনোহর দাস, মনোহর দাসের অভাবে মনোহরের উত্তরাধিকারিগণ অধিকারী হইবেন; তদভাবে রামসদয়ের পুত্র পৌত্রাদি যথাক্রমে, কিন্তু রামসদয় নহে।

পিতা গৃহত্যাগ করিয়া মাতাকে লইয়া কলিকাতায় আসিলেন। মাতার কিছু পিতৃদত্ত অর্থ ছিল। তদবলম্বনে, এবং একজন সজ্জন বণিক্ সাহেবের আনুকূল্যে পিতা বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইলেন। লক্ষ্মী সুপ্রসন্না হইলেন; সংসার প্রতিপালনের জন্য পিতাকে কোন কষ্ট পাইতে হইল না।

যদি কষ্ট পাইতে হইত, তাহা হইলে বোধ হয়, পিতামহ সদয় হইতেন। পুত্রের সুখের অবস্থা শুনিয়া, বৃদ্ধের যে স্নেহাবশেষ ছিল, তাহাও নিবিয়া গেল। পুত্র অভিমান প্রযুক্ত, পিতা না ডাকিলে আর যাইব না, ইহা স্থির করিয়া, আর পিতার কোন সম্বাদ লইলেন না। অভক্তি এবং তাচ্ছীল্য বশতঃ পুত্র এরূপ করিতেছে বিবেচনা করিয়া পিতামহও তাঁহাকে আর ডাকিলেন না।

সুতরাং কাহারও রাগ পড়িল না; উইলও অপরিবর্ত্তিত রহিল। এমত কালে হঠাৎ পিতামহের স্বর্গপ্রাপ্তি হইল।

পিতা মহা শোকাকুল হইলেন; তাঁহার পিতার মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভ করিয়া যথাকর্ত্তব্য করেন নাই, এই দুঃখে অনেকদিন ধরিয়া রোদন করিলেন। তিনি আর ভবানীনগর গেলেন না, কলিকাতাতেই পিতৃকৃত্য সম্পন্ন করিলেন। কেননা, এক্ষণে ঐ বাটী মনোহর দাসের হইল।

এদিকে মনোহর দাসের কোন সম্বাদ নাই। পশ্চাৎ জানিতে পারা গেল যে, পিতামহের জীবিতাবস্থাতেও মনোহরের কেহ কোন সম্বাদ পায় নাই। মনোহর দাস ভবানীনগর হইতে যে গিয়াছিল, সেই গিয়াছিল; কোথায় গেল, পিতামহ তাহার অনেক সন্ধান করিলেন। কিছুতেই কোন সন্ধান পাইলেন না। তখন তিনি উইলের এক ক্রোড়পত্র সৃজন করিলেন। তাহাতে বিষ্ণুরাম সরকার নামক একজন

কলিকাতানিবাসী আত্মীয় কুটুম্বকে উইলের একজিকিউটর নিযুক্ত করিলেন। তাহাতে কথা রহিল যে তিনি সযত্নে মনোহর দাসের অনুসন্ধান করিবেন। পশ্চাৎ ফলানুসারে সম্পত্তি যাহার প্রাপ্য তাঁহাকে দিবেন।

বিষ্ণুরাম বাবু অতি বিচক্ষণ, নিরপেক্ষ এবং কর্ম্মঠ ব্যক্তি। তিনি পিতামহের মৃত্যুর পরেই মনোহর দাসের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন; অনেক পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিয়া, যাহা পিতামহ কর্ত্তৃক অনুসন্ধান হয় নাই, তাহার নিগূঢ় কথা পরিজ্ঞাত হইলেন। স্থূল বৃত্তান্ত অনুসন্ধানে এই জানা গেল যে, মনোহর ভবানীনগর হইতে পলাইয়া কিছু কাল সপরিবারে ঢাকা অঞ্চলে গিয়া বাস করেন। পরে সেখানে জীবিকানির্ব্বাহের জন্য কিছু কষ্ট হওয়াতে, কলিকাতায় নৌকাযোগে আসিতেছিলেন। পথিমধ্যে বাত্যায় পতিত হইয়া সপরিবারে জলমগ্ন হইয়াছিলেন। তাহার আর উত্তরাধিকারী নাই।

বিষ্ণুরাম বাবু এ সকল কথার অকাট্য প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া আমাদিগকে দেখাইলেন। তখন পিতামহের ভূসম্পত্তি আমাদিগের দুই ভ্রাতার হইল; এবং বিষ্ণুরাম বাবুও তাহা আমাদের হস্তে সমর্পণ করিলেন।

আমাদিগের এখন আর কিছু নাই; পিতা যাহা বাণিজ্যে-উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহা বাণিজ্যেই ক্ষয় হইয়াছে। এই ভূসম্পত্তি আমাদিগের জীবনাবলম্বন।

এ সকল পরিচয় এখানে দিলাম কেন? আমরা ঘোরতর বিপদাপন্ন হইতেছি বলিয়া। এক্ষণে বিষ্ণুরাম বাবু সম্বাদ দিয়াছেন যে মনোহর দাসের উত্তরাধিকারী উপস্থিত হইয়াছে—বিষয় ছাড়িয়া দিতে হইবে।

কে উত্তরাধিকারী তাহা বিষ্ণুরাম বাবু প্রথমে কিছু বলিলেন না। যে ব্যক্তি দাবিদার, সে যে মনোহর দাসের যথার্থ উত্তরাধিকারী তদ্বিষয়ে নিশ্চয়তা আছে কি না, ইহা জানিবার জন্য বিষ্ণুরাম বাবুর কাছে গেলাম। আমি বলিলাম, "মহাশয় পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন যে, মনোহরদাস সপরিবারে জলে ডুবিয়া মরিয়াছে। তাহার প্রমাণও আছে। তবে তাহার আবার ওয়ারিস আসিল কোথা হইতে?"

বিষ্ণুরাম বাবু বলিলেন, "হরেকৃষ্ণ দাস নামে তাহার এক ভাই ছিল, জানেন বোধ হয়?"

আমি। তা ত জানি। কিন্তু সেও ত মরিয়াছে।

বিষ্ণু। বটে; কিন্তু মনোহরের পর মরিয়াছে। সুতরাং সে বিষয়ে অধিকারী হইয়া মরিয়াছে।

আমি। তা হৌক, কিন্তু হরেকৃষ্ণেরও ত এক্ষণে কেহ নাই?

বিষ্ণু। পূর্ব্বে তাহাই মনে করিয়া আপনাদিগকে বিষয় ছাড়িয়া দিয়াছিলাম। কিন্তু এক্ষণে জানিতেছি যে তাহার এক কন্যা আছে।

আমি। তবে এতদিন সে কন্যার কোন প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয় নাই কেন?

বিষ্ণু। হরেকৃষ্ণের স্ত্রী তাহার পূর্ব্বে মরে; স্ত্রীর মৃত্যুর পরে শিশুকন্যাকে পালন করিতে অক্ষম হইয়া হরেকৃষ্ণ কন্যাটিকে তাহার শ্যালীকে দান করে। তাহার শ্যালী ঐ কন্যাটিকে আত্মকন্যাবৎ প্রতিপালন করে, এবং আপনার বলিয়া পরিচয় দেয়। হরেকৃষ্ণের মৃত্যুর পর তাহার সম্পত্তি লাওয়ারেশ বলিয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেব কর্ত্তৃক গৃহীত হওয়ার প্রমাণ পাইয়া, আমি হরেকৃষ্ণকে লাওয়ারেশ মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু এক্ষণে হরেকৃষ্ণের একজন প্রতিবাসী আমার নিকট উপস্থিত হইয়া, তাহার কন্যার কথা প্রকাশ করিয়াছে। আমি তাহার প্রদত্ত সন্ধানের অনুসরণ করিয়া জানিয়াছি যে, তাহার কন্যা আছে বটে।

আমি বলিলাম, "যে হয় একটা মেয়ে ধরিয়া হরেকৃষ্ণ দাসের কন্যা বলিয়া ধূর্ত্ত লোকে উপস্থিত করিতে পারে। কিন্তু সে যে যথার্থ হরেকৃষ্ণ দাসের কন্যা তাহার কিছু প্রমাণ আছে কি?"

"আছে।" বলিয়া বিষ্ণুরাম বাবু আমাকে একটা কাগজ দেখিতে দিলেন, বলিলেন, "এবিষয়ে যে যে প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা উহাতে ইয়াদ দাস্ত করিয়া রাখিয়াছি।"

আমি ঐ কাগজ লইয়া পড়িতে লাগিলাম। তাহাতে পাইলাম যে হরেকৃষ্ণ দাসের শ্যালীপতি রাজচন্দ্র দাস; এবং হরেকৃষ্ণের কন্যার নাম রজনী।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

প্রমাণ যাহা দেখিলাম তাহা ভয়ানক বটে। আমরা এতদিন অন্ধ রজনীর ধনে ধনী হইয়া তাহাকে দরিদ্র বলিয়া ঘৃণা করিতেছিলাম।

আমি বিষ্ণুরামকে রজনীর সন্ধান জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি বলিলেন যে, বলিতে তাঁহার প্রতি নিষেধ আছে। প্রথমে মনে করিলাম যে বিষ্ণুরাম বাবু আমাদিগের বিপক্ষতাচরণ করিতেছেন। কিন্তু কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিয়া দেখিলাম যে, তিনি আপন কর্ত্তব্যই সাধন করিতেছেন। আমি তাঁহাকে বলিয়া পাঠাইলাম যে, যে অধিকারিণী সে নিরুদ্দেশ; সে জীবিতা আছে কিনা, নিশ্চিত না বুঝিলে কাহাকেও বিষয় ছাড়িয়া দিব না।

ইহার উত্তর বিষ্ণুরাম বাবুর নিকট পাইলাম না। উত্তর উকীল গ্রাওলি এণ্ড ব্রডসক সাহেবদিগের নিকট পাইলাম। তাঁহারা লিখিলেন যে, রজনী আদালতে হাজির হইতে প্রস্তুত ; আমাকে কেন দেখা দিবে ?

আমি বুঝিলাম যে, রজনীর প্রদত্ত এ উত্তর নহে। আমি তখন রজনীর পিতা রাজচন্দ্র দাসকে ডাকিতে পাঠাইলাম। পিতাকে রজনী কি বলিয়া দেখা না দিবে ?

যে লোক রাজচন্দ্রকে ডাকিতে গিয়াছিল, সে ফিরিয়া আসিল। বলিল, রাজচন্দ্র তাহার পূর্ব্বগৃহে নাই। বাড়ী বেচিয়া সপরিবারে কোথায় উঠিয়া গিয়াছে।

মহা গোলযোগ বোধ হইতে লাগিল। আমার সকল সন্দেহ সেই মধুরভাষী বিদ্যাবিশারদ অমরনাথ ঘোষের উপর গিয়া বর্ত্তিল। রজনীকে বিবাহ করিবার জন্য তাহার ব্যগ্রতার এই কি কারণ ? সেই কি রাজচন্দ্র দাসকে অর্থের দ্বারা বশীভূত করিয়া উঠাইয়া লইয়া গিয়াছে ? এতদিনে তাহাকে সম্মত করিয়া রজনীকে বিবাহ করে নাই ত ?

রজনীকে অমরনাথ বিবাহ করিয়াছে কি না, এই সন্দেহ ভঞ্জনার্থ বিবিধ প্রকার চেষ্টা করিতে লাগিলাম, কিন্তু কোন সন্ধান পাইলাম না। তখন নিরুপায় হইয়া, রজনীর উকীলদিগের সঙ্গে সাক্ষাৎ করাই পরামর্শ স্থির করিলাম।

একজন বন্ধু পরামর্শ দিলেন যে, তুমি এসকল বিষয়ে উকীলের সাহায্য না লইয়া কোন প্রসঙ্গ করিও না। যাইতে হয় ত একজন উকীল সঙ্গে করিয়া লইয়া যাও। আমার একজন আত্মীয়, রাজকৃষ্ণ গুপ্ত এটর্ণি ছিলেন। রাজকৃষ্ণ সোজা লোক নহে, কিন্তু আমার নিকট বড় বিশ্বাসী। আমি তাঁহাকে নিযুক্ত করিয়া তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া গেলাম।

গ্রাওলি ব্রডসকদিগের কর্ম্মকর্ত্তা ব্রডসক সাহেব। তাঁহার সঙ্গে আমাদিগের সাক্ষাৎ হইল। রাজকৃষ্ণ তাঁহাকে আমার পরিচয় দিয়া বলিলেন যে, তিনি আমার পক্ষে নিযুক্ত হইয়াছেন। পরে বলিলেন যে, এ মোকদ্দমা আদালতে উপস্থিত হইবে কি না এক্ষণে বলা যায় না। রজনী দাসীর সঙ্গে আমাদের একবার সাক্ষাৎ হইলে, বোধ হয় অনেক কথা পরিষ্কার হইতে পারে।

ব্রডসক বলিলেন, “কেন, আপনারা কি রফা করিতে ইচ্ছুক ?”

রাজকৃষ্ণ বলিলেন, “আমরা রজনীকে মনোহর দাসের উত্তরাধিকারিণী বলিয়া স্বীকার করি না। এবং রজনী জীবিতা কি না তাহাও জানি না। তবে রজনী যদি জীবিত থাকে, তবে গোল মিটিতে পারে।”

ব্রডসক। আমি তাঁহার উকীল; গোল মিটাইবার কথা আমার সাক্ষাতে বলিতে পারেন।

রাজকৃষ্ণ। আপনি উকীল, ঘটক নহেন; আপনাকে বলিয়া কি হইবে? আপনার মোয়াক্কেল কুমারী, আমার মোয়াক্কেল গৃহশূন্য; আমার মোয়াক্কেল আপনার মোয়াক্কেলকে বিবাহ করিয়া গোল মিটাইতে চাহেন।

ব্রডসক হাসিয়া উঠিল; আমি অপ্রতিভ হইলাম। আমার সেই স্বপ্নও মনে পড়িল।

ব্রডসক বলিলেন, "আপনাদের হিন্দুর মেয়ের কয়টা স্বামী হইতে পারে?"

রাজ। কেন?

ব্রডসক। আমার মোয়াক্কেলের বিবাহ হইয়া গিয়াছে।

রাজ। কার সঙ্গে, অমরনাথ ঘোষের সঙ্গে? সে কথা মিথ্যা।

ব্রডসক হাসিল, বলিল "এ মোকদ্দমায় সে তর্ক উঠিবে না; সুতরাং সে বিবাহ মিথ্যা সত্যের বিচারে আমাদিগের প্রয়োজন নাই। তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, অমরনাথ জীবিত থাকিতে, আপনার মোয়াক্কেল বিবাহের দ্বারা মোকদ্দমা মিটাইবার সম্ভাবনা নাই। অমরনাথ মরিলে বাবু বিধবা বিবাহ করিতে পারেন।"

আমার সহ্য হইল না। আমি উঠিয়া চলিয়া আসিলাম।

কার্য্য সিদ্ধ হইল বটে, কিন্তু রাজকৃষ্ণের প্রতি বড় রাগ করিলাম।

গৃহে আসিয়া পুনর্ব্বার বাদলচন্দ্রকে স্মরণ করিলাম। অনুমানে বুঝিয়াছিলাম, রজনীর মোকদ্দমার কাণ্ডটা, অমরনাথ সকলই করিতেছে। বিষ্ণুরাম বাবু যে প্রমাণাদির কথা বলিয়াছিলেন, সে প্রমাণ উত্তম বটে কিন্তু অমরনাথের জন্য আমার সর্ব্বত্র সংশয় হইতেছিল। অমরনাথের নিগূঢ় সন্ধান লওয়া আমার কর্ত্তব্য বোধ হইতে লাগিল। অমরনাথও সেই একবার দেখা দিয়া কেবল লুকাইয়া বেড়াইতেছে।

আমি তখন বাদলকে বলিলাম যে, যে অমরনাথ ঘোষের সন্ধানে তুমি চোর বাগানে গিয়াছিলে, সেই অমরনাথের সন্ধানে তোমাকে আবার যাইতে হইবে। সে বোধ হয় গ্রাওলি ব্রডসকের আপিসে মধ্যে মধ্যে আসিয়া থাকে। সেইখানে সন্ধান করিতে হইবে।

বাদল, ছাতি ঘাড়ে করিয়া, গ্রাওলি ব্রডসকের বাড়ীতে কেরাণিগিরির উমেদারিতে যাতায়াত আরম্ভ করিল। চাকরি সহজে হয় না; সুতরাং বাদলও আর তাঁহাদের আপিস ছাড়া নহে। প্রথম প্রথম অমরনাথের দেখা পাইল না; শেষ একদিন দেখিল, সেই বাবু উহাদিগের আপিসে প্রবেশ করিলেন।

বাদল তাঁহাকে কিছু বলিল না। তাঁহার গাড়িয়ানের সঙ্গে ছলে কথোপকথন আরম্ভ করিয়া বাসার ঠিকানা জানিয়া লইল। গাড়িয়ান বাসা জানে না। তবে সে ইহাই বলিল যে আহিরীটোলার মোড়ে তাহাকে নামাইয়া দিতে হইবে, ইহাই চুক্তি আছে।

বাদল অগ্রসর পদব্রজে গিয়া ঐ মোড়ের কাছে দাঁড়াইয়া রহিল। দুই ঘণ্টা পরে বাবু আসিয়া সেখানে নামিলেন। বাদল, অলক্ষ্য থাকিয়া তাঁহার পশ্চাতে গিয়া, তাঁহার বাসা দেখিয়া আসিল।

পরদিন প্রাতে আমি বাদলকে সঙ্গে করিয়া সেই ভবনে গেলাম। প্রথমে রামচন্দ্র দাসের সঙ্গে দেখা হইল। সে নমস্কার করিল। আমি তাহাকে কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলাম, "এখানে কোথা হইতে ?"

রাজ। আজ্ঞা এ আমার জামাতার বাড়ী।

আমি। তোমার জামাই কে ? রজনীর স্বামী না কি ?

রাজ। আজ্ঞা।

আমি। তবে রজনীকে পাওয়া গিয়াছে ?

রাজ। আজ্ঞা।

আমি। কোথায় পাওয়া গেল ?

রাজ। আমি এইখানে আসিয়াই দেখিলাম।

আমি। রজনী পলাইয়াছিল কেন, কিছু শুনিয়াছ ?

রাজ। আজ্ঞা, মেয়েমানুষ, সতীনের ঘর করিতে চাহে না।

আমি। এখন বিবাহ দিয়াছ কাহার সঙ্গে ?

রাজা। আজ্ঞা, সেই অমরনাথ বাবুর সঙ্গে।

আমি। যদি সেই পাত্রে তোমার কন্যা দেওয়া অভিপ্রায় ছিল, তবে আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে গিয়াছিলে কেন ?

"ভদ্রতার জন্য।"

এ উত্তর রামচন্দ্র দিল না; পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখি, অমরনাথ।

অমরনাথ আমার হস্তধারণপূর্ব্বক সাদরে লইয়া গিয়া বসাইলেন। কিন্তু বোধ হয় উভয়েই জানিতে পারিলাম যে, দুইজনে পরস্পরের পরম শত্রুর সম্মুখীন হইয়াছি।

ভারতমহিমা

ভারতবর্ষের মহিমা নিবিড় তমসাচ্ছন্ন। ভারতভূমি মানব সমাজের কি কি উপকার সাধন করিয়াছেন, ভারত-সন্তানেরাও ভাবিয়া দেখেন কি না সন্দেহ। আমরা জানি যে বর্ত্তমান সুসভ্য ইউরোপীয় জাতিগণ যীহুদী দেশ হইতে ধর্ম্ম, রোমের নিকট হইতে ব্যবস্থা ও রাজনীতি, এবং গ্রীসের নিকট হইতে বিজ্ঞান, সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন ও শিল্প প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু ভূমণ্ডলের উন্নতি সম্বন্ধে ভারতবর্ষ কিরূপ সহায়তা করিয়াছেন, আমাদিগের মধ্যে কয়জন লোকে অবগত আছেন? এই প্রবন্ধে সংক্ষেপে আমরা এতদ্বিষয়ের সমালোচনা করিব।

বিজ্ঞান লইয়াই বর্ত্তমান সভ্যজাতিদিগের গৌরব; এই নিমিত্ত আমরা প্রথমে বিজ্ঞানের কথাই বলিব। গণিতই বিজ্ঞানের মূল; বিজ্ঞানশাস্ত্রের যে শাখা যে পরিমাণে গণিতের অধীন হয়, তাহা সেই পরিমাণে উন্নতি লাভ করে। মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম প্রকাশিত হইয়াই জ্যোতিষের এত উন্নতি। তাপ, তড়িৎ, আলোক, শব্দ প্রভৃতির কার্য্য সংখ্যাদ্বারা ব্যক্ত করিতে পারিয়াই তাহাদিগের সম্বন্ধে বিজ্ঞানবেত্তৃগণ কত অভিনব তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন। নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে পদার্থসকলের পরস্পর সংযোগ ঘটে, এই নিয়মের আবিষ্ক্রিয়া হইতেই রসায়ন, উন্নতি সোপানে আরোহণ করিয়াছে। এক্ষণে দেখা যাউক, গণিত সম্বন্ধে ভারতবাসিগণ কি করিয়াছেন।

এক্ষণে অধিকাংশ সভ্য জনপদে যে সংখ্যালিখন-প্রণালী চলিতেছে, ভারতবর্ষেই তাহার উৎপত্তি। নয়টী অঙ্ক এবং শূন্যের সাহায্যে সমুদায় সংখ্যা লিখিবার রীতি ভারতবাসীরাই প্রকাশ করেন। এল্‌ফিন্‌ষ্টোন সাহেব তৎকৃত "ভারতবর্ষের ইতিহাসে" স্বীকার করিয়াছেন যে, পাটীগণিতের দশগুণোত্তর সংখ্যালিখন-প্রণালী হিন্দুদিগের সৃষ্টি। (১) ইউরোপবাসিগণ আরবদিগের নিকটে পাটীগণিত

---

(১) The Hindus are distinguished in Arithmetic by the acknowledged invention of the decimal notation." p. 142. *Elphinstone's History of India, Cowell's Edition.*

শিক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু আরবেরা এতদ্বিষয়ে হিন্দুদিগকে গুরু বলিয়া মানেন। এসিয়াটিক রিসার্চের দ্বাদশ খণ্ডে একজন আরব গ্রন্থকারকে উল্লেখ করিয়া লিখিত আছে, “বাহাউদ্দিন দশগুণোত্তর প্রণালীর অঙ্কগুলির সৃষ্টিকর্ত্তা ভারতবাসীদিগকে বলেন। ভারতবাসীরা যে এই অঙ্কগুলির স্রষ্টা ইহার প্রমাণ একখণ্ড আরবী কবিতাবলীর প্রস্তাবনা হইতে সচরাচর প্রদত্ত হইয়া থাকে, এজন্য বলা ভাল যে, সমুদায় আরবী এবং পারসী পাটীগণিত পুস্তকেই ভারতবাসীদিগকে স্রষ্টা বলিয়া উল্লেখ আছে।” (২)

কেবল পাটীগণিত নহে, বীজগণিতও ভারতবাসীদিগের সৃষ্টি। বর্ত্তমান ইউরোপবাসীরা বীজগণিতও মুসলমানদিগের নিকটে পাইয়াছেন; বীজগণিতের Algebra নামটী আরবী “আলজিবর” শব্দ হইতে সমুৎপন্ন। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে লিওনার্ডো নামক ইতালীদেশীয় একব্যক্তি মুসলমানদিগের নিকটে বীজগণিত শিক্ষা করিয়া উহা প্রথমে ইউরোপখণ্ডে প্রচার করেন। (৩) আরবেরা যে বীজগণিতের স্রষ্টা নহেন, তাহার বিলক্ষণ প্রমাণ আছে। বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁহারা হিন্দু এবং গ্রীকজাতির ছাত্র। তাঁহাদিগের নূতন আবিষ্ক্রিয়া কিছুই দৃষ্ট হয় না। তাঁহাদিগের পূর্ব্বে ভারতবর্ষে আর্য্যভট্ট, বরাহমিহির, ব্রহ্মগুপ্ত প্রভৃতি এবং গ্রীসদেশে দিওফান্তস নামক বীজগণিতকার প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। যিনি আরব দেশে প্রথমে বীজগণিত প্রচার করেন, তিনি যে ভারতবাসীদিগের শিষ্য তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। সুবিখ্যাত কোলব্রুক সাহেব লিখিয়াছেন, “মহম্মদ বেন মুসা আরবদিগের মধ্যে প্রথম বীজগণিত প্রকাশ করেন বলিয়া পরিচিত। তিনিই আল্‌মান্‌ সুরের রাজত্বকালে আল্‌মামুনের সন্তোষার্থে একখানি ভারতবর্ষীয় জ্যোতিষগ্রন্থের সংক্ষিপ্তসার রচনা করেন। তিনি হিন্দুদিগের গণনা-তালিকা সংশোধন করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া তদবলম্বন পূর্ব্বক গণনা-তালিকা প্রস্তুত করেন; এবং তিনি ভারতবর্ষীয় সংক্ষিপ্ত গণনা-প্রণালী শিক্ষা করিয়া

---

(২) "Bahauldin ascribes the invention of the numeral figures in the decimal scale to the *Indians*. As the proof commonly given of the *Indians* being the inventors of these figures is only an extract from the preface of a book of Arabic poems, it may be as well to mention that all the *Arabic* and Persian books of arithmetic ascribe the invention to the *Indians*."—p. 184. Vol. XII. *Asiatic Researches*.

(৩) "Leonardo of Pisa first introduced Algebra into Europe; he learned it at Bugia, in Barbary, where his father was a scribe in the custom house by appointment from Pisa; his book is dated A. D. 1202" —*Cowell's Note to Elphinstone's History of India*. p. 145.

স্বদেশে প্রচার করেন (৪) যে ব্যক্তি পাটীগণিত, জ্যোতিষ প্রভৃতি বিষয়ে হিন্দুদিগের নিকটে পদে পদে ঋণী, সে ব্যক্তি যে হিন্দুদিগের বীজগণিত শিক্ষা করে নাই, ইহা সম্ভব বোধ হয় না। কোলব্রুক সাহেবও এইরূপ বিবেচনা করেন। তিনি বলেন, “গ্রীক ও হিন্দুজাতি আরবদিগের পূর্ব্বে যে বীজগণিত সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই; আরবেরা বীজগণিতের স্রষ্টা বলিয়া দাবিও করে না। বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাহারা যে অন্যের নিকটে ঋণী, ইহা তাহারা স্বীকার করিয়া থাকে এবং তাহাদিগের সর্ব্ববাদিসম্মত কথা এই যে, তাহারা হিন্দুদিগের নিকট সংখ্যাশাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিল। তাহারা যে হিন্দুদিগের বীজগণিতও পাইয়াছিল, ইহা যেরূপ সম্ভব, যে গণিতবেত্তা ভারতবর্ষীয় পাটীগণিত শিখিয়া আরবদিগকে শিখাইয়াছিলেন, তিনি ভারতবর্ষীয় গণিতের কিছুমাত্র সাহায্য না পাইয়া বীজগণিত আবিষ্কার করিয়াছেন, একথা সেরূপ সম্ভব নহে।” (৫)

৭৭৩ খৃষ্টাব্দে খলিফা আল্‌মানসুরের রাজত্বকালে প্রথম আরবগণিতবেত্তা কর্ত্তৃক ভারতবর্ষীয় গণিতগ্রন্থ আরবী ভাষায় অনুবাদিত হয়। (৬) ৪৭৬ খৃষ্টাব্দে আর্য্যভট্টের জন্ম; ৫৮৭ খৃষ্টাব্দে বরাহমিহিরের মৃত্যু; এবং ৫৯৮ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মগুপ্তের

---

(৪) "Muhammed Ben Musa Ali Khuwarezmi is recognized among the Arabians as the first who made Algebra known to them. He is the same, who abridged, for the gratification of Almamun, an astronomical work taken from the Indian system in the preceding age, under Almansur. He framed tables likewise, grounded on those of the Hindus; which he professed to correct. And he studied and communicated to his countrymen the Indian compendious method of computation." *Colebrooke's Dissertation prefixed to his translations from Sanscrit Algebra.*

(৫) "Priority seems then decisive in favour of both Greeks and Hindus against any pretensions on the part of the Arabians who in fact, however, prefer none as inventors of Algebra. They were avowed borrowers in science: and by their own unvaried acknowledgment, from the Hindus they learnt the science of numbers. That they also received the Hindu Algebra, is much more probable than that the same mathematician who studied the Indian arithmetic and taught it to his Arabian brethren, should have hit upon Algebra unaided by any hint or suggestion of the Indian Analysis."—*Colebrooke's Dissertation.*

(৬) 'The first Arabian mathematician translated a Hindu book in the reign of the Khalif Almansur, A. D. 773." *Cowell's Note to Elphinstone's India.* p. 145.

জন্য। (৭) সুতরাং যে সময়ে আরবেরা ভারতবর্ষীয় গণিত প্রাপ্ত হইলেন, সে সময়ে এদেশে বীজগণিতের বিলক্ষণ উন্নতি হইয়াছিল। এতদ্দেশীয় গণিতপ্রাপ্তির পরে শতবর্ষাধিক কাল পর্য্যন্তও তাঁহারা গ্রীকগণিতের বিন্দুবিসর্গও জানিতেন না এবং প্রায় দুই শতাব্দী গত হইলে পর দিওফান্তসের গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে পাইয়াছিলেন। (৮) অতএব আরবদিগের অনেক পূর্ব্বে এদেশে বীজগণিতের চর্চ্চা হইয়াছিল, এবং তাঁহারা প্রধানতঃ এদেশেরই শিষ্য, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু হিন্দুরা গ্রীকদিগের নিকটে বীজগণিত শিক্ষা করিয়াছিলেন কি না, বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক। গ্রেগরী আবুল ফরাজ নামক একজন আর্ম্মাণী খৃষ্টান লেখক বলেন যে, রোমক সম্রাট্ জুলিয়ানের সময়ে দিওফান্তস্ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। (৯) একথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে ৩৬০ খৃষ্টাব্দ দিওফান্তসের প্রাদুর্ভাব কাল; সুতরাং তিনি আর্য্যভট্টেরও শত বর্ষের পূর্ব্বের লোক হইতেছেন। কিন্তু আর্য্যভট্টও ভারতবর্ষের প্রথম গণিতবেত্তা নহেন। তাঁহার পূর্ব্বে পরাশর, গর্গ, বশিষ্ঠ প্রভৃতি গণিতবিৎ পণ্ডিতগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অতএব আর্য্যভট্টকে দিওফান্তসের ছাত্র বলা যুক্তিযুক্ত হইতেছে না। আর্য্যভট্ট যে প্রকার বীজগণিতের জ্ঞান দেখাইয়াছেন, তাহা যে কেবল দিওফান্তসের অপেক্ষা অনেক অধিক এরূপ নহে; দুইশত বৎসর পূর্ব্বে ইউরোপ খণ্ডে তদপেক্ষা অধিক দৃষ্ট হইত না। (১০) এস্থলে আর একটী বিষয়ও বিবেচনাযোগ্য। দিওফান্তস্ ব্যতিরিক্ত আর কোন গ্রীক বীজগণিতকারের নাম বা গ্রন্থ কোথাও পাওয়া যায় না এবং প্রাচীন গ্রীক ভাষায় বীজগণিতবোধক একটী শব্দ নাই। (১১) গ্রীস্ দেশে বীজগণিতের চর্চ্চা থাকিলে এরূপ হইত না। ইহাতে.

---

(৭) See a paper by the late Dr. Bhau Daji in the *Journal of the Royal Asiatic Society.* New Series. Vol. I.

(৮) "The Arabs became acquainted with the Indian astronomy and numerical science before they had any knowledge of the writings of the Grecian astronomers and mathematicians; and it was not until after more than one century, and nearly two, that they had the benefit of an interpretation of Diophantus, whether version or paraphrase, executed by Muhammad Abulwafa Al Buzjane." p. XXI *Colebrooke's Dissertation.*

(৯) See page VI & XX *Colebrooke's Dissertation.*

(১০) See *Cowell's Elphinstone* p. 143.

(১১) "We know of no Greek writer on Algebra, but Diophantus; neither he, nor any known author, of any age or of any country, has spoken directly or indirectly, of any other *Greek* writer on Algebra in

সন্দেহ হয় যে দিওফান্তস্ বিদেশীয় লোকের নিকটে বীজগণিত শিক্ষা করিয়াছিলেন। এই সন্দেহটী যে অমূলক নহে, এসিয়াটিক রিসার্চ্চের দ্বাদশ খণ্ড পাঠ করিয়া অবগত হওয়া যায়। উহাতে লিখিত আছে, "১৫৭৯ খৃষ্টাব্দে বম্বেলি নামক এক ব্যক্তি একখানি বীজগণিত গ্রন্থ প্রকাশ করেন এবং উক্ত গ্রন্থে তিনি বলেন যে, তিনি এবং রোমের একজন উপদেশক দিওফান্তসের কিয়দংশ অনুবাদ করিয়াছিলেন এবং তাহাতে ভারতবর্ষীয় গ্রন্থকারদিগের বারম্বার উল্লেখ দেখিয়া জানিয়াছিলেন যে আরবদিগের পূর্ব্বে ভারতবর্ষীয়েরা বীজগণিত জানিতেন।" (১২) অতএব ভারতবর্ষই যে বীজগণিতের উৎপত্তিস্থান, তদ্বিষয়ে সংশয় থাকিতে পারে না।

গণিতের পরে রসায়ন দ্বারাই বর্ত্তমান কালে বিজ্ঞানশাস্ত্রের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। কিন্তু রসায়নের মূলও ভারতবর্ষ। ইউরোপীয় Chemistry বা রসায়ন Alchemy হইতে সমুদ্ভূত। কিন্তু Alchemy (আলকিমী) নামটী আরবী। ইহাতেই জানা যাইতেছে যে আরবদিগের নিকট হইতেই ইউরোপবাসিগণ রসায়নের প্রথম শিক্ষা পাইয়াছিলেন। কিন্তু আরবেরা এতদ্দেশ হইতে এ বিষয়ের জ্ঞানলাভ করিয়াছিল, কিঞ্চিৎ অনুসন্ধান করিলেই বুঝিতে পারা যায়। চরক ও সুশ্রুত এদেশের প্রধান চিকিৎসাগ্রন্থ। আরবেরা বিদ্যাশিক্ষার প্রতি মনোযোগ দিতে আরম্ভ করিয়া অল্পকাল মধ্যে চরক এবং সুশ্রুত অনুবাদ করিয়া লয়; এবং প্রকাশ্যরূপে ভারতবাসীদিগের নিকটে আপনাদিগের ঋণ স্বীকার করে। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে বোগদাদের বিখ্যাত বাদসাহ হারুনাল রসিদের সভায় দুইজন হিন্দু চিকিৎসক ছিল। (১৩) হিন্দুরা যে কেবল ভাল চিকিৎসক ছিলেন, এরূপ নহে; তাঁহারা রাসায়নিক বিদ্যায়ও বিলক্ষণ পারদর্শী ছিলেন। এলফিন্‌ষ্টোন্

---

any branch whatever; the Greek has not even a term to designate the science."—p. 163. Vol. XII *Asiatic Researches.*

(১২) "In 1579 Bombelli published a treatise of Algebra, in which he says, that he and a lecturer at Rome, whom he names, had translated part of Diophantus, adding, "that they had found that in the said work the *Indian* authors are often cited; by which they learnt that the science was known among the *Indians* before the Arabians had it." p. 161 Vol. XII. *Asiatic Researches.*

(১৩) "The earliest medical writers extant are Charaka and Susruta. These authors were translated into Arabic, and probably soon after that nation turned its attention to literature. The Arab writers openly acknowledge their obligations to the medical writers of India...It helps to fix the date of their becoming known to the Arabs, to find that two Hindus, named Manka and Saleh, were physicians to Harun al Rashid in the eighth century."—*Cowell's Elphinstone* p. 159.

সাহেবের "ভারতবর্ষের ইতিহাসে" লিখিত আছে যে তাঁহারা গান্ধকিক অম্ল, যাবক্ষারিক অম্ল, ও লাবণিক অম্ল ; তাম্র, লৌহ, সীসক, রাং এবং দস্তার অম্লজানজ ইত্যাদি অনেক রাসায়নিক প্রক্রিয়া সমুৎপন্ন যৌগিক পদার্থ প্রস্তুত করিতে পারিতেন। (১৪) এই পদার্থগুলির মধ্যে গান্ধকিক অম্লকে হিন্দুরা মহাদ্রাবক নাম দিয়াছেন এবং এ নামটি কেমন যুক্তিসঙ্গত, ডাক্তার ওশানসী লিখিত কয়েক পংক্তির নিম্নস্থ অনুবাদ দৃষ্টে প্রতীয়মান হইবে ;—"এই দ্রাবকের সাহায্যে আমরা যাবক্ষারিক, লাবণিক প্রভৃতি অন্যান্য দ্রাবক প্রস্তুত করিয়া থাকি। ইহা হইতেই আমরা সস্তায় সোডা হরিতকাদি উৎপাদন করিতে পারি। ইহা রঙ্গকরের প্রক্রিয়ায় আবশ্যক এবং ইহা হইতেই আমরা কালোমেল, কুইনাইন প্রভৃতি মহৌষধি পাইতেছি। বস্তুতঃ, যে সময়ে ইউরোপে অল্পব্যয়ে গান্ধকিক অম্ল প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, সেই সময় হইতে রাসায়নিক শিল্পজাত সম্বন্ধে ইউরোপের মহত্বের প্রারম্ভ হইয়াছে।" (১৫)

একণে দেবতত্ত্ব সম্বন্ধে ইউরোপখণ্ডে যেপ্রকার ব্যাখ্যা অবলম্বিত হইতেছে, তাহারও উৎপত্তি ভারতবর্ষে। কুমারিল ভট্ট লিখিয়াছেন,—

"প্রজাপতিস্তাবৎ প্রজাপালনাধিকারাদাদিত্য এবোচ্যতে। সচারুণোদয়বেলায়ামুষস্যমুদ্যন্নভ্যেতি সা তদাগমনাদেবোপজায়ত ইতি তদ্দুহিতৃত্বেন ব্যপদিশ্যতে। তস্যাং চারুণকিরণাখ্যবীজনিক্ষেপাৎ স্ত্রীপুরুষ সংযোগবদুপচারঃ। সমস্ততেজাঃ পরমেশ্বরত্ব নিমিত্তেন্দ্র শব্দবাচ্যঃ সবিতৈবাহনি লীয়মানতয়া রাত্রেরহল্যা শব্দবাচ্যায়াঃ ক্ষয়াত্মক জরণ হেতুত্বাজ্জীর্য্যত্যস্মাদনেন বোদিতেন বেত্যহল্যাজার ইত্যুচ্যতে ন পরস্ত্রী ব্যভিচারাৎ।"

---

(১৪) "They knew how to prepare sulphuric acid, nitric acid and muriatic acid ; the oxides of copper, iron, lead......,tin and zinc ; the sulphuret of iron, copper, mercury, antimony and arsenic : the sulphate of copper, zinc and iron and carbonates of lead and iron." **Ibid p. 159.**

(১৫) "By the assistance of this acid we prepare almost all the others ; for instance, the nitric, muriatic, tartaric, citric &c. We owe to it the cheapest mode of obtaining artificial soda, chlorine and its bleaching compounds. It is essential to the purposes of the dyer and to it we are indebted for many of the best remedies we can command —of which calomel, corrosive sublimate, sulphate of quinine, the ethers &c. may be cited as examples. In fact, from the time that sulphuric acid was first prepared at a cheap price in Europe, may be dated the commencement of her greatness in all chemical manufactures." O. Shaughnessy's *Manual of Chemistry* p. 102.

অর্থাৎ "প্রজাপালন করেন বলিয়া সূর্য্যকে প্রজাপতি বলে। অরুণোদয় সময়ে তাঁহার আগমনে উষার উৎপত্তি, এজন্য উষাকে তাঁহার দুহিতা বলে। উষার সহিত তাঁহার তেজঃসংযোগ ঘটে, এজন্য উভয়কে স্ত্রীপুরুষভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। তেজোময় সবিতা ঐশ্বর্য্য হেতুক ইন্দ্রপদবাচ্য। অহন্ অর্থাৎ দিনকে লয় করে বলিয়া রাত্রির নাম অহল্যা। সেই রাত্রিকে ক্ষয় বা জীর্ণ করেন বলিয়া ইন্দ্র অর্থাৎ সবিতাকে অহল্যাজার বলে, ব্যভিচার জন্য নহে।"

যে ভট্টমোক্ষমূলর ইউরোপে দেবতত্ত্ব ব্যাখ্যার পথ খুলিয়াছেন, তিনিই প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যবিষয়ক গ্রন্থে উপরিধৃত সংস্কৃত পংক্তি কতিপয় প্রথমে উদ্ধৃত করিয়াছেন; (১৬) এবং উহা হইতেই যে তিনি দেবতত্ত্বের সৌরব্যাখ্যা অবলম্বন করিতে শিখিয়াছেন, তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে।

ভারতবর্ষ হইতে ভূমণ্ডলের আরও অনেক উপকার হইয়াছে। যে প্রখর প্রতিভা হইতে পাটীগণিত, বীজগণিত ও রসায়ন সমুদ্ভূত, তাহারই গুণে একটী নূতন বর্ণমালারও সৃষ্টি হইয়াছে। পৃথিবীতে তিনটী বর্ণমালা আছে। চীনদেশীয়, ফিনিসীয় এবং ভারতবর্ষীয়। চীনদেশীয় বর্ণমালা চীন এবং জাপানে প্রচলিত। ফিনিসীয় বর্ণমালা য়িহুদী, মুসলমান এবং ইউরোপীয় জাতিদিগের মধ্যে চলিতেছে। ভারতবর্ষীয় বর্ণমালা ভারতবর্ষ, পূর্ব্ব উপদ্বীপ, তিব্বত, সিংহল ও বালিদ্বীপে দৃষ্ট হয়। কণ্ঠ, তালু, মূর্দ্ধা, দন্ত, ওষ্ঠ এইরূপ উচ্চারণস্থানভেদে বর্ণোৎপত্তি কল্পিত বলিয়া ভারতবর্ষীয় বর্ণমালাটী যেরূপ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে গঠিত, অন্য দুইটী তদ্রূপ নহে।

কিন্তু ধর্ম্ম ও নীতি বিষয়েই ভারতবর্ষ মনুষ্য-সমাজের মহদুপকার করিয়াছেন। খৃষ্ট জন্মিবার প্রায় ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে এতদ্দেশে বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করিয়া জগন্মণ্ডলে প্রেমপূর্ণ সার্ব্বভৌম ধর্ম্ম প্রথম প্রচার করেন। তিনি রাজর্ষি পুত্র ও রাজসিংহাসনের উত্তরাধিকারী হইয়া রাজভোগে ছিলেন। ক্ষমতাশালী পিতা, স্নেহময়ী মাতা, পতিপ্রাণা পত্নী, সুন্দর সুত, আজ্ঞাবহ দাসদাসী, অপরিমেয় অর্থ এ সকল তাঁহার ছিল; কিন্তু এ সকলে তাঁহার মনস্তুষ্টি হইল না। তিনি মানব-জাতির দুঃখে কাতর হইয়া রাজভোগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মোক্ষপথের অনুসন্ধানে বহির্গত হইলেন। ক্রমে তাঁহার জ্ঞানচক্ষু খুলিল। জাতিভেদ ও অবস্থাভেদ তাঁহার আর দৃষ্টিরোধ করিল না। তিনি দেখিতে পাইলেন যে মুক্তিপথে প্রবেশ করিতে সকলেরই সমান অধিকার। যিনি লোকের যন্ত্রণা অবলোকন করিয়া ব্যাকুল, তিনি পরপীড়ন দেখিতে পারিবেন কেন? তাঁহার হৃদয় হইতে এই মহাবাক্য

---

(১৬) Ancient Sanscrit Literature by Professor Max Muller.

নিঃসৃত হইল, "অহিংসাই পরম ধর্ম্ম ;" মনুষ্য হউক বা অপর জীব হউক কাহাকেও কষ্ট দিবে না, সকলকে সুখে রাখিবার চেষ্টা করিবে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এবং বহুসংখ্যক সঙ্কর জাতির বিবাদভূমিতে একতার বীজ রোপিত হইল। আর্য্য ও ম্লেচ্ছ একই বন্ধনে বদ্ধ হইবার উপায় হইল। ক্রমে সুগভীর, সুবিস্তীর্ণ সিন্ধুসলিল অতিক্রম করিয়া, তুষারমণ্ডিত, মেঘভেদী, তুঙ্গশৃঙ্গ শৈলমালা উল্লঙ্ঘন করিয়া, মঙ্গলবার্ত্তা দূরদেশে ছুটিল। সমুদ্র পার হইয়া সিংহল দ্বীপে, হিমালয় অতিক্রম করিয়া চীন সাম্রাজ্যে, বৌদ্ধধর্ম্মের উজ্জ্বল তরঙ্গ লাগিল। পূর্ব্বে লোকে আপন আপন ধর্ম্ম লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিত। সত্য ধর্ম্ম সর্ব্বত্র প্রচার করিয়া সমুদায় মনুষ্যজাতিকে একধর্ম্মাক্রান্ত করিতে হইবে, এ নূতন ভাব বৌদ্ধধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে ভূমণ্ডলে প্রথম উদিত হইল। ধর্ম্মপ্রচারকগণ দেশে দেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। নূতন উৎসাহে প্রীতিবিস্ফারিত হৃদয়ে তাঁহারা জগতের হিতসাধন ব্রতে ব্রতী হইলেন। সিন্ধু বা ব্রহ্মপুত্র, সাগর বা হিমাচল, কিছুতেই তাঁহাদিগের গতিরোধ করিতে পারিল না। এইরূপে খৃষ্ট জন্মিবার পূর্ব্বেই সিংহল দ্বীপ হইতে চীন পর্য্যন্ত বৌদ্ধধর্ম্মের শান্তিময়ী পতাকা উড্ডীন হইল। অদ্যাপি ভূমণ্ডলে বুদ্ধদেবের যত শিষ্য আছে, তত আর কোন ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের নাই। সকল দেশ, সকল জাতি, সকল বর্ণের জন্য ধর্ম্মের দ্বার বুদ্ধদেব প্রথম উদ্‌ঘাটন করেন। পরে য়ীহুদিদেশীয় ঈশা এবং আরববাসী মহম্মদ সেই পথের পথিক হন। কিন্তু ঈশার প্রীতি নরজাতি পর্য্যন্তই বিস্তীর্ণ হইয়াছিল, উহা বুদ্ধদেবের দয়ার ন্যায় সমুদায় জীবগণকে ক্রোড়ে ধারণ করে নাই। মহম্মদ ঈশ্বরের মহিমা প্রচার করিতে গিয়া ধরণীমণ্ডল নরশোণিতে প্লাবিত করিয়াছেন। বলদ্বারা বৌদ্ধধর্ম্মের বিস্তার হয় নাই। বুদ্ধশিষ্যগণ অনেক অত্যাচার সহ্য করিয়াছেন, কখন কখন শত্রুপ্রদত্ত তুষানলে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন ; কিন্তু অস্ত্রদ্বারা, শারীরিক বিক্রমদ্বারা তাঁহারা ধর্ম্মপ্রচার করিতে চেষ্টা করেন নাই। খৃষ্ট জন্মিবার প্রায় তিন শত বৎসর পূর্ব্বে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী মগধপতি অশোক বা প্রিয়দর্শী প্রায় সমুদায় ভারতবর্ষের সম্রাট্ ছিলেন ; পাষাণময় গিরিগাত্রে স্থানে স্থানে তাঁহার যে সকল অনুজ্ঞাপত্র ক্ষোদিত আছে, তাহাতে লোকের মঙ্গলসাধনার্থে যে প্রকার যত্ন এবং অন্য ধর্ম্মাবলম্বী লোকের প্রতি যেরূপ উদার ভাব লক্ষিত হয়, তদ্দর্শনে বর্ত্তমান সভ্যতাভিমানী ইউরোপবাসী নরপতিদিগকেও লজ্জা পাইতে হয়, সন্দেহ নাই। দুর্ভাগ্যক্রমে এক্ষণে বৌদ্ধমতাবলম্বী জাতিগণ পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নহেন ; কিন্তু যে কেহ মনোযোগপূর্ব্বক ইতিহাস পাঠ করিয়াছেন, তিনিই স্বীকার করিবেন যে পাশ্চাত্য ভূভাগে ঈশা যে প্রেমজ্যোতি বিকীর্ণ করিয়াছেন, পূর্ব্বভূভাগে বুদ্ধদেবপ্রদীপ্ত প্রেমালোক কোন ক্রমেই তদপেক্ষা হীনপ্রভ নহে। যখন মনে হয় যে অল্পদিন হইল বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী

জাপান রাজ্যের নরপালগণ স্বদেশের উপকারার্থে সম্রাটের হস্তে আপন আপন সৈন্য, গড় ও রাজকোষ সমর্পণ করিয়াছেন এবং জাপানবাসিগণ মহোৎসাহ সহকারে উন্নতিপথে অগ্রসর হইতে যৎপরোনাস্তি চেষ্টা করিতেছেন, তখন আশা হয় বুঝি এসিয়াখণ্ডের পুনর্জ্জীবিত হইবার দিন উপস্থিত হইতেছে।

ভারতবর্ষ ভূমণ্ডলের জ্ঞান ও ধর্ম্ম বৃদ্ধি করিয়াছেন বলিয়া আর কোনরূপ উপকার করেন নাই এরূপ নহে। এতদ্দেশবাসিগণ সিংহল, যব ও বালিদ্বীপে উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়া তথায় সভ্যতার সূত্রপাত করেন। সিংহলের ধর্ম্মগ্রন্থ সকল যে পালিভাষায় লিখিত তাহা ভারতবর্ষ হইতে গৃহীত। সিংহলের রাজবংশ বাঙ্গালি। বালিদ্বীপে অদ্যাপি হিন্দু দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি আছে ও তাহাদিগের পূজা হইয়া থাকে এবং তথায় যে কবিভাষা প্রচলিত তাহাও সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন। পূর্ব্বকালে সিংহল ও ভারতসাগরীয় দ্বীপশ্রেণী হইতে অর্ণবপোতে মুক্তা ও দারুচিনি, এলাচ প্রভৃতি লইয়া আসিয়া ভারতবর্ষীয়গণ পাশ্চাত্য প্রদেশে প্রেরণ করিতেন। এইরূপে তাহাদিগের সামুদ্রিক বাণিজ্যের গুণে য়ীহুদী, ফিনিসীয়, গ্রীক, রোমক প্রভৃতি অনেক জাতি উপকৃত হইতেন। এক্ষণে সভ্য সমাজে যে কার্পাসবস্ত্রের বহুল ব্যবহার, তাহার উৎপত্তি ভারতবর্ষে। সকলেই স্বীকার করেন যে কার্পাস শিল্পজাতের জন্মভূমি ভারতবর্ষ। যে ঋগ্বেদ প্রায় খৃষ্টজন্মের পঞ্চদশ শত বৎসর পূর্ব্বে লিখিত, তাহাতেও তন্ত্রস্থিত কার্পাস বস্ত্রের উল্লেখ দৃষ্ট হয়; সুতরাং তাদৃশ প্রাচীন কালেও এতদ্দেশে কার্পাস বস্ত্র ব্যবসায় প্রচলিত হইয়াছিল। (১৭) এতদ্ব্যতিরিক্ত গ্রীক, রোমক প্রভৃতি জাতিগণ যে ভারতবাসীদিগের নিকট হইতে রেশমের কাপড় পাইতেন, তাহারও প্রমাণ আছে। রেশমের উৎপত্তি চীনেই হউক বা ভারতবর্ষেই হউক, ইউরোপের প্রাচীন সভ্য জাতিগণ যে এতদ্দেশ হইতে পট্টবস্ত্র প্রাপ্ত হইতেন, তাহার সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষ বহুকাল পর্য্যন্ত অধিকাংশ সভ্যজনপদের কার্পাস ও রেশমী কাপড় যোগাইতেন। ইংরেজদিগের লিখিত গ্রন্থেই দৃষ্ট হয় যে, একশত বৎসর পূর্ব্বে এদেশে ঘরে ঘরে চরকা ঘুরিত এবং গ্রামে গ্রামে বস্ত্রব্যবসায়ী লোক ছিল। কিন্তু এখন আর সে দিন নাই। আমরা পরিধেয় বস্ত্রের জন্যও ইংরেজদিগের মুখ চাহিয়া থাকি। ম্যান্‌চেষ্টরের

---

(১৭) "India is according to our knowledge, the accredited birth place of cotton manufacture. In one of the hymns of the Rigveda said to have been written fifteen centuries before our era, reference is made to *cotton in the loom* there, at which early date therefore it must have acquired some considerable footing."—Vol. XVII Journal of the Royal Asiatic Society.

কলের কাপড়ই এখন আমাদিগের প্রধান অবলম্বন হইয়াছে। সকল বিষয়েই এইরূপ। যে দেশে পাটীগণিত, বীজগণিত ও রসায়নের সৃষ্টি, সেই দেশের লোকেরাই এখন বিদেশী বিজ্ঞানের ছিটাফোঁটা পাইয়াই আপনাদিগের জন্মসার্থক জ্ঞান করেন। যেদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের উৎপত্তি, সেইদেশের কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ সামান্য বিলাতী লেখকদিগকে ধর্ম্মবিষয়ে গুরু বলিতে লজ্জিত হন না। আর কতকাল এইরূপ চলিবে? হে ভারতসন্তানগণ, ভারতের পূর্ব্বমহিমা স্মরণপূর্ব্বক সকলে একবার আপনাদিগের দুরবস্থা মোচনের চেষ্টা কর। তোমরা কি ছিলে এবং কি হইয়াছ, ভাবিয়া কি দেখিয়াছ?

১ম সংখ্যা

হেম বাবু এই কাব্যখানি অসম্পূর্ণাবস্থাতেই প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং আমরা ইহার রীতিমত সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইতে পারিতেছি না। মহাকাব্যের সম্পূর্ণাবস্থা না হইলে, তাহার দোষগুণ নির্ব্বাচন সাধ্য নহে; অর্দ্ধনির্ম্মিত অট্টালিকা দেখিয়া কেহ অট্টালিকার ভাবী উৎকর্ষ সম্বন্ধে স্থির কথা বলিতে পারেন না; শাখা বা কাণ্ড মাত্র দেখিয়া কেহই বৃক্ষের শোভা বুঝিতে পারেন না; অঙ্গমাত্র দেখিয়া ব্যক্তিবিশেষকে সুন্দর বা কুৎসিত বলা যায় না। তবে অসমাপ্ত কাব্য পড়িয়া আমাদিগের যে সুখোদয় হইয়াছে, পাঠকগণকে সেই সুখের ভাগী করিবার জন্য গ্রন্থের কিছু পরিচয় দিব। অনেকেই এই গ্রন্থ পাঠান্তরে স্বীকার করিবেন যে, বাঙ্গালা গ্রন্থ পড়িয়া এরূপ সুখ অনেক দিন ঘটে নাই। এবং শীঘ্র ঘটিবে না। এরূপ কাব্য সর্ব্বদা জন্মে না।

এই মহাকাব্যের বিষয়, ইন্দ্রকৃত বৃত্রের বধ। হেমবাবু পৌরাণিক বৃত্তান্তের অবিকল অনুসরণ করেন নাই—অনেক স্থানেই নিজ কল্পনাকে স্ফূরিত করিয়াছেন। পাতালে, বৃত্রজিত, নির্ব্বাসিত দেবগণ মন্ত্রণায় নিযুক্ত। এই স্থানে গ্রন্থারম্ভ। প্রথম সর্গ পড়িয়া অনেকেরই পাণ্ডিমোনিয়মে মন্ত্রণানিযুক্ত দেবদূতগণের কথা মনে পড়িবে। হেমবাবু স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন যে, "বাল্যাবধি আমি ইংরাজিভাষা অভ্যাস করিয়া আসিতেছি এবং সংস্কৃতভাষা অবগত নহি, সুতরাং এই পুস্তকের অনেক স্থানে যে ইংরাজি গ্রন্থকারদিগের ভাবসঙ্কলন এবং সংস্কৃতভাষার অনভিজ্ঞতা-দোষ-লক্ষিত হইবে তাহা বিচিত্র নহে।" হেমবাবু মিল্টনের অনুসরণ করিয়া থাকুন বা না থাকুন, তিনি এ অংশেও যে স্বকীয় কবিত্বশক্তির বিশেষ পরিচয় দিয়াছেন, তাহা পাঠমাত্রেই সহৃদয় ব্যক্তি বুঝিতে পারিবেন। "নিবিড়ধূম্রল ঘোর"

বৃত্রসংহার কাব্য। প্রথম খণ্ড। শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বিরচিত। শ্রীক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য্য কর্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতা।

সেই পাতাল পুরীর মধ্যে, সেই দীপ্তিশূন্য অমরগণের দীপ্তিশূন্য সভা—অল্পশক্তির সহিত বর্ণিত হয় নাই। একটি শ্লোক বিশেষ ভয়ঙ্কর—

চারিদিকে সমুত্থিত অস্ফুট আরাব
ক্রমে দেব-বৃন্দমুখে ফুটে ঘন ঘন;
ঝটিকার পূর্ব্বে যেন ঘন ঘনচ্ছাস
বহে ঘুড়ি চারিদিক আলোড়ি সাগর।

স্বর্গভ্রষ্ট দেবগণ সেই তমসাচ্ছন্ন, ভীমশব্দপূর্ণ সভাতলে বসিয়া, পুনর্ব্বার স্বর্গ আক্রমণের পরামর্শ করিতে লাগিলেন। দেবমুখে সন্নিবেশিত বাক্যগুলিতে একটি অর্থ আছে; বোধ করি, সকলেই বিনা টিপ্পনীতে তাহা বুঝিতে পারিবেন। অধিক উদ্ধৃত করিবার আমাদিগের স্থান নাই; উদাহরণস্বরূপ তিনটি শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি—

"ধিক্ দেব! ঘৃণাশূন্য, অক্ষুব্ধ-হৃদয়,
এতদিন আছ এই অন্ধতম পুরে;
দেবত্ব, বিভব, বীর্য্য, সর্ব্ব তেয়াগিয়া
দাসত্বের কলঙ্কেতে ললাট উজ্জ্বলি।"

"ধিক্ সে অমরনামে, দৈত্যভয়ে যদি
অমরা পশিতে ভয় কর দেবগণ,
অমরতা পরিণাম পরিশেষে যদি
দৈত্য-পদরজঃ পৃষ্ঠে করহ ভ্রমণ।"

"বল হে অমরগণ—বল প্রকাশিয়া
দৈত্যভয়ে এইরূপে থাকিবে কি হেথা?
চির অন্ধকার এই পাতাল প্রদেশে,
দৈত্য-পদ-রজঃ-চিহ্ন বক্ষে সংস্থাপিয়া?"

এই সর্গে অনেকস্থানে আশ্চর্য্য কবিত্ব প্রকাশ আছে, তাহা দেখাইবার আমাদিগের অবকাশ নাই। অন্যান্য সর্গ সম্বন্ধে অধিকতর বক্তব্য আছে।

এই দেবসমাজে ইন্দ্র ছিলেন না। তিনি কুমেরু-শিখরে নিয়তির আরাধনা করিতেছিলেন। অমরগণ বিনা ইন্দ্রেই পুনর্যুদ্ধ অভিপ্রেত করিলেন।

দ্বিতীয় সর্গ ইন্দ্রালয়ে। প্রথম সর্গে রৌদ্র ও বীর রসের তরঙ্গ তুলিয়া কুশলময় কবি সহসা সে ক্ষুব্ধ সাগর শান্ত করিলেন। সহসা এক অপূর্ব্ব মাধুর্য্যময়ী সৃষ্টি সম্প্রসারিত করিলেন। নন্দন বনে বৃত্র-মহিষী ঐন্দ্রিলা, নবপ্রাপ্ত স্বর্গসুখে সুখময়ী—

রতি ফুলমালা হাতে দেয় তুলি,
পরিছে হরিষে সুখসাথে ভুলি,
বদন মণ্ডলে ভাসিছে ব্রীড়া ।

এই চিত্রমধ্যে বসন্ত পবনের মাধুর্য্যের ন্যায় একটি মাধুর্য্য আছে—কিসের সে মাধুর্য্য, পবন মাধুর্য্যের ন্যায় তাহা অনির্ব্বচনীয়—স্বপ্নবৎ—

করিছে শয়ন কল্প পারিজাতে
মৃদুল মৃদুল সুশীতল বাতে
মুদিয়া নয়ন কুসুমে হেলি ।

এই সুখশয্যায় শয়ন করিয়া, ঐন্দ্রিলা স্বামীর কাছে সোহাগ বাড়াইতে লাগিলেন। তিনি স্বর্গের অধিশ্বরী হইয়াছেন, তথাপি তাঁহার সাধ পূরে না—শচীকে আনিয়া দাসী করিয়া দিতে হইবে। বৃত্রাসুর তাহাতে স্বীকৃত হইলেন। এই কথোপকথন আমাদিগের তত ভাল লাগে নাই। ইন্দ্রজয়ী মহাসুরের সঙ্গে মহাসুরের মহিষী নন্দনে বসিয়া এই কথোপকথন করিতেছেন, গ্রন্থ পড়িতে পড়িতে ইহা মনে থাকে না, মর্ত্তভূমে সামান্যা বঙ্গগৃহিণীর স্বামিসম্ভাষণ বলিয়া কখন কখন ভ্রম হয়।

তৃতীয় সর্গে, বৃত্রাসুর সভাতলে প্রবেশ করিলেন।

নিবিড় দেহের বর্ণ মেঘের আভাস,
পর্ব্বতের চূড়া যেন, সহসা প্রকাশ—

"পর্ব্বতের চূড়া যেন **সহসা** প্রকাশ" ইহা প্রথম শ্রেণীর কবির উক্তি—মিল্‌টনের যোগ্য। বৃত্রসংহার কাব্য মধ্যে এরূপ উক্তি অনেক আছে।

অন্যান্য দেবতা পাতালবাসী, কিন্তু কাম ও রতি, স্বর্গ ছাড়িতে পারে নাই—তাহারা বৃত্র এবং মহিষীর পরিচর্য্যায় নিযুক্ত। নহিলে অসুরলব্ধ স্বর্গের প্রকৃতি ভ্রংশ হয়! দূরদর্শী কবি এটুকু ভুলেন নাই। বৃত্রের আজ্ঞানুসারে, কাম শচীর সন্ধান বলিয়া দিয়াছিলেন। শচী, এক দেবী মাত্র সঙ্গে লইয়া পৃথিবীতলে নৈমিষারণ্যে বিচরণ করিতেছেন। বৃত্র সভারূঢ় হইয়া আদেশ করিলেন যে, ভীষণ নামে পরাক্রান্ত অসুর তাঁহাকে আনয়ন জন্য প্রেরিত হউক। প্রথমে কৌশল, কৌশলে না পারে বলে আনিবে। এদিকে সূর্য্যাদি দেবগণ মন্ত্রণানুসারে স্বর্গ নিরোধ করিতে আসিতেছিলেন। বৃত্র সেই সম্বাদ পাইলেন। বৃত্রাসুর সে কথায় বিশ্বাস করিলেন না,—তখন প্রধান রক্ষক, যেরূপ লক্ষণ দেখিয়া দেবাগমন অনুমান করিয়াছিল, তাহা নিবেদন করিল। সে কয় পংক্তি অমূল্য রত্ন—

কহিলা রক্ষক দৈত্য "শুন, দৈত্যনাথ,
ত্রিযাম রজনী যবে, হেরি অকস্মাৎ
দিকে দিকে চারিধারে ঈষৎ প্রকাশ,

জ্যোতির্ম্ময় দেহ যেন উজলে আকাশ ;
নক্ষত্র উল্কার জ্যোতি নহে সে আকার ;
জানি ভাল দেব-অঙ্গে জ্যোতি যে প্রকার ;
ভ্রম না হইল কভু ক্ষণকাল তায়,
চিনিলাম দেব-অঙ্গ-জ্যোতি সে শোভায় ;
ফুটিতে লাগিল ক্রমে ক্রমে দশদিশে,
যতক্ষণ অন্ধকার অংশুতে না মিশে ;
দেখিলাম কত হেন সংখ্যা নাহি তার,
উঠিছে আকাশপ্রান্তে ঘেরি চারি ধার ;
বহু দূরে এখন (ও) সে জ্যোতির উদয়—
দেবতা তাহারা কিন্তু কহিনু নিশ্চয়।"

বৃত্রাসুরের সন্দেহভঞ্জন হইল, তখন যুদ্ধের উদ্যোগ হইতে লাগিল।

পরে চতুর্থ সর্গে, নৈমিষারণ্যে সুরেশ্বরী শচী, সখীর সঙ্গে কথোপকথন করিতেছেন। স্বর্গচ্যুতিদুঃখ সখীর কাছে বলিতেছেন। সে সখী, অন্য কেহ নহে—বিদ্যুৎ। বৃত্রনাশের জন্য বজ্র সৃষ্টি হয়—বজ্রের অগ্রে বিদ্যুতের অস্তিত্ব কল্পনা করিয়াছেন বলিয়া কবি, পাঠকদিগের নিকট কৈফিয়ত দিয়াছেন। দেখা যাইতেছে যে, কবি এই মহাকাব্য প্রণয়ন করিয়া আপনাকে বিপদ্‌গ্রস্ত মনে করিয়াছেন। তাঁহার মনে ছিল, কথাও অপ্রকৃত নহে—যে যাহারা তাঁহার কাব্য পড়িবে, তাহারা অধিকাংশই আধুনিক অর্দ্ধশিক্ষিত বাঙ্গালি—এবং তদপেক্ষা ঘোরতর মূর্খ সমালোচকেরা ইহা সমালোচনা করিবে। সুতরাং মূর্খ সম্প্রদায়ের ভয়ে ভীত হইয়া কথাটি বিনীতভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন। আমরা তাঁহার এ বিনয়ের প্রশংসা করিতে পারিলাম না। এ সময়ে ভবভূতির গর্ব্বোক্তি মনে পড়িল। যে এই মনোমোহিনী বিদ্যুৎ সৃষ্টির প্রশংসা না করিবে, সে তাঁহার এই মহাকাব্য পড়িবার যোগ্য নহে। যে গ্রন্থ পড়িবার যোগ্য নহে, তাহাকে বুঝাইবার প্রয়োজন নাই।

হেমবাবুর বিদ্যুৎ অত্যন্ত মনোমোহিনী, সুসঙ্গতা, এবং যথাস্থানে সন্নিবেশিতা। আমরা বলিতে পারি না, কবির কি অভিপ্রায়, কিন্তু আমাদিগের এমন একটু ভরসা আছে যে বজ্র সৃষ্ট হইলে; কাব্যমধ্যে সুন্দরী চঞ্চলা এবং মহাবীর বজ্রের পরিণয় দেখিতে পাইব—চির-প্রথিত রূপ ও বলের সংযোগ—বাহ্য প্রকৃতির চরমোৎকর্ষ, বাঙ্গালার কবির গানে গীত হইবে। আমাদিগের এ সাধ কি পূরিবে ?

চঞ্চলার নিকটে শচীর বিলাপ, অতি মধুর অতি সকরুণ। ঐন্দ্রিলার বাক্যে যে মানুষিকতা দোষ লক্ষিত হইয়াছে, ইহাতে সে দোষ নাই ; ইহা সম্পূর্ণরূপে দেবীর যোগ্য। বোধ হয় এই প্রভেদ, কবির অভিপ্রেত। দেবীদ্বয়ে প্রভেদ

অবশ্য রক্ষণীয়। তথাপি দৈত্যের দৈত্যত্ব থাকা আবশ্যক। অন্যত্র তাহা আছে। এই শচীবিলাপ হইতে, উদাহরণস্বরূপ আমরা কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি—

স্বপনে যদ্যপি ছাই, সে কথা ভুলিতে চাই,
দেবেরে স্বপন নাহি আসে!
জাগ্রতে সে দেখি যাহা, চিত্ত দগ্ধ করে তাহা,
প্রাণে যেন মরীচিকা ভাসে!
নয়নের কাছে কাছে, সতত বেড়ায় নাচে,
স্বরগের মনোহর কায়া।
সকলি তেমতি ভাব, দৃষ্টিপথে আবির্ভাব,
কিন্তু জানি সকলি সে ছায়া!
ভ্রান্তি যদি হৈত কভু, কিছুক্ষণ সুখে তবু,
থাকিতাম যাতনা ভুলিয়া।
হায় এ মাটীর ক্ষিতি, পায়ে বাজে নিতিনিতি
শিলা যেন কঠোর কর্কশ!
শুনিতে না পাই তান, শব্দ যেন সর্ব্বকাল,
কর্ণমূলে ঝটিকা পরশ!
এ ক্ষুদ্র ক্ষিতিতে থাকি, কেমনে শরীর রাখি,
সখিরে সকলি হেথা স্থূল!
নিত্য এ পর্ব্বতাক্রান, আকুল করে পরাণ,
কেমনে সে বাঁচে নর-কুল!
অমর—মরণ নাই, কত কাল ভাবি তাই,
এত কষ্টে এখানে থাকিব।
যখনি ভাবি লো সই, তখনি তাপিত হই,
চিরদিন কেমনে সহিব॥
অনন্ত যৌবন লৈয়ে, ইন্দ্রের বনিতা হৈয়ে,
ভোগ করি স্বর্গবাস সুখ।
কিরূপে থাকিব হেথা, হইয়া অনন্তচেতা,
নরলোকে সহিয়া এ দুখ॥

এই কাব্যে হেমবাবু একটি অসাধারণ ক্ষমতা দেখাইয়াছেন—অতি অল্প কথায়, অতিশয় সম্পূর্ণ এবং উজ্জ্বল চিত্র সমাপন করিতে পারেন; শ্রেষ্ঠ কবিমাত্রেই এই ক্ষমতার অধিকারী। শচীবিলাপ হইতে আমরা একটি উদাহরণ প্রযুক্ত করিতেছি—

কেমনে ভুলিব বল, মেঘে যবে আখণ্ডল,
বসিত কার্ম্মুক ধরি করে;

তুই সে মেঘের অঙ্গে,　　খেলাতিস্ কত রঙ্গে,
ঘটা করি লহরে লহরে!
কি শোভা হইত তবে,　　বসিতাম কি গৌরবে,
পার্শ্বে তাঁর নীরদ আসনে!
হইত কি ঘন ঘন,　　মৃদু মন্দ গরজন,
মেঘে যবে দুলাত পবনে!

কামদেব, প্রভুর আজ্ঞায় শচীর সন্ধান বলিয়া দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু কামদেব শচীর নিকট নিতান্ত বিশ্বাসঘাতক নহেন। শচী ধরিবার ব্যবস্থা শুনিয়া ভীত হইয়া, নৈমিষারণ্যে সম্বাদ দিতে আসিলেন। তখন কবি, অকস্মাৎ প্রথম শ্রেণীর নাটককারের ক্ষমতা প্রকাশ করিতেছেন। স্বদলত্যাগী অসুরদাস কামদেবকে দেখিয়া দেবীদ্বয় ব্যঙ্গ করিতে লাগিলেন। চপলার ব্যঙ্গ তৎস্বভাবানুযায়ী, স্পষ্ট স্পষ্ট, উগ্র, তপ্ত এবং চাপল্যব্যঞ্জক, যথা—

শুনি নাকি মাল্যকার,　　হৈয়ে এবে আছ, মার!
ঐন্দ্রিলার উদ্যান সাজাও?
নিজ করে গাঁথ মালা,　　সাজাতে দানববালা,
মালা গাঁথি অসুরে পরাও?
এত গুণপনা তব,　　জানিলে হে মনোভব,
নিত্য গাঁথাতাম পুষ্পহার।
থাকিতে সে অন্তমনে,　　ত্যজি পুষ্পশরাসনে,
ত্রিভুবন পাইত নিস্তার॥
বড় আগে হেলি হেলি,　　পুষ্পধনু পৃষ্ঠে ফেলি
বেড়াইতে মনোহর বেশে।
ত্যক্ত করি বারে বারে,　　সর্ব্বলোকে সবাকারে
শুন কাম এই তার শেষে॥

শচীর ব্যঙ্গও শচীর যোগ্য, গম্ভীর এবং গূঢ়ার্থ। যথা—

শচী কহে চপলারে,　　"গঞ্জনা দিওনা মারে,
সুখে আছে সুখে থাক কাম,
এ পীড়া হৃদয়ে ধরি,　　স্বর্গপুরী পরিহরি,
পুরাইত কিবা মনস্কাম?
ভাবনা যাতনা নাই,　　সদা সুখী সর্ব্বঠাঁই,
চিরজীবী হ(উ)ক সেইজন॥
রতির কপাল ভাল,　　সুখে আছে চিরকাল,
সহে না সে এ পোড়া যাতন।

প্রহ্লাদ, কৌশল কিবা, আমারে শিখায়ে দিলা
সদা সুখ চিত্তে কিসে হয় ;
কিরূপে তুলিব সব, তুমি যথা মনোভব,
নিত্য সুখী নিত্য হাস্যময় ?”

কন্দর্পের উত্তর সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট—

কন্দর্প অপাঙ্গ ঠারে, শাসাইয়া চপলারে,
সগৌরবে শচী প্রতি কয়।—
“সুখদুখ ইন্দ্রপ্রিয়া, সকলি বাসনা নিয়া,
প্রকৃতির আয়ত্ত সে নয়।
ছাড়িয়া নন্দন-বনে, কোথায় সে ত্রিভুবনে
জুড়াইবে কন্দর্পের প্রাণ।
কামের বাঞ্ছিত যাহা, নন্দন ভিতরে তাহা
না পাইব গিয়া অন্যস্থান॥
সেবি সে অমৃত নর, কিবা দেবী কি অমর,
তাই স্বর্গ না পারি ছাড়িতে।
যার যেথা ভালবাসা, তার সেথা চিরবাসা
সুখ দুখ মনের খনিতে॥”

কন্দর্প বৃত্রকৃত শচীহরণের পরামর্শ বলিয়া দিলেন। শুনিয়া শচী প্রথমে স্তম্ভিত হইয়া, পরে রোদন করিতে লাগিলেন। শেষে নিরুপায় হইয়া তপঃস্থিত ইন্দ্রের অভাবে পুত্র জয়ন্তকে স্মরণ করিলেন।

পরে পঞ্চমসর্গে জয়ন্তের আগমনে বিলম্ব দেখিয়া চপলা ইন্দ্রাণীকে বৈকুণ্ঠে বা কৈলাসে বা ব্রহ্মালয়ে আশ্রয় লইতে পরামর্শ দিলেন। কিন্তু যিনি ইন্দ্রপত্নী সুরেশ্বরী তিনি বৈকুণ্ঠেও পরাশ্রয় গ্রহণ করিতে স্বীকার করিলেন না। তখন চপলা ছদ্মবেশ গ্রহণের পরামর্শ দিলেন। শচীর উত্তর পাঠে সকলেরই আনন্দ জন্মিবে।—

“শুনলো চপলা।
শচী কভু নাহি জানে কুহকীর ছলা॥
চিরদিন যেইরূপ জানে সর্ব্বজন,
সহচরি, সেইরূপ শচীর (ও) এখন।
আসিছে দংশিতে ফণী, করুক দংশন—
নিজরূপ, সখি, নাহি ত্যজিব কখন।”
বলিতে বলিতে আস্যে হইল প্রকাশ
অপূর্ব্ব গরিমা-ছটা কিরণ আভাস।

নয়ন, ললাট, গণ্ড হৈল জ্যোতির্ম্ময়—
সৃষ্টির সৃজনে যেন নব সূর্য্যোদয়!
ঘোর স্নিগ্ধ প্রচণ্ড উদার সেই ভাল,
হেরে স্তব্ধ হয় সেই, সে নেত্র বদন।

দেখিয়া চপলার বড় আনন্দ হইল। চপলা তখন সেই মূর্ত্তির শোভনোপযোগী মায়াবন সৃষ্টি করিলেন—

মোহিনী-মোহকর মহীরুহ-রাজি
প্রকাশিল সুন্দর কিসলয়ে সাজি।
ধাইল সমীরণ মলয় সুগন্ধি;
চুম্বে বন বন কুসুম আনন্দি।
কাঁপিল ঝরঝর তরুশিরে সাধে,
শিহরিত পল্লব মর মর নাদে।
হাসিল ফুলকুল মঞ্জুলমঞ্জুল,
মোদিত মৃদুবাসে উপবন ফুল্ল।
কোকিল হরষিল কুহুরবে কুঞ্জ;
শোভিল সরোবরে সরোজিনীপুঞ্জ।
নাচিল চিত্তসুখে ময়ূর কুরঙ্গ;
গুঞ্জরে ঘন ঘন মধুপানে ভৃঙ্গ।
সুন্দর শতদল প্রিয়তর আভা—
সুরূপ অরুণ, অরুণ শশিশোভা,—
শোভিল শুভক্ষণ বন জল অঙ্গে;-
বিরচিলা হ্লাদিনী মায়াবন রঙ্গে।

পরে জয়ন্ত আসিয়া উপস্থিত হইলেন; মাতা পুত্রে অনেক সস্নেহ এবং সকরুণ কথোপকথন হইল এবং জয়ন্ত সবিশেষ বৃত্তান্ত শুনিলেন। এদিকে চপলা নন্দনতুল্য বনবিকাশ করিয়া আনন্দে ভ্রমণ করিতেছিলেন, এমত সময়ে দূতসহ ভীষণ সেই স্থলে উপস্থিত।—তাহারা মর্ত্ত্যে নন্দন-শোভা দেখিয়া বিস্মিত হইল। চপলাকে দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল। পরে যাহা ঘটিল তাহা গ্রন্থকারের মুখে শুনিতে হইবে—

চপলা কহিলা "কেন, কিসের কারণ
নৈমিষ অরণ্য দোঁহে কর অন্বেষণ?
এই সে নৈমিষ, আমি নিবসি এখানে;
প্রকাশিয়া বল শুনি কি বাসনা প্রাণে?
দিব ইচ্ছা যাহা তব, এ বন আমার—
দেখ অরণ্যেরে কৈনু নন্দন আকার।
বল আগে, কার দূত পুরুষ কি নারী?
পার কি চিনিতে, বুঝি আমি যেন পারি।
হাতে দেখি পারিজাত, না হবে মানব—
হায় রে সে স্বর্গ, যথা অমর বৈভব!"
ভাবিল ভীষণ, তবে হবে এই শচী
নিবারিতে ক্লেশ মর্ত্তে আছে স্বর্গ রচি।
প্রফুল্ল পরাণে কহে "ধর এই ফুল—
পাছে নাহি মান, চিহ্ন আনিয়াছি তুল;
দেব-দূত আমি, দেবি, ইন্দ্রের প্রেরিত,
তুমি সুরেশ্বরী শচী ভুবনে বিদিত।
যুদ্ধে জয়, অমরের স্বর্গ অধিকার;
তিরস্কৃত দৈত্যকুল তাড়িত আবার;
স্বর্গ এবে শান্ত পুনঃ, তাই সুরপতি
পাঠাইলা, লৈতে তোমা আপন বসতি।"
ঈষৎ হাসিয়া তাহে চপলা কহিলা,
"আমায়, সন্দেশবহ চিনিতে নারিলা।
পেয়েছ দূতের পদ, শিখ নাহি ভাল—
ইন্দ্রের দূতত্বপদ বড়ই জঞ্জাল।
শিখাব উত্তম রূপে পাই সে সময়,
তুমি দূত, আমি দূতী জানিহ নিশ্চয়।'
পুরাতনে প্রয়োজন নহিলে কি এত?
নূতনে নূতন জ্বালা, বুঝে না সঙ্কেত।"
শিব! বলি, দূতবেশী কহে দৈত্যচর
"চিনেছি, চিনেছি—ভ্রান্তি নাহি অতঃপর—
শচী-সহচরী তুমি বিষ্ণুর মহিলা"—
"আবার ভুলিলা দূত" চপলা কহিলা;

"থাক্ থাক্, আর কেন দেও পরিচয়—
মূর্খের অশেষ দোষ, কহিনু নিশ্চয়;
অহে দূত, বুঝা গেছে তব গুণপনা—
নারী চেনা, মণি চেনা দুর্ঘট ঘটনা!

নহি হরিপ্রিয়া আমি বৈকুণ্ঠী কমলা;
শুন দূত শচীদূতী আমি সে চপলা।
আশা করি আসিয়াছ ইন্দ্রের আদেশে,
না হবে নৈরাশ, ভাগ্যে ঘটে যাহা শেষে।"

চপলা অকুতোভয়ে দৈত্যদ্বয়কে শচী সমীপে লইয়া গেলেন। দৈত্যদ্বয় সেই প্রশান্ত গম্ভীর তেজোময় আকার দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া রহিল। এমন সময়ে জয়ন্ত তাহাদিগকে দেখিতে পাইয়া দ্রুত আসিয়া ভীষণের মুণ্ডচ্ছেদ করিলেন।

ষষ্ঠ সর্গে দেবগণ স্বর্গ নিরোধ করিয়াছে। দেবদৈত্যের সেই যুদ্ধ বর্ণনা বাঙ্গালাভাষায় অতুল্য; মেঘনাদ-বধে ইহার তুল্য যুদ্ধ বর্ণনা কোথাও আছে আমাদিগের স্মরণ হয় না। এ বর্ণনা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবিদিগের যোগ্য। উদ্ধৃত করিতেছি।—

বেষ্টিয়াছে ইন্দ্রপুরী দেব-অনীকিনী;
চৌদিকে বিস্তৃত যেন সাগর-সিকতা,
যোজন যোজন ব্যাপ্ত, প্রদীপ্ত ভাস্বতে—
দেবকুল সেইরূপ দিক্ আচ্ছাদিয়া।

দূরস্থিত, সন্নিহিত, যত শৈলরাজি,
অস্তোদয়-গিরিশৃঙ্গ, প্রভায় উজ্জ্বল,
অনন্তের সন্নিধানে নক্ষত্র বা যথা
বিস্তীর্ণ হইয়া দীপ্তি ধরে চতুর্দ্দিকে।

প্রাচীরে প্রাচীরে দৈত্য ভীষণদর্শন—
পাষাণ-সদৃশ-বপুঃ দীর্ঘ, উরস্বান্—
নানা অস্ত্র ধরি নিত্য করে পরিক্রম,
ভীম দর্পে, ভীম তেজে, গর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া।

জাগ্রত, নিঃশঙ্ক সদা যুদ্ধের সজ্জায়,
ক্রমে দৈত্য বর্ম্মে বর্ম্মে, স্বর্গ আন্দোলিয়া,
আচ্ছাদি সুমেরু-অঙ্গ, বৈজয়ন্ত ঢাকি,
ঘোর শব্দ, সিংহনাদে, অম্বর বিদারি।

অস্ত্রবৃষ্টি শৈলবৃষ্টি, প্রতি অহরহঃ,
অনন্ত আকুল করি উভয় সৈন্যেতে;
রাত্রিদিবা যেন শূন্যে নিয়ত বর্ষণ
বিদ্যুত-মিশ্রিত শিলা দিগে দিগে ব্যাপি।

ত্রিদশ আলয়ে যেন অমর দানবে
জ্বলিছে সমরবহ্নি নিত্য অহরহঃ;
বেষ্টিত অমরাবতী দেব-সৈন্যদলে,
সুদৃঢ়সঙ্কল্প উভ দেবতা দনুজে।

অর্ণবের ঊর্ম্মিরাশি যথা প্রবাহিত
অহর্নিশি অনুক্ষণ, বিরত-বিশ্রাম;
স্রোতস্বতী বিধাবিত নিয়ত যদ্রূপ
ধারা প্রসারিয়া সদা সিন্ধু-অভিমুখে;

অথবা সে শূন্যে যথা আহ্নিক গতিতে
ভ্রমে নিত্য ভূমণ্ডল পল অনুপল;
কিম্বা নিরন্তর যথা অবিচ্ছেদ-গতি
অনন্ত তরঙ্গ চলে কালের প্রবাহে;

সেইরূপ অবিশ্রাম দানব-অমরে
হয় যুদ্ধ অহরহঃ স্বর্গ-বহির্দ্দেশে;
জয়, পরাজয়, নিত্য নিত্য অনিশ্চয়—
দৈত্যের বিজয় কভু, কখন ত্রিদশে।

বিরক্ত হইয়া দৈত্যপতি যোদ্ধৃবর্গকে তিরস্কৃত করিতে লাগিলেন এবং স্বয়ং যুদ্ধে যাইবেন বলিয়া শিবদত্ত ত্রিশূল আনিতে আজ্ঞা দিলেন। দেখিয়া বৃত্রপুত্র যুবা বীর রুদ্রপীড় তাঁহাকে ক্ষান্ত করিয়া স্বয়ং যুদ্ধে যাইতে অনুমতি প্রার্থনা করিলেন।—

বীরের সর্ব্বই যশঃ যশ (ই) সে জীবন।
সে যশে কিরীট আজি বান্ধিব শিরসে॥

বৃত্রের উত্তরে যে বীরবাক্য আছে তাহাও উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

"তবে যে বৃত্রের চিত্তে সমরের সাধ
অদ্যাপি প্রবল এত, হেতু সে তাহার
যশোলিপ্সা নহে, পুত্র, অন্য সে লালসা,
নারি ব্যক্ত করিবারে বাক্যে বিন্যাসিয়া!
"অনন্ততরঙ্গময় সাগর-গর্জ্জন,
বেলাগর্ভে দাঁড়াইলে, যথা সুখময়;
গভীর শর্ব্বরীযোগে গাঢ় ঘনঘটা
বিদ্যুতে বিদীর্ণ হয়, দেখিলে যে সুখ;—
"কিম্বা সে গঙ্গোত্রী পার্শ্বে একাকী দাঁড়ায়ে
নিরখি যখন অম্বুরাশি ঘোর নাদে
পড়িছে পর্ব্বতশৃঙ্গ স্রোতে বিলুণ্ঠিয়া,
ধরাধর ধরাতল করিয়া কম্পিত!
"তখন অন্তরে যথা, শরীর পুলকি,
দুর্জ্জয় উৎসাহে হয় সুখ বিমিশ্রিত;
সমর-তরঙ্গে পশি, খেলি যদি সদা,
সেই সুখে চিত্তে মম হয় রে উত্থিত।
"সেই সুখ, সে উৎসাহ, হয় কত কাল!
না ধরি হৃদয়ে, জয় স্বর্গ যে অবধি,
চিত্তে অবসাদ সদা—কোথাও না পাই
দ্বিতীয় জগৎ যুদ্ধে পুরাইতে সাধ।
"নাহি স্থান ত্রিভুবনে জিনিতে সংগ্রামে,
ভাবিয়া বৃত্রের চিত্তে পড়িয়াছে মলা;
দেখ এ ত্রিশূল অগ্রে পড়িয়াছে যথা
সমর-বিরতি চিহ্ন, কলঙ্ক গভীর!

এমত সময়ে দূত আসিয়া ভীষণের বধবার্ত্তা জ্ঞাপন করিল। তখন রুষ্ট দৈত্যপতি পুত্রকে শচী আনয়নে যাত্রা করিতে আদেশ করিলেন। মন্ত্রী নিষেধ করিল। স্বর্গদ্বারে দেবগণ যুদ্ধ করিতেছে; কুমার কি প্রকারে সে ব্যূহভেদ করিয়া গমন করিবেন? নির্গমন করিলেই বা কি প্রকারে আবার পুরী প্রবেশ করিবেন? বৃত্র পুত্রের সঙ্গে শত যোদ্ধা ও তাঁহার হস্তে শিবত্রিশূল দিতে চাহিলেন। মন্ত্রী বলিল, শূল না থাকিলে পুরী রক্ষা শঙ্কট হইবে; তখন—

ভ্রূকুটি করিয়া তবে ললাট প্রদেশে
স্থাপিয়া অঙ্গুলিদ্বয়, গর্ব্ব প্রকাশিয়া,
কহিলা দানবপতি—"সুমিত্র, হে এই—
এই ভাগ্য যত দিন থাকিবে বৃত্রের,
"জগতে কাহার সাধ্য নাহি সে আমায়
সমরে পরাস্ত করে—কিম্বা অকুশল;
অনুকূল ভাগ্য যার অসাধ্য কি তার—
ধর রে ত্রিশূল, পুত্র, বীর রুদ্রপীড়।"

রুদ্রপীড় ত্রিশূল লইল না। শত যোদ্ধা লইয়া শচীহরণে চলিল। এবং প্রতারণা দ্বারা দেবসৈন্য হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া মর্ত্ত্যে গমন করিল।

আমরা ছয় সর্গের বৃত্তান্ত লিখিলাম। আর চারি সর্গ বাকি আছে। আগামী সংখ্যায় তৎসমালোচনে প্রবৃত্ত হইব।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা

(সম্পাদকীয় উক্তি)

বহুসংখ্যক গ্রন্থ আমাদিগের নিকট অসমালোচিত রহিয়াছে। গ্রন্থকারগণও ব্যস্ত হইয়াছেন। কেন সে-সকল গ্রন্থ এপর্য্যন্ত সমালোচিত হয় নাই, তাহা যে বুঝে না, তাহাকে বুঝান দায়। বুঝাইতেও আমরা বাধ্য কি না তদ্বিষয়ে সন্দেহ। কিছু বুঝাইলেও ক্ষতি নাই। প্রথম, স্থানাভাব। বঙ্গদর্শনের আকার ক্ষুদ্র; অন্যান্য বিষয়ের সন্নিবেশের পরে প্রায় স্থান থাকে না। দ্বিতীয় অনবকাশ। আজি কালি বাঙ্গালা ছাপাখানা ছারপোকার সঙ্গে তুলনীয় হইয়াছে; উভয়ের অপত্য বৃদ্ধির সীমা নাই, এবং উভয়েরই সন্তানসন্ততি কদর্য্য এবং ঘৃণাজনক। যেখানে ছারপোকার দৌরাত্ম্য সেখানে কেহ ছারপোকা মারিয়া নিঃশেষ করিতে পারে না; আর যেখানে বাঙ্গালা গ্রন্থ সমালোচনার জন্য প্রেরিত হয়, সেখানে তাহা পড়িয়া কেহ শেষ করিতে পারে না। আমরা যত গ্রন্থ সমালোচনার জন্য প্রাপ্ত হইয়া থাকি, তাহা সকল পাঠান্তর সমালোচনা করা যায়, এত অবকাশ নিষ্কর্ম্মা লোকের থাকিতে পারে, কিন্তু বঙ্গদর্শনলেখকদিগের কাহারও নাই। থাকিবার সম্ভাবনাও নাই। থাকিলেও, বাঙ্গালা গ্রন্থমাত্র পাঠ করা যে যন্ত্রণা, তাহা সহ্য করিতে কেহই পারে না। "বৃত্রসংহার" বা "কল্পতরু" বা তদ্বৎ অন্যান্য বাঙ্গালা গ্রন্থ পাঠ করা সুখের বটে, কিন্তু অধিকাংশ বাঙ্গালা গ্রন্থ পাঠ করা এরূপ গুরুতর যন্ত্রণা যে, তাহার অপেক্ষা অধিকতর দণ্ড কিছুই আমাদের আর স্মরণ হয় না।

অনেকে বলিতে পারেন, যদি তোমাদিগের এ অবকাশ বা ধৈর্য্য নাই, তবে এ কাজে ব্রতী হইয়াছিলে কেন? ইহাতে আমাদিগের এই উত্তর যে, আমরা বিশেষ না জানিয়া এ দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি। আর করিব না। বঙ্গদর্শনে যাহাতে সংক্ষিপ্ত সমালোচনা আর না প্রকাশ হয় এমত চেষ্টা করিব।

আমাদের স্থূল বক্তব্য এই যে, আমাদের নিকট যে সকল গ্রন্থ এক্ষণে অসমালোচিত আছে বা যাহা ভবিষ্যতে প্রাপ্ত হইব, তৎসম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত সমালোচনা আর বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইবে না। কোন কোন গ্রন্থের সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্ব প্রথানুসারে সবিস্তারে সমালোচনা করিব।

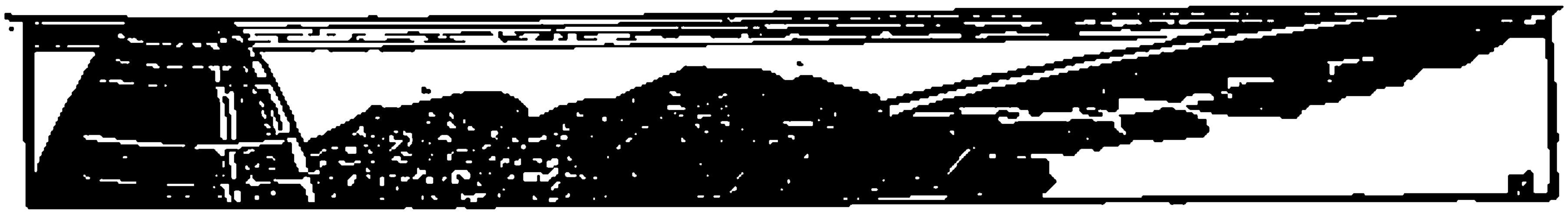

কমলাকান্তের দপ্তর

একটী গীত

"শোন্ প্রসন্ন, তোকে একটী গীত শুনাইব।"

প্রসন্ন গোয়ালিনী বলিল, "আমার এখন গান শুনিবার সময় নয়—দুধ যোগাবার বেলা হলো।"

কমলাকান্ত। "এসো এসো বঁধু এসো"—

প্রসন্ন। "ছি ছি ছি! আমি কি তোমার বঁধু?"

কমলাকান্ত—"বালাই! ষাট, তুমি কেন বঁধু হইতে যাইবে? আমার গীতে আছে—

এসো এসো বঁধু এসো—আধ আঁচরে বসো—

সুর করিয়া আমি কীর্ত্তন ধরাতে প্রসন্ন দুধের কেঁড়ে রাখিয়া বসিল, আমি গীতটি আদ্যোপান্ত গায়িলাম।—

"এসো এসো বঁধু এসো, আধ আঁচরে বসো
নয়ন ভরিয়ে তোমায় দেখি।
অনেক দিবসে, মনের মানসে
তোমাধনে মিলাইল বিধি।
মণি নও মাণিক নও
যে হার করে গলে পরি,
ফুল নও যে কেশের করি বেশ।
নারী না করিত বিধি, তোমা হেন গুণনিধি,
লইয়া ফিরিতাম দেশে দেশ।
বঁধু তোমায় যখন পড়ে মনে,
আমি চাই বৃন্দাবন পানে
আলুইলে কেশ নাহি বাঁধি।

রন্ধনশালাতে যাই, তুয়া বঁধু গুণ গাই,
ধুঁয়ার ছলনা কোরে কাঁদি ॥”

মিল ত চমৎকার, “দেখি” আর “বিধি” মিলিল! কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায়, এইরূপ মোহমন্ত্র আর একটি শুনিব, মনে বড় সাধ রহিয়াছে। যখন এই গান প্রথম কর্ণ ভরিয়া শুনিয়াছিলাম, মনে হইয়াছিল, নীলাকাশতলে ক্ষুদ্র পক্ষী হইয়া এই গীত গাই—মনে হইয়াছিল, সেই বিচিত্র সৃষ্টিকুশলী কবি শ্রীমদ্ভাগবতকারের সৃষ্টি দৈববংশী লইয়া, মেঘের উপর যে বায়ুস্তর—শব্দশূন্য, দৃশ্যশূন্য, পৃথিবী যেখান হইতে দেখা যায় না, সেইখানে বসিয়া, সেই মুরলীতে, একা এই গীত গাই—এই গীত কখন ভুলিতে পারিলাম না; কখন ভুলিতে পারিব না।

এসো এসো বঁধু এসো—

লোকের মনে কি আছে বলিতে পারি না, কিন্তু আমি কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী, বুঝিতে পারি না যে, ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তিতে কিছু সুখ আছে। যে পশু ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তিজন্য পরসন্দর্শনের আকাঙ্ক্ষী, সে যেন কখন কমলাকান্ত শর্ম্মার দপ্তর মুক্তাবলী পড়িতে বসে না। আমি বিলাসপ্রিয়ের মুখে “এসো এসো বঁধু এসো” বুঝিতে পারি না। কিন্তু ইহা বুঝিতে পারি যে, মনুষ্য মনুষ্যের জন্য হইয়াছিল—এক হৃদয় অন্য হৃদয়ের জন্য হইয়াছিল—সেই হৃদয়ে হৃদয়ে সংঘাত, হৃদয়ে হৃদয়ে মিলন, ইহা মনুষ্য-জীবনের সুখ। ইহজন্মে মনুষ্য-হৃদয়ে একমাত্র তৃষা, অন্য হৃদয়ে কামনা। মনুষ্য-হৃদয় অনবরত হৃদয়ান্তরকে ডাকিতেছে, “এসো এসো বঁধু এসো।” ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবৃত্তি সকল শরীর রক্ষার্থ—মহতী প্রবৃত্তি সকলের উদ্দেশ্য, “এসো এসো বঁধু এসো।” তুমি চাকরি কর, খাইবার জন্য—কিন্তু যশের আকাঙ্ক্ষা কর, পরের অনুরাগ লাভ করিবার জন্য—জনসমাজের হৃদয়কে তোমার হৃদয়ের সঙ্গে মিশ্রিত করিবার জন্য। তুমি যে পরোপকার কর, সে পরের হৃদয়ের ক্লেশ আপন হৃদয়ে অনুভূত কর বলিয়া। তুমি যে রাগ কর, সে তোমার মনোমত কার্য্য হইল না বলিয়া, হৃদয় হৃদয়ে আসিল না বলিয়া। সর্ব্বত্র এই রব—“এসো এসো বঁধু এসো।” সর্ব্ব কর্ম্মের এই মন্ত্র, “এসো এসো বঁধু এসো।” জড় জগতের নিয়ম, আকর্ষণ। বৃহৎ গ্রহ, উপগ্রহকে ডাকিতেছে “এসো এসো বঁধু এসো।” সৌরপিণ্ড বৃহৎ গ্রহকে ডাকিতেছে, “এসো এসো বঁধু এসো।” জগৎ জগদন্তরকে ডাকিতেছে “এসো এসো বঁধু এসো।” পরমাণু পরমাণুকে অবিরত ডাকিতেছে—“এসো এসো বঁধু এসো।” জড়পিণ্ড সকল, গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু—সকলেই এই মোহমন্ত্রে বাঁধা পড়িয়া ঘুরিতেছে। প্রকৃতি পুরুষকে ডাকিতেছে “এসো এসো বঁধু এসো।” জগতের এই গম্ভীর অবিশ্রান্ত ধ্বনি—“এসো এসো বঁধু এসো।” কমলাকান্তের বঁধু কি আসিবে!

আধ আঁচরে বসো

এই তৃণশষ্পসমাচ্ছন্ন, কণ্টকাদিতে কর্কশ সংসারারণ্যে, হে বাঞ্ছিত! তোমাকে আর কি আসন দিব, আমার এই হৃদয়াবরণের অর্দ্ধেকে উপবেশন কর। তোমার দুঃখ, তোমার কুশ-কণ্টকাদি আচ্ছাদন জন্য আমি এই আপন অঙ্গ অনাবৃত করিতেছি—আমার আঁচরে বসো। যাহাতে আমার লজ্জারক্ষা, মানরক্ষা, যাহাতে আমার শোভা, হে মিলিত! তুমিও তাহার অর্দ্ধেক গ্রহণ কর—আধ আঁচরে বসো। হে পরের হৃদয়, হে সুন্দর, হে মনোরঞ্জন, হে সুখদ! কাছে এসো, আমাকে স্পর্শ কর, আমি তোমাতে সংলগ্ন হইব,—দূরে আসনগ্রহণ করিও না—এই আমার শরীরলগ্ন অঞ্চলার্দ্ধে বসো। হে কমলাকান্ত! হে দুর্বিনীত! হে আজন্মবিবাহশূন্য, তুমি এতদর্থে শান্তিপুরে কলকাদার আঁচলের আধখানা বুঝিও না। তুমি যে অঞ্চলার্দ্ধে বসিবে, তাহার তাঁতি আজিও জন্মে নাই। মনের নগ্নত্ব জ্ঞানবস্ত্রে আবৃত; অর্দ্ধেকে তোমার হৃদয় আবৃত রাখ, অর্দ্ধেকে বাঞ্ছিতকে বসাও। তুমি মূর্খ—তথাপি তোমার অপেক্ষা মূর্খ যদি কেহ থাকে তাহাকে ডাক—"এসো এসো বঁধু এসো—আধ আঁচরে বসো।"

নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখি

কেহ কখন দেখিয়াছে? তুমি অনেক ধন উপার্জ্জন করিয়াছ—কখন নয়ন ভরিয়া আত্মধন দেখিতে পাইয়াছ? তুমি যশস্বী হইবার জন্য প্রাণপাত করিয়াছ—কিন্তু আত্মযশোরাশি দেখিয়া কবে তোমার নয়ন ভরিয়াছে? রূপতৃষ্ণায় তুমি ইহজীবন অতিবাহিত করিলে—যেখানে ফুলটি ফুটে, ফলটি দোলে, যেখানে পাখীটি উড়ে, যেখানে মেঘ ছুটে, গিরিশৃঙ্গ উঠে, নদী বহে, জল ঝরে, তুমি সেইখানে রূপের অনুসন্ধানে ফিরিয়াছ—যেখানে বালক, প্রফুল্ল মুখমণ্ডল আন্দোলিত করিয়া হাসে, যেখানে যুবতী ব্রীড়াভরে ভাঙ্গা ভাঙ্গা হইয়া শঙ্কিতগমনে যায়, যেখানে প্রৌঢ়া নিতান্ত স্ফুটিত মধ্যাহ্ন পদ্মিনীবৎ অকাতরে রূপের বিকাশ করে, তুমি সেইখানেই রূপের সন্ধানে ফিরিয়াছ; কখন নয়ন ভরিয়া রূপ দেখিয়াছ? দেখ নাই কি যে, কুসুম দেখিতে দেখিতে শুকায়, ফল দেখিতে দেখিতে পাকে, খসে, পচে, গলে; পাখী উড়িয়া যায়, মেঘ চলিয়া যায়, গিরি ধূমে লুকায়, নদী শুকায়, চাঁদ ডুবে, নক্ষত্র নিবিয়া যায়? শিশুর হাসি রোগে হরণ করে, যুবতীর ব্রীড়া—কিসে না যায়? প্রৌঢ়া বয়সে শুকাইয়া যায়। ইহা সংসারের দুরদৃষ্ট—কেহ কিছু নয়ন ভরিয়া দেখিতে পায় না। অথবা এই সংসারের শুভাদৃষ্ট—কেহ কিছু নয়ন ভরিয়া দেখিতে পায় না। গতিই সংসারের সুখ—চাঞ্চল্যই সংসারের সৌন্দর্য্য। নয়ন ভরে না। সে নয়ন আমরা পাই নাই। পাইলে সংসার দুঃখময় হইত; পরিতৃপ্তি রাক্ষস আমাদের সকল সুখকে গ্রাস করিত।

কোন কারিগর অভিসন্ধি করিয়া এই পরিবর্তনশীল সংসার, আর এই অতৃপ্য নয়ন সৃজন করিয়াছিলেন কি না বলিতে পারি না; কিন্তু যদি কারিগরের কারিগরি থাকে, তবে কারিগরির উপর কারিগরি, এই বাসনা, নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখি। জগৎ পরিবর্তনশীল, নয়নও অতৃপ্য, অথচ বাসনা—নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখি।

হে রূপ! হে বাহ্য সৌন্দর্য্য! হে অন্তঃপ্রকৃতির সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট! কাছে আইস, নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখি। দূরে বসিলে দেখা হইবে না, কেননা দেখা কেবল নয়নে নহে। সংস্পর্শ বা নৈকট্য ব্যতীত মনের বৈদ্যুতী বহে না—আমরা সর্ব্ব শরীরে দেখিয়া থাকি। মনে হইতে মনে বৈদ্যুতী চলিলে তবে নয়ন ভরিবে। হায়! কিসেই বা নয়ন ভরিবে! নয়নে যে পলক আছে।

অনেক দিবসে, মনের মানসে
তোমা ধনে মিলাইল বিধি হে।

আমি কখন কখন মনে করিয়া থাকি, কেবল দুঃখের পরিমাণ জন্যই দয়া করিয়া বিধাতা দিবসের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। নহিলে কাল অপরিমেয়, মনুষ্য-দুঃখ অপরিমিত হইত। আমরা এখন বলিতে পারি যে আমি দুই দিন, দুই মাস, বা দুই বৎসর দুঃখ ভোগ করিতেছি; কিন্তু দিন রাত্রির পরিবর্ত্তন না থাকিলে, কালের পথচিহ্ন শূন্য হইলে, কে না বুঝিত যে আমি অনন্ত কাল দুঃখ ভোগ করিতেছি? আশা তাহা হইলে দাঁড়াইবার স্থল পাইত না—এতদিন পরে আবার দুঃখান্ত হইবে, একথা কেহ ভাবিতে পারিত না—বৃক্ষাদিশূন্য অনন্ত প্রান্তরবৎ জীবনের পথ অনুত্তীর্য্য হইত—জীবনযাত্রা দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণাস্বরূপ হইত। অতএব এই বৃহৎ জগৎকেন্দ্র সূর্য্যের পথ আমাদের সুখ দুঃখের মানদণ্ড। দিবস গণনায় সুখ আছে। সুখ আছে বলিয়াই দুঃখিজন দিবস গণিয়া থাকে। দিবসগণনা দুঃখ বিনোদন। কিন্তু এমন দুঃখীও আছে যে সে দিবস গণে না; দিবসগণনা তাহার পক্ষে চিত্তবিনোদন নহে। আমি কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী—পৃথিবীতে ভুলিয়া মনুষ্য-জন্ম গ্রহণ করিয়াছি—সুখহীন, আশাহীন, উদ্দেশ্যশূন্য, আকাঙ্ক্ষাশূন্য আমি কি জন্য দিবস গণিব? এই সংসার-সমুদ্রে আমি ভাসমান তৃণ, সংসার-বাত্যায় আমি ঘূর্ণ্যমান ধূলিকণা, সংসারারণ্যে আমি অফলন্ত বৃক্ষ—সংসারাকাশে আমি বারিশূন্য মেঘ, আমি কেন দিবস গণিব?

গণিব। আমার এক দুঃখ, এক সন্তাপ, এক ভরসা আছে। ১২০৩ শাল হইতে দিবস গণি। যে দিন বঙ্গে হিন্দুনাম লোপ পাইয়াছে, সেই দিন হইতে দিন গণি। যে দিন সপ্তদশ অশ্বারোহী বঙ্গজয় করিয়াছিল, সেই দিন হইতে দিন গণি। হায়! কত গণিব! দিন গণিতে গণিতে মাস হয়, মাস গণিতে গণিতে

বৎসর হয়, বৎসর গণিতে গণিতে শতাব্দী হয়, শতাব্দীও ফিরিয়া ফিরিয়া সাতবার গণি। কই, অনেক দিবসে মনের মানসে বিধি মিলাইল, কই ? যাহা চাই, তাহা মিলাইল কই ? মনুষ্যত্ব মিলিল কই ? একজাতীয়ত্ব মিলিল কই ? ঐক্য কই ? বিদ্যা কই ? গৌরব কই ? শ্রীহর্ষ কই ? ভট্টনারায়ণ কই ? হলায়ুধ কই ? লক্ষ্মণ সেন কই ? আর কি মিলিবে না ? হায়। সবারই ইপ্সিত মিলে, কমলাকান্তের কি মিলিবে না ?

মণি নও মাণিকও নও, যে হার করো গলে পরি—

বিধাতা জগৎ জড়ময় করিয়াছেন কেন ? রূপ জড়পদার্থ কেন ? সকলই অশরীরী হইল না কেন ? হইলে হৃদয়ে হৃদয়ে কেমন মিলিত ! যদি রূপের শরীরের প্রয়োজন ছিল, তবে তোমার আমার বিধাতা এক শরীর করেন নাই কেন ? তাহা হইলে আর ত বিচ্ছেদ হইত না। এখন কি এক শরীর হয় না ? আমার শরীরে এত স্থান আছে—তোমাকে তাহাতে কোথাও কি রাখিতে পারি না ? তোমাকে কণ্ঠলগ্ন করিয়া হৃদয়ে বিলম্বিত করিয়া রাখিতে পারি না ? হায় ! তুমি মণি নও, মাণিক নও, যে হার করিয়া গলে পরি।

আর বঙ্গভূমি ! তুমিই বা কেন মণি-মাণিক্য হইলে না, তোমায় কেন আমি হার করিয়া, কণ্ঠে পরিতে পাইলাম না ! তোমায় যদি কণ্ঠে পরিতাম, মুসলমান আমার হৃদয়ে পদাঘাত না করিলে তাহার পদরেণু তোমাকে স্পর্শ করিতে পারিত না। তোমায় সুবর্ণের আসনে বসাইয়া, হৃদয়ে দোলাইয়া দেশে দেশে দেখাইতাম। ইউরোপে, আমেরিকে, মিসরে, চীনে, দেখিত তুমি আমার কি উজ্জ্বল মণি !

আমার নারী না করিত বিধি
তোমা হেন গুণনিধি
লইয়া ফিরিতাম দেশে দেশ

প্রথমে আহ্বান "এসো এসো বঁধু এসো" পরে আদর "আধ আঁচরে বসো" পরে ভোগ "নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখি।" তখন সুখভোগ কালীন পূর্ব্ব দুঃখ স্মৃতি—"অনেক দিবসে মনের মানসে তোমাধনে মিলাইল বিধি।" সুখ দ্বিবিধ, সম্পূর্ণ এবং অসম্পূর্ণ। অসম্পূর্ণ সুখ যথা,—

মণি নও মাণিক নও, যে হার করে
গলে পরি।

পরে সম্পূর্ণ সুখ,—

নারী না করিত বিধি,
তোমা হেন গুণনিধি,
লইয়া ফিরিতাম দেশে দেশ।

সম্পূর্ণ, অসহ্য সুখের লক্ষণ, শারীরিক চাঞ্চল্য, মানসিক অস্থৈর্য্য। এসুখ কোথায় রাখিব, লইয়া কি করিব, আমি কোথায় যাইব, এ সুখের ভার লইয়া কোথায় ফেলিব ? এ সুখের ভার লইয়া আমি দেশে দেশে ফিরিব ; এ সুখ একস্থানে ধরে না ; যেখানে যেখানে পৃথিবীতে স্থান আছে, সেইখানে সেইখানে এ সুখ লইয়া যাইব, এ জগৎ সংসার এই সুখে পুরাইব। সংসার এ সুখের সাগরে ভাসাইব ; মেরু হইতে মেরু পর্য্যন্ত সুখের তরঙ্গ নাচাইব, আপনি ডুবিয়া, উঠিয়া, ভাসিয়া, হেলিয়া, ছুটিয়া বেড়াইব। এ সুখে কমলাকান্তের অধিকার নাই—এসুখে বাঙ্গালির অধিকার নাই। সুখের কথাতেই বাঙ্গালির অধিকার নাই। গোপীর দুঃখ, বিধাতা গোপীকে নারী করিয়াছেন কেন—আমাদের দুঃখ, বিধাতা আমাদের নারী করেন নাই কেন—তাহা হইলে এ মুখ দেখাইতে হইত না।

সুখের কথায় বাঙ্গালির অধিকার নাই—কিন্তু দুঃখের কথায় আছে। কাতরোক্তি যত গভীর, যতই হৃদয়বিদারক হউক না কেন, তাহা বাঙ্গালির মর্ম্মোক্তি। আর কাতরোক্তি কোথায় বা নাই ? নবপ্রসূত পক্ষিশাবক হইতে মহাদেবের শৃঙ্গধ্বনি পর্য্যন্ত সকলই কাতরোক্তি। সম্পূর্ণসুখে সুখীও সুখকালে পূর্ব্ব দুঃখ স্মরণ করিয়া কাতরোক্তি করে। নহিলে সুখের সম্পূর্ণতা কি ? দুঃখস্মৃতিব্যতীত সুখের সম্পূর্ণতা কোথায় ? সুখও দুঃখময়—

তোমায় যখন পড়ে মনে,
আমি চাই বৃন্দাবন পানে,
আলুইলে কেশ নাহি বাঁধি।

এই কথা সুখ দুঃখের সীমা রেখা ! যাহার নষ্ট সুখের স্মৃতি জাগরিত হইলে সুখের নিদর্শন এখনও দেখিতে পায়, সে এখনও সুখী—তাহার সুখ একেবারে লুপ্ত হয় নাই। তাহার বন্ধু, তাহার প্রিয়, বাঞ্ছিত গিয়াছে, কিন্তু তাহার বৃন্দাবন আছে—মনে করিলে সে সেই সুখভূমি পানে চাহিতে পারে। যাহার সুখ গিয়াছে, সুখের নিদর্শন গিয়াছে, বঁধু গিয়াছে বৃন্দাবনও গিয়াছে, এখন আর চাহিবার স্থান নাই—সেই দুঃখী, অনন্ত দুঃখে দুঃখী। বিধবা যুবতী, মৃত পতির যত্নরক্ষিত পাদুকা হারাইলে, যেমন দুঃখে দুঃখী হয়, তেমনই দুঃখে দুঃখী।

আমার এই বঙ্গদেশের সুখের স্মৃতি আছে—নিদর্শন কই ? দেবপালদেব, লক্ষ্মণসেন, জয়দেব, শ্রীহর্ষ—প্রয়াগ পর্য্যন্ত রাজ্য, ভারতের অধীশ্বর নাম, গৌড়ী রীতি, এ সকলের স্মৃতি আছে, কিন্তু নিদর্শন কই ? সুখ মনে পড়িল কিন্তু চাহিব কোন্ দিকে ? সে গৌড় কই ? সে যে কেবল যবনলাঞ্ছিত ভগ্নাবশেষ। আর্য্য রাজধানীর চিহ্ন কই ? আর্য্যের ইতিহাস কই ? জীবনচরিত কই ? কীর্ত্তি কই ? কীর্ত্তিস্তম্ভ কই ? সমরক্ষেত্র কই ? সুখ গিয়াছে—সুখ চিহ্নও গিয়াছে, বঁধু গিয়াছে, বৃন্দাবনও গিয়াছে—চাহিব কোন্ দিকে ?

চাহিবার এক শ্মশান-ভূমি আছে,—নবদ্বীপ। সেইখানে সপ্তদশ যবনে বঙ্গাধিকার করিয়াছিল। বঙ্গমাতাকে মনে পড়িলে, আমি সেই শ্মশান-ভূমি প্রতি চাই। যখন দেখি, সেই ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম বেড়িয়া অদ্যাপি সেই কলধৌত-বাহিনী গঙ্গা তর তর রব করিতেছেন, তখন গঙ্গাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করি—তুমি আছ, সে বঙ্গলক্ষ্মী কোথায়? তুমি যাঁহার পা ধুয়াইতে, সেই মাতা কোথায়? তুমি যাহাকে বেড়িয়া বেড়িয়া নাচিতে, সেই আনন্দরূপিণী কোথায়? তুমি যাঁহার জন্য সিংহল, বালী, আরব, সুমিত্রা হইতে বুকে করিয়া ধন বহন করিয়া আনিতে, সে ধনেশ্বরী কোথায়? তুমি যাহার রূপের ছায়া ধরিয়া রূপসী সাজিতে, সে অনন্তসৌন্দর্য্যশালিনী কোথায়? তুমি যাহার প্রসাদী ফুল লইয়া ঐ স্বচ্ছ হৃদয়ে মালা পরিতে, সে পুষ্পাভরণা কোথায়? সে রূপ, সে ঐশ্বর্য্য কোথায় ধুইয়া লইয়া গিয়াছ? বিশ্বাসঘাতিনি, তুমি কেন আবার শ্রবণমধুর কল কল তর তর রবে মন ভুলাইতেছ? বুঝি তোমারই অতল গর্ভমধ্যে, যবন-ভয়ে ভীতা সেই বঙ্গলক্ষ্মী ডুবিয়াছেন, বুঝি কুপুত্রগণের আর মুখ দেখিবেন না বলিয়া ডুবিয়া আছেন। মনে মনে আমি সেইদিন কল্পনা করিয়া কাঁদি। মনে মনে দেখিতে পাই, মার্জ্জিত বর্ষাফলক উন্নত করিয়া, অশ্বপদ শব্দ মাত্রেই নৈশ নীরব বিস্মিত করিয়া, যবনসেনা নবদ্বীপে আসিতেছে। কালপূর্ণ দেখিয়া নবদ্বীপ হইতে বঙ্গলক্ষ্মী অন্তর্হিতা হইতেছেন। সহসা আকাশ অন্ধকারে ব্যাপিল; রাজ-প্রাসাদের চূড়া ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। পথিক ভীত হইয়া পথ ছাড়িল; নাগরীর অলঙ্কার খসিয়া পড়িল; কুঞ্জবনে পক্ষিগণ নীরব হইল; গৃহময়ূরকণ্ঠে অর্দ্ধব্যক্ত কেকার অপরার্দ্ধ আর ফুটিল না। দিবসে নিশীথ উপস্থিত হইল, পণ্যবীথিকার দীপমালা নিবিয়া গেল, পূজাগৃহে বাজাইবার সময়ে শংখ বাজিল না; পণ্ডিতে অশুদ্ধ মন্ত্র পড়িল; সিংহাসন হইতে শালগ্রাম শিলা গড়াইয়া পড়িল। যুবার সহসা বলক্ষয় হইল; যুবতী সহসা বৈধব্য আশঙ্কা করিয়া কাঁদিল; শিশু বিনারোগে মাতার ক্রোড়ে শুইয়া মরিল। গাঢ়তর, গাঢ়তর, গাঢ়তর অন্ধকারে, দিক্ ব্যাপিল; আকাশ, অট্টালিকা, রাজধানী, রাজবর্ত্ম, দেবমন্দির, পণ্যবীথিকা, সেই অন্ধকারে ঢাকিল—কুঞ্জতীরভূমি, নদী, নদীসৈকত, নদীতরঙ্গ সেই অন্ধকারে—আঁধার, আঁধার, আঁধার হইয়া লুকাইল। আমি চক্ষে সব দেখিতেছি—আকাশে মেঘ ঢাকিতেছে—ঐ সোপানাবলী অবতরণ করিয়া রাজলক্ষ্মী জলে নামিতেছেন। অন্ধকারে নির্ব্বাণোন্মুখ আলোকবিন্দুবৎ, জলে, ক্রমে ক্রমে সেই তেজোরাশি বিলীন হইতেছে। যদি গঙ্গার অতলজলে না ডুবিলেন, তবে আমার সেই বঙ্গলক্ষ্মী কোথায় গেলেন—

যখন বন্দনশালাতে যাই, তুয়া মাতা গুণ গাই,
কাব্যের ছলনা করি কাঁদি।

জ্ঞান সম্বন্ধে দার্শনিক মত

ন্যায়দর্শনের সঙ্গে বাঙ্গালিমাত্রেরই একটি বিশেষ সম্বন্ধ আছে। যদি কেহ আমাদিগকে বলে যে, তোমরা এত বড়াই কর, কিন্তু কোন বিষয়ে তোমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা পৃথিবীবাসী অন্যান্য জাতির অপেক্ষা গৌরব লাভ করিয়াছিলেন, তাহা হইলে, আমরা আর কিছু বলিতে পারি বা না পারি, ন্যায়শাস্ত্রের উল্লেখ করিতে পারি। ইহাই বাঙ্গালিদিগের জাতীয় গৌরব। ভারতবর্ষীয় প্রত্নতত্ত্বের যতই গাঢ়তর অনুসন্ধান হইতেছে—ততই দেখা যাইতেছে যে, সাহিত্যে, দর্শনে, গণিতশাস্ত্রে—স্থাপত্যে, সঙ্গীতে, ব্যবস্থাশাস্ত্রে,—ঐশ্বর্য্যে, বাহুবলে—একদিন ভারতভূমি ভূমণ্ডলে রাজ্ঞীস্বরূপা ছিলেন। কিন্তু সে গৌরবে বঙ্গদেশের অংশ মগধ কান্যকুব্জাদির ন্যায় নহে। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য মধ্যমপ্রকার—জয়দেব গোস্বামী ইহার চূড়া। মানবাদি ধর্ম্মশাস্ত্র বঙ্গীয় নহে। যে স্থাপত্য জন্য ফর্গুসন সাহেব ভারতবর্ষীয়গণকে ভূমণ্ডলে অতুল্য বলিয়াছেন, বঙ্গদেশ অপেক্ষা ভারতবর্ষের অন্যান্যাংশে তাহা প্রচুরতর। যে সংগীতের জন্য সেদিন আলদিস্ সাহেব ভারতবর্ষকে পৃথিবীশ্বরী বলিয়াছেন, তাহার চালনা বঙ্গদেশে চিরকালই সামান্য প্রকার। আর্য্যভট্ট, ভাস্করাচার্য্য প্রভৃতি কেহই বাঙ্গালি নহে। কিন্তু ন্যায়শাস্ত্রে বাঙ্গালিরা অদ্বিতীয়। উদয়নাচার্য্য বোধ হয়, বাঙ্গালি। রঘুনাথ শিরোমণি, মথুরানাথ তর্কবাগীশ, ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ, কৃষ্ণদাস সার্ব্বভৌম, গদাধর তর্কালঙ্কার, জগদীশ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি বাঙ্গালি। গৌতম, কণাদ, কোন্ দেশবাসী তাহা নিশ্চিত করিবার কোন উপায় নাই—কিন্তু পরবর্ত্তী প্রধান নৈয়ায়িকদিগের মধ্যে অনেকেই বাঙ্গালি। নবদ্বীপে ন্যায়শাস্ত্র যেরূপ মার্জ্জিত এবং পরিপুষ্ট হইয়াছিল, এরূপ ভারতবর্ষের আর কোথাও হয় নাই। নবদ্বীপে, বাঙ্গালির প্রধান কীর্ত্তি ও অকীর্ত্তির জন্মভূমি। নবদ্বীপে ন্যায়শাস্ত্রের অভ্যুদয়,

---

ন্যায়পদার্থতত্ত্ব। বাঙ্গালা দর্শন। শ্রীহরিকিশোর তর্কবাগীশ প্রণীত। কলিকাতা। গিরিশ বিদ্যারত্ন ৫২।

নবদ্বীপে চৈতন্যদেবের অভ্যুদয়—নবদ্বীপে বৈষ্ণব সাহিত্যের আকর—কৃষ্ণচন্দ্রীয় সাহিত্যও নবদ্বীপের নামে খ্যাত—আর, নবদ্বীপেই সপ্তদশ পাঠান কৃত বঙ্গবিজয়।

অদ্যাপিও ভারতবর্ষে বঙ্গীয় নৈয়ায়িকদিগের বিশেষ খ্যাতি। যাহা আমাদিগের জাতীয় গৌরব, তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় গ্রহণ করা, বাঙ্গালি মাত্রেরই কর্ত্তব্য। শ্রীযুক্ত হরিকিশোর তর্কবাগীশ প্রণীত ন্যায়পদার্থতত্ত্ব নামক উৎকৃষ্ট গ্রন্থের দ্বারা সে-পথ অত্যন্ত সুগম হইয়াছে।

ন্যায়দর্শন কিসের নাম? এ কথার উত্তর দিতে হইলে, প্রথম বুঝিতে হয়, ভারতবর্ষে দর্শন কাহাকে বলে। প্রথমে বুঝিতে হইবে যে, ইউরোপে যে অর্থে “ফিলোসফি” শব্দ ব্যবহৃত হয়, দর্শন সে অর্থে ব্যবহৃত হয় না। বাস্তবিক ফিলসফি শব্দের অর্থের স্থিরতা নাই,—কখন ইহার অর্থ অধ্যাত্মতত্ত্ব, কখন ইহার অর্থ প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, কখন ইহার অর্থ ধর্ম্মনীতি, কখন ইহার অর্থ বিচারবিদ্যা। ইহার একটিও দর্শনের ব্যাখ্যার অনুরূপ নহে। ফিলসফির উদ্দেশ্য, জ্ঞানবিশেষ; তদতিরিক্ত অন্য উদ্দেশ্য নাই। দর্শনেরও উদ্দেশ্য জ্ঞান বটে কিন্তু সে জ্ঞানেরও উদ্দেশ্য আছে। সেই উদ্দেশ্য, নিঃশ্রেয়স, মুক্তি, নির্ব্বাণ বা তদ্বৎ নামান্তর বিশিষ্ট পারলৌকিক অবস্থা। ইউরোপীয় ফিলসফিতে জ্ঞানই সাধনীয়; দর্শনে জ্ঞান সাধন মাত্র। ইহা ভিন্ন আর একটি গুরুতর প্রভেদ আছে। ফিলসফির উদ্দেশ্য, জ্ঞানবিশেষে,—কখন আধ্যাত্মিক, কখন ভৌতিক, কখন নৈতিক বা সামাজিক জ্ঞান। কিন্তু সর্ব্বত্র পদার্থ মাত্রেরই জ্ঞান, দর্শনের উদ্দেশ্য—ফলতঃ সকল প্রকার জ্ঞানই দর্শনের অন্তর্গত।

জ্ঞানে নিঃশ্রেয়স লাভ, ইহা ইউরোপীয়দিগের পক্ষে নূতন কথা বটে এবং এদেশে প্রচলিত “ভক্তিতে মিলয়ে কৃষ্ণ, তর্কে বহুদূর” ইত্যাদি প্রবাদের বিপরীত। জ্ঞানবাদীদিগের বিরোধী ভক্তিবাদীও যে এদেশে ছিলেন না, এমত নহে। প্রধান ভক্তি সূত্রকার শাণ্ডিল্য এবং বৈষ্ণব ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠাতা চৈতন্যদেব।

সংসার দুঃখময়। প্রাকৃতিক বল, সর্ব্বদা মনুষ্য-সুখের প্রতিদ্বন্দ্বী। তুমি যাহা কিছু সুখভোগ কর, সে বাহ্য প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া লাভ কর। মনুষ্য-জীবন, প্রকৃতির সঙ্গে দীর্ঘ সমর মাত্র—যখন তুমি সমরজয়ী হইলে তখনই কিঞ্চিৎ সুখলাভ করিলে। কিন্তু মনুষ্য বল হইতে প্রাকৃতিক বল অনেক গুণে গুরুতর। অতএব মনুষ্যের জয় কদাচিৎ—প্রকৃতির জয়ই প্রতিনিয়ত ঘটিয়া থাকে। তবে জীবন যন্ত্রণাময়। আর্য্যমতে ইহার আবার পৌনঃপুন্য আছে। ইহজন্মে, অনন্তদুঃখ কোনরূপে কাটাইয়া প্রাকৃতিক রণে শেষে পরাস্ত হইয়া, যদি জীব দেহত্যাগ করিল—তথাপিও ক্ষমা নাই—আবার জন্মগ্রহণ করিতে হইবে, আবার

সেই অনন্ত দুঃখভোগ করিতে হইবে—আবার মরিতে হইবে, আবার জন্মিতে হইবে—আবার দুঃখ। এই অনন্ত দুঃখের কি নিবৃত্তি নাই? মনুষ্যের নিস্তার নাই?

ইহার দুই উত্তর আছে। এক উত্তর ইউরোপীয়, আর এক উত্তর ভারতবর্ষীয়। ইউরোপীয়েরা বলেন, প্রকৃতি জেয়; যাহাতে প্রকৃতিকে জয় করিতে পার সেই চেষ্টা দেখ। এই জীবন-রণে প্রকৃতিকে পরাস্ত করিবার জন্য আয়ুধ সংগ্রহ কর। সেই আয়ুধ, প্রকৃতিকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি নিজেই বলিয়া দিবেন। প্রাকৃতিক তত্ত্ব অধ্যয়ন কর—প্রকৃতির গুপ্ত তত্ত্বসকল অবগত হইয়া, তাহারই বলে তাহাকে বিজিত করিয়া, মনুষ্যজীবন সুখময় কর। এই উত্তরের ফল—ইউরোপীয় বিজ্ঞান শাস্ত্র।

ভারতবর্ষীয় উত্তর এই যে, প্রকৃতি অজেয়—যতদিন প্রকৃতির সঙ্গে সম্বন্ধ থাকিবে ততদিন দুঃখ থাকিবে। অতএব প্রকৃতির সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছেদই দুঃখ নিবারণের একমাত্র উপায়। সেই সম্বন্ধ বিচ্ছেদ কেবল জ্ঞানের দ্বারাই হইতে পারে। এই উত্তরের ফল ভারতবর্ষীয় দর্শন।

সেই জ্ঞান কি? আকাশ-কুসুম বলিলেও একটি জ্ঞান হয়—কেননা আকাশ কি তাহা আমরা জানি এবং কুসুম কি তাহাও জানি, মনের শক্তির দ্বারা উভয়ে সংযোগ করিতে পারি। কিন্তু সে জ্ঞান, দর্শনের উদ্দেশ্য নহে। তাহা ভ্রমজ্ঞান। যথার্থ জ্ঞানই দর্শনের উদ্দেশ্য। এই যথার্থ জ্ঞানকে প্রমাজ্ঞান বা প্রমা প্রতীতি বলে।

প্রমাজ্ঞানের বিষয় কি, তদ্বিষয়ে শ্রীযুক্ত হরিকিশোর তর্কবাগীশ মহাশয়ের গ্রন্থে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা অতি পরিষ্কার। কিন্তু জ্ঞানের মূল কি, তাহা সমালোচিত হয় নাই। ইউরোপীয় দার্শনিকদিগের মধ্যে, সেই তত্ত্বটি লইয়া ইদানীং অনেক তর্ক বিতর্ক হইয়াছে। অতএব আমরা তর্কবাগীশ মহাশয়ের পুস্তক পরিত্যাগ করিয়া তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ বলিব।

যাহা জানি, তাহাই জ্ঞান। যাহা জানি তাহা কি প্রকারে জানিয়াছি?

কতকগুলি বিষয় ইন্দ্রিয়ের সাক্ষাৎ সংযোগে জানিতে পারি। ঐ গৃহ, এই বৃক্ষ, ঐ নদী, এই পর্ব্বত, আমার সম্মুখে রহিয়াছে; তাহা আমি চক্ষে দেখিতে পাইতেছি, এজন্য জানি যে ঐ গ্রহ, এই বৃক্ষ, ঐ নদী, এই পর্ব্বত আছে। অতএব জ্ঞাতব্য পদার্থের সঙ্গে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সংযোগে আমাদিগের এই জ্ঞান লব্ধ হইল। (১) ইহাকে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ বলে। এইরূপ, গৃহমধ্যে থাকিয়া শুনিতে পাইলাম,

---

(১) গৃহ, পর্ব্বতাদি দূরে রহিয়াছে—আমাদিগের চক্ষে সংলগ্ন নহে, তবে ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হইল কি প্রকারে? দৃষ্ট পদার্থবিক্ষিপ্ত রশ্মির দ্বারা। ঐ রশ্মি আমাদিগের নয়নাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে দৃষ্টি হয়।

মেঘ গর্জ্জিতেছে, পক্ষী ডাকিতেছে; এখানে মেঘের ডাক, পক্ষীর রব আমরা কর্ণের দ্বারা প্রত্যক্ষ করিলাম। ইহা শ্রাবণ প্রত্যক্ষ। এইরূপ চাক্ষুষ, শ্রাবণ, ঘ্রাণজ, ত্বাচ, এবং রাসন, পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাধ্য পাঁচ প্রত্যক্ষ। মনও একটি ইন্দ্রিয় বলিয়া আর্য্য দার্শনিকেরা গণিয়া থাকেন, অতএব, তাঁহারা মানস প্রত্যক্ষের কথা বলেন। মন বহিরিন্দ্রিয় নহে। অন্তরিন্দ্রিয়ের সঙ্গে বহির্ব্বিষয়ের সাক্ষাৎ সংযোগ অসম্ভব। অতএব মানস প্রত্যক্ষে বহির্ব্বিষয় অবগত হওয়া যায় না; কিন্তু অন্তর্ব্বিষয় জ্ঞান, মানস প্রত্যক্ষের দ্বারাই হইবে।

যে পদার্থ প্রত্যক্ষ হয়, তদ্বিষয়ে আমাদিগের জ্ঞান জন্মে, এবং তদ্ব্যতিরিক্ত বিষয়ের জ্ঞানও সূচিত হয়। আমি রুদ্ধদ্বার গৃহমধ্যে শয়ন করিয়া আছি, এমত সময়ে মেঘের ধ্বনি শুনিলাম, ইহাতে শ্রাবণ প্রত্যক্ষ হইল। কিন্তু সে প্রত্যক্ষ ধ্বনির, মেঘের নহে। মেঘ এখানে আমাদের প্রত্যক্ষের বিষয় নহে। অথচ আমরা জানিতে পারিলাম যে আকাশে মেঘ আছে। ধ্বনির প্রত্যক্ষে মেঘের অস্তিত্ব জ্ঞান হইল কোথা হইতে? আমরা পূর্ব্বে পূর্ব্বে দেখিয়াছি, আকাশে মেঘ ব্যতীত কখন ঐরূপ ধ্বনি হয় নাই। এমন কখনও ঘটে নাই যে মেঘ নাই, অথচ ঐরূপ ধ্বনি শুনা গিয়াছে। অতএব রুদ্ধদ্বার গৃহমধ্যে থাকিয়াও আমরা বিনা প্রত্যক্ষে জানিলাম যে আকাশে মেঘ হইয়াছে। ইহাকে অনুমিতি বলে। মেঘধ্বনি, আমরা প্রত্যক্ষে জানিয়াছি, কিন্তু মেঘ অনুমিতির দ্বারা।

মনে কর, ঐ রুদ্ধদ্বার গৃহ অন্ধকার, এবং তুমি সেখানে একাকী আছ। এমত কালে তোমার দেহের সহিত মনুষ্য-শরীরের স্পর্শ অনুভূত করিলে। তুমি তখন কিছু না দেখিয়া, কোন শব্দও না শুনিয়া জানিতে পারিলে যে গৃহমধ্যে মনুষ্য আসিয়াছে। সেই স্পর্শজ্ঞান, ত্বাচ প্রত্যক্ষ; কিন্তু গৃহমধ্যে মনুষ্যজ্ঞান অনুমিতি। ঐ অন্ধকার গৃহে তুমি যদি যূথিকা পুষ্পের গন্ধ পাও, তবে তুমি বুঝিবে যে, গৃহে যূথিকা পুষ্প আছে; এখানে গন্ধই প্রত্যক্ষের বিষয়; পুষ্প অনুমিতির বিষয়।

মনুষ্য অল্প বিষয়ই স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিতে পারে। অধিকাংশই অনুমিতির উপর নির্ভর করে। অনুমিতি সংসার চালাইতেছে। আমাদিগের অনুমানশক্তি না থাকিলে, আমরা প্রায় কোন কার্য্যই করিতে পারিতাম না। বিজ্ঞান, দর্শনাদি, অনুমানের উপরেই নির্ম্মিত।

কিন্তু, যেমন কোন মনুষ্যই সকল বিষয় স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিতে পারেন না, তেমনি কোন ব্যক্তি সকল তত্ত্ব স্বয়ং অনুমান করিয়া সিদ্ধ করিতে পারেন না। এমন অনেক বিষয় আছে যে, তাহা অনুমান করিয়া জানিতে গেলে যে পরিশ্রম আবশ্যক, তাহা একজন মনুষ্যের জীবনকালের মধ্যে সাধ্য নহে। এমন অনেক

বিষয় আছে যে, তাহা অনুমানের দ্বারা সিদ্ধ করার জন্য যে বিদ্যা, বা যে জ্ঞান, বা যে বুদ্ধি, বা যে অধ্যবসায় প্রয়োজনীয়, তাহা অধিকাংশ লোকের নাই। অতএব এমন অনেক নিতান্ত প্রয়োজনীয় বিষয় আছে যে, তাহা অনেকে স্বয়ং প্রত্যক্ষ বা অনুমানের দ্বারা জ্ঞাত হইতে পারেন না। এমন স্থলে আমরা কি করিয়া থাকি? যে স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছে, বা যে স্বয়ং অনুমান করিয়াছে, তাহার কথা শুনিয়া বিশ্বাস করি। ইতালীর উত্তরে যে আল্‌প নামে পর্ব্বত শ্রেণী আছে তাহা তুমি স্বয়ং প্রত্যক্ষ কর নাই। কিন্তু যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহাদের প্রণীত পুস্তক পাঠ করিয়া তুমি সে জ্ঞান লাভ করিলে। পরমাণু মাত্র যে অন্য পরমাণু মাত্রের দ্বারা আকৃষ্ট হয়, ইহা প্রত্যক্ষের বিষয় হইতে পারে না, এবং তুমিও ইহা গণনার দ্বারা সিদ্ধ করিতে পার না, এজন্য তুমি নিউটনের কথায় বিশ্বাস করিয়া সে জ্ঞান লাভ করিলে।

ন্যায়, সাংখ্যাদি আর্য্য দর্শনশাস্ত্রে ইহা একটি তৃতীয় প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। ইহার নাম শব্দ। তাঁহাদিগের বিবেচনায় বেদাদি এই প্রমাণের উপর নির্ভর করে। আপ্তবাক্য বা গুরূপদেশ, স্থূলতঃ যে বিশ্বাসযোগ্য তাহার উপদেশ —আর্য্যমতে ইহা একটি স্বতন্ত্র প্রমাণ। তাহারই নাম শব্দ।

কিন্তু চার্ব্বাকাদি কোন কোন আর্য্য দার্শনিক, ইহাকে প্রমাণ বলিয়াই স্বীকার করেন না। ইউরোপীয়েরাও, ইহাকে স্বতন্ত্র প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন না।

দেখা যাইতেছে, সকলের কথাতে বিশ্বাস অকর্ত্তব্য। যদি একজন বিখ্যাত মিথ্যাবাদী আসিয়া বলে যে, সে জলে অগ্নি জ্বলিতে দেখিয়া আসিয়াছে, তবে এ কথা কেহই বিশ্বাস করিবে না। তাহার উপদেশে প্রমাজ্ঞানের উৎপত্তি নাই। ব্যক্তিবিশেষের উপদেশই প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য। তবে, সেই জ্ঞানলাভের পূর্ব্বে, আদৌ মীমাংসা আবশ্যক যে কে বিশ্বাসযোগ্য কে নহে। কোন্ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া এ মীমাংসা করিব? কোন্ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া, মন্বাদির কথা আপ্তবাক্য বলিয়া গ্রহণ করিব, এবং রামু শ্যামুর কথা অগ্রাহ্য করিব? দেখা যাইতেছে যে, অনুমানের দ্বারা ইহা সিদ্ধ করিতে হইবে। মনুর সঙ্গে পল্লীর পাদরি সাহেবের মতভেদ। তুমি চিরকাল শুনিয়া আসিয়াছ যে, মনু অভ্রান্ত ঋষি এবং পাদরি সাহেব স্বার্থপর সামান্য মনুষ্য; এজন্য তুমি অনুমান করিলে যে মনুর কথা গ্রাহ্য, পাদরির কথা অগ্রাহ্য। মনুর ন্যায় অভ্রান্ত ঋষি গোমাংসভোজন নিষেধ করিয়াছেন বলিয়া তুমি অনুমান করিলে গোমাংস অভক্ষ্য। অতএব শব্দকে একটি স্বতন্ত্র প্রমাণ না বলিয়া, অনুমানের অন্তর্গত বল না কেন?

শুধু তাহাই নহে। যে ব্যক্তির কতকগুলি উপদেশ গ্রাহ্য কর, তাহারই আর কতকগুলি অগ্রাহ্য করিয়া থাক। মাধ্যাকর্ষণ সম্বন্ধে নিউটনের যে মত, তাহা তুমি শিরোধার্য্য কর, কিন্তু অলোক সম্বন্ধে তাঁহার যে মত, তাহা পরিত্যাগ করিয়া তুমি ক্ষুদ্রতর বুদ্ধিজীবী ইয়ঙ ও ফ্রেস্নেলের মত গ্রহণ কর, ইহার কারণ কি? ইহার কারণ সন্ধান করিলে, তলে অনুমিতিকেই পাওয়া যাইবে। অনুমানের দ্বারা তুমি জানিয়াছ যে মাধ্যাকর্ষণ সম্বন্ধে নিউটনের যে মত, তাহা সত্য, আলোক সম্বন্ধে তাঁহার যে মত তাহা অসত্য। যদি শব্দ একটি পৃথক্ প্রমাণ হইত, তবে তাঁহার সকল মতই তুমি গ্রাহ্য করিতে।

ভারতবর্ষে তাহাই ঘটিয়া থাকে। ভারতবর্ষে যাহার মত গ্রাহ্য বলিয়া স্থির হয়, তাহার সকল মতই গ্রাহ্য হয়। ইহার কারণ শব্দ একটি স্বতন্ত্র প্রমাণ বলিয়া গণ্য—আপ্ত বাক্যমাত্র গ্রাহ্য, ইহা আর্য্য দর্শনশাস্ত্রের আজ্ঞা। এইরূপ বিশেষ বিচার ব্যতীত ঋষি ও পণ্ডিতদিগের মত মাত্রই গ্রহণ করা, ভারতভবর্ষের অবনতির একটি যে কারণ, ইহা বলা বাহুল্য। অতএব দার্শনিকদিগের এই একটি ক্ষুদ্র ভ্রান্তিতে সামান্য কুফল ফলে নাই।

প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং শব্দ ভিন্ন নৈয়ায়িকেরা উপমিতিকেও একটি স্বতন্ত্র প্রমাণ বিবেচনা করেন। বিচার করিয়া দেখিলে সিদ্ধ হইবে যে উপমিতি, অনুমিতির প্রকারভেদ মাত্র এবং সেইজন্য সাংখ্যাদি দর্শনে উপমিতি স্বতন্ত্র প্রমাণ বলিয়া গণ্য হয় নাই। অতএব উপমিতির বিস্তারিত উল্লেখ প্রয়োজনীয় বোধ হইল না। বস্তুতঃ প্রত্যক্ষ এবং অনুমাই জ্ঞানের মূল।

তাহার পর দেখিতে হইবে যে, অনুমানও প্রত্যক্ষমূলক। যে জাতীয় প্রত্যক্ষ কখন হয় নাই, সে বিষয়ে অনুমান হয় না। তুমি যদি কখন পূর্ব্বে মেঘ না দেখিতে, বা আর কেহ কখন না দেখিত, তবে তুমি রুদ্ধদ্বার গৃহমধ্যে মেঘগর্জ্জন শুনিয়া কখন মেঘানুমান করিতে পারিতে না। তুমি যদি কখন যূথিকা গন্ধ প্রত্যক্ষ না করিতে, তবে অন্ধকার গৃহে থাকিয়া যূথিকা ঘ্রাণ পাইয়া তুমি কখন অনুমান করিতে পারিতে না যে গৃহমধ্যে যূথিকা আছে। এইরূপ অন্যান্য পদার্থ সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে। তবে অনেক সময়ে দেখা যাইবে যে, একটি অনুমানের মূল, বহুতর বহুজাতীয় পূর্ব্বপ্রত্যক্ষ। এক একটি বৈজ্ঞানিক নিয়ম সহস্র সহস্র জাতীয় প্রত্যক্ষের ফল।

অতএব প্রত্যক্ষই জ্ঞানের একমাত্র মূল—সকল প্রমাণের মূল। অনেকে দেখিয়া বিস্মিত হইবেন যে, দর্শনশাস্ত্র, দুই তিন সহস্র বৎসরের পর, ঘুরিয়া ঘুরিয়া আবার সেই চার্ব্বাকের মতে আসিয়া পড়িতেছে। ধন্য আর্য্য বুদ্ধি! যাহা এতকালে হূম, মিল, বেন প্রভৃতির দ্বারা সংস্থাপিত হইয়াছে—দুই সহস্রাধিক

বৎসর পূর্ব্বে বৃহস্পতি তাহা প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন। কেহ না ভাবেন যে আমরা এমন বলিতেছি যে প্রত্যক্ষ ভিন্ন প্রমাণ নাই—আমরা বলিতেছি যে, সকল প্রমাণের মূল প্রত্যক্ষ। বৃহস্পতি ঠিক তাহাই বলিয়াছিলেন কি না, তাঁহার গ্রন্থসকল লুপ্ত হওয়ায়, নিশ্চয় করা কঠিন।

প্রত্যক্ষই জ্ঞানের একমাত্র মূল, কিন্তু এই তত্ত্বের মধ্যে ইউরোপীয় দার্শনিকদিগের মধ্যে একটি ঘোরতর বিবাদ আছে। কেহ কেহ বলেন যে, আমাদিগের এমন অনেক জ্ঞান আছে যে, তাহার মূল প্রত্যক্ষে পাওয়া যায় না। যথা, কাল, আকাশ, ইত্যাদি।

কথাটি বুঝা কঠিন। আকাশ সম্বন্ধে একটি সহজ কথা গ্রহণ করা যাউক,—যথা দুইটি সমানান্তরাল রেখা যতদূর টানা যাউক, কখন মিলিত হইবে না, ইহা আমরা নিশ্চিত জানি। কিন্তু এ জ্ঞান আমরা কোথা পাইলাম? প্রত্যক্ষবাদী বলিবেন "প্রত্যক্ষের দ্বারা। আমরা যত সমানান্তরাল রেখা দেখিয়াছি, তাহা কখন মিলিত হয় নাই।" তাহাতে বিপক্ষেরা প্রত্যুত্তর করেন যে, "জগতে যত সমানান্তরাল রেখা হইয়াছে, সকল তুমি দেখ নাই—তুমি যাহা দেখিয়াছ, তাহা মিলে নাই বটে, কিন্তু তুমি কি প্রকারে জানিলে যে কোন কালে কোথাও এমন দুইটি সমানান্তরাল রেখা হয় নাই, বা হইবে না, যে তাহা টানিতে টানিতে একস্থানে মিলিবে না? যাহা মনুষ্যের প্রত্যক্ষ হইয়াছে, তাহা হইতে তুমি কি প্রকারে অপ্রত্যক্ষীভূতের নিশ্চয় করিলে? অথচ আমরা জানিতেছি যে, তুমি যাহা বলিতেছ তাহা সত্য;—কস্মিন কালে কোথাও এমত দুইটি সমানান্তরাল রেখা হইতে পারে না যে তাহা মিলিবে। তবে প্রত্যক্ষ ব্যতীত তোমার আর কোন জ্ঞানমূল আছে—নহিলে তুমি এই প্রত্যক্ষের অতিরিক্ত জ্ঞানটুকু কোথায় পাইলে?"

এই কথা বলিয়া, বিখ্যাত জর্ম্মান দার্শনিক কান্ত, লক ও হ্যুমের প্রত্যক্ষবাদের প্রতিবাদ করেন। এই অতিরিক্ত জ্ঞানের মূল তিনি এই নির্দ্দেশ করেন যে, যেখানে বহির্ব্বিষয়ের জ্ঞান আমাদিগের ইন্দ্রিয়ের দ্বারা হইয়া থাকে, সেখানে বহির্ব্বিষয়ের প্রকৃতি সম্বন্ধে কোন তত্ত্বের নিত্যত্ব আমাদের জ্ঞানের অতীত হইলেও, আমাদিগের ইন্দ্রিয়সকলের প্রকৃতির নিত্যত্ব আমাদিগের জ্ঞানের আয়ত্ত বটে। আমাদিগের ইন্দ্রিয়সকলের প্রকৃতি অনুসারে আমরা বহির্ব্বিষয় কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট অবস্থাপন্ন বলিয়া পরিজ্ঞাত হই। ইন্দ্রিয়ের প্রকৃতি সর্ব্বত্র একরূপ, এজন্য বহির্ব্বিষয়ের তত্তৎ অবস্থাও আমাদিগের নিকট সর্ব্বত্র একরূপ। এইজন্য আমাদিগের কাল, আকাশাদির সমবায়ের নিত্যত্ব জানিতে পারি। এই জ্ঞান

আমাদিগেতেই আছে—এজন্য কান্ত ইহাকে স্বতোলব্ধ বা আভ্যন্তরিক জ্ঞান বলেন। আমাদিগের ব্রাহ্মেরা ইহাকে সহজ জ্ঞান বলেন।

পাঠক আবার দেখিবেন যে আধুনিক ইউরোপীয় দর্শন, ফিরিয়া ফিরিয়া সেই প্রাচীন ভারতীয় দর্শনে মিলিতেছে। যেমন চার্ব্বাকের প্রত্যক্ষবাদে, মিল ও বেনের প্রত্যক্ষবাদের সাদৃশ্য দেখা গিয়াছে, তেমনি বেদান্তের মায়াবাদের সঙ্গে কান্তের এই প্রত্যক্ষ প্রতিবাদের সাদৃশ্য দেখা যায়। আধ্যাত্মিক তত্ত্বে, প্রাচীন আর্য্যগণ কর্ত্তৃক সূচিত হয় নাই, এমত তত্ত্ব অল্পই ইউরোপে আবিষ্কৃত হইয়াছে।

কান্তীয় আভ্যন্তরিক মতের প্রধানতম প্রতিদ্বন্দ্বী জন ষ্টুয়ার্ট মিল। তিনি কার্য্য-কারণ সম্বন্ধের নিত্যত্বের উপর নির্ভর করেন। তিনি বলেন যে, আমরা প্রত্যক্ষের দ্বারা একটি অকাট্য সংস্কার এই লাভ করিয়াছি যে, যেখানে কারণ বর্ত্তমান আছে, সেইখানে তাহার কার্য্য বর্ত্তমান থাকিবে। যেখানে পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে ক বর্ত্তমান আছে, সেইখানে দেখিয়াছি যে খ আছে। পুনর্ব্বার যদি কোথাও ক দেখি, তবে আমরা জানিতে পারি যে খও এখানে আছে কেননা, আমরা প্রত্যক্ষের দ্বারা জানিয়াছি, যেখানে কারণ থাকে সেইখানেই তাহার কার্য্য থাকে। সমানান্তরালতা কারণ, এবং সংমিলনবিরহ তাহার কার্য্য, কেননা, আমরা যেখানে যেখানে সমানান্তরালতা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, সেইখানে সেইখানে দেখিয়াছি মিল হয় নাই, অতএব সমানান্তরালতা, সংমিলনবিরহের নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী। কাজেই আমরা জানিতেছি যে যখন যেখানে দুইটি সমানান্তরাল রেখা থাকিবে, সেইখানেই আর তাহাদিগের মিলন হইবে না। অতএব এ জ্ঞানও প্রত্যক্ষমূলক।

শেষ মত, হর্বর্ট স্পেন্সরের। তিনিও প্রত্যক্ষবাদী, কিন্তু তিনি বলেন যে, এই প্রত্যক্ষমূলক জ্ঞান সকলটুকু আমাদিগের নিজ প্রত্যক্ষজাত নহে। প্রত্যক্ষজাত সংস্কার পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমার পূর্ব্বপুরুষদিগের যে প্রত্যক্ষজাত সংস্কার, আমি তাহা কিয়দংশে প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি যে সেই সকল সংস্কার লইয়া জন্মিয়াছি এমত নহে—তাহা হইলে সদ্যঃপ্রসূত শিশুও সংস্কার বিশিষ্ট হইত, কিন্তু তাহার বীজ আমার শরীরে (মন, শরীরের অন্তর্গত) আছে; প্রয়োজনমত সময়ে জ্ঞানে পরিণত হইবে। এইরূপে, যাহা কান্তীয় মতে আভ্যন্তরিক বা সহজ জ্ঞান, স্পেন্সরের মতে তাহা পূর্ব্বপুরুষ পরম্পরাগত প্রত্যক্ষজাত জ্ঞান।

এই কথা আপাততঃ অপ্রামাণিক বোধ হইতে পারে, কিন্তু স্পেন্সর একরূপ দক্ষতার সহিত ইহার সমর্থন করিয়াছেন যে, ইউরোপে এই মতই এক্ষণে প্রচলিত হইয়া উঠিতেছে। (২)

---

(২) অনেকে কোম্‌তের "Positive Philosophy" নামক দর্শনশাস্ত্রের নামানুবাদে প্রত্যক্ষবাদ লিখিয়া থাকেন। আমাদের বিবেচনায় সেটি ভ্রম। যাহাকে "Empirical Philosophy" বলে অর্থাৎ লক, হ্যুম, মিল ও বেনের মতকেই প্রত্যক্ষবাদ বলা যায়। আমরা সেই অর্থেই প্রত্যক্ষবাদ শব্দ এই প্রবন্ধে ব্যবহার করিয়াছি।

আমরা শ্রীযুক্ত হরিকিশোর তর্কবাগীশ মহাশয়ের পুস্তকের নামোল্লেখ করিয়া এই প্রবন্ধের সূচনা করিয়াছি. এক্ষণে তাঁহার গ্রন্থের যথাযোগ্য প্রশংসা না করিয়া প্রবন্ধ সমাপ্ত করিতে পারি না। যিনি অস্মদ্দেশীয় ন্যায় দর্শন অনায়াসে অধ্যয়ন করিতে চাহেন, তিনি তর্কবাগীশ মহাশয়ের প্রণীত এই গ্রন্থ যত্নে অধ্যয়ন করিবেন। আমরা ন্যায়শাস্ত্রের একরূপ সরল ব্যাখ্যা বাঙ্গালা বা ইংরেজিভাষায় আর দেখি নাই। যে, যে তত্ত্বে পারদর্শী না হয়, সে কখন তাহা পরিষ্কার করিয়া লিখিতে পারে না। তর্কবাগীশ মহাশয়, এই দর্শনশাস্ত্রের যে সম্যক্ পারদর্শী, এই গ্রন্থ তাহার পরিচয়। তাঁহার প্রশংসার্থ ইহাও বক্তব্য যে, তিনি কেবল, বিতণ্ডাকারী, চতুষ্পাঠীগতবুদ্ধি প্রাচীন সম্প্রদায়ের পণ্ডিত নহেন। উত্তমরূপে না হউক, কিয়ৎ পরিমাণে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক অবগত আছেন এবং প্রাচীন সম্প্রদায়ের নৈয়ায়িকদিগের ন্যায় তাহাতে আস্থাশূন্য নহেন। অনেক স্থানে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে এবং প্রাচ্য দর্শনে সামঞ্জস্য করিতে যত্ন করিয়াছেন। ন্যায়শাস্ত্রে তাঁহার যেরূপ অধিকার বিজ্ঞানে সেরূপ না থাকায় তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। না হউক, তথাপি তাঁহার গ্রন্থ, অনেক বিষয়ে বাঙ্গালা ভাষায় তুলনাশূন্য। তিনি জ্ঞানী, কুসংস্কারবর্জ্জিত, এবং লিপিকুশল। এবং সাহস করিয়া আধুনিক অসারগ্রাহী পাঠকদিগের সম্মুখে ন্যায়শাস্ত্রের পরিচয় দিতে উদ্যত হইয়াছেন। ইহাতে তাঁহারও প্রশংসা এবং বাঙ্গালার শ্রীবৃদ্ধির লক্ষণ।

সমাজ বিজ্ঞান

কেহ যদি জিজ্ঞাসা করেন বর্ত্তমান কালের প্রধান লক্ষণ কি, আমরা বলিব বিজ্ঞানের অধিকার বিস্তার। ব্রহ্মাণ্ডের সকল কাণ্ডেই এক্ষণে বিজ্ঞান হাত দিতে আরম্ভ করিয়াছে। যে সমস্ত বস্তু অতি ক্ষুদ্র বলিয়া চক্ষুর অগোচর, বিজ্ঞান অণুবীক্ষণযোগে আপনার আয়ত্ত করিতেছে। যেসকল পদার্থ অতি দূরবর্ত্তী বলিয়া অলক্ষ্য বা দুর্লক্ষ্য, বিজ্ঞান দূরবীক্ষণযন্ত্র দ্বারা আপনার শাসনাধীনে আনিতেছে। এইরূপে ভূমণ্ডল ও আকাশ হইতে দেবতা তাড়াইয়া সর্ব্বত্রই বিজ্ঞান আপনার রাজ্য বাড়াইতেছে। পূর্ব্বে যে ঝড় বৃষ্টি বজ্রাঘাতের বিশৃঙ্খল ব্যাপারে ইন্দ্র ও বায়ুর প্রভাব অথবা ঈশ্বরের অনুগ্রহ বা নিগ্রহ লক্ষিত হইত, তাপতাড়িতের দুটা কথা বলিয়া বিজ্ঞান তাহা নিজস্ব করিয়া লইয়াছে। পূর্ব্বে যে ধূমকেতু দেবক্রোধ চিহ্নস্বরূপ গগনমণ্ডলে উদিত হইয়া ভূপৃষ্ঠে অমঙ্গল বর্ষণ করিত, বিজ্ঞান মাধ্যাকর্ষণ রজ্জু দিয়া তাহাকে সূর্য্যের সঙ্গে বাঁধিয়া দিয়াছে। পূর্ব্বে যেখানে রুদ্রমূর্ত্তি সর্ব্বভুক্ হুতাশন দৃষ্ট হইতেন, সেখানে বিজ্ঞান রাসায়নিক প্রক্রিয়াবিশেষ প্রদর্শন করিতেছে। পূর্ব্বে যে প্রাণরূপ স্বতন্ত্র পদার্থ জীবোদ্ভিদ্ সমূহের শরীরে থাকিয়া তথাকার কার্য্যসমুদায় সম্পাদন করিত, বিজ্ঞান তাহাকে উড়াইয়া দিয়া তাহার অধিষ্ঠান ভূমিতে নৈসর্গিক নিয়মের আধিপত্য সংস্থাপন করিয়াছে। এমন কি, কিরূপে বর্ত্তমান জগতের ও জীবপুঞ্জের উৎপত্তি হইয়াছে, বিজ্ঞান তাহাও দেখাইয়া দিতে অগ্রসর। কি প্রকারে চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ ধূমকেতুগণ সমুৎপন্ন হইয়াছে, কি প্রকারে জলস্থল পর্ব্বত নদী প্রভৃতি তাহাদিগের বর্ত্তমান অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, কি প্রকারে ভূমণ্ডলে নানাবিধ জীবের উদয়, বিলয় বা বিস্তার ঘটিয়াছে, বিজ্ঞান যুক্তিসহকারে বুঝাইয়া দিতে প্রস্তুত। এই বৃহৎ ব্রতের অনুষ্ঠান করিতে গিয়া বিজ্ঞান ঐশীশক্তির সাহায্য চাহে না, সৃষ্টির কল্পনা করে না, কেবল প্রাকৃতিক কার্য্যপ্রণালীর কথা বলে। এই কার্য্যপ্রণালীর দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই বিজ্ঞান বিদ্যুৎকে দূত করিয়াছে, অগ্নিকে রথের অশ্ব করিয়াছে, সমুদ্রকে গমনাগমনের পথ করিয়াছে, এবং বায়ুকে প্রয়োজনানুসারে বাহন করিয়া থাকে।

কার্য্যকারণসূত্র ধরিয়া বিজ্ঞান জগন্মণ্ডলে সর্ব্বত্রই নিয়মের আধিপত্য সংস্থাপন করিতেছে; এক্ষণে মনুষ্যসমাজকেও ছাড়িতেছে না। সূক্ষ্মদর্শী পণ্ডিতগণ বলিতেছেন যে, মানবজাতিও কার্য্যকারণশৃঙ্খলে গ্রথিত, মানবজাতিও নিয়মের অধীন। যেমন চরণতলস্থ ধূলিকণা হইতে দূরবর্ত্তী নক্ষত্রপুঞ্জ পর্য্যন্ত জড়পদার্থ সকল নিয়মের অধীন, তেমনই বিজ্ঞানবেত্তৃগণের মতে তরুলতার অঙ্কুর হইতে মনুষ্য মনের মহোচ্চতম চিন্তা পর্য্যন্ত প্রাণিমণ্ডলস্থ সমস্ত ব্যাপারই নিয়মের অধীন। কিন্তু ইহার প্রতি এই আপত্তি হইতে পারে যে, আমরা ত আপনাদিগকে এ প্রকার আবদ্ধ বিবেচনা করি না; আমাদিগের অনুভব ও বিশ্বাস এই যে, আমরা সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন। আমাদিগের কার্য্যে এইরূপ বিশ্বাসই সর্ব্বদা প্রকাশ পায়। যখন আমরা কোন মন্দ কর্ম্ম করি, তজ্জন্য আমাদের চিত্তে অনুতাপ উপস্থিত হয়। আমরা অবশ্যই ভাবি যে উক্ত কর্ম্ম করা না করা উভয়ই আমাদিগের সাধ্যায়ত্ত ছিল; ইচ্ছাপূর্ব্বক অবৈধ আচরণ করিয়াছি বলিয়াই মনস্তাপ জন্মে। যদি আমরা বুঝিতাম যে, যে কার্য্য করিয়াছি, তদ্বিরুদ্ধে ধাবিত হইবার শক্তি আমাদিগের ছিল না, তাহা হইলে আমাদিগের ঈদৃশ আত্মগ্লানি উপস্থিত হইত না। বাস্তবিক যখন আমাদিগের স্বাধীনতা থাকে না, যদি আমাদিগের দ্বারা কেহ একটা অন্যায় কার্য্যও করাইয়া লয়, আমরা তজ্জন্য বিশেষ কোন মানসিক যন্ত্রণাও ভোগ করি না। যদি ডাকাইতে কাহাকে বাঁধিয়া অন্য একজনের উপরে নিক্ষেপ করে, তাহা হইলে নিক্ষিপ্ত ব্যক্তি অপরকে কষ্ট দিয়াছি বলিয়া সন্তপ্তচিত্ত হয়, এরূপ বোধ হয় না। আর সংকর্ম্ম করিলে আমরা যে আত্মপ্রসাদ পাই, অসংপথে যাইবার ক্ষমতা আমাদিগের ছিল, এ প্রকার প্রত্যয় না থাকিলে তাহা কখনই জন্মিত না। অন্য লোককে যখন আমরা তাহাদিগের কার্য্যজন্য নিন্দা বা প্রশংসা, পুরস্কার বা তিরস্কার করি, তখনও আমরা তাহাকে স্বাধীন জ্ঞান করি; কারণ, বিপরীত ব্যবহার তৎপক্ষে সম্ভব না হইলে তাহার প্রতি দোষ বা গুণের আরোপ নিতান্ত নিরর্থক হইয়া পড়ে। যখন আমরা কোন অপরাধীকে দণ্ড দিয়া থাকি, তখনও আমরা বিবেচনা করি যে, সে অন্যরূপ কার্য্য করিতে পারিত, কোন অনিবার্য্য শক্তির বশবর্ত্তী হইয়া সে ব্যক্তি দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় নাই, তাহার এ প্রকার আন্তরিক বল ছিল যে, সে অসংবর্ত্ম পরিত্যাগ করিয়া সন্মার্গানুগামী হইতে পারিত।

এই আপত্তিগুলির সম্বন্ধে আমরা সংক্ষেপে গুটিকতক কথা বলিব। অনুভব দ্বারা আমরা আপন আপন বর্ত্তমান মানসিক অবস্থা জানিতে পারি। আমাদিগের মনে কি প্রকার সুখ, দুঃখ, বাসনা, ইচ্ছা বা জ্ঞান এক্ষণে উপস্থিত হইয়াছে, আমরা অনুভব করিয়া থাকি। কিন্তু কোন প্রকার মানসিক শক্তি অনুভবের বিষয় নহে, অনুমানের বিষয়। আমাদিগের মনে যে সকল ভাব উদিত হয়, তন্মধ্যে এক এক

জাতীয় ভাবদিগকে এক একটি শক্তির কার্য্য বলিয়া আমরা অনুমান করিয়া থাকি। সুতরাং যদি আমাদিগের কার্য্যনিয়ন্ত্রী স্বাধীনতাশক্তি থাকে, তাহা অনুভবসিদ্ধ না হইয়া অনুমানসিদ্ধ হইবে। অনুমান অবলম্বন করিয়াই, আমাদিগের কোন প্রকার ক্ষমতা আছে না আছে, তদ্বিষয়ের বিশ্বাস জন্মে। এক্ষণে দেখা যাউক যে আমাদিগের যে স্বাধীনতায় বিশ্বাস আছে, সে কিরূপ স্বাধীনতা। সাধ্যবিষয়ান্তর্গত যখন আমাদিগের যাহা করিতে ইচ্ছা হয়, তাহা করিতে পাইলেই আমরা আপনাদিগকে স্বাধীন জ্ঞান করি। যদি কেহ আমাদিগকে ধরিয়া বাঁধিয়া বা আবদ্ধ করিয়া রাখে, যদি ইচ্ছামত আমরা বিচরণ করিতে না পারি, যদি ইচ্ছানুসারে লিখিতে, পড়িতে, বলিতে বা অন্য কোনরূপ কার্য্য করিতে না পাই, তাহা হইলে আর আমরা আপনাদিগকে স্বাধীন জ্ঞান করি না। ইহাতেই স্পষ্টই বুঝাইতেছে যে যখন কোন বাহ্যশক্তিতে আমাদিগকে ইচ্ছানুসারে চলিতে দেয় না, তখনই আমরা আপনাদিগকে পরাধীন ভাবি; আর যখন আমরা আপন আপন ইচ্ছানুসারে কার্য্য করিতে পাই, তখনই আমরা আপনাদিগকে স্বাধীন বিবেচনা করি। আমরা স্বাধীন একথা বলিবার সময়ে, আমাদিগের ইচ্ছার কোন কারণ নাই, ইহা বলা আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে। তবে হয়ত ইহার অন্তরে এই ভাবটি আছে, আমরা কোন অনিবার্য্য বাহ্যশক্তির বশীভূত হইয়া ইচ্ছাটিও করি না, স্বীয় প্রকৃতি অনুসারেই করিয়া থাকি। স্বাধীনতা শব্দের অর্থই স্বপ্রকৃতি সাপেক্ষতা, স্বস্বভাবানুবর্ত্তিতা।

অসৎকর্ম্ম করিলে আত্মগ্লানি কেন হয় তাহার কারণ নিম্নে লিখিত হইতেছে। কি করা ভাল, কি করা মন্দ, প্রত্যেক ব্যক্তিই একপ্রকার স্থির করিয়া রাখে। কিন্তু সময়ে সময়ে কোন কোন বাসনা প্রবল হইয়া কর্ত্তব্যজ্ঞান ঢাকিয়া ফেলে। তখন অন্যায় কার্য্য সহজেই অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু যখন আন্তরিক ঝটিকা থামিয়া যায়, তখন স্থির বুদ্ধির আলোকে উক্ত কার্য্যের মলিনত্ব স্পষ্টরূপে প্রকাশ পায়। তখন উচ্চলক্ষ্যচ্যুত ও নীচপথগামী বলিয়া আপনার প্রতি অত্যন্ত ঘৃণা জন্মে। নিজের প্রতি অতিশয় অশ্রদ্ধা হইলে মনে অত্যন্ত কষ্ট হইবারই কথা।

আমরা যে সকল লোকের কার্য্য দেখিয়া তাহাদিগের নিন্দা বা প্রশংসা, দণ্ড বা পুরস্কার করি, ইহা হইতে তাহাদিগের ইচ্ছা কার্য্যকারণনিয়মের অধীন নহে এরূপ বিবেচনা করা অন্যায়। মনে কর যদি পৃথিবীতে এমন একজাতীয় জীব থাকিত, যাহারা অনিবার্য্য বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া ক্রমাগতই আমাদিগের উপকার করিত ও অপকার করা কাহাকে বলে বুঝিত না; তাহা হইলে কি আমরা তাহাদিগকে দেবতাতুল্য ভক্তি করিতাম না? আর যদি কোন একজাতীয় জীব স্বকার্য্যের ফলাফল বোধশূন্য হইয়া নিয়তই আমাদিগের অপকার

করিত, তাহা হইলে কি আমরা তাহাদিগকে সর্প ও ব্যাঘ্রের ন্যায় বধ করিতে প্রস্তুত হইতাম না? বাস্তবিক বোধ হয়, নিন্দা, প্রশংসা, দণ্ড, পুরস্কার, এসকলের প্রধান উদ্দেশ্য দুইটি; ১ আত্মরক্ষা ২ সৎপ্রবৃত্তি বৰ্দ্ধন। যে ব্যক্তি আমাদিগের অনিষ্টসম্পাদনে নিযুক্ত, সে ব্যক্তি কলের ন্যায় বোধশূন্য হইলেও আমরা তাহাকে দণ্ড দিতে পারি। এই কারণেই আমরা উন্মত্তদিগকে আবদ্ধ করিয়া রাখা উচিত জ্ঞান করি। সাধারণতঃ লোকের বিশ্বাস এই যে নিন্দা, প্রশংসা, দণ্ড, পুরস্কার দ্বারা সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের সৎপ্রবৃত্তি বৰ্দ্ধিত ও অসৎপ্রবৃত্তি নিবারিত হয়। এ বিশ্বাস সমূলক হইলে, নিন্দা প্রভৃতি দ্বারা মানবচিত্তের অনেক পরিবর্ত্তন ঘটে স্বীকার করিতে হইতেছে। সুতরাং মনুষ্যকে কার্য্যকারণ শৃঙ্খলে আবদ্ধ বলিতে হইতেছে।

মনুষ্য কার্য্যকারণ নিয়মের অধীন, ইহা পদে পদে আমরা অনুমান করি। যখন আমরা বলি অমুক ব্যক্তি অমুক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে, অমুক ব্যক্তি পারে না; তখন আমাদিগের মনোগত ভাব কি? তখন কি আমরা ইহাই ধরিয়া লই না যে প্রত্যেক ব্যক্তির কার্য্যই তাহার চরিত্র ও অবস্থার সমবেত ফল? হাজার টাকা উৎকোচ পাইলে অর্থলোভী ও ন্যায়পর এ উভয়ের মধ্যে কে কিরূপ কার্য্য করিবে, আমরা কি ভবিষ্যদ্বক্তার ন্যায় বলিয়া দিতে পারি না? যদি গণনা ঠিক না হয়, তাহা হইলে কি আমরা বুঝি না যে, চরিত্র ভাল করিয়া না জানাই আমাদিগের বিফল হইবার কারণ? আমরা কার্য্য সিদ্ধ করিতে হইলে লোকের প্রকৃতি বুঝিয়া চলি। কাহারও নিকটে অনুনয়বিনয় করি। কাহারও কাছে তর্জ্জনগর্জ্জন করি। কাহাকে তাহার স্বার্থের কথা বলি। কাহারে বা ধর্ম্মভয় দেখাই। কাহারও যশোলিপ্সা প্রজ্জ্বলিত করি, কাহারও আত্মগরিমার বিনোদন করি। এইরূপে আমরা ব্যবহারে দেখাইতেছি যে, লোকের কার্য্য অবস্থা সংযোগে স্বভাবোৎপন্ন ফল, ইহাই আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস।

জর্ম্মনদিগকে অনেকে চিন্তামগ্ন বলিয়া বৈষয়িক ব্যাপারে অপারগ জ্ঞান করিত। অনেকে ভাবিত তাহারা দর্শন ও কাব্যরসে চিরদিন ডুবিয়া থাকিবে; কিন্তু পৃথিবীতে কখনও সমরকুশল ও মন্ত্রণাতৎপর পরাক্রান্ত জাতি বলিয়া গণ্য হইতে পারিবে না; এক্ষণে তাহাদিগের কার্য্য দেখিয়া লোকের এ প্রকার ভ্রান্তি দূর হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে কার্য্য কারণ নিয়মের ব্যভিচার হইতেছে না। ইহাতে দেখাইতেছে যে পূর্ব্বে অনেক লোকে জর্ম্মনদিগের প্রকৃতি ভাল করিয়া অবগত হইতে পারে নাই।

মনুষ্যসমাজ যে নিয়মের অধীন তাহার একটি সুন্দর প্রমাণ বর্ত্তমান সময়ে পাওয়া গিয়াছে। ইউরোপ ও আমেরিকাখণ্ডে এক্ষণে অনেক প্রকার ঘটনার

বিশেষ বিশেষ তালিকা প্রস্তুত হইয়া থাকে। তদ্দৃষ্টে জানা যায় যে, যে সকল কার্য্যে লোকের বিশেষ স্বাধীনতা অনুমিত হইয়া থাকে, তাহাতেও নিয়ম আছে। কোন্ দেশে বৎসরে কত বিবাহ, কত নরহত্যা, কত চিঠিলেখা হইবে, এসকল এক প্রকার স্থির আছে। এমন কি, কত লোকে চিঠির শিরোনামায় মোকাম লিখিতে ভুলিবে, তাহাও অবধানিত করিয়া বলা যায়। বাস্তবিক সামাজিক অবস্থা যতদিন একরূপ থাকে ততদিন গড়পড়তায় ফল একরূপ হইবে, ইহা একপ্রকার স্বতঃসিদ্ধ।

মনুষ্যের ইচ্ছা কারণসূত্রে বদ্ধ, ইহা বলিলে যদি কেহ দুঃখিত হন, কি করিব? জনমনোমোহন চিত্র অপেক্ষা সত্য আমাদিগের প্রিয়বস্তু। কল্পনার বশবর্ত্তী হইয়া মনুষ্যের মহত্ব বাড়াইতে গিয়া, আমরা সত্যকে পরিত্যাগ করিতে পারি না। কিন্তু যাঁহারা ভাবেন যে অকারণে মনুষ্য যাহা তাহা ইচ্ছা করিতে পারে, তাঁহাদিগকে আমরা দুই একটী কথা জিজ্ঞাসা করিব। লোকের সৎ বা অসৎ অভিপ্রায় দেখিয়াই আমরা তাহাদিগকে প্রশংসা বা নিন্দা করি। অভিপ্রায়ানুবর্ত্তী ইচ্ছার কারণ স্পষ্টই উক্ত অভিপ্রায়। সুতরাং সে ইচ্ছা কার্য্যকারণশৃঙ্খলাবদ্ধ। যে ইচ্ছার কারণ নাই, তাহাকে কিরূপে অসৎ বা সৎ বলিয়া তাহার নিন্দা বা প্রশংসা করিবে?

মনুষ্যসমাজ যদিও নিয়মের অধীন, তথাপি তাহা কতদূর বিজ্ঞানের দৃষ্টিপথবর্ত্তী, ইহা অনেকে বুঝেন না। অনেকে মনে করেন, আমি, তুমি, বা অপর কোন ব্যক্তি সারাজীবন কখন্ কি কাজ করিব, বিজ্ঞান কালে বলিতে পারিবে। এটী সম্পূর্ণ ভ্রান্তি। যদি একখানি কাচপাত্র প্রস্তরের উপরে সবলে নিক্ষেপ করা যায়, তবে কাচপাত্রটি খণ্ড খণ্ড হইয়া ভাঙ্গিয়া যাইবে, পদার্থতত্ব. বলিতে পারে; কিন্তু কোন্ খণ্ড কোথায় কিরূপ বেগে যাইয়া পড়িবে, ইহা বলা বিজ্ঞানের সাধ্য নহে। সেইরূপ মনুষ্যসমাজের সম্বন্ধে সাধারণতঃ দুই চারিটী কথা বলা যাইতে পারে; কিন্তু তদন্তর্গত ব্যক্তিবিশেষের জীবনগতি নির্ণয় করা বিজ্ঞানের ক্ষমতাতীত।

যে জ্যোতিষে বিজ্ঞানের মাহাত্ম্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে প্রদর্শিত হইয়াছে, যাহাতে বিজ্ঞান ভবিষ্যদ্বক্তার ন্যায় বহুকাল পূর্ব্বে হইতে সূর্য্যচন্দ্রের গ্রহণ বা গ্রহবিশেষের অবস্থান গণনা করিতে সক্ষম, এমন কি যাহাতে বিজ্ঞান না দেখিয়া অনুমানবলে বলিতে পারিয়াছে গগনের অমুক স্থানে অনুসন্ধান কর একটী নূতন গ্রহ পাইবে, সেই জ্যোতিষেও বিজ্ঞান ঠিক ঠিক ফল নির্ণয় করিতে পারে না। গ্রহদিগের কক্ষগুলি ঠিক কেপ্‌লার (Kepler) নির্দ্দিষ্ট বৃত্তাভাস পথ নহে; অপর গ্রহসমুদায়ের আকর্ষণে প্রত্যেক গ্রহের কক্ষ শুদ্ধ বৃত্তাভাস

আকার প্রাপ্ত হইতে পারে না। বাস্তবিক জ্যোতিষিক গণনা দ্বারা পরস্পর আকর্ষণকারী তিনটী পদার্থের প্রকৃত অবস্থানও সম্পূর্ণ বিশুদ্ধরূপে আমরা নিরূপণ করিতে অশক্ত। ইহা হইতেই সহজে অনুমেয় যে, বিষয়ের জটিলতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তত্ত্বনির্ণয়ের কত ব্যাঘাত উপস্থিত হয়। মনুষ্যসমাজ একে ত অসংখ্য ব্যক্তিবর্গের সমষ্টি, তাহাতে প্রত্যেক ব্যক্তি আবার বিবিধ বাসনার বশবর্ত্তী। একমাত্র মাধ্যাকর্ষণের নিয়মাধীন তিনটী পদার্থের কক্ষ কয়টী ঠিক ঠিক নিরূপণ করা যখন অসাধ্য ব্যাপার, তখন বহুবিধ বাসনাজড়িত বহুসংখ্যক ব্যক্তিবর্গের গতি স্থির করা সহজ কাণ্ড নহে। বিশেষতঃ দেশ, কাল ও অবস্থাভেদে মনুষ্যের কতরূপ প্রকৃতিভেদ দৃষ্ট হয়। ইহার উপর আবার ভাবিতে হয় যে, মানবজাতি প্রায় লক্ষ বৎসর ভূমণ্ডলের অধিবাসী ; অথচ আমরা কেবল দুই তিন হাজার বৎসরের কোন কোন দেশের ইতিহাস মাত্র জানি। সাগরকূলের দুই একটী ঢেউ দেখিয়া কেহ অকূল জলধির বৃত্তান্ত লিখিতে গেলে তাহার যে দশা হয়, সমুদয় মানবজাতিসম্বন্ধে কোন কথা বলিতে গেলে আমাদিগের প্রায় সেইরূপ দশা উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা। যদি আমরা পুরাণবর্ণিত ঋষিগণের ন্যায় ত্রিকালজ্ঞ হইতাম, তাহা হইলেও একপ্রকার নিস্তার ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা কলিকালের লোক। সামান্য বুদ্ধিরূপ ভেলা অবলম্বন করিয়া আমাদিগকে অনন্ত অম্বুনিধি অতিক্রম নিমিত্ত অগ্রসর হইতে হয়।

পদার্থভেদে তন্নির্ম্মিত স্তূপের আকারভেদ ঘটে। গোলক, ইষ্টক, বা বালুকা, রাশীকৃত করিয়া সাজাও, স্তূপগুলি ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করিবে, তাহাদিগের গঠনবন্ধনও বিভিন্নরূপ দৃঢ়তা প্রাপ্ত হইবে। এই সামান্য উদাহরণ হইতেই বুঝা যাইতেছে যে, সমষ্টির প্রকৃতি উপাদানসাপেক্ষ। মানবসমাজও এই নিয়মের অধীন। মনুষ্যের স্বভাব দেখিয়াই মানবসমাজের ভাবগতি নির্ণেয়।

যখন কোন পদার্থে ভিন্ন ভিন্ন বল প্রয়োগ করা যায়, তখন হয় তাহা স্থির হইয়া থাকিবে, নয় তাহার গতি হইবে। পণ্ডিতেরা এনিমিত্ত বলবিজ্ঞানকে দুই ভাগে বিভক্ত করেন ; ১ স্থিতিবিজ্ঞান, ২ গতিবিজ্ঞান। স্থিতিবিজ্ঞানে স্থিতির, এবং গতিবিজ্ঞানে গতির নিয়ম সকল নির্ণীত হয়। সমাজতত্ত্ববিদ্‌গণ এই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া সামাজিক স্থিতিবিজ্ঞান ও সামাজিক গতিবিজ্ঞান নামক সমাজবিজ্ঞানের দুইটী শাখা কল্পনা করিয়াছেন। সামাজিক স্থিতিবিজ্ঞানে সমাজস্থিতির, এবং সামাজিক গতিবিজ্ঞানে সামাজিক উন্নতির নিয়মাবলী নিরূপিত হয়।

সমাজস্থিতির নিয়মাবলী নির্ণয় করিতে গিয়া পণ্ডিতেরা মানবসমাজকে শরীরের সহিত তুলনা করেন। শরীরের সমুদায় অংশগুলি পরস্পর সম্বন্ধ রাখিতে যেমন স্নায়ুগণ আছে, তেমনই সমাজে শাসনকর্ত্তা চাই। ভিন্ন ভিন্ন শারীরিক

যন্ত্রদ্বারা যেমন শরীর রক্ষণোপযোগী ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য সম্পাদিত হয়, তেমনই সমাজরক্ষার উপযোগী ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ব্যবসায়ী লোক সমাজে থাকা আবশ্যক। যেমন শরীরের এক অঙ্গে বেদনা লাগিলে সমুদায় শরীরের ক্লেশবোধ হয়, তেমনই সমাজের কাহারও দুঃখ হইলে অন্যের সহানুভূতি চাই। যেমন শরীরস্থ এক অঙ্গ দ্বারা অন্য অঙ্গের সহায়তা হয়, তেমনই সমাজের এক ব্যক্তি বা এক বিভাগ দ্বারা অপর ব্যক্তি বা অপর বিভাগের সাহায্য হওয়া আবশ্যক। বাস্তবিক যে যে স্থলে সমাজ ক্ষমতাশালী ও সুখী দেখা যায়, সে সে স্থলে সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের শ্রদ্ধেয় শাসনপ্রণালী আছে, সেখানে প্রয়োজনানুরূপ বিভিন্ন প্রকার ব্যবসায়ী লোক আছে, এবং সেখানে পরস্পরের সাহায্য করা ও পরস্পরের ব্যথায় ব্যথিত হওয়া বহুল পরিমাণে লক্ষিত হয়। যদিও শরীরের সহিত সমাজের এত সাদৃশ্য, তথাপি উভয়ের মধ্যে একটী গুরুতর বিভেদ আছে। সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিই চৈতন্যবিশিষ্ট জীব, কিন্তু শরীরের প্রত্যেক অঙ্গ তদ্রূপ নহে। সুতরাং সমাজস্থ সমস্ত ব্যক্তিবর্গের সচ্ছন্দতাসম্পাদনই সমাজরক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য; কিন্তু অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গাপেক্ষা স্নায়ুমণ্ডলের সচ্ছন্দতাসম্পাদনই শরীররক্ষার প্রধান লক্ষ্য। এই কারণে শাসনকর্ত্তৃগণ সমাজশরীরের স্নায়ুমণ্ডলস্বরূপ হইলেও রাজার সুখাপেক্ষা প্রজাদিগের সুখের দিকে দৃষ্টি রাখাই রাজ্যশাসনের মুখ্য উদ্দেশ্য। সমাজের উপাদানভূত ব্যক্তিগণ সচেতন হওয়াতে আর একটী বিশেষ ফল এই হইয়াছে যে শারীরিক কার্য্যাপেক্ষা সামাজিক কার্য্য অধিক পরিমাণে জ্ঞান ও ইচ্ছার অনুবর্ত্তী।

মনুষ্যের উন্নতির দিকে দৃষ্টিপাত করিলে, উহা ত্রিবিধ বলিয়া প্রতীয়মান হইবে; প্রথম জ্ঞানের উন্নতি, দ্বিতীয় নীতির উন্নতি, তৃতীয় বাহ্য জগতের উপর কর্ত্তৃত্ব বৃদ্ধি। যখন আমরা কোন জাতিকে পূর্ব্বাপেক্ষা উন্নত বলি, তখন হয় তাহারা পূর্ব্বাপেক্ষা বিশ্বব্যাপার সম্বন্ধে নূতন কথা অনেক জানিয়াছে, নয় তাহারা পূর্ব্বাপেক্ষা সৎকার্য্যশালী হইয়াছে, অথবা তাহারা পূর্ব্বাপেক্ষা জড়পদার্থসকল আপনাদিগের কর্ত্তৃত্বাধীনে আনিয়া তদ্দ্বারা সামাজিক সুখসচ্ছন্দতার বৃদ্ধি করিয়াছে, এইরূপ কোন একটি বা দুই তিনটির প্রতি লক্ষ্য করি। কিন্তু কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিয়া দেখিলেই প্রতীতি হইবে যে অপর দুই প্রকার উন্নতি জ্ঞানোন্নতি সাপেক্ষ। জ্ঞানবৃদ্ধিসহকারে বাহ্য বস্তুর প্রকৃতি জানিতে পারিলেই আমরা তাহার উপর কর্ত্তৃত্ব সংস্থাপন করিতে পারি। যতদিন না লোকে জানিত বিদ্যুৎ কি পদার্থ, ততদিন তাহাকে ইচ্ছানুসারে আপন আপন কার্য্যে নিয়োজিত করিতে পারে নাই; কিন্তু এক্ষণে তাহার আবির্ভাবের নিয়ম অবগত হইয়া আমরা তার সংযোগে তদ্দ্বারা দূরে সংবাদ প্রেরণ করিতেছি। অগ্নিকে প্রথমে লোকে দেবতা বলিয়া ভয় করিত, পরে অগ্নি উৎপাদন করিতে শিখিয়া তদ্দ্বারা

মানবজাতি কত কার্য্য সাধন করিতে সক্ষম হইয়াছে। অগ্নি অন্ন-ব্যঞ্জন পাক করে। অগ্নি শীতকালে তাপ দিয়া থাকে। অগ্নি অন্ধকার হরণ করিয়া নিশাকালে আমাদিগের কত সাহায্য করে। অগ্নি মৃণ্ময় পাত্র ও ইষ্টক পুড়াইয়া আমাদিগের কত উপকার করে। অগ্নি জলকে বাষ্প করিয়া কলের নৌকা ও কলের গাড়ী চালায়। আবার দেখ, বায়ুর গতি অবগত হইয়া তৎসাহায্যে মনুষ্য সমুদ্র-পথে জাহাজ চালাইতেছে। এইরূপ পদে পদে দৃষ্ট হইবে যে জ্ঞানই নরজাতির কর্তৃত্বের মূল এবং বাহ্য জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞান বৃদ্ধি না হইলে তাহার উপর কর্তৃত্ব বৃদ্ধির সম্ভাবনা নাই। নৈতিক উন্নতি বিশ্বাস-পরিবর্ত্তন সাপেক্ষ। কিন্তু নূতন কিছু না জানিলে লোকের বিশ্বাস পরিবর্ত্তন হয় না। সুতরাং নৈতিক উন্নতিও জ্ঞানোন্নতি সাপেক্ষ।

যদি জ্ঞানোন্নতিই সকল উন্নতির মূল হয়, তাহা হইলে জ্ঞানোন্নতির নিয়মই সামাজিক উন্নতির প্রধান নিয়ম হইবে; এবং যে সকল কারণে জ্ঞানোন্নতির সাহায্য করে, সেইগুলি সামাজিক উন্নতিরও সহায় হইবে। সুপ্রসিদ্ধ ফরাসি পণ্ডিত অগোস্ত কোম্‌ত বলেন যে জ্ঞানোন্নতির তিনটি সোপান আছে, ১ পৌরাণিক, ২ দার্শনিক, ৩ বৈজ্ঞানিক; আর যে বিজ্ঞানের বিষয় যত সরল, তাহা তত শীঘ্র বৈজ্ঞানিক সোপানে উত্তীর্ণ হয়। অদ্যাপি ইহার অতিরিক্ত উচ্চ কথা আর কেহই বলিতে পারেন নাই, এবং ইহার সাহায্যে কোম্‌ত ঐতিহাসিক তত্ত্বের অনেক ব্যাখ্যা করিয়াছেন। "কোম্‌ত দর্শন" নামক প্রবন্ধে একবার কোম্‌তের জ্ঞানোন্নতি বিষয়ক মতের আলোচনা করা গিয়াছে; তজ্জন্য এতৎ সম্বন্ধে এস্থলে আর অধিক লিখিত হইল না।

প্রাচীন কালে প্রাকৃতিক কারণে বোধ হয় জ্ঞানোন্নতির অনেক সহায়তা করিয়াছিল। যে যে স্থলে ভূমির উর্ব্বরতা গুণে লোকে অল্প পরিশ্রমে আহার-সামগ্রী সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়া জ্ঞানচর্চ্চা জন্য অবসর পাইত, সেই সেই স্থলে পূর্ব্বকালে বহুল পরিমাণে সামাজিক উন্নতি হইয়াছিল, দৃষ্ট হয়। মিসরের নীলনদ-তীরে, তুরস্কের ইউফ্রেটিস্ ও টাইগ্রিস্ নদীর কূলে, ভারতবর্ষে সপ্তসিন্ধু প্রদেশে, হোয়াংহো ও ইয়াং সিকিয়াং নদী বিভূষিত চীনদেশে, প্রাচীন সময়েই সভ্যতার জ্যোতি বিকীর্ণ হইয়াছিল।

সময়ে সময়ে কোন কোন মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াও জ্ঞানোন্নতির বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। বুদ্ধ বা খৃষ্ট না জন্মিলে লোকের নৈতিক জ্ঞানের বিকাশ হইতে আরও কতকাল লাগিত, কে বলিতে পারে? যদি গালিলিও বা নিউটন না জন্মিতেন, তাহা হইলে বিজ্ঞানের উন্নতি অল্পকালমধ্যে এত হইত কি না সন্দেহ। কেহ কেহ বলেন যে মহাপুরুষেরা উচ্চ পর্ব্বত-চূড়াস্বরূপ, উদয়োন্মুখ জ্ঞানসূর্য্যের

আলোক তাঁহাদিগের মস্তকে আগে লাগিয়া উপত্যকা প্রদেশে প্রতিফলিত হয়, এই মাত্র। একথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে তাঁহারা না আবির্ভূত হইলেও উপত্যকা প্রদেশ জ্ঞানরশ্মিদ্বারা আপনাআপনি অনতিবিলম্বেই আলোকিত হইত। ইহাতে আমরা সায় দিতে পারি না। সত্য বটে, কোন একটি নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বে তাহার পথ প্রস্তুত হইয়া থাকে। কিন্তু একটি বড় লোকে যতগুলি তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে সক্ষম, বহুসংখ্যক সামান্য লোকে বহুকাল না খাটিলে ততগুলি আবিষ্কার করিতে পারে না; এবং কোন একটি মহত্তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে মনের যেরূপ মহত্ত্ব আবশ্যক, তাহা কখনও সামান্য লোকের হইতে পারে না। এই নিমিত্ত আমরা বলি যে, যে প্রণালীতে জ্ঞানের উন্নতি হইবে যদিও তাহার অন্যথা হইতে পারে না, তথাপি মহাপুরুষদিগের আবির্ভাব দ্বারা উন্নতির বেগের তারতম্য সংঘটিত হয়।

শাসনকর্তৃগণ পুরস্কার বা দণ্ডদ্বারা জ্ঞানবৃদ্ধির অনুকূল বা প্রতিকূল হইতে পারেন। সুতরাং সামাজিক উন্নতি সম্বন্ধে আমরা তাঁহাদিগকে এক হাত গণিয়া চলি। যাঁহারা রাজনিয়ম দ্বারা জর্ম্মনির উন্নতি ও স্পেনের অবনতি সন্দর্শন করিয়াছেন, আমরা আশা করি যে তাঁহারা আমাদিগের সহিত একমত হইবেন।

২য় সংখ্যা

কাব্যনায়ক ইন্দ্র, এই প্রথম, সপ্তম সর্গে দৃশ্যমান হইতেছেন। কোন কোন মহাকাব্যে আদ্যোপান্ত নায়ক প্রায় আমাদিগের দৃষ্টির অতীত হয়েন না,—সে শ্রেণীর মহাকাব্যের প্রধান উদাহরণ রামায়ণ। আবার কোন কোন মহাকাব্যে নায়ক, তাদৃশ সর্ব্বদা দর্শনীয় নহেন; কার্য্যকালেই দেখা দেন। সংসারের এক একটি কার্য্য বহুজনের বহুতর উদ্যোগের ফল; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোকে বহুতর উদ্যোগ করে, শক্তিধর মনুষ্য তাহা একত্রিত করিয়া তাহাতে ইচ্ছামত ফল ফলান। কাব্যকার সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আয়োজন প্রথমে দেখাইয়া, শক্তিধরের শক্তিতে তৎসমুদায়ের পরিণাম দেখান। এইজন্য শ্রেণীবিশেষের মহাকাব্যে নায়ক কেবল ফলোৎপত্তি কালেই পরিদৃশ্যমান হয়েন। ইলিয়দের প্রথম সর্গের পর, আট সর্গে আর আকিলিসের দেখা নাই; এবং বৃত্রসংহারে সপ্তম সর্গ পর্য্যন্ত ইন্দ্রের দেখা নাই। ফলে যে একাদশ সর্গ এক্ষণে প্রকাশ হইয়াছে, ইহাতে ইন্দ্রকে আমরা অধিকক্ষণ দেখি না।

কুমেরুশিখরে ইন্দ্র তপস্যায় নিযুক্ত। কিন্তু সে তপস্যা ব্রহ্মাদি পৌরাণিক দেবতার আরাধনা নহে। তিনি নিয়তির আরাধনা করিতেছিলেন। নিয়তি হেমবাবুর সৃষ্টি। সত্য বটে, গ্রীসীয় দেবতাদিগের মধ্যে ঈদৃশ দেবী আছেন, কিন্তু হেমবাবুর নিয়তি গ্রীক দেবীগণ হইতে ভিন্নপ্রকৃতি। হেমবাবুর এই সৃষ্টি অত্যন্ত সুসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। নিয়তি অস্মদ্দেশীয় পুরাণেতিহাসে নাম প্রাপ্ত নহেন বটে, কিন্তু পৌরাণিক দেবতাগণ সকলকেই ঐশী শক্তির অতীত আর একটি শক্তির অধীন দেখা যায়। যাঁহারা পুরাণাদিতে জগদীশ্বরত্বে প্রতিষ্ঠিত, ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব, তাঁহারাও সর্ব্বশক্তিমান্ বা ইচ্ছাময় নহেন। তাঁহাদিগকেও উদ্যোগ করিয়া, কার্য্যসিদ্ধ করিতে হয় এবং সময়ে সময়ে বিফলযত্ন হইতে হয়। দশ বার মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করিয়া বিষ্ণুকে পৃথিবীর ভার মোচন বা ভক্তের উদ্ধার করিতে হইয়াছিল।

মহাদেব সমুদ্রমন্থন করাইয়াও বিষ ভিন্ন কিছু পাইলেন না। অন্য দেবতাদিগের ত কথাই নাই। যত্ন এবং তাহার বিফলতা থাকিলেই সুখ দুঃখ আছে। অতএব ব্রহ্মা বিষ্ণ্বাদির এই সুখ দুঃখ কোন্ শক্তিতে? পুরাণাদিতে সে শক্তির নাম নাই। হেমবাবু তাহার নিয়তি নাম দিয়া তাহাকে দেহবিশিষ্ট করিয়াছেন। সে দেহও অতি ভয়ঙ্কর—

পাষাণের মূর্ত্তি যেন, দৃষ্টি নিরদয়।
মাধুর্য্য কি স্নেহ কিম্বা অনুকম্পা-লেশ
বদন, শরীর, নেত্র, গাত্র, কি ললাটে,
ব্যক্ত নহে বিন্দুমাত্র; নিয়ত দর্শন
করতলস্থিত ব্যাপ্ত ভবিতব্য-পটে।
অনন্যমানস, দৃষ্টি আলেখ্যের প্রতি,
কহিলা নীরস বাক্য চাহিয়া বাসবে—
"কেন ইন্দ্র, নিয়তির পূজায় ব্যাপৃত?
নিয়তি নহেক তুষ্ট কিম্বা রুষ্ট কভু।

যুগ যুগান্তে ইন্দ্রের ধ্যানভঙ্গ হইলে নিয়তির এই মূর্ত্তি তাঁহার সম্মুখীন হইল। কিন্তু নিয়তির পরিচয় রাখিয়া আমরা পাঠককে আর একটি কৌতূহল ব্যাপার দেখাইব—বিজ্ঞানে কাব্যে বিবাহ। ইন্দ্রের ধ্যান ভঙ্গ হইল। তিনি পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে সুশিক্ষিত কবির সাহায্যে নিম্নলিখিত মত যুগান্তরীয় পরিবর্ত্তন দেখিতেছেন,—

"পূর্ব্বে সে নিরখি যেথা ক্ষৌণী সমতল,
পর্ব্বত এখন সেথা শৃঙ্গবিভূষিত,
লতা গুল্ম সমাকীর্ণ শ্যামল সুন্দর,
বিরাজে গগনমার্গে অঙ্গ প্রসারিয়া!

"গভীর সাগর পূর্ব্বে ছিল যেই স্থানে,
বিস্তীর্ণ মরুমণ্ডল সেথায় এখন,
সমাচ্ছন্ন নিরন্তর বালুকারাশিতে,
তরুবারি-বিরহিত তাপদগ্ধ-দেহ!

"নক্ষত্র নূতন কত, গ্রহ নবোদিত,
নিরখি অনন্ত মাঝে হয়েছে প্রকাশ;
সূর্য্যের মণ্ডল যেন স্বস্থান বিচ্যুত,
অপসৃত বহুদূর অন্তরীক্ষ পথে!"

আমাদিগেরও এইরূপ ধারণা আছে যে, অত্যুচ্চ বিজ্ঞান এবং অত্যুচ্চ কাব্য, পরস্পরকে আশ্রয় করে। কেপ্লরের তিনটি নিয়ম আমাদিগের নিকট তিনখানি

অত্যন্ত উৎকট সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট কাব্য বলিয়া কখন কখন প্রতীয়মান হয় এবং লিয়রে বা হামলেতে কখন কখন আমরা উৎকৃষ্ট মানসিক বিজ্ঞানের সাক্ষাৎ পাই। প্রাকৃতবিজ্ঞান যে কাব্যের উৎকৃষ্ট সহায়, হেমবাবু তাহা উপরিধৃত কয় চরণে দেখাইয়াছেন। ইহার আর একটি উদাহরণ আমরা পশ্চাৎ উদ্ধৃত করিব।

নিয়তির দর্শন পাইলে, ইন্দ্র তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কতদিনে, কি উপায়ে বৃত্র নিধন হইবে। নিয়তি তাঁহাকে শিবপুরে যাইতে পরামর্শ দিলেন। ইন্দ্র, দেবদূত স্বপ্নের দ্বারা এ সম্বাদ, স্বর্গদ্বারে সমবেত দেবগণ-নিকেতনে প্রেরণ করিয়া স্বয়ং কৈলাসধামে যাত্রা করিলেন।

অষ্টম সর্গ, আদ্যোপান্ত একটি সুদীর্ঘ মোহমন্ত্র। এই মোহমন্ত্রের মোহিনী রুদ্রপীড়পত্নী ইন্দুবালা। বৃত্রসংহারের অষ্টম সর্গের ন্যায় কবিতা, বাঙ্গালা ভাষায় অতি বিরল। আমরা সর্গটি সমুদায় উদ্ধৃত করিতে পারি না, কিন্তু সমুদায় উদ্ধৃত না করিলেও, ইহার রাশি রাশি সৌন্দর্য্য, ইহার চমৎকার কবিত্বের পরিচয় দেওয়া যায় না—নিদাঘকালীন পুষ্পবৃক্ষের ন্যায় ইহা আদ্যোপান্ত সুপ্রফুল্ল কবিতাপুষ্পে মণ্ডিত।

ইন্দুবালার প্রকৃতি অতি মনোমোহিনী।

মাধুরী লহরী অঙ্গেতে যেমন,
উছলি উছলি চলে।

রতি নিকটে বসিয়া ফুল গাঁথিতেছিলেন। ইন্দুবালাকে সম্বোধন করিয়া রতি বলিলেন—তুমি বীরপত্নী, তোমার এত ভয় কেন? তখন—

কহে ইন্দুবালা ফেলি গাঢ় শ্বাস
নেত্র আর্দ্র অশ্রুজলে,
"বীরপত্নী হায় সবার পূজিতা
সকলে আমায় বলে!
পতি যোদ্ধা যার তাহার অন্তরে
কত যে সতত ভয়,
জানে সে কজন, ভাবে সে কজন
বীরপত্নী কিসে হয়!
কতবার কত করেছি নিষেধ
না জানি কি বুঝপণ!
যশঃ-তৃষা হায় মিটে নাকি তাঁর
যশঃ কি স্বাদু এমন!
পল অনুপল মন চিন্তে ভয়
সতত অন্তরে দহি।
সে ভয় কি তাঁর নাহয় হৃদয়ে,
সমরের দাহ সহি!"
কহিয়া এতেক, উঠি অন্যমনে;
অস্থির-চরণে গতি,
ভ্রমে গৃহ মাঝে, গৃহ সজ্জা যত
নেহালে যতনে অতি।
"এই জাতি ফুল তাঁর প্রিয় অতি"
বলি কোন পুষ্প তুলে;
"এই পালঙ্কেতে বসিবারে সাধ,"
বলি তাহে বৈসে ভুলে;
"এই অস্ত্রগুলি খুলি কতবার,
তুলি এই সারসন;
কহিলা 'সাজাব রণবেশে তোমা
শিখাব করিতে রণ॥'

এ কবচ অঙ্গে　　দিলা কতদিন,
　　শিরে এই শিরস্ত্রাণ !
কটিবন্ধে কসি　　দিলা এই অসি
　　হাতে দিলা এই বাণ !
অতিপ্রিয় তাঁর　　অস্ত্র এই সব
　　আমার সাধের অতি !
তাঁর সাথে রঙ্গে　　ধরি কত দিন,
　　হেরে প্রিয় স্মরমতি।
আহা এই ধনু　　চারু পুষ্পময়
　　মন্মথ দিলা তাঁয় !
যুদ্ধ ছল করি　　কত পুষ্পশর
　　ফেলিল আমার গায় !
এবে শুকায়েছে,　　হয়েছে নিগন্ধ,
　　প্রিয়কর কতদিন

না পরশে ইন্দ্র,　　সতত সমরেতে
　　রত তিনি অনুদিন ॥
সকলি কোমল　　প্রিয়ের আমার,
　　সমরে শুধু নিদয় ;
হেন সুকোমল　　হৃদয় তাঁহার
　　কেমনে কঠোর হয় !
আমিও রমণী,　　রমণীও শচী,
　　তবে তিনি কেন তায়,
না করিয়া দয়া,　　হইয়া নিষ্ঠুর
　　ধরিতে গেলা ধরায় ?
কি হবে শচীর,　　পতি কাছে নাই,
　　মহাবীর পতি নন !
আমিও যদ্যপি　　পড়ি সে কখন
　　বিপদে শচীর সম !”

এই সকল কবিতার সমুচিত প্রশংসা করিয়া উঠা যায় না। “আমিও রমণী, রমণীও শচী” ইত্যাদি এক ছত্রে যাহা আছে, ক্ষুদ্র কবিগণ শতপৃষ্ঠা লিখিয়া তাহা ব্যক্ত করিতে পারেন না।

শচীকে ধরিতে পাঠাইয়াছে বলিয়া, শ্বাশুড়ীর উপর ইন্দুবালার রাগও বড় মধুর।—

ঐন্দ্রিল-দুহিতা　　সেবিতে কিঙ্করী
　　স্বর্গে কি ছিল না কেহ ?
ব্রহ্মাণ্ড-ঈশ্বরী　　দানবমহিষী,
　　দাসী চাহি শ্রমে সেহ !
আমারে না কেন　　কহিলা মহিষী,
　　আমি সেবিতাম তাঁয়।
পূরে না কি তাঁর　　সাধের ভাণ্ডার
　　শচী না সেবিলে পায় ?

রতির মুখে ইন্দ্রাণীর প্রশংসা শুনিয়া ইন্দুবালা বলিতেছে,—

আমারে লইয়া,　　কন্দর্প কামিনি,
　　চল সে পৃথিবী পর,
হইতে দিব না　　নিদয় এমন,
　　ধরিব পতির কর ;
এত সাধ তাঁর　　করিবারে রণ,
　　সে সাধ মিটাব আমি ;

শচী বিনিময়ে থাকি বনবাসে
ফিরায়ে আনিব স্বামী ॥

ইন্দুবালা মর্ত্ত্যলোকে যাইতে চাহিলে, রতি বলিলেন, দেব্যবূহভেদ করিয়া মর্ত্ত্যে যাইতে হইবে। তখন ইন্দুবালার স্মরণ পড়িল যে, তাঁহার স্বামীকেও যুদ্ধ করিয়া মর্ত্ত্যে যাইতে হইবে। ইন্দুবালা যুদ্ধের বিভীষিকা দেখিতে লাগিলেন। আমরা সে ভাগ উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না, কিন্তু ইন্দুবালার সরলতা তাহাতে অতি সুন্দর স্পষ্টতা প্রাপ্ত হইয়াছে। এই সরলতাই, ইন্দুবালার চরিত্রের মোহিনী শক্তির মূল। কবির চিত্রনৈপুণ্য সম্বন্ধে ইহাও বক্তব্য যে, যে সরলতা তিনি ইন্দুবালার চরিত্রের মূলস্বরূপ করিয়াছেন, সে সরলতা আর কোন নায়িকার চরিত্রকে স্পর্শ করিতে দেন নাই। শচীতে, চপলায় বা ঐন্দ্রিলায় সে সরলতা নাই। এইরূপে তিনি চরিত্র সকলের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছেন।

ইন্দুবালাকে রতি শান্ত করিলে ইন্দুবালা যে কয়টি কথা বলিলেন, তাহাতে অপূর্ব্ব কবিত্ব। সেই সরলতার সঙ্গে কবি অতি গুরুতর গাম্ভীর্য্যের সূত্র জড়াইয়া দিতেছেন;—ইন্দুবালার চরিত্রে সৌন্দর্য্য-তরঙ্গ উছলিয়া উঠিতেছে,—

"পারিনা সহিতে প্রদ্যুম্ন-কামিনি,
নিতি নিতি এই জ্বালা!
দৈত্যসেনা কত মরে অহর্নিশি,
পড়ে কত মহাবীর;
দেখি দৈত্যকুল এইরূপে ক্ষয়
হৈবে বুঝি শেষ স্থির!
কত দৈত্যসুতা হয় অনাথিনী!
কত পিতা পুত্রহীন!
কত দেব-তনু পড়িয়া মূর্চ্ছাতে
অনুক্ষণ হয় ক্ষীণ!
যুদ্ধেতে কি লাভ, যুদ্ধ করে যারা
বিচারিয়া যদি দেখে,
তবে কি সে কেহ যশের আকর
বলিয়া উল্লেখে একে?
দানবের কুলে জন্ম হয় মম,
বুঝি অদৃষ্টের ছলে!
কানন-সহচরি, সত্য তোমা বলি,
সতত অন্তর জ্বলে!"

কুলশক্র দেবতার জন্য এই কাতরতা—"কত দেবতনু পড়িয়া মূর্চ্ছাতে!" এই চারিটি শব্দে হেমবাবু রমণী-চরিত্রের সরলতা, মাধুর্য্য ও মহত্বের সীমা দেখাইয়াছেন।

তখন রতি বলিতেছে,—

"হায় ইন্দুবালা, তুমি সুকোমল
পারিজাত পুষ্প যেন!
পতি যে তোমার তাঁহার হৃদয়
নির্দ্দয় এতই কেন?"

তখন পতি-নিন্দায় ইন্দুবালা গর্জ্জিয়া উঠিয়া রতিকে ভৎর্সনা করিতে লাগিল,—

"শচীর লাগিয়া না নিন্দিহ তাঁরে,
বীর তিনি রণ-প্রিয়!
শচীর বেদনা ঘুচাব আপনি,
ফিরিয়া আসিলে প্রিয়॥
যাব শচীপাশে, করিব শুশ্রূষা,
যাতে সাধ দিব আনি।
মহিষী-কিঙ্করী হইতে দিব না,
কহিনু নিশ্চিত বাণী॥
মন্মথ-রমণি, নাহি কর খেদ,
যাহ ফিরে নিজ বাস;
পতির এ দোষ যাবে ভুলে শচী
পাইব সদা প্রয়াস॥
ভেবেছিনু আর গাঁথিবনা ফুল,
থাকিবে অমনি ঢালা,
এবে ফুটাইয়া, আরও সুযতনে
গাঁথিয়া রাখিব মালা;
যবে শচী ল'য়ে ফিরিবেন পতি
পরাব তাঁহার গলে,
পরাব শচীরে মনের আহ্লাদে
মুছায়ে চক্ষুর জলে॥
পতির মালিন্য নারী না ঢাকিলে,
কে ঢাকিবে তবে আর,"

তখন রতি যে কয়টি কথা বলিতেছে, তাহা মর্ম্ম বিদারক,—

"এ দুঃখ তাহার করিবে মোচন,
দিয়া তারে পুষ্প-হার?
ফুলের রজ্জুতে করিলে বন্ধন
বেদনা নাহি কি তার?
আর কেন চাও ফুটাতে অঙ্কুর
চরণে দলিয়া আগে।
দানব-নন্দিনি, জান না সে তুমি,
দুঃখীরে পূজিলে লাগে!
মৃগেন্দ্রী আসিছে আপন আলয়ে
শৃঙ্খল বান্ধিয়া পায়!
রতির কপালে এও সে ঘটিল,
দেখিতে হইল হায়!"

এই বলিয়া রতি কাঁদিতে কাঁদিতে গেল। ইন্দুবালাও কাঁদিতে লাগিল,—

পড়ে বিন্দু বিন্দু কুসুমের অঙ্গ,
ইন্দুবালা গাঁথে ফুল;
ভাবিয়া পতিরে, ভাবি যুদ্ধভঙ্গ,
চিন্তাতে হৈয়ে আকুল।
কুরঙ্গী যেমন শুনিয়া গহনে
মৃগারির দূররব,
চকিত চঞ্চল, প্রতি পলে পলে
মৃত্যু করে অনুভব;
সেইরূপ ভয়ে চমকি চমকি
গাঁথিতে গাঁথিতে চায়,
ফুল-মালা হাতে, ইন্দুবালা বামা
রুদ্রপীড় ভাবনায়।

নবম সর্গ বীররসপ্রধান। বাত্যামথিত সাগরবৎ এই সর্গ, অবিশ্রান্ত ভীম গর্জ্জন করিতেছে। নৈমিষে জয়ন্ত সঙ্গে শচী কথোপকথন করিতেছেন, এমত সময়ে রুদ্রপীড় আসিল,—

হেনকালে রণমত্ত,
মৃগেন্দ্র-প্রকৃতি-আতঙ্ক;
অসুরের সিংহনাদে পূরিল গগন;
বন আলোড়িত হয়,
কাঁপিয়া অচলচয়
শিখরে শিখরে ধরে ধ্বনি অগণন।

কিঞ্চিৎকাল প্রাচীন প্রথানুসারে বাক্‌যুদ্ধের পর, রুদ্রপীড় জয়ন্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, কোন্ যোদ্ধার সঙ্গে জয়ন্ত যুদ্ধে ইচ্ছুক। তখন জয়ন্ত শত অসুরকে এককালীন যুদ্ধে আহ্বান করিলেন। হেমবাবু, কবিবর মধুসূদন দত্তের অপেক্ষায়, কয়েকটি বিষয়ে সুপটু। তন্মধ্যে যুদ্ধবর্ণনা একটি। জয়ন্তের সঙ্গে শত যোদ্ধার যুদ্ধবর্ণনা আমরা উদ্ধৃত করিতেছি—

অস্ত্র শব্দ সব স্তব্ধ,
দেবদৈত্যে যুদ্ধারব্ধ,
কেবল হুঙ্কারধ্বনি, বাণের গর্জ্জন।
আন্দোলিত হয় সৃষ্টি,
সুরাসুরে শরবৃষ্টি,
শৈলেতে শৈলেতে যেন সদা সংঘর্ষণ॥
ক্ষেপণ, মুষল, শলা,
প্রক্ষেড়ন, চক্র, ভল্ল,
দৈত্যের নিক্ষিপ্ত অস্ত্র বরিষে করকা।
জয়ন্তের শররাশি,
চমকে তমসা নাশি,
অন্তরীক্ষে ধায় যেন নিক্ষিপ্ত তারকা॥
কেশরী-শার্দ্দূল-দল,
শুনিয়া সে কোলাহল,
ত্রাসে ভয়ে ছাড়ি বন, পর্ব্বত-গহ্বর।
বিহঙ্গ জড়ায়ে পাখা,
ত্রাসেতে ছাড়িয়া শাখা,
খসিয়া খসিয়া পড়ে ধরণী উপর॥
ধূলিতে ধূলিতে ছন্ন,
অভেদ নিশি মধ্যাহ্ন,
উদগীরিল বিশ্বম্ভরা গর্ভস্থ অনল!
অসুর-জয়ন্ত-ক্ষিপ্ত
শেল, শূল, শর দীপ্ত,
ঘাত প্রতিঘাতে ছিন্ন কৈল নভঃস্থল॥
ধরাতল টল টল,
নদীকূল কল কল
ডাকিয়া, আসিয়া রোধ করিল প্লাবন।
ঘুরিতে লাগিল শৃঙ্গ,
শৈলচূড়া হৈল তুঙ্গ,
চূর্ণ চূর্ণ হ'য়ে দিগ্‌দিগন্তে পতন॥
হেন যুদ্ধ দেবাসুরে,
হয় অর্দ্ধ দিন পূরে,
তখন জয়ন্ত, করতলে দীপ্ত-অসি,
ছুটে যেন নভস্বৎ
কিম্বা ক্ষিপ্ত গ্রহবৎ,
পড়িল বেগেতে দৈত্য-মণ্ডলী ঝলসি॥

যথা সে অতলবাসী,
তিমি তুলি জলরাশি,
সাগর আলোড়ি করে পুচ্ছের প্রহার,
যবে যাদঃপতি জলে,
ভ্রমে ভীম ক্রীড়াচ্ছলে,
উত্তুঙ্গ পর্ব্বতপ্রায় দেহের প্রসার;
ক্রোশ যুড়ি শুষি বারি,
আবার ফেনে উগারি
দূর অন্তরীক্ষে, বেগে ছাড়িয়া নিশ্বাস;
নাসিকাগ্র উৎক্ষেপণ,
অম্বুরাশি অনুক্ষণ,
অস্থির অম্বুধিপতি ভাবিয়া সন্ত্রাস॥

কিম্বা গিরিশৃঙ্গ-রাজি
ঝড়ো যথা তেজে সাজি,
ক্ষণপ্রভা খেলে রঙ্গে করি ঘোর ঘটা,
খেলে রঙ্গে ভীমভঙ্গি,
শিখর শিখর লঙ্ঘি,
শৈলে শৈলে আঘাতিয়া জ্বল তীক্ষ্ণ ছটা;
নিমেষে নিমেষে ভঙ্গ,
দগ্ধ গিরি-চূড়া অঙ্গ,
অদ্রিকুল ভয়াকুল ছাড়ে ঘোর রাব;

বেগে দীপ্ত গিরিকায়,
বিদ্যুৎ আবার ধায়,
ছড়ায়ে অনন্ত শিখা উদ্ভাসিত ভাব ॥
জয়ন্ত তেমতি রণে
দানব যোদ্ধায় দলে,
রুদ্রপীড় সহ দৈত্যবর্গে ভীম দাপে ।

তখন সূর্য্যাস্ত দেখিয়া এবং নবতি যোদ্ধা হত দেখিয়া রুদ্রপীড়, বিশ্রামের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিলেন। উভয়পক্ষ রাত্রে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। রাত্রে শচী ও চপলা বিশ্রামশীল জয়ন্তকে দেখিয়া যে কথোপকথন করিলেন, তাহা অতি সুমধুর। প্রভাতে জয়ন্ত মাতৃচরণে প্রণাম করিয়া আশীর্ব্বাদ কামনা করিলেন। শচী অন্তরে অমঙ্গল সূচনা দেখিয়া, জয়ন্তকে অন্য দেবের স্মরণ করিতে বলিলেন। কিন্তু বীরধর্ম্মাশ্রিত জয়ন্ত তাহাতে স্বীকৃত হইলেন না, একাই যুদ্ধে গেলেন। এইসকল বৃত্তান্ত আশ্চর্য্য কৌশলের সহিত কথিত হইয়াছে।

অর্দ্ধ দিবা যুদ্ধ করিয়া জয়ন্ত আরও পাঁচ জন দানব বধ করিলেন। কিন্তু সেই সময়ে রুদ্রপীড় তাঁহাকে ঘোরতর আঘাত করিল।—

না সহি দুর্ব্বহ ভার,
অচল বিজুলি হায়
বিচ্ছিন্ন হইলে যেন, পড়িল তেমন !
কিম্বা যেন রাশীকৃত
চন্দ্র-রশ্মি আভা-হত,
খসিয়া পৃথিবী-অঙ্গে হইল পতন !
শিরীষ-কুসুমস্তর,
যেন বা অবনী'পর,
পড়িয়া রহিল মহী করিয়া শোভন ।
দেখিতে দেখিতে দ্যুতি,
নিমেষে মিশে তেমতি,
অম্বরেতে অম্বার দীপ্ত মিশায় যেমন !

শচী আসিয়া পুত্রদেহ ক্রোড়ে করিয়া বসিলেন—

না পড়ে চক্ষের পাতা,
যেন ধরাতলে গাঁথা,
মলিন প্রস্তরমূর্ত্তি অর্দ্ধ অচেতন ।

দেখিয়া, রুদ্রপীড়, শচীকে স্পর্শ করিতে পারিলেন না। কিন্তু নিকুম্ভর নামে এক দানর অনুচর সঙ্গে ছিল; শচীহরণজন্য তাহাকে অনুমতি করিলেন। নিকুম্ভর শচীর কেশ ধরিয়া তুলিল—

যায় মত্তমত্ত যথা,
ছিঁড়িয়া মৃণাল-লতা,
শুণ্ডেতে দুলায়ে তুলে শতদল থর ;
দানব-করেতে তথা,
নিবদ্ধ কুন্তললতা,
দুলিতে লাগিল শূন্যে শচীকলেবর !

দৈত্যগণ, স্তম্ভিতা শচীকে কেশে ধরিয়া শূন্যপথে লইয়া চলিল। স্বর্গদ্বারে শংখধ্বনি শুনিয়া, শচীর মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল। তখন শচী উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন ; সেই রোদন মর্ম্মভেদী তূর্য্যধ্বনিবৎ। শুনিয়া ত্রিলোকের জীব কাঁদিল। এদিকে রুদ্রপীড় স্বর্গে আসিয়া দেখিলেন, দেবগণ সমরে পরাভূত হইয়াছেন,—

রুদ্রপীড় দেখে চেয়ে,
আছে শৈলরাজি ছেয়ে,
চারিদিকে দেব-তনু কিরণ প্রকাশি ;
দিনান্তে নদীর জল,
ঈষৎ-বায়ু-চঞ্চল,
তাহে যেন ভাসিতেছে ভানু-রশ্মিরাশি।

সর্গশেষে একটি চমৎকার ছত্র আছে। শচী-দেহ, অসুর, বৃত্রসভাতলে আনিল। দেখিয়া দৈত্যপতি,—

চমকি সম্ভ্রমে উঠি যেন দাঁড়াইল।

দশম সর্গারম্ভে ইন্দ্র কৈলাসপুরে যাইতেছেন। আমরা কৈলাসযাত্রা সম্বন্ধে দীর্ঘ বর্ণনাটি উদ্ধৃত করিব—পাঠকেরা, তজ্জন্য আমাদিগের প্রতি বিরক্ত না হইয়া কৃতজ্ঞ হইবেন, এমন বিশ্বাস আছে।

ক্রমে ব্যোমগর্ভে যত প্রবেশে বাসব,
ঊর্দ্ধে ঊর্দ্ধে পরস্পরে করি প্রদক্ষিণ
নিরখিলা সুসজ্জিত অন্তরীক্ষ মাঝে
জ্যোতি-বিমণ্ডিত কোটি গ্রহের উদয়।

দেখিলা ভ্রমিছে শূন্যে শশাঙ্কমণ্ডল
ধরাসঙ্গে, ধরা-অঙ্গ করি প্রদক্ষিণ,
প্রকাশিয়া চারুদীপ্তি সূর্য্যচারিধারে,
শীতল কিরণে পূর্ণ করিয়া গগন।

ভ্রমিছে সে সুধাকর পৃথিবী ছাড়িয়া
আরো ঊর্দ্ধ শূন্যদেশে, অতি দ্রুতবেগে,
চন্দ্রমা-বেষ্টিত চারি, চারু-শোভাময়,
দীপ্ত বৃহস্পতিতনু বেষ্টিয়া ভাস্করে।

সে সকলে রাখি দূরে কান্তি মনোহর,
ভাতি-উপবীত অঙ্গে, চলেছে ছুটিয়া
ভয়ঙ্কর বেগে শূন্যে ঘেরিয়া অরুণে,
সপ্ত কলানিধি সঙ্গে গ্রহ শনৈশ্চর।

দেখিলা সে কত শশী, কত গ্রহ হেন,
ব্যোমমার্গে ভ্রমে সদা ফুটিয়া কুটিল,
উজ্জ্বল কিরণমালা জড়ায়ে অঙ্গেতে,
অপূর্ব্ব ধ্বনিতে শূন্য করি আনন্দিত।

দেখিতে দেখিতে বেগে চলিলা বাসব
ঊর্দ্ধ ঊর্দ্ধ বায়ুস্তর করি অতিক্রম—
ধরাতল ক্রমে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর অতি
সুদূর নক্ষত্রতুল্য লাগিল ভাতিতে।

ক্রমে ক্ষীণ—লীনপ্রায়—মসীবিন্দুবৎ
হইল ধরণী-অঙ্গ, বাসব ক্রমশঃ
উঠিতে লাগিলা যত অনন্ত অম্বরে,
নিম্নদেশে ছাড়ি চন্দ্র শুক্র শনৈশ্চর।

অদৃশ্য হইল শেষে—বাসব যখন
ছাড়িলা সুদূর নিম্নে এ সৌর জগৎ,
বায়ুবিরহিত ঘোর অনন্তের মাঝে
উত্তরিলা আসি তীন কৈলাসপুরীতে।

শব্দশূন্য, বর্ণ-শূন্য প্রশস্ত, গম্ভীর,
ব্যাপৃত সে অন্তরীক্ষ, ব্যাস অন্তহীন,
বিকীর্ণ তাহার মাঝে, পূরি চতুর্দ্দিক,
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড-মূর্ত্তি ছায়ার আকারে।

বিম্বপ্রতিবিম্ব হেন দশ দিক যুড়ি
বিদ্যমান সে গগনে দেখিলা বাসব—
ফুটিতেছে, মিশিতেছে অনন্ত-শরীরে,
মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে, কোটি জলবিম্ববৎ।

বসিয়া তাহার মাঝে শম্ভু ব্যোমকেশ
ঐশ্বর্য্য-ভূষিত অঙ্গ, প্রশান্ত মূরতি,
প্রকাশিত বক্ষ, ভালে প্রগাঢ় ভাবনা;
তবু মনোহর যেন রজতের গিরি!

তথা শঙ্কর এবং উমা, অতি গূঢ় দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গের জল্পনায় আনন্দে কালাতিপাত করিতেছিলেন। এমত সময়ে ইন্দ্রকে সমাগত দেখিয়া, পার্ব্বতী তাঁহাকে সবিশেষ জিজ্ঞাসাবাদ করিলেন। ইন্দ্রও সকল কথা বলিলেন। এমত সময়ে সহসা শিবের জটা কম্পিত হইল; ইন্দ্রের হস্ত হইতে কার্ম্মুক স্খলিত হইল; গৌরীর চক্ষু হইতে অশ্রুবিন্দু পড়িল। শচীর ক্রন্দন কৈলাসে ধ্বনিত হইল। শুনিয়া ইন্দ্র দ্রুতবেগে স্বর্গাভিমুখে ছুটিতেছিলেন। শিব তাঁহাকে নিবারণ করিলেন। তখন ইন্দ্র গর্জ্জিয়া উঠিয়া, শঙ্করকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। সেই মহাতেজোময় দৃপ্ত বাক্য উদ্ধৃত করিবার স্থান নাই। মহাদেবও তখন বৃত্রের অত্যাচারে রুষ্ট হইয়া, সহসা সংহার-মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। পার্ব্বতী ঈশানকে শান্ত করিলেন। তিনি তখন ইন্দ্রকে দধীচির আলয়ে যাইতে উপদেশ দিলেন। দধীচির অস্থিতে বজ্রসৃষ্টি হইবে।

একাদশ সর্গের আরম্ভে স্বর্গপুরে দৈত্যজয়োৎসব। শচীকে দেখিতে দৈত্য-পুরবধূ ছুটিতেছে—তদ্বর্ণনা পাঠ করিয়া অনেকের কালিদাস কৃত, রঘু দেখিতে নাগরীদিগের গমন বর্ণনা স্মরণ হইবে।

এদিগে বৃত্র, বৃত্রপুত্র একত্র মিলিত হইলে উভয়ে আপনাপন যুদ্ধ সম্বাদ কহিতে লাগিলেন—বৃত্র সগর্ব্বে, রুদ্রপীড় বিনীতভাবে। তৎপরে ঐন্দ্রিলা শচীর আনয়ন সম্বাদে প্রীত হইয়া পুত্রকে তাহার রূপের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। রুদ্রপীড় শচীর রূপের অনেক প্রশংসা করিলেন। পুত্রমুখে শচীর রূপের কীর্ত্তন

শুনিয়া ঐন্দ্রিলার আর সহ্য হইল না। তিনি স্বামীকে আদেশ করিলেন যে তখনই শচীকে আনাইয়া তাঁহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত করা হউক—

"অলক্তে রঞ্জিবে শচী আজি এ চরণ।"

কৈলাসে পার্ব্বতী এই কথা শুনিয়া মহাদেবকে জানাইলেন। তখন মহাকালের ক্রোধাগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। তৎক্ষণে—

সংহার-ত্রিশূলাকৃতি জ্যোতিঃ বায়ুস্তরে
স্ফুরিতে লাগিল দীপ্ত বৈজয়ন্ত পরে।
চমকিল ব্যোমমার্গে ভাস্করের রথ;
অতল ছাড়িয়া কূর্ম উঠে অদ্রিবৎ;
বাসুকি গুটায় ফণা, মেদিনী কম্পিত;
উত্তাল উল্লোলময় সিন্ধু বিঘূর্ণিত;
তলেতে ভুজঙ্গকুল পাতালে গর্জ্জয়;
সদ্যোজাত শিশু মাতৃস্তন ছাড়ি রয়,
বিদীর্ণ বিমানমার্গ, গিরিশৃঙ্গ পড়ে;
চেতনে জড়ের গতি, গতিপ্রাপ্ত জড়ে;
টলমল টলমল ত্রিদশ আলয়;
মূর্চ্ছিত দেবতা-দেহে চেতনা উদয়,
দোদুল্য সঘনে শৃঙ্গ সুমেরুশিখর
ঘোর বেগে বৈজয়ন্ত কাঁপে থর থর!
ঐন্দ্রিলার হস্ত হৈতে খসিল কঙ্কণ;
কংপীড় অঙ্গে হৈল লোম-হরষণ;
নিঃশঙ্ক বৃত্রের নেত্রে পলক পড়িল,
"রুদ্রের ক্রোধাগ্নি-চিহ্ন" বলিয়া উঠিল॥

এইখানে অদৃষ্টের বিষময় বীজ রোপিত করিয়া কবি প্রথম খণ্ড সমাপ্ত করিয়াছেন। অপর খণ্ড কবে প্রকাশিত হইবে জানি না, কিন্তু বঙ্গীয় পাঠক তজ্জন্য যে ব্যগ্র হইয়া রহিলেন, ইহা আমরা হেমবাবুকে নিশ্চিত বলিতে পারি।

খণ্ডমাত্র প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া কাব্যের উপাখ্যান ভাগ, নায়ক-নায়িকাদিগের চরিত্র এবং কাব্যের নিগূঢ় মর্ম্ম সম্বন্ধে কিছুই বলিতে পারিলাম না। কাব্যের বিশেষ বিশেষ অংশ মাত্র উদ্ধৃত করা ব্যতীত আমরা আর কিছুই করি নাই। আমরা যে পরিমাণে উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাও গ্রন্থকারের অনুমতি ব্যতীত তুলিতে সক্ষম হইতাম না; গ্রন্থকার যে অনুগ্রহ করিয়া অনুমতি দিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি।

গ্রন্থকারের ছন্দঃসম্বন্ধে আমাদিগের কিছু বলা হয় নাই। ইউরোপে এ বিষয়ে একটি কুপ্রথা আছে; একটি ছন্দে এক একখানি বৃহৎ মহাকাব্য লিখিত হইয়া থাকে। ইহা পাঠকমাত্রেরই ক্লান্তিকর বোধ হয়। কতক কতক এই কারণে ইউরোপীয় মহাকাব্য সকল সামান্য পাঠকেরা আদ্যোপান্ত পড়িয়া উঠিতে পারে না। এদেশীয় প্রাচীন প্রথাটি ভাল—সর্গে সর্গে ছন্দঃ পরিবর্ত্তন হয়। মাইকেল মধুসূদন দত্ত দেশী প্রথা পরিত্যাগ করিয়া ইউরোপীয় প্রথা অবলম্বন করিয়া স্বপ্রণীত কাব্যসকলের কিঞ্চিৎ হানি করিয়াছিলেন। হেমবাবু দেশী প্রথাটিই বজায় রাখিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার কাব্যের বৈচিত্র্য এবং লালিত্য বৃদ্ধি হইয়াছে।

অমিত্রাক্ষর ছন্দঃসম্বন্ধেও মাইকেল মধুসূদন দত্ত ইংরেজি রীতি বিনা সংশোধনে অবলম্বন করিয়াছিলেন। এস্থলেও হেমবাবু ইউরোপীয় প্রথা পরিত্যাগ পূর্ব্বক,

শ্রেণী প্রথা বজায় রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তবে বাঙ্গালার মাত্রাবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া, "কেবল সচরাচর সংস্কৃত শ্লোকের চারি চরণে যেরূপ পদ সম্পূর্ণ হয়, তদ্রূপ চতুর্দ্দশাক্ষর বিশিষ্ট পংক্তির চারি পংক্তিতে পদ সম্পূর্ণ করিতে যত্নশীল হইয়াছেন।" কিন্তু মাত্রাবৃত্তি পরিত্যাগ করাতে, পদ্যের তাদৃশ ঔৎকর্ষ হয় নাই। বাবু বলদেব পালিত প্রভৃতি বাঙ্গালি কবিগণ দেখাইয়াছেন যে বাঙ্গালা ভাষায় সংস্কৃত ছন্দের উৎকৃষ্ট অনুকরণ হইতে পারে; এবং বীরাদি রসের অবতারণায় সংস্কৃত মাত্রাবৃত্ত ছন্দঃ সকলেই বিশেষ কৃতকার্য্য হওয়া যায়। আধুনিক কবিদিগের কথা দূরে থাকুক, স্বয়ং ভারতচন্দ্রে ইহার উদাহরণ আছে। অতএব হেমবাবু অক্ষরবৃত্ত অমিত্রাক্ষর ছন্দঃ পরিত্যাগ করিয়া উপজাতি মালিনী প্রভৃতি সংস্কৃত ছন্দ অবলম্বন করিলে বোধ হয় ভাল করিতেন। তাঁহার কবিত্ব ও তাঁহার কাব্য যেরূপ, তাঁহার অমিত্রাক্ষর পদ্য তাহার যোগ্য নহে। কিন্তু "একোহি দোষোগুণ সন্নিপাতেনিমজ্জতীত্যাদি।" আমরা বৃত্রসংহার পাঠ করিয়া অশেষ আনন্দলাভ করিয়াছি এবং কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি যে, হেমবাবু দীর্ঘজীবী হইয়া, বাঙ্গালার সাহিত্যের মুখোজ্জ্বল করিতে থাকুন।

দ্বিতীয় সংখ্যা

আমরা দেখাইয়াছি যে নিশ্বাসগত শোণিতসঞ্চারী অম্লজান, শোণিতমধ্যে মেদ না পাইলে শরীর ভাঙ্গিয়া শারীরিক সামগ্রী নষ্ট করে। কিন্তু মেদ ব্যতীত অন্য এক সামগ্রী আছে যে, শোণিত মধ্যে তাহা পাইলে, অম্লজান তাহার সঙ্গে মিলিত হইয়া যায়; তত মেদের প্রয়োজন করে না।

ময়দা ধৌত করিলে যে অংশে গ্লুটেন প্রাপ্ত হওয়া যায়,তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। ময়দা ধুইলে যে জল দুগ্ধের ন্যায় গড়াইয়া যায়, তাহাতে ময়দার যে অংশ আছে, তাহাকে ইংরেজিতে ষ্টার্চ বলে। ঐ ষ্টার্চের নির্ম্মাণ জলজান, অম্লজান ও অঙ্গারজানে হইয়া থাকে; জলজানে ও অম্লজানে জল হয়, অতএব জলে ও অঙ্গারজানে ষ্টার্চের নির্ম্মাণ বলা যাইতে পারে। তাহার সঙ্গে শোণিতস্থ অম্লজানের সংযোগে এই হয় যে, অম্লজানে ও অঙ্গারজানে আঙ্গারিক অম্লের উৎপত্তি হয়; এবং জল পৃথক্ হইয়া যায়। ঐ জল ও আঙ্গারিক অম্ল নিশ্বাসাদির দ্বারা বিনির্গত হয়।

ষ্টার্চের যেরূপ নির্ম্মাণ, শর্করারও সেইরূপ; বস্তুতঃ ষ্টার্চ মুখমধ্যে লালা সংযোগে শর্করায় পরিণত হয় এবং শর্করারূপেই শরীরমধ্যে গৃহীত হইয়া কার্য্য সম্পাদন করে। এবং শোণিতমধ্যে শর্করা থাকিলে, অম্লজানের সংযোগে সেইরূপ জল ও আঙ্গারিক অম্লের উৎপত্তি হয়।

অতএব খাদ্যের মধ্যে ষ্টার্চ, শর্করা বা মেদ থাকা প্রয়োজন; কেননা তদ্দারা নিশ্বাসাগত অম্লজানকর্ত্তৃক শরীরধ্বংস নিবারণ হয়। কিন্তু ষ্টার্চ বা শর্করা শরীর গঠনে লাগে না, অতএব উহার আতিশয্য নিষ্প্রয়োজনীয়। উহা গৃহীত হইয়া কর্ম্ম সমাধান্তে পরিত্যক্ত হয়। শরীরগঠনে মেদের প্রয়োজন, উহা যে সর্ব্বত্র শারীরিক সামগ্রী, তাহা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন, মাংসাদির রক্ষাজন্য গ্লুটেনযুক্ত খাদ্য এবং শরীরের অন্যান্য অংশের প্রয়োজনানুসারে ধাতব লবণাদি অন্যান্য সামগ্রী চাই।

এক্ষণে দেখা যাউক, কোন্ খাদ্যে কি আছে। আমাদিগের প্রধান খাদ্য চাউল। চাউলে ষ্টার্চ অত্যন্ত অধিক আছে, কিন্তু গ্লুটেন অতি অল্প। যদি খাদ্যের সামগ্রীবিশেষকে পুষ্টিকর বলিতে হয়, তবে যাহাতে অধিক পরিমাণে গ্লুটেন আছে, তাহাকেই পুষ্টিকর বলিতে হয়, কেননা, গ্লুটেনেই মাংস গঠিত হয় এবং মাংসেই বল। এবং দেখান গিয়াছে যে জল ব্যতীত অন্যান্য সামগ্রীর অপেক্ষা শরীরগঠন পক্ষে অধিক গ্লুটেনের প্রয়োজন। অতএব গ্লুটেনের অল্পতাহেতু চাউলকে পুষ্টিকর খাদ্য বলা যায় না।

যেমন চাউল আমাদের প্রধান খাদ্য, আয়র্লণ্ডে আলু তদ্রূপ। আলুও চাউলের ন্যায় অল্প গ্লুটেন সংযুক্ত। চাউলে গ্লুটেন সাতভাগ মাত্র, গোল আলুতে ৮ কি ৯ ভাগ মাত্র।

অনেক কাফ্রি জাতির কদলীই প্রধান খাদ্য। কদলী, চাউল ও গোল আলুর অপেক্ষাও অসার। উহাতে গ্লুটেন শতকরা পাঁচ ভাগের অধিক নহে। (এইজন্য কি কলা খাওয়া একটা গালাগালি ?)

এই তিন সামগ্রীতে ষ্টার্চ বা শর্করা প্রচুর পরিমাণে আছে, অতএব তাহাতে নিশ্বাসের দ্বারা শরীরের যে ধ্বংস তাহা উত্তমরূপে নিবারিত হয়। কিন্তু মাংসাদির যে ভাগ শ্রমজন্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তাহার পুনর্গঠন জন্য যে পরিমাণে গ্লুটেন প্রয়োজন, তাহা অনেক চাউল বা অনেক আলু বা অনেক কদলী না খাইলে পাওয়া যায় না। কোন কোন লেখক বলেন যে, চাউলের অসারতা হেতু হিন্দু প্রভৃতি তণ্ডুলভোজী জাতি অধিক পরিমাণে ভাত খায়, এজন্য তাহাদিগের উদরে অধিক আহারের স্থান আবশ্যক বলিয়া ক্রমে তাহারা স্থূলোদর হইয়া পড়ে। একথা কতদূর সত্য তাহা বলিতে পারি না।

অনেক জাতির প্রধান খাদ্য গম। ভারতবর্ষের যে সকল জাতি বলিষ্ঠ, তাহারা গম খাইয়া থাকে। ময়দায় চাউলের অপেক্ষা অধিক পরিমাণে গ্লুটেন আছে। উত্তম ময়দায় শতভাগে—

জল	১৬	ভাগ
গ্লুটেন	১০	”
মেদ	২	”
ষ্টার্চ প্রভৃতি	৭২	”

অতএব চাউল অপেক্ষা গোধূম যে সারবান্ খাদ্য তদ্বিষয়ে সংশয় নাই।

মাংস আরও পুষ্টিকারক। কোন মাংসে—হিন্দুয়ানি রক্ষার্থ আমরা তাহার নাম করিব না—শতভাগে—

জল ও রক্ত	৭৮
মাংসিক বা গ্লুটেন	১৯
মেদ	৩
ষ্টার্চ প্রভৃতি	
	১০০

কিন্তু যে সকল পশু গৃহপালিত, এবং যাহা সচরাচর ভুক্ত হয়, তাহাতে মেদের পরিমাণ আরও অধিক।

যদি জল বাদ দেওয়া যায় তবে অবশিষ্ট ভাগকে শত ভাগ করিলে, গৃহপালিত মেষাদির মাংসে পাওয়া যায়—

মাংসিক	৬৩	ভাগ
মেদ	৩০	„
রক্ত এবং ধাতব লবণ	৭	„
	১০০	

মাংসে যেমন অধিক পরিমাণে গ্লুটেন আছে, তেমন একেবারে ষ্টার্চ নাই। অতএব কেবল মাংসাহারে শরীর রক্ষা হইতে পারে না। তবে অধিক পরিমাণে মেদ থাকাতে, ষ্টার্চের কার্য্য তদ্দ্বারা কতক সিদ্ধ হয়। পালিত মেষাদির ন্যায় কুক্কুটে সচরাচর অধিক মেদ থাকে না। হরিণ-মাংসে অল্প মেদ, শূকরে অধিক। মৎস্যও মাংসবিশেষ। পশু-মাংসাপেক্ষা তাহাতে মেদ অল্প; সুতরাং মাংসিক অধিক। আমাদের দেশের লোকের বিশ্বাস যে পশু-মাংসই পুষ্টিকর, মৎস্যের কোন গুণ নাই, কিন্তু এ কথার কোন বিশেষ প্রমাণ আমরা দেখি নাই।*

আমরা যতগুলি দ্রব্যের কথা বলিয়াছি, তাহার একটি সামগ্রী এমত নহে যে কেবল সেই সামগ্রী মাত্র আহার করিয়া মনুষ্য অধিক কাল স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে পারে। সকলগুলিতে কোন না কোন দ্রব্যের অল্পতা আছে। গোধূমাদিতে গ্লুটেনের অল্পতা, এবং মাংসে ষ্টার্চের বা মেদের অল্পতা। কেবল দুগ্ধই মনুষ্য-খাদ্যের মধ্যে একা জীবনরক্ষায় সমর্থ। ইহাতে গ্লুটেন এবং শর্করা এবং মেদ তিনই আবশ্যকীয় পরিমাণে আছে। দুগ্ধে "কেসিন" নামে একটি সামগ্রী আছে, তাহাই গ্লুটেনের স্থানীয়। কাঁচা গোরুর দুগ্ধে শত ভাগে—

---

* কেহ কেহ বলেন যে মৎস্য অপত্যবর্দ্ধক। এই জন্য কি বঙ্গদেশে এত লোক ?

জল	৮৭
কেসীন	৪॥০
মেদ বা নবনীত	৩
শর্করা	৪৸০
ধাতব	৸০
	১০০

কাঁচা দুধ কেহ খায় না। জ্বাল দিলে জল কমিয়া যায়, সুতরাং কেসীনাদির অপেক্ষাকৃত আধিক্য হয়। শুষ্ক ক্ষীরের শত ভাগে—

কেসীন	৩৪৸০
নবনীত (মেদ)	২৩৸০
শর্করা	৩৭
ধাতব	৪॥০
	১০০

মনুষ্যদুগ্ধ, প্রায় গোদুগ্ধের ন্যায়—

জল	৮৯
কেসীন	৪
নবনীত	২॥৶০
শর্করা	৪।৶০
ধাতব লবণ	৶০

কেসীন বা পুষ্টিকর সামগ্রী মনুষ্যদুগ্ধাপেক্ষা গোদুগ্ধে অধিক ; গোদুগ্ধাপেক্ষা ছাগদুগ্ধে অধিক। এইজন্য মনুষ্য-শিশু সূতিকাগারে জল মিশাইয়া না খাইলে গোদুগ্ধ জীর্ণ করিতে পারে না। এবং এই জন্য ছাগদুগ্ধ দৌর্ব্বল্যের ঔষধস্বরূপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

বহুকাল ধরিয়া দুইটি সম্প্রদায়ে মনুষ্যখাদ্য লইয়া বিবাদ করিতেছেন। এক সম্প্রদায় বলেন যে মাংসই পুষ্টিকর, অতএব মনুষ্যের মাংস খাওয়া কর্ত্তব্য। আর এক সম্প্রদায় বলেন যে, উদ্ভিদ্ পদার্থ, ফল মূল শস্য, মাংসাপেক্ষা অধিক পুষ্টিকর, অতএব মাংস খাইবার প্রয়োজন নাই, উদ্ভিদ্ই মনুষ্যের খাদ্য। কতকগুলি ভ্রান্তি নিবন্ধনই এরূপ বিবাদ উত্থাপিত হওয়া সম্ভবে। আসল কথা এই যে, অনেক উদ্ভিজ্জাতীয় খাদ্য মাংসাপেক্ষা নিকৃষ্ট ; কিন্তু তাই বলিয়া যে উদ্ভিদ্ মাত্রই মাংসাপেক্ষা নিকৃষ্ট এমত নহে। অনেকগুলি যে মাংসের তুল্য, এবং কেহ

কেহ মাংসাপেক্ষাও উৎকৃষ্ট তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। অতএব মাংস ব্যতীত শরীর প্রতিপোষণ অসম্ভব নহে; কিন্তু অসম্ভব নহে বলিয়াই মাংস অখাদ্য নহে।

মটর, সীম, মসূরী, ছোলা, মাসকলাই, অড়হর প্রভৃতি দাল, মাংসের ন্যায় বা মাংসাপেক্ষা পুষ্টিকর। এই সকলে শত করা ২০ হইতে ২৪ ভাগ গ্লুটেন পাওয়া যায়। মেদ দুই ভাগ মাত্র। কথিত আছে যে এক সের শুষ্ক ছোলায় যত প্রাণরক্ষক ও পুষ্টিকর সামগ্রী আছে, অন্য কোন প্রকার মনুষ্যখাদ্যের এক সেরে তত পাওয়া যায় না। বাঁধা কপির ন্যায় অধিক পরিমাণে গ্লুটেন কোন খাদ্যেই নাই। ইহার শত ভাগে ৩৫ ভাগ গ্লুটেন। পিঁয়াজও অতি উৎকৃষ্ট খাদ্য। পুষ্টিকারিতায় ইহা ছোলার তুল্য—ইহার শত ভাগের মধ্যে ২৫, ৩০ ভাগ গ্লুটেন।

যাহাতে অধিক গ্লুটেন আছে তাহাই আমরা পুষ্টিকারক বলিয়াছি, কিন্তু ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, কেবল গ্লুটেন সংগ্রহ মাত্র, আহারের উদ্দেশ্য নহে। স্টার্চ, মেদ, ধাতবাদি সকলই আহার্য্য মধ্যে যথাপরিমাণে থাকা আবশ্যক। যাহাতে অন্যান্য দ্রব্য উপযুক্ত পরিমাণে থাকে, অথচ গ্লুটেন অধিক থাকে, তাহাই ভাল এবং তাহাকেই আমরা পুষ্টিকর বলিয়াছি। গ্লুটেনের আধিক্যও অনিষ্টকারক। যে সকল সামগ্রীতে গ্লুটেন অধিক, তাহা প্রায় মলবদ্ধ করে; এবং মেদসাহায্য ব্যতীত সুজীর্ণ হয় না। এজন্য তাহা ঘৃতাদি মেদযুক্ত সামগ্রীর সহিত পাক করিয়া খাইতে হয়। বস্তুতঃ পাকের রীতি, এবং নানাবিধ সামগ্রী একত্রিত করিয়া আহার করার রীতি, মনুষ্যের পরমোপকারী। এক খাদ্যে সকল প্রয়োজনীয় সামগ্রী পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু নানাগুণবিশিষ্ট নানাজাতীয় আহার্য্য একত্রে আহার করায় সে অভাবের মোচন হয়। গোধূমে মেদ অল্প, এজন্য আমরা ময়দা ঘৃতে ভাজিয়া লুচি করিয়া, অথবা রোটি করিয়া, তাহাতে ঘৃত মাখিয়া খাই। ইউরোপীয়েরাও রোটিতে মাখন দিয়া খায়। এইজন্য ছোলা, অড়হরাদির দাল, এবং মৎস্যাদি, যাহাতে অল্প মেদ, তাহাতে তৈল বা ঘৃত দিয়া না রাঁধিলে জীর্ণ হয় না।

অনেকেই এই কথা বলিয়া থাকেন, এবং আমরাও কখন কখন বলিয়াছি যে, তণ্ডুলভোজী বাঙ্গালির আহার অত্যন্ত অসার। বাঙ্গালি গোধূম এবং মাংস খায় না বলিয়াই বাঙ্গালির বলহীনতা এবং অস্বাস্থ্য, ইহা অনেকের বিশ্বাস। তণ্ডুল অসার বটে, কিন্তু বাঙ্গালি কেবল ভাত খায় না। ভাতের সঙ্গে মৎস্য, দাল, সীম, কপি প্রভৃতি শাক এবং ঘৃত ও দুগ্ধ খাইয়া থাকে। মৎস্য, দাল এবং অনেক তরকারিতে বরং মাংসপেক্ষাও অধিক পরিমাণে গ্লুটেন আছে। সুতরাং মাংসভোজনের যে ফল তাহা তদ্ভোজনে অবশ্যই ঘটে। দুগ্ধও পুষ্টিকর খাদ্য। ঘৃত ও দুগ্ধ হইতে সমুচিত পরিমাণে মেদ পাই

—বরং তাহার কিছু আতিশয্যই ঘটিয়া থাকে। অতএব বাঙ্গালির আহার যে অসার, এবং মাংসাহার না করাতেই যে আমাদের এ দশা, একথা সত্য নহে। তবে ইহা সত্য বটে যে, এইরূপ মিশ্রিত আহার, সম্পন্ন ব্যক্তিরাই করিয়া থাকেন। কৃষকাদি দরিদ্র শ্রমজীবীরা কেবল দাল ভাত খায়। কিন্তু দাল যদি যথেষ্ট পরিমাণে খায়, তাহা হইলেই গ্লুটেনের অভাব মোচন হইল। যাহাদের কপালে তাহাও ঘটে না—যাহারা কেবল নুণ ভাত খায়, তাহাদিগের আহার অস্বাস্থ্যকর বটে। এমন লোকও বঙ্গদেশে অনেক আছে—ইহা আমাদের দুর্ভাগ্য সন্দেহ নাই।

এইরূপে সকল জাতিই নানাবিধ আহার্য্য মিশাইয়া, একের দ্বারা অন্যের দোষ খণ্ডন করিয়া খায়। আয়র্লণ্ডীয়েরা গোল আলুর উপর নির্ভর করে, কিন্তু চাউলের ন্যায় গোল আলুতেও গ্লুটেন অল্প। তাহারা সেজন্য গোল আলুর সঙ্গে কপি মিশায়। কপিতে অনেক গ্লুটেন আছে, তাহা বলা হইয়াছে।

আমরা বলিয়াছি যে, শরীরের অধিকাংশ জল। নিশ্বাসাদিতে নির্গত হয়,—জল। এজন্য শরীর মধ্যে জলের বিশেষ প্রয়োজন। আমরাও সর্ব্বদা জলপান করিয়া থাকি এবং অন্যান্য আহার্য্যের সঙ্গেও জল পাই। কিন্তু জলের আরও প্রয়োজন আছে। শুষ্ক পদার্থ আমরা জীর্ণ করিতে পারি না; উদর মধ্যে যাহা কঠিন থাকে তাহা শরীরে গৃহীত হয় না। আমরা যাহা খাই, তাহাই জলযুক্ত; দুগ্ধাদি এবং অধিকাংশ ফলমূলের স্বাভাবিকাবস্থাতেই অনেক জল থাকে; যাহাতে না থাকে, তাহা আমরা জল দিয়া সিদ্ধ করিয়া লই বা জল মাখিয়া তরল করিয়া লই।

যেমন জল, গ্লুটেন, মেদ ও ষ্টার্চের প্রয়োজন, খাদ্যমধ্যে তদ্রূপ আরও কতকগুলি সামগ্রীর অল্পপরিমাণে প্রয়োজন আছে। উদাহরণস্বরূপ লবণের কথা উল্লেখ করিব।

যে কেহ রক্তের স্বাদ জানে, সেই জানে যে রক্ত লবণাক্ত। বস্তুতঃ শোণিতে লবণ আছে। রক্তের পক্ষে ঐ লবণ নিতান্ত প্রয়োজনীয়। তদ্ভিন্ন লবণে সোডা আছে। সোডা পিত্তে আছে। পিত্ত জীরণ কার্য্যে নিতান্ত আবশ্যক। লবণ প্রত্যহ অজ্ঞাত ঘর্ম্মে এবং প্রস্রাবে মুহুর্মুহু নির্গত হইয়া যাইতেছে। তাহার পুনঃসঞ্চার সেইজন্য নিতান্ত প্রয়োজনীয়। এজন্য সলবণ খাদ্য খাইতে হয়। উপকথায় পড়া যায় যে বন্যজাতীয়েরা লবণ খাইতে জানে না, বাস্তবিক সে কথা প্রকৃত নহে। লবণ ব্যতীত মনুষ্যের জীবন রক্ষার সম্ভাবনা নাই। এবং মনুষ্যকে কিছুকাল লবণ খাইতে না দিলে পীড়িত

হইয়া মরিয়া যায়। এমনও কথিত আছে যে, ইউরোপে পূর্ব্বকালে লবণশূন্য খাদ্য খাওয়াইয়া বধরূপ একটি ভয়ঙ্কর দণ্ড প্রচলিত ছিল। যে ব্যক্তির প্রতি এই দণ্ড ব্যবহৃত হইত, তাহার শরীর গলিত হইয়া কীটে সমাচ্ছন্ন হইত—এইরূপে সে প্রাণত্যাগ করিত। পশুদিগকে লবণপ্রিয় দেখা যায়। পশুগণ লবণাম্বু পান করিতে গিয়া থাকে—অথবা লবণোৎপাদক ভূমি লেহন করে। পালিত পশুদিগকে লবণ দিলে সহর্ষে আহার করে। ঘোড়ার দানাতেও লবণ মিশাইয়া দিতে হয়।

আমাদিগের বিশ্বাস আছে যে জল যত নির্ম্মল হইবে, ততই শরীরের পক্ষে উপকারী, কথাটি সকল সময় সত্য নহে। ধাতব নির্ঝরিণীর জল গৈরিক মিশ্রিত; এজন্য সে সকল জল ঔষধস্বরূপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যাহার শোণিতে লৌহের অভাব আছে, লৌহমিশ্রিত নির্ঝরিণীর জলে তাহার পীড়ার শান্তি হইবে। চা খড়ি প্রভৃতি চূণসংযুক্ত স্তর হইতে যে সকল জল আইসে, তাহা পান করিলে উদরে যে চূণ যায়, তাহাতে অম্লের দমন হয়। যাহার সে জল পান করা অভ্যাস, সে যদি সহসা স্বাস্থ্যবাতিকগ্রস্ত হইয়া সে জল ছাঁকিয়া খাইতে আরম্ভ করে, তবে তাহার অজীর্ণ এবং অম্লরোগের সম্ভাবনা। আয়র্লণ্ডের ভূমিতলে চূণক প্রস্তরের স্তর আছে বলিয়া তথাকার জলে এইরূপ চূণ থাকে। গোল আলুতে চূণ নাই; এজন্য খাদ্য পেয়মধ্যে সুসম্বন্ধ ঘটিয়াছে। গোধূমে চূণ আছে; গোধূম যদি আয়র্লণ্ডের সাধারণের খাদ্য হইত তাহা হইলে চূণের আধিক্য পীড়াকর হইত। এইরূপ অনেক সময়ে জনসমাজের খাদ্য অন্যান্য বিষয়ে নিকৃষ্ট হইলেও দেশোপযোগী হইয়া থাকে।

উপসংহার কালে বক্তব্য যে সম্প্রতি ওয়েষ্টমিনিষ্টর রিবিউতে "মনুষ্যের সর্ব্বোৎকৃষ্ট খাদ্য" ইতি শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। তৎপ্রবন্ধ লেখকের মতে, উদ্ভিদ্ই উৎকৃষ্ট খাদ্য এবং তাহা মাংসাপেক্ষা পুষ্টিকর। প্রবন্ধটি ভ্রান্তিপরিপূর্ণ, এবং এ প্রদেশে কেহ কেহ সেই মতের পক্ষপাতী হইয়াছেন বলিয়া আমাদের ইচ্ছা ছিল যে, তাহার প্রতিবাদ করি। কিন্তু স্থানাভাবে এবার কিছু বলা হইল না। অবকাশ হয় ত বারান্তরে বলিব।

১

বঁধুরে হেরিব বলে যমুনা পুলিনে লো
নিতি নিতি কত আসি যাই।
মত্ত বারণ সম, হিয়ে মুঝ মাতল,
অহনিশ হেরিতে কানাই॥
নটবর নাগর, রূপ গুণ সাগর,
জারল বিরহ হুতাশে।
কবলহি পাগর, রজনী উজাগর,
জাগর প্রেম-পিয়াসে॥

২

সজনি লো আজু এ ঘোর পরমাদ।
অমূল সে নিধি হম, যতনে ন পারলু
দারুণ বিধিসে বিবাদ॥
দরশ পাই নিতি, সরস পরশ-সুখ,
তরসে হৃদয় ভেল ভোর।
মরমে মরম কথা, কহই না পারই,
রমণী পরাণ কঠোর॥

৩

সই লো পীরিতি সে বিষম বেয়াধি।
যে জন আছিল পর, সেই সে আপন ভেল,
আপন অব ভেল বাদী॥
সহচরীগণ মেলি, করত রভস কেলি,
যাওত গাওত তানে।
নাহি শুনি নাহি হেরি, আপন পাশরি,
শ্যামর বাঁশরী গানে॥

৪

সই লো কত সহে পাপ পরাণ।
পিককুল কলরব, প্রেম মহা মহোৎসব,
মধুপ করত মধু পান।
মৃদুল পবন বহে, বিরহিহৃদয় দহে,
চকোর চুম্বিত শশী হাসে।
নিকুঞ্জে কুসুম ভাতি, পারিজাত যূথি জাতি,
কুমুদিনী সরসে উল্লাসে॥
সখিরে যমুনা তীরে শ্যাম বিলাসে।

রক্ষ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

অমরনাথ মিষ্টালাপে প্রবৃত্ত হইলেন—যেন আমি তাঁহার পরম সুহৃদ্—যেন কাহারও মনে কোন মালিন্য নাই—কোন দিকে কোন গোলযোগের কথা উপস্থিত হয় নাই। আমিও সেইরূপ করিতে লাগিলাম। আপনারা কেহ যদি মনে করিয়া থাকেন যে, আমি অমরনাথের সঙ্গে বিবাদ-বচসা করিতে বা তাহাকে কোন প্রকার অনুরোধ করিতে আসিয়াছি, তবে আপনারা মহা ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। বিবাদ বচসা করিলে কোন্ উপকার হইবে? আর অনুরোধেই বা কে ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া থাকে? আমার সে সকল অভিপ্রায় ছিল না। যে অভিপ্রায়ে এত সন্ধান করিয়া আসিয়াছিলাম, তাহা গোপন করিয়া, আমিও মিষ্টালাপে প্রবৃত্ত হইলাম। অতি ধূর্ত্তের সঙ্গে কার্য্য, ইহা স্মরণ রাখিলাম। কিন্তু সে অভিপ্রায় আমার সিদ্ধ হইল না।

কথোপকথন মধ্যে কিঞ্চিৎ অবসর পাইয়া আমি বলিলাম, "আপনার সঙ্গে কথোপকথনে বড়ই প্রীতি পাই। এক্ষণে আমাদিগের মধ্যে মামলা মোকদ্দমা উপস্থিত হইতে চলিল—ভরসা করি, তাহাতে সম্প্রীতির স্থানে বৈরিতা উপস্থিত হইবে না।"

আমার বোধ ছিল, অমরনাথ মিষ্টভাষী শঠের মত মধুমাখা মিথ্যা কথায় উত্তর দিবেন। কিন্তু অমরনাথ তাহা না করিয়া স্পষ্ট কথাই বলিলেন—যাহা বলিলেন, তাহা সত্যবাদী, বুদ্ধিমান্, উদারচরিত্রের কথা। বলিলেন, "কি প্রকারে সম্প্রীতি থাকিবার সম্ভাবনা? আপনাদিগের অবশ্য এরূপ ধারণা আছে যে আমি একটা মিথ্যা কাণ্ড উপস্থিত করিয়া আপনাদিগের সম্পত্তি অপহরণ করিতেছি; এ ধারণা না থাকিলে মোকদ্দমার প্রয়োজন হইবে কেন? যদি আপনার এরূপ বিশ্বাস থাকে, তবে আপনি আমাকে ভালবাসিবেন কি প্রকারে? আর আমি যদি বিবেচনা করি যে, আপনারা আমার যথার্থ প্রাপ্য হইতে আমাকে বঞ্চিত

করিয়া অনর্থক আদালতে দুঃখ দিতে ইচ্ছা করিতেছেন, তবে আমিই বা আপনাদিগের প্রতি ভক্তিমান হইব কি প্রকারে ?"

আমি বলিলাম, "যে দিন আমার মনে বিশ্বাস হইবে যে রজনীর সম্পত্তি আমরা ভোগ করিতেছি সেই দিন আমি সে সম্পত্তি পরিত্যাগ করিব।"

অমর। তবে আপনার সে বিশ্বাস এখনও হয় নাই ?

আমি। কিসে হইবে ?

অমর। আমাদিগের যে প্রমাণাদি আছে, তাহা বিষ্ণুরাম বাবুর কাছে দেখিয়া থাকিবেন।

আমি। প্রমাণের একটি ইয়াদদাস্ত দেখিয়াছি ; দলিলগুলি দেখি নাই।

অমর। দলিলগুলি আমার কাছে আছে। যদি আপনার বিশ্বাস জন্মাইতে পারিলেই মোকদ্দামার দায় হইতে উদ্ধার পাই, তবে যত্ন করিয়া আপনাকে দলিলগুলি দেখাইতে হইতেছে। এখন দেখিবেন কি ?

এরূপ সরল ব্যবহার আমি অমরনাথের নিকট প্রত্যাশা করি নাই। বলিলাম, "অবশ্য দেখিব।"

অমরনাথ একটি বাক্স আনিয়া, তাহা হইতে দলিলের তাড়া বাহির করিলেন। তাড়া খুলিতে খুলিতে বলিলেন, "বোধ হয় যে, হরেকৃষ্ণ দাসের যদি কন্যা বর্ত্তমান থাকে, তবে সে যে মনোহর দাসের উত্তরাধিকারিণী, তদ্বিষয়ে আপনার সংশয় নাই ?"

আমি বলিলাম, "আইন অনুসারে সে উত্তরাধিকারিণী কি না, তাহা আমি বলিতে পারি না, কেননা আমি আইনজ্ঞ নহি। কিন্তু আইন অনুসারে হউক বা না হউক, আমার নিকট ধর্ম্মতঃ সে আমার পিতামহের বিষয় পাইতে পারে বটে।"

অমরনাথ সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন যে, "এরূপ ভদ্রলোকের সহিত আমাকে এ কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইতেছে, তাহাতে আমাকে অধিক কষ্ট পাইতে হইবে না। এক্ষণে দেখুন, এই জোবানবন্দী কাহার।"

এই বলিয়া অমরনাথ একটি "জাবেতা নকল" আমার হাতে দিলেন। সেই নকল একটি সাক্ষের জোবানবন্দীর।

আমি পড়িয়া দেখিলাম যে, জোবানবন্দীর বক্তা হরেকৃষ্ণ দাস। মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে তিনি এক বালাচুরির মোকদ্দামায় এই জোবানবন্দী দিতেছেন। জোবানবন্দীতে, পিতার নাম ও বাসস্থান লেখা থাকে ; তাহাও পড়িয়া দেখিলাম। তাহা মনোহরদাসের পিতার নাম ও বাসস্থানের সঙ্গে মিলিল। অমরনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "মনোহর দাসের ভাই হরেকৃষ্ণের এই জোবানবন্দী বলিয়া আপনার বোধ হইতেছে কি না ?"

আমি। বোধ হইতেছে।

অমর। যদি সংশয় থাকে তবে এখনই তাহা ভঞ্জন হইবে। পড়িয়া যাউন।

পড়িতে লাগিলাম যে সে বলিতেছে, "আমার ছয় মাসের একটি কন্যা আছে। এক সপ্তাহ হইল তাহার অন্নপ্রাশন দিয়াছি। অন্নপ্রাশনের দিন বৈকালে তাহার বালা চুরি গিয়াছে।"

এই পর্য্যন্ত পড়িয়া দেখিলে, অমরনাথ বলিলেন, "দেখুন কতদিনের জোবানবন্দী ?"

জোবানবন্দীর তারিখ দেখিলাম, জোবানবন্দী উনিশ বৎসরের।

অমরনাথ বলিলেন, "ঐ কন্যার বয়স এক্ষণে হিসাবে কত হয় ?"

আমি। উনিশ বৎসর কয় মাস—প্রায় কুড়ি।

অমর। রজনীর বয়স কত অনুমান করেন ?

আমি। প্রায় কুড়ি।

অমর। পড়িয়া যাউন; হরেকৃষ্ণ কিছু পরে বালিকার নামোল্লেখ করিয়াছেন।

আমি পড়িতে লাগিলাম। দেখিলাম যে, একস্থানে হরেকৃষ্ণ পুনঃপ্রাপ্ত বালা দেখিয়া বলিতেছেন, "এই বালা আমার কন্যা রজনীর বালা বটে।"

আর বড় সংশয়ের কথা রহিল না—তথাপি পড়িতে লাগিলাম। প্রতিবাদীর মোক্তার হরেকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "তুমি দরিদ্র লোক। তোমার কন্যাকে সোনার বালা দিলে কি প্রকারে ?" হরেকৃষ্ণ উত্তর দিতেছে, "আমি গরিব, কিন্তু আমার ভাই মনোহর দাস দশটাকা উপার্জ্জন করেন। তিনি আমার মেয়েকে সোনার গহনাগুলি দিয়াছেন।"

তবে যে এই হরেকৃষ্ণ দাস আমাদিগের মনোহর দাসের ভাই, তদ্বিষয়ে আর সংশয়ের স্থান রহিল না।

পরে মোক্তার আবার জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "তোমার ভাই তোমার পরিবার বা তোমার আর কাহাকে কখন অলঙ্কারাদি দিয়াছে ?"

উত্তর। না।

পুনশ্চ প্রশ্ন। সংসার খরচ দেয় ?

উত্তর। না।

প্রশ্ন। তবে তোমার কন্যাকে অন্নপ্রাশনে সোনার গহনা দিবার কারণ কি ?

উত্তর। আমার এই মেয়েটি জন্মান্ধ। সেজন্য আমার স্ত্রী সর্ব্বদা কাঁদিয়া থাকে। আমার ভাই ও ভাইজ তাহাতে দুঃখিত হইয়া, আমাদিগের মনোদুঃখ যদি কিছু নিবারণ হয় এই ভাবিয়া অন্নপ্রাশনের সময় মেয়েটিকে এই গহনাগুলি দিয়াছিলেন।

জন্মান্ধ! তবে যে সে এই রজনী তদ্বিষয়ে আর সংশয় কি?

আমি হতাশ হইয়া জোবানবন্দী রাখিয়া দিলাম। বলিলাম "আমার আর বড় সন্দেহ নাই।"

অমরনাথ বলিলেন, "অত অল্প প্রমাণে আপনাকে সন্তুষ্ট হইতে বলি না। আর একটা জোবানবন্দীর নকল দেখুন।"

দ্বিতীয় জোবানবন্দীও দেখিলাম যে, উহাও ঐ কথিত বালাচুরির মোকদ্দামায় গৃহীত হইয়াছিল। এই জোবানবন্দীতে বক্তা রাজচন্দ্র দাস। তিনি একমাত্র কুটুম্ব বলিয়া ঐ অন্নপ্রাশনে উপস্থিত ছিলেন। তিনি হরেকৃষ্ণের শ্যালীপতি বলিয়া আত্মপরিচয় দিতেছেন। এবং চুরির বিষয় সকল সপ্রমাণ করিতেছেন।

অমরনাথ বলিলেন, "উপস্থিত রাজচন্দ্র দাস সেই রাজচন্দ্র দাস। সংশয় থাকে, ডাকিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করুন।"

আমি বলিলাম, "নিষ্প্রয়োজন।"

অমরনাথ আরও কতকগুলি দলিল দেখাইলেন, সে সকলের বৃত্তান্ত সবিস্তারে বলিতে গেলে, সকলের ভাল লাগিবে না। ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, এই রজনী দাসী যে হরেকৃষ্ণ দাসের কন্যা তদ্বিষয়ে আমার সংশয় রহিল না। তখন দেখিলাম বৃদ্ধ পিতা মাতা লইয়া, অন্নের জন্য কাতর হইয়া বেড়াইব!

অমরনাথকে বলিলাম, "মোকদ্দমা করা বৃথা। আপনি নালিশ করিবেন না। বিষয় রজনী দাসীর, তাঁহার বিষয় তাঁহাকে ছাড়িয়া দিব। তবে আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর এ বিষয়ে আমার সঙ্গে তুল্যাধিকারী। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিবার অপেক্ষা রহিল মাত্র। আর একটি ভিক্ষা আছে।"

অমরনাথ বলিলেন, "আজ্ঞা করুন।" আমি বলিলাম, "আমাদিগের হিন্দু সমাজের এমত রীতি নহে যে ভদ্রলোকে ভদ্রলোকের পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। তবে রজনীর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ সেরূপ নহে। রজনীকে আমাদিগের পরিবারস্থা বলিলেও হয়। অতএব আমি যদি তাহার সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করিতে চাহি, তবে আপনি বিস্মিত হইবেন না।"

"কিছুমাত্র না—বরং এখনই সাক্ষাৎ করুন," এই বলিয়া অমরনাথ আমাকে অন্তঃপুরে ডাকিয়া লইয়া গেলেন। এবং রজনীকে আমার কাছে ডাকিয়া দিয়া বিশ্বাস বা ভদ্রতা দেখাইবার জন্য স্বয়ং কর্ম্মান্তরে গেলেন।

আমি রজনীর কাছে বিষয় ভিক্ষা লইতে আসি নাই—তাহার অপেক্ষা দারিদ্র্য বা অনশনে মৃত্যুও ভাল। কিন্তু রজনী কি বলে, তাহা জানিবার জন্য আমার কৌতূহল ছিল। রজনী আমার বিমাতার কাছে অনেক বিষয়ে উপকৃতা। ইতর লোকে অসময়ের উপকার সময়ে মনে রাখে না। কিন্তু আমার স্থির বিবেচনা ছিল, রজনীর স্বভাব সেরূপ ইতর নহে। তজ্জন্য রজনী যদি বিষয় লইতে কুণ্ঠিত হয়, তবে তাহাকে বুঝাইয়া দিব যে, কুণ্ঠিত হওয়া নিষ্প্রয়োজন। আরও ইচ্ছা ছিল, কেনই বা সে পলাইয়াছিল, অমরনাথের সঙ্গে কি প্রকারেই বা বিবাহ ঘটিল, যদি জানিতে পারি, তাহাও জানিব। কিন্তু ইহাও বিস্মৃত হই নাই যে, এসকল কথা এসময়ে এস্থানে জিজ্ঞাসা করা অকর্ত্তব্য। শেষ কথা, আর একটি পরীক্ষা—কিন্তু সেটি মনে স্থান দিতে পারিলাম না—কেননা এখন রজনীর বিবাহ হইয়াছে। যাহা হউক, নিতান্ত কৌতূহলপরায়ণ হইয়াই আমি রজনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে চাহিয়াছিলাম।

রজনী আসিয়া কিছু বলিল না,—নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। আমি বলিলাম, "আমি শচীন্দ্র। একটা কথার জন্য আসিয়াছি।"

রজনী মৃদুস্বরে বলিল, "আজ্ঞা করুন।"

আমি বলিলাম, "তুমি নাকি আমাদিগকে নিঃস্ব করিয়া বিষয় কাড়িয়া লইতেছ?"

রজনী বলিল, "বিষয় আমার।"

হরি বোল!

বিষয় রজনীর হউক, কিন্তু রজনী যে আমার মুখের উপর একথা বলিবে, এমত কখন আমি মনে করি নাই। পুনরপি বলিলাম, "বিষয় আমার পিতামহের—তুমি আমার পিতামহের কে?"

রজনী বলিল, "কেহ নই। তবে আইনমতে আমি পাই।"

রজনীকে বিষয় ছাড়িয়া দিব, ইহা পূর্ব্বেই স্থির করিয়াছিলাম, তবে, এখন রজনীর কথায় বিরক্ত হইয়া বলিলাম, "আইনমতে পাইলেই কি লইবে?"

রজনী বলিল, "আমি বিষয় লইব।"

আমি রাগ করিয়া বলিলাম, "তুমি এমন রাক্ষসী তাহা জানিতাম না।"

এই বলিয়া আমি বাহিরে যাইব বলিয়া পশ্চাৎ ফিরিলাম। তখন রজনী ছিন্ন কদলীতরুবৎ ভূমিতে পড়িয়া গেল—তাহার কণ্ঠনির্গত চীৎকার আমার কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিল—এরূপ কাতর, এরূপ সকরুণ চীৎকার আমি কখন শুনি নাই। ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলাম রজনী মূর্চ্ছিতা।

নিকটস্থ পাত্রে জল ছিল, তাহা রজনীর মুখে সিঞ্চন করিতে লাগিলাম, এবং বস্ত্রের দ্বারা ব্যজন করিতে লাগিলাম। কাহাকেও ডাকিলাম না। দেখিতে লাগিলাম, বাত্যাপতিত বৃষ্টিজলসিক্ত প্রস্তর-পুত্তলীর ন্যায় রজনী পড়িয়া রহিয়াছে।

কিয়ৎক্ষণ পরে তাহার চৈতন্য হইল। জ্ঞানপ্রাপ্তির পর আমার কণ্ঠস্বর শুনিয়া রজনী অতিকষ্টে, রুদ্ধস্বরে বলিল, "আপনি এখান হইতে যান। কোন কালে যদি আপনাকে ডাকিয়া পাঠাই, তবে আসিবেন, দুই একটা কথা বলিবার আছে। এখন কেন আসিয়াছেন?"

আমি ভাবিতে ভাবিতে ধীরে ধীরে চলিয়া গেলাম।

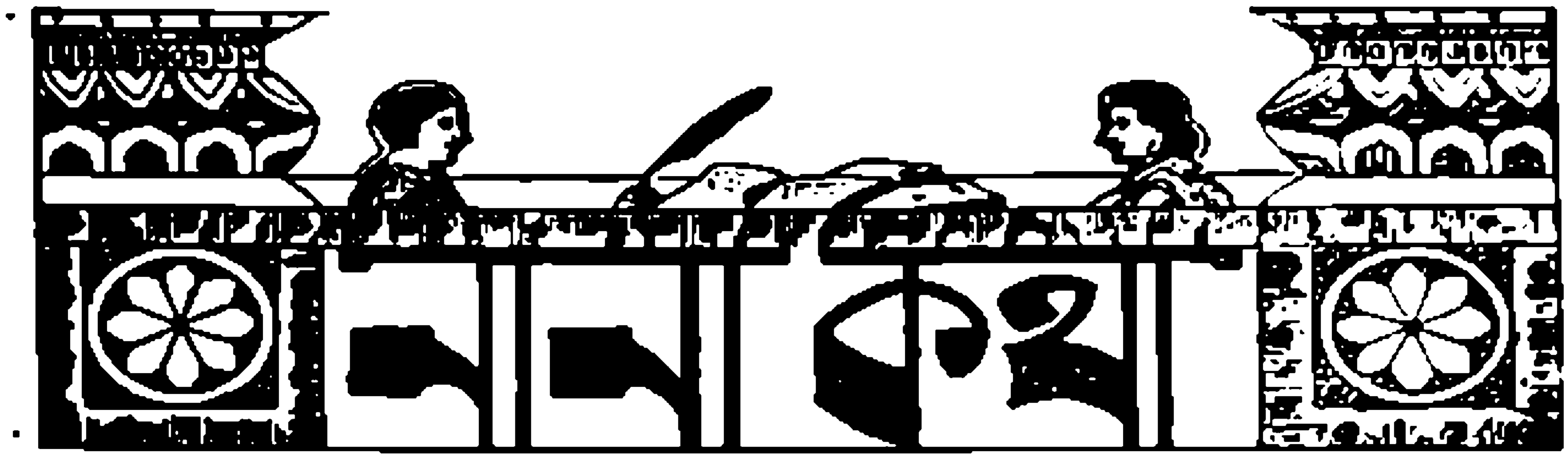

নানা কথা

[বঙ্গদর্শনে সংক্ষিপ্ত সমালোচনা উঠিয়া গিয়াছে ; কিন্তু যাঁহারা দীর্ঘ প্রবন্ধ নিয়ত পাঠ করিতে ইচ্ছা করেন না, তাঁহাদিগের প্রীত্যর্থ আমরা "নানা কথার" সন্নিবেশ আরম্ভ করিলাম]

এই বৎসরের এক সংখ্যক কর্ণহিল মাগাজিনে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার শিরোনাম, "সূর্য্য বুদ্বুদ মাত্র।" অর্থ এই যে, যেমন জলবুদ্বুদের বাহিরের আবরণ, অতি সূক্ষ্ম জলীয় ত্বক্ এবং ভিতরে বায়ু, সূর্য্যের তদ্রূপ বাহিরে দ্রবীভূত জলবৎ পদার্থের সূক্ষ্ম আবরণ এবং ভিতরে বায়বীয় পদার্থ। তবে, সূর্য্যের আবরণ জলের নহে, দ্রবীভূত লৌহাদি ধাতব পদার্থের। যিনি এই আশ্চর্য্য তত্ত্বের মর্ম্মগ্রহ করিতে চাহেন, তিনি গত অক্‌টোবর মাসের কর্ণহিল পাঠ করিবেন। এ মতটি বিখ্যাত আমেরিক জ্যোতির্ব্বিদ্ ইয়ঙ্ সাহেবের।

আমেরিকার বিখ্যাত চিকিৎসক ক্লার্ক সাহেব বলিয়াছেন যে, স্ত্রীলোকদিগের স্বাস্থ্যরক্ষার্থ ইহা নিতান্ত প্রয়োজনীয় যে, তাঁহারা মাসে তিন সপ্তাহ মাত্র কার্য্য করিয়া, সময়বিশেষে এক সপ্তাহ বিশ্রাম করেন। আমাদিগের প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা বোধ হয় এই বৈজ্ঞানিক তত্ত্বটি জানিয়াই দিবসত্রয় কার্য্য বিরতির বিধান করিয়াছিলেন। ইহুদীদিগের মধ্যেও ঐরূপ নিয়ম আছে। আমাদিগের প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা যে ইউরোপীয়দিগের অজ্ঞাত অতি গূঢ় বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সকল অবগত ছিলেন, তাহার আরও অনেক প্রমাণ আছে। আজি কালি দুই একজন শারীরতত্ত্ববিৎ বলিতেছেন যে মৎস্য ভোজনে রিপুবিশেষ অত্যন্ত বলবান্ হয়, কিন্তু দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে হিন্দু শাস্ত্রকারেরা আজ্ঞা প্রচার করিয়াছিলেন যে, যেখানে হিন্দু বিধবারা আর বিবাহ করিতে পারিবে না—সেখানে মৎস্য তাহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ।

ফর্ম্মোসা উপদ্বীপের কিয়দংশে চীনেরা বাস করে, অপরাংশে অসভ্য অধিবাসীরা থাকে। অসভ্যদিগের মধ্যে কতকগুলি কৌতুকাবহ রীতি প্রচলিত আছে। তাহাদিগের মধ্যে স্ত্রীলোকেরাই পুরোহিত। চত্বারিংশৎ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে, স্বামী যদি স্ত্রীর সাক্ষাৎ লাভে ইচ্ছুক হয়েন, তবে চুরি করিয়া সাক্ষাৎ করিতে

হইবে। যদি কেহ জানিতে পারে যে, উনচত্বারিংশৎ বর্ষ বয়স্ক শিশু স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছে তবে বড় প্রমাদ। স্ত্রীলোক যদি সপ্তত্রিংশৎ বর্ষ বয়সের পূর্ব্বে সন্তান প্রসব করে, তবে আইন অনুসারে শিশুটিকে বধ করিতে হয়। অনেকে বলিতে পারেন যে, এই দুইটি আইনই বঙ্গদেশে চলিলে নিতান্ত অমঙ্গল ঘটে না।

এই অসভ্যজাতিদিগের মধ্যে বৈদ্য নাই। চিকিৎসা একটি মাত্র আছে। কাহারও রোগ হইলে তাহার গলায় ফাঁসি দিয়া আড়ায় লটকাইয়া দিতে হয়—তার পরে ফাঁসি কাটিয়া দিয়া আছড়াইয়া ফেলিয়া দিতে হয়। মরিল ত রোগ চিকিৎসার অতীত বলিয়া সপ্রমাণ হইল। বাঁচিল ত চিকিৎসার মহিমা। আমাদিগের ডাক্তারগণ, পড়িয়া যেন হাস্য করেন না। ভাবিয়া দেখিলে, সকল চিকিৎসাই এইরূপ।

অনেকে জানেন যে সেঁকোবিষ—ডাক্তারদিগের "আর্সেনিক", নানা রোগের ঔষধস্বরূপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু উহাতে আর একটি উপকার আছে, এতদ্দেশে তাহা সকলে জানেন না। উহা শারীরিক সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়া থাকে। উহাতে শুষ্ক শরীর পূর্ণ হয়, ত্বক্ কোমল এবং চাকচিক্যবিশিষ্ট, এবং বর্ণ উজ্জ্বল ও মাধুর্য্যবিশিষ্ট হয়। অষ্ট্রীয়ার কোন কোন স্থানে এই কারণে অনেক লোক নিত্য বিষ ভক্ষণ করিয়া থাকে। এবং অনেক যুবতী, নায়কের মনোহরণার্থ, বিষভোজন আরম্ভ করেন। পূর্ব্বে প্রথা ছিল যে, যে হতভাগিনী প্রণয়ে নিরাশ হইত, সেই বিষভোজন করিত; অষ্ট্রীয়ার এই প্রদেশে যে যুবতী প্রণয়ের আশা রাখে, সেই বিষ ভোজন করে। অন্য দেশের কবিগণ বলেন, যোষিদ্বর্গের অধরে সুধা এবং নয়নে বিষ, অষ্ট্রীয়ার তাহাদের নয়নেও বিষ এবং অধরেও বিষ। তাহার উপর তাঁহাদের দাঁতে বিষ নাই ত?

অক্টোবর মাসের ফ্রেজরে, "Dangerous glory of India" নামে একটি প্রবন্ধ আছে, তাহা ভারতবর্ষে পুনর্মুদ্রিত হইয়া প্রচলিত হওয়া কর্ত্তব্য। লেখকের উদ্দেশ্য তিনটি কথা বলা, প্রথম, ইংরেজ বিচারক কর্ত্তৃক ভারতবর্ষে সুবিচার হয় না ও হইতে পারে না; সর্ব্বত্র দেশী বিচারকের প্রয়োজন। দ্বিতীয়, ভারতবর্ষে বাজে ইংরেজগণ ভয়ানক অত্যাচারী; তাহারা অত্যাচার করিলে দণ্ড পায় না, কেবল খালাষ পাইয়া থাকে। তৃতীয়, দেশী লোকগণকে উচ্চপদস্থ না করিলে ভারতবর্ষে ইংরেজ রাজ্য দৃঢ়মূল হইতে পারে না। দেশীয়েরা যে ইংরেজদিগের সঙ্গে উচ্চপদে তুল্যরূপে অধিকারী তাহা পুনঃ পুনঃ আইনে বিধিবদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু তাহা কখন কার্য্যে পরিণত হইল না। লেখক বলেন যে, রোম রাজ্যে প্লিবিয়নগণ রাজকীয় পদ সকলে আপনাদিগের অধিকার পেট্রিসিয়নদিগের তুল্য

বলিয়া আইনে বিধিবদ্ধ করাইয়াও, তাহা কার্য্যে পরিণত করাইতে পারে নাই ; ইহাতে তাহারা অগত্যা নিয়ম করাইল যে, রাজকীয় কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে এতগুলি সিবিলিয়ন হইতেই হইবে। সেইরূপ ভারতবর্ষেও নিয়ম করা কর্ত্তব্য যে, উচ্চ রাজকীয় কর্ম্মচারীদিগের মধ্যেও বার আনা দেশী লোক হইতেই হইবে। এরূপ নিয়ম না করিলে, ইংরেজেরা লোভ সম্বরণ করিয়া দেশী লোককে কিছু দিবেন না।

কোন কোন দেশে লোকে মৃত্তিকা ভোজন করে। ঔষধ স্বরূপ, বা কখন সক করিয়া একটু খায়, এমত নহে ; রীতিমত আহার করে। আমেরিকায় অটোমাক্ জাতীয়েরা বর্ষাকালে মৃত্তিকা খাইয়াই জীবন ধারণ করে। শারীরতত্ত্ববিদেরা সেই মৃত্তিকার মধ্যে শরীরপোষক কোন দ্রব্য পায়েন নাই। অতএব কেন যে তাহাতে জীবন রক্ষা হয় বলিতে পারেন না। অনাহারেও অনেকে জীবন রক্ষা করে, এমন গল্প আছে। বিজ্ঞানের কপালে কি আছে, বলিতে পারি না।

ভারতবর্ষীয় আর্য্যজাতির আদিম অবস্থা

[পরিবারগত অবস্থা, বিবাহবিষয়ক আচার, শাসনপ্রণালী, চিত্র-নৈপুণ্য ও অবরোধের ব্যাখ্যাগত বিভেদ]

পরিবারবর্গের সহিত বিবাদ করা যুক্তিসিদ্ধ নহে।
১৭৯—১৮৫। ৪ অধ্যায় মনু।

পাঠক, আজি আমরা সভ্য হইয়াছি। সহোদরের সঙ্গে একত্র বাস করিতে সম্মত নহি। নিজ নিজ পুত্রকলত্রদিগকে বসনভূষণে পরিশোভিত করিয়া যাদৃশ সুখানুভব করি, সচরাচর ভ্রাতৃভার্য্যাকে তাদৃশ বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিত করিতে আন্তরিক অভিলাষ রাখি না—নিরুপায় ভগিনী ও তদীয় পরিজনদিগকে গলগ্রহ জ্ঞান করিয়া তাহাদিগের প্রতি কত কটুবাক্য ও কত ভর্ৎসনা করিতে থাকি এবং স্থলবিশেষে কোন কোন ব্যক্তিও সাক্ষাৎ দেবতাস্বরূপা স্নেহময়ী জননীকেও পিতার পরিবার বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিতে উদ্যত হন।

এখন একবার ভাবিয়া দেখ দেখি, আমাদিগের পূর্ব্বতন আর্য্যসন্তানগণ কেমন ভাবে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া আসিয়াছেন। উপরি কথিত ব্যক্তিবর্গের প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি প্রদর্শন ও তাহাদিগকে প্রতিপালন করা যে পরম ধর্ম্ম তদ্বিষয়ে তাঁহাদিগের মতদ্বৈধ ছিল না। তাঁহারা ইহাদিগকে এতাদৃশ আন্তরিক ভালবাসিতেন যে ইহাদিগের সঙ্গে বিবাদেও আপনাদিগের অনিষ্ট জ্ঞান করিতেন এবং তন্নিমিত্ত পরকালে নরকদর্শনের ভয়ে ভীত থাকিতেন। সেই ভয়টি ছিল বলিয়াই আমাদিগের পরিবারগত এত স্নেহ। পরিবারদিগের সঙ্গে বিবাদে সম্মত নহি, ইহাদিগকে বস্ত্রালঙ্কারে পরিশোভিত করিতে পারিলে পরম সুখ জ্ঞান করি। যেস্থলে পরিবারগণ ক্লেশনিবন্ধন অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিয়াছেন, তথায় অচিরে সে কুল নির্ম্মূল হইয়াছে। গুরু, পুরোহিত, আচার্য্য, মাতুল, অতিথি, অনুজীবী, বালক, বৃদ্ধ, পীড়িত, বৈদ্য, জ্ঞাতি, কুটুম্ব, মাতাপিতা, ভগিনী, পুত্রবধূ, ভ্রাতা, ভাগিনেয় প্রভৃতি স্নেহের পাত্রগণ ও ভৃত্যবর্গের সহিত প্রকৃত জ্ঞানী আর্য্য সন্তানগণ

কদাচ নিষ্কারণে বিবাদ করিতেন না। ইঁহারা জানিতেন যে, ইঁহাদিগের সহিত বিবাদ না করিয়া যুক্তিপ্রদর্শন দ্বারা ইঁহাদিগের মত খণ্ডনপূর্ব্বক নিরস্ত করিতে পারিলে জগজ্জয়ী হওয়া যায় ; এইটী ইঁহাদিগের স্থিরতর সংস্কার। (১)

ইঁহারা মনে করেন, আচার্য্যকে স্বকীয় মতের বশবর্ত্তী করিতে পারিলে ব্রহ্মলোক জয় করা যায়। সেবা-শুশ্রূষা দ্বারা পিতাকে অনুরক্ত করিতে পারিলে প্রাজাপত্য লোক জয় করা হয়। ইন্দ্রলোক জয়াভিলাষী হইলে অতিথির প্রতি সদয় হওয়া উচিত। দেবলোক দর্শন বাসনা থাকিলে গুরু পুরোহিতাদির সম্মান ব্যতিক্রম না করাই কর্ত্তব্য। ভ্রাতা, জায়া ও ভগিনী প্রভৃতি পরিবারবর্গকে অনুরক্ত রাখিতে পারিলে অপ্সর লোকাধিকারের ফলভাগী হওয়া যায়। সখার সঙ্গে সখ্য চিরস্থায়ী রাখিতে পারিলে বৈশ্ব দেবের সহিত সালোক্যপ্রাপ্তি বিষয়ে আর সংশয় থাকে না। রসাতলের প্রভুত্ব লাভ করিতে বাসনা করিলে আত্মীয়-স্বজন ও জ্ঞাতিগণের সঙ্গে বিবাদ না করাই শ্রেয়ঃকল্প। এই মর্ত্ত্য ভূমিতে চিরসুখী হইতে ইচ্ছা করিলে মাতৃ এবং মাতুলের সম্মান রক্ষা পূর্ব্বক নির্ব্বিবাদে তাঁহাদিগের সেবা-শুশ্রূষা দ্বারা তাঁহাদিগের প্রীতি জন্মাইতে পারিলেই ইহলোকে সুখভাগী ও জয়ী বলিয়া পরিগণিত হওয়া যায়। (২)

নির্ধন, বালক, বৃদ্ধ ও আতুর ব্যক্তিদিগকে সদয়ভাবে তাহাদিগের বাঞ্ছা পরিপূরণপূর্ব্বক নির্ব্বিবাদে তাহাদিগের সহিত কাল হরণ করিতে পারিলেই দ্যুলোক জয়ের ফলপ্রাপ্তি হয়। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতার সদৃশ মান্য ও পূজ্য। ভার্য্যা ও পুত্র স্বকীয় শরীর হইতে ভিন্ন নহে। পত্নী পতির দেহের অর্দ্ধাঙ্গ, পুত্র আত্মা-স্বরূপ। কন্যা প্রভৃতি সন্ততিবর্গ স্বীয় দেহের অন্যান্য অবয়ব। অনুজীবী, সেবক

---

(১) মনু ৪র্থ অঃ
ঋত্বিক্ পুরোহিতাচার্য্যৈর্মাতুলাতিথি সংশ্রিতৈঃ।
বালবৃদ্ধাতুরৈর্বৈদ্যৈর্জ্ঞাতিসম্বন্ধিবান্ধবৈঃ ॥ ১৭৯
মাতাপিতৃভ্যাং যামিভির্ভ্রাত্রা পুত্রেণ ভার্য্যয়া।
দুহিত্রা দাসবর্গেণ বিবাদং ন সমাচরেৎ ॥ ১৮০

(২) ১৮১
এতৈর্বিবাদং সন্ত্যজ্য সর্ব্ব পাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
এভির্জিতৈশ্চ জয়তি সর্ব্বান্ লোকানিমান্ গৃহী ॥

১৮২
আচার্য্যো ব্রহ্মলোকেশঃ প্রাজাপত্যে পিতা প্রভুঃ
অতিথিস্ত্বিন্দ্রলোকেশো দেব লোকস্তচর্ত্বিজঃ ॥

১৮৩
যাময়োঽপ্সরসাং লোকে বৈশ্ব দেবস্য বান্ধবাঃ।
সম্বন্ধিনোহ্যপাং লোকে পৃথিব্যাং মাতৃ মাতুলৌ ॥

১৮৪
আকাশেশাস্ত বিজ্ঞেয়া বালবৃদ্ধকৃশাতুরাঃ।
ভ্রাতা জ্যেষ্ঠঃ সমঃ পিত্রা ভার্য্যা পুত্রঃ স্বকাতনুঃ

ও দাসবর্গ ছায়াস্বরূপ। ইহাদিগের সহিত বিবদমান হইয়া তিরস্কার করিলে ইহারা মনঃক্ষুণ্ণভাবে অবমাননা সহ্য করে বটে কিন্তু তদ্দ্বারা কুলনষ্ট হয়। এজন্য মুনিগণ ইহাদিগকে সর্ব্বদা বস্ত্রালঙ্কারে সুখে রাখিতে আদেশ করিয়াছেন। (৩)

আর্য্যসন্তানগণ কেবল যে স্বীয় ভার্য্যাকে ভরণপোষণ করিয়া ভর্ত্তা শব্দের ব্যুৎপত্তি লভ্য অর্থের সার্থকতা সম্পাদন করিলেই যে ইহ সংসারে কৃতার্থম্মন্য হইতেন তাহা কদাচ জ্ঞান করা যায় না। কি পতি কি পিতা কি ভ্রাতা কি দেবর ইহাদিগের মধ্যে যিনিই সংসারের শান্তি কামনা করেন, তিনিই অবশ্য নিজের বিভব অনুসারে দেশ কাল পাত্র বিবেচনায় স্ত্রী ও পরিজনদিগকে উত্তমরূপ অন্নাচ্ছাদন ও ভূষণাদি দ্বারা তাহাদিগের মনঃক্ষোভ নিবারণ করিবেন। (৪)

ইহাদিগের মধ্যে যে পরিবারের স্ত্রী পরিজন সর্ব্বদা সম্প্রীতির সহিত কাল হরণ করে, সে কুলে দেবতাগণ পরিতুষ্ট থাকেন। স্ত্রীজাতি বসনভূষণাদি দ্বারা বিভূষিত হইলেই সন্তোষ লাভ করে, যে পরিবার মধ্যে স্ত্রীজাতিরা বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা সম্মানিত না হয় সে কুলের স্ত্রীজনেরা সর্ব্বদা মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া অশ্রুবিসর্জ্জন পূর্ব্বক শোক করে। তাহাদিগের ক্ষোভ নিবন্ধন পরিবার মধ্যে অনিষ্টবীজ রোপিত হয়। সেই অপ্রীতিজনক বিচ্ছেদ বীজ বদ্ধমূল হইলেই সুখময় সংসার-তরু নিষ্ফল ও সংসারী ব্যক্তির ক্রিয়া পণ্ড হয় এবং অতি শীঘ্র বংশলোপ হইয়া আইসে, পরিজনদিগের সম্প্রীতি দ্বারা বংশের শ্রীবৃদ্ধি হয়।

ভগিনী, পুত্রবধূ, পত্নী, কন্যা প্রভৃতির অভিশাপ দ্বারা কুলের ধ্বংস হয়। যে কুলে ভার্য্যা ও ভর্ত্তার প্রণয় না থাকে, সে কুলের শ্রীবৃদ্ধি হয় না। যে স্থলে স্বামী ও স্ত্রীতে পরস্পর আন্তরিক প্রেম পরিবর্দ্ধিত হয়, তথায় কুলদেবতা পরিতুষ্ট থাকেন; তন্নিবন্ধন সে কুলের শ্রীবৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী বলিয়া স্থিরীকৃত হয়। (৫)

৫৫—৬০—৩য় মনু।

---

(৩) পিতৃভির্ভ্রাতৃভিশ্চৈতাঃ পতিভির্দেবরৈস্তথা।
৫৫ পূজ্যা ভূষয়িতব্যাশ্চ বহুকল্যাণমীপ্সুভিঃ॥

যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
৫৬ যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্ব্বাস্তত্রাফলাক্রিয়াঃ॥

শোচন্তি জাময়ো যত্র বিনশ্যত্যাশু তৎকুলং।
৫৭ নশোচন্তিতু যত্রৈতা বর্দ্ধতে তদ্ধি সর্ব্বদা॥

(৪) জাময়ো যানি গেহানি শপন্ত্যপ্রতিপূজিতাঃ।
৫৮ তানি কৃত্যাহতানীব বিনশ্যন্তি সমন্ততঃ॥

তস্মাদেতাঃ সদা পূজ্যা ভূষণাচ্ছাদনাশনৈঃ।
৫৯ ভূতিকামৈর্নরৈর্নিত্যং সৎকারেষূৎসবেষু চ॥

(৫) মনু সন্তুষ্টো ভার্য্যয়া ভর্ত্তা ভর্ত্তাভার্য্যা তথৈবচ।
অঃ ৩। ৬০ যস্মিন্নেব কুলে নিত্যং কল্যাণং তত্রৈব ধ্রুবং॥

বঙ্গদর্শনের পাঠকগণের প্রায় অনেকেই আর্য্যজাতির বিবাহ দর্শন করিয়াছেন। বৈবাহিক কার্য্যের অনুষ্ঠানকালে অন্যান্য ইতিকর্ত্তব্যতা যাহা আছে তাহার সকলগুলি সর্ব্বজাতির পক্ষে সমানরূপে ব্যবহৃত হয় না। যেগুলি সচরাচর সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহারই কতকগুলি অদ্য লিখিত হইল। বিচারকগণ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন, ঐগুলি কিজন্য কৌলিক আচারের অনুশাসনে সর্ব্বত্র সমানরূপে দেদীপ্যমান আছে। বোধ হয় ইহাতে অবশ্য কোন নিগূঢ় তত্ত্ব নির্দ্দিষ্ট আছে, সেইজন্যই এতকাল ঐগুলিই আর্য্যসমাজে সমান আদরে আচরিত হইয়া আসিতেছে।

আর্য্যজাতির সমস্ত মাঙ্গলিক কার্য্যেই হরিদ্রামার্জ্জন করা চিরপ্রথা, ইহা সকলেই জানেন। বিবাহেই বা তাহার ব্যতিক্রম কেন লক্ষিত হইবে? বিবাহের প্রাক্কালে বর ও কন্যার হস্তে যে সূত্র বন্ধন করা হয়, তাহার নাম কৌতুক-সূত্র। ঐ সূত্রদ্বারা বর ও কন্যাকে অন্য ব্যক্তি হইতে পৃথক্ করা যায়, কৌলিক আচার ব্যবহার পরে দেখান যাইবে। এক্ষণে ইহাই যুক্তিদ্বারা ও শাস্ত্রের বচনদ্বারা প্রমাণ করা যাউক যে, কি জন্য পরস্পর হস্তধারণ করে ও কি জন্য উভয়ের উত্তরীয় বস্ত্র বন্ধনদ্বারা পরস্পর আবদ্ধ হয়।

এক্ষণে আমরা যত বিবাহ দেখিতে পাই তৎসমস্তই সবর্ণাবিবাহ, সুতরাং বিবাহের আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত পাণিগ্রহণই দেখিতে পাই। বস্ত্রের দশা (ছিলা) গ্রহণও তৎসঙ্গে সঙ্গেই থাকে এবং মাল্যবদলরূপ পরস্পরের অনুরাগ ও শুভদৃষ্টিও দেখিতে পাই। অপর কয়েকটী বিষয় অসবর্ণাবিবাহ নিষেধের সঙ্গে সঙ্গেই লোপ পাইয়াছে।

যৎকালে ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্রিয় কন্যাকে ভার্য্যারূপে গ্রহণ করিতে উদ্যুক্ত হইতেন তৎকালে ঐ কন্যা বরের ধৃত শরের (বাণের) প্রান্ত গ্রহণ করিতে অধিকারিণী, উক্ত ব্রাহ্মণরূপ বরের কর গ্রহণযোগ্যা নহে। অর্থাৎ তদীয় পিতৃকুল বরের সমকক্ষ নহে তাহাই দেখান হয়।

বৈশ্যকন্যা ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় বরে অভিলাষী হইলে সেই কন্যা ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় বরের করস্পর্শাধিকারিণী হয় না। বিবাহকালে উক্ত জাতিদ্বয়ের বরের হস্তস্থিত পাচনী গোতাড়ন দণ্ডের একদেশ স্পর্শ করিত। (৬)

বিচার-মার্গে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে ইহাই স্পষ্ট লক্ষিত হয় যে, যে স্থলে

---

(৬) পাণিগ্রহণসংস্কারঃ সবর্ণাসূপদিশ্যতে।
অসবর্ণাস্বয়ং জ্ঞেয়ো বিধিরুদ্বাহ কর্ম্মণি॥ ৪০
শরঃ ক্ষত্রিয়য়া গ্রাহ্যঃ প্রতোদো বৈশ্যকন্যয়া।
বসনস্য দশা গ্রাহ্যা শূদ্রয়োৎকৃষ্ট বেদনে ৪১ মনু অঃ ৩।

সবর্ণা বিবাহ হয় তথায় পরস্পর পাণিগ্রহণ করা শাস্ত্রসিদ্ধ, তদনুসারে বরের বাম হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলি দ্বারা কন্যার দক্ষিণ করের কনিষ্ঠাঙ্গুলি পরিগৃহীত হয়। যাবৎ বিবাহ-কার্য্য সমাধা না হয়, তাবৎকাল উভয়ের করে উভয়ের কর সংলগ্ন থাকে, এবং উভয়ের উত্তরীয় বস্ত্র-প্রান্তের গ্রন্থি দ্বারা পরস্পর আবদ্ধ থাকে। স্বজাতীয়া ও সমান বর্ণা কন্যাগ্রহণ স্থলে ঋষিগণ বস্ত্রের দশা (ছিলা) গ্রহণ বিধান করেন নাই। যে স্থলে শূদ্রকন্যা উৎকৃষ্ট জাতীয় পুরুষের গলে মাল্যদান অভিলাষ করেন, তথায় বরের করগ্রহণের ব্যবস্থা (পাণি) পীড়ন লিখেন নাই। অর্থাৎ ঐ কন্যার পিতৃকুল বরের নিকট করস্পর্শযোগ্য নহেন। ঐ কন্যা পাণিগ্রহণ মন্ত্রদ্বারা বরের কুলে পরিগৃহীত হইলে, সেই কন্যা পাণিপীড়নযোগ্য হয়। গান্ধর্ব্ব বিধানে বিবাহসিদ্ধি স্থলেই মাল্যবদলের ব্যবস্থা। কিন্তু আমাদিগের সমাজে অগ্রে মাল্যবদল তৎপরে শুভদৃষ্টি তৎপরে বস্ত্রের প্রান্তে প্রান্তে বন্ধন তৎপরে পাণিপীড়ন দেখা যায়।

ব্যবহার বিষয়

পাঠক, তুমি মনে করিয়াছ অর্য্যজাতির বিচারকেরা কিরূপ অভিযোগে কিরূপ ব্যবহার অনুসারে সময় ক্ষেপণ করিতেন, তাহার ব্যবস্থাগুলি সুশৃঙ্খলাবদ্ধ ছিল না। বাস্তবিক তাহা নহে, সর্ব্ব বিষয়েরই সুনিয়ম ও সুরীতি ছিল।

চুরি ডাকাতি, পারদারিক কার্য্য, নরহত্যা ও মৃত্যু বিষয়ে অভিচারাদি অসদ্ব্যবহার, গোধনের অনিষ্ট সম্বন্ধে, কুলস্ত্রীর অপবাদ বিষয়ে এবং পরপরিবাদ স্থলে সময়ক্ষেপ করিবার বিধি নাই ; এবংবিধ কার্য্য জন্য সাহসিক কার্য্যের বিবাদ স্থলে সদ্য বিচার করিবার ব্যবস্থা দেখা যায়। শান্তি কার্য্যের বিবাদ স্থলে উপযুক্তরূপে সময় দেওয়ার রীতি আছে, তবে পূর্ব্বোক্ত কার্য্যঘটিত সমস্ত বিবাদ স্থলেই যে অভিযোগ উপস্থিত হইবামাত্র তাহার নিষ্পত্তি হয় তাহা নহে। কার্য্যের লাঘব গৌরব ব্যক্তিবিশেষের পীড়া, ক্ষতি ও বৃদ্ধির তারতম্য বিবেচনায় নির্দ্ধারিত সময়ের ব্যতিক্রমও ঘটে, অভিযোগগুলি ধারাবাহিক সংখ্যা গণনায় তাহাদিগের নামলিখন স্থলে সংখ্যাপাত হয়। তুল্য বিষয় ও বিবাদ স্থলে ধারাবাহিক কালানুসারে বিচারকার্য্য নিষ্পত্তি হয়। (৭)

বৃহস্পতি সং

(৭) সাহসস্তেয় পারুষ্যে গোভিশাপাত্যয়ে স্ত্রিয়াং।
বিবাদয়েৎ সদ্য এব কালোঽন্যত্রেচ্ছয়া স্মৃতঃ॥

বৃহস্পতি সং

সদ্যঃ কৃতেষু কার্য্যেষু সদ্য এব বিবাদয়েৎ।
কালাতীতেষু বা কালং দদ্যাৎ প্রত্যর্থিনে প্রভুঃ॥

ব্যবহারতত্ত্বধৃত নারদ সংহিতার বচন।

পূর্ব্বে অভিযোগের পূর্ব্বপক্ষ সাক্ষী মধ্যে লেখ্য প্রভৃতির কতক অংশ লিখিত হইয়া এক্ষণে অভিযোগের উত্তর পক্ষ অবতারণা করা গেল। বঙ্গদর্শনের পূর্ব্ব পূর্ব্ব খণ্ডে “পক্ষ” বিষয় লেখান গিয়াছে তাহার সহিত মিলন কর।

অভিযোগের উত্তর শব্দে কি বুঝায়—যে বাক্য পূর্ব্বপক্ষকে নিরাশ করিতে সমর্থ প্রকৃত বিষয়োপযোগী ও বিষয়ান্তরে সংক্রান্ত না হয়, যে বাক্য অসন্দিগ্ধ বলিয়া লোকের প্রতীতি জন্মে পূর্ব্বাপর বাক্যের কোন প্রকারে বাধক না হয়, নিরাকুল এবং সকলের বোধগম্য হয়, তাহাকেই পণ্ডিতেরা উত্তর শব্দে নির্দ্দেশ করেন। কোন কোন ঋষির মতে যদ্দারা বাদ বাক্য খণ্ডন করা যায়, তাহারই নাম উত্তর। কোন কোন ঋষির মতে প্রতিপক্ষের বাক্যমাত্রকে উত্তর স্থলে গৃহীত হয়।

উত্তর চতুর্ব্বিধ—মিথ্যা, সম্প্রতিপত্তি, প্রত্যবস্কন্দন এবং প্রত্যাঙ্‌ন্যায়।

বাদীর অভিযোগে যে সাধ্য লিখিত থাকে, প্রতিবাদী যদি তাহার অপহ্নব করে তাহা হইলে ঐ উত্তরকে মিথ্যাজ্ঞান করা যায়, যাহা সত্য বলিয়া স্বীকার করে তাহার নাম সত্যোত্তর। স্বীকার বাক্যে কোন কোন স্থলে উত্তরগুলিতে আংশিক সত্য ও আংশিক মিথ্যা থাকে। বিচারকগণের নিকট মিথ্যাবাক্য প্রধানতঃ সাধ্য নির্দ্দেশাদি দ্বারা ধৃত হয়।

লৌকিক ব্যবহার

আর্য্যজাতিরা খাদ্যবস্তু মাত্রকেই অন্ন শব্দে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তন্মধ্যে তণ্ডুলে অন্নশব্দের মুখ্যার্থ ধরিয়া থাকেন। আমান্ন শব্দে অপক্ক তণ্ডুলকে নির্দ্দেশ

পক্ষস্য ব্যাপকং সারমসন্দিগ্ধমনাকুলং।
অব্যাখ্যাগম্যমিত্যেতদুত্তরং তদ্বিদো বিদুঃ॥
মিথ্যা সম্প্রতিপত্তিশ্চ প্রত্যবস্কন্দনং তথা।
প্রাঙ্‌ন্যায়শ্চোত্তরা প্রোক্তাশ্চত্বারো শাস্ত্র বেদিভিঃ॥
অভিযুক্তোঽভিযোগস্য যদি কুর্য্যাদপহ্নবম্।
মিথ্যাতত্তু বিজানীয়াদুত্তরং ব্যবহারতঃ॥
সত্যাভিযোগং প্রত্যর্থী যদি তং প্রতিপদ্যতে।
সাতু তং প্রতিপত্তিঃ স্যাৎ শাস্ত্রবিদ্ভিরুদাহৃতাঃ॥
অর্থিনাভিহিতো যোঽর্থঃ প্রত্যর্থী যদি তং তথা।
প্রপদ্য কারণং ব্রূয়াৎ প্রত্যবস্কন্দনং হি তৎ॥

বৃহস্পতি বচন। ব্যবহার তত্ত্ব।

আচারে নাবসন্নোঽপি পুনর্লেখয়তে যদি।
সোঽভিধেয়ো জিতঃ পূর্ব্বং প্রাঙ্‌ন্যায়স্তু স উচ্যতে॥

করেন, পক্ক তণ্ডুলে সিদ্ধান্নের ব্যবহার দেখা যায়, অন্ন শব্দে সামান্যাকারে এইমাত্র অর্থ প্রাপ্তি হইতেছে—কিন্তু ব্রাহ্মণ জাতির যাচ্ঞানিবৃত্তি মানসে জাতিবিশেষের প্রদত্ত অন্নের অর্থ কোথাও এমন সঙ্কোচ এবং কোন স্থলে তাহার এরূপ প্রশংসাপর-ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, তদ্দৃষ্টে ব্রাহ্মণ জাতির ভিক্ষা বিষয়ে ইচ্ছার নিবৃত্তিব্যতীত প্রবৃত্তি জন্মিবার সম্ভাবনা নাই।

ক্ষেত্রস্বামিগণ নিঃশেষরূপে ধান্যাদি সংগ্রহ পুরঃসর ক্ষেত্রত্যাগ করিলে তথায় স্থানে স্থানে যে দুই একটি ধান্যাদি পতিত থাকে, তাহার সংগ্রহের নাম উঞ্ছবৃত্তি। পরিত্যক্ত ক্ষেত্রে যে সকল শস্য পতিত থাকে কেবল তাহার অগ্রভাগ মাত্র গ্রহণের নাম শিলবৃত্তি। প্রার্থনা ব্যতিরেকে যাহা উপস্থিত হয় তাহার নাম অমৃত। যাচ্ঞালব্ধ বস্তুর নাম মৃত। ব্রাহ্মণের পক্ষে নিজহস্তে কর্ষণলব্ধ বস্তুর নাম প্রমৃত।

ব্রাহ্মণগণের পক্ষে প্রথমে শিলোঞ্ছবৃত্তিরূপে জীবনোপায়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন। দ্বিতীয় স্থলে অযাচিতলব্ধ বস্তু দ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা দূষ্য নহে, ইহা নির্দ্ধারিত করিয়া যাচ্ঞালব্ধ বস্তুর নিন্দা করিতেছেন এবং ব্রাহ্মণের পক্ষে ক্ষেত্রকর্ষণ নিন্দিত হয়। ঐ দুইটি বৃত্তি এককালে প্রতিসিদ্ধ করা হইল।

যদিও যতি ব্রহ্মচারী ও বানপ্রস্থ ধর্ম্মাবলম্বীর পক্ষে ভিক্ষা নিন্দনীয় নহে তথাপি স্বয়ং যাচ্ঞা অপকর্ষ বৃত্তির মধ্যে গণ্য। ইহাদিগের মতে ব্রাহ্মণ জাতি ব্রাহ্মণদিগকে যাচ্ঞা না করিতে যে আমান্ন দেয় তাহার নাম অমৃত। ক্ষত্রিয়গণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ব্রাহ্মণমাত্রকে যে সমস্ত অযাচিত আম তণ্ডুলাদি দেন তাহার নাম পায়স অর্থাৎ ঐ তণ্ডুলাদি ক্ষীর সদৃশ। ঐ বস্তু ভক্ষণে শারীরিক ও মানসিক বীর্য্যাধান হইতে পারে। বৈশ্যদত্ত অযাচিত আম তণ্ডুলের তাদৃশ প্রশংসা বা অপ্রশংসা নাই। উহা প্রকৃত খাদ্য বস্তুরূপেই গণ্য হয়। ইহার গ্রহণ ও ভক্ষণে মনঃসঙ্কুচিত বা পাপস্পর্শ হয় না। শূদ্রদত্ত আমান্ন শোণিত সদৃশ অপবিত্র অর্থাৎ ঐ তণ্ডুলাদি ভক্ষণে শরীর ও মনে পাপ স্পর্শ করে ও আত্মা সঙ্কুচিত হয়।

সামান্যতঃ এইমাত্র ব্যবস্থা দেখা যায় যে, শূদ্রের প্রদত্ত অপক্ক বস্তু মাত্র অন্ন শব্দে নির্দ্দিষ্ট আছে। শূদ্রকর্ত্তৃক পক্ক দ্রব্যগুলি উচ্ছিষ্ট বলিয়া পরিগণিত, এই হেতু বশতঃ শূদ্রের দত্ত বস্তু ব্রাহ্মণগণের পক্ষে সামান্যাকারে নিষেধ দেখা যায়, তবে স্থলবিশেষে কালবিশেষে কোন কোন ব্যক্তিবিশেষ কর্ত্তৃক স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত প্রদান স্বীকারে পূর্ব্বকালে দোষ ছিল না। অধুনা কলিকালের প্রারম্ভে কতিপয় স্থল ব্যতীত নিষেধ দেখা যায়।

গৃহী ব্যক্তিবর্গ অতিথিসৎকারাদি পিতৃযজ্ঞের বিধান বাসনায় সচ্ছূদ্রের প্রদত্ত ভিক্ষা অযাচিত বস্তু গ্রহণ করিতে পারেন।

যে শূদ্র বিশুদ্ধ বংশসম্ভূত দ্বিজভক্ত হবিষ্যাশী এবং বৈশ্যবৃত্তি দ্বারা জীবনোপায় নির্ব্বাহ করে, তাহাকেই পরাশর মুনি সচ্ছূদ্র শব্দে পরিগণিত করিয়াছেন। (৮)

খাদ্য ও দান গ্রহণের বিশেষ ব্যবস্থা ক্রমশঃ দেখান যাইবে।

চিত্রনৈপুণ্য

পাঠক, তুমি বিলাতীয় চিত্র দর্শন করিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছ। তুমি মনে কর আর্য্যজাতি এ বিষয়ে মনসংযোগ করেন নাই। বস্তুতঃ তাহা নহে, যিনি সে প্রকার জ্ঞান করেন তাঁহার সেটী ভ্রম। অবনীমণ্ডলে যত জাতি আছেন, তন্মধ্যে ভারতীয় আর্য্য সন্তানগণ মনস্তত্ব নির্ণয় সম্বন্ধে অদ্বিতীয় পথপ্রদর্শক ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হয়। ঐ মনস্তত্বে আত্মার বিচার আছে। আত্মার উপনান স্থলে চিত্রের চারিপ্রকার অবস্থা অবতারণা করা হইয়াছে। যে বিষয়টী আপামর সাধারণের বোধগম্য হয়, তাহারই সহিত জ্ঞানকাণ্ডের উপমা প্রদর্শন পূর্ব্বক উপদেশ পথ পরিষ্কৃত করা গিয়া থাকে। উপমান ও উপমেয় পরস্পর সমান অবস্থায় না থাকিলে তুলনা সুসিদ্ধ হয় না। ভারতীয় চিত্রনৈপুণ্যের এতাদৃশী শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল যে, আত্মার অবস্থাভেদ বুঝাইবার জন্য চিত্রের অবস্থাগত ভেদের সহিত আত্মার অবস্থান্তর সাদৃশ্য দেওয়া গিয়াছে। কেহ কেহ এরূপ কহিতে পারেন যে, ব্যক্তিবিশেষের বা সম্প্রদায়বিশেষের চিত্রবিষয়ে নৈপুণ্য ছিল কিন্তু সাধারণতঃ চিত্রকর্ম্মের বাহুল্য বা প্রশংসা ছিল না। তাহার প্রামাণ্য সংস্থাপন জন্য আমাকে অধিক প্রয়াস পাইতে হইবে না। মহর্ষি শঙ্করাচার্য্যকৃত পঞ্চদশী দেখ, চিত্রবিষয়ক অবস্থান্তর দেখিতে পাইবে। (৯)

পরাশর সংহিতা ৪র্থ অধ্যায়

(৮) ঋতমুঞ্ছশিলং জ্ঞেয়মমৃতং স্যাদযাচিতং।
মৃতন্তু যাচিতং ভৈক্ষ্যং প্রমৃতং কর্ষণং স্মৃতং। ৫। মনু অঃ ৪।
অমৃতং ব্রাহ্মণস্যান্নং ক্ষত্রিয়ান্নং পয়ঃস্মৃতং।
বৈশ্যস্যাপ্যন্নমেবান্নং শূদ্রস্য রুধিরং স্মৃতং ॥ ৩।
আমং শূদ্রস্য পক্কান্নং পক্কমুচ্ছিষ্ট মুচ্যতে।
তস্মাদামঞ্চ পক্কঞ্চ শূদ্রস্য পরিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৪।
কণভিক্ষাং নিরাকুর্য্যাত্তদিকুর্য্যাদমৃতকঃ।
সচ্ছূদ্রাণাং গৃহে কুর্ব্বন্ তদ্দোষেন লিপ্যতে ॥ ৫।
বিশুদ্ধান্বয় সম্ভূতো নিবৃত্তো মদ্যমাংসতঃ।
দ্বিজভক্তো বণিগ্বৃত্তিঃ সচ্ছূদ্রঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ৬।
(৯) যথা চিত্রপটে দৃষ্টমবস্থানাং চতুষ্টয়ং।
তৎপরমাত্মনি বিজ্ঞেয়স্তথাবস্থা চতুষ্টয়ং ॥

আমাদের পাঠকবর্গের কেহ কেহ কহিতে পারেন যে, অবস্থাগত সচরাচর সাধারণ চিত্রকরদিগের জ্ঞান ছিল না। চিত্রকরদিগের জ্ঞান ছিল কিনা সেটী পরে বিচার্য্য। অগ্রে ইহাই প্রদর্শন করা উচিত যে, চিত্রকার্য্যে সকলেরই উৎসাহ ছিল, নৈপুণ্য ছিল, অনেকেই ইচ্ছাপূর্ব্বক অভ্যাস করিত। যদি আমার কথায় বিশ্বাস না হয়, তবে মহাকবি কালিদাস, ভবভূতি, শ্রীহর্ষ প্রভৃতির গ্রন্থ দেখ; তাঁহাদিগের সময়েও কারুকার্য্যের ও চিত্রনৈপুণ্যের অসাধরণ শ্রীবৃদ্ধি লক্ষিত হইবে।

শ্রীহর্ষ অতি প্রাচীন, খৃষ্টের জন্মের বহু শতাব্দী পূর্ব্বে তাঁহার জন্ম, ইহা স্থির সিদ্ধান্ত হইয়াছে।* তাঁহার রত্নাবলীতে সাগরিকা কর্ত্তৃক বৎসরাজের চিত্র দেখ। যদি বল রাজকন্যার পক্ষে চিত্রশিক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, সে কথা স্বীকার করি। কিন্তু যদি সামান্য স্ত্রীলোকে ও সামান্য মনুষ্য মাত্রের নৈপুণ্য দেখা যায়, তবে ঐ বিষয়ের বাহুল্য প্রচার ও সকলেরই ঐ বিষয়ের রসাস্বাদ গ্রহণের সামর্থ ছিল ইহা এক প্রকার স্বীকার করিতে হয়।

সাগরিকাকৃত রাজার প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া সাগরিকার সখী সুসঙ্গতা নাম্নী দাসী ঐ ছবির বাম ভাগে সাগরিকার প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত করে। উহা দেখিয়া রাজা মোহিত হইয়া গিয়াছিলেন। (১০)

যথা ধৌতো ঘট্টিতশ্চ লাঞ্ছিতো রঞ্জিতঃ পটঃ।
চিদন্তর্যামি সূত্রাণি বিরাট্ চাত্মা তথের্য্যতে॥
স্বতঃ শুভ্রোঽত্র ধৌতঃ স্যাৎ ঘট্টিতোঽন্নবিলেপনাৎ।
মস্যাকারৈর্লাঞ্ছিতঃ স্যাৎ রঞ্জিতো বর্ণ পূরণাৎ॥
স্বতশ্চিদন্তর্যামী তু মায়াবী সূক্ষ্ম সৃষ্টিতঃ।
সূত্রাত্মা স্থূল-সৃষ্ট্যৈব বিরাড়িত্যুচ্যতে পরঃ॥

বেদান্ত দর্শন পঞ্চদশী ৬ষ্ঠ।

* কি প্রকারে?—সং

(১০) সুসঙ্গতা—উপবিশ্য ফলকং গৃহীত্বা দৃষ্টাচ।

সহি কো এসো তুএ আলিহিদো।

সাগরিকা—পউত্তমহূসবো ভঅবং অণঙ্গো।

সুসঙ্গতা। সস্মিতং। অহো দে ণিউণত্তণং কিং! উন সুণ্ণং বিঅ চিত্তং পড়িভাদি, তা অহংপি আলিহিঅ রই সনাহংকরিস্সং।

বর্ত্তিকাং গৃহীত্বা নাট্যেন রতিব্যপদেশেন সাগরিকামালিখতি।

সাগরিকা—বিলোক্য সক্রোধং। সহি সুসঙ্গদে, কীস, তুএ অহংএত্থ আলিহিদা।

সুসং—বিহস্য। সহি, কি অআরণে কুপ্পসি জাদিসো তুএ কামদেবো আলিহিদো তাদিসী মএ রই আলিহিদেত্তি, তা অন্নহা সংভাবিণি কিং তুএ এদিনা আলোবিদেণ, কহেহি সব্বং বুত্তন্তং।

মহাকবি কালিদাসও খৃষ্টের জন্মের অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভা ভূষিত করিয়াছিলেন । তাঁহারই অভিজ্ঞান শকুন্তলার ষষ্ঠাঙ্কে রাজা দুষ্মন্তের কৃত চিত্রনৈপুণ্যের বিষয় পাঠ কর, দেখিবে তৎকাল পর্য্যন্তও চিত্র কর্ম্মের সারগ্রাহিতা ছিল । কবিরাও চিত্রের ভাল মন্দ অবস্থা বর্ণন করিতে সক্ষম ছিলেন । (১১)

মহাকবি ভবভূতিও কালিদাসের সমকক্ষ কবি, তিনি তাঁহার সীতাকে যে চিত্রপট প্রদর্শন করিয়াছেন তাহাতে চিত্রের অসাধারণ নৈপুণ্য আছে ।

প্রত্যেক ব্যক্তির কৌমার কৈশোর ও যৌবনাদিভেদে নানা অবস্থা ও নানাবিধ রূপ ঘটিয়াছে । একখানি চিত্রপটে প্রত্যেক ব্যক্তির বিবিধ অবস্থাগত

রাজা ফলকং নির্বর্ণ্য ।

কৃচ্ছ্রাদূরু যুগং ব্যতীত্য, সুচিরং ভ্রান্ত্বা নিতম্বস্থলে
মধ্যেঽস্যা স্ত্রিবলী তরঙ্গবিষমে নিস্পন্দতামাগতা ।
মদ্দৃষ্টিস্তৃষিতেব সম্প্রতি শনৈরারুহ্য তুঙ্গৌ স্তনৌ
সাকাঙ্ক্ষং মুহুরীক্ষতে জললবপ্রস্যন্দিনী লোচনে ॥

—রত্নাবলী দ্বিতীয়াঙ্ক ।

(১১) মিশ্রকেশী—অহো এসা রাএসিনো বত্তিআলেহা ণিউণদা জাণে পিঅসহী সে অগ্গদো বট্টদিত্তি ।

•　•　•　•

রাজা তথাহি—

অস্যাস্তুঙ্গমিব স্তনদ্বয়মিদং নিম্নেব নাভি স্থিতা
দৃশ্যন্তে বিষমোন্নতাশ্চ বলয়ো ভিত্তৌ সমায়ামপি
অঙ্গে চ প্রতিভাতি মার্দ্দবমিদং স্নিগ্ধপ্রভাবাচ্চিরং
প্রেম্ণান্মুখমীষদীক্ষতইব স্মেরা চ বক্তীব মাম্ ॥

•　•　•　•

বিদূ—ভো তিন্নিম্মা আইদিও দীসন্তি, সব্বাও জ্জেব্ব দংসণীআও, তা কদমা এত্থ তত্থভোদী সউন্দলা ।

•　•　•　•

রাজা—ত্বং তাবৎ কতমাং তর্কয়সি ।

বিদূ—নিরূপ্য । তক্কেমি জা এসা সিঢিল কেসবন্ধণুব্বন্ত কুসুমেন কেসহত্থেন বহন্তেঅবিন্দুণা বঅণেণ বিসেসদো ওমিদ সাহাহিং বাহুলদাহিং উস্সসিদ ণীবিণা বসনেন অ ঈসী পরিস্সন্তা বিঅ অবি সে অ সিনিদ্ধ দর পল্লবস্স বাল চূদ রুক্খস্স পাসে আলিহিদা এসা তত্থ ভোদী সউন্তলা ইদরাও সহিওত্তি ।

রাজা—নিপুণো ভবান্ অত্র মমাপি ভাবচিহ্নং
স্বিন্নাঙ্গুলিবিনিবেশাদ্রেখা প্রান্তেষু দৃশ্যতে মলিনা ।
অশ্রু চ কপোলপতিতং লক্ষ্যমিদং বর্ণকোচ্ছ্বাসাৎ ॥

অভিজ্ঞান শকুন্তলা । ষষ্ঠাঙ্ক ।

চিত্র কেমন বর্ণনা করিয়াছেন। চিত্রের বর্ণন দ্বারা অবস্থান্তর পর্য্যন্ত কেমন স্মরণ করাইয়া দিতেছে, অধিক প্রমাণ দেখাইবার আবশ্যকতা নাই, একটি দেখাইলেই যথেষ্ট হইবে। (১২)

লক্ষ্মণ কহিলেন, এই অযোধ্যার প্রতিকৃতি। রাম অশ্রু বিসর্জ্জনপূর্ব্বক সখেদে কহিলেন, ভাই সমুদায় স্মরণ হইতেছে। পিতা যে সময়ে জীবিত ছিলেন আমরা প্রথম বয়সে নূতন দারপরিগ্রহ করিয়াছি, জননীবর্গ আমাদিগকে সস্নেহ নয়নে দৃষ্টিপূর্ব্বক আমাদিগের চিত্তবিনোদনে পরম প্রীতি লাভ করিতেছেন। আমাদিগের সে সকল অমৃতায়মান ও পরমানন্দের দিন একেবারে গত হইয়াছে। তেমন সুখকর দিন আর আসিবে না।

সহৃদয় পাঠকগণ অপর চিত্রগুলি নিজে পাঠ করিয়া দেখ। বুঝিতে পারিবে।

শ্রীলালমোহন শর্ম্মা।

---

(১২) রামঃ সাক্ষেপং, বৎস বহুতরং দ্রষ্টব্য মন্যতোদর্শয়।

সীতা। সস্নেহ বহুমানং নির্ব্বর্ণ্য। সুষ্ঠু সোহসি অজ্জউত্ত, এদিনা বিনয় মাহপ্পেন।

লক্ষ্মণঃ—এতে বয়মযোধ্যাং প্রাপ্তাঃ।

রামঃ—সাস্রং। স্মরামি হন্ত স্মরামি।

জীবৎসু তাতপাদেষু নবে দারপরিগ্রহে।
মাতৃভিশ্চিন্ত্যমানানাং তেহি নো দিবসাগতাঃ॥
ইয়মপি তদা জানকী।
প্রতনু বিরলৈঃ প্রান্তোন্মীলন্মনোহর কুন্তলৈ-
র্দশন মুকুলৈর্মুগ্ধালোকং শিশুর্দধতী মুখং।
ললিত ললিতৈর্জ্যোৎস্নাপ্রায়ৈর কৃত্রিম বিভ্রমৈ-
রকৃত মধুরৈরম্বানাং মে কুতূহলমঙ্গকৈঃ॥

উত্তর রামচরিত। প্রথমাঙ্ক।

তৃতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

(অমরনাথ বক্তা)

এতদিনের যত্ন সফল হইল—মিত্রদিগের অতুল সম্পত্তির আমি অধীশ্বর হইলাম। শচীন্দ্র এবং তাহার অগ্রজ অনর্থক মোকদ্দমা করিল না—বিষয় ছাড়িয়া দিয়াছে। শুনিয়াছি, শচীন্দ্র ডাক্তারী করিয়া দুই এক টাকা উপার্জ্জন করিতে চেষ্টা করিতেছে—তাহার ভাই কেরানিগিরির উমেদারিতে ফিরিতেছে। দুঃখের বিষয়, সন্দেহ নাই—কিন্তু আমি কি করিব ? ন্যায্য সম্পত্তি কি সেই অনুরোধে ছাড়িয়া দিব ? টাকায় যদি পৃথিবীতে প্রয়োজন না থাকিত, ক্ষতি ছিল কি ? কিন্তু তথাপি আমি শচীন্দ্রকে কিছু দিতে চাহিয়াছিলাম—সে লইল না। কোন্ ভদ্রলোকে লইত ?

সম্পত্তি হস্তগত হইলে, রজনী জিজ্ঞাসা করিল, "এ সম্পত্তি আমার স্থিরতর হইয়াছে বটে ?"

আমি বলিলাম, "তাহাতে সন্দেহ নাই।"

রজনী জিজ্ঞাসা করিল, "আমি এখন ইহা দান বিক্রয় করিতে পারি ?"

আমার মুখ শুকাইল—বলিলাম, "কেন, কাহাকে দান বিক্রয় করিবে ?"

আমার কণ্ঠস্বরে ভয় বুঝিতে পারিয়া রজনী হাসিল, বলিল, "ভয় নাই, আর কাহাকেও নহে। আপনাকেই দান করিব। ইহা আপনার পরিশ্রমে পাইয়াছি, আমার নামে না থাকিয়া, আপনার নামে থাকে, ইহা আমার সাধ।"

মনে মনে আমারও সেই ইচ্ছা ছিল। রজনীর সম্মতি পাইয়া আমি উকীলের বাড়ী গেলাম—লেখাপড়া করাইলাম। রজনী তাহা রেজিষ্টরী করিয়া দিল। একথা এক্ষণে গোপন রাখিলাম।

সম্পত্তির উপর বজ্রের মত আঁটিয়া বসিয়া বড়মানুষি করিব একবার ইচ্ছা হইল। বড়মানুষির সুখ যাহা তাহা বিলক্ষণ জানিতাম, তবে এ শুঁড়ি সোনার বেনের সাধ আমার মনে উদয় হইল কেন? ইহার কারণ কলিকাতা শুঁড়ি সোনার বেনের সমাজ; এখানে ব্রাহ্মণ কায়স্থের চরিত্রেও একটু একটু বেনেগিরি আছে—এখানে একটু বড়মানুষি না করিলে কেহ গ্রাহ্য করে না। এখানে গণ্য হইতে গেলে, হয় হুজুগ তুলিতে হইবে, নহে রাজপ্রসাদ পাইতে হইবে, নহে গলাবাজি করিতে হইবে, নয় বড়মানুষি করিতে হইবে। হুজুগ আমার এসে না—রাজপ্রসাদের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ নাই; গলাবাজি ভাল লাগে না; সুতরাং বড়মানুষিই অবলম্বন করিলাম, আর বোধ হইল রজনী চির-দরিদ্রা—বড়মানুষি তাহার ভাল লাগিতে পারে—অতএব রজনীর জন্য সে ইচ্ছা হইল। বড় দেখিয়া বাড়ী কিনিলাম। গৃহসজ্জায় দাসদাসীতে তাহা পরিপূর্ণ করিলাম—স্বর্ণ রৌপ্য যেখানে যাহা প্রয়োজন, মুক্তহস্তে ছড়াইলাম। বাছিয়া বাছিয়া গাড়ি আনিলাম—বাছিয়া বাছিয়া ঘোড়া তাহাতে যুড়িলাম—শেষ সাধ,—রজনীকে রত্নালঙ্কারে সাজাইব।

হায়—কাহাকে সাজাইব? সে ত কিছু দেখিতে পাইবে না। কাহার জন্য এ গৃহ সাজাইলাম—সে ত কিছু দেখিতে পাইল না!

রজনীকে অলঙ্কারের কথা বলিলাম। রজনী হাসিল। বলিল, "কালি বলিব?"

"কেন, আজ?"

রজনী বলিল, "আজ একবার লবঙ্গলতা ঠাকুরাণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাইব।"

আমি বিস্মিত হইলাম—রুষ্টও হইলাম। আগে রাগের কথা বলিলাম, "আজিও সে তোমার কাছে ঠাকুরাণী কিসে?"

রজনী। আমি তাঁহার সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইয়াছি, সম্ভ্রমটুকু না কাড়িলেও চলে।

আমি। তাহার সঙ্গে দেখা করিতে যাইবে কেন?

রজনী। প্রয়োজন আছে। পশ্চাৎ বলিব।

আমি। আমি আগে শুনিব।

রজনী। জেদ করিবেন না।

সুতরাং জেদ করিলাম না। বলিলাম, "তুমি তাহার কাছে না গিয়া, সে তোমার কাছে আসিলে হয় না?"

রজ। সে আসিবে কেন?

আমি জানিতাম—লবঙ্গলতা আসিলেও আসিতে পারে। ভিতরে কিছু গুপ্ত কথা ছিল। রজনী তাহা জানিত না। বলিলাম, "ডাকিলে আসিতে পারে।"

রজ। আমি তাঁহার বিষয় কাড়িয়া লইয়া এমন কি বড় লোক হইয়াছি যে তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইব?

আমি বলিলাম, "সে কথা নহে। আচ্ছা, তুমি দেখ, আমি নিজে তাঁহাকে ডাকিতে যাই। না আসে তখন তুমি যাইও।"

আমি স্বয়ং রামসদয় মিত্রের বাড়ী গেলাম। রামসদয় আমাকে দেখিয়া অন্তঃপুরে চলিয়া গেলেন, আমার সঙ্গে বাক্যালাপ করিলেন না। শচীন্দ্র চক্ষুলজ্জা বশতঃ আমার নিকটে আসিয়া বসিল। তাহাকে বলিলাম, "আমার পরিবার কোন বিশেষ কথা আপনার বিমাতার নিকট বলিতে চাহেন। আপনার বিমাতাকে জিজ্ঞাসা করুন, তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ জন্য আমার পরিবার এখানে আসিবেন, না আপনার বিমাতা আমাদিগের বাড়ীতে পায়ের ধূলা দিবেন।"

শচীন্দ্র বলিলেন, "জিজ্ঞাসা করা বৃথা। রজনীর এ পরিচিত স্থান—তিনি অনায়াসেই এখানে আসিতে পারেন।"

আমি বলিলাম, "সত্য। তথাপি আপনার একবার জিজ্ঞাসা করায় ক্ষতি হইবে না।"

"অনর্থক কষ্ট দিলেন।" বলিয়া শচীন্দ্র অনুরোধ রক্ষার্থ একবার অন্তঃপুরে গেলেন। ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "আমার পিতা সম্মত হইলে, বিমাতাই যাইবেন।"

রামসদয় যে আপত্তি করিবেন, তাহা আমি একবার ভ্রমেও মনে স্থান দিলাম না। বৃদ্ধ স্বামী কোন্ কালে যুবতী ভার্য্যার ইচ্ছায় অসম্মত হইয়াছে? আমি নিঃশঙ্কচিত্তে গিয়া রজনীকে বলিলাম যে "লবঙ্গলতা আসিবে।" রজনী একটু বিস্মিতা হইল।

পরদিন প্রাতে লবঙ্গলতা আসিল। রজনী নীচে হইতে তাহাকে সঙ্গে করিয়া উপরে আনিল। আমি তখন অন্তঃপুরে। রজনী ইচ্ছাপূর্ব্বক জীর্ণ বস্ত্র পরিয়াছিল,—লজ্জায় সে লবঙ্গলতার সঙ্গে ভাল করিয়া কথা কহিতেছিল না। লবঙ্গলতা হাসিতে উছলিয়া পড়িতেছিল—রাগ বা বিদ্বেষের কিছুমাত্র লক্ষণ দেখা গেল না।

সে হাসি অনেকদিন শুনি নাই। সে হাসি তেমনই ছিল—পূর্ণিমার সমুদ্রে ক্ষুদ্র তরঙ্গের তুল্য, সপুষ্প বসন্তলতার আন্দোলন তুল্য—তাহা হইতে সুখ, ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া ঝরিয়া পড়িতেছিল!

আমি অবাক্ হইয়া, নিস্পন্দ শরীরে, সশঙ্কচিত্তে, এই বিচিত্রচরিত্রা রমণীর মানসিক শক্তির আলোচনা করিতেছিলাম ! ললিত লবঙ্গলতা কিছুতেই টলে না। লবঙ্গলতা মহান্ ঐশ্বর্য্য হইতে দারিদ্রে পড়িয়াছে—তবু সেই সুখময় হাসি ; যে রজনী হইতে এই ঘোর বিপদ্ ঘটিয়াছে, তাহারই গৃহে উঠিতেছে, তাহার সঙ্গে আলাপ করিতেছে, চারিদিকে তাহারই ঐশ্বর্য্য—লবঙ্গের কাছে হইতে অপহৃত ঐশ্বর্য্য দেখিতেছে, তবু সেই সুখময় হাসি। আমি সম্মুখে—তবু সেই সুখময় হাসি। অথচ আমি জানি লবঙ্গ কোন কথাই ভুলে নাই।

আমি সরিয়া পার্শ্বের ঘরে গেলাম—লবঙ্গলতা প্রথমে সেই ঘরেই প্রবেশ করিল—নিঃশঙ্কচিত্তে, আজ্ঞাকারিণী রাজ-রাজেশ্বরীর ন্যায় রজনীকে বলিল—"রজনি—তুই এখন আর কোথাও যা ! তোর স্বামীর সঙ্গে আমার গোপনে কিছু কথা আছে। ভয় নাই ! তোর স্বামী সুন্দর হইলেও আমার বৃদ্ধ স্বামীর অপেক্ষা সুন্দর নহে !" রজনী অপ্রতিভ হইয়া, কি ভাবিতে ভাবিতে সরিয়া গেল।

ললিত লবঙ্গলতা, ভ্রুকুটি কুটিল করিয়া সেই মধুময় হাসি হাসিয়া, ইন্দ্রাণীর মত আমার সম্মুখে দাঁড়াইল। একবার বৈ কেহ অমরনাথকে আত্মবিস্মৃত দেখে নাই। আবার আত্মবিস্মৃত হইলাম। সেবারও ললিত লবঙ্গলতা—এবারও ললিত লবঙ্গলতা।

লবঙ্গ হাসিয়া বলিল, "আমার মুখপানে চাহিয়া কি দেখিতেছ ? তোমার নূতন ঐশ্বর্য্য কাড়িয়া লইতে আসিয়াছি কি না ? মনে করিলে তাহা পারি।"

আমি বলিলাম, "তুমি সব পার, কিন্তু ঐটি পার না। পারিলে কখন আমাকে বিষয় দিয়া, এখন স্বহস্তে রাঁধিয়া সতীনকে খাওয়াইতে না।"

লবঙ্গ উচ্চহাসি হাসিয়া বলিল, "হায় ! হায় ! ওটা বুঝি বড় গায়ে লাগিবে মনে করেছ ? সতীনকে রাঁধিয়া দিতে হয়, বড় দুঃখের কথা বটে, কিন্তু একটা পাহারাওয়ালাকে ডাকিয়া তোমাকে ধরাইয়া দিলে, এখনই আবার পাঁচটা রাঁধুনী রাখিতে পারি।"

ঠিক এই কথাটি শুনিবার জন্যই আমি ললিত লবঙ্গলতার আসার জন্য এত যত্ন করিয়াছিলাম। বলিলাম, "বিষয় রজনীর ; আমাকে ধরাইয়া দিলে কি হইবে ? যাঁহার বিষয় সে ভোগ করিতে থাকিবে।"

লবঙ্গ। তুমি কস্মিন্‌কালে স্ত্রীলোক চিনিলে না। স্বামীকে রক্ষার জন্য রজনী এখনই বিষয় ছাড়িয়া দিবে।

আমি। অর্থাৎ আমার রক্ষার জন্য বিষয়টা তোমায় ঘুষ দিবে ?

লবঙ্গ। তাই।

আমি। তবে এতদিন সে ঘুষ চাও নাই কেন ?

লবঙ্গ। তোমার মত ছোটলোকে তাহা বুঝিবে কি প্রকারে? চোরেরা বুঝিতে পারে না যে পরের দ্রব্য অস্পৃশ্য। রজনীর সম্পত্তি রাখিতে পারিলেও আমি রাখিব কেন?

আমার যেটি প্রধান ভয় ছিল, এই কথায় তাহা দূর হইল। লবঙ্গ সম্পত্তি উদ্ধারের লোভে আমার অনিষ্ট করিবে না। আমি লবঙ্গের ভয়েই প্রথম প্রথম লুকাইয়া বেড়াইয়াছি; পরে তাহাকে নিশ্চেষ্ট দেখিয়া আর একখানা ভাবিয়াছিলাম—এখন বুঝিলাম সেটা ভ্রান্তি। তথাপি যাহা জানিবার ইচ্ছা ছিল, তাহা জানিলাম। কিন্তু সকল জানিতে পারি নাই। বলিলাম, "তুমি যদি এমন না হবে, তবে আমার সে মরণ, কুবুদ্ধি ঘটিবে কেন? যদি আমার এত অপরাধ মার্জ্জনা করিয়াছ, এত অনুগ্রহ করিয়াছ, তবে আর একটি ভিক্ষা আছে। যাহা জান, তাহা যদি অন্যের কাছে না বলিয়াছ, তবে রজনীর কাছেও বলিও না।"

দর্পিতা লবঙ্গলতা ভ্রূভঙ্গী করিল—কি সুন্দর ভ্রূভঙ্গী! বলিল, "আমি কি ঠক! স্বামীর নামে স্ত্রীর কাছে ঠকাম করিবার জন্য কি আমি তোমার বাড়ীতে আসিয়াছি? তবে ইহা বলিতে পারি, যদি তুমি রজনীকে বিবাহ করিবার অগ্রে আমি ঘুণাক্ষরে জানিতে পারিতাম যে তুমি রজনীকে বিবাহ করিবে, তাহা হইলে আমি কখন এ বিবাহ হইতে দিতাম না। এখন বিবাহ হইয়াছে, তুমি নিশ্চিন্ত থাক, আমি ঘর ভাঙ্গিয়া রজনীকে কাতর করিব না।"

হঠাৎ এক সন্দেহ—এক আহ্লাদ মনে উদয় হইল—যাহা আগে ভাবিয়াছিলাম, তাই বা? নহিলে লবঙ্গলতা আসিল কেন? বলিলাম, "যদি আমার সে সন্দেহ থাকিবে, তবে যত্ন করিয়া তোমাকে লইয়া আসিব কেন?"

লবঙ্গ আমার অপেক্ষাও ধূর্ত্ত, বলিল, "তুমি সে জন্য আমাকে আন নাই। তুমি কেবল ইহাই জানিতে চাও, আমি তোমার সর্ব্বনাশ করিব কি না!"

আমি বলিলাম, "যদি তাই মনে করিয়া আনিয়া থাকি, তাতেই বা ক্ষতি কি?"

ললি। কি বুঝিলে?

আমি বলিলাম, "তুমি ভাঙ্গিয়া না বলিলে আমি বুঝি আমার সাধ্য কি?"

ললি। কেননা শচীন্দ্রের মত কাঁচা ছেলে পাও নাই। (আমি মনে মনে একটু হাসিলাম, কেন না, শচীন্দ্র বিমাতার অপেক্ষা বয়সে বড়) লবঙ্গ বলিতে লাগিল, "আমি ভাঙ্গিয়াই বলিব। তুমি আমাদের কোন অন্যায় অনিষ্ট কর নাই—ন্যায় মতেই আমরা বিষয় হারাইয়াছি—এজন্য তোমাকে কিছু বলি নাই। রজনীকে বিবাহ করিয়াছ, তাহাতেও কিছু বলিব না।—কেননা বিবাহ কিছুতেই ফিরিবে না। কিন্তু দেখিও— আর কাহারও কোন অনিষ্ট করিতে যদি তোমাকে প্রবৃত্ত দেখিব—

তবে আমার যাহা কর্ত্তব্য তাহা করিব। এ কথাই বলিতে আমি আসিয়াছি। এখন রজনীর কাছে চলিলাম। ইচ্ছা হয়, সঙ্গে এসো।”

এই বলিয়া, লবঙ্গলতা হাসিল। তাহার হাসির মর্ম্ম আমি কিছু কখন বুঝিতে পারি না। লবঙ্গ বিলক্ষণ রাগিয়া উঠিয়াছিল—কিন্তু হাসিতে সব রাগ ভাসিয়া গেল। যেন জলের উপর হইতে মেঘের ছায়া সরিয়া গেল, তাহার উপর মেঘমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় জ্বলিতে লাগিল।

হাসিয়া বলিল, “তবে আমি রজনীর কাছে যাই?”

“যাও।”

ললিত লবঙ্গলতা, ললিত লবঙ্গতার মত দুলিতে দুলিতে চলিল। ক্ষণেক পরে, আমাকে ডাকিয়া পাঠাইল। গিয়া দেখিলাম, লবঙ্গলতা দাঁড়াইয়া আছে। রজনী তাহার পায়ে হাত দিয়া কাঁদিতেছে। আমি গেলে লবঙ্গলতা বলিল, “শুন, তোমার ভার্য্যা কি বলিতেছে! তোমার সম্মুখে নহিলে এমন কথা আমি কানে শুনিব না, বা তাহার উত্তর দিব না।”

আমি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম “কি?”

লবঙ্গলতা রজনীকে বলিল, “বল। তোমার স্বামী আসিয়াছেন—এখন উত্তর দিব।”

রজনী সকাতরে বলিল, “আমি যদি কখন আপনার দ্বারে গিয়া আশ্রয় ভিক্ষা করি, তবে আমাকে আশ্রয় দিবেন কি না? না অপরাধিনী বলিয়া তাড়াইয়া দিবেন?”

লবঙ্গলতা বলিল, “তোমার যেদিন ইচ্ছা সেইদিন আসিও। আমার গৃহ, তোমার গৃহ। আমার যতদিন অন্ন যুটিবে, তোমারও ততদিন যুটিবে।”

এই বলিয়া, আমার মুখপানে চাহিয়া, মৃদু হাসিয়া, ললিত লবঙ্গলতা সোপান অবতরণ পূর্ব্বক শিবিকারোহণ করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ললিত লবঙ্গলতা চলিয়া গেলে পর, আমি রজনীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “লবঙ্গ তোমাকে কি বলিয়াছে?”

রজনী। যাহা আপনি শুনিলেন, তাহাই।

আমি বলিলাম, “আমার কথা কিছু?”

রজ। কিছু না।

আমি। তুমি তাহাকে কি বলিয়াছ?

রজ। আপনি যাহা শুনিলেন, তাই।

আমি। আমার কথা কিছু।

রজ। কিছু না।

আমি। আমি যাহা শুনিলাম, তাহাই কেন বলিতেছিলে? কিজন্য তুমি তাহার নিকট আশ্রয় ভিক্ষা চাহিতেছিলে? এইজন্য কি তুমি লবঙ্গের সঙ্গে দেখা করিতে চাহিয়াছিলে?

রজ। এইজন্যই। যে বিষয়-বিভব আপনার উদ্দেশ্য তাহা আমি আপনাকে লিখিয়া দিয়াছি। এক্ষণে আমাতে আপনার আর প্রয়োজন নাই। আমাকে ত্যাগ করুন।

আমি আকাশ হইতে পড়িলাম। "সে কি রজনি? এ কথা কেন বলিতেছ? তুমি আমাকে ছাড়িয়া কোথায় যাইবে?"

রজ। যেখানে আশ্রয় পাইব।

আমি বলিলাম, "আমি কি অপরাধ করিয়াছি? কিসে আমার উপর রাগ করিলে?"

রজ। আপনার উপর রাগ কিছুই নহে—এবং এ শরীর ধারণে কখন আপনার উপর রাগ করিতে পারিব না। তবে আপনার অনুরোধে, অত্যন্ত গর্হিত কার্য্য করিয়াছি। যাহারা বাল্যাবধি আমাকে প্রতিপালন করিয়াছে, তাহাদিগের সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইয়াছি। যাহারা রাজা ছিল, আমার চক্রে তাহারা পথের কাঙ্গাল হইয়াছে। আপনার ঋণ পরিশোধের জন্য এ সকলও আমার কর্ত্তব্য হইয়াছিল—আপনার কথায় তাহা করিয়াছি। আপনি সে ধনের অধিকারী হইবেন বলিয়া এ দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি, কিন্তু স্বয়ং সে ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতে পারিব না। যাহাদিগের বিষয় কাড়িয়া লইয়াছি, তাহাদিগের দাসীত্ব করিয়া কালযাপন করিব।

বুঝিলাম। বলিলাম, "এ সম্পত্তি কাহার? তোমার নহে?"

রজনী। আমার হইলেও আমার ইহাতে প্রয়োজন নাই।

আমি নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইলাম—নিতান্ত ভীত হইলাম। যদি রজনী এখন আমার গৃহত্যাগ করিয়া মিত্র গোষ্ঠীর আশ্রয় গ্রহণ করে, তবে লোকে মনে করিবে রজনীর ইচ্ছা ছিল না, আমিই অর্থের লোভে রজনীকে হস্তগত করিয়া কুচক্রে মিত্রদিগকে এই বিপদগ্রস্ত করিয়াছি। লোকে অন্যায় মনে করিবে না, কিন্তু লোকের এরূপ মনে করা আমার পক্ষে ভাল নহে। আমার বিষয় কেহ কাড়িয়া লইতে পারিবে না বটে, কিন্তু কুলোক বলিয়া সমাজে পরিচিত হওয়া মঙ্গলের কথা নহে। কুলোক বলিয়া যে পরিচিত তাহার কোন ইষ্ট সিদ্ধ হয় না—সমাজে তাহার সকলেই শত্রুতা করে। রজনী বিষয় আমাকে

দিয়া স্বয়ং ভিখারিণী হইয়া পরাশ্রয়ে গেলে আমি সমাজে অর্থলুব্ধ কুচক্রী হইয়া দাঁড়াইব। আমার সম্ভ্রম যাইবে। আমার সম্ভ্রম সর্ব্বস্ব। অতএব রজনীকে যাইতে দেওয়া হইবে না।

আমি বলিলাম, "তুমি যদি আমাকে প্রবঞ্চনা করিবে জানিতাম, তাহা হইলে তোমার বিষয় উদ্ধারের জন্য এত করিতাম না। এখন কি তাহার এই প্রতিফল?"

রজ। ঐ কথাটি বলিবেন না। আপনি আমার জন্য বিষয়ের উদ্ধার করেন নাই। নিজের জন্য করিয়াছেন। আমি আপনাকে অনেকবার নিষেধ করিয়াছি। আপনি শুনেন নাই। আপনার ইহাতে নিতান্ত সুখ বুঝিয়া আমি সুতরাং আপনার প্রতিকূলতাচরণ করি নাই—কেন না আপনার কাছে আমি বড় ঋণে বাঁধা আছি। এখন আপনার অভিলাষ পূর্ণ করিয়াছি, এখন আমাকে ছাড়িয়া দিউন।

আমি। কেমন করিয়া আমাকে ত্যাগ করিয়া যাইবে? লোকে কি বলিবে? আমি যে তোমার স্বামী!

রজনী। কার্য্যোদ্ধার হইয়াছে—বিষয় আপনার হইয়াছে—এখন আর লোককে প্রবঞ্চনা করিব কেন? আপনি আমার স্বামী নহেন, পৃথক্ হইবার বিচিত্রতা কি?

মাথায় বজ্রাঘাত হইল। এ কথাও রজনী প্রকাশ করিবে! রজনীকে বুঝাইয়া বলিলাম—

"দেখ রজনি, কয় মাস স্ত্রীপুরুষ পরিচয়ে একত্রে বাস করিতেছি। এখন তুমি যদি বল তুমি আমার স্ত্রী নহ, কে তোমার কথায় বিশ্বাস করিবে?"

রজনী বলিল, "যখন আমি বলিব যে, মিত্রদিগের বিষয় নিজ হস্তগত করিবার জন্য অমরনাথ বাবু আমার স্বামী সাজিয়াছিলেন, তখন সকলেই আমার কথায় বিশ্বাস করিবে। কেন না মন্দ কথাটা লোকে সহজেই বিশ্বাস করে—বুঝাইতে হয় না।"

আমি বলিলাম, "যদি তাহা বুঝ, তবে আর একটা কথা ভাবিয়া দেখ। তুমি আমার অন্তঃপুরে আমার স্ত্রী পরিচয়ে এতদিন বাস করিয়াছ, তবে এখন যদি বল যে, তোমার বিবাহ হয় নাই, তবে লোকে মনে করিবে, তুমি কুলটার মতই আমার ঘরে ছিলে।"

লজ্জায়, দুঃখে, ক্রোধে রজনীর মুখ নীলবর্ণ হইল। রজনী কাঁদিতে লাগিল, পরিশেষে কাতর স্বরে বলিতে লাগিল, "যাহার অন্য উপায় নাই, তাহার এক উপায় আছে। সে মরিতে পারে। যে অন্ধ, সে যদি মরিবার জন্য কোন উপায়

না পায়, তবে অনাহারেও মরিতে পারে। আমি স্ত্রীজাতি, সহজে আত্মহত্যা করিতে পারি।"

তখন আমিও সকাতরে বলিলাম, "রজনি, তোমার চক্ষু নাই, আমার আঘাত চিহ্নগুলি তোমাকে দেখাইতে পারিলাম না। নহিলে সেগুলি দেখাইয়া তোমার জিজ্ঞাসা করিতাম, যাহার জন্য এই সকল আঘাত শরীরে ধরিয়াছি তাহার কাছে আমার কি এই পুরস্কার হইল।"

রজনী আরও কঠিন হইল। বলিল, "তাহার পুরস্কার, মিত্রদিগের জমীদারী। আপনি আমার জন্য শরীরদানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন—সে উপকারের প্রতিশোধ কিছুতেই হইতে পারে না বটে, কিন্তু আমার যাহা সাধ্য তাহা করিয়াছি। আপনাকে আমার বিষয় দিয়াছি। আপনি পুরুষ, আপনি মহৎ কার্য্য করিতে পারেন; আমি স্ত্রীজাতি, সামান্য কার্য্যই পারি; তাই, আপনার মহৎ কাজে আমার সামান্য কাজে শোধ হইল মনে করুন। এইরূপে আপনার ঋণ পরিশোধ করিব বলিয়াই এতদিন আপনার বশবর্ত্তিনী হইয়া যাহা বলিয়াছেন, তাহাই করিয়াছি। শচীন্দ্র বাবুকেও রূঢ় কথা বলিয়া তাড়াইয়া দিয়াছি।"

"শচীন্দ্র বাবুকেও রূঢ় কথা বলিয়া তাড়াইয়া দিয়াছি।" কথাটি বলিবার সময় রজনীর কথা একটু বিকৃত হইল—কথাটিতে অপ্রতিভের চিহ্ন ছিল—তাহা আমি ঠিক বুঝিতে পারিলাম না—আমার ভাল লাগিল না—মর্ম্ম বুঝিবার জন্য বলিলাম,

"কেন, যে এতদিন বঞ্চনা করিয়া তোমার ধনে বড়মানুষি করিয়াছে, তাহাকে রূঢ় কথা বলিতে ক্ষতি কি ?"

রজ। জানিয়া কেহ আমায় বঞ্চনা করে নাই—বরং তাঁহারা আমার উপকার করিতেন। কিন্তু সে কথায় এখন কাজ কি ? আপনি আমাকে বিদায় দিন।

আমি বুঝিলাম যে, রজনী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, স্থিরসংকল্প। যে একবার গৃহত্যাগ করিয়া গিয়াছিল, সে আর একবার পারে। মিথ্যা বাগ্‌জাল ত্যাগ করিয়া বলিলাম, "যদি আমার সংসর্গ ত্যাগ করাই তোমার স্থির হইয়াছে, তবে মিত্রদিগের আশ্রয়েই যাইতে হইবে কেন ? আর কি স্থান নাই ?"

সকাতরে রজনী বলিল, "কোথায় স্থান ?"

আমি। কেন তোমার পিতার সঙ্গে যাও না ?

রজনী। তিনিও আপনার ঐশ্বর্য্যে মুগ্ধ—আপনার বখরাদার। তিনি সুখ সম্পদ্ ছাড়িয়া যাইবেন না।

আমি। আমি তোমাকে স্বতন্ত্র বাড়ী কিনিয়া দিতেছি।

রজনী। আপনার টাকার ভাগ লইয়া আমি সুখ কিনিব না।

আমি। আমার সকল টাকা মিত্রদিগের বিষয়ের উপস্বত্ব নহে। আমার নিজের বিষয় আছে। তাহার উপস্বত্বও যথেষ্ট। তাহা হইতে তোমার উপায় করিব।

রজনী। তাহা হইতেও আমি কিছু লইব না। সে কেবল ডানহাত বাঁহাত মাত্র।

আমি। আমি তোমাকে বিষয়ের ভাগ দিতে চাহিতেছি না। শান্তিপুরে আমার পৈতৃক বাড়ীতে তোমাকে পাঠাইতেছি। সেখানে আমার পৈতৃক সম্পত্তির উপস্বত্ব হইতে অনেক অনাথা গ্রাসাচ্ছাদন পাইতেছে। তুমি সেইখানে তাহাদিগের মত থাকিবে। তুমি কে, কি বৃত্তান্ত কেহ জানিবে না।

রজনী সম্মতা হইল।

কিন্তু সেই সময়ে লবঙ্গলতার শাসনবাক্য মনে পড়িল। মনে মনে আপনাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—আমি কি রজনীর কোন ক্ষতি করিতেছি? না, সে যাহা চায় তাহাই করিতেছি?

কৃষ্ণচরিত্র

বঙ্গদর্শনের দ্বিতীয় খণ্ডে মানস বিকাশের সমালোচনায় কথিত হইয়াছে যে, যেমন অন্যান্য ভৌতিক, আধ্যাত্মিক বা সামাজিক ব্যাপার নৈসর্গিক নিয়মের ফল, কাব্যও তদ্রূপ। দেশভেদে ও কালভেদে কাব্যের প্রকৃতিগত প্রভেদ জন্মে। ভারতীয় সমাজের যে অবস্থার উক্তি রামায়ণ, মহাভারত সে অবস্থার নহে; মহাভারত যে অবস্থার উক্তি, কালিদাসাদির কাব্য সে অবস্থার নহে। তথায় দেখান গিয়াছে যে বঙ্গীয় গীতিকাব্য, বঙ্গীয় সমাজের কোমল প্রকৃতি, নিশ্চেষ্টতা এবং গৃহসুখনিরতির ফল। অদ্য সেই কথা স্পষ্টীকরণে প্রবৃত্ত হইব।

বিদ্যাপতি এবং তদনুবর্ত্তী বৈষ্ণব কবিদিগের গীতের বিষয়, একমাত্র কৃষ্ণ ও রাধিকা। বিষয়ান্তর নাই। তজ্জন্য এইসকল কবিতা অনেক আধুনিক বাঙ্গালির অরুচিকর। তাহার কারণ এই যে, নায়িকা, কুমারী বা নায়কের শাস্ত্রানুসারে পরিণীতা পত্নী নহে, অন্যের পত্নী; অতএব সামান্য নায়কের সঙ্গে কুলটার প্রণয় হইলে যেমন অপবিত্র, অরুচিকর এবং পাপে পঙ্কিল হয়, কৃষ্ণলীলাও তাঁহাদের বিবেচনায় তদ্রূপ—অতি কদর্য্য পাপের আধার। বিশেষ এসকল কবিতা অনেক সময় অশ্লীল, এবং ইন্দ্রিয়ের পুষ্টিকর—অতএব ইহা সর্ব্বথা পরিহার্য্য। যাঁহারা এইরূপ বিবেচনা করেন, তাঁহারা নিতান্ত অসারগ্রাহী। যদি কৃষ্ণলীলার এই ব্যাখ্যা হইত, তবে ভারতবর্ষে কৃষ্ণভক্তি এবং কৃষ্ণগীতি কখন এতকাল স্থায়ী হইত না। কেননা অপবিত্র কাব্য কখন স্থায়ী হয় না। এ বিষয়ের যথার্থ নিরূপণ জন্য আমরা এই নিগূঢ় তত্ত্বের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

কৃষ্ণ যেমন আধুনিক বৈষ্ণব কবিদিগের নায়ক, সেইরূপ জয়দেবে, ও সেইরূপ শ্রীমদ্ভাগবতে। কিন্তু কৃষ্ণচরিত্রের আদি শ্রীমদ্ভাগবতেও নহে। ইহার আদি মহাভারতে। জিজ্ঞাস্য এই যে মহাভারতে যে কৃষ্ণচরিত্র দেখিতে পাই, শ্রীমদ্ভাগবতেও কি সেই কৃষ্ণের চরিত্র? জয়দেবেও কি তাই? এবং বিদ্যাপতিতেও

প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ। শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার কর্ত্তৃক সম্পাদিত। চুঁচুড়া—সাধারণী যন্ত্র ৮

কি তাই ? চারিজন গ্রন্থকারই কৃষ্ণকে ঐশিক অবতার বলিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু চারিজনেই কি একপ্রকার সে ঐশিক চরিত্র চিত্রিত করিয়াছেন ? যদি না করিয়া থাকেন, তবে প্রভেদ কি ? যাহা প্রভেদ বলিয়া দেখা যায়, তাহার কি কিছু কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে ? সে প্রভেদের সঙ্গে, সামাজিক অবস্থার কি কিছু সম্বন্ধ আছে ?

প্রথমে বক্তব্য, প্রভেদ থাকিলেই তাহা যে সামাজিক অবস্থাভেদের ফল, আর কিছু নহে, ইহা বিবেচনা করা অকর্ত্তব্য। কাব্যে কাব্যে প্রভেদ নানা প্রকারে ঘটে। যিনি কবিতা লিখেন, তিনি জাতীয় চরিত্রের অধীন; সামাজিক বলের অধীন; এবং আত্মস্বভাবের অধীন। তিনটিই তাঁহার কাব্যে ব্যক্ত হইবে। ভারতবর্ষীয় কবিমাত্রেরই কতকগুলিন বিশেষ দোষ গুণ আছে, যাহা ইউরোপীয় বা পারসিক ইত্যাদি জাতীয় কবির কাব্যে অপ্রাপ্য। সেগুলি তাঁহাদিগের জাতীয় দোষ গুণ। প্রাচীন কবিমাত্রেরই কতকগুলি দোষ গুণ আছে, যাহা আধুনিক কবিতে অপ্রাপ্য। সেইগুলি তাঁহাদিগের সাময়িক লক্ষণ। আর কবিমাত্রের শক্তির তারতম্য এবং বৈচিত্র আছে। সেগুলি তাঁহাদিগের নিজগুণ।

অতএব, কাব্যবৈচিত্রের তিনটি কারণ—জাতীয়তা, সাময়িকতা এবং স্বাতন্ত্র্য। যদি চারিজন কবিকর্তৃক গীত কৃষ্ণচরিত্রে প্রভেদ পাওয়া যায়, তবে সে প্রভেদের কারণ তিন প্রকারই থাকিবার সম্ভাবনা। বঙ্গবাসী জয়দেবের সঙ্গে, মহাভারতকার বা শ্রীমদ্ভাগবতকারের জাতীয়তাজনিত পার্থক্য থাকিবারই সম্ভাবনা; তুলসীদাসে এবং কৃত্তিবাসে আছে। আমরা জাতীয়তা এবং স্বাতন্ত্র্য পরিত্যাগ করিয়া সাময়িকতার সঙ্গে এই চারিটি কৃষ্ণচরিত্রের কোন সম্বন্ধ আছে কি না ইহারই অনুসন্ধান করিব।

মহাভারত কোন্ সময়ে প্রণীত হইয়াছিল, তাহা এপর্য্যন্ত নিরূপিত হয় নাই। নিরূপিত হওয়াও অতি কঠিন। মূলগ্রন্থ একজন প্রণীত বলিয়াই বোধ হয়, কিন্তু এক্ষণে যাহা মহাভারত বলিয়া প্রচলিত, তাহার সকল অংশ কখন একজনের লিখিত নহে। যেমন একজন একটি অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া গেলে, তাঁহার পরপুরুষেরা তাহাতে কেহ একটি নূতন কুঠারি, কেহ বা একটি নূতন বারেণ্ডা, কেহ বা একটি নূতন প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়া তাহার বৃদ্ধি করিয়া থাকেন, মহাভারতেরও তাহাই ঘটিয়াছে। মূলগ্রন্থের ভিতর পরবর্ত্তী লেখকেরা কোথাও কতকগুলি কবিতা, কোথাও একটি উপন্যাস, কোথাও একটি পর্ব্বাধ্যায় সন্নিবেশিত করিয়া বহু সরিতের জলে পুষ্ট সমুদ্রবৎ বিপুল কলেবর করিয়া তুলিয়াছেন। কোন্ ভাগ আদি গ্রন্থের অংশ, কোন্ ভাগ আধুনিক সংযোগ, তাহা সর্ব্বত্র নিরূপণ করা

অসাধ্য। অতএব আদি গ্রন্থের বয়ঃক্রম নিরূপণ অসাধ্য। তবে উহা যে শ্রীমদ্ভাগবতের পূর্ব্বগামী ইহা বোধ হয় সুশিক্ষিত কেহই অস্বীকার করিবেন না। যদি অন্য প্রমাণ নাও থাকে,তবে কেবল রচনাপ্রণালী দেখিলে বুঝিতে পারা যায়। ভাগবতের সংস্কৃত অপেক্ষাকৃত আধুনিক; ভাগবতে কাব্যের গতি অপেক্ষাকৃত আধুনিক পথে।

অতএব প্রথম মহাভারত। মহাভারত খ্রীষ্টাব্দের অনেক পূর্ব্বে প্রণীত হইয়াছিল, ইহাও অনুভবে বুঝা যায়। মহাভারত পড়িয়া বোধ হয়, ভারতবর্ষীয়দিগের দ্বিতীয়াবস্থা, অথবা তৃতীয়াবস্থা ইহাতে পরিচিত হইয়াছে। তখন দ্বাপর, সত্য যুগ আর নাই। যখন সরস্বতী ও দৃষদ্বতী-তীরে, নবাগত আর্য্যবংশ, সরল গ্রাম্য ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া দস্যুভয়ে আকাশ, ভাস্কর, মরুতাদি ভৌতিক শক্তিকে আত্মরক্ষার্থ আহ্বান করিয়া, অপেয় সোমরস পানকে জীবনের সার সুখজ্ঞান করিয়া আর্য্য-জীবন নির্ব্বাহ করিতেন, সে সত্য যুগ আর নাই। দ্বিতীয়াবস্থাও নাই। যখন আর্য্যগণ সংখ্যায় পরিবর্দ্ধিত হইয়া, বহু যুদ্ধে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিয়া, দস্যুজয়ে প্রবৃত্ত, সে ত্রেতা আর নাই। যখন আর্য্যগণ, বাহুবলে বহুদেশ অধিকৃত করিয়া, শিল্পাদির উন্নতি করিয়া, প্রথম সভ্যতার সোপানে উঠিয়া কাশী, অযোধ্যা, মিথিলাদি নগর সংস্থাপিত করিতেছেন, সে ত্রেতা আর নাই। যখন আর্য্যহৃদয়ক্ষেত্রে নূতন জ্ঞানের অঙ্কুর দেখা দিতেছে, সে ত্রেতা আর নাই। এক্ষণে দস্যুজাতি বিজিত, পদানত, দেশপ্রান্তবাসী শূদ্র, ভারতবর্ষ আর্য্যগণের করস্থ, আয়ত্ত, ভোগ্য এবং মহাসমৃদ্ধিশালী। তখন আর্য্যগণ বাহ্য শত্রুর ভয় হইতে নিশ্চিন্ত, আভ্যন্তরিক সমৃদ্ধি সম্পাদনে সচেষ্ট, হস্তগতা অনন্তরত্নপ্রসবিনী ভারতভূমি অংশীকরণে ব্যস্ত। যাহা সকলে জয় করিয়াছে তাহা কে ভোগ করিবে? এই প্রশ্নের ফল আভ্যন্তরিক বিবাদ। তখন আর্য্য পৌরুষ চরমে দাঁড়াইয়াছে। যে হলাহল যুদ্ধের ফলে, দুই সহস্র বৎসর পরে জয়চন্দ্র এবং পৃথ্বীরাজ পরস্পর বিবাদ করিয়া উভয়ে সাহাবুদ্দিনের করতলস্থ হইলেন, এই দ্বাপরে তাহার বীজ বপন হইয়াছে। এই দ্বাপরের কার্য্য মহাভারত। (১)

এরূপ সমাজে দুই প্রকার মনুষ্য সংসার-চিত্রের অগ্রগামী হইয়া দাঁড়ান; এক সমরবিজয়ী বীর, দ্বিতীয় রাজনীতিবিশারদ মন্ত্রী। এক মল্টকে, দ্বিতীয় বিস্মার্ক; এক গারিবলদি, দ্বিতীয় কাবুর; মহাভারতেও এই দুই চিত্র প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, এক অর্জ্জুন, দ্বিতীয় শ্রীকৃষ্ণ।

এই মহাভারতীয় কৃষ্ণচরিত্রকাব্য সংসারে তুলনারহিত। যে ব্রজলীলা জয়দেব ও বিদ্যাপতির কাব্যের একমাত্র অবলম্বন, যাহা শ্রীমদ্ভাগবতেও অত্যন্ত পরিস্ফুট, ইহাতে তাহার সূচনাও নাই। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ অদ্বিতীয় রাজনীতিবিদ্—

---

(১) পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে কতিপয় শতাব্দীকে এখানে "যুগ" বলা যাইতেছে।

সাম্রাজ্যের গঠন বিশ্লেষণে বিধাতৃতুল্য কৃতকার্য্য—সেইজন্য ঈশ্বরাবতার বলিয়া কল্পিত। শ্রীকৃষ্ণ ঐশিক শক্তিধর বলিয়া কল্পিত, কিন্তু মহাভারতে ইনি অস্ত্রধারী নহেন, সামান্য জড় শক্তি বাহুবল ইঁহার বল নহে; উচ্চতর মানসিক বলই ইঁহার বল। যে অবধি ইনি মহাভারতে দেখা দিলেন, সেই অবধি এই মহেতিহাসের মূল গ্রন্থি রজ্জু ইঁহার হাতে—প্রকাশ্যে কেবল পরামর্শদাতা—কৌশলে সর্ব্বকর্ত্তা। ইঁহার কেহ মর্ম্ম বুঝিতে পারে না, কেহ অন্ত পায় না, সে অনন্ত চক্রে কেহ প্রবেশ করিতে পারে না। ইঁহার যেমন দক্ষতা, তেমনই ধৈর্য্য। উভয়েই দেবতুল্য। পৃথিবীর বীরমণ্ডলী একত্রিত হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত; যে ধনু ধরিতে জানে, সেই কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিল; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদিগের পরমাত্মীয় হইয়াও কুরুক্ষেত্রে অস্ত্র ধরেন নাই। তিনি মানসিক শক্তি মূর্ত্তিমান্, বাহুবলের আশ্রয় লইবেন না। তাঁহার অভীষ্ট, পৃথিবীর রাজকুল ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া, একা পাণ্ডব পৃথিবীশ্বর থাকেন; স্বপক্ষ বিপক্ষ উভয়ের নিধন না হইলে তাহা ঘটে না; যিনি ঈশ্বরাবতার বলিয়া কল্পিত, তিনি স্বয়ং রণে প্রবৃত্ত হইলে, যে পক্ষাবলম্বন করিবেন, সেই পক্ষের সম্পূর্ণ রক্ষা সম্ভাবনা। কিন্তু তাহা তাঁহার উদ্দেশ্য নহে। কেবল পাণ্ডবদিগকে একেশ্বর করাও তাঁহার অভীষ্ট নহে। ভারতবর্ষের ঐক্য তাঁহার উদ্দেশ্য। ভারতবর্ষ তখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত; খণ্ডে খণ্ডে এক একটি ক্ষুদ্র রাজা। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজগণ পরস্পরকে আক্রমণ করিয়া পরস্পরকে ক্ষীণ করিত, ভারতবর্ষ অবিরত সমরানলে দগ্ধ হইতে থাকিত। শ্রীকৃষ্ণ বুঝিলেন যে, এই সসাগরা ভারত একচ্ছত্রাধীন না হইলে ভারতের শান্তি নাই; শান্তি ভিন্ন লোকের রক্ষা নাই; উন্নতি নাই। অতএব এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরস্পর-বিদ্বেষী রাজগণকে প্রথমে ধ্বংস করা কর্ত্তব্য, তাহা হইলেই ভারতবর্ষ একায়ত্ত, শান্ত এবং উন্নত হইবে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তাহারা পরস্পরের অস্ত্রে পরস্পরে নিহত হয়, ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য হইল। ইহারই পৌরাণিক নাম পৃথিবীর ভারমোচন। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং যুদ্ধ করিয়া, এক পক্ষের রক্ষা চেষ্টা করিয়া, কেন সে উদ্দেশ্যের বিঘ্ন করিবেন? তিনি বিনা অস্ত্রধারণে, অর্জ্জুনের রথে বসিয়া, ভারত রাজকুলের ধ্বংস সিদ্ধ করিলেন।

এইরূপ, মহাভারতীয় কৃষ্ণচরিত্র যতই আলোচনা করা যাইবে, ততই তাহাতে এই ক্রূরকর্ম্মা দূরদর্শী রাজনীতিবিশারদের লক্ষণ সকল দেখা যাইবে। তাহাতে বিলাসপ্রিয়তার লেশমাত্র নাই—গোপবালকের চিহ্নমাত্র নাই।

এদিকে দর্শনশাস্ত্রের প্রাদুর্ভাব হইতেছিল। বৈদিক ও পৌরাণিক দেবগণের আরাধনা করিয়া আর মার্জ্জিতবুদ্ধি আর্য্যগণ সন্তুষ্ট নহেন। তাঁহারা দেখিলেন যে, যে সকল ভিন্ন ভিন্ন নৈসর্গিক শক্তিকে তাঁহারা পৃথক্ পৃথক্ দেব কল্পনা করিয়া পূজা করিতেন, সকলেই এক মূল শক্তির ভিন্ন ভিন্ন বিকাশ মাত্র। জগৎকর্ত্তা

এক এবং অদ্বিতীয়। তখন ঈশ্বরতত্ত্ব নিরূপণ লইয়া মহাগোলযোগ উপস্থিত হইল। কেহ বলিলেন, ঈশ্বর আছেন, কেহ বলিলেন নাই। কেহ বলিলেন ঈশ্বর এই জড় জগৎ হইতে পৃথক্, কেহ বলিলেন এই জড় জগৎই ঈশ্বর। তখন, নানা জনের নানা মতে, লোকের মন অস্থির হইয়া উঠিল; কোন্ মতে বিশ্বাস করিবে? কাহার পূজা করিবে? কোন্ পদার্থে ভক্তি করিবে? দেব ভক্তির জীবন নিশ্চয়তা—অনিশ্চয়তা জন্মিলে ভক্তি নষ্ট হয়। পুনঃ পুনঃ আন্দোলনে ভক্তিমূল ছিন্ন হইয়া গেল। অর্দ্ধাধিক ভারতবর্ষ নিরীশ্বর বৌদ্ধমত অবলম্বন করিল। সনাতন ধর্ম্ম মহাসঙ্কটে পতিত হইল। শতাব্দীর পর শতাব্দী এইরূপে কাটিয়া গেলে শ্রীমদ্ভাগবতকার সেই ধর্ম্মের পুনরুদ্ধারে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহাতে দ্বিতীয় কৃষ্ণ-চরিত্র প্রণীত হইল।

আচার্য্য টিণ্ডল একস্থানে ঈশ্বর নিরূপণের কাঠিন্য সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি একাধারে উৎকৃষ্ট কবি এবং উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক হইবে, সেই ঈশ্বর নিরূপণে সক্ষম হইবে। প্রথম শ্রেণীর বৈজ্ঞানিকতা এবং প্রথম শ্রেণীর কবিত্ব, একাধারে এ পর্য্যন্ত সন্নিবেশিত হয় নাই। একব্যক্তি নিউটন ও সেক্ষপীয়রের প্রকৃতি লইয়া এ পর্য্যন্ত জন্মগ্রহণ করেন নাই। কিন্তু বৈজ্ঞানিক কবি কেহ না হইয়া থাকুন, দার্শনিক কবি অনেক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন—ঋগ্বেদের ঋষিগণ হইতে রাজকৃষ্ণবাবু পর্য্যন্ত ইহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। দার্শনিক কবিগণ আপনাদিগকে ঈশ্বর নিরূপণে সমর্থ বিবেচনা করেন। শ্রীমদ্ভাগবতকার দার্শনিক এবং শ্রীমদ্ভাগবতকার কবি। তিনি দর্শনে ও কাব্যে মিলাইয়া, ধর্ম্মের পুনরুদ্ধারে প্রবৃত্ত হইলেন। এবং এই ভূমণ্ডলে এরূপ দুরূহ ব্যাপারে যদি কেহ কৃতকার্য্য হইয়া থাকেন, তবে শাক্যসিংহ ও শ্রীমদ্ভাগবতকার হইয়াছেন।

দার্শনিকদিগের মতের মধ্যে একটি মত, পণ্ডিতের নিকট অতিশয় মনোহর। সাংখ্যকার, মানস রসায়নে জগৎকে বিশ্লিষ্ট করিয়া, আত্মা এবং জড়জগতে ভাগ করিয়া ফেলিলেন। জগৎ দ্বৈপ্রকৃতিক—তাহাতে পুরুষ এবং প্রকৃতি বিদ্যমান। কথাটি অতি নিগূঢ়,—বিশেষ গভীরার্থপূর্ণ। ইহা প্রাচীন দর্শনশাস্ত্রের শেষ সীমা। গ্রীক্ পণ্ডিতেরা বহুকষ্টে এই তত্ত্বের আভাসমাত্র পাইয়াছিলেন। অদ্যাপি ইউরোপীয় দার্শনিকেরা এই তত্ত্বের চতুঃপার্শ্বে অন্ধ মধুমক্ষিকার ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। কথাটির স্থূল মর্ম্ম যাহা, তাহা সাংখ্যদর্শন বিষয়ক প্রবন্ধে বুঝাইয়াছি। এই প্রকৃতি ও পুরুষ সাংখ্য মতানুসারে পরস্পরে আসক্ত, স্ফাটিকপাত্রে জবা পুষ্পের প্রতিবিম্বের ন্যায়, প্রকৃতিতে পুরুষ সংযুক্ত, ইহাদিগের মধ্যে সম্বন্ধ বিচ্ছেদেই জীবের মুক্তি।

এই সকল দুরূহ তত্ত্ব দার্শনিকের মনোহর, কিন্তু সাধারণের বোধগম্য নহে। শ্রীমদ্ভাগবতকার ইহাকেই জনসাধারণের বোধগম্য এবং জনসাধারণের মনোহর

করিয়া সাজাইয়া, মৃত ধর্ম্মে জীবন সঞ্চারের অভিপ্রায় করিলেন। মহাভারতে যে বীর ঈশ্বরাবতার বলিয়া লোকমণ্ডলে গৃহীত হইয়াছিল, তিনি তাঁহাকেই পুরুষ স্বরূপে স্বীয় কাব্যমধ্যে অবতীর্ণ করিলেন, এবং স্বকপোল হইতে গোপকন্যা রাধিকাকে সৃষ্ট করিয়া, প্রকৃতিস্থানীয় করিলেন। প্রকৃতি পুরুষের যে পরস্পরাসক্তি, বাল্যলীলায় তাহা দেখাইলেন; এবং তদুভয়ে যে সম্বন্ধ বিচ্ছেদ, জীবের মুক্তির জন্য কামনীয়, তাহাও দেখাইলেন। সাংখ্যের মতে ইহাদিগের মিলনই জীবের দুঃখের মূল—তাই কবি এই মিলনকে অস্বাভাবিক এবং অপবিত্র করিয়া সাজাইলেন। শ্রীমদ্ভাগবতের গূঢ় তাৎপর্য্য, আত্মার ইতিহাস—প্রথমে প্রকৃতির সহিত সংযোগ, পরে বিয়োগ, পরে মুক্তি।

জয়দেব প্রণীত তৃতীয় কৃষ্ণচরিত্রে এই রূপক একেবারে অদৃশ্য। তখন আর্য্যজাতির জাতীয় জীবন দুর্ব্বল হইয়া আসিয়াছে। রাজকীয় জীবন নিবিয়াছে—ধর্ম্মের বার্দ্ধক্য আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। উগ্রতেজস্বী, রাজনীতিবিশারদ আর্য্য বীরেরা বিলাসপ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়পরায়ণ হইয়াছেন। তীক্ষ্ণবুদ্ধি মার্জ্জিতচিত্ত দার্শনিকের স্থানে অপরিণামদর্শী স্মার্ত্ত এবং গৃহ-সুখ-বিমুগ্ধ কবি অবতীর্ণ হইয়াছেন। ভারত দুর্ব্বল, নিশ্চেষ্ট, নিদ্রায় উন্মুখ, ভোগপরায়ণ। অস্ত্রের ঝঞ্ঝনার স্থানে রাজপুরী সকলে নূপুর নিক্কণ বাজিতেছে—বাহ্য এবং আভ্যন্তরিক জগতের নিগূঢ়তত্ত্বের আলোচনার পরিবর্ত্তে কামিনীগণের ভাবভঙ্গীর নিগূঢ়তত্ত্বের আলোচনার ধূম পড়িয়া গিয়াছে। জয়দেব গোস্বামী এই সময়ের সামাজিক অবতার; গীতগোবিন্দ এই সমাজের উক্তি। অতএব গীতগোবিন্দের শ্রীকৃষ্ণ কেবল বিলাসরসে রসিক কিশোর নায়ক। সেই কিশোর নায়কের মূর্ত্তি, অপূর্ব্ব মোহন মূর্ত্তি; শব্দ-ভাণ্ডারে যত সুকুমার কুসুম আছে, সকলগুলি বাছিয়া বাছিয়া, চতুর গোস্বামী এই কিশোর কিশোরী রচিয়াছেন, আদিরসের ভাণ্ডারে যতগুলি স্নিগ্ধোজ্জ্বল রত্ন আছে, সকলগুলিতে ইহা সাজাইয়াছেন; কিন্তু যে মহা গৌরবের জ্যোতি মহাভারতে ও ভাগবতে কৃষ্ণচরিত্রের উপর নিঃসৃত হইয়াছিল, এখানে তাহা অন্তর্হিত হইয়াছে। ইন্দ্রিয়পরতার অন্ধকার ছায়া আসিয়া, প্রখর সুখতৃষ্ণাতপ্ত আর্য্য পাঠককে শীতল করিতেছে।

তারপর, বঙ্গদেশ যবন হস্তে পতিত হইল। পথিক যেমন বনে রত্ন কুড়াইয়া পায়, যবন সেইরূপ বঙ্গরাজ্য অনায়াসে কুড়াইয়া লইল। প্রথমে নামমাত্র বঙ্গ দিল্লীর অধীনে ছিল, পরে যবন-শাসিত বঙ্গরাজ্য সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন হইল। আবার বঙ্গদেশের কপালে ছিল যে, জাতীয় জীবন কিঞ্চিৎ পুনরুদ্দীপ্ত হইবে। সেই পুনরুদ্দীপ্ত জীবন বলে, বঙ্গভূমে রঘুনাথ ও চৈতন্যদেব অবতীর্ণ হইলেন। বিদ্যাপতি তাঁহাদিগের পূর্ব্বগামী,—পুনরুদ্দীপ্ত জাতীয় জীবনের প্রথম শিখা।

তিনি জয়দেব প্রণীত চিত্রখানি তুলিয়া লইলেন—তাহাতে নূতন রঙ্ ঢালিলেন। জয়দেব অপেক্ষা বিদ্যাপতির দৃষ্টি তেজস্বিনী—তিনি শ্রীকৃষ্ণকে কিশোরবয়স্ক বিলাসরত নায়কই দেখিলেন বটে, কিন্তু জয়দেব কেবল বাহ্য-প্রকৃতি দেখিয়াছিলেন—বিদ্যাপতি অন্তঃপ্রকৃতি পর্য্যন্ত দেখিলেন। যাহা জয়দেবের চক্ষে কেবল ভোগ-তৃষা বলিয়া প্রকটিত হইয়াছিল—বিদ্যাপতি তাহাতে অন্তঃপ্রকৃতির সম্বন্ধ দেখিলেন। জয়দেবের সময় সুখভোগের কাল, সমাজের দুঃখ ছিল না। বিদ্যাপতির সময় দুঃখের সময়। ধর্ম্ম লুপ্ত, বিধর্ম্মিগণ প্রভু, জাতীয় জীবন শিথিল, সবেমাত্র পুনরুদ্দীপ্ত হইতেছে—কবির চক্ষু কুটিল। কবি, সেই দুঃখে দুঃখ দেখাইয়া, দুঃখের গান গাইলেন। আমরা বঙ্গদর্শনের দ্বিতীয় খণ্ডে মানস-বিকাশের সমালোচনা উপলক্ষে বিদ্যাপতি ও জয়দেবে প্রভেদ সবিস্তারে দেখাইয়াছি; সেই সকল কথার পুনরুক্তির প্রয়োজন নাই। এস্থলে কেবল ইহাই বক্তব্য যে, সাময়িক প্রভেদ, এই প্রভেদের একটি কারণ। বিদ্যাপতির সময়ে, বঙ্গদেশে চৈতন্যদেবকৃত ধর্ম্মের নবাভ্যুদয়ের এবং রঘুনাথকৃত দর্শনের নবাভ্যুদয়ের পূর্ব্বসূচনা হইতেছিল; বিদ্যাপতির কাব্যে সেই নবাভ্যুদয়ের সূচনা লক্ষিত হয়। তখন বাহ্য ছাড়িয়া, আভ্যন্তরিকে দৃষ্টি পড়িয়াছে। সেই আভ্যন্তরিক দৃষ্টির ফল, ধর্ম্ম ও দর্শনশাস্ত্রের উন্নতি।

আমরা যে গ্রন্থকে উপলক্ষ করিয়া, এই কয়টি কথা বলিলাম, তৎসম্বন্ধে এক্ষণে কিছু বলা কর্ত্তব্য। শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও শ্রীযুক্ত বাবু সারদাচরণ মিত্র "প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ" প্রকাশ করিতেছেন। যে দুই খণ্ড আমরা দেখিয়াছি, তাহাতে কেবল বিদ্যাপতিরই কয়েকটী গীত প্রকাশিত হইয়াছে। বিদ্যাপতি প্রভৃতি উৎকৃষ্ট প্রাচীন কবিদিগের রচনা এক্ষণে অতি দুষ্প্রাপ্য। যাহাতে উহা পাওয়া যায়, তাহাতে এত ভেল মিশান যে, খাঁটি নাল বাছিয়া লইতে কাহারও প্রবৃত্তি হয় না। অক্ষয় বাবু ও সারদা বাবু উৎকৃষ্ট গীতসকল বাছিয়া শ্রেণীবদ্ধ করিয়া প্রকাশ করিতেছেন। বিদ্যাপতির রচনাপাঠ পক্ষে সাধারণ পাঠকের একটি প্রতিবন্ধক এই যে, তাঁহার ভাষা আধুনিক প্রচলিত বাঙ্গালা নহে—সাধারণ পাঠকের তাহা বুঝিতে বড় কষ্ট হয়। প্রকাশকেরা টীকায় দুরূহ শব্দ সকলের সদর্থ লিখিয়া সে প্রতিবন্ধকের অপনয়ন করিতেছেন। যে কার্য্যে ইঁহারা প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহা গুরুতর, সুকঠিন এবং নিতান্ত প্রয়োজনীয়। ইঁহারা সে কার্য্যের উপযুক্ত ব্যক্তি। উভয়েই কৃতবিদ্য এবং অক্ষয় বাবু সাহিত্য-সমাজে সুপরিচিত। তিনি কাব্যের সুপরীক্ষক, তাঁহার রুচি সুমার্জ্জিত এবং তিনি বিদ্যাপতির কাব্যের মর্ম্মজ্ঞ। দুরূহ শব্দ সকলের ইঁহারা যে প্রকার সদর্থ করিয়াছেন, তাহাতে আমরা বিশেষ সাধুবাদ করিতে পারি। ভরসা করি, পাঠক-সমাজ ইঁহাদিগের উপযুক্ত সহায়তা করিবেন।

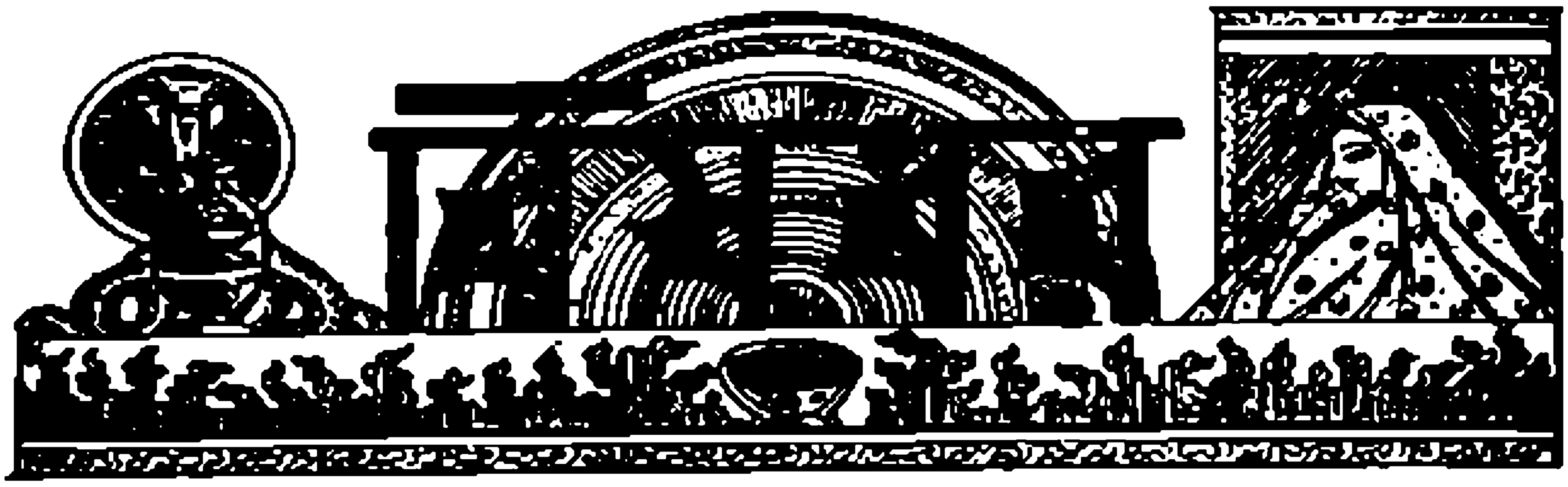

অনেকেই জানেন যে বিখ্যাত ডাক্তার ফেরার, ভারতবর্ষীয় বিষধর সর্প সম্বন্ধে অনেক অনুসন্ধান করিয়াছেন। তাঁহার ও তাঁহার সহকারীদিগের অনুসন্ধানে যে সকল তত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে, তাহার স্থূল মর্ম্ম অনেকেই অবগত আছেন, কিন্তু অনেকেই সবিশেষ অবগত নহেন। আমাদিগের ঘরে, দ্বারে, পথে, মাঠে সর্ব্বত্রই সকলেরই সর্পের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হইয়া থাকে, অতএব সকলেরই কর্ত্তব্য তাহাদিগের পরিচয় কিছু কিছু জানিয়া রাখেন। এজন্য সর্ব্বশ্রেণীর পাঠ্য বঙ্গদর্শনে, আমরা সে সকল কথা কিঞ্চিৎ আলোচনা উপযুক্ত বিবেচনা করিলাম।

সর্পাঘাতে কেহ মরিলে সচরাচর পুলিসে সম্বাদ হয়। ডাক্তার ফেরার বঙ্গীয় প্রভৃতি গবর্ণমেণ্ট হইতে সংবাদ লইয়া একটা তালিকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন যে, এক বৎসরে কত লোক সর্পাঘাতে মরে। বোম্বাই মান্দ্রাজ প্রভৃতি স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট হইতে তিনি সম্বাদ প্রাপ্ত হয়েন নাই, কেবল বাঙ্গালা, উত্তর-পশ্চিম পাঞ্জাব, অযোধ্যা, মধ্যভারত, রাজপুতানা এবং ব্রিটিশ ব্রহ্ম হইতে সম্বাদ পাইয়াছিলেন। এই কয় প্রদেশে ১৮৬৯ সালে ১১,৪১৬ জন লোকের সর্পাঘাতে মৃত্যু হওয়ার সম্বাদ পুলিসে প্রদত্ত হইয়াছিল। ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, এইগুলির মধ্যে সকলেই যে সর্পাঘাতে মরিয়াছিল, এমত না হইতে পারে। অনেক খুন সর্পাঘাত বলিয়া প্রচার হয়। কিন্তু ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, অধিকাংশ সর্পাঘাতে মৃত্যুর সম্বাদই হয় না। যদি ইহা বলা যায় যে, কথিত কয় প্রদেশে ঐ বৎসরে বিংশতি সহস্র লোকের মৃত্যু হইয়াছিল, তাহা হইলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। যে বিপদে পাঁচ বৎসরে এক লক্ষ লোক মরিয়া যায়, ভারতবর্ষের পক্ষে তাহা সামান্য বিপদ নহে। জ্ঞানবৃদ্ধি সহকারে সকল বিপদেরই প্রতিকার হইয়া থাকে; অতএব সর্পতত্ত্ব সবিশেষ পরিজ্ঞাত হইলে এ বিপদেরও শান্তির সম্ভাবনা। এজন্য ভারতবর্ষে সর্পতত্ত্ব যতই সমালোচিত হয়, ততই মঙ্গল।

The Thanatophidia of India. J. Fayrer, London. 1872.

Report on Indian and Australian Snake Poisoning. Calcutta 1874.

প্রথমে জানা কর্ত্তব্য, বিষধর সর্প কোন্‌গুলি। যাহারা বিষধর নহে, তাঁহাদের দংশনে স্বভাবতঃ কোন অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু সাপে কামড়াইয়াছে জানিতে পারিলে, দংশক বিষধর হউক বা না হউক, ভয়েই অনেকের প্রাণ বাহির হয়। ভয়, শারীরিক ব্যাধির অত্যন্ত বৃদ্ধিকারক। যেখানে বিষে মরিবার সম্ভাবনা নাই, সেখানে ভয়েই অনেকেই মরিতে পারে। ইহার একটী উদাহরণ ফেরার সাহেবের গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি।

একদিবস প্রাতে হাঁসপাতালে গিয়া, ডাক্তার ফেরার শুনিলেন যে একটি লোক রাত্রে সর্পদষ্ট হইয়া হাঁসপাতালে আনীত হইয়াছে; এবং সে অত্যন্ত নির্জ্জীব হইয়া পড়িয়াছে। ডাক্তার গিয়া দেখিলেন যে লোকটি বস্তুতঃ অত্যন্ত নির্জ্জীব হইয়া পড়িয়াছে; তাহার কথা কহিবার শক্তি নাই; এবং সে অত্যন্ত দুর্ব্বল। তাহার আত্মীয়স্বজন বলিল যে, রাত্রে কুটীরমধ্যে প্রবেশ কালে তাহাকে সর্পে দংশন করিয়াছিল; তাহাতে সে বিশেষ ভীত হইয়াছিল এবং অল্পকালেই অচেতন হইয়াছিল। সেই অবস্থাতেই হাঁসপাতালে আনীত হইয়াছিল। সকলেই বিবেচনা করিতেছিল যে, সে ব্যক্তি এখনই মরিবে—উহার আর জীবনের আশা নাই। রোগীরও সেই বিশ্বাস। ডাক্তার ফেরার জিজ্ঞাসা করিলেন সাপটি কি প্রকার? রোগীর সঙ্গিবর্গ বলিল যে ধরিয়া বোতলে পুরিয়া আনিয়াছি, দেখুন। ডাক্তার দেখিয়া চিনিলেন যে উহা নির্ব্বিষজাতীয় সর্প। রোগী এবং তাহার আত্মীয়গণ প্রথমে এ কথা বিশ্বাস করিল না—ক্রমে বিশ্বাস করিল। তখন রোগীর শরীর হইতে শীঘ্র আপনি বিষ নামিতে লাগিল, আসন্ন মৃত্যু-লক্ষণ সকল ক্রমে দূর হইতে লাগিল—এবং অল্পকাল মধ্যে বিনাচিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করিয়া রোগী হাঁসপাতাল হইতে চলিয়া গেল।

অতএব দংশক বিষধর কি না, তাহা না জানিয়া অনর্থক ভীত হওয়া অকর্ত্তব্য। ডাক্তার ফেরার বলেন, এতদ্দেশীয় সর্পের মধ্যে গোক্ষুরা, কেউটিয়া, শংখচূড় (অহিরাজ), শাঁখিনী, বোড়া, কোন কোন জাতীয় চিতি (Bungarus cæruleus) ইহারাই বিষধর এবং সাংঘাতিক। আরও কতকগুলি বিষধর সর্পের তিনি বর্ণনা করিয়াছেন, তৎসম্প্রদায়ের দেশী নামের আমরা ঠিকানা করিতে পারি নাই। ফলে, আমাদিগের এমন বোধ হইয়াছে যে, দুই একটি সুপরিচিত বিষধরের নাম মাত্রও তিনি উল্লেখ করেন নাই। এবং ইহাও বিবেচ্য যে, অনেকগুলি সর্প যাহা বিষধর বলিয়া পরিচিত, তাহা বস্তুতঃ বিষধর নহে। যেখানে মহাভারতেই তক্ষক, বিষধর সর্পের শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরীক্ষিতের নিধনে কবিকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছিল, সেখানে তৎপাঠক এবং শ্রোতৃবর্গের যে তদ্রূপ অনেক ভ্রম থাকিবে তাহার বৈচিত্র কি?

তক্ষক বিষধরও নহে, সর্পও নহে। আমরা এমনও দুই একটি অধ্যাপক দেখিয়াছি যে, তাঁহাদের বিলক্ষণ বিশ্বাস আছে যে উচ্চিঙড়ার কামড়ে মানুষ মরে।

ডাক্তার ফেরার স্বয়ং অন্যান্য মান্য চিকিৎসকগণের সাক্ষাতে সর্পবিষ সম্বন্ধে বহু শত পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। এবং তাঁহার সূচনানুসারে, তিনি এতদ্দেশ পরিত্যাগ করিলে পর, একটি কমিশ্যন নিযুক্ত হইয়াছিল। তাঁহারাও বহুসংখ্যক পরীক্ষা অতি সাবধানে করিয়াছেন। এই সকল পরীক্ষায় একটি কথা নিশ্চিতরূপে স্থির হইয়াছে যে,ভারতবর্ষীয় বিষধরের দংশনে জীবন রক্ষা করে, এমত ঔষধি এপর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই।

এতদ্দেশে অনেকে অনেক পাতা, লতা, মূল, বীজ, কন্দ ইত্যাদিকে সর্পবিষের উৎকৃষ্ট ঔষধি বলিয়া বিশ্বাস করেন এবং প্রয়োগ করিয়াও থাকেন। তন্মধ্যে অনেকগুলি পরীক্ষকগণ কর্ত্তৃক পরীক্ষিত হইয়াছিল। সকলই তুল্যরূপে নিষ্ফল হইয়াছে—বিষধরে প্রকৃতরূপে দংশন করিলে কেহ রক্ষা করিতে পারে না।

অষ্ট্রেলীয়ার বিষধরের বিষের উপর পরীক্ষা করিয়া ডাক্তার হালফোর্ড এই মত প্রচার করেন যে, ত্বকে ছিদ্র করিয়া রক্তমধ্যে আমোনিয়ার পিচকারী দিলে বিষধর-দংশনে প্রাণরক্ষা হয়। এদেশেও অনেকের বিশ্বাস যে আমোনিয়া সর্পদংশনে মহৌষধ! স্বয়ং ফেরার সাহেবও সর্পদংশনে আমোনিয়া ব্যবহার করিতে পরামর্শ দেন। কিন্তু কমিশ্যনরেরা পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, আমোনিয়া উপকার করা দূরে থাকুক, বরং বিষের সহায়তা করে। এবং আমোনিয়া প্রয়োগ না করিলে যত কালে রোগীর মৃত্যু হইত, আমোনিয়া প্রয়োগ করিলে তদপেক্ষা অল্প কালেই মৃত্যু হয়।

সর্পবিষ রক্তে মিশিয়া শরীরমধ্যে প্রবেশ করিলে পর তাহা অজ্ঞাত ঘর্ম্ম প্রস্রাবাদি ক্রিয়ায় শরীর হইতে নির্গত হইতে থাকে। ডাক্তার ফেরার এমত বিবেচনা করিয়াছিলেন যে, যতক্ষণে সমুদায় বিষ এইরূপে স্বাভাবিক ক্রিয়ার দ্বারা শরীর হইতে নিঃশেষ হইয়া নির্গত হইতে পারে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কোন উপায়ে জীবনরক্ষা করিতে পারিলেই রোগী বাঁচিতে পারে। ততক্ষণ পর্য্যন্ত জীবনরক্ষা হয় কি প্রকারে? তৎপূর্ব্বেই যে শ্বাসরুদ্ধ হইয়া রোগীর প্রাণবিয়োগ হয়। ইহার এক উপায় আছে—স্বাভাবিক শ্বাসরুদ্ধ হইলেও যন্ত্রের দ্বারা শ্বাসকোষে বায়ু প্রেরিত হইতে পারে। যদি তদুপায়ে এতাবৎ কাল জীবন রক্ষিত হয় যে, ততক্ষণে বিষ স্বাভাবিক ক্রিয়ার দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়া যায়, তাহা হইলে আর কোন চিন্তা নাই। এ বিষয়ের পরীক্ষাজন্যই উক্ত কমিশ্যন নিযুক্ত হয়। কমিশ্যনরেরা বহুতর পরীক্ষার দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, ইহাও নিষ্ফল। রোগী ইহাতে কিছুক্ষণ বাঁচে বটে কিন্তু শেষে মরে। কিছুতেই জীবন রক্ষা হয় না।

অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, যদি বিষধরের দংশনে কোন মতেই প্রাণ রক্ষা হইতে পারে না, ইহাই স্থির, তবে কখনও কখনও বাঁচিতে দেখা যায় কি প্রকারে? এই কথাটি বুঝা বড় প্রয়োজনীয় বটে।

প্রথমতঃ, অনেক সময়েই দেখা যায় যে দষ্ট ব্যক্তি সাপে কামড়াইয়াছে বলিয়া চীৎকার করিয়া বসিয়া পড়িল এবং অল্পকাল মধ্যে ভয়ে অভিভূত হইয়া উঠিল। সকলে দেখিল হাঁ ঠিক বটে, এই ত দাঁতের দাগ—রক্তও পড়িয়াছে—পাড়ার লোকে চারিপাশে বেরিয়া বসিয়া অনবরত চিমটি কাটিতে আরম্ভ করিল—"বলি লাগে?" রোগীর তখন ভয়ে লাগা না লাগা সমান—কখন বলে "লাগে" কখন বলে "লাগে না।" যদি একবার বলিল লাগে না তবে অমনি বিজ্ঞ প্রতিবাসিগণ সিদ্ধান্ত করিলেন যে "জাতি-সাপে কামড়াইয়াছে।" যেমন এই সিদ্ধান্ত হইল—অমনি রোগী ঢুলিয়া পড়িল। তখন ওঝাগণ দলে দলে আসিয়া ঝাড় ফুক আরম্ভ করিল—চড় চাপড়ের প্রতিধ্বনিতে বাড়ী ফাটিতে লাগিল—নয় ত কেহ কোন বিখ্যাত ঔষধি বাটিয়া কিছু রোগীকে খাওয়াইলেন, কিছু ক্ষতমুখে লেপিয়া দিলেন। রোগী আরোগ্য পাইল—চিকিৎসকের নামে ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল।

এস্থলে প্রথমে জিজ্ঞাস্য কামড়াইয়াছিল কিসে? সকলেরই অনুভব বিষধর সর্প, কিন্তু কেহ কি দেখিয়াছে? হয় ত, আদৌ সাপে কামড়ায় নাই—বিছা বা কোন নির্ব্বিষ জন্তু—রোগী কেবল শীতল স্পর্শে অনুভব করিয়াছিল যে সাপ, এবং সকলেই সেই কথা বিনানুসন্ধানে স্থির বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল। হয় ত রোগী বা অন্য কেহ প্রত্যক্ষ দেখিয়াছে, সর্প বটে, দংশন করিয়া বিবরে প্রবেশ করিল। কিন্তু কি সর্প? সেটা অন্ধকারে বড় ঠিক হয় নাই। অনুভব যে, যেখানে কামড়াইয়াছে সেখানে বিষধর হইবে, নহিলে ধাঁক বাঁধে কই? কিন্তু হয় ত দংশনকারী বস্তুতঃ কোন নিরীহ নির্ব্বিষ জাতীয় ভুজঙ্গ। ভয়েই রোগী ঢুলিয়া পড়িয়াছিল, চিকিৎসা না করিলেও ভাল হইত। ওঝার কপালে ছিল, তাহার জয় জয়কার রটিল।

দ্বিতীয়, ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, অনেক সময়ে বিষধরে দংশন করিলেও দংশিত ব্যক্তি রক্ষা পায়। ইহা পুনঃ পুনঃ ঘটিয়াছে; অনেকে দেখিয়াছেন যে, যে সর্প দংশন করিল, সে স্পষ্টই বিষধর জাতীয়। বরং দংশনকারী ধৃত বা হত হইয়া দগ্ধ হইয়াছে। সেস্থলে কোন সন্দেহ থাকে না যে, দংশনকারী বিষধর সর্প, অথচ দষ্ট ব্যক্তি কখন কখন এমত অবস্থায় রক্ষা পায়। তাহার কারণ আছে।

বিষধর যখন দংশন করে, তখন তাহাদের বিষদন্ত শরীরমধ্যে রোপণ করিয়া বিষ ঢালিয়া দেয়। যদি কোন কারণে দংশন করিয়াও, বিষদন্ত দংশিতের মাংসে রোপণ করিতে না পারে ও বিষক্ষেপ করিতে না পারে, তবে জীবননাশের কোন

সম্ভাবনা নাই। ইহা পরীক্ষার দ্বারা নিশ্চিত হইয়াছে যে, বিষধরে দংশন করিলেই বিষদন্ত মাংসে রোপিত হয় না, বা বিষ বিক্ষিপ্ত হয় না। বিষধরগণের বিষদন্ত কখনও আপনা হইতে পড়িয়া যায় বা কোন কারণে ভাঙ্গিয়া যায়। আবার দন্ত উদ্গত হইবার পূর্ব্বে যদি কাহাকে তাদৃশ অবস্থাপন্ন বিষধর দংশন করে, তবে তাহার কোন অনিষ্ট ঘটিবে না। “তুবড়ী ওয়ালা”-দিগের অনুগ্রহে বিষদন্তহীন বিষধরের অভাব নাই; তাহাদিগের দ্বারা প্রতারিত হইয়া অনেকে অনেক সময়ে মনে করেন যে, বিষজয়ী হইয়াছি। ইহার একটি উদাহরণ ফেরার সাহেবের গ্রন্থের ১১১ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইবে। উদ্ধৃত করি আমাদিগের এত স্থান নাই। কিন্তু বিষদন্ত থাকিলেও সকল সময়ে তাহা দংশিতের শরীরমধ্যে রোপিত হয় না; এমনও অনেক সময়ে ঘটিয়াছে যে, বিষধর সর্প দংশন করিয়া রক্তপাত করিয়াছে, তথাপি বিষ ঢালিতে পারে নাই বা ঢালে নাই। সে সকল স্থানে মৃত্যুর কোন সম্ভাবনা নাই, এবং সে সকল স্থানে ঔষধ প্রয়োগ করিলেও রোগী বাঁচিবে, না করিলেও বাঁচিবে

পরীক্ষার দ্বারা নিরূপিত হইয়াছে যে সর্পবিষ রক্তমধ্যে প্রবেশ করিলেই জীবের জীবন ধ্বংস হইবে, এমত নহে। অতি অল্পপরিমাণে বিষ প্রবেশ করিলে মৃত্যু ঘটে না; কখন কখন “বিষ ধরার” লক্ষণসকলই, অল্প বিষেও জন্মে বটে, কিন্তু কখন কখন কোন বিকারই দেখা যায় না। সর্প-কমিশ্যনরেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, আধ গ্রেণ পরিমিত গোক্ষুরার বিষেও ছোট ছোট কুক্কুরগণ মরিয়াছে, কিন্তু ১/৩ গ্রেণ বিষে একটি বড় কুক্কুর বাঁচিয়াছিল—আর দুইটি, ছোট বড় মরিল। ১/৪ গ্রেন বিষে একটি ছোট কুক্কুর মরিল। ১/৬ গ্রেন বিষে একটি ছোট কুক্কুর মরিল—দুইটি বড় কুক্কুর বাঁচিল। ১/৮ গ্রেনে তিনটি কুক্কুরই বাঁচিল। ইত্যাদি।*

বিষধরগণ দংশনকালে কাহাকেও দয়া করিয়া অল্প বিষ ঢালে না। কিন্তু অনেক সময়ে তাহাদিগের ভাণ্ডার খালি থাকে। যে সর্প পুনঃ পুনঃ দংশন করিয়া বিষ ব্যয় করিয়াছে, ব্যয়শৌণ্ডের ন্যায় তাহারও ভাণ্ডার খালি। যে অনেক দিন অনাহারে আছে বা যে রুগ্ন বা নিস্তেজ, তাহারও বিষভাণ্ডার অপূর্ণ। এরূপ অবস্থাপন্ন বিষধরে দংশন করিলে প্রায়ই অল্পমাত্র বিষ দষ্টের শরীরমধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়। এ সকল স্থলে মৃত্যুর অল্প সম্ভাবনা, এবং যে ভাল হইবার, সে চিকিৎসা না করিলেও ভাল হইবে। তবে অনেকের উপর ঝাড়ফুক এবং ঔষধ প্রযুক্ত হয়, এবং স্বাভাবিক প্রতিকারের গৌরব মন্ত্র বা ঔষধের উপর বর্ত্তে।

---

* ডাক্তারগণ ওজন করা বিষ ত্বকে ছিদ্র করিয়া পিচকারি দিয়াছিলেন। এমত নহে যে বিষধরগণ ওজন করিয়া বিষ ঢালিয়া দংশন-কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিল।

তৃতীয়তঃ, এমত আশ্চর্য্য কখন কখন ঘটিয়াছে যে, তেজস্বী বিষধর সম্পূর্ণরূপে বিষ-দাঁত ফুটাইয়া, রক্তপাত করিয়াছে—সুতরাং বিবেচনা করিতে হয় যে মনের সাধে বিষ ঢালিয়া দিয়াছে। তথাপি প্রাণ নাশ হয় নাই। ডাক্তার ফেরারের গ্রন্থের ১০৪ পৃষ্ঠায় এরূপ একটি উদাহরণ আছে (৫ সংখ্যক পরীক্ষা দেখ)।

অতএব বিষধরে দংশন করিলেই যে রোগী মরিবে, ইহা নিশ্চিত নহে। অবস্থানুসারে বাঁচিতে পারে। কিন্তু যে বাঁচিবার, সে বিনা চিকিৎসাতেও বাঁচিবে—ঔষধাদিতে কোন উপকার নাই। ডাক্তার ফেরারও একপ্রকার চিকিৎসার উপদেশ দিয়াছেন এবং তাহা ধারাবদ্ধ ও অনুবাদিত হইয়া, থানায় থানায় জারি হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার স্বকৃত এবং কমিশনকৃত পরীক্ষাসকলের ফল অবগত হইয়া সে চিকিৎসার উপকারিতার বিষয় আমরা নিশ্চয় করিতে পারি না। তিনি ক্ষতের উপর দৃঢ় বন্ধন করিয়া, ক্ষতমুখ পোড়াইয়া দিবার উপদেশ দেন, কিন্তু তাঁহারই কৃত পরীক্ষাসকলের দ্বারা জানা যায় যে, যেরূপ দৃঢ় বন্ধনে শরীরে বিষের প্রবেশ একেবারে নিবারিত হইতে পারে, তাহা অতি কঠিন, প্রায় অসাধ্য। তবে একটি চিকিৎসা আছে—তাহা ফলদায়ক বটে, কিন্তু ইহাদিগের আবিষ্ক্রিয়া বলিয়া স্বীকারের প্রয়োজন নাই—সার্দ্ধেক সহস্র বৎসর হইল "অঙ্গুলীবোরগ ক্ষতা" ইতিবাক্যে কালিদাস তাহার নির্দ্দেশ করিয়াছেন। দংশনমাত্র যদি দষ্ট অঙ্গ ছেদন করিয়া ফেলা যায়, তাহা হইলে আর বড় শঙ্কা নাই। কিন্তু কয়জনে তাহা পারে?

চিকিৎসা-প্রণালী যেমন হউক, ফেরার সাহেবের একটি উপদেশ নিতান্ত গ্রাহ্য। যতক্ষণ ভরসা থাকে, ততক্ষণ রোগীকে ভরসা দিবে। বিষধর সর্পে দংশন করিয়াছে কি না, ইহা অনেক সময়েই অনিশ্চিত থাকে; বিষধরে দংশন করিলেও দংশন সাংঘাতিক তাহা অনিশ্চিত থাকে; যতক্ষণ এ সকল অনিশ্চিত, ততক্ষণ বাঁচিবার ভরসা আছে। কিন্তু অনেক সময়ে ভরসা হারাইয়াই রোগী ঢুলিয়া পড়ে। সেইটি হইতে দেওয়া অকর্ত্তব্য।

এতদ্দেশে প্রথা আছে যে, রোগী "ঢুলিয়া পড়িতেছে" দেখিয়া, তাহাকে চড় চাপড় মারিয়া বা চিমটি কাটিয়া বা হাঁটাইয়া সচেতন রাখিবার চেষ্টা করা হয়। ফেরার সাহেব বলেন যে,যখন কেবল ভয়েই রোগী নির্জ্জীব অচেতন হইয়া পড়িতেছে, তখন এ প্রথা মন্দ নহে, কিন্তু যেখানে বিষধরে কঠিন দংশন করিয়াছে, সেখানে এ প্রথার চিকিৎসায় কেবল অনিষ্টেরই সম্ভাবনা। সর্পবিষে যে মৃত্যু হয়, তাহার কারণ বিষ স্নায়বীয় বল অপহৃত করিতে থাকে। যেখানে বিষে স্নায়বীয় বল অপহৃত করিতেছে, সেখানে প্রাগুক্ত শারীরিক কার্য্যসকলের দ্বারা সেই বল অপব্যয় করা অবিধেয়। তিনি বলেন, এমন অবস্থায়, রোগী চুপ করিয়া বসিয়া থাকে বা শয়ন করে বা নিদ্রা যায়, ইহা ভাল।

বিষধর সর্প সম্বন্ধে পরীক্ষার দ্বারা নিশ্চিত আর দুই একটি তত্ত্বের উল্লেখ করিয়া আমরা ক্ষান্ত হইব।

বিষধর দংশনে সকল জীবই মরে—কাহারও রক্ষা নাই। পক্ষিগণ বড় শীঘ্র মরে। যে জীব যত ক্ষুদ্র, তাহার উপর বিষের অধিকার তত অধিক। কিন্তু সর্ব্বত্র এ কথা খাটে না—বিড়াল অপেক্ষা কুক্কুর শীঘ্র মরে। বিড়ালের পক্ষে সর্পবিষ তত তীব্রঘাতী নহে; তথাপি বিড়ালেরও রক্ষা নাই; শীঘ্র হৌক, বিলম্বে হৌক বিড়ালও মরে।

অনেকেরই বিশ্বাস আছে যে, সর্পবিষে বেঁজির কিছু হয় না। ইহা সকলেই দেখিয়াছে যে, বিষধরে ও বেঁজিতে যুদ্ধ হইতেছে; সর্প বেঁজিকে পুনঃ পুনঃ দংশন করিয়া রক্তপাত করিতেছে, তথাপি বেঁজির কিছু হইতেছে না। কিন্তু ইহার কারণ এই যে, বেঁজির কৌশলে হৌক, আর যে কারণেই হৌক, সেই সকল দংশনে প্রকৃতরূপে বিষ, ক্ষতমধ্যে প্রবেশ করে না। পরীক্ষকেরা ভূয়োভূয়ঃ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, বিষধরে বেঁজিকে প্রকৃতপ্রস্তাবে দংশন করিলে, বেঁজিরও রক্ষা নাই।

সর্পবিষে সকল সর্পেরও রক্ষা নাই। বিষধরের দংশনে নির্ব্বিষ সর্পগণ মরিয়া যায়। তীব্র বিষযুক্ত সর্পের দংশনে অন্য বিষধরগণ মরিয়া যায়। গোক্ষুরা, কেউটিয়ার দংশনে শাঁখিনী প্রভৃতি বাঁচে না।

কেবল যে স্বয়ং তীব্র বিষধর, সেই তীব্র বিষধরের দংশনে বাঁচিবে। গোক্ষুরা কেউটিয়া বোড়ার দংশনে গোক্ষুরা কেউটিয়া বোড়া প্রায় বাঁচে, কখন কখন মরে। আপনার দংশনে কোন বিষধর মরে না। কাঁকড়াবিছা আপনাআপনি দংশন করিয়া আত্মহত্যা করিয়া থাকে।

তীব্রঘাতী বিষধরের সর্পবিষে কিছু না হউক, তাহারা অন্যান্য বিষে মরে। কার্ব্বোলিক আসিডে ইহাদিগের শীঘ্র মৃত্যু হয়।

ডাক্তার ফেরার বলেন যে, পরীক্ষা কালে তিনি দেখিয়াছেন যে, গোক্ষুরা কেউটিয়া প্রভৃতি সর্প সহজে দংশন করিতে চাহে না। বোধ হয় বঙ্গদেশীয় সর্প সাহেব দেখিয়া ভয় পাইয়াছিল। নহিলে কেউটিয়া যে “অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ” সার করিয়া বসিয়া আছে, ইহা আমরা বিশ্বাস করি না।

[সমবেত বাঙ্গালিদিগের সভা দেখিয়া]

১

এক বঙ্গভূমে জনম সবার,
এক বিদ্যালয়ে জ্ঞানের সঞ্চার,
এক দুঃখে সবে করি হাহাকার,
ভাই ভাই সবে, কাঁদরে ভাই।
এক শোকে শীর্ণ সবার শরীর,
এক শোকে সব, নয়নের নীর,
এক অপমানে সবে নত-শির,
এক শিকলেতে বাঁধা সবাই।

২

নাহি ইতিবৃত্ত নাহিক গৌরব,
নাহি আশা কিছু নাহিক বৈভব,
বাঙ্গালির নামে করে ছি ছি রব,
কোমল স্বভাব, কোমল দেহ।
কোমল করেতে ধর কমলিনী,
কোমল শয্যাতে, কোমল শিঞ্জিনী,
কোমল সমীর, কোমল যামিনী
কোমল পিরীতি, কোমল স্নেহ।

৩

শিখিয়াছ শুধু উচ্চ চীৎকার!
"ভিক্ষা দাও! ভিক্ষা দাও! ভিক্ষা দাও" সার,
দেহি দেহি দেহি বল বার বার
না পেলে গালি দাও মিছামিছি!
দানের অযোগ্য চাও তবু দান,
মানের অযোগ্য চাও তবু মান,
বাঁচিতে অযোগ্য, রাখ তবু প্রাণ,
ছি ছি ছি ছি ছি ছি! ছি! ছি! ছি!

৪

কার উপকার করেছ সংসারে ?
কোন্ ইতিহাসে তব নাম করে ?
কোন্ বৈজ্ঞানিক বাঙ্গালির ঘরে ?
কোন্ রাজ্য তুমি করেছ জয় ?
কোন্ রাজ্য তুমি শাসিয়াছ ভাল ?
কোন্ যায়াধনে ধরিয়াছ ঢাল ?
এই বঙ্গভূমি এ কাল সে কাল
অরণ্য, অরণ্য, অরণ্যময় ॥

৫

কে মিলাল আজি এ চাঁদের হাট ?
কে খুলিল আজি মনের কপাট ?
পড়াইব আজি এ দুঃখের পাঠ,
শুন ছি ছি রব, বাঙ্গালি নামে,
য়ুরোপে মার্কিনে ছিছি ছিছি বলে,
শুন ছিছি রব, হিমালয় তলে,
শুন ছিছি রব, সমুদ্রের জলে,
স্বদেশে, বিদেশে, নগরে গ্রামে ॥

৬

কি কাজ রহিল এ ছার জীবনে,
কি কাজ রাখিয়া এ নাম ভুবনে,
কলঙ্ক থাকিতে কি ভয় মরণে ?
চল সবে মরি পশিয়া জলে।
গলে গলে ধরি, চল সবে মরি,
সারি সারি সারি, চল সবে মরি,
শীতল সলিলে এ জ্বালা পাসরি,
লুকাই এ নাম, সাগর তলে ॥

৭

নহে উঠ সবে মহা ঘোর রবে
ভাই ভাই রবে, ভাই ভাই সবে
মুছ এ কলঙ্ক, পুরাও এ ভবে
বাঙ্গালির যশ, বাঙ্গালি নামে
য়ুরোপে মার্কিনে যেন ধন্য বলে,
যেন ধন্য বলে, হিমালয় তলে,
সমুদ্রের জলে, মণ্ডলে মণ্ডলে,
স্বদেশে, বিদেশে, নগরে গ্রামে ॥

৮

স্বদেশে, বিদেশে নগরে বা গ্রামে
জয় জয় বল বাঙ্গালির নামে
গাও জয় গীত বঙ্গ মহাধামে
জয় জয় জয় বঙ্গের জয়।
যেখানেতে ধর্ম্ম জয় সেইখানে,
যেখানেতে ঐক্য জয় সেইখানে,
মিল ভ্রাতৃভাবে বঙ্গের সন্তানে,
বল জয় জয়, বঙ্গের জয় ॥

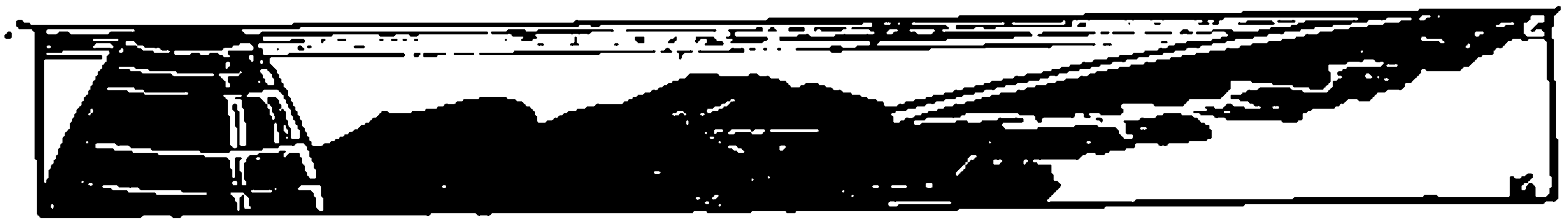

কমলাকান্তের দপ্তর

বিড়াল

আমি শয়ন গৃহে, চারপায়ীর উপর বসিয়া, হুঁকা হাতে ঝিমাইতেছিলাম। একটু মিট্ মিট্ করিয়া ক্ষুদ্র আলো জ্বলিতেছিল—দেয়ালের উপর চঞ্চল ছায়া প্রেতবৎ নাচিতেছিল। আহার প্রস্তুত হয় নাই—এজন্য হুঁকা হাতে, নিমীলিত লোচনে আমি ভাবিতেছিলাম যে, আমি যদি নেপোলিয়ন হইতাম, তবে ওয়াটার্লু জিতিতে পারিতাম কি না। এমত সময়ে একটি ক্ষুদ্র শব্দ হইল, "মেও!"

চাহিয়া দেখিলাম—হঠাৎ কিছু বুঝিতে পারিলাম না। প্রথমে মনে হইল, ওয়েলিংটন হঠাৎ বিড়ালত্ব প্রাপ্ত হইয়া, আমার নিকট আফিঙ্গ ভিক্ষা করিতে আসিয়াছে। প্রথম উদ্যমে, পাষাণবৎ কঠিন হইয়া বলিব মনে করিলাম যে, ডিউক মহাশয়কে ইতিপূর্ব্বে যথোচিত পুরস্কার দেওয়া গিয়াছে, এক্ষণে আর অতিরিক্ত পুরস্কার দেওয়া যাইতে পারে না। বিশেষ, অপরিমিত লোভ ভাল নহে। ডিউক বলিল, "মেও!"

তখন চক্ষু চাহিয়া, ভাল করিয়া দেখিলাম যে, ওয়েলিংটন নহে। একটী ক্ষুদ্র মার্জ্জার; প্রসন্ন আমার জন্য যে দুগ্ধ রাখিয়া গিয়াছিল, তাহা নিঃশেষ করিয়া উদরসাৎ করিয়াছে; আমি তখন ওয়াটার্লুর মাঠে ব্যূহ রচনায় ব্যস্ত, অত দেখি নাই। এক্ষণে মার্জ্জার সুন্দরী, নির্জ্জল দুগ্ধপানে পরিতৃপ্ত হইয়া আপন মনের সুখ এ জগতে প্রকটিত করিবার অভিপ্রায়ে অতি মধুর স্বরে বলিতেছিলেন, "মেও!" বলিতে পারি না, বুঝি, তাহার ভিতর একটু ব্যঙ্গ ছিল; বুঝি মার্জ্জার মনে মনে হাসিয়া, আমার পানে চাহিয়া ভাবিতেছিল, "কেহ মরে বিল ছেঁচে, কেহ খায় কই।" বুঝি সে "মেও!" শব্দে একটু মন বুঝিবার অভিপ্রায়ও ছিল। বুঝি বিড়ালের মনের ভাব, "তোমার দুধ ত খাইয়া বসিয়া আছি—এখন বল কি?"

বলি কি ; আমি ত ঠিক করিতে পারিলাম না। দুধ আমার বাপেরও নয়। দুধ মঙ্গলার, দুহিয়াছে প্রসন্ন। অতএব সে দুগ্ধে আমারও যে অধিকার, বিড়ালেরও তাই ; সুতরাং রাগ করিতে পারি না। তবে চিরাগত একটি প্রথা আছে যে, বিড়ালে দুধ খাইয়া গেলে, তাহাকে তাড়াইয়া মারিতে যাইতে হয়। আমি যে সেই চিরাগত প্রথার অবমাননা করিয়া মনুষ্যকুলে কুলাঙ্গারস্বরূপ পরিচিত হইব, ইহাও বাঞ্ছনীয় নহে। কি জানি এই মার্জ্জারী যদি স্বজাতি মণ্ডলে কমলাকান্তকে কাপুরুষ বলিয়া উপহাস করে ? অতএব পুরুষের ন্যায় আচরণ করাই বিধেয়। ইহা স্থির করিয়া, সকাতর চিত্তে, হস্ত হইতে হুঁকা নামাইয়া, অনেক অনুসন্ধানে এক ভগ্ন যষ্টি আবিষ্কৃত করিয়া সগর্ব্বে মার্জ্জারী প্রতি ধাবমান হইলাম।

মার্জ্জারী কমলাকান্তকে চিনিত ; সে যষ্টি দেখিয়া বিশেষ ভীত হওয়ার কোন লক্ষণ প্রকাশ করিল না। কেবল আমার মুখপানে চাহিয়া হাই তুলিয়া, একটু সরিয়া বসিল। বলিল "মেও !" প্রশ্ন বুঝিতে পারিয়া, যষ্টি ত্যাগ করিয়া পুনরপি শয্যায় আসিয়া, হুঁকা লইলাম। তখন দিব্যকর্ণ প্রাপ্ত হইয়া, মার্জ্জারের বক্তব্য সকল বুঝিতে পারিলাম।

বুঝিলাম যে, বিড়াল বলিতেছে "মার পিট কেন ? স্থির হইয়া, হুঁকা হাতে করিয়া, একটু বিচার করিয়া দেখ দেখি ? এ সংসারের ক্ষীর, সর, দুগ্ধ, দধি, মৎস্য, মাংস সকলই তোমরা খাইবে, আমরা কিছু পাইব না কেন ? তোমরা মনুষ্য আমরা বিড়াল, প্রভেদ কি ? তোমাদের ক্ষুৎপিপাসা আছে— আমাদের কি নাই ? তোমরা খাও আমাদের আপত্তি নাই ; কিন্তু আমরা খাইলেই তোমরা কোন্ শাস্ত্রানুসারে ঠেঙ্গা লাঠি লইয়া মারিতে আইস, তাহা আমি বহু অনুসন্ধানে পাইলাম না। তোমরা আমার কাছে কিছু উপদেশ গ্রহণ কর। বিজ্ঞ চতুষ্পদের কাছে শিক্ষালাভ ব্যতীত তোমাদের জ্ঞানোন্নতির উপায়ান্তর দেখি না। তোমাদের বিদ্যালয় সকল দেখিয়া আমার বোধ হয় এত দিনে একথাটি বুঝিতে পারিয়াছ।

"দেখ, শয্যাশায়ী মনুষ্য ! ধর্ম্ম কি ? পরোপকারই পরম ধর্ম্ম। এই দুগ্ধটুকু পান করিয়া আমার পরম উপকার হইয়াছে। তোমার আহরিত দুগ্ধে এই পরোপকার সিদ্ধ হইল—অতএব তুমি সেই পরমধর্ম্মের ফলভাগী। আমি চুরিই করি, আর যাই করি, আমি তোমার ধর্ম্মসঞ্চয়ের মূলীভূত কারণ। অতএব আমাকে প্রহার না করিয়া, আমার প্রশংসা কর। আমি তোমার ধর্ম্মের সহায়।

"দেখ, আমি চোর বটে, কিন্তু আমি কি সাধ করিয়া চোর হইয়াছি! খাইতে পাইলে কে চোর হয়? দেখ, যাঁহারা বড় বড় সাধু, চোরের নামে শিহরিয়া উঠেন, তাঁহারা অনেকে চোরের অপেক্ষাও অধার্ম্মিক। তাঁহাদের চুরি করিবার প্রয়োজন নাই বলিয়া চুরি করেন না। কিন্তু তাঁহাদের প্রয়োজনাতীত ধন থাকিতেও চোরের প্রতি যে মুখ তুলিয়া চাহেন না, ইহাতেই চোরে চুরি করে। অধর্ম্ম চোরের নহে—চোরে যে চুরি করে, সে অধর্ম্ম কৃপণ ধনীর। চোর দোষী বটে, কিন্তু কৃপণ ধনী তদপেক্ষা শতগুণে দোষী। চোরের দণ্ড হয়; চুরীর মূল যে কৃপণ, তাহার দণ্ড হয় না কেন?

"দেখ, আমি প্রাচীরে প্রাচীরে, মেও মেও করিয়া বেড়াই, কেহ আমাকে মাছের কাঁটাখানাও ফেলিয়া দেয় না। মাছের কাঁটা, পাতের ভাত, নরদামায় ফেলিয়া দেয়, জলে ফেলিয়া দেয়, তথাপি আমাকে ডাকিয়া দেয় না। তোমাদের পেট ভরা, আমার পেটের ক্ষুধা কি প্রকারে জানিবে! হায়! দরিদ্রের জন্য ব্যথিত হইলে তোমাদের কি কিছু অগৌরব আছে? আমার মত দরিদ্রের ব্যথায় ব্যথিত হওয়া, লজ্জার কথা সন্দেহ নাই। যে কখন অন্ধকে মুষ্টিভিক্ষা দেয় না, সেও একটা বড় রাজা ফাঁপরে পড়িলে রাত্রে ঘুমায় না—সকলেই পরের ব্যথায় ব্যথিত হইতে রাজি। তবে ছোটলোকের দুঃখে কাতর! ছি! কে হইবে?

"দেখ, যদি অমুক শিরোমণি, কি অমুক ন্যায়ালঙ্কার আসিয়া তোমার দুধটুকু খাইয়া যাইতেন, তবে তুমি কি তাহাকে ঠেঙ্গা লইয়া মারিতে আসিতে? বরং যোড়হাত করিয়া বলিতে, আর একটু কি আনিয়া দিব? তবে আমার বেলা লাঠি কেন? তুমি বলিবে, তাঁহারা অতি পণ্ডিত, বড় মান্য লোক। পণ্ডিত বা মান্য বলিয়া কি আমার অপেক্ষা তাঁহাদের ক্ষুধা বেশী? তা ত নয়—তেলা মাথায় তেল দেওয়া মনুষ্যজাতির রোগ—দরিদ্রের ক্ষুধা কেহ বুঝে না। যে খাইতে বলিলে বিরক্ত হয়, তাহার জন্য ভোজের আয়োজন কর—আর যে ক্ষুধার জ্বালায় বিনা আহ্বানেই তোমার অন্ন খাইয়া ফেলে, চোর বলিয়া তাঁহার দণ্ড কর,—ছি! ছি!

"দেখ,আমাদিগের দশা দেখ, দেখ প্রাচীরে প্রাচীরে,প্রাঙ্গণে প্রাঙ্গণে,প্রাসাদে প্রাসাদে, মেও মেও করিয়া আমরা চারিদিক্ দৃষ্টি করিতেছি—কেহ আমাদিগকে মাছের কাঁটাখানা ফেলিয়া দেয় না। যদি কেহ তোমাদের সোহাগের বিড়াল হইতে পারিল—গৃহমার্জ্জার হইয়া, বৃদ্ধের নিকট যুবতীভার্য্যার সহোদর, বংশজের নিকট কুলীন জামাতা বা মূর্খ ধনীর কাছে সতরঞ্চ খেলওয়ারের স্থানীয় হইয়া থাকিতে পারিল—তবেই তাহার পুষ্টি। তাহার লেজ ফুলে, গায়ে লোম হয়; এবং তাহাদের রূপের ছটা দেখিয়া অনেক মার্জ্জার কবি হইয়া পড়ে।

"আর আমাদিগের দশা দেখ—আহারাভাবে উদর কৃশ, অস্থি পরিদৃশ্যমান, লাঙ্গূল বিনত, দাঁত বাহির হইয়াছে—জিহ্বা ঝুলিয়া পড়িয়াছে—অবিরত আহারাভাবে ডাকিতেছি 'মেও! মেও! খাইতে পাই না!—আমাদের কাল চামড়া দেখিয়া ঘৃণা করিও না! এ পৃথিবীর মৎস্য মাংসে আমাদের কিছু অধিকার আছে। খাইতে দাও—নহিলে চুরি করিব।' আমাদের কৃষ্ণ চর্ম্ম, শুষ্ক মুখ, ক্ষীণ সকরুণ মেও মেও শুনিয়া তোমাদের কি দুঃখ হয় না? চোরের দণ্ড আছে, নির্দ্দয়তার কি দণ্ড নাই? দরিদ্রের আহার সংগ্রহের দণ্ড আছে, ধনীর কার্পণ্যের দণ্ড নাই কেন? তুমি কমলাকান্ত, দূরদর্শী, কেননা আফিঙ্গখোর, তুমিও কি দেখিতে পাও না যে, ধনীর দোষেই দরিদ্রে চোর হয়? পাঁচশত দরিদ্রকে বঞ্চিত করিয়া, একজনে পাঁচশত লোকের আহার্য্য সংগ্রহ করিবে কেন? যদি করিল, তবে সে তাহার খাইয়া যাহা বাহিয়া পড়ে, তাহা দরিদ্রকে দিবে না কেন? যদি না দেয়, তবে দরিদ্র অবশ্য তাহার নিকট হইতে চুরি করিবে; কেননা অনাহারে মরিয়া যাইবার জন্য এ পৃথিবীতে কেহ আইসে নাই।"

আমি আর সহ্য করিতে না পারিয়া বলিলাম, "থাম! থাম মার্জ্জারপণ্ডিতে! তোমার কথাগুলি ভারি সোশিয়ালিষ্টিক! সমাজবিশৃঙ্খলার মূল! যদি যাহার যত ক্ষমতা সে তত ধনসঞ্চয় করিতে না পায়, অথবা সঞ্চয় করিয়া চোরের জ্বালায় নির্ব্বিঘ্নে ভোগ করিতে না পায়, তবে কেহ আর ধনসঞ্চয়ে যত্ন করিবে না। তাহাতে সমাজের ধনবৃদ্ধি হইবে না।"

মার্জ্জার বলিল, "না হইল ত আমার কি? সমাজের ধনবৃদ্ধির অর্থ ধনীর ধনবৃদ্ধি। ধনীর ধনবৃদ্ধি না হইলে দরিদ্রের কি ক্ষতি?"

আমি বুঝাইয়া বলিলাম যে, "সামাজিক ধনবৃদ্ধি ব্যতীত সমাজের উন্নতি নাই।" বিড়াল রাগ করিয়া বলিল যে, "আমি যদি খাইতে না পাইলাম, তবে সমাজের উন্নতি লইয়া কি করিব?"

বিড়ালকে বুঝান দায় হইল। যে বিচারক বা নৈয়ায়িক, কস্মিন কালে কেহ তাহাকে কিছু বুঝাইতে পারে না। এ মার্জ্জার সুবিচারক এবং সুতার্কিকও বটে, সুতরাং না বুঝিবার পক্ষে ইহার অধিকার আছে। অতএব ইহার উপর রাগ না করিয়া বলিলাম, "সমাজের উন্নতিতে দরিদ্রের প্রয়োজন না থাকিলে না থাকিতে পারে, কিন্তু ধনীদিগের বিশেষ প্রয়োজন, অতএব চোরের দণ্ড বিধান কর্ত্তব্য।"

মার্জ্জারী মহাশয়া বলিলেন, "চোরকে ফাঁসি দেও, তাহাতেও আমার আপত্তি নাই, কিন্তু তাহার সঙ্গে আর একটি নিয়ম কর। যে বিচারক চোরকে সাজা দিবেন, তিনি আগে তিন দিবস উপবাস করিবেন। তাহাতে যদি তাঁহার চুরি করিয়া

খাইতে ইচ্ছা না করে, তবে তিনি সচ্ছন্দে চোরকে ফাঁসি দিবেন। তুমি আমাকে মারিতে লাঠি তুলিয়াছিলে, তুমি অদ্য হইতে তিনদিন উপবাস করিয়া দেখ। তুমি যদি ইতিমধ্যে নশীবাবুর ভাণ্ডার-ঘরে ধরা না পড়, তবে আমাকে ঠেঙ্গাইয়া মারিও, আমি আপত্তি করিব না।"

বিজ্ঞলোকের মত এই যে, যখন বিচারে পরাস্ত হইবে, তখন গম্ভীরভাবে উপদেশ প্রদানারম্ভ করিবে। আমি সেই প্রথানুসারে মার্জ্জারকে বলিলাম যে, "এ সকল অতি নীতিবিরুদ্ধ কথা, ইহার আন্দোলনেও পাপ আছে। তুমি এসকল দুশ্চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মাচরণে মন দাও। তুমি যদি চাহ, তবে পাঠার্থে তোমাকে আমি নিউমান ও পার্করের গ্রন্থ দিতে পারি। আর কমলাকান্তের দপ্তর পড়িলেও কিছু উপকার হইতে পারে—আর কিছু হউক বা না হউক, আফিঙ্গের অসীম মহিমা বুঝিতে পারিবে। এক্ষণে স্বস্থানে গমন কর; প্রসন্ন কাল কিছু ছানা দিবে বলিয়াছে, জলযোগের সময় আসিও, উভয়ে ভাগ করিয়া খাইব। অদ্য আর কাহারও হাঁড়ি খাইও না; বরং ক্ষুধায় যদি নিতান্ত অধীরা হও, তবে পুনর্ব্বার আসিও, এক সরিষা ভোর আফিঙ্গ দিব।"

মার্জ্জার বলিল, "আফিঙ্গে বিশেষ প্রয়োজন নাই, তবে হাঁড়ি খাওয়ার কথা, ক্ষুধানুসারে বিবেচনা করা যাইবে।"

মার্জ্জার বিদায় হইল। একটি পতিত আত্মাকে অন্ধকার হইতে আলোকে আনিয়াছি, ভাবিয়া কমলাকান্ত পাত্রির বড় আনন্দ হইল!

শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী।

১

ঝুঙুণ ঝুঙুণ মধুর নিক্কণে
বাজিছে বাজনা শৈলেশভবনে ;
নাচিছে নর্ত্তকী, ঢালিয়া সঘনে
তান মান লয়ে গীতের ধারা ;
বিকচ-কমল-মালিকা-রঞ্জিত
ধামে গিরিপুর গন্ধে আমোদিত ;
সকলেরি চিত পুলকে পূরিত,
উদিত নগেন্দ্র নয়নতারা।

২

সিংহপৃষ্ঠে কন্যা মহিষমর্দ্দিনী,
দশভুজা গৌরী বিশ্ববিনোদিনী,
শরতে উষায় উজলি মেদিনী,
উদিতা পার্ব্বতী পর্ব্বত ধামে ;
বেড়ি চারিদিকে করে স্তুতিধ্বনি,
গম্ভীর সঙ্গীতে পূরিয়া ধরণী,
উল্লাসে রসিয়া, উৎসাহে ভাসিয়া,
হৃদয় ভরিয়া, ভকত দাসে।

৩

“কে জানে তোমার অপার মহিমা ?
কে কবে তোমার শকতির সীমা ?
সর্ব্বভূতে তুমি শক্তি স্বরূপিণী,
তব লীলা খেলা ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিনী,
তোমাতে জগৎ জীবিত রয়।
প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড খরতর কর,
প্রবল প্রতাপ বায়ু ভয়ঙ্কর,
তরঙ্গসঙ্কুল সাগর ভীষণ,
দিগন্তকারী ক্রুদ্ধ হুতাশন,
তব বল বিনা কিছুই নয়।

৪

“রবি শশী তারা অনল উষার
আলোকে নিয়ত প্রকাশ তোমার ;
কস্তূরী কুসুম সৌরভ সকল
বিস্তারে জগতে তব পরিমাণ,
মৃদুল মলয়ানিল হিল্লোলে ;
বিহঙ্গ কূজনে, বীণা ঝঙ্কারে
দেবনর কণ্ঠে, খেলে অনিবারে
তোমার মধুর স্তবের লহরী ;
কাননবল্লরী, নর্ত্তকী, সুন্দরী,
তোমার লাবণ্যে আনন্দে দোলে।

৫

“দশদিকে দশ কর প্রসারিয়া
সকল ব্রহ্মাণ্ড রেখেছ ধরিয়া,
সকলে রক্ষিছ, সকলে পালিছ,
সকল প্রদেশে করুণা ঢালিছ,
সঙ্কটহারিণী, ত্রিলোকতারিণী,
বরাভয়দাত্রী, দুর্গতিনাশিনী,
জগদ্ধাত্রী তুমি, জগতজননী,
তোমার প্রসাদে বিপদে জয়।

৬

“তুমি যার প্রতি কৃপাদৃষ্টি কর,
লক্ষ্মী সরস্বতী আসিয়া সত্বর

বিরাজেন সুখে তাঁহার আলয়ে ;
দেবসিদ্ধি দাত্রী প্রফুল্ল হৃদয়ে
করেন সফল বাসনা তার ;
সুরসেনাপতি সাজান তাহারে
বিপত্তি বিজয় সাহসের হারে ;
দূরে যায় তার দুঃখের ভার ।

৭

"বিপুলবিক্রম হর্য্যক্ষ বাহনে
যবে মা যেখানে উর রঙ্গনে,
আরণ্য মহিষ সম ভয়ঙ্কর
সুখ সংহারক সঙ্কট নিকর
তোমার প্রতাপে বিলয় পায় ;
যথা ঊষাদেবী রবি আরোহণে
উঠিলে সতেজে পূরব গগনে,
সৌন্দর্য্য বিলোপী চেতনা বিনাশী
ভয়প্রদ নৈশ অন্ধকার রাশি
ভীষণ শমন সদনে যায় ।

৮

"দুর্জ্জয়দানবে যবে দেবগণে
মহেশের বরে সংগ্রামে দলে,
সর্ব্বদেবতার তেজ সম্মিলনে
মূর্ত্তিমতী তোমা দেখিয়া নয়নে
বিস্ময়ে সহসা দৈত্যারিগণ ;
রূপের আলোকে জগত ভাতিল,
মস্তক উঠিল আকাশে ঠেকিল,
রবি শশী বহ্নি সমান উজ্জ্বল
তিনটী নয়ন করে ঝলমল,
ফুটে পদতলে কমল বন ।

৯

"নিজ অস্ত্র দিয়া দেবতা সকলে
পূজিল তোমার চরণ কমলে ;
হুঙ্কারি মা তুমি সংগ্রামে পশিলে
দেবের বিপক্ষ দানবে নাশিলে,
অট্ট অট্ট হাসে পূরি আকাশ ;
বৃন্দারক বৃন্দ আনন্দে মাতিল,
অমরের জয় বাজনা বাজিল,
বিদ্যাধরী গীতে গগন ছাইল,
তব পদে নতি করিতে ধাইল
দেব-দেবী যত করি উল্লাস ।

১০

"প্রকৃতিরূপিণী তুমি হৈমবতী,
সকলের অঙ্গে তোমার শকতি,
কিবা জীবোদ্ভিদ্, কি দেব মানব,
জগতে তোমার অবতার সব,
সকলের তুমি চরম গতি ।
ভকতি যাহার আছে তব পদে
নিয়ত তাহারে তার মা বিপদে ;
সারদে, বরদে, সুখদে, শুভদে,
থাকে যেন রাঙ্গা চরণে মতি ।

১১

"তুমি আদ্যাশক্তি জ্যোতিঃস্বরূপিণী,
কৌশলভাবিত বিশ্বপ্রকাশিনী,
অব্যক্ত অসীম তিমির ভাঙ্গিয়া,
বিচিত্র ব্রহ্মাণ্ড ব্যক্ত করি দিয়া,
প্রকাশ করেছ লীলা তোমার ।
কি জন্য করেছ কে বলিতে পারে ?
আমরা সকলে ঘুরি অন্ধকারে ;
যখন যা কিছু বুঝিবারে চাই,
কূলতল তার দেখিতে না পাই ;
খুলি দাও দেবি জ্ঞানের দ্বার ।"

সংগীত সমালোচনা

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

প্রাচীন মতে স্বরগ্রামকে শ্রুতি নামে যে ২২টী ক্ষুদ্রতম অংশে বিভক্ত করা যায়, সেই বিভাগ কি প্রকার, তাহা "সংগীত সার" গ্রন্থের ৬ পৃষ্ঠায় ও শেষে অতিরিক্ত পত্রে যেরূপ দেখান হইয়াছে, তাহা অসঙ্গত হইয়াছে, এবং প্রাচীন মতের সহিতও ঐক্য হয় নাই। গ্রামের ষড়্জাদি সপ্তস্বরও যে ঐ ২২ টীর সাতটি শ্রুতি, গ্রন্থলেখকের তাহা অনুধাবন হয় নাই। এতদ্দেশীয় সংগীত বিদ্যাভিমানী ব্যক্তিগণের প্রায়ই এরূপ স্বভাব দেখা যায় যে, তাঁহারা সংগীত বিষয়ে একবার যাহা বলিয়া ফেলেন, তাহা স্পষ্ট ভ্রমপূর্ণ হইলেও, তাহা স্বীকার করেন না। প্রত্যুত: তাহাই বজায় রাখিবার নিমিত্ত প্রাণপণে চেষ্টা করেন। শ্রুতি সম্বন্ধে উক্ত মত যিনি একবার লিখিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, তিনি আমার ন্যায় একজন সামান্য লোকের কথাতেই তাঁহার ঐ মত সহসা পরিবর্ত্তন নাও করিতে পারেন, এবং ঐ মতই যে অভ্রান্ত, ইহা বজায় করিবার নিমিত্ত অনেক তর্কও উপস্থিত করিতে পারেন। অতএব উহা খণ্ডনার্থ আমি যুক্তি ও শাস্ত্রপ্রমাণ উভয়ই দিতেছি। তিনি ঐ শ্রুতিবিষয়ক প্রাচীন শাস্ত্রীয় শ্লোক সমূহের স্বরূপার্থ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভিন্নার্থ করিয়াই ঐ গোল বাধাইয়াছেন।

"চতস্রঃ পঞ্চমে ষড়্জে মধ্যমে শ্রুতয়ো মতাঃ।
ঋষভে ধৈবতে তিস্রো দ্বে গান্ধারেনিষাদকে॥"

গ্রন্থকার বলেন, সংগীত রত্নাকর নামক গ্রন্থে ঐরূপ লিখা আছে। কিন্তু ঐ বচনের এইরূপ অর্থ হয় যে, ষড়্জ্‌ ও ঋষভের মধ্যে চারি শ্রুতি, ঋষভ গান্ধারের মধ্যে তিন, গান্ধার ও মধ্যমের মধ্যে দুই শ্রুতি ইত্যাদি। কখনই নহে, উহার প্রকৃত অর্থ এই ষড়্জ স্থানে চারি শ্রুতি, ঋষভ স্থানে তিন, গান্ধার স্থানে দুই ইত্যাদি। অর্থাৎ গ্রামকে যে প্রধান সাত ভাগে বিভাগ করা যায়, তাহাদের কোন্ কোন্‌টিতে শ্রুতি নামক ২২ সূক্ষ্মতম বিভাগের কতটি পড়ে, অথবা ঐ সাত ভাগের এক একটি আরও কিরূপ সূক্ষ্মাংশে বিভক্ত হয়, তাহাই ঐ শ্লোকে বর্ণিত আছে। গ্রামের

প্রথম শ্রুতিতে যে ধ্বনি, সেই ষড়্‌জ ; তাহার পর ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রুতি ক্রমে অল্প অল্প উচ্চ, তাহার পর একটু উচ্চ যে ৫ম শ্রুতি সেইটী ঋষভ ; তৎপরে ৬ষ্ঠ ও ৭ম শ্রুতি পর পর উচ্চ, তাহার পর একটু উচ্চ যে অষ্টম শ্রুতি, সেই গান্ধার ; তৎপরে ৯ম শ্রুতি একটু উচ্চ, তাহার পর একটু উচ্চ যে দশম শ্রুতি সেইটি মধ্যম-ইত্যাদি। পাঠক। এইরূপে বিভাগ করিয়া দেখুন, ২২ শ্রুতি মিলে কি না। সংগীতসার গ্রন্থে যেরূপ শ্রুতি বিভাগ দেখান হইয়াছে, তাহাতে ২২+৭এ ২৯টী সূক্ষ্ম বিভাগ পাইবেন।

"চতুঃশ্রুতিস্ত্রিশ্রুতিশ্চ, দ্বিশ্রুতিশ্চ চতুঃশ্রুতিঃ।
চতুঃশ্রুতিস্ত্রিশ্রুতিশ্চ, দ্বিশ্রুতিশ্চেতি তাঃ ক্রমাৎ॥

গ্রন্থকার "সংগীত রত্নাবলী" হইতে ঐ শ্লোকের যে প্রমাণ দিয়াছেন, তদ্দারা আমি যেরূপ শ্রুতির বিভাগ দেখাইলাম, তাহাতেই আরও স্পষ্টীকৃত হইতেছে যে, গ্রামের সাতটি প্রধান বিভাগ ঐ প্রকারে আরও বিভক্ত হইয়া, সাকল্যে গ্রামের ২২টি সূক্ষ্ম বিভাগ হয়। ঐ ২২টী বিভাগ পরস্পর সমান না হউক, সমানের অনেক নিকট। কিন্তু সমালোচিত গ্রন্থে যেরূপ বিভাগ দেখান হইয়াছে, তাহা অতিশয় অসমান। তদনুসারে ১ম শ্রুতি হইতে ২য় শ্রুতি, ২য় হইতে ৩য়, কিম্বা ৩য় হইতে ৪র্থ শ্রুতি যতদূর, চতুর্থ হইতে পঞ্চম শ্রুতির দূরতা তাহার দ্বিগুণেরও অধিক। প্রত্যেক স্বরের নিকট শ্রুতির অন্তর ঐরূপ বিভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। শ্রুতিগুলি মধ্যে মধ্যে ঐরূপ লাফাইয়া যে প্রায় সমভাবে একটির পর একটি চড়িয়া যায়, নিম্নোক্ত শ্লোক তাহার প্রমাণ ; যথা—

এতেতু ধ্বনিভেদাঃ স্যুঃশ্রবনাৎ শ্রুতি সংজ্ঞিতাঃ।
উচ্চোচ্চ ভাবমাপন্না দ্বিগুণাদুত্তরোত্তরং॥

সংগীত রত্নাবলী।

সাতটি প্রধান স্বরও অর্থাৎ সা, রি, গ, ম, প, ধ, নি ইহারাও যে ২২ শ্রুতির মধ্যে সাতটী শ্রুতি, ইহাই যে প্রাচীন গ্রন্থকারের অভিপ্রেত, উক্ত বচনের প্রথম পংক্তিতে তাহা অতিশয় স্পষ্ট রহিয়াছে। আরও এক দৃষ্টান্ত দিতেছি। "ততঃ সপ্তস্বরা শুদ্ধা বিকৃতা দ্বাদশাপ্যমী" সংগীত দর্পণের ঐ বচনটীর অর্থ যদি এই হয় যে, গ্রামের মধ্যে সাতটী শুদ্ধ (স্বাভাবিক) স্বর আছে, এবং বারটী বিকৃত অর্থাৎ অচলস্বারিক (*Chromatic*) স্বর আছে তাহা হইলে ঐ বারটী বিকৃত স্বরের মধ্যে প্রথমোক্ত সাতটী শুদ্ধ স্বরও আছে কি না ? অবশ্যই আছে। আরও এক প্রমাণ দিই। প্রস্তাবিত গ্রন্থেরই ২ পৃষ্ঠায় লিখা আছে, যেমন আকাশে পক্ষী উড়িয়া যাইলে এবং জলে মৎস্য গমন করিলে, সেই সঞ্চরণ মার্গের কোন দাগ পড়ে না, তদ্রূপ শ্রুতিগুলি ধ্বনিত হইলে শুনা যায় মাত্র, তাহার কোন দাগ

পড়ে না। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, পাঠকবর্গ বিবেচনা করিয়া দেখুন, শ্রুতিরই কি কেবল ঐ প্রকৃতি? অন্য ধ্বনির কি তাহা নাই? সা, রি, গ, ম, প্রভৃতি সাতটী প্রধান স্বরের কেহ ধ্বনিত হইলে, তাহার কি কোন দাগ পড়ে যে, তজ্জন্য তাহা শ্রুতি হইতে ভিন্ন হইবে? কখনই নহে। ধ্বনি মাত্রেরই শ্রুতি ব্যতীত কোনই চিহ্ন লক্ষিত হয় না। নিম্নোদ্ধৃত বচনটী দেখুন, তাহাতে ঐ বিষয় কেমন স্পষ্ট রহিয়াছে,—

" এতত্তু ধ্বনিভেদাঃ স্যুঃ শ্রবণাৎ শ্রুতিসংজ্ঞিতাঃ।"

অর্থাৎ কেবল শুনাই যায়, এই হেতু বিভিন্ন ধ্বনির শ্রুতিসংজ্ঞা হইয়াছে। প্রায় সর্ব্বদাই দেখা গিয়াছে, পাঠকও বোধ হয় জানেন যে, বিপক্ষ পক্ষের নিরাশার্থ কলিকাতাস্থ বঙ্গসংগীত বিদ্যালয় সংক্রান্ত সংগীতাধ্যাপকদিগের শ্রুতির তর্কই মহাবলস্বরূপ। কিন্তু দেখুন, তাঁহাদের মূলেই শ্রুতির সংস্কারেই কেমন মহা ভ্রম রহিয়াছে। প্রস্তাবিত গ্রন্থের কর্ত্তারা বলিতে পারেন যে, তাঁহারা শ্রুতিসম্বন্ধীয় শ্লোক সমূহের যেরূপ অর্থ করিয়াছেন, ব্যাকরণের কোন্ সূত্রদ্বারা সেই অর্থের ভুল প্রমাণ হইল? প্রতিবাদ করিবার তাঁহাদিগের এই এক উত্তম পন্থা রহিয়াছে। কিন্তু ব্যাকরণের তর্ক করিতে আমার শক্তি নাই। সংস্কৃত ব্যাকরণ-শাস্ত্র কল্পতরুস্বরূপ, যে যাহা চাহিবে, তাহাই পাইবে। শুনিয়াছি, অনেক বড় বড় বৈয়াকরণিক সংগীত-সারের সহায় আছেন, অতএব ব্যাকরণসম্বন্ধে অধিক কথা বলিলে, এখনই তর্কের স্রোতে ভাসিয়া যাইতে হইবে। এই গ্রন্থের পদে পদে সংস্কৃত শ্লোকের প্রমাণ দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু অধিকাংশেরই এরূপ অর্থ করা হইয়াছে, যদ্দ্বারা গ্রন্থকর্ত্তাদিগের স্বকপোলকল্পিত মতের আশানুরূপ পরিপোষণ হয়। ক্রমে আরও দৃষ্টান্ত দেখাইব। শ্রুতিসম্বন্ধে অনেকানেক গুরুতর আবশ্যকীয় কথা বলিতে এখন বাকি রহিল, রাগ রাগিণীর সমালোচনায়, তাহা আবার উত্থাপন করিয়া শেষ করিব।

সংগীতসার গ্রন্থের ৮ পৃঃ সপ্তক প্রকরণে দেখিবেন লিখা আছে, "মনুষ্যদেহে স্বাভাবিক তিন সপ্তকের অধিক উচ্চারিত হয় না;" "ঐ তিন সপ্তকের তিনটী আশ্রয় স্থল আছে, নাভি, বক্ষঃ, এবং মস্তক;" "নাভি হইতে যে সপ্তস্বর উচ্চারিত হয় তাহাকে উদারা বলা যায়, অর্থাৎ খাদ স্বর সমূহ।" এই একটী বৃহৎ প্রাচীন ভ্রম। নাভি হইতে কি কখন কণ্ঠস্বর নির্গত হয়? উদরাময়ের পীড়া হইলে নাভির নিকট গড়্ গড়্ শব্দ শুনা যায়, এতদ্ভিন্ন সাংগীতিক ধ্বনি উৎপাদনের কোন কল বল নাভির মধ্যে নাই। অতিশয় খাদ অর্থাৎ গম্ভীর স্বর উচ্চারণকালীন, একটী যে ঘর ঘর শব্দ শুনা যায়, লোকে তাহার যথার্থ কারণ না পাইয়া, বলে যে, ঐ শব্দ নাভির। এই কুসংস্কার অজ্ঞতার ফল। প্রাচীন শাস্ত্রে ঐ মত

লিখা আছে বলিয়া, এপর্য্যন্ত কেহ তাহার দোষাদোষের প্রতি মনোযোগ করেন নাই। ঐটী পদার্থতত্ত্বের প্রসঙ্গ। আধুনিক শারীরবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থের সাহায্যব্যতীত সংস্কৃত গ্রন্থদ্বারা উহার মীমাংসা হইবে না। খাদ, মধ্য, উচ্চ, সকল স্বরই কণ্ঠ হইতে উৎপন্ন হয়। গলদেশে অন্ননলী (Esophagus) ও শ্বাসনলী (Trachea) নামক দুইটী নলী আছে। অন্ননলী দিয়া খাদ্য উদরস্থ হয়, এবং শ্বাসনলী দিয়া নিশ্বাস প্রশ্বাস হয় ও স্বর নির্গত হয়। ঐ শ্বাসনলীর উপরিভাগেই ধ্বনির জন্ম, সেই স্থানের নাম কণ্ঠ (Larynx)। স্থিতিস্থাপক হেতু শ্বাসনলীকে ফুলান ও কুঞ্চিত করা যায়। ফুলাইলে ছিদ্র বৃহৎ হয়, তখন আওয়াজ দিলে, তাহা হইতে গম্ভীর স্বর নির্গত হয়। কুঞ্চিত করিলে ছিদ্র সূক্ষ্ম হয়, সুতরাং তখন তাহা হইতে তীক্ষ্ণ স্বর বাহির হয়। নাভি হইতে যে খাদ সুর নির্গত হয় না, তাহা পরীক্ষার্থ এক সাদাসিধা উপায় বলিয়া দিই। খাদ স্বর উচ্চারণ কালীন নাভিস্থলে হাত দিয়া সবলে ধরিয়া দেখিবেন, খাদ স্বর বন্ধ হইয়া যায় কি না। ধ্বন্যুৎপাদক পদার্থের বিকৃতি জন্মাইলে, কখনই পূর্ব্বমত স্বাভাবিক স্বর উৎপন্ন হয় না।

প্রস্তাবিত গ্রন্থের ৮ পৃষ্ঠায় “স্বরগ্রাম” শব্দের চমৎকার অর্থ দেখিবেন। লিখা আছে, “যাহাকে অবলম্বন করিয়া ঋষভাদি ষট্‌সুরের বোধ হয়, তাহাকে স্বর গ্রাম কহে।” যাহার অবলম্বনে রি, গম প্রভৃতি বুঝা যায়, তাহাকে খরজ (ষড়্জ) কহে। গ্রাম কি প্রকারে হইল? এক খরজ হইতে অন্য উচ্চ কিম্বা নিম্ন খরজ পর্য্যন্ত সুরের যে বিস্তৃতি, তাহাকেই “স্বরগ্রাম” কহে। সাদা কথায়, সাত সুরের সমষ্টিকেও গ্রাম কহা যায়। গ্রন্থকার এক খরজ হইতে অন্য অব্যবহিত উচ্চ বা নিম্ন খরজ পর্য্যন্ত গ্রাম বলিতে চাহেন না। তাঁহার মতে সা হইতে নি পর্য্যন্তই একটি পূর্ণগ্রাম হয়, ইহা তিনি ৮৫ পৃষ্ঠার টীকায় প্রকাশ করিয়া এক বৃহৎ তর্ক করিয়াছেন, টীকাকার বলেন যে, সংগীতে যখন সাত সুরের অধিক নাই, তখন আট-সুর পরিমিত যে দুই খরজ তাহা এক গ্রামের ভিতর ধরা হইতে পারে না; অষ্টম সুরটী অন্যগ্রামের, সুতরাং এক সপ্তকেই এক পূর্ণ স্বরগ্রাম হয়। এইরূপ করিয়া ইউরোপীয়েরা যে ‘অক্টেভ’ শব্দ গ্রামের তুল্যার্থে ব্যবহার করেন, তাহারও দোষ ধরিয়াছেন; এবং তাহার প্রমাণার্থ বলেন যে, অক্টেভ শব্দের অর্থ আট, অতএব এক অক্টেভ পরিমিত সুর বলিলে সা রি গ ম প ধ নি সা বুঝায়, কিন্তু দুই অক্টেভ বলিলে ইউরোপীয়েরা ১৬টী সুর না লইয়া কেন যে এক সা হইতে তাহার দ্বিতীয় উচ্চ সা পর্য্যন্ত ১৫টী সুর গ্রহণ করেন, ইহার কোন কারণই নাই। এইরূপ যে কূট তর্ক করিয়াছেন, তাহার মধ্যে মহা ভ্রম রহিয়াছে। অক্টেভ শব্দের অর্থে অষ্টম, আট নহে। ইহা না জানাতেই, ঐ ফল হইয়াছে। সা-এর অষ্টম সা, রি-এর অষ্টম

রি, গ-এর অষ্টম গ, এইরূপই হইয়া থাকে, অতএব সা-এর দুই অষ্টম উচ্চ যে সুর সেও সা ; সে আর রি হইতে পারে না। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, উক্ত প্রথা ইউরোপে যে অকারণে চলিতেছে, তাহার প্রমাণার্থ টীকাকার বার্ণি, টার্টিনি, মার্কস প্রভৃতি কয়েকটী প্রসিদ্ধ ইউরোপীয় সংগীত গ্রন্থকারের নাম লইয়াছেন। ইহাতে সাধারণকে ঘোর প্রতারণা করা হইয়াছে। ঐ সকল লোকের কৃত গ্রন্থসমূহ অতি বিস্তীর্ণ, প্রাচীন ও বহুমূল্য ; তাহা অন্য কোন বাঙ্গালির গৃহে আছে কি না, সন্দেহ ; থাকিলেও ইউরোপীয় সংগীতের পুস্তক কে পড়িবে ? তৎসম্বন্ধে যাহা লেখা যাইবে, তাহার সত্যাসত্য সহসা ধরা পড়িবে না, হয় এই অনুমানে এত অলীক লিখিতে সাহস হইয়া থাকিবে ; না হয়, ঐ সকল গ্রন্থের অর্থ ভাল করিয়া বুঝা হয় নাই। যে সে ইংরাজি শিক্ষিত ব্যক্তি ঐ গ্রন্থ বুঝাইয়া দিতে পারিবেন না। বিশেষ ঐ সকল গ্রন্থ অতিশয় বৈজ্ঞানিক। টীকাকার ইহাও লিখিয়াছেন, ইউরোপীয় সংগীতাধ্যাপক মার্কস সাহেব সাত সুরেই এক পূর্ণ স্বরগ্রাম বলেন। কিন্তু তাঁহার কৃত Universal school of music" নামক গ্রন্থের ১১ পৃষ্ঠার ও ১২ পৃষ্ঠার চতুর্থ প্যারেগ্রাফে যাহা লিখা আছে যদি কেহ তাহা দেখেন, তবে সত্য মিথ্যা জানিতে পারিবেন। ঐ গ্রন্থের ১২পৃঃ ৪ প্যারাতে লিখা আছে, সাত ডিগরিতে এক গ্রাম হয়। এই ডিগরির (*Degree*) অর্থ টীকাকার বোধ হয় বুঝেন নাই। তিনি সাত ডিগরির অর্থ সাত সুর বুঝিয়াছেন, তজ্জন্যই ঐ প্রমাদ ঘটিয়াছে। ডিগরির অর্থ পরিমাণ বিশেষ। সংগীতে সেই পরিমাণকে ধাপ, ঘাট, বা পর্দ্দা কহা যায়। মার্কস সাহেব ইহাই কহিয়াছেন যে, কোন সুর হইতে সাত ধাপ উঠিলে এক গ্রাম পূর্ণ হয়। কেবল কোন একটী সুর বলুন ; যেন সা, উচ্চারণ করিলে এক ডিগরি উঠা হয় না। সা-এর পর রি বলিলে এক ডিগরি উঠা হয়, গ উচ্চারণ করিলে দুই ডিগরি, ম তিন ডিগরি ইত্যাদি, এই প্রকার সাত ডিগরি উঠিলে অষ্টম সুর ২য়, সা পর্য্যন্ত উঠা হয় কি না, পাঠক দেখুন। সপ্তক শব্দের অর্থ যদি এরূপ হইত যে, অষ্টম সুর ২য় সা-এর অব্যবহিত পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বিস্তৃত সুরের সমষ্টিকে সপ্তক কহে, তাহা হইলে এক সপ্তকেই এক গ্রাম হইত। কিন্তু সপ্তক বলিলে সা হইতে নি পর্য্যন্ত বুঝায়। নি স্বরগ্রামের শেষ সীমা হইতে পারে না, কারণ তাহা সা-এর অব্যবহিত নীচে নহে। মধ্যে কোন প্রধান সুর ব্যবধান না থাক, দুই একটী শ্রুতিও আছে। আরও বিবেচনা করিয়া দেখুন, সা হইতে রি-এর কিম্বা রি হইতে গ-এর কিম্বা গ হইতে ম-এর যেমন এক একটা অন্তর ব্যবধান আছে, অর্থাৎ সা হইতে কোন এক নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে উঠিলে, তবে রি পাওয়া যায়, সেইরূপ নি হইতে কোন একটি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে চড়িলে অষ্টমসুর, উচ্চ সা পাওয়া যায়। অতএব কাহাকেও এক গ্রাম স্বর উচ্চারণ করিতে কহিলে, সে যদি সা-এ আরম্ভ করিয়া

নি-এ শেষ করে, তাহা হইলে নি হইতে উচ্চ সা-এর যে কতখানি ব্যবধান তাহা সে দেখাইল কই? আর ঐ কার্য্যটা কোন্ গ্রামের অধীন? সা হইতে আরম্ভ করিয়া নি-এ সমাপ্ত করিলে মনে একটু অপেক্ষা থাকিয়া যায় কিন্তু উচ্চ সা-এ শেষ করিলে কেমন যেন বিশ্রাম পাওয়া যায়, ইহা কে না স্বীকার করিবে? অতএব প্রাচীন কাল হইতে ভারতবর্ষে সপ্তক শব্দই যে গ্রাম শব্দের তুল্যার্থে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, তাহা অতি অসঙ্গত। ঐ ভ্রমের বশে গ্রন্থকার গ্রাম-সাধনের উদাহরণ সমূহে সা হইতে নি পর্য্যন্ত লিখিয়াছেন। কণ্ঠে এইরূপ সাধনে ছাত্রেরা অনর্থক ক্লেশ পাইবে সন্দেহ নাই। মনে করুন, এক বালককে স্বরগ্রাম শিখ বলিয়া অনুলোমে সা হইতে নি পর্য্যন্ত উঠিতে এবং বিলোমে নি হইতে সা-এ নামিতে শিখাইলাম। সে নি হইতে উচ্চ সা-এ আপনি উঠিতে পারিবে? কখনই নহে, কারণ নি হইতে কতখানি চড়িলে উচ্চ সা হয় তাহা তাহাকে দেখান হয় নাই। সেটী নূতন করিয়া দেখাইলে, সে সাধন প্রথম গ্রামের না দ্বিতীয় গ্রামের? কোন সুর হইতে তাহার অষ্টম সুর পর্য্যন্ত গ্রাম সাধাইলে কোন গোলই থাকে না। এইরূপ নিয়মে এক গ্রাম শিখাইলে অসংখ্য গ্রাম শিক্ষার কার্য্য হয়। আর এইরূপ সাধনাই সর্ব্বসাধারণ্যে প্রচলিত রহিয়াছে। কিন্তু গ্রন্থকার কাহার পরামর্শে ইউরোপীয় সংগীতের উপর ঠেস দিয়া গায়ের জোরে সা হইতে নি পর্য্যন্ত গ্রাম সাধাইতে চাহেন? কারণ সংস্কৃত গ্রন্থে ইউরোপীয় 'অক্টেভ' শব্দের তুল্যার্থ শব্দ নাই।

৮ পৃষ্ঠার নীচে এরূপ লিখা আছে যে, আড়াই সপ্তক পাইবার নিমিত্ত বীণাদি যন্ত্রের নায়কী অর্থাৎ ১ম তারকে মধ্যম সুরে বাঁধা যায়। প-এ বাঁধিলে, আড়াই সপ্তকের অধিক হয় এবং গ-এ বাঁধিলে তাহার কম হয়। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, আড়াই সপ্তকই যে পাইতে হইবে ইহার কারণ কি? আমাদের সংগীতে আড়াই সপ্তকেরই প্রয়োজন। এই গ্রন্থেই লেখা আছে যে, হিন্দু সংগীতে তিন সপ্তক পরিমিত সুর ব্যবহৃত হয়, অতএব আড়াই সপ্তক পাইবার নিমিত্তই যে নায়কী তারকে ম-সুরে বাঁধা যায়, তাহা নয়। তারের সংকর্ষণ (*Tension*) সহ্য করিবার শক্তি বিবেচনাতেই ম-সুরে বাঁধার প্রথা হইয়াছে। প-এ বাঁধিয়া বাজাইলে কখন তার রক্ষা হয় না, ছিন্ন হইয়া যায়, ইহাই যথার্থ কারণ। নতুবা আড়াই সপ্তকের অধিক প্রাপ্তিতে উপকার ভিন্ন অপকার নাই। যদি বল, কিছু নামাইয়া বাঁধিলে তার ছিঁড়িবে না, কিন্তু তাহাতে তারের সংকর্ষণ ঢিল হওয়াতে তার ভৎভৎ করে, ধ্বনি উত্তম শুনায় না। যদি বল মিহি তার ব্যবহার করিলে হইতে পারে, কিন্তু তাহাতেও ধ্বনি অতি ক্ষীণ হইয়া ভাল শুনায় না।

ক্রমশঃ

শ্রীকৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়।

(এই প্রবন্ধটি আমরা অনেক দিন পাইয়াছি, ইহার প্রধনাংশ হারাইয়া ফেলিয়াছি বিবেচনায়, ইহা এপর্য্যন্ত পত্রস্থ করি নাই। ইহা অন্য কোন পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে কি না তাহাও জানি না। লেখককৃত বিচার, ভাল কি মন্দ তাহাও জানি না, কেননা বিচার্য্য বিষয়ে সম্পাদক সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। তবে একস্থানের ভাষা রূঢ় বলিয়া পরিত্যাগ করা গিয়াছে।) বং সং

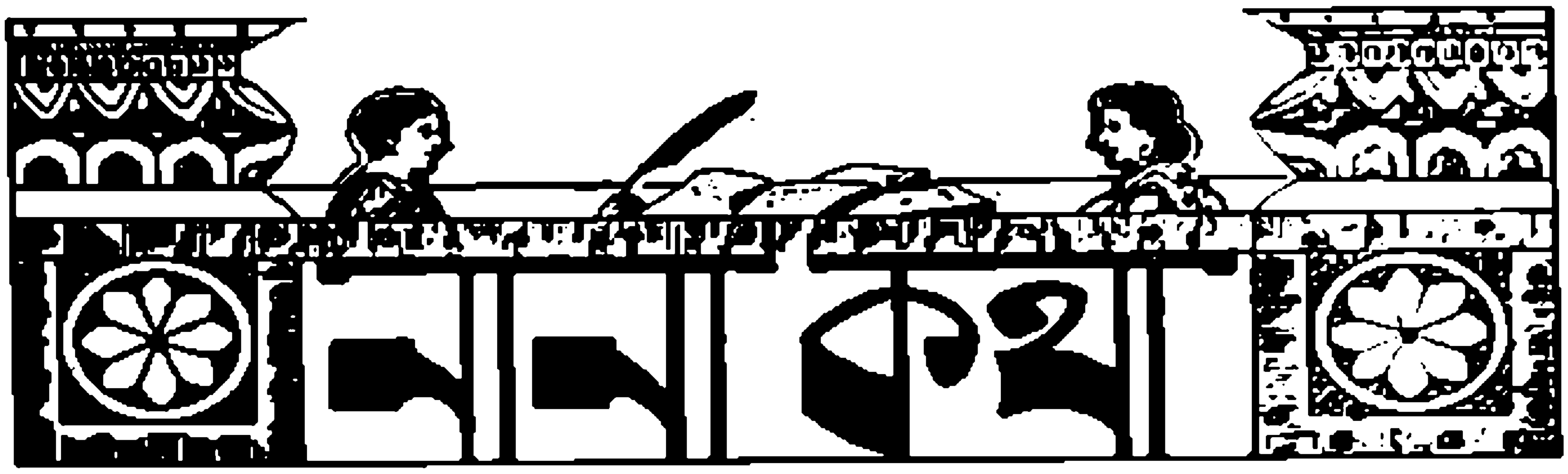

নানা কথা

আধুনিক ভারতবর্ষে, যিনি কায়ক্লেশে একখানি গ্রন্থ লিখিয়া সমাপ্ত করিতে পারিলেন, তিনি শ্রমশীলতার আদর্শস্বরূপ সমাজে পরিচিত হইয়া উঠেন। অথচ স্কট, সৌদি প্রভৃতি ইংরেজি লেখকেরা কত লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা সকলেই জানেন। জেম্‌স একা প্রায় আশীখানি উপন্যাস গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আমরা দুই এক জন নাটককারের কথার উল্লেখ করিব—তাহা আরও বিস্ময়জনক। হেউড নামক ইংরাজি নাটককার দুই শত কুড়িখানা নাটক স্বয়ং বা অন্যের সাহায্যে রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু হার্দি নামক ফরাসীর তুলনায় হেউডও অলসের মধ্যে গণ্য। তিনি ৩৭ বৎসরের মধ্যে আট শত নাটক প্রণয়ন করেন! বৎসরে প্রায় বাইশ খানি!

এদিকে ভারতবর্ষে হাহাকার পড়িয়াছে যে, বিজ্ঞানের সমাদর নাই: কাব্যেই লোকের মন নিবিষ্ট। ওদিকে বিলাতে হাহাকার পড়িয়াছে যে, বিলাতে কাব্যের সমাদর নাই—বিজ্ঞানেরই বড় আদর। কাব্যালোচনা মনুষ্যের উন্নতির পক্ষে যে নিতান্ত প্রয়োজনীয়, তাহা মিল প্রভৃতির নিকট অনেক শুনা গিয়াছে। এক্ষণে কাব্যে আদরাভাবের একটী নূতন কুফল কোন প্রবন্ধ বিশেষ ক্রেজরে দেখা গেল। পার্লিমেণ্টের বাগ্মিগণের বর্ণনাকালে লেখক এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন যে, ইংলণ্ডে এক্ষণে যে উচ্চশ্রেণীর কবি কেহ নাই, তাহার কারণ ইংলণ্ডে কাব্যের অনুশীলন সেরূপ নাই। যদি কেহ বলেন যে, ইংলণ্ডে যে এখন পূর্ব্বের মত বীরত্ব নাই, তাহারও কারণ কাব্যে অনাদর, আমরা সে কথাও অসঙ্গত মনে করিব না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এ দেশে একদল নব্য মূর্খ জন্মিয়াছেন, তাঁহারা মনে করেন যে ক্ষণিক মনোরঞ্জন ভিন্ন, কাব্যে আর কোন উপকার নাই, এবং বিজ্ঞান ভিন্ন অন্য কোন বিদ্যা অনুশীলনের যোগ্য নহে। যদি এই মূর্খদিগের বিজ্ঞানে কিছুমাত্র অধিকার থাকিত, তাহা হইলে ক্ষতি ছিল না। আমাদের বিবেচনায় ভারতবর্ষে বিজ্ঞানের অধিক আদর কর্ত্তব্য বটে, কেননা বিজ্ঞান কিছুই নাই, কাব্যের তাদৃশ অভাব নাই। কিন্তু তাই বলিয়া, কাব্যে অনাদর হওয়া কর্ত্তব্য নহে। অনে

বাঙ্গালি কাব্যকারদিগের জ্বালায় কাব্য সকলেরই অরুচিকর হইয়া উঠিয়াছে, ইহাও স্বীকার করি।

গত ডিসেম্বর মাসের মুখুর্য্যার পত্রে খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রচার বিষয়ে বিঘ্ন সম্বন্ধে যে প্রস্তাব লিখিত হইয়াছে, পাঠকগণ তাহা পাঠ করিয়াছেন? যিনি পাঠ না করিয়াছেন, তাঁহাকে পাঠ করিতে বলি। লেখকের সঙ্গে বাঙ্গালির অনেক স্থানে মতভেদের সম্ভাবনা; কিন্তু তাহা হইলেও প্রস্তাবটিকে উৎকৃষ্ট বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। ভারতবর্ষে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারিত হইতেছে না কেন, তদ্বিষয়ে নানা মুনির নানা মত, কিন্তু আমরা বলি, একটা কথা বলিলেই যথোচিত হয়। ভারতে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারের একমাত্র বিঘ্ন—“হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা।” খ্রীষ্টধর্ম্মে এমন কি আছে যে তাহা হিন্দুধর্ম্মে নাই? তবে কেন হিন্দু খ্রীষ্টধর্ম্মের জন্য সমাজ পরিত্যাগ করিবে? পাদরি সাহেবেরা হিন্দুধর্ম্মের মর্ম্ম বুঝেন না বলিয়া এত মাথা কুটিয়া মরেন। যে দিন বুঝিবেন, সেই দিন আসামে গিয়া চার চাস আরম্ভ করিবেন।

আমরা “মুখুর্য্যার পত্রের” গোঁড়া এবং পত্রস্থ প্রবন্ধসকল পাঠ করিয়া বড় সুখী হইয়া থাকি। কিন্তু ঐ ডিসেম্বর মাসে “Administration of Justice in Bengal” নামক প্রবন্ধ দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। ইহা কোন দেশীয় বিচারক প্রণীত বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। যদি সে কথা সত্য হয়, তবে ইহা আমাদের দেশীয় বিচারকদিগের লজ্জার কথা বটে। বিচক্ষণ সম্পাদক কি ইহার ইংরেজিটুকুও সংশোধন করিতে অবকাশ পান নাই? যদি তাঁহার ন্যায় সুদক্ষ ব্যক্তির দ্বারা সম্পাদিত পত্রেও একরূপ ইংরেজি প্রবেশ করে, তবে বাঙ্গালি “বাবু ইংরেজির” জন্য গালি খাইবে না কেন?
